বাংলার ইতিহাস

মোগল আমল

আবদুল করিম

বাংলার ইতিহাস
মোগল আমল

Edited by Ripon Sarkar

বাংলার ইতিহাস
মোগল আমল

প্রথম খণ্ড

(১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে দাউদ কররানীর পতন থেকে
১৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে জাহাংগীরের মৃত্যু পর্যন্ত)

আবদুল করিম

অধ্যাপক

প্রাক্তনউপাচার্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

Edited by Ripon Sarkar

বাংলার ইতিহাস : মোগল আমল

আবদুল করিম

প্রকাশক : মোরশেদ আলম, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ৬৭ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। প্রচ্ছদ : বিশ্বাস। বর্ণবিন্যাস : বর্ণনা ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০। মুদ্রণে : আল ফয়সাল প্রিন্টিং প্রেস, শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০। গ্রন্থস্বত্ব : লেখক। প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯২। দ্বিতীয় এবং জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন প্রথম প্রকাশ জুলাই ২০০৫। দ্বিতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ২০০৭।

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা

BANGLAR ITIHAS MOGLE AMAL : by Abdul Karim. Published by Morshed Alam, Jatiya Grontha Prakashan, 67 Pyaridas Road, Dhaka-1100. Cover Design : Biswash. First Published : July 2005. 2nd Print : April 2007.

Price Tk. : 350.00 Only. US $ 10

ISBN 984-560-121-9

Edited by Ripon Sarkar

উৎসর্গ

আমার প্রথম শিক্ষক
মরহুম মৌলবী মুনিরুজ্জামান
ও
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও শিক্ষক
মরহুম সৈয়দ আবদুল হালীম
স্মরণে

Edited by Ripon Sarkar

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'বাংলার ইতিহাস: সুলতানী আমল' বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পর লক্ষ্য করলাম বাংলার মোগল আমলের ইতিহাসের উপর ব্যাপক কোন গবেষণা হয়নি বা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি, বিশেষ করে কিছু বিষয়ে কয়েকখানি বই ছাড়া। এই উপলব্ধি থেকে অনুভূত হলো ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলি পুনর্মূল্যায়ন করে বাংলায় মোগল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করার অবকাশ রয়েছে। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' আমাকে সিনিয়র ফেলোশীপ মঞ্জুর করলে আমি বাংলার মোগল আমলের ইতিহাস লিখার কাজ হাতে নিই এবং মোগল আমল-এর প্রথম খণ্ড শেষ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হই।

বইটি 'ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর দ্রুতই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। কিন্তু নানাবিধ অসুবিধায় পড়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ বিলম্বিত হয়। অবশেষে পাঠকদের চাহিদার কথা ভেবে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনকে ধন্যবাদ, তাঁরা অতি যত্নসহকারে অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে পেরেছেন। বইটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক এবং সকল ইতিহাসানুরাগীর উপকারে আসলে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

১৫.৪.০৫ — আবদুল করিম

Edited by Ripon Sarkar

ভূমিকা

হিষ্টরি অব বেংগল ভল্যুম ২ প্রকাশিত হওয়ার পরে চল্লিশ বৎসরেরও বেশী সময় গত হয়েছে। বইখানি স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। ইহা বাংলার মুসলমান শাসনের ইতিহাসে একটি মূল্যবান অবদান। ইহা আমাদের জ্ঞান প্রসারিত করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে, পূর্ববর্তী ইতিহাস গ্রন্থ রিয়াজ-উস-সলাতীন এবং ষ্টুয়ার্টের হিষ্টরি অব বেংগল-এ প্রাপ্ত ইতিহাস ছিল নিতান্ত অপ্রতুল এবং ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। কালক্রমে স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিষ্টরি অব বেংগল-এর অপ্রতুলতা এবং ভুল-ভ্রান্তিও আধুনিক ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হয়।

গত প্রায় তিন যুগ ধরে আমি বাংলার ইতিহাসের সুলতানী আমল নিয়ে গবেষণা করেছি এবং সুলতানী আমলের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানি বই এবং বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি. বাংলাদেশ ও পশ্চিমবংগের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও সুলতানী আমলের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং বই ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে বলা যায় যে সুলতানী আমল সম্পর্কে হিষ্টরি অব বেংগল, ভল্যুম ২-এর তুলনায় আমাদের জ্ঞান বেশ প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু বাংলার মোগল আমলের ইতিহাসে কোন ব্যাপক গবেষণা হয়নি বা ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত হয়নি। বিশেষ বিষয়ে কয়েকখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, যেমন তপন কুমার রায় চৌধুরীর "বেংগল আণ্ডার আকবর এ্যাণ্ড জাহাংগীর", আমার "মুর্শিদকুলী খান এ্যাণ্ড হিজ টাইমস", খন্দকার মাহবুবুল করিমের "দি প্রভিনসেস অব বিহার এ্যাণ্ড বেংগল আণ্ডার শাহজাহান" এবং অঞ্জলি বসুর "বেংগল আণ্ডার আওরংজেব"। প্রথম বইখানি মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. ফিল. থিসিস এবং শেষ তিনটি মূলত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান ষ্টাডিজের পি.এইচ-ডি থিসিস। এই বইগুলি প্রমাণ করেছে যে, ইতিহাসের মৌলিক উপাদানগুলি পুনর্মূল্যায়ণ করে বাংলায় মোগল আমলের ইতিহাস পুনর্গঠন করার অবকাশ রয়েছে। তাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব বাংলাদেশ ষ্টাডিজ আমাকে সিনিয়র ফেলোশীপ মঞ্জুর করলে আমি বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) লিখার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এই পরিকল্পনা নিম্নরূপ :

প্রথম খণ্ড : বাংলা ইতিহাস : মোগল আমল : ১৫৭৬-১৬২৭। (দাউদ খান কররানীর পতন থেকে মোগল সম্রাট জাহাংগীরের মৃত্যু পর্যন্ত।)

দ্বিতীয় খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : ১৬২৭-১৭০৭। (শাহজাহান ও আওরংগজেবের রাজত্বকাল।)

তৃতীয় খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : ১৭০৭-১৭৫৭। (মুর্শিদকুলী খান থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত।)

Edited by Ripon Sarkar

চতুর্থ খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : (সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস।)

পঞ্চম খণ্ড : বাংলার ইতিহাসঃ মোগল আমল : (অর্থনৈতিক ইতিহাস।)

এই পরিকল্পনা মতে প্রথম খণ্ড শেষ করে পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি আনন্দিত বোধ করছি।

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) এর এই প্রথম খণ্ডে কররানী সুলতান দাউদ খানের পতন থেকে মোগল সম্রাট জাহাংগীরের মৃত্যু পর্যন্ত একপঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। এই অর্ধ শতাব্দীর ইতিহাস বাংলার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই সময়েই বাংলায় মোগল শাসন দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অনেক যুদ্ধ বিগ্রহের পরে বাংলায় স্থিতিশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থা ফিরে আসে। বাংলা মোগল সুবারূপে ইহার স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমারেখা ফিরে পায় এবং বাংলার হিন্দু-মুসলমান একত্রে মুসলমান মোগলদের বিরুদ্ধে একই কাতারে সমবেত হয়ে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়। সুলতানী আমলে বাংগালা নামের উৎপত্তি হয়, মোগল আমলে বাংগালা স্বাভাবিক সীমায় রূপ লাভ করে। History of Bengal. vol. II প্রকাশিত হওয়ার পরে এই পর্বের ইতিহাসের বিশেষ কিছু নতুন উপাদান আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কিছু গবেষণা কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। নতুন তথ্য আবিষ্কৃত না হলেও পুরাতন তথ্য নতুন আলোকে বিশ্লেষণ করে এই পুস্তকখানি লিখিত হয়েছে। ইহাতে আশাতিরিক্ত সুফল পাওয়া গেছে বলে আমার বিশ্বাস। আবদুল লতীফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়রী এবং মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী আবিষ্কারের কৃতিত্ব স্যার যদুনাথের, এই আবিষ্কারের জন্য বাংগালীরা স্যার যদুনাথের নিকট চিরদিন ঋণী থাকবে, কারণ এই দুইটি সূত্র আবিষ্কারের আগে বাংলায় মোগল অধিকারের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু History of Bengal vol. II তে এই দুইটি মহামূল্যবান সূত্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে বলে মনে হয় না। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই পর্বের লেখক ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যা লিখেছিলেন, সম্পাদক স্যার যদুনাথ তা সংক্ষেপ করে প্রায় অর্ধেকে নিয়ে এসেছেন (HB II. preface. IX)। এই প্রথম খণ্ডে আমরা বার-ভূঁঞাকে যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছি, ভাটি এবং ভাটির বার-ভূঁঞার নতুন করে পরিচিতি দেয়া হয়েছে এবং বার-ভূঁঞা সম্পর্কে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের ভুল ধারণা নিরসন করা হয়েছে। মোগল আগ্রাসনের প্রতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূঁঞাদের প্রতিরোধ, এবং মুসা খান মসনদ-ই-আলা ও বার-ভূঁঞার যুদ্ধ আমরা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছি। খাজা উসমানের যুদ্ধ এবং তার পরিণামের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আকবরের বিখ্যাত সেনাপতিরা যেখানে বাংলা জয় করতে বিফল হয়েছেন, সেখানে ইসলাম খান চিশতী কিভাবে এবং কি গুনে মাত্র তিন বৎসরের মধ্যে সারা বাংলা জয় করে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, সেই বিষয়টির উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। কাসিম খান এবং

Edited by Ripon Sarkar

ইবরাহীম খান ফতেহজংগের সুবাদারী আমলের প্রতিও History of Bengal. vol. II র তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলার ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট বিষয়ে এই বই নতুন আলোকপাত করতে সক্ষম হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) প্রথম খণ্ড রচনার সময় আমি অনেকের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ কর্তৃপক্ষের কথা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট-এর অনেক অধ্যাপকদের সংগে আমার পূর্বপরিচয় ছিল কিন্তু রাজশাহী যাওয়ার আগে আমি জানতাম না যে সেখানে আমার এত অধিক সংখ্যক সুহৃদ এবং বন্ধু আছে। সকলের নাম উল্লেখ করা এখানে সম্ভব নয়, তবে যাঁদের নাম উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদ, উপ-উপাচার্য প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী, ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর সফর আলী আকন্দ, প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, ড. প্রীতি কুমার মিত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. বি. মোশারফ হোসেন, প্রফেসর শাহানারা হোসেন, প্রফেসর এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী, ড. গোলাম রসুল এবং ড. মুহিবুল্যা ছিদ্দিকী। ইনস্টিটিউটের সচিব জনাব জিয়াদ আলী এবং ফেলোরা সকলে আমার রাজশাহী অবস্থান স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তোলেন, ফেলো মিঃ মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন ও তৌহিদ হোসেন চৌধুরী এবং তাদের স্ত্রীদের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী, আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ফেলো সবাই আমাকে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন, বিশেষ করে আবুল হাশেম, আমিনুল ইসলাম, তৌহিদ হোসেন চৌধুরী, জাফর হানাফী, বদীউল আলম এবং নীলকান্ত বেপারীর সাহায্য সহযোগিতা ভুলবার নয়। তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. এফ. সালাহউদ্দীন আহমদের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ, তিনিই সর্বপ্রথম আমার রাজশাহী যাওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন, প্রফেসর আকন্দ প্রস্তাব বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন এবং মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর আমানুল্লাহ আহমদের আন্তরিকতায় প্রস্তাবটি বাস্তবিক হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর আবদুল মোমিন চৌধুরী, প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর কে. এম. মোহসীন এবং প্রফেসর মুফাখখারুল ইসলামের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ, তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকে বই পুস্তক, সাময়িকীর ফটোকপি সরবরাহ করে আমাকে সাহায্য করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আবদুল সাঈদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর জনাব শামসুল হোসাইনও বই পুস্তক সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জনাব ফারুক আহমদ এবং সহকারী ডকুমেনটেশন অফিসার জনাব সাদেক রেজা চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক জনাব ফারুক আহমদ এবং সহকারী ডকুমেনটেশন অফিসার জনাব সাদেক রেজা চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরীও বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজের সকলেই

Edited by Ripon Sarkar

সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে জনাব মোঃ আবদুল গাফফার ও আবদুস সালাম আকন্দ বইখানির প্রেস কপি তৈরি করেছেন। তাঁদের সকলের কাছে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, জামাতা, পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনীদের কথা না বললে এই পর্ব অসম্পূর্ণ থাকবে। আমার অনুপস্থিতিতে তারা আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমার স্ত্রী এবং ছোট ছেলে মাঝে মাঝে আমার সংগে রাজশাহীতে আসে। রাজশাহীর আবহাওয়া চট্টগ্রামের আবহাওয়ার চেয়ে কিছুটা অনুদার, যাতায়াত ব্যবস্থাও খুব সুখকর নয়। সুতরাং তারা রাজশাহীতে আসলেও অস্বস্তিতে থাকে, আবার চট্টগ্রামে থাকলেও উৎকণ্ঠায় দিন কাটায়। কিন্তু তারা হাসিমুখে এই অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠা সহ্য করে যায়। তাদের মংগলের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতালার নিকট প্রার্থনা জানাই।

বইখানি নিষ্ঠাসহকারে ছাপাবার জন্য উত্তরণ প্রেসের মালিক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বইখানি সমাদৃত হলে এবং ছাত্র-শিক্ষক, গবেষক ও পাঠকদের কাজে আসলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
১৫-০১-১৯৯২

আবদুল করিম

Edited by Ripon Sarkar

এই লেখকের অন্যান্য বই :

ইংরেজি বই

Social History of the Muslims in Bengal (down to A. D. 1538)
Corpus of the Muslim Coins of Bengal (down to A. D. 1538)
Murshid Quli Khan and His Times
Dacca The Mughal Capital
Catalogue of Coins in the Cabinet of the Chittagong University Museum
Corpus of Arabic and Persian Inscriptions of Bengal
History of Bengal : Mughal Period, vol. I (Form the fall of Daud Karrani
1576 to the death of Jahangir).

বাংলা বই

ঢাকাই মসলিন
শরিয়তনামা (কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের শরীয়তনামার সম্পাদনা)
ভারত উপ-মহাদেশে মুসলিম শাসন
বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)
চট্টগ্রামে ইসলাম
হজরত শাহ সুফী আমানত খান
বাংলার সুফী সমাজ
মোল্লা মিসকিন শাহ
মক্কা শরীফে বাঙালী মাদ্রাসা
ফুতুহাত-ই-ফীরুজশাহী (সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক বিরচিত ফুতুহাত-ই-ফীরুজশাহীর বাংলা অনুবাদ)

Edited by Ripon Sarkar

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : উপক্রমণিকা ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাংলার ভূঁইয়াদের আমল : ভাটির বার-ভূঁইয়া ২৫

তৃতীয় অধ্যায় : আকবরের রাজত্বকালে মোগল অভিযান : মোগল সেনাদের বিদ্রোহ : বাংলার ভূঁইয়াদের প্রতিরোধ ১১২

চতুর্থ অধ্যায় : সুবাদার ইসলাম খান চিশতী ভাটি বিজয় ও বার ভূঁইয়ার পতন ১৭১

পঞ্চম অধ্যায় : সুবাদার ইসলাম খান চিশতী : রাজা উসমান ও বায়েজীদ কররানীর পতন ২২০

ষষ্ঠ অধ্যায় : সুবাদার ইসলাম খান চিশতী: যশোহর, বাকলা, কাছাড় এবং কামরূপ বিজয় ২৬৩

সপ্তম অধ্যায় : সুবাদার ইসলাম খান চিশতী : চরিত্র, কৃতিত্ব এবং মৃত্যু ২৮৬

অষ্টম অধ্যায় : সুবাদার কাসিম খান চিশতী ৩২৫

নবম অধ্যায় : সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ : আফগানদের বিদ্রোহ দমন ৩৬৫

দশম অধ্যায় : সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ : ত্রিপুরা বিজয় ৪০১

একাদশ অধ্যায় : সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ : চন্দ্রকোনা ও দ্বিতীয় বিদ্রোহ দমন, ব্যর্থ আরাকান অভিযান ও মৃত্যু ৪২৬

দ্বাদশ অধ্যায় : বাংলায় বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহান এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৪৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায় : উপসংহার ৪৬৬

গ্রন্থপঞ্জী ৪৭৭

নির্ঘণ্ট ৪৮৩

Edited by Ripon Sarkar

টীকা সংকেত

আইন	: আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, হেনরী ব্লখম্যান কর্তৃক অনূদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, এইচ. এস. জেরেট কর্তৃক অনূদিত এবং স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃ সংশোধিত, কলকাতা ১৯৪৯।
আকবরনামা	: আবুল ফজলের আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, বেভেরীজ কর্তৃক অনূদিত।
এইচ. বি. ২য় H. B. II	: হিষ্টরি অব বেংগল, ভল্যুম ২, স্যার যদুনাথ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৪৮।
জে. এ. এস. বি	: জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেংগল, কলকাতা।
তুজুক	: তুজুক-ই-জাহাংগীরী, রোজার্স এবং বেভেরীজ কর্তৃক অনূদিত, ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮।
বাহরিস্তান	: মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী, এম. আই. বোরাহ কর্তৃক ২ খণ্ডে অনূদিত এবং আসাম গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত।
বি. পি. পি. B. P. P.	: বেংগল পাষ্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, কলকাতা।
মাসির-উল-উমারা	: শাহনওয়াজ খান ও আবদুল হাই কর্তৃক রচিত মাসির-উল-উমারা, বেনী প্রসাদ ও বেভেরীজ কর্তৃক ২ খণ্ডে অনূদিত।
রাজমালা	: শ্রী রাজমালা, কালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত, ৩ খণ্ড, ১৩২৬-১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে প্রকাশিত।
রিয়াজ	: গোলাম হোসেন সলীমের রিয়াজ-উস-সালাতীন, আবদুস সালাম কর্তৃক অনূদিত, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে পুনর্মুদ্রণ।

Edited by Ripon Sarkar

প্রথম অধ্যায়

...পাবলিক লাইব্রেরী ... ঢাকা

উপক্রমণিকা

বাংলার মুসলমান শাসন আমলের প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস সৈয়দ গোলাম হোসেন সলীম জাইদপুরীর রিয়াজ-উস-সলাতীন। ফার্সি ভাষায় লিখিত এই বইখানি ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ মুসলিম শাসন শেষ হওয়ার পরে মালদহে লিখিত হয় এবং ইহাতে প্রথম মুসলমান বিজয় থেকে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসরের বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। ধারাবাহিক ইতিহাস হলেও এটি পূর্ণাঙ্গ নয়; এতে অনেক অপূর্ণতা এবং ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। গোলাম হোসেনের সময়ে ইতিহাসের উৎস ছিল দিল্লীতে লিখিত ইতিহাস, বাংলার কোন সমসাময়িক ইতিহাস আবিষ্কৃত না হওয়ায় তাঁকে বাংলার বাইরে লিখিত অসম্পূর্ণ ইতিহাসের উপর নির্ভর করতে হয়। দিল্লীতে লিখিত সকল ইতিহাসও তাঁর আয়ত্তে ছিল কিনা সন্দেহ। গোলাম হোসেনের সময়ে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার ইতিহাসের প্রধান উৎস ছিল আবুল ফজলের আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী, নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশীর তবকাত-ই-আকবরী, আবদুল কাদের বদায়ুনীর মুন্তখব-উৎ-তওয়ারীখ, ফিরিশতার তারীখ-ই-ফিরিশতা, জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী এবং মুতামদ খানের ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী। এইগুলি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসাবে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য এই বইগুলিতে পাওয়া যায়। তথ্যগুলি সম্পূর্ণ না হওয়ায় এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এতে গোলাম হোসেন বাংলার ইতিহাসের কোন রূপরেখা পাননি, তাঁকে বাংলার ইতিহাসের একটি নতুন কাঠামো তৈরি করে নিতে হয়। কিন্তু এই বইগুলিও গোলাম হোসেনের আয়ত্তে ছিল কিনা বা আয়ত্তে থাকলেও তিনি সবগুলি পুস্তকের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। আকবরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভূঁএগদের বিশেষ করে বার-ভূঁএগর প্রতিরোধ বাংলার ইতিহাসের একটি প্রধান অধ্যায়, কিন্তু রিয়াজ-উস-সলাতীনে এই বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। আকবরনামায় ঈসা খান মসনদ-ই-আলা, কেদার রায়, মাসুম খান কাবুলী এবং অন্যান্য ভূঁএগদের প্রতিরোধের কথা আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও রিয়াজে এঁদের নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না, বার-ভূঁএগ কথাটিও রিয়াজে অনুপস্থিত। রিয়াজে শুধু দাউদ কররানীর পতন সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আছে; আকবরের সেনাপতিদের নাম আছে, কিন্তু আকবরের বাংলা বিজয়ের প্রচেষ্টার কাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে। জাহাঙ্গীরের আত্ম-জীবনী রিয়াজ রচয়িতা গোলাম হোসেনের আয়ত্তে ছিল কিনা সন্দেহ, তবে গোলাম হোসেন সলীম মুতামদ খানের ইকবালনামা-ই-জাহাংগীরী ব্যবহার করেন বলে মনে হয়। ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তারের সম্পূর্ণ কাহিনী রিয়াজে নেই, শুধু খাজা উসমানের পতনের কাহিনী একটু বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই কাহিনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী এবং ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরীতেও পাওয়া যায়। শের আফগানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সুবাদার কুতুব-উদ-দীন খানের মৃত্যু কাহিনীও রিয়াজে সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ইসলাম খানের পরবর্তী সুবাদারদের সম্পর্কেও রিয়াজে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না, শুধু শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ এর মৃত্যু কাহিনী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। সীমাবদ্ধতা থাকলেও রিয়াজ-উস-সলাতীন বাংলার মুসলমান শাসন আমলের ধারাবাহিক ইতিহাসে

Edited by Ripon Sarkar

সর্বপ্রথম উদ্যোগ, এই পুস্তকেই ঐ সময়ের ইতিহাসের প্রথম রূপরেখা পাওয়া যায় এবং এ কারণেই এই পুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুসলমান শাসন আমলের পরবর্তী ইতিহাস ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্টের হিস্টরি অব বেঙ্গল, যা ১৮১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের অনেক মৌলিক তথ্য তখনও অনাবিষ্কৃত থাকে, তাই স্টুয়ার্ট তাঁর পুস্তক রচনায় রিয়াজ-উস-সলাতীনের উপর নির্ভর করেন, ফলে তাঁর বই মোটামুটিভাবে রিয়াজের ইংরেজি ভাষ্যে পরিণত হয়। স্টুয়ার্ট তাঁর বইয়ের শেষ দিকে ইংরেজ কোম্পানির দলিলপত্র থেকেও উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং জাহাঙ্গীরের আমলের ইতিহাস রচনায় পর্তুগীজ বিবরণের সাহায্য নেন, যা রিয়াজ রচয়িতার নাগালের বাইরে ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্টুয়ার্ট বাংলার ইতিহাসে বিশেষ নতুন কিছু সংযোজন করতে পারেননি। উনিশ এবং বিশ শতকে ইংরেজ, ভারতীয় এবং বাঙ্গালি ঐতিহাসিকেরা বাংলার ইতিহাসে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং তাঁদের গবেষণার ফল বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশ করেন। প্রাক-মুসলিম এবং মুসলিম আমলের অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়, লিখিত তথ্য ছাড়াও অনেক মুদ্রা এবং শিলালিপি ও তাম্রলিপি ঐতিহাসিকদের গোচরে আসে। যদিও বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অনেক বই পুস্তক প্রকাশিত হয়, তবুও বাংলার ধারাবাহিক এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ অনেক বিলম্বিত হয়। অবশেষে ত্রিশের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার এক ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নেয়। এই পরিকল্পনার ফলশ্রুতিতে দুই খণ্ডে হিস্টরি অব বেঙ্গল প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রাক-মুসলিম আমলের ইতিহাস রচিত হয়ে প্রথম খণ্ড ১৯৪৩ সালে এবং স্যার যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় মুসলিম আমলের ইতিহাস সম্বলিত দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।

আমরা ছাত্রাবস্থায় এই বইগুলি পড়েছি এবং গবেষণার সময় এই বইগুলি কাজে লেগেছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে রিয়াজ-উস-সলাতীন বা স্টুয়ার্টের হিস্টরি অব বেঙ্গল-এর তুলনায় স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, অনেক উন্নতমানের, এবং এই বই আগের তুলনায় আমাদের জ্ঞান অনেক প্রসারিত করেছে। সম্পাদক স্যার যদুনাথ ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন :[১]

> For the Editor's own portion of this volume..... his only apology is the nature of raw material on which he had to work. He had to clear the jungle and break virgin soil in respect of certain periods in his share, such as the viceroyalties of Prince Muhammad Shuja, Shaista Khan and Murshid Quli Khan. In these my predecessors, the Riyaz-us-Salatin and its English version, Stewart's History of Bengal, had merely left to us unchartered wilderness, and I had to construct their true story by piecing together a large number of stray hints in Persian manuscripts and letters and European traders' roports. A comparison of these chapters with the corresponding pages in Stewart will show how our knowledge of the history of Bengal has advanced beyond recognition in the century and a quarter that have followed the days of Stewart.

Edited by Rana Sarkar

নিঃসন্দেহে হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, একটি মূল্যবান অবদান এবং স্যার যদুনাথের উপরোক্ত দাবি মোটেই অযৌক্তিক নয়। কিন্তু আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি যে এই বইতেও কিছু অপূর্ণতা এবং ভুল-ভ্রান্তি রয়ে গেছে। আমি প্রথমে বাংলার সুলতানী আমলে গবেষণা শুরু করি এবং ঐ আমলের বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকখানি বই এবং প্রায় শ'খানেক প্রবন্ধ লিখি। বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গের আরও কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকও সুলতানী আমলে ব্যাপক গবেষণা করেছেন এবং আমার মনে হয় হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এর তুলনায় বর্তমানে সুলতানী আমল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক প্রসারিত হয়েছে। আমার 'মুর্শিদকুলী খান এ্যাণ্ড হিজ টাইমস' বইখানি লেখার সময় আমি লক্ষ্য করি যে হিস্টরি অব বেঙ্গল ভল্যুম ২-এ মোগল আমলের ইতিহাসেও বেশ অপূর্ণতা রয়ে গেছে। তখন থেকেই আমি বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) লিখার আশা পোষণ করতে থাকি।

হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ যাঁরা লিখেছেন তাঁরা সকলেই খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন। স্যার যদুনাথের পরিচিতির প্রয়োজন নেই, তিনি মোগল ইতিহাসের স্থপতি এবং ভারতীয় ও বাঙ্গালি ঐতিহাসিকদের দিশারী। অন্যান্য যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও খ্যাতিমান, তাঁদের কেউ কেউ আমার শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা আমার শিক্ষক ছিলেন না, তাঁরাও শিক্ষক পর্যায়ের। আমি দাবি করি না যে আমি তাঁদের চেয়ে ভাল লিখব, আমার মধ্যে কোন আত্মম্ভরিতা নেই। তবে ইতিহাসের গবেষণায় কোন শেষ কথা নেই, আজ যা সিদ্ধান্ত দেয়া গেল, নতুন তথ্যের আলোকে হয়ত তা কালকেই পুনর্বিবেচনা ও পরিবর্তন করতে হবে। যে সকল তথ্য পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিগোচর হয়নি বা তাঁদের নিকট অস্পষ্ট ছিল, তা হয়ত আধুনিক ঐতিহাসিকদের গোচরে আসতে পারে বা পূর্বের অস্পষ্ট ধারণা স্বচ্ছ হতে পারে। তাছাড়া প্রেক্ষিতের প্রশ্ন আছে। স্যার যদুনাথ এবং তাঁর সহকর্মীরা মোগল সাম্রাজ্যের প্রেক্ষিতে লিখেছেন। তাই তাঁদের রচিত বাংলার ইতিহাস বাংলার ইতিহাস না হয়ে বাংলায় মোগলদের ইতিহাসে রূপলাভ করেছে। এই কথাটি বিশেষভাবে আকবরের সময়ে প্রযোজ্য। তাঁরা বাংলার ভূঁঞা, জমিদার এবং সামন্ত প্রধানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না, তাঁদের দেশ প্রেমের প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, স্যার যদুনাথ নিজে বার-ভূঁঞাদের ভূঁই-ফোড় (Upstart) এবং দস্যু-সর্দার (Captains of plundering bands) রূপে উল্লেখ করেন। বার-ভূঁঞারা তিন যুগ ধরে মোগল আগ্রাসন প্রতিরোধ করেন এবং সফলভাবে আকবরের সেনাপতিদের বাধা দেন, কিন্তু হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ তাঁদের কোন মর্যাদাই দেয়া হয়নি এবং তাঁদের দেশ প্রেমের কথা সরাসরি অস্বীকার করা হয়। সুতরাং মোগল আমলের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল) এর এই খণ্ডে ব্যবহৃত মৌলিক উপাদানগুলি গবেষকদের নিকট পরিচিত, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের নিকটও এইগুলি পরিচিত ছিল। তবুও মৌলিক ইতিহাস গ্রন্থগুলির পুনর্মূল্যায়ন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আকবরের সময়ে বাংলায় মোগল অভিযানের জন্য প্রধান এবং প্রাথমিক সূত্র আবুল ফজলের

Edited by Ripon Sarkar

আকবরনামা।[২] আবুল ফজল কোন সময় বাংলায় আসেননি, কিন্তু তিনি দরবারী ঐতিহাসিক এবং আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন, ইতিহাস লেখার সকল সুযোগ সুবিধা তাঁকে দেয়া হয়। তিনি আকবরের সময়ে বাংলায় মোগল অভিযান, বাংলার ভূঁঞা এবং জমিদারদের প্রতিরোধ, আকবরের বিরুদ্ধে বাংলায় অবস্থানরত মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করেছেন। আবুল ফজল বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার সময় প্রায়ই "একটি ঘটনা" "বাংলা থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে" বা "বাংলার সুসংবাদ পাওয়া গেছে," ইত্যাকার ভূমিকা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। এতে মনে হয় তিনি সিপাহসালার, সুবাদার বা সেনাপতিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁর বক্তব্য লিখেন। সুবা বা প্রদেশ থেকে সংবাদের আরও একটি উৎস ছিল। মোগল প্রাদেশিক শাসন কাঠামোয় ওয়াকিয়ানবিশ নামক একজন কর্মকর্তা নিযুক্ত হত, আকবর প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থার রূপরেখা প্রণয়নের সময় এই কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি করেন। এই কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অজান্তে বিভিন্ন বিষয়ে সম্রাটের নিকট সংবাদ প্রেরণ করা। কিন্তু যদিও পদ সৃষ্টি করা হয়, আকবরের সময়ে বাংলায় এই পদে কোন লোক নিযুক্তির প্রমাণ আকবরনামায় পাওয়া যায় না। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে জানা যায় যে, ইসলাম খান চিশতীর সুবাদারী আমলের শেষ পর্যায়ে জাহাঙ্গীর বাংলায় একজন ওয়াকিয়ানবিশ নিযুক্ত করে পাঠান, প্রথম ওয়াকিয়ানবিশের নাম আকা ইয়াগমা। তাঁর নিযুক্তির তারিখ পাওয়া যায় না, তবে ঘটনা পরম্পরায় মনে হয় যে, তিনি ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নিযুক্তি পেয়ে ঢাকায় আসেন।[৩] মনে হয় আবুল ফজল ওয়াকিয়ানবিশ বা ঐরূপ কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রেরিত কোন নিরপেক্ষ সংবাদ পাননি, বরং সুবাদার বা সেনানায়কদের প্রেরিত রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলার ঘটনাবলী আকবরনামায় লিপিবদ্ধ করেন। তাই আকবরনামায় দেখা যায় যে মোগল সিপাহসালার, সুবাদার বা সেনানায়কেরা বাংলার ভূঁঞা ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রায়ই জয়লাভ করেন, যদিও গভীরভাবে পরীক্ষা করলে বুঝা যায় যে, প্রায় অভিযানেই তাঁরা ব্যর্থ হন। তাই দেখা যায় যে, আকবরনামার অনুসরণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরাও মোগলদের সাফল্যের কথাই বেশি বলেছেন। যেমন হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ 'শাহবাজ খান বাংলাকে শান্ত করেন', "মানসিংহের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ", "নদীমাতৃক বাংলার গোলযোগের আগুন নির্বাপন করা হল" ইত্যাকার শিরোনামে মোগলদের সাফল্যের কথা বলা হয়েছে।[৪] কিন্তু যুদ্ধের বিবরণ এবং ফলাফল গভীরভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আবুল ফজল বা আধুনিক ঐতিহাসিকদের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে নিঃসন্দেহে বলা চলে এবং সকলেই স্বীকার করেন যে, আকবরের সময় মোগল অধিকার বা আধিপত্য বাংলায় শুধু পশ্চিমাংশেই সীমিত ছিল। দ্বিতীয়ত, আবুল ফজল বাংলায় না আসায় বাংলার ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তাই ভৌগোলিক পরিচিতি দিতে গিয়ে তিনি প্রায় সময় ভুল-ভ্রান্তি করেছেন। তিনি বাংলা এবং ভাটির দৈর্ঘ্য প্রস্থের হিসাবে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দূরত্বের পরিমাপ দিতে গিয়েও ভুল করেছেন। তৃতীয়ত, আকবরনামায় প্রথম দিকে বাংলায় মোগলদের যুদ্ধের বিবরণ মোটামুটিভাবে বিস্তারিত দেয়া হয়েছে, আকবরের বিরুদ্ধে মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ, বিদ্রোহের কারণ, ফলাফল, বাংলায় অবস্থানরত মোগল সেনানায়কদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, মতানৈক্য,

Edited by Ripon Sarkar

অবৈধভাবে ধন-সম্পদ হস্তগত করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে আকবরনামার শেষ দিকের আলোচনা, বিশেষ করে আবুল ফজলের মৃত্যুর (বা হত্যার) পরে আকবরনামার বর্ধিতাংশের আলোচনা অত্যন্ত সীমিত। উদাহরণ স্বরূপ মানসিংহের শেষ ভাটি অভিযান অত্যন্ত সংক্ষেপে এক অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে, এবং আকবরনামায় বলা হয়েছে মানসিংহ এই অভিযানে অপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। এই সকল সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আকবরনামাই একমাত্র সূত্র যেখানে বাংলায় আকবরের অভিযানসমূহ, আকবরের বিরুদ্ধে মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ এবং এই বিদ্রোহ দমন এবং আকবরের বিরুদ্ধে ভূঁঞা জমিদারদের প্রতিরোধ কাহিনী পাওয়া যায়। ঈসা খান মসনদ-ই-আলা, কেদার রায়, মাসুম খান কাবুলী, খাজা উসমান ইত্যাদি সেনানায়কদের উত্থান কাহিনী একমাত্র আকবরনামাতেই পাওয়া যায়। এই কাহিনী সংক্ষিপ্ত হলেও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং শিলালিপি, মুদ্রা এবং অন্যান্য সংক্ষিপ্ত লিখিত সূত্র এবং কিংবদন্তীর সমন্বয়ে বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের ইতিহাস পুনর্গঠন করা যায়। আকবরনামায় প্রাপ্ত কালানুক্রমও নির্ভরযোগ্য।

ইতিহাসের উৎস হিসাবে আকবরনামার পরেই আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর[৫] স্থান। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর জন্য আইন-ই-আকবরী বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়, কারণ এই বইখানি মূলত : প্রশাসনিক ম্যানুয়েল এবং বর্তমান কালের গেজেটিয়ারের মত। কিন্তু আইন-ই-আকবরীতে প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি বন্দোবস্ত, সরকার ও পরগণাসমূহের নাম ইত্যাদি পাওয়া যায়। সরকার ও পরগণার তালিকায় অধুনালুপ্ত অনেক স্থানের নাম পাওয়া যায় যার সাহায্যে সমসাময়িক কালের ভৌগোলিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরীতে প্রত্যেক সরকারের বিবরণ দেয়া হয়েছে, এবং এতে মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক তথ্যও লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা এবং ভাটির ভৌগোলিক অবস্থান, সীমা, দূরত্ব ও পরিমাপ, সীমান্তবর্তী কোচবিহার, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বিবরণ, আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের প্রথম সূত্র জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী।[৬] কিন্তু সম্রাট শের আফগানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সুবাদার কুতুব-উদ-দীন খান কোকার মৃত্যু এবং খাজা উসমানের পতন কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করেন, শাহজাহানের বিদ্রোহের কথাও সামান্য আলোচনা করেন, কিন্তু তাঁর সময়ে বাংলায় মোগলদের আরও অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। ইসলাম খান চিশতী বাংলার মোগল আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রায় তিন বৎসর অবিরত যুদ্ধ করেন, বার-ভূঁঞাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন, যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং আরও অনেক ভূঁঞা জমিদারকে পরাস্ত করেন, কামরূপ ও কাছাড় জয় করেন, ইবরাহীম খান ফতেহজংগ ত্রিপুরা জয় করেন, এই সকল বিষয়ে তুজুকে কোন আলোচনা নাই। বার-ভূঁঞা বা ভূঁঞা প্রধান মুসা খান মসনদ-ই-আলার নাম তুজুকে পাওয়া যায় না। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বাকলার রাজা রামচন্দ্র, ভূষণার রাজা শত্রুজিত, ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য, ফতহাবাদের মজলিস কুতুব, সিলেটের বায়েজীদ কররানী, বীরভূমের বীর হাম্বির, পাচেটের শামস খান এবং হিজলীর সলীম খান (বা পরে বাহাদুর খান) ইত্যাদি কারও নাম তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে পাওয়া যায়

Eidited by Ripon Sarkar

না। কিন্তু তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে অনেক তারিখ, বিশেষ করে সুবাদার বা অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিযুক্তি, প্রত্যাহার বা পদচ্যুতির তারিখ পাওয়া যায় যার ভিত্তিতে বিভিন্ন ঘটনা বা যুদ্ধ বিগ্রহের তারিখ নির্ধারণ করা যায়।

মুতামদ খানের ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরীও[৭] একটি সমসাময়িক ইতিহাস। লেখক জাহাঙ্গীরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী তাঁর জানা ছিল। যদিও এটা একটি সমসাময়িক বই এতে নতুন সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না। বইখানি মোটামুটিভাবে তুজুকের অনুসরণেই লিখিত। রিয়াজ-উস-সলাতীনের লেখক গোলাম হোসেন সলীম এই পুস্তকের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করেন।

শাহনওয়াজ খান ও তাঁর ছেলে আবদুল হাই রচিত মাসির-উল-উমারা[৮] একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এটা মোগল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জীবনী গ্রন্থ। বাংলায় নিযুক্ত সুবাদার, দীওয়ান, বখশী এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জীবনী এই পুস্তকে পাওয়া যায়। কর্মকর্তাদের জীবনী আলোচনা করার সময় বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণও এই পুস্তকে পাওয়া যায়, যেমন খাজা উসমানের পতন কাহিনী এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং মূল্যবান পুস্তক মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী। উপরে উল্লেখিত পুস্তকগুলির তুলনায় এটা একটু ভিন্ন প্রকৃতির, উপরে উল্লেখিত পুস্তকগুলি মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, কিন্তু বাহরিস্তান-ই-গায়বী একটি আঞ্চলিক ইতিহাস, অর্থাৎ এই পুস্তকে বাংলার ইতিহাস এবং বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত অঞ্চলের ইতিহাস লিখিত হয়েছে। বইখানি এমন একজন লোক রচনা করেন যিনি তাঁর সামরিক জীবন বাংলাতেই কাটান। তিনি অন্য লোকের রিপোর্টের বা সংবাদের ভিত্তিতে বই লিখেননি, বরং তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কাজে লাগান। এই পুস্তকে লিখিত ঘটনাবলী লেখকের জীবন কাহিনীর সঙ্গে জড়িত ছিল।

লেখক মিরযা নাথনের পিতার নাম মালিক আলী, তাঁর উপাধি ছিল ইহতিমাম খান। মালিক আলী আকবরের সময়ে প্রথম চাকরি লাভ করেন, তাঁর মনসব ছিল ২৫০। কিছুদিন তিনি দিল্লীর কোতওয়াল পদে নিযুক্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সিংহাসন লাভের পরে ইহতিমাম খানকে বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুর বিরুদ্ধে পাঠানো হয়, পরে বাংলায় একজন সুদক্ষ মীর বহর বা এ্যাডমিরাল পাঠাবার প্রয়োজন হলে তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়। ইসলাম খানকে যখন সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইহতিমাম খানকে মীর বহর নিযুক্ত করা হয়। তিনি তাঁর ছেলে মিরযা নাথনকে নিয়ে বাংলায় আসেন।

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে জাহাঙ্গীরের আমলের বাংলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, এতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান চিশতীর সুবাদার নিযুক্তি থেকে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি তারিখে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের রাজমহল ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে যাত্রা পর্যন্ত ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। মিরযা নাথন তাঁর পিতার নবনিযুক্ত এ্যাডমিরাল ইহতিমাম খানের সঙ্গে বাংলায় আসেন ও তিনি প্রথমে তাঁর পিতার নৌবহরে কাজ করেন, কিন্তু পরে তিনি উপাধি ও মনসবসহ ইম্পেরিয়াল অফিসার নিযুক্ত হন। তাঁর নাম ছিল আলা-উদ-দীন ইসফাহানী, মিরযা নাথন ছিল তাঁর জনপ্রিয় নাম। লেখক

Edited by Ripon Sarkar

হিসাবে তিনি ছদ্মনাম নেন গায়বী। সেইজন্য তাঁর পুস্তকের নাম বাহরিস্তান-ই-গায়বী। জাহাঙ্গীরের আমলে তিনি শিতাব খান উপাধি লাভ করেন, কিন্তু তিনি মিরযা নাথন নামেই সুপরিচিত ছিলেন। মিরযা নাথন সম্রাটের প্রাসাদেই লালিত পালিত হন, তিনি নিজেকে খানা-জাদ বা house born রূপে পরিচিতি দেন।[৯] মনে হয়, তিনি শাহজাহানের সমবয়সী ছিলেন। তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং জাহাঙ্গীরকে সর্বদা প্রভু এবং কিবলা (master and qibla) রূপে উল্লেখ করতেন। কিন্তু যুবরাজ শাহজাহান বিদ্রোহী হয়ে ঢাকা এলে মিরযা নাথন যুবরাজের দলে যোগ দেন। যুবরাজ তাঁকে রাজমহলের সুবাদার নিযুক্ত করেন। যুবরাজ যখন সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে টনসের যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন নাথন অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে বাংলা থেকে অর্থ, যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং রসদ সরবরাহ করতেন। যুবরাজ রাজমহল ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি মিরযা নাথনকেও সঙ্গে যেতে বলেন। মিরযা নাথন প্রথমে রাজি হন কিন্তু তাঁর পরিবার সঙ্গে না থাকায় স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অনুরাগবশত তাদের ফেলে দাক্ষিণাত্যে গেলেন না। এই কথা লেখার পরে বাহারিস্তান-ই-গায়বী শেষ হয়ে যায়। সুতরাং মিরযা নাথন পরে কি করেন, কোথায় থাকেন তার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। অতঃপর জাহাঙ্গীর বা শাহজাহানের সময়ে বা মোগল ইতিহাসে মিরযা নাথনের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এই বই লেখার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মিরযা নাথন বলেন :[১০]

As it occured to the mind of this most insignificant one that if a small portion of the events of Bengal which took place during the prosperous reign of the greatest Sultan and the greatest Khaqan of the world, Nurud-Din Muhammad Jahangir Badshah Ghazi (may God, the great, grant perpetuity to his kingdom and sovereignty), be put into writing, (then) the imprint of that auspicious writing will remain on the pages of time; and far-sighted men of high intellect will achieve great eloquence form these true happenings and the wonders of these pages of subtle points. Therefore, with the grace of divine favours, it has been written with the hope that if it comes before the scrutinizing eyes of the scholars of the august Court and the orators of sublime hall of audience, it will get a favourable reception and that they will adorn it with the pen of correction, and incorporate its contents into the history of Jahangir.

কিন্তু মিরযা নাথনের আশা পূর্ণ হয়নি, বইখানি যে কোন কারণে জাহাঙ্গীরের ঐতিহাসিকদের দৃষ্টির আড়ালে থেকে যায় এবং সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে ফার্সি ভাষায় লিখিত কোন ইতিহাসে এটা ব্যবহৃত হয়নি।

বইখানি অনেকদিন যাবত ঐতিহাসিকদের দৃষ্টির আড়ালে ছিল। সৌভাগ্যক্রমে স্যার যদুনাথ সরকার বইখানির একটি পাণ্ডুলিপি প্যারিসের বিবলিওথেকা ন্যাশনেল থেকে আবিষ্কার করেন। স্যার যদুনাথ প্রথমে "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ এবং জার্নাল অব দি বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ লিখে এই অত্যন্ত মূল্যবান পাণ্ডুলিপির প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

Edited by Ripon Sarkar

করেন।[১১] এই পাণ্ডুলিপির একটি রটগ্রাফ কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের জন্য সংগৃহীত হয় এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুঈদুল ইসলাম বোরাহ দুই খণ্ডে এটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ ১৯৩৬ সালে আসাম গবর্নমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

বাহরিস্তান-ই-গায়বী চারটি দফতর বা খণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেক দফতরে জাহাঙ্গীরের আমলের এক একজন সুবাদারের কার্যাবলী বিধৃত। প্রথম দফতর সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর শাসনকাল নিয়ে লিখিত, এই দফতরের নাম দেয়া হয়েছে ইসলামনামা। দ্বিতীয় দফতর সুবাদার কাসিম খানের শাসন সম্পর্কে লিখিত, কিন্তু এই দফতরের কোন নাম দেয়া হয়নি। আমাদের এই পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে কাসিম খানের শাসনকাল আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখা যাবে যে কাসিম খানের সঙ্গে মিরযা নাথনের সম্পর্ক খুব সুখকর ছিল না তাই বোধ হয় এই দফতরটি কাসিম খানের নামে নামকরণ করা হয়নি। তৃতীয় দফতর ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমল নিয়ে লিখিত এবং এই দফতরের নাম দেয়া হয় ইবরাহীমনামা। চতুর্থ দফতরে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের বাংলায় আগমন থেকে বাংলা ত্যাগ করা পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এই দফতরের নাম দেয়া হয়েছে ওয়াকিয়াত-ই-জাহানশাহী।

বাহরিস্তান-ই-গায়বী রচনার তারিখ পাওয়া যায় না, শুধু তৃতীয় দফতর রচনা, তারিখ আছে। তবে বইয়ের ভিতরে কিছু তথ্য আছে এবং পাণ্ডুলিপির বাইরের অতিরিক্ত কাগজে (fly-leaf) পাণ্ডুলিপি হস্তান্তরের কিছু তথ্য আছে যার সাহায্যে বই রচনার তারিখ সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এই তথ্যগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) উপক্রমণিকায় বই রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লেখক সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রশস্তি করেছেন এবং সম্রাটের দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। লেখক আশা প্রকাশ করেন যে, তাঁর এই পুস্তকে বিধৃত ঘটনাবলী জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে স্থান পাবে।[১২]

(খ) ইসলামনামা বা প্রথম দফতরের শেষে লেখকের শিতাব খান উপাধির উল্লেখ আছে।[১৩]

(গ) ইবরাহীমনামা বা তৃতীয় দফতরের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে, "(১০৪১) হিজরীর ৭ই জিলকদ তারিখে, অর্থাৎ সাহিব-ই-কিরানীর বা শাহজাহানের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষে (১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে) (অর্থাৎ বইয়ের ভাষা) অন্তর থেকে জিহ্বায় এবং জিহ্বা থেকে কলমে আসে (অর্থাৎ লিখিত হয়)।[১৪]

(ঘ) পাণ্ডুলিপির বাইরের অতিরিক্ত কাগজে দেখা যায় যে, বইখানি মিরযা নাথন নবাব আসালত খানকে উপহার দেন এবং নবাব আসালত খান তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই আকা মুহাম্মদ বাকিরকে ১০৫১ হিজরীর ১লা রবিউল আউয়াল তারিখে (১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন) উপহার দেন।[১৫]

প্রথম দফতরের উপক্রমণিকায় জাহাঙ্গীরের দীর্ঘায়ু কামনা করায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই বই লেখা শুরু হয়। এই দফতরের শেষে মিরযা নাথনের শিতাব খান উপাধি থাকায় আরও বলা যায় যে, এই দফতর শিতাব খান উপাধি পাওয়ার পরেই লেখা শেষ হয়। মিরযা নাথন ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষার্ধে শিতাব খান উপাধি লাভ করেন; সুতরাং প্রথম দফতর ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর আগে এবং ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের পরে যে কোন সময় লিখিত হয় বলে ধরে নেয়া যায়। তৃতীয় দফতর অর্থাৎ ইবরাহীমনামা লেখার তারিখ ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে, অর্থাৎ শাহজাহানের রাজত্বকালে। বইখানি নবাব আসালত খান ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে আকা মুহাম্মদ বাকিরকে উপহার দেন। মিরযা নাথন আসালত খানকে বইখানি উপহার দেয়ার তারিখ পাওয়া যায় না, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জুনের আগে তিনি এটা আসালত খানকে উপহার দেন। আগেই বলা হয়েছে, মিরযা নাথন জাহাঙ্গীরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু যুবরাজ শাহজাহান বিদ্রোহ করে বাংলায় এলে তিনি যুবরাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। শাহজাহান বাংলা ছেড়ে চলে গেলে মিরযা নাথনকে সম্রাট বা যুবরাজ কোন পক্ষেই দেখা যায় না। মনে হয়, মিরযা নাথন অবসর গ্রহণ করেন এবং এই অবসরের সময় নিশ্চিতভাবে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়। তাই ধরে নেয়া যায় যে, বাহরিস্তান-ই-গায়বীর প্রথম দফতর ১৬২৫ থেকে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে শেষ হয়। দ্বিতীয় দফতর লেখার তারিখ নেই, কোন ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। তবে এটা নিশ্চিতভাবে তৃতীয় দফতরের আগেই লেখা হয়। তৃতীয় দফতর লেখা হয় ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে মে তারিখে, এই তারিখ রচনা শুরুর তারিখ। কারণ ভূমিকাতেই এই তারিখ পাওয়া যায়। চতুর্থ দফতর ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দের দুই এক বৎসরের মধ্যে রচিত হয়। মিরযা নাথন পুস্তক রচনা শেষ করে এটা নবাব আসালত খানকে উপহার দেন (তারিখ পাওয়া যায় না) এবং নবাব আসালত খান ১৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে বইখানি আকা মুহাম্মদ বাকিরকে উপহার দেন।

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে তারিখের বিশেষ স্বল্পতা রয়েছে, সমগ্র পুস্তকে মাত্র চারটি পূর্ণ তারিখ (পূর্ণ তারিখ বলতে দিন, মাস এবং সন বুঝায়) পাওয়া যায়। প্রথম তারিখটি সম্রাট ইহতিমাম খানকে বাংলায় এ্যাডমিরাল পদে নিযুক্ত করে তাঁকে বাংলায় যাওয়ার অনুমতি দেয়ার তারিখ, দ্বিতীয় তারিখটি সম্রাট কর্তৃক ইহতিমাম খানের নৌবহর পরিদর্শনের তারিখ, তৃতীয় তারিখ ইসলাম খান চিশতী ভাটি যাওয়ার পথে মোগল নৌবহর ইছামতী নদীতে প্রবেশের তারিখ এবং চতুর্থ তারিখটি যুবরাজ পারভেজ ও সেনাপতি মহাবত খানের সঙ্গে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের টন্‌স এর যুদ্ধের তারিখ।[১৬] চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখেছি যে, মিরযা নাথনের নিজের বর্ণনা মতেই প্রথম তিনটি তারিখ ভুল, আবদুল লতীফের ডায়রী এবং তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে প্রাপ্ত তারিখ মিরযা নাথনের তারিখকে ভুল প্রমাণিত করে। টন্‌স-এর যুদ্ধের তারিখ অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না, মিরযা নাথনের বর্ণনা মতেও এই তারিখটি নির্ভুল বলে মনে হয়। যদিও বাহরিস্তানে অন্য কোন পূর্ণ তারিখ পাওয়া যায় না, এই পুস্তকে এমন অনেক ইঙ্গিত রয়েছে যাতে বাহরিস্তানের বিবরণের সাহায্যে অনেক বিশিষ্ট ঘটনার তারিখ নির্ধারণ করা সহজ। এই ইঙ্গিতগুলি হচ্ছে বর্ষাকাল, রমজান মাস, দুই

Edited by Ripon Sarkar

ঈদের উৎসব, মহররমের চাঁদ দেখা, দশই মহররম, শব-ই-বরাত ইত্যাদি। তাছাড়া বাহরিস্তানে পূর্ণ তারিখ না থাকলেও মাঝে মধ্যে মাসের নাম বা শুধু তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সমসাময়িক অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত তারিখের সঙ্গে এই ইঙ্গিতগুলি মিলিয়ে নিলে প্রকৃত তারিখ বের করা সম্ভব। উপরে বলা হয়েছে যে মিরযা নাথন ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারির পরে তাঁর বই লেখা শুরু করেন এবং তখন তিনি চাকরিতে ছিলেন না, অর্থাৎ তিনি বর্ণিত ঘটনার পরে এই বই রচনা করায় সন তারিখ বেশি দিতে পারেননি। প্রথমদিকে যে তিনটি পূর্ণ তারিখ দেন তাও ভুল প্রমাণিত হয়। তবে বর্ষাকাল, রমজান মাস, ঈদের দিন, মহররম মাস (মনে রাখতে হবে যে, তিনি শিয়া ছিলেন, তাই মহররম মাস তাঁর নিকট অধিকতর পবিত্র) ইত্যাদি মনে রাখতে তাঁর পক্ষে কোন অসুবিধা হয়নি।

তৃতীয় দফতরের শুরুতে মিরযা নাথন বলেছেন যে এটা অন্তর থেকে জিহ্বায় এবং জিহ্বা থেকে কলমে আসে। তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন যে তিনি বইখানি স্মরণ থেকে লিখেছেন? বইখানিতে পূর্ণ তারিখের অভাব এই বক্তব্য সমর্থন করে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিরযা নাথন বাংলায় এবং বাংলার সীমান্তবর্তী রাজ্যে মোগলদের যুদ্ধের এত বিস্তারিত বিবরণ দেন যে ভাবতে অবাক লাগে। কামরূপ, আসাম এবং ত্রিপুরার যুদ্ধের বিবরণ আঞ্চলিক ইতিহাস যেমন কামরূপের বুরঞ্জী, আসাম বুরঞ্জী এবং রাজমালাতেও পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ইতিহাসের বিবরণ মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীর বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়, এমনকি আসামের সেনানায়কদের নাম এবং পদবীর সঙ্গেও মিলে যায় : পার্থক্য এই যে আঞ্চলিক ইতিহাসে বিবরণ সংক্ষিপ্ত, অথচ বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বিবরণ দীর্ঘ। তাছাড়া মিরযা নাথনের বিবরণে ধারাবাহিকতা আছে, এবং আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য আছে। আমার পরীক্ষা নিরীক্ষায় বাহরিস্তানে আমি কোন অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিনি। তাই মনে হয় মিরযা নাথন শুধু স্মরণ থেকে বই লিখেননি। তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিবরণ খসড়াভাবে লিখিত ছিল, এবং এই খসড়া তিনি যুদ্ধের সময় বা যুদ্ধের পরে অবসর সময়ে লিখে রাখতেন। মিরযা নাথন ১৬০৮ থেকে ১৬২৫ পর্যন্ত, অর্থাৎ যে সময়ের ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করেন সেই সময়ে প্রায়ই যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন, শুধু একবার তিনি সুবাদার ইবরাহীম খানের আদেশে ঢাকায় অল্প সময়ের জন্য এসে প্রায় দেড় বৎসর ঢাকায় থাকেন এবং এই সময়ে মাঝে মধ্যে তিনি তাঁর জাগীর-এ তদারকের জন্য যান। আর একবার তিনি পাণ্ডুয়ার শয়খ আলা-উল হক এবং শয়খ নূর কুতব আলমের মাযার জেয়ারত করতে যান এবং একবার বিয়ে করার জন্যে গৌড়ে যান এবং কদম রসূল জেয়ারত করেন।[১৭] এই সময় ছাড়া তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেই কাটান। তিনি বার-ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে, খাজা উসমানের বিরুদ্ধে এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন, বাকি প্রায় সময় তিনি কামরূপের যুদ্ধে এবং কামরূপে বিদ্রোহ দমনে কাটান। মোগল অফিসারেরা যুদ্ধের পরে অবসর সময় কিভাবে কাটান তার কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না, বাহরিস্তানে দু'এক জায়গায় শুধু সামান্য আলোক পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে যে, অবসর সময়ে মোগল অফিসারেরা খাওয়া-দাওয়া, অতিথি আপ্যায়ন এবং সহকর্মীদের বাসস্থানে আসা-যাওয়া করে সময় কাটাতেন।[১৮] এক স্থানে বলা হয়েছে যে, হাফিজরা (যাঁরা কুরআন মুখস্থ করে) অবসর সময়ে কুরআন পাঠ করে সবাইকে শোনাত, আবার কোন কোন সময় গায়ক এবং বাদকরা গান করে এবং বাদ্য বাজিয়ে সকলের চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করত। মাঝে মাঝে কবিরা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করত।[১৯] প্রত্যেক যুদ্ধের পরে শিবিরে অবস্থানরত কবিরা বিজয়

কাহিনী রচনা করত, এই বিজয় কাহিনীকে জঙ্গনামা বলা হত এবং তাঁরা অবসর সময়ে এই স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে সকলকে শুনাত। মিরযা নাথন প্রায় প্রত্যেকটি জঙ্গনামা বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে উদ্ধৃত করেছেন। মৌলানা মীর কাসিম নামক একজন কবি খাজা উসমানের বিরুদ্ধে দৌলম্বপুর যুদ্ধের গাথা বা জঙ্গনামা রচনা করেন. চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই জঙ্গনামাও মিরযা নাথন তাঁর বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন।[২০] মিরযা নাথন একজন পড়ুয়া লোক ছিলেন এবং ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে ভাল জ্ঞান রাখতেন। বাহরিস্তানে তিনি মাঝে মাঝে ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। তিনি জুনায়েদ বাগদাদী এবং মনসুর হাল্লাজের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং মনসুর হাল্লাজকে "আনাল হক্ব" (আমিই সত্য বা আমিই প্রভু) দাবি করার জন্য যে অত্যাচার ও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তাও উল্লেখ করেন।[২১] তিনি মাঝে মাঝে শয়খ সাদী এবং উরফী প্রমুখ বিখ্যাত ফার্সি কবিদের কবিতারও উদ্ধৃতি দেন।[২২] যুদ্ধের পরামর্শ সভায় নিজের মতামত দেয়ার সময় তিনি বিখ্যাত সেনাপতিদের, যেমন মিরযা আবদুর রহিম খান খানানের যুদ্ধনীতির উদাহরণ দিতেন। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনায় মিরযা নাথনের পরামর্শ বেশ ফলপ্রসূ হতে দেখা যায়।

উপরে আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে মিরযা নাথন একজন বিদ্বান লোক ছিলেন এবং ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর ভাল জ্ঞান ছিল। আরও বুঝা যায় যে, তিনি অবসর সময়ে কিছু লেখাপড়া করতেন। সম্ভবত তিনি এই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, বিশেষ বিশেষ যুদ্ধ, সুবাদারদের কার্যাবলী, মোগল সেনানায়কদের মধ্যে সম্প্রীতি, সদ্ভাব, বা দলাদলি, অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু লিখে রাখতেন যা বাহরিস্তান-ই-গায়বী লেখার সময় তিনি কাজে লাগান। তিনি যে বলেছেন, "ইহা অন্তর থেকে জিহ্বায় এবং জিহ্বা থেকে কলমে আসে," এ দ্বারা বুঝা যায় যে, মিরযা নাথন একজন মুনশী বা কেরানীর দ্বারা বইখানি লেখান, তিনি যা বলেন, মুনশী তাই লিখেন। বাহরিস্তানে আমরা দেখি যে, মিরযা নাথন মাঝে মাঝে সম্রাটের পাঠানো ফরমান সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেন। সুবাদার ইসলাম খান চিশতী বারোকার মত সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সম্রাট একখানি ফরমান জারি করে ইসলাম খানকে সতর্ক করেন। সতের দফার এই ফরমানখানি মিরযা নাথন সম্পূর্ণ বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে উদ্ধৃত করে দেন। ফরমানখানি তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতেও পাওয়া যায়। উভয় পুস্তকে দফাগুলির মধ্যে মিল রয়েছে। পার্থক্য এই যে, তুজুকে বলা হয়েছে ফরমানখানি সীমান্তবর্তী প্রদেশের সুবাদারদের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়, কিন্তু মিরযা নাথন বলেছেন যে, ফরমানখানি ইসলাম খানের উদ্দেশ্যে জারি করা হয়। এটা অবশ্য মিরযা নাথনের ভুল নয়, কারণ ফরমানখানি সীমান্তবর্তী সকল প্রদেশের সুবাদারের নিকট প্রেরিত হলেও মিরযা নাথনের এটা জানার কথা নয়। ইসলাম খানের নিকট এটা প্রেরিত হয়েছে জেনে মিরযা নাথন ইসলাম খানের কথা উল্লেখ করেছেন। যদি মিরযা নাথন ফরমান, বা জঙ্গনামা লিখে না রাখতেন, তাহলে তিনি বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে এইগুলি নির্ভুলভাবে উদ্ধৃত করতে পারতেন না। তাছাড়া বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে প্রত্যেক যুদ্ধের পরিকল্পনা, প্রত্যেক যুদ্ধে নিযুক্ত সেনাপতি সেনানায়কদের নাম, অশ্বারোহী বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, বন্দুকধারী, রণতরী এবং হাতির সংখ্যা ইত্যাদি দেয়া আছে, কোন কোন যুদ্ধে সৈন্যদের ব্যূহ রচনা, যেমন অগ্রবর্তী দল, অগ্রবর্তী রিজার্ভ, ডান, বাম এবং কেন্দ্রীয় বাহুর পরিকল্পনা, সৈন্য এবং হাতির সংখ্যা, সেনাপতি সেনানায়কদের নাম ও

Edited by Ripon Sarkar

বিভিন্ন বাহিনীর সংখ্যাও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এইরূপ বিস্তারিত বিবরণ, নাম-ধাম, সংখ্যা কোন মানুষের পক্ষে শুধু স্মরণ থেকে দেয়া সম্ভব নয়।

যুদ্ধ বিগ্রহের বিবরণ ছাড়াও মিরযা নাথনের আরও একটি বৈশিষ্ট্য বাংলার ভৌগোলিক স্থানের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি। তিনি বলতে গেলে সারা বাংলা ঘুরেছেন। ত্রিপুরার যুদ্ধ বা আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি অংশ না নিলেও তিনি ইবরাহীম খানের আদেশে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে এবং দক্ষিণে ফেনী নদীর তীর পর্যন্ত যান। সুতরাং তাঁর পক্ষে ভৌগোলিক পরিচিতি দেয়া যেমন সম্ভব ছিল, অন্য কারও পক্ষে তা ছিল না। সামরিক কর্মকর্তা হিসাবে তিনি প্রত্যেক স্থানের সামরিক গুরুত্ব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। সেই কারণে সমসাময়িক কালে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা জানার জন্য বাহরিস্তান-ই-গায়বী অত্যন্ত মূল্যবান। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যায়। মুসা খানের ডাকছড়া এবং যাত্রাপুর দুর্গের অবস্থিতি এবং বিবরণ, খিজিরপুর, ডেমরা খাল, কতরাব, বন্দর খাল, কদম রসূল ইত্যাদির সামরিক গুরুত্ব বাহরিস্তানে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। লক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর বিবরণ এবং ভাওয়াল, টোক ও এগার সিন্দুরের বর্ণনায় ঐ এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা বিধৃত হয়েছে। বুকাইনগর, উহর, সিলেট, তরফ, মাতঙ্গ, যশোর, বাকলা, কামরূপ, ভুলুয়া এবং ত্রিপুরায় গমনপথের বিবরণ অত্যন্ত নির্ভুলভাবে বাহরিস্তানে পাওয়া যায় এবং বাহরিস্তানের বিবরণের ভিত্তিতে প্রত্যেকটি স্থান নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করা যায়। কামরূপে মিরযা নাথন অনেকদিন যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য গ্রামে গ্রামে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেন এবং অসংখ্য স্থানের নাম তিনি বাহরিস্তানে লিপিবদ্ধ করেন। তিনি যে স্থানগুলি দেখেন এবং যেগুলির নাম উল্লেখ করেন, তার অনেকগুলি স্থানের নাম পরিবর্তন হয়েছে, বা অনেকগুলি স্থান গুরুত্ব হারিয়েছে, বা অনেক নদীতীরবর্তী স্থান নদীতে বিলীন হয়েছে। মিরযা নাথন এত স্থানের নাম দেন যে, তাঁর কাছে যদি খসড়াভাবে কিছু লেখা না থাকত, তিনি শুধু স্মরণ থেকে এতগুলি স্থানের নাম দিতে পারতেন না। বাহরিস্তান পাঠে দেখা যায় যে, গত চারশ বৎসরে অনেক স্থান পদ্মা, করতোয়া, ইছামতী, ধলেশ্বরী, লক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর ভাঙনে বিলীন হয়েছে। কিন্তু বাহরিস্তান-ই-গায়বী এবং আইন-ই-আকবরীর সাহায্যে মধ্যযুগের বাংলার মানচিত্র পুনরায় অংকন করা যায়।

মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে সাধারণত অভিযোগ করা হয় যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে অনেক বেশি বলেছেন, অনেক বিজয়ের জন্য নিজে কৃতিত্বের দাবি করেন।[২৩] স্মরণ রাখতে হবে যে, মিরযা নাথন বাংলায় সকল যুদ্ধে অংশ নেননি, যে সকল যুদ্ধে অংশ নেন তাতে জয় পরাজয় হয়েছে। মিরযা নাথন তাঁর পরাজয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেন। এটা সত্য যে, কোন কোন স্থানে মিরযা নাথন দাবি করেছেন যে সিনিয়র ইম্পেরিয়াল অফিসারেরা যখন ব্যর্থ হন, তখন তিনি সেখানে সফলতা লাভ করেন। দুই একটি উদাহরণ দেয়া যায়। মুসা খানের ডাকছড়া দুর্গ জয় করা সম্ভব না হলে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ প্রস্তাব করেন যে, একটি বদ্ধ খালের মুখ থেকে বালির স্তূপ সরিয়ে খালে পানি চলাচল করতে পারলে মোগল নৌবহর খালের পথে অগ্রসর হয়ে সহজে ডাকছড়া দুর্গ জয় করতে পারবে। সিনিয়র অফিসারেরা অনেকদিন চেষ্টা করেও খালের মুখ খুলে দিতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু মিরযা নাথন সাত দিনের মধ্যে সেই কাজ করতে সমর্থ হন। এই প্রসঙ্গে মিরযা নাথন বলেনঃ "নৌবহরের বার হাজার নাবিকের মধ্যে মিরযা নাথন দুই হাজার নাবিক ইহতিমাম খানের সঙ্গে নৌকায় রেখে দেন এবং বাকি দশ হাজার নাবিকে

Edited by Ripon Sarkar

খাল কাটার কাজে নিয়োগ করা হয়। তিনি (মিরযা নাথন) নিজে চার প্রহর পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকে (খাল কাটার) কাজের তদারক করেন এবং নাবিকদের মধ্যে তামার মুদ্রা, চাল, ভাঙ এবং আফিম বিলি করে তাদের উৎসাহিত করেন এবং খালের মুখ খুলে দেয়ার কাজ ছয় প্রহরে শেষ করেন।"[২৪] ডাকছড়া দুর্গ অধিকারেও মিরযা নাথন নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন ও বাংলার জলাভূমিতে দুর্গ জয় করতে তিনি কি কৌশল অবলম্বন করেন, তার বিবরণ দেন। ডাকছড়া দুর্গের চতুর্দিকে গভীর পরিখা ছিল এবং মুসা খান পরিখায় বাঁশের তীক্ষ্ণ ফলা পুঁতে রাখেন। মিরযা নাথন শকট বা গাড়ি (wagon) তাঁর সৈন্যদের সামনে রাখেন এবং গাড়ি ঘাস ও মাটি দ্বারা পূর্ণ করেন। ফলে গাড়িগুলি শত্রু আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকের কাজ করে। তিনি পরিখা ভরাট করা এবং বাঁশের ফলা অকেজো করার জন্যও একইভাবে ঘাস ও মাটি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন:[২৫] "শকটগুলি নৌকার উপরে পুলের মত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। মিরযা নাথন আদেশ দেন যে, ঐগুলি নামিয়ে আনা হয়। ফলে শকটগুলি নিচে আনা হয় যেখানে সৈন্যরা চালের আড়ালে অবস্থান নিয়েছিল। অর্ধেক নাবিককে শকটের পিছনে মাটি এবং বাকি অর্ধেক নাবিককে ঘাস ফেলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় যাতে শকটগুলি দেয়ালের মত হয়।" তিনি আরও বলেন:[২৬] "যুদ্ধের সময় সাহায্যের জন্য নাবিকদের নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং তারা প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে। মিরযা নাথন এখন এই নাবিকদের দুইভাগে ভাগ করার জন্য নৌ-সেনানায়কদের নির্দেশ দেন। এক ভাগকে মাটি এবং অন্যভাগকে ঘাস নিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়। এখন তাদের আদেশ দেয়া হয় তারা যেন মাটি এবং ঘাস দ্বারা পরিখা ভরাট করে যাতে বাঁশের ফলা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।" মিরযা নাথন কর্তৃক এইরূপ ব্যবস্থা নেয়ার আরও প্রমাণ আছে, এবং এই ব্যবস্থাসমূহ তাঁর দূরদর্শিতার প্রমাণ। মোগল নৌবহর আত্রাই নদী থেকে করতোয়া নদীতে আনার সময় কুদিয়া খাল অতিক্রম করতে হয়। কিন্তু দেখা যায়, কুদিয়া খালে পানির প্রবাহ কমে যাওয়ায় নৌবহর অতিক্রম করা অসম্ভব হয়ে উঠে। তখন মিরযা নাথন অনেক কষ্টে প্রথমে ডিঙ্গি নৌকা করে, পরে ঘোড়ায় চড়ে এবং আরও পরে পায়ে হেঁটে করতোয়ায় আসেন। করতোয়ার নিকটে তিনি দুটি জলা এবং একটি দহ আবিষ্কার করে খাল কেটে ঐ জলা এবং দহ থেকে কুদিয়া খালে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করেন এবং মোগল নৌবহর করতোয়ায় নিয়ে আসেন। এটাও মিরযা নাথনের অসম সাহস এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অনেক যুদ্ধে মিরযা নাথনের সাফল্যের কথা বাহরিস্তানে পাওয়া যায়। যুদ্ধের বিবরণে বুঝা যায় যে, তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক, সাহসী, বুদ্ধিমান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুবক। যুদ্ধবিদ্যায় ছিলেন তিনি অত্যন্ত পটু, যুদ্ধ আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষায় তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল, তাঁর কৌশলের কাছে শত্রুরা হার মানত। উপরে যে দুই একটি উদাহরণ দেয়া হয়েছে, তাতেও তাঁর কৌশল-জ্ঞান, সাহস এবং দূরদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক সফলতা লাভ করবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এস. কে. ভূঁঞা বলেন:[২৭] "লেখক মিরযা নাথন যাঁকে আসামী ইতিহাসে মিরযা নাথোলা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, আসামের ইতিহাসে অত্যন্ত উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন, শুধু মীর জুমলার নিচেই তাঁর স্থান। অহোমদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ আসামের লোকদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং এই প্রভাব সতের শতকের শেষ পর্যন্ত মোগল-আসাম যুদ্ধের সময় বলবৎ থাকে।" মিরযা নাথন শুধু তাঁর সাফল্যের কথা বলেননি, তাঁর ব্যর্থতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে দৌলম্বপুরের যুদ্ধে তিনি অগ্রবর্তী

Eidited by Ripon Sarkar

বাহুর নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অগ্রবর্তী বাহু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং ফলে শত্রুরা এই বাহু ঘিরে ফেলে। মোগল সৈন্যরা হয় পলায়ন করে, না হয় অন্য বাহুর সঙ্গে মিলিত হয়ে যায়। মিরযা নাথন নিজেও পরাজিত হন এবং তিনি কিভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান তিনি নিজেই তার বিশদ বিবরণ দেন। তিনি আহত হয়ে মাঠে পড়ে থাকেন। সেখান থেকে তাঁর বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে আনেন।[২৯] জাহাঙ্গীরের আমলে মোগলরা বাংলায় যত যুদ্ধ করে, তার মধ্যে দৌলম্বপুরের যুদ্ধ সর্বাপেক্ষা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এবং ভয়াবহ। মিরযা নাথন যদি সকল কৃতিত্ব নিজে নিতে চাইতেন, তিনি এই যুদ্ধেও তাঁর নিজের কৃতিত্বের দাবি করতে পারতেন। বাহরিস্তানে দৌলম্বপুরের যুদ্ধের বিবরণ পাঠ করলে বুঝা যায় যে, মিরযা নাথন মোগলদের দৌলম্বপুর যুদ্ধে জয়ের কৃতিত্ব দেননি। প্রকৃত পক্ষে আফগানরাই এই যুদ্ধে জয়ী হয়। মোগলদের প্রায় সকল বাহুই পরাস্ত হয়, অনেক সেনাপতি যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেক সেনানায়ক আহত হয়। কিন্তু খাজা উসমান মৃত্যুবরণ করায় আফগানদের বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। মিরযা নাথন একদেশদর্শী ঐতিহাসিক হলে এই যুদ্ধে মোগলদের জয়ের কথাও বলতে পারতেন। কামরূপের একটি যুদ্ধেও মিরযা নাথন তাঁর পরাজয়ের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নিজের দুর্গ পরিত্যাগ করে নিরাপদ দূরবর্তী স্থানে আশ্রয় নেন।[৩০] মিরযা নাথন তাঁর কিছু ব্যক্তিগত দোষের কথাও বর্ণনা করেন। মিনা নামক ইসলাম খানের একজন ভৃত্যের প্রতি মিরযা নাথনের দুর্বলতা ছিল। অনেক দীর্ঘ বর্ণনায় তিনি এই ভৃত্যের প্রতি তাঁর ভালবাসার কথা বলেছেন। কামরূপ যুদ্ধে যাওয়ার সময় তিনি অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পরেও রাত্রিতে চুপি চুপি ঢোকে আসতেন এবং তাঁর ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে আবার রাত্রেই ফিরে গিয়ে সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হতেন।[৩১] শুধু অর্থ লাভের মানসে যশোরে রায়তদের উপর তাঁর অত্যাচারের কথাও তিনি নির্দ্বিধায় ব্যক্ত করেছেন।[৩২] সুতরাং এটা মনে করার কারণ নেই যে মিরযা নাথন ইচ্ছা করে সত্য গোপন করেছেন এবং তাঁর যা প্রাপ্য নয় সেরূপ কৃতিত্বের দাবি করেছেন।

মিরযা নাথন যে সময়ের ইতিহাস লিখেন, সে সময়ের জন্য তাঁর বাহরিস্তান-ই-গায়বীই একমাত্র সমসাময়িক বাংলার ইতিহাস। ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক বাংলায় মোগল অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা; কামরূপ ও ত্রিপুরা বিজয়; কাছাড়, আসাম ও চট্টগ্রামে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ে এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ, সমসাময়িক বাংলা ও সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক অবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় ইত্যাদিতে বাহরিস্তানে যেরূপ তথ্য পাওয়া যায় তা অন্য কোন পুস্তকে পাওয়া যায় না। বাহরিস্তান আবিষ্কৃত না হলে মুসা খান মসনদ-ই-আলা ও ভাটির বার-ভুঁঞা, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য, বাকলার রামচন্দ্র, ভূষণার শত্রুজিত, পাচেটের শামস খান, হিজলীর সলীম খান ও বাহাদুর খান, ফতহাবাদের মজলিশ কুতুব এবং আরও অনেক জমিদারের নাম ও সামরিক শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যেত না। সিলেটের বায়েজীদ কররানীর নাম শুধু বাহরিস্তানেই পাওয়া যায়। খাজা উসমান ও তাঁর ভাই সোলায়মানের নাম আকবরনামায় পাওয়া যায়। কারণ আকবরের সময়ে মানসিংহ তাঁদের উড়িষ্যা থেকে বাংলায় নির্বাসন দেন। উসমানের মৃত্যু এবং তাঁর ভাই ও ছেলেদের আত্ম-সমর্পণের কাহিনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী এবং রিয়াজ-উস-সলাতীনেও পাওয়া যায়, কিন্তু বাহরিস্তানের আলোচনা অনেক বেশি বিস্তারিত ও তথ্যবহুল। উসমানের অন্যান্য ভাই এবং উসমানের

Edited by Ripon Sarkar

ছেলেদের নাম ও ভাইপোর নাম একমাত্র বাহরিস্তানেই পাওয়া যায়। উসমানের শেষ রাজধানী উহর এবং দৌলম্বপুর যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিচিতি অনেকদিন পণ্ডিতদের বিভ্রান্ত করে, চার্লস স্টুয়ার্ট একে উড়িষ্যায় সুবর্ণরেখা নদীর তীরে বলে অনুমান করেন। বাহরিস্তান আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এসব স্থানের পরিচিতি দেয়া অনেক সহজ হয়েছে। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম আগেও জানা ছিল, কিন্তু তাঁর ইতিহাস কিংবদন্তী ও কাল্পনিক কাহিনীতে ঢাকা ছিল। তিনি মানসিংহের সমসাময়িক রূপে গণ্য ছিলেন। তাঁকে দেশপ্রেমিক এবং জাতীয় বীর রূপে কল্পনা করা হত এবং মনে করা হত যে তিনি স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু বাহরিস্তান আবিষ্কৃত হওয়ার পরে প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস জানা যায়। তিনি জাহাঙ্গীর এবং ইসলাম খানের সমসাময়িক ছিলেন, ইসলাম খান তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। বাংলার ভূঁঞা জমিদারদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যই সর্বপ্রথম স্বেচ্ছায় মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মোগলরা তাঁর প্রতি সম্মানজনক ব্যবহার করেন, কিন্তু পরে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় মোগলরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁকে রাজ্যচ্যুত করেন। মোগলদের কামরূপ বিজয় এবং কাছাড়ে যুদ্ধ সম্পর্কে আঞ্চলিক ইতিহাসে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় একমাত্র বাহরিস্তানেই। ত্রিপুরা বিজয়ের কাহিনীও রাজমালায় পাওয়া যায়, কিন্তু এই কাহিনী অনেক পরে লিখিত হয়। তাছাড়া রাজমালায় কালানুক্রম ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় রাজমালার বিবরণ অসম্পূর্ণ ছিল। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে ত্রিপুরা বিজয়ের কাহিনী সমসাময়িক এবং এই পুস্তকের আলোচনাও বিস্তারিত। মোগল এলাকায়, বিশেষ করে ভুলুয়ায় কয়েকবার আরাকানের মগ আক্রমণের কাহিনীও বাহরিস্তানেই বিশদভাবে পাওয়া যায়। ইতিহাসের সূত্র হিসাবে বাহরিস্তান-ই-গায়বীর গুরুত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে এটাই বলা যায় যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিশেষ করে ১৬০৮ থেকে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস এত বিস্তারিত জানা যায় যে, প্রাক-ব্রিটিশ যুগের বাংলার ইতিহাসের অন্য কোন সময়ের ইতিহাস এত বিস্তারিত জানা যায় না। এই অত্যন্ত মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থটি বিদগ্ধ পণ্ডিত মরহুম ডঃ মুঈদুল ইসলাম বোরাহ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুবাদের জন্য আমরা সকলেই তাঁর নিকট ঋণী। আমি বিশেষভাবে তাঁর নিকট ঋণী। কারণ আমি নিঃসঙ্কোচে তাঁর অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি।

আবদুল লতীফের ডায়রী বা ভ্রমণ বৃত্তান্তেও অনেক মূল্যবান তথ্য রয়েছে। এই ডায়রীর পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার সর্বপ্রথম ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আবদুল লতীফ ছিলেন বাংলার দীওয়ান আবুল হাসানের বিশ্বস্ত কর্মচারী। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান চিশতী যখন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন, প্রায় একই সঙ্গে আবুল হাসান শিহাবখানী বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁকে মুতাকিদ খান উপাধি দেয়া হয় এবং ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে প্রত্যাহৃত হওয়া পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। আহমদাবাদের আবদুল্লাহ আব্বাসীর ছেলে আবদুল লতীফ তাঁর মনিব আবুল হাসান মুতাকিদ খানের সঙ্গে বাংলায় আসেন।

আবদুল লতীফ তাঁর ভ্রমণ কাহিনী ডায়রীর আকারে লিখেন। এই ভ্রমণ কাহিনী আহমদাবাদ থেকে আগ্রা এবং সেখান থেকে বাংলায় পর্যন্ত। ডায়রীতে বাংলার অংশ রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত যাওয়ার কাহিনী। সুবাদার ইসলাম খান, দীওয়ান

Edited by Ripon Sarkar

মুতাকিদ খান এবং অন্যান্য ইম্পেরিয়াল কর্মকর্তারা ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল থেকে নদীপথে ঘোড়াঘাট যান এবং আবদুল লতীফও তাঁদের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর মনিব আব্দুল হাসান মুতাকিদ খানের সঙ্গে ছিলেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে মিরযা নাথন একজন আবদুল লতীফের উল্লেখ করেছেন, তিনি মিরযা নাথনের বন্ধু ছিলেন এবং দীওয়ানী দফতরে হিসাবরক্ষক ছিলেন;[৩৩] সম্ভবত ডায়রীর লেখক এবং এই আবদুল লতীফ একই ব্যক্তি ছিলেন।

স্যার যদুনাথ আব্দুল লতীফের ডায়রীর একখানি পাণ্ডুলিপি তাঁর বন্ধু দিল্লীর প্রফেসর আবদুর রহমানের নিকট পান। স্যার যদুনাথ এই পাণ্ডুলিপির রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত ভ্রমণ কাহিনী ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় অনুবাদ করেন। ইংরেজি অনুবাদে তিনি কিছু সংক্ষিপ্ত করেন এবং উভয় অনুবাদে তিনি যে অংশ অপ্রয়োজনীয় মনে করেন সে অংশ বাদ দেন।[৩৪]

স্যার যদুনাথ ডায়রীর লেখক আবদুল লতীফের পরিচিতি দিয়ে বলেনঃ[৩৫]

"সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমে, শেখ আলাউদ্দীন চিশতী, ওরফে ইসলাম খাঁ (আকবরের পীর শেখ সলীম চিশতীর পৌত্র), বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। আবদুল লতীফ আবদুল্লা আব্বাসীর পুত্র ও আহমদাবাদের অধিবাসী। তাঁহার প্রভু আবুল হসন (পরে আসফ খাঁ উপাধিতে ভূষিত, এবং শাজাহানের শ্বশুর ও সাম্রাজ্যের উজীর), ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গেরদেওয়ান নিযুক্ত হইয়া, আগ্রা হইতে বংগদেশে আসেন। লতীফ তাঁর অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন।"

স্পষ্টত, স্যার যদুনাথ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় নিযুক্ত দীওয়ান এবং আবদুল লতীফের মনিব আব্দুল হাসানকে ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র, নূরজাহানের ভাই শাজাহানের শ্বশুর এবং মমতাজ মহলের পিতা, আবুল হাসানের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু এই পরিচিতি ভুল। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে আবুল হাসান নামধারী তিনজন লোকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু জাহাঙ্গীর তাঁদের পৃথক পৃথক পরিচিতি দেন। একজন আবুল হাসানকে তিনি সর্বদা খাজা আবুল হাসান, দ্বিতীয় জনকে ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র আবুল হাসান এবং তৃতীয় জনকে আবুল হাসান শিহাবখানী রূপে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় আবুল হাসান, অর্থাৎ ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র এবং নূরজাহানের ভাই যখন ইতিকাদ খান ও পরে আসফ খান উপাধি পান, তখন তাঁকে যথাক্রমে সেই উপাধিতেই অভিহিত করা হয়।

প্রথম আবুল হাসান অর্থাৎ খাজা আবুল হাসান প্রথমে জাহাঙ্গীরের ভাই যুবরাজ দানিয়ালের দীওয়ান ছিলেন। দানিয়ালের মৃত্যুর পরে তাঁকে প্রথমে কেন্দ্রের দীওয়ান নিযুক্ত করা হয় এবং পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠানো হলে তিনি বুরহানপুর থেকে এসে সম্রাটকে পঞ্চাশটি মোহর, পনেরটি মণিমুক্তা খচিত পাত্র এবং একটি হাতি নযরানা দেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইবরাহীম খানের[৩৬] সঙ্গে যুগ্মভাবে কেন্দ্রের বখশী নিযুক্ত হন। আরও পরে তিনি বখশী-উল-মুলক বা প্রধান বখশী নিযুক্ত হন।[৩৭] তুজুকে তাঁকে সর্বদা খাজা আবুল হাসান বলা হয়েছে এবং তিনি বাংলায় আসার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

Edited by Ripon Sarkar

দ্বিতীয় আবুল হাসান ছিলেন ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র, নূরজাহানের ভাই, শাহজাহানের শ্বশুর এবং মমতাজ মহলের পিতা। তিনি পরে সাম্রাজ্যের উজীর নিযুক্ত হন এবং ইয়ামীন-উদ-দৌলা উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইতিকাদ খান উপাধি পান। ঐ একই বৎসরে সম্রাট তাঁকে সর-আন্দাজ নামক একখানি তরবারি উপহার দেন। ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট যমুনা নদীর তীরে তাঁর বাসগৃহে গিয়ে তাঁকে ধন্য করেন। ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মনসব ৩০০০/১০০০ এ উন্নীত করা হয় এবং তাঁকে আসফ খান উপাধি দেয়া হয়।[৩৮] ইতোমধ্যে জাহাঙ্গীর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে মেহের-উন-নিসাকে (নূরজাহান) বিয়ে করেন এবং পরের বৎসর, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান আবুল হাসান ইতিকাদ খান আসফ খানের মেয়ে আরজমন্দ বানু বেগমকে (মমতাজ মহল) বিয়ে করেন। এই আবুল হাসানও বাংলায় আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।।

দ্বিতীয় আবুল হাসান ছিলেন মিরযা গিয়াস বেগের (ইতমাদ-উদ-দৌলা) ছেলে, সুতরাং তিনি ছিলেন মিরযা, তিনি খাজা ছিলেন না। তাঁর উপাধি ছিল ইতিকাদ খান, অথচ বাংলার দীওয়ানের উপাধি ছিল মুতাকিদ খান। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বাংলার দীওয়ানকে সর্বদা মুতাকিদ খান রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক মিরযা নাথন এবং দীওয়ান মুতাকিদ খান এক সঙ্গে বাংলায় চার বৎসর চাকরি করেন এবং অবস্থান করেন। দীওয়ান রূপে মুতাকিদ খান অফিসারদের মধ্যে জাগীর বিতরণ করতেন এবং মুতাকিদ খান যুদ্ধেও অংশ নেন। সুতরাং দীওয়ানের সংস্পর্শে আসার সুযোগ মিরযা নাথনের ছিল। তাই মিরযা নাথনের পক্ষে তাঁর সহকর্মী দীওয়ানের নাম বা উপাধি ভুল করার কথা নয়। উজীর খানের স্থলে বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত করার সময় জাহাঙ্গীর নতুন দীওয়ানের নাম লিখেন আবুল হাসান শিহাবখানী[৩৯] কিন্তু ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে প্রত্যাহার করার সময় তাঁর নাম লিখেন মুতাকিদ খান।[৪০] এই লোক পরে লস্কর খান উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কেন্দ্রের বখশী নিযুক্ত হন এবং আরও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।[৪১] উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইতমাদ-উদ-দৌলার ছেলে আবুল হাসান (ইতিকাদ খান, আসফ খান) বাংলার দীওয়ান ছিলেন না; আবুল হাসান শিহাবখানী মুতাকিদ খানই বাংলার দীওয়ান ছিলেন। বাংলার দীওয়ান আবুল হাসান ছিলেন শিহাবখানী বা শিহাব-উদ-দীন নামক কোন ব্যক্তির ছেলে বা অনুচর, যাঁর পরিচয় জানা যায়নি। বাংলার দীওয়ান নিযুক্ত হওয়ার সময় তিনি মুতাকিদ খান উপাধি লাভ করেন। স্যার যদুনাথ এই আবুল হাসান মুতাকিদ খানকে ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র বা নূরজাহানের ভাইরূপে পরিচিতি দিয়ে ভুল করেছেন।

আবদুল লতীফের ডায়রী অতি সংক্ষিপ্ত; ঘোড়াঘাটের উদ্দেশ্যে ইসলাম খান চিশতীর রাজমহল ত্যাগ করার কথা বলে এর শুরু এবং ভাটির উদ্দেশ্যে ইসলাম খানের ঘোড়াঘাট ত্যাগ করার কথা বলে এটি শেষ হয়। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত ডায়রীটি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ আবদুল লতীফ ডায়রীতে অনেক তারিখ দিয়েছেন। ইসলাম খানের রাজমহল ত্যাগের তারিখ, বিভিন্ন স্থানে যাত্রা বিরতির তারিখ এবং ঘোড়াঘাট ত্যাগের তারিখ এই ডায়রীতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকের কালক্রম নির্ণয়ে এই তারিখগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। তারিখ ছাড়াও বাংলার যে সকল ভূঁঞা-জমিদার রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট যাওয়ার পথে

Edited by Ripon Sarkar

সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং উপহার প্রদান করেন, তাঁদের নাম-ধাম এই ডায়রীতে পাওয়া যায়। ডায়রীতে কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যায়। কোন কোন তথ্য অন্যান্য সূত্রের সঙ্গে মিলে না। ডায়রীতে যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায় এবং রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত নৌ-পথের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাও মূল্যবান। কারণ ডায়রী লিখিত হওয়ার পরে গত কয়েকশ বৎসরে নৌ-পথের বেশ পরিবর্তন হয়েছে এবং কোন কোন স্থান আধুনিক মানচিত্রে পাওয়া যায় না।[৪২]

ইসলাম খান ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ভাটির উদ্দেশ্যে ঘোড়াঘাট ত্যাগ করেন বলে আবদুল লতীফের ডায়রী অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ হয়। উপরে বলা হয়েছে যে, আবদুল লতীফ দীওয়ান মুতাকিদ খানের অধীনে দীওয়ানী বিভাগে কর্মরত ছিলেন। মুতাকিদ খান ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাংলায় ছিলেন, এর পরে তিনি প্রত্যাহৃত হন। সুতরাং আবদুল লতীফও অন্তত পক্ষে ঐ সময় পর্যন্ত বাংলায় থাকার কথা। কিন্তু আবদুল লতীফ কেন ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর ডায়রী লিখেননি তার কোন সদুত্তর দেয়া যায় না। সম্ভবত তিনি ডায়রী ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লিখেছিলেন, কিন্তু তা হারিয়ে গেছে এবং পণ্ডিতদের হাতে আসেনি। এবং সম্ভবত ডায়রীর হারানো অংশটি কোনদিন আবিষ্কৃত হতে পারে। যদি সেই সৌভাগ্য কোনদিন আসে, অর্থাৎ ডায়রীর হারানো অংশটি যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় তাহলে বাহরিস্তান-ই-গায়বী ছাড়া ইসলাম খানের বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপনের আরেকটি স্বাধীন ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ আমরা পেতে পারি।

কামরূপ ও আসামের আঞ্চলিক ইতিহাসকে বুরঞ্জী বলা হয়। এইরূপ বেশ কয়েকখানি বুরঞ্জী পাওয়া যায়। এইগুলি ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ বুরঞ্জীতে মোগল অভিযানের মুকাবিলায় স্থানীয় রাজারা কি ব্যবস্থা নেন তার বিবরণ পাওয়া যায়। বুরঞ্জীগুলির প্রথম দিকে কিংবদন্তীতে পূর্ণ, কিন্তু পরের দিকে, বিশেষ করে মোগল আক্রমণের সময়ে বুরঞ্জীর তারিখ এবং ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ নির্ভরযোগ্য। জাহাঙ্গীরের সময়ে বাংলার ইতিহাস কামরূপ, কাছাড় এবং আসামের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কারণ মোগলরা এই সময়ে এই রাজ্যগুলির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। মোগলরা কামরূপ জয় করে, পরে কোচরা বিদ্রোহ করলে বিদ্রোহও দমন করা হয়। কাছাড়ও জয় করা হয় এবং কাছাড়ের রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। আসামের রাজার সঙ্গেও যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়। সুতরাং বুরঞ্জীতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ মোগল ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়। বুরঞ্জীগুলি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যগুলি মূল্যবান।[৪৩]

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস রাজমালা শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়।[৪৪] এর তৃতীয় খণ্ডে বার-ভূঁঞার নেতা ঈসা খান মসনদ-ই-আলার ক্ষমতা লাভের প্রথম দিকের ইতিহাস এবং ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এতে বলা হয় যে, ঈসা খান প্রথম জীবনে সরাইলের জমিদার ছিলেন এবং তিনি ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের নিকট থেকে মসনদ-ই-আলা উপাধি লাভ করেন। ঈসা খান এবং বার-ভূঁঞার অন্যান্য জমিদারেরা ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যকে শ্রমিক সরবরাহ করে অমরসাগর দীঘি খনন করতে সাহায্য করেন এবং তরফের জমিদার ফতেহ খানের সঙ্গে যুদ্ধে ঈসা খান অমর মাণিক্যকে

Edited by Ripon Sarkar

সাহায্য করেন।[৪৫] সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ কর্তৃক ত্রিপুরা বিজয়ের কাহিনীও সবিস্তারে বর্ণিত আছে। [১] কিন্তু রাজমালা পরবর্তীকালে রচিত হওয়ায় এর তারিখগুলি প্রায়ই ভুল প্রমাণিত হয়। সুতরাং রাজমালার সাক্ষ্য ব্যবহারের আগে কালক্রম শুদ্ধ করে নিতে হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ে আরাকানের রাজা কয়েকবার বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্ত ভুলুয়া আক্রমণ করেন, এমনকি কোন কোন সময় ঢাকার উপকণ্ঠেও আক্রমণ চালান। সুবাদার কাসিম খান এবং সুবাদার ইবরাহীম খানও আরাকান (চট্টগ্রাম) আক্রমণ করেন। আরাকানী ইতিহাসে এই সম্পর্কে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এই তথ্যগুলি ফেয়ার এবং হার্ভে উভয়েই তাঁদের নিজ নিজ "হিস্ট্রি অব বার্মায়" ব্যবহার করেছেন।

বিদেশী পরিব্রাজক এবং পর্তুগীজ মিশনারীদের বিবরণও ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটনে সাহায্য করে। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় আসেন এবং শ্রীপুর, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও ইত্যাদি অঞ্চল ভ্রমন করেন। তাঁর দেয়া তথ্যগুলি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য, তিনি ভাটি এলাকার অত্যন্ত প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেছেন এবং তাঁর বিবরণে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, ভাটি নদী-নালা বেষ্টিত হওয়ায় বার-ভুঁঞা অনেকদিন ধরে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। রালফ ফিচের বিবরণে আরও জানা যায় যে, ঈসা খান ছিলেন বার-ভুঁঞার নেতা। সুতরাং রালফ্ ফিচ্ আবুল ফজলের আবকরনামা এবং আইন-ই-আকবরীর বক্তব্য সমর্থন করেন। পর্তুগীজ মিশনারীদের বক্তব্যেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়। মিশনারীদের দেয়া তথ্যগুলি হেনরী বেভেরীজ তাঁর 'বাকরগঞ্জ' গ্রন্থে এবং জে. ওয়েস্টল্যাণ্ড তাঁর "যশোর" গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন। পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের আলোচনায়ও মোগল-আরাকান সংঘর্ষের তথ্য পাওয়া যায়। এই সময় পর্তুগীজরা বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরে দস্যুবৃত্তি চালাতে থাকে। তারা কোন কোন সময় আরাকানের রাজার পক্ষে আবার কোন কোন সময় বিপক্ষে থাকত। সুতরাং পর্তুগীজ বা আরাকানী মগদের এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে বাংলায় লুঠতরাজের সংবাদও পাওয়া যায়। পর্তুগীজ তথ্যগুলি বেভারেজ এইচ হস্টেন এবং জে. জে. এ. কেম্পস সদ্ব্যবহার করেছেন।[৪৭]

বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত কিংবদন্তী, গীতিকা ইত্যাদিও ঐতিহাসিক তথ্য বহন করে; কিংবদন্তী এবং গীতিকাগুলিকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা যায় না। কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করে জেমস ওয়াইজ প্রথম বার-ভুঁঞা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। ওয়াইজ সংগৃহীত তথ্য, এস.সি.মিত্র সংগৃহীত যশোরের প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কিংবদন্তী এবং পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা "দেওয়ান ইছা খানের পালা" ইত্যাদিতে মূল্যবান তথ্য রয়েছে, তবে অকাট্য তথ্যের দ্বারা সমর্থিত না হলে এইগুলির সাক্ষ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না। বিংশ শতকের বাংলার বিভিন্ন জেলার ইতিহাস লিখিত হয়েছে। ব্রিটিশ, পাকিস্তানী এবং বাংলাদেশ আমলে ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয়েছে। এইগুলিতেও প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যেমন প্রাচীন ইমারত এবং ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, ঐতিহাসিক স্থানসমূহ, প্রাচীন রাস্তা এবং নৌ-পথ, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র, রাজস্ব নীতি ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ খাজা উসমানের রাজধানী উহর এবং উসমানের বিরুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধ ক্ষেত্র দৌলম্বপুরের পরিচিতি দেওয়া সম্ভব হয়েছে স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে। বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এই স্থানসমূহের পরিচয় দিয়ে প্রতিভা নামক বাংলা মাসিক

Edited by Ripon Sarkar

পত্রিকায় তাঁর তথ্যানুসন্ধানের বিবরণ প্রকাশ করেন। বুকাইনগরের দুর্গ এবং এগার সিন্দুরের দুর্গ সম্পর্কেও স্থানীয় অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়। একটি পরিবারের ভূমি রেকর্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে ডঃ হাবিবা খাতুন ঈসা খানের রাজধানী কতরাবোর পরিচিতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে সমর্থ হন। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোর খুলনায় স্থানীয়ভাবে অনুসন্ধান করে অনেক তথ্য হস্তগত করেন এবং মহেন্দ্র করণ স্থানীয়ভাবে হিজলীর ইতিহাসের অনেক তথ্য উদঘাটন করেন।

শিলালিপি এবং মুদ্রা যে ইতিহাসের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান এতে কোন দ্বিমত নেই। সুলতানী আমলে বাংলায় সমসাময়িক ইতিহাসের অভাবে শিলালিপি এবং মুদ্রার সাহায্যেই ইতিহাসের কালক্রম নির্ধারিত হয়। মোগল আমলের কালক্রম নির্ণয় করা খুব দুঃসাধ্য নয়, কারণ দিল্লীতে লিখিত মোগল সাম্রাজ্যের ইতিহাসেই অনেক সন তারিখ পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলা, ত্রিপুরা ও কামরূপের কিছু মুদ্রা এবং বাংলায় প্রাপ্ত দুইখানি শিলালিপি ইতিহাস পুনর্গঠনে এবং কালক্রম নির্মাণে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। শের শাহের ছেলে ইসলাম-শাহ সুরের সময়ে বারবক শাহ নামধারী একজন সুলতানের মুদ্রা প্রাপ্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খানের বিদ্রোহের কাহিনী এবং বারবক শাহের মুদ্রা এক সঙ্গে পাঠ করলে হোসেন শাহী বংশের পতনের পর বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায় উদঘাটিত হয়। রাজমালায় প্রাপ্ত তারিখগুলি প্রায়ই ভুল প্রমাণিত হওয়ায় ত্রিপুরার রাজাদের মুদ্রা কালক্রম নির্মাণে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। অনুরূপভাবে কামরূপের রাজাদের কালক্রমও মুদ্রার সাহায্যেই নির্মাণ করা যায়। মোগলরা যেহেতু এই রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেহেতু তাদের নির্ভুল কালক্রম বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। মাসুম খান কাবুলীর চাটমোহর শিলালিপি এবং ঈসা খানের কামানের লিপি এই দুজন বীর পুরুষের ইতিহাস পুনর্গঠনে সাহায্য করে। এই লিপিগুলি তাঁদের নিজ নিজ জীবনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তির সাক্ষ্য বহন করে। মাসুম খানের লিপিতে তাঁকে সুলতান উপাধি দেয়া হয় এবং ঈসা খানের কামানে তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেয়া হয়।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত প্রধান সূত্রগুলি উপরে আলোচিত হল। দাউদ কররানীর পতনের পর থেকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর ইতিহাস এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। যে সকল ভূঁঞা জমিদার দাউদের পতনের পর বাংলার বিভিন্ন স্থানে ক্ষমতা বিস্তার করে এবং আকবরের আগ্রাসনের প্রতিরোধ করে, আমি প্রথমে তাদের চিহ্নিত করেছি। প্রধানতঃ ভাটি এলাকা আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং আমি এই ভাটির বার-ভূঁঞাদেরও পরিচিতি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই মনে করেন যে বার-ভূঁঞা সারা বাংলায় অধিকার বিস্তার করেছিল এবং বার-ভূঁঞা দ্বারা অনেক এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভূঁঞাকে বুঝাত। কিন্তু আমার অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের ধারণা ভুল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং মিরযা নাথন বার-ভূঁঞা দ্বারা বার জন ভূঁঞাকে বুঝান এবং বার-ভূঁঞা মানে ভাটির বার-ভূঁঞা, সারা বাংলায় নয়। হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ দাউদ কররানীর পতনের পরেই বাংলায় মোগল আমল শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা সত্য হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মোগল আমল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেই শুরু হয়। আকবরের রাজত্বকালে মোগল অধিকার বাংলার একটি ক্ষুদ্র এলাকায় সীমিত ছিল। মোগল সেনানায়কদের উদ্যোগে একটি বিদ্রোহী সরকার প্রায় দুই বৎসর স্থায়ী থাকে এবং এই

Edited by Ripon Sarkar

সময়ে আকবরের শাসন বাংলা থেকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা হয়। আমরা ইসলাম খান চিশতীর সময়ে বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তারের এবং কামরূপ বিজয়ের কাহিনী পূর্ববর্তী লেখকদের তুলনায় অনেক বেশি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মুসা খান এবং বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে দুই পর্যায়ের যুদ্ধ, বুকাইনগর এবং উহর বিজয় এবং খাজা উসমানের মৃত্যু ও আফগানদের আত্মসমর্পণ, সিলেটের বায়েজীদ কররানীর পতন ও আত্মসমর্পণ, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য, বাকলার রাজা রামচন্দ্র, ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের আত্মসমর্পণের কাহিনী বাহরিস্তান-ই-গায়বীর অনুসরণে অনেক বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-তে এই যুদ্ধগুলি অতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। ঐ পুস্তক পাঠে মনে হয়, ইসলাম খান চিশতী অনায়াসে বাংলার সর্বত্র মোগল আধিপত্য বিস্তার করেন বা কামরূপ জয় করেন, কিন্তু এত সোজাভাবে এই কাজগুলি সমাধা হয়নি। যুদ্ধের শুরু থেকে বিজয় লাভ করা পর্যন্ত ইসলাম খান চিশতীর অনেক পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি নিতে হয়। বাহরিস্তানে এর বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। মোগল সেনাপতি এবং সেনানায়কদের মধ্যে প্রায়ই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মতবিরোধ হত, সুবাদারকে এইগুলির সমাধান করতে হত। মোগলদের সাফল্যের পেছনে ছিল ইসলাম খানের কূটবুদ্ধি, যুদ্ধ পরিকল্পনার নিপুণতা এবং দূরদর্শিতা। হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ ইসলাম খানের কূটনীতি ও দূরদর্শিতার প্রশংসা করা হয়েছে, কিন্তু এই পুস্তক পাঠে মোগলদের সাফল্যে ইসলাম খানের অবদানের গুরুত্ব পরিমাপ করা যায় না। আমরা ঢাকায় মোগল রাজধানী স্থাপনের তারিখ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মোগলদের যুদ্ধের কালক্রম নির্মাণ করেছি। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে দৌলম্বপুরের যুদ্ধের তারিখ আমরা নতুনভাবে নির্ধারণ করেছি, তুজুকে প্রাপ্ত এই যুদ্ধের তারিখ ভুল প্রমাণিত হয় এবং তুজুকের অনুসরণে হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ এই ভুল তারিখ গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা ইসলাম খানের চরিত্র এবং কৃতিত্ব নতুনভাবে আলোচনা করেছি। ইসলাম খান সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতা ঝারোকা, চৌকি এবং কুর-এর অপব্যবহার করেন। এই কারণে ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদারী থেকে অপসারণ করে সুজাত খানকে নিয়োগের আদেশ দেয়া হয়। বাহরিস্তানে এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা থাকলেও হিস্টরি অব বেঙ্গল ভল্যুম ২-এ এর কোন উল্লেখ নেই। তুজুকের অনুসরণে হিস্টরি অব বেঙ্গলে ইসলাম খানের মৃত্যুর তারিখও ভুল দেয়া হয়েছে। আমি বাহরিস্তান ও তুজুকের আনুষঙ্গিক বিবরণের অনুসরণে এই তারিখ সংশোধন করেছি। আমরা কাসিম খানের সুবাদারী আমলও পৃথকভাবে আলোচনা করেছি। তাঁর সুবাদারী আমল ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যথার্থই বলেন যে; কাসিম খানের শাসন অযোগ্যতা এবং ভুল পদক্ষেপের স্বাক্ষর। কাসিম খান তাঁর অধস্তন অফিসারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতেন, এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে তাঁর অভিযানসমূহ, যেমন আরাকান (চট্টগ্রাম) ও আসাম অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ এই সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা আছে, আমি এটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে ত্রিপুরা বিজয় এবং তাঁর ব্যর্থ আরাকান (চট্টগ্রাম) অভিযানও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। তাঁর সময়ে কামরূপের বিদ্রোহ দমনও আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়টি হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ স্থান পায়নি।

Edited by Ripon Sarkar

ইবরাহীম খানের চরিত্র চিত্রণে হিস্টরি অব বেঙ্গল-এ তাঁকে অতি বেশি প্রশংসা করা হয়েছে। তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা চিহ্নিত করে আমরা চরিত্র চিত্রণ করেছি, তাঁর প্রাপ্য কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁকে দেয়া হয়েছে। বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের বাংলা অধিকার, বাংলায় তাঁর শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন, সম্রাটের বাহিনী কর্তৃক তাঁর পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁর পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে বিশেষ করে শাহজাহানের ঢাকা আসার পথ এবং বিভিন্ন ঘটনার তারিখে হিস্টরি অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২-এ যা অসঙ্গতি ধরা পড়েছে তা শুদ্ধ করা হয়েছে।

ঈসা খান বা মুসা খানের উপাধির শুদ্ধ পাঠ কি মসনদ-ই-আলী হবে না মসনদ-ই-আলা হবে এই বিষয়ে বিভ্রান্তি আছে। তাজ খানের শিলালিপিতে পরিষ্কারভাবে মসনদ-ই-আলী খোদিত হয়েছে,[৪৮] ঈসা খানের কামানের উপাধিটি মসনদ-ই-আলী।[৪৯] এতে মনে হয়, তাঁরা নিজে মসনদ-ই-আলী উপাধি ব্যবহার করতেন। কিন্তু মির্যা নাথন বাহরিস্তান-ই-গায়বীর সর্বত্র মসনদ-ই-আলা ব্যবহার করেছেন। তাই বাহরিস্তানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য আমরা এই পুস্তকে সর্বত্র মসনদ-ই-আলা ব্যবহার করেছি। এই পুস্তকের ইংরেজি সংস্করণও প্রকাশ করা হচ্ছে, কিন্তু একটি অন্যটির অনুবাদ নয়, যদিও প্রতিপাদ্য বিষয় একই।

১। এইচ. বি. ২য়, ভূমিকা, IX-X.
২। আকবরনামা, ৩য়, বেভেরীজের ইংরেজি অনুবাদ, দিল্লী ১৯৭৩।
৩। বাহরিস্তান, ১ম, ২০৯, ২২১।
৪। এইচ. বি. ২য়, ২০৫, ২১৩, ২১৫।
৫। আইন, ২য়, এইচ. এস. জেরেটের অনুবাদ এবং স্যার যদুনাথ কর্তৃক সংশোধিত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৭৮।
৬। বেভেরীজ এবং রোজার্স কর্তৃক অনূদিত এবং দুই খণ্ডে প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮।
৭। কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কর্তৃক প্রকাশিত।
৮। বেণী প্রসাদ ও হেনরী বেভেরীজ কর্তৃক অনূদিত।
৯। বাহরিস্তান, ২য়, ৭১০।
১০। -ঐ-, ১ম, ১-২।
১১। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭ বাংলা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা, ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা। জার্নাল অব দি বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ভল্যুম, ৭, ১৯২১।
১২। বাহরিস্তান, ১ম, ১।
১৩। -ঐ-, ২৫৮।
১৪। -ঐ-, ভূমিকা, ২৪।
১৫। -ঐ-, ভূমিকা, ২১।
১৬। -ঐ-, ৫, ৬, ৬৪, ঐ, ২য়, ৭৫৮-৫৯।
১৭। -ঐ-, ১ম, ১৪৫-৪৬।
১৮। -ঐ-, ২৪২।
১৯। -ঐ-, ১৩৮।
২০। -ঐ-, ২০৬।

Edited by Ripon Sarkar

২১। -ঐ-, ৩১৩-১৪। মনসুর হাল্লাজ ইরানের একজন বিখ্যাত সুফী ছিলেন, খলীফা আল-মুকতাদির-এর সময়ে (৯০৮-৯৩২ খ্রিঃ) তিনি জীবিত ছিলেন। "আনল-হক" বা আমিই সত্য এই দাবি করার জন্য তাঁর উপর অত্যাচার করা হয় এবং ৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। জুনায়েদ বাগদাদী মনসুর হাল্লাজের শিক্ষক ছিলেন, তিনিও একজন উঁচু দরের সুফী ছিলেন।

২২। যেমন ঐ, ৩১৪।

২৩। জার্নাল অব ইন্ডিয়ান হিস্টরি, ১৯, ১৯৩২, ৩৩৪-৩৬।

২৪। বাহরিস্তান, ১ম, ৬২। মির্জা নাথন এখানে ছয় প্রহরের মধ্যে খাল কাটার কথা বলেন কিন্তু পরে (পৃঃ ৬৪) বলেছেন যে সাত দিনে ঐ কাজ সমাধা হয়।

২৫। -ঐ-, ৬৬।

২৬। -ঐ-, ৬৮।

২৭। -ঐ-, ৪৫-৪৮।

২৮। -ঐ-, ভূমিকা, ৮।

২৯। -ঐ-, ১৮৩-৮৫।

৩০। -ঐ-, ২য়, ৫৯৭-৬০৫।

৩১। -ঐ-, ১ম, ২৮৮।

৩২। -ঐ-, ১৪২।

৩৩। -ঐ-, ১৬৬, ২১০।

৩৪। বেঙ্গল পাষ্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট, ৩৫, নং ৬৯-৭০, ১৯২৮, ১৪৩-৪৬, প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, বাংলা, ৫৫২-৫৩।

৩৫। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬ বাংলা, ৫৫২।

৩৬। ইনি নূরজাহানের ভাই এবং পরে ফতেহজঙ্গ উপাধি পান ও বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

৩৭। তুজুক, ১ম, ২০২, ২৫২-৫৩, ২৬০, ২য়, ৫, ৮২, ১২৭, ১৬৩।

৩৮। -ঐ-, ১ম, ২০২-০৩, ২৪৯, ২৬০।

৩৯। -ঐ-, ১৩৯।

৪০। -ঐ-, ২৩০।

৪১। -ঐ-, ২৩১, ২৬৫, ৪০৬। একজন আবুল হাসান বাগদাদী জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে লস্কর খান উপাধি পান (মাসির-উল-উমারা, ১ম, ৮৩১-৩৪), কিন্তু তিনি বাংলায় নিযুক্ত হয়েছিলেন কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৪২। ডায়রীর পুনর্মূল্যায়নের জন্য দেখুন, আ. করিমঃ "A Fresh Study of Abdul Latif's Diary: North Bengal in 1609 A. D."
জার্নাল অব দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ভল্যুম ১৩, ১৯৯০, ২৩-৪৬।

৪৩। প্রধান বুরঞ্জীগুলি নিম্নরূপঃ (ক) আসাম বুরঞ্জী (এটি ১২২৮ খ্রিঃ থেকে ১৮২৬ খ্রিঃ পর্যন্ত আসামের ইতিহাস) (খ) কামরূপের বুরঞ্জী (এতে মোগল কামরূপ যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে)। এই বুরঞ্জীগুলি এস. কে. ভূঞা তাঁর আর্লি হিস্ট্রি অব কামরূপ এবং ই. এ. গেইট তার হিস্ট্রি অব আসাম-এ ব্যবহার করেছেন।

Edited by Ripon Sarkar

৪৪। তৃতীয় খণ্ড ১৩৪১ ত্রিপুরা অব্দে প্রকাশিত হয়।

৪৫। রাজমালা, ৩য়, ১৪-১৮।

৪৬। —ঐ—, ৫৯-৬৫।

৪৭। জে. এ. এস. বি. ভল্যুম ৯, নবেম্বর ১৯১৩; কেমপস্‌ঃ হিষ্টরি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, কলকাতা ১৯১৯।

৪৮। এস. আহমদ. ইনসক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, ৫০ নং চিত্র।

৪৯। বেঙ্গল পাস্ট : এ্যাণ্ড প্রেজেন্ট, ৩৮, চিত্র, ৭ নং।

Edited by Ripon Sarkar

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলায় ভূঁঞাদের আমলঃ ভাটির বার ভূঁঞা

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি খান জাহানের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হন। দাউদ কররানীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ফলে বাংলার আফগান শাসনেরও অবসান হয়।[১] কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মোগল শাসন সারা বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হতে দীর্ঘদিন সময় লাগে। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় মোগল ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। পরবর্তী মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ইসলাম খান চিশতী নামক একজন নতুন সুবাদার নতুন পরিকল্পনায় এবং নতুন উদ্যমে সারা বাংলা মোগল অধিকারে আনতে সমর্থ হন সুতরাং ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই ৩৬ বৎসর সময়কে বাংলার ইতিহাসে মোগল আমল বলা চলে না। এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সেনানায়ক, ভূঁঞা বা জমিদারের কর্তৃত্ব ছিল। তারা কোন কোন সময় এককভাবে, বা কোন কোন সময় যুগ্মভাবে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করে স্বাধীনভাবে বা আধা-স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করে। যেহেতু দেশে কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ছিল না, সেহেতু এই আমলকে ভূঁঞাদের আমল বলা যেতে পারে। ভূঁঞাদের মধ্যে বার-ভূঁঞা অত্যধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে, বার-ভূঁঞারা আকবরের সময়ে এবং জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথমদিকে প্রাণপণ যুদ্ধ করে, শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও দীর্ঘদিন তারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় লিপ্ত ছিল। বার-ভূঁঞাদের সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, কেউ বলেন বার-ভূঁঞা দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভূঁঞাকে বুঝায়, কেউ কেউ বলেন, বাংলায় যে সকল ভূঁঞা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা সকলেই বার-ভূঁঞার অন্তর্ভুক্ত। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা পরে করা হবে, আমরা দেখব যে বার-ভূঁঞা বাংলার একটি বিশেষ অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করে মোগলদের বাধা দান করে। সুতরাং এই আমলকে আমরা "বার-ভূঁঞার আমল" না বলে "ভূঁঞাদের আমল" রূপে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত মনে করি। যেহেতু বার-ভূঁঞা সম্পর্কে আলোচনাও এই অধ্যায়ে রয়েছে, সেহেতু শিরোনামে "ভাটির বার-ভূঁঞা"ও যুক্ত হয়েছে।

স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হিস্টরি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ডে[২] বাংলার ভূঁঞাদের প্রতি, এমনকি, বার-ভূঁঞাদের প্রতিও কোন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এই পুস্তকে আলোচিত অধ্যায়গুলি মোগল সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রেক্ষাপটে লিখিত হওয়ায় ভূঁঞাদের কাহিনী এবং বিশেষ করে বার-ভূঁঞাদের সাহসিকতাপূর্ণ কীর্তিকলাপ এবং মোগল শক্তির প্রতিরোধের কাহিনী যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি। যদিও মোগল অভিযানের সাফল্য এবং ব্যর্থতার কাহিনী লিখতে গিয়ে ভূঁঞাদের সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে, এতে ভূঁঞাদের প্রতিরোধের ইতিহাস গুরুত্ব লাভ করেনি। এই গ্রন্থের সম্পাদক স্যার যদুনাথ সরকার বার-ভূঁঞাদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচয় দেন এবং তাদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। তিনি বলেন,[৩]

Edited by Ripon Sarkar

> A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders. They were nothing of the sort. Firstly, they were nearly all of them upstarts, who had in their own persons or one generation earlier grabbed at some portion of the dissolving Karrani kingdom of Bengal and set up as masterless Rajas in their different corners of the country, especially in the inaccessible regions of the seacoast in Khulna and Baqarganj or beyond the mighty barrier of the Brahmaputra in Dacca and the still remoter jungles of north Mymensingh and Sylhet..
>
> We must not confound the Bara Bhuiyas with the Rajahs of Tipperah, Kamrup and Kuch Bihar, who were representative of long established tribal chieftains. Pratapaditya and Kedar Rai, Isa Khan and Anwar Ghazi were not tribal heads nor scions of any old and decayed royal house. They were at best bloated zamindars, who would have been glad to save their estates by paying annual revenues if the Karrani dynasty had not been subverted and a strong Sultan like Sulaiman had filled the throne of Bengal. The eclipse of the royal authority at the centre of the Government of Bangal was the opportunity of these usurpers of neighbours' territories; they had their brief day in the twilight between the setting Afghan kingship and the rising Mughal emprie in Bengal; and when the Mughal power came out, under Islam Khan, in full splendour, they vanished into the obscurity from which they had risen.

স্যার যদুনাথের উপরোক্ত বক্তব্য নৈরাশ্যজনক, তাঁর মত যশস্বী ঐতিহাসিকের বিরূপ মন্তব্য নতুন গবেষকদের বিভ্রান্ত করবে। তিনি বার-ভূঁঞারা দেশপ্রেমিক ছিল কিনা বা স্বাধীনচেতা ছিল কিনা প্রশ্ন তুলেছেন। দেশপ্রেম না থাকলে বা স্বাধীনচেতা না হলে তারা এত রক্তক্ষয়, লোকক্ষয় এবং সম্পদ ক্ষয় করবে কেন? এটা সত্য যে ভূঁঞারা সকলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল না। কেউ কেউ প্রথম চোটেই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে, আবার কেউ কেউ মোগলদের পক্ষ অবলম্বন করে ভূঁঞাদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রধারণ করে। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হবে। এটাও সত্য যে, ভূঁঞাদের কেউ রাজমুকুট পরার সুযোগ পায়নি বা পুরাতন রাজবংশের লোক ছিল না। পরে দেখা যাবে যে তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী রাজবংশের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। হিজলীর সলীম খান ও তাঁর ভাইপো বাহাদুর খান মাঝে মাঝে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেও বার বার বিদ্রোহ করেন এবং বাহাদুর খান বন্দীদশায় জীবন কাটান। ঈসা খান মসনদ-ই-আলা জীবনের শেষ পর্যন্তও আত্মসমর্পণ করেননি। মসনদই-আলা উপাধিতে দেখা যায় যে, প্রথমে জীবনে তিনি যেই হোন না কেন, শেষ জীবনে মসনদ-ই-আলার মত উপাধি গ্রহণ করার শক্তি তাঁর ছিল বা তিনি অর্জন করেন। বার-ভূঁঞার দেশপ্রেম বা স্বাধীনতা-প্রেম অস্বীকার করা মানে তাদের প্রতি অবিচার করা। মোগলদের তুলনায় তারা ছিল অতি ক্ষুদ্র, ধনবল বা জনবল-এ তারা মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় ছিল অতি নগণ্য, কিন্তু তাদের ছিল অদম্য মনোবল, সাহস এবং দেশপ্রেম। এই পুঁজি নিয়েই তারা

Edited by Ripon Sarkar

কঠোর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। স্যার যদুনাথ বলেছেন যে, তাদের জমিদারীর নিরাপত্তা দেয়া হলে তারা সন্তুষ্ট থাকত। প্রকৃতপক্ষে আত্মসমর্পণের পরে মোগলরাও ভুঁঞাদের জমিদারী অক্ষুণ্ন রাখে। ভুঁঞারাও তা জানত এবং জানা সত্ত্বেও তারা যুদ্ধ করেছে। বার-ভুঁঞাদের কেউ বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেনি, শেষ পর্যন্ত প্রবল বিরোধী শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। উসমান আফগান যুদ্ধ করে প্রাণ দেন, কিন্তু মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তবুও কি বলা যায় তাদের দেশপ্রেম ছিল না বা তারা স্বাধীনচেতা ছিল না। উল্লেখ্য যে, ভুঁঞারা কয়েক যুগ ধরে (অন্তত তিন যুগ) বাংলার বিভিন্ন অংশে স্বীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখে এবং সফলতার সঙ্গে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করে। এ সময়ে বাংলায় কোন একক বা কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বহুদিন ধরে নড়বড়ে আফগান শাসন মোগলেরা ভেঙ্গে দেয়, কিন্তু মোগলদের পক্ষে আফগান শাসন যন্ত্র ভাঙ্গা যত সহজ ছিল, নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করা তত সহজ হল না। মোগলেরা আকবরের সময় প্রথম পূর্বেকার আফগান রাজধানী তাঁড়ায় (মুসলমান ঐতিহাসিকদের তাণ্ডা) এবং পরে রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করে। মাঝে মাঝে বাংলার অন্যান্য এলাকায় এমনকি নদীবহুল পূর্ব বাংলায়ও হানা দেয়, মাঝে মাঝে কিছু অংশ বিজিত হয়, পরে আবার হাতছাড়া হয়ে যায়। আকবরের আমলে মোগল বাহিনী এবং ভুঁঞাদের মধ্যে এইরূপ লুকোচুরি চলতে থাকে। কোন মতেই পূর্ব এবং দক্ষিণ বাংলার নিম্ন অঞ্চলে মোগল বাহিনী কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। সুতরাং আকবরের আমলে মোগল বিজয় অসমাপ্ত থেকে যায়।

ভুঁঞাদের আমলে বেশ কয়েকখানি আরবি এবং ফার্সী শিলালিপি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিগুলি বর্ধমান, মালদহ, পাণ্ডুয়া, পাবনা এবং বগুড়া থেকে প্রাপ্ত। এইগুলি ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে থেকে ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ, কিন্তু কোন শিলালিপিতে আকবর বা জাহাঙ্গীরের নাম উল্লেখ নেই, যদিও সুলতানী বা মোগল যুগের শিলালিপিতে সুলতান বা বাদশাহর নাম উৎকীর্ণ হওয়ার রেওয়াজ ছিল। পাবনার চাটমোহর শিলালিপিতে আকবরের এক বিদ্রোহী সেনাপতি, মাসুম খান কাবুলী নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা করেন। এই উপাধি নেন সুলতান-উল-আযম আবুল ফতহ মুহাম্মদ মাসুম।[৪] স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই শিলালিপিগুলিতে মোগল সম্রাটের নাম উল্লেখ করা হয়নি। মুদ্রাও অনুরূপ সাক্ষ্য বহন করে। বাংলার কোন টাকশালের নাম উৎকীর্ণ করে আকবরের আমলের কোন মুদ্রা পাওয়া যায়নি, কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় থেকে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের এই মুদ্রাগুলি তাঁর রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে অর্থাৎ ১৬১৬-১৭ খ্রিষ্টাব্দে উৎকীর্ণ, অর্থাৎ পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সুবাদার ইসলাম খানের সময়ে সারা বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে এই মুদ্রাগুলি চালু হয়। তবে এর সাথে আকবরের কিছু মুদ্রা আলোচনা করাও প্রয়োজন।

এই মুদ্রাগুলি আকবরের রাজত্বের ৩৯শ বৎসরের অর্থাৎ ১৫৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জারি করা হয় এবং ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকে। মুদ্রাগুলি চারকোণা বিশিষ্ট, মুদ্রার পিঠে কলেমা এবং দ্বিতীয় পিঠে ফার্সি কবিতা উৎকীর্ণ যার অনুবাদ নিম্নরূপঃ[৫]

Edited by Ripon Sarkar

"বাংগালার মুদ্রা এই কারণে সৌন্দর্য লাভ করে যে ইহা
আকবর শাহ কর্তৃক উৎকীর্ণ হওয়ার গৌরব পায়।"

উপরের "বাংগালা" শব্দটিকে কেউ কেউ টাকশালের নাম ধরে নিয়েছেন এবং মনে করেন যে "বাংগালা" দ্বারা গৌড়কে বুঝান হয়েছে। কিন্তু এই মুদ্রাগুলি জারী হওয়ার অনেক আগেই গৌড় শহর পরিত্যক্ত হয়। তাছাড়া গৌড়েই যদি এই মুদ্রাগুলি উকীর্ণ হয়ে থাকে তাহলে মুদ্রায় গৌড়ের সুলতানী আমলের নাম লখনৌতি বা হুমায়ুন প্রদত্ত নাম জন্নতাবাদ উৎকীর্ণ হত। মোগল আমলে গৌড় নাম পুনারায় চালু হয়, সুতরাং গৌড় নামও উৎকীর্ণ হতে পারত। বাংগালা এমন একটি নাম যার দ্বারা সারা বাংলাকেই বুঝায়, বাংলার কোন একটি শহরকে নয়। তাই এস. এইচ. হোদিওয়ালা বলেন যে, "বাংগালা" দ্বারা কোন একটি বিশেষ শহরকে বুঝান হয়নি, যখন যেখানে সুবাদারের সদর দফতর স্থাপিত হত, সেই স্থানকেই মুদ্রায় "বাংগালা" বলা হয়েছে।[৬] নলিনীকান্ত ভট্টশালী মুদ্রাগুলি সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেনঃ[৭]

> The appearance of these coins of Bengal proper in 1593 would suggest that from 1575 upto this date, the state of Bengal was too disturbed to allow proper minting operation to begin. By 1593 minting operations began, but no particular place in Bengal could be fixed upon as a mint-town, and the coins manufactured were designated with the general name of Bengal coins. The couplet on the 'Bangala' coins also suggests that this series was the first in Bengal to be graced in Akbar's name.

সুতরাং আকবরের সময়ে এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের প্রথম কয়েক বৎসরে বাংলায় মোগল অধিকার বিস্তারের ইতিহাস আলোচনা করে এবং সমসাময়িক শিলালিপি ও মুদ্রা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ১৫৭৬ থেকে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালকে কোন মতেই বাংলার ইতিহাসের 'মোগল আমল' বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে এই সময়কালকে 'ইনটেরেগনাম' (interregnum) বা দুই রাজত্বকালের মধ্যবর্তী অবস্থানকাল রূপে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু যেহেতু ভূঁঞারা দেশের বৃহদাংশে অধিকার বিস্তার করে, সেহেতু আমরা এই সময়কালের আলোচনাসূচক অধ্যায়কে "বাংলায় ভূঁঞাদের আমল" নাম দিয়েছি। ভূঁঞাদের মধ্যে বার-ভূঁঞারাই অত্যন্ত গৌরবময় ভূমিকা পালন করে। বার-ভূঁঞার নামে বাঙ্গালিরা আজ পর্যন্ত গৌরবান্বিত। তাই এই অধ্যায়ে বার-ভূঁঞাদের সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বার-ভূঁঞার পরিচিতি এই অধ্যায়ের বৃহৎ অংশ দখল করেছে।

বার-ভূঁঞাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের আলোচনা ঃ

প্রায় দুই শতাব্দীকাল ধরে ভূঁঞাদের বা বার-ভূঁঞার আমল ছিল ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়। বাংলার প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস রিয়াজ-উস-সলাতীনে বার-ভূঁঞার, এমনকি। ঈসা খানের নাম উল্লেখ নেই। শুধু উসমান খান আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় বার-ভূঁঞা সম্পর্কে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়। ইংরেজ আমলারা তখন প্রশ্ন

Edited by Ripon Sarkar

তোলেন, ভূমি বন্দোবস্ত কাকে দেয়া হবে? ভূমির প্রকৃত মালিক কে? কেউ কেউ প্রশ্ন করে, আফগান শাসনের অবসান হয়ে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় ভূমির মালিক কে ছিল? সি. ডব্লিউ. বি. রাউজ Dissertation Concerning the Landed Property of Bengal নামে একখানি বই লিখেন[৮] এবং মত প্রকাশ করেন যে আফগানদের পতন এবং মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ে বাংলা কোন একক শাসনাধীনে ছিল না, বরং সারা বাংলা ভূঁঞা নামধারী কিছুসংখ্যক স্বাধীন সেনানায়কের অধীনে বিভক্ত ছিল। রাউজ অত্যন্ত সঠিকভাবে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করেন। তাঁর এই বই ডঃ জেমস ওয়াইজ[৯] কে বার-ভূঁঞাদের সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করে। ওয়াইজ এই বিষয়ে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে একটি প্রামাণ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১০] পরের বৎসর তিনি একই বিষয়ে কিছু নতুন সংবাদ পরিবেশন করেন।[১১] জেমস ওয়াইজ বার-ভূঁঞা সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ভূঁঞাদের পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত কাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেন এবং তৎকালে প্রাপ্ত লিখিত তথ্যাদি বিচার করেন। ওয়াইজের সময়ে আবুল ফজলের আকবরনামা বা আইন-ই-আকবরী ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়নি। ফলে তিনি ঐ প্রামাণ্য তথ্য ব্যবহার করতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বার-ভূঁঞা সম্পর্কে তাঁর আলোচনা মোটামুটিভাবে প্রামাণ্য এবং এখন পর্যন্ত গবেষকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক, তবে তাঁর আলোচনা ছিল সীমিত। তিনি নিম্নলিখিত পাঁচজন ভূঁঞা সম্পর্কে আলোচনা করেন :

(ক) ভাওয়ালের ফজল গাজী,

(খ) বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়,

(গ) ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য,

(ঘ) চন্দ্রদ্বীপ বা বাকলার কন্দর্প নারায়ণ,

(ঙ) খিজিরপুরের মসনদ-ই-আলা ঈসা খান।

অন্যান্য ভূঁঞাদের সম্পর্কে ওয়াইজ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। প্রায় একই সময়ে আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। এগুলি হচ্ছে হেনরী ব্লখম্যান এর Contributions[১২] ওয়েস্টল্যাণ্ড-এর Jessore[১৩] এবং বেভেরীজ এর Bakarganj[১৪]। ব্লখম্যান-এর প্রবন্ধসমূহ মূলত বার-ভূঁঞা সম্পর্কে লিখিত না হলেও তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভূগোলে যথেষ্ট অবদান রয়েছে এবং বার-ভূঁঞা সম্পর্কেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ওয়েস্টল্যাণ্ড এবং বেভেরীজ-এর পুস্তকদ্বয়ে কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও তাঁরা কেউ বার-ভূঁঞা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেননি। পরে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বেভেরীজ ঈসা খান মসনদ-ই-আলা সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা করেন।[১৫] ইতোমধ্যে তিনি আকবরনামার অনুবাদ প্রায় শেষ করেন। ফলে এই প্রবন্ধে তিনি ঐ পুস্তকে প্রাপ্ত প্রামাণ্য এবং সমসাময়িক তথ্যাদির সদ্ব্যবহার করেন। তিনি ঈসা খান সম্পর্কে প্রচুর আলোকপাত করেন কিন্তু তিনিও ইতিহাসে ঈসা খানের স্থান মূল্যায়ন করতে সমর্থ হননি। নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন,[১৬]

> It would appear, however, that he (Beveridge) too failed to appreciate the greatness of Isa Khan's life-struggle for independence and he did not devote to it the regardful attention it deserves. After

Edited by Ripon Sarkar

dealing into the subject at some length he somewhat lightly and abruptly refers to some pages of the Akbarnama in which further details of Isa Khan's doings are to be found and then goes off to discuss some minor and unimporoant issues.

বেভেরীজ ছিলেন সাম্রাজ্যিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক। তাই তিনি বিষয়টি মোগল কেন্দ্রীয় ও সাম্রাজ্যিক শক্তির প্রেক্ষাপটে দেখেন এবং মোগল ইতিহাসের আলোকে প্রবন্ধটি রচনা করেন। তাই বেভেরীজ ঈসা খানের আজীবন স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পরবর্তী লেখক এইচ. ই. স্ট্যাপলটন। ঢাকার অদূরে ঈসা খানের উত্তর পুরুষদের আবাসস্থল দেওয়ানবাগে কয়েকটি কামান আবিষ্কৃত হওয়ার পরে স্ট্যাপলটন "Note on seven sixteenth century cannons recently discovered in the Dacca district" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকশে করেন।[১৭] ঈসা খান ও তাঁর উত্তর পুরুষেরা কামানগুলির মালিক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে একটি কামানে ঈসা খানের নাম ও সন তারিখ খোদাই করা আছে। ফলে স্ট্যাপলটন ঈসা খান সম্পর্কে আলোচনা করেন, কিন্তু তিনি ঈসা খানের নামাঙ্কিত বাংলা লিপির যথাযথ পাঠ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। এই প্রবন্ধে নতুন তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না।

এর পরে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রেভারেণ্ড হস্টেন বার-ভূঁঞা সম্পর্কে "The Twelve Bhuiyans or Lanulords of Bengal" শীর্ষক একটি মূল্যবান এবং তথ্যভিত্তিক প্রবন্ধ লিখেন।[১৮] হস্টেন সমসাময়িক পর্তুগীজ তথ্যাদি ব্যবহার করেন এবং বিশেষ করে পর্তুগীজদের উল্লেখিত সলিমানবাজ, কতরাব এবং চণ্ডীকান নামক স্থানগুলির অবস্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বার-ভূঁঞাদের পরিচয় এবং ভূঁঞাদের সংখ্যা বার কেন হল তাও নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। হস্টেনই সর্ব প্রথম উল্লেখ করেন যে, পর্তুগীজ বিবরণে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দেই মোগলদের চণ্ডীকান দখলের সংবাদ পাওয়া যায়। এই তথ্য অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ ইতোপূর্বে মনে করা হত যে, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে মোগল সেনাপতি রাজা মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন। কিন্তু রেভারেণ্ড হস্টেনও তখন এই তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি, এমনকি স্যার যদুনাথ সরকার[১৯] এবং সতীশচন্দ্র মিত্রও[২০] এই তথ্যের গুরুত্ব তখন বুঝতে পারেননি। কিন্তু মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী আবিষ্কারের ফলে এখন সকলেই জানে যে, ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হস্টেন উল্লেখিত পর্তুগীজ তথ্যসমূহ বাহরিস্তানও সমর্থন করে। অতঃপর জে. জে. এ. কেমপসও পর্তুগীজ তথ্যাদি অবলম্বন করে তাঁর History of the Portuguese in Bengal [২১] বইখানি লিখেন, তবে তাঁর পুস্তকে নতুন সংবাদ বিশেষ পাওয়া যায় না।

বাঙালি ঐতিহাসিকেরাও উনিশ শতক থেকে বার-ভূঁঞা সম্পর্কে গবেষণা শুরু করেন। প্রথমে কৈলাসচন্দ্র সিংহ "ভারতী" পত্রিকায় উপরে উল্লেখিত জেমস ওয়াইজের প্রবন্ধের সমালোচনা করেন। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে স্বরূপচন্দ্র রায় তাঁর সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস লিখেন। এই পুস্তকে ঈসা খান ও তাঁর শাসিত অঞ্চল সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা

Edited by Ripon Sarkar

করেন, কিন্তু এই পুস্তকে অনেক অলীক ও কাল্পনিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়। ১৩১২ বঙ্গাব্দে কেদারনাথ মজুমদার মানসিংহের ইতিহাস প্রকাশ করেন। এই পুস্তকেও ঈসা খান সম্পর্কে কিছু তথ্য রয়েছে।

রামরাম বসু ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রতাপাদিত্য, চরিত প্রকাশ করেন। ১৩১৩ বঙ্গাব্দে (১৯০৬ খ্রিঃ) নিখিলনাথ রায় এই বই সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য-চরিত একখানি জীবনী গ্রন্থ, একে প্রথম বাংলা গদ্য রূপে গণ্য করা হয়। রামরাম বসুর সময়ে বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণ অনগ্রসর ছিল, কিন্তু তবুও আঠার শতকে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর অন্নদামঙ্গল-এ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যে কাল্পনিক কাহিনী দেন, রামরাম বসু তা পুরাপুরি গ্রহণ করেননি। ভারতচন্দ্রই বলেন যে, মোগল সেনাপতি মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করেন। কিন্তু রামরাম বসু সঠিকভাবে বলেন যে, সুবাদার ইসলাম খানই প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করেন। রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সঠিকভাবে লিখেন, যদিও প্রতাপাদিত্যের চরিত্র চিত্রণে তিনি কল্পনার আশ্রয় নেন। নিখিলনাথ রায় অত্যন্ত পরিশ্রম করে এবং নিষ্ঠা সহকারে প্রতাপাদিত্যের সঠিক ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

কলকাতা হেয়ার স্কুলের শিক্ষক উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রতিভা পত্রিকায় খাজা উসমান সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সিলেট থেকে এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি কিছু সনদ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। ফলে তাঁর রচনা তথ্যভিত্তিক হয়।

স্যার যদুনাথ সরকার বাহারিস্তান-ই-গায়বীর সাহায্যে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। এইগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) "প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে কিছু নতুন সংবাদ" প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬ বাংলা।
(খ) "প্রতাপাদিত্যের পতন" প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৭ বাংলা।
(গ) "প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রিস্টান পাদরী" প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২৮ বাংলা।
(ঘ) "বঙ্গের শেষ পাঠান বীর" (উসমান) প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা।
(ঙ) "বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন" প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯ বাংলা।
(চ) "বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী" প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৯ বাংলা।

সতীশ চন্দ্র মিত্র ১৩২৯ বাংলা সনে যশোর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রকাশ করেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ভৌগোলিক পরিচিতি দিয়ে বইখানি সমৃদ্ধ করেন। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে তিনি সবিশেষ আলোচনা করেন এবং অন্যান্য ভূঁঞাদের সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী বার-ভূঁঞাদের সম্পর্কে Bengal Chiefs' struggle for independence in the reigns of Akbar and Jahangir শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করেন।[২২] ভট্টশালীর আলোচনা বরাবরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে বার-ভূঁঞাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রথমে তাঁর পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকদের আলোচনার মূল্যায়ন করেন, পরে তিনি বার-ভূঁঞাদের উত্থানের আগের রাজধানী

Edited by Ripon Sarkar

শাসনকাল আলোচনা করেন এবং কররানীদের পতনের পরে ভুঁঞাদের উত্থানের ঐতিহাসিক কারণ বিশ্লেষণ করেন। তিনি আফগান আমলে বাংলায় মোগল আগ্রাসন এবং মোগল-আফগান যুদ্ধের বিবরণ দেন। সবশেষে তিনি ঈসা খান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। ঈসা খানের পূর্ব-পরিচিতি, ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি এবং মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধ, বিগ্রহের বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু ভট্টশালীর এই বিস্তারিত আলোচনা পাঠে মনে হয়, তিনি তাঁর আলোচনা শেষ করেননি, যে কোন কারণে ঈসা খান সম্পর্কে আলোচনার পরে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর এই সিরিজের প্রবন্ধগুলি শেষ হয়। পরে ভট্টশালী মোগল শাসনকালের প্রাথমিক যুগ সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। এইগুলিতে বার-ভুঁঞা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা না থাকলেও মোগল শাসনের প্রেক্ষিত আলোচনায় ঈসা খানের পরবর্তী ভুঁঞাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং বলা যায় যে, ভট্টশালীর আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও সীমিত; বার-ভুঁঞার আমলের ধারাবাহিক ইতিহাস এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু সীমিত হলেও ভট্টশালীর আলোচনাই এখনও আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট অতি প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে পরিগণিত। তিনি যে ধারায় ইতিহাস পুনর্গঠন করেছেন সেই ধারাটি এখনও আধুনিক ঐতিহাসিকদের নিকট উদাহরণ হয়ে আছে। আমিও আমার এই আলোচনায় ভট্টশালীর রচনা ব্যবহার করেছি এবং উপকৃত হয়েছি। ভট্টশালীর পরে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কেউ করেননি।

মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলায় যারা স্বাধীন বা আধা-স্বাধীনভাবে বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করত, তাদের সকলেই যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিল বা বার-ভুঁঞাদের অন্তর্গত ছিল তা নয়। বিশেষ করে যশোরের প্রতাপাদিত্য একজন বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। পূর্ববর্তী লেখকদের অনেকেই প্রতাপাদিত্যকে খাঁটি দেশপ্রেমিক রূপে চিহ্নিত করেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত আন্দোলনের সময় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ যখন তুঙ্গে, তখন কেউ কেউ প্রতাপাদিত্যকে স্বাধীন বাংলার স্বাধীন বীরের প্রতীক রূপে চিহ্নিত করেন। ঐ সময়ে ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রতাপাদিত্যের জীবনী অবলম্বনে একখানি নাটক লিখেন। এই নাটক এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, তৎকালে অন্য কোন নাটক এরূপ সফল হয়নি। রাতের পর রাত পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বাঙ্গালিরা এই নাটক উপভোগ করে। অথচ প্রতাপাদিত্য সত্যিই দেশপ্রেমিক ছিলেন কিনা এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। লিউ ফকনার বলেন,[২৩] "He (Pratapaditya) was a brave man that is certain sure but in my considered opinion he was a buccaneer on filbustering intent rather than a patriot actuated by motives disinterestedly pure. প্রতাপাদিত্য সাহসী যোদ্ধা ছিলেন কিনা, তাও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয় এ বিষয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সতীশচন্দ্র মিত্র এই উক্তির বিরোধিতা করার চেষ্টা করেও বিফল হন। তিনি প্রতাপাদিত্যের দেশপ্রেম প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। ভট্টশালী বলেন,[২৪] "Indeed Satish Babu's attitude towards Pratapaditya is like a doting but justice-loving grandmother, whose heart, however straight, is led astray by the bias of affection. If he had the courage to seek for truth regarding Pratapaditya. I am sure, he would not have missed it." বার-ভুঁঞাদের দেশপ্রেমের মত অনুভূতিসম্পন্ন (sensitive) একটি বিষয়ে ঐতিহাসিকদের নিরপেক্ষতা

Edited by Ripon Sarkar

রক্ষা করা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজন, তেমনি অত্যন্ত কঠিন, তবু সত্য অনুসন্ধান করাই ঐতিহাসিকদের কাজ। ভট্টশালী এই বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন[২৫]

> We surely want models to guide us in the path of regeneration.— models of heroism, of nobleness, of self sacrifice and above all, of patriotism. If the past history of our country does not hold any of these upto us, our clear duty is to lead our lives in such a manner that we ourselves may be the models for the future. If, with the best of motives, we attempt to cheat ourselves by believing as ture what is not true, if we fail to deal our condemnation in emphatic terms, where condemnation is clearly deserved, I cannot believe that such propaganda history will bring us ultimate good. A true historian should be much above such failings.

আগেই বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengal দ্বিতীয় খণ্ডে স্যার যদুনাথ সরকার বার-ভূঁঞাদের বিশেষ আমল দেননি। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে বার-ভূঁঞাদের যুদ্ধকে স্বাধীনতা যুদ্ধ রূপে আখ্যায়িত করতে নারাজ, এমনকি তিনি তাঁদের জবর দখলকারী (usurper) এবং দস্যু (plundering bands) বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু ভট্টশালী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন এবং তিনি বার-ভূঁঞাদের দেশপ্রেমের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এই বিষয়ে ভট্টশালীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ[২৬]

> I cannot but say that the thirty eight years' (1575-1612 A. D.) struggle for independence of the Bengals chiefs has not received the recognition it deserves. Rana Pratap of Mewar spent his whole life in fighting Akbar and ended his days sword in hand and independent. We have almost deified Rana Pratap and there is no name more honoured from one end of the country to the other than Rana Pratap's. But what then have the Bengal chiefs done to deserve this oblivion? They did the same: they fought with the greatest generals of Akbar, the very generals who had fought Rana Pratap. Rana Pratap was strong in cavalry, the Bengalees were strong in war-boats. The imperial generals were defeated again and again and driven out of Bengal, Bengal was never at peace and constant guerilla warfare was maintained throughout the reign of Akbar, with occasional disasters to the imperial arms. It was not before 1613, in the reign of Jahangir that Bengal was completely subjugated. And all these the Bengal chiefs accomplished with the children of the soil of bengal and not with hirelings from Nepal or Rajputana. Yet Bengalees are a non-military race unworthy of receiving a soldier's training, though their chief and fore-fathers had fought and maintained their independence for more than a third of a century.

বার-ভুঁঞা নামের তাৎপর্য

বার-ভুঁঞা নামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। আফগানদের পতন এবং মোগল শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্যবর্তী কয়েক বৎসরে (প্রায় ৩৬ বৎসর) অনেক ভুঁঞা সেনাপতি ও যোদ্ধা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে রেখেছিল এবং স্বাধীন বা আধা-স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং মিরযা নাথন উভয়েই বার-ভুঁঞা (দওয়াজদাহ বুমি) নামটি উল্লেখ করেছেন এবং তাদের দমনের উপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন।[২৭] ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায়ও "দ্বাদশ বাঙ্গালা" বা বার-ভুঁঞার উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৮] পরবর্তী ঐতিহাসিকেরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে বার-ভুঁঞার অবদানের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু এই বার-ভুঁঞা নামের তাৎপর্য কি? তারা কি সত্যিই সংখ্যায় বার জন ছিল? তারা কোন্ অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে? উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে প্রশ্নগুলির বা কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউ সন্দেহাতীতভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে শেষোক্তটি পরে আলোচনা করা হবে। এখন প্রথম দুইটি আলোচনা করা যাক।

সতীশ চন্দ্র মিত্র প্রশ্নগুলি বিদশভাবে আলোচনা করেছেন। নিচে তাঁর আলোচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন ঃ[২৯]

"প্রবাদ এই, মোগলাদিগের বংশ বিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে এইরূপ বারজন ভুঁঞা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বলিতে গেলে এক প্রকার তাঁহারাই বংগদেশকে বা নিম্ন বঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে নিজেরা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন 'বার-ভুঁঞার মুলুক' বা 'বারভাটি বাঙালা' বলিত। কিন্তু তাঁহারা যে সংখ্যায় ঠিক বারজনই ছিলেন এবং সেই বারজন ঠিক এক সময়ে ছিলেন, তাহা বলা যায় না। হয়ত একজনের রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভুঁঞার মৃত্যুর পর, তাঁহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালনা করতেন, কিন্তু হিসাবের বেলায় তিনিও বার-ভুঁঞার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন।

"দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার সম্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব। অতি প্রাচীনকাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্ত রাজের প্রসংগ চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানা সম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে। তাহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণত বার-ভুঁঞা বেষ্টিত হইয়া বসিতেন। বাঙ্গালার মত আসামেও বারজন রাজা বা বারজন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন হইত না এবং 'পাঁচ পীরের' নাম করিতে গিয়া যেমন নানা জনে নানা পীরের নাম করিয়াছেন, আসামের বারজন রাজার তালিকা পুরাইতেও বিভিন্ন নাম কথিত হয়। আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেককালে বারজন সামন্ত রাজা বা ভূঞার আবশ্যক হইত এবং উঁহাদের অভিষেকও এক সময়ে সম্পন্ন হইত। এখনও আমাদের দেশে বারজনে ভিন্ন কোন কাজ হয় না, বহুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্য বলে। উহাতে ঠিক বারজন থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার ভুঁঞার কাণ্ডটিও প্রায়

Edited by Ripon Sarkar

একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঁঞা বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহাদিগকে 'বার-ভূঁঞা' বলিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যেন সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বারজন ছিলেন, এমন বোধ হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে, বহুজনে 'বার-ভূঁঞা'র কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু কেহই ঠিকভাবে বারজনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বারজনের নাম দিতে পারেন নাই, প্রত্যেকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই।"

সতীশ বাবুর মূল বক্তব্য দুটি, প্রথমত তিনি বলেন যে অতি প্রাচীনকাল থেকে বারজন সামন্ত রাজের প্রসঙ্গ চলে আসছে এবং মনুসংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ বার-ভূঁঞা বলতে ঠিক বারজন ভূঁঞাকে বুঝান হয়নি, বরং বহু অর্থে বার সংখ্যাটি ব্যবহৃত। কিন্তু সতীশ মিত্র 'বার-ভূঁঞা নামটি সারা বাংলার জন্য প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে নিঃসংশয় হতে পারেননি। কারণ তিনি বলেন, "বলিতে গেলে এক প্রকার তাঁহারাই (বার-ভূঁঞা) বঙ্গদেশকে বা নিম্ন বঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে নিজেরা ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।"

নলিনীকান্ত ভট্টশালী সতীশ বাবুর উপরোক্ত মন্তব্য পরীক্ষা করে মত প্রকাশ করেন যে, সতীশ বাবুর দ্বিতীয় মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন যে, ভূঁঞাদের কথা বলার সময় সকলেই "বার-ভূঁঞা" কথাটি উল্লেখ করেন। কারণ তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিল না। তিনি আরও বলেন যে সমসাময়িক ইউরোপীয় লেখক এবং এমনকি আবুল ফজলও তাঁদের বার-ভূঁঞা বলেছেন। (সমসাময়িক লেখকদের বক্তব্য পরে বিচার করা হবে) কিন্তু ভট্টশালী সতীশ বাবুর প্রথম বক্তব্যটি গ্রহণ করেননি। তিনি প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বলেন যে, গুপ্ত যুগে পূর্ব ভারত কয়েকটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভুক্তির শাসককে বলা হত 'উপরিক' (বা গভর্নর)। প্রত্যেক ভুক্তি আবার কয়েকটি 'বিষয়'-এ বিভক্ত ছিল এবং তাদের শাসককে বলা হত 'বিষয়পতি'। কোন কোন সময় 'মণ্ডল'-এর নামও পাওয়া যায়, কিন্তু 'মণ্ডল' এবং 'বিষয়' এর সম্পর্ক সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। গুপ্ত পরবর্তী যুগে পাল, সেন, বর্মনদের সময়েও 'উপরিক' ও 'বিষয়পতির' উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে ভট্টশালীর মতে রাজ্যের আকৃতি সংকোচিত হওয়ার ফলে 'উপরিক' শুধু একটি নামে পর্যবসিত হয়, যদি 'বিষয়পতির' শাসন ক্ষমতা হিন্দু যুগের শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল। এই আলোচনার পর ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে প্রাচীন বাংলার এই শাসন ব্যবস্থায় বার-ভূঁঞার কোন স্থান নেই বা 'বিষয়পতির' সংখ্যা যে বারজনে সীমাবদ্ধ ছিল তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতঃপর ভট্টশালী মুসলমান আমলের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, ইলিয়াস শাহ, সিকান্দর শাহ, হুসেন শাহ প্রমুখ ক্ষমতাবান সুলতানদের সময় মুসলিম বাংলা জাগীরদারদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। জাগীরদারেরা প্রত্যেকে সেনানায়ক ছিল, তারা সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করে রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসনের ব্যবস্থা করত এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করত। অতঃপর ভট্টশালী বলেন যে, সুলতানী আমলের প্রায় চারশ বৎসর অতিবাহিত হওয়ার পরে মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে হঠাৎ করে মনুসংহিতার বার সংখ্যাটি বাংলায় প্রবেশ করার কল্পনা করা যায় না। তিনি প্রশ্ন করেন, তবে কি তখন বাংলায় হিন্দু পুনর্জাগরণ হয়? তা হয়ত বিশ্বাস করা যেত যদি বার-ভূঁঞারা সকলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বী হত। কিন্তু তিনি বলেন যে, বার-ভূঁঞাদের মধ্যে অন্তত

Edited by Ripon Sarkar

নয়জন মুসলমান ছিল। (ভট্টশালীর এই বক্তব্য বোধগম্য নয়, কারণ পরে দেখা যাবে যে তিনি নিজে বারজন ভূঁঞার স্থলে পনেরজন ভূঁঞার পরিচিতি দেন)।

ভট্টশালী বার-ভূঁঞার নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আসাম ও কোচবিহারের উদাহরণ টেনেছেন। তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ আসামের ইতিহাসের তের শতক অন্ধকার যুগ। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে অহোমরা শান সেনাপতি সুখ-পার নেতৃত্বে পূর্ব সীমান্ত দিয়ে আসামে প্রবেশ করে। অহোমরা ইতিহাস সচেতন জাতি, তাদের ইতিহাস অহোম বুরঞ্জী নামক ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। বুরঞ্জীগুলি ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভরশীল। অহোম বুরঞ্জী মতে পূর্ব আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তরে ছুটিয়া নামে একটি রাজ্য গঠিত হয় এবং ঐ নদের দক্ষিণে একটি কাছাড়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে কোচবিহার ও রংপুর অঞ্চল নিয়ে কামতা নামে আরও একটি রাজ্য গঠিত হয়। পশ্চিমে কামতা এবং পূর্বে ছুটিয়া ও কাছাড় রাজ্যের মধ্যবর্তী ভূভাগের কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। এইগুলি বার-ভূঁঞার রাজ্য নামে পরিচিত হয়। প্রায় ৭০ বৎসর ধরে এই ভূঁঞারা স্বাধীনভাবে দেশ শাসন করে। এই ভূঁঞাদের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথম কাহিনী এই ঃ কামরূপের ক্ষত্রিয় রাজ অরিমত্তের পুত্র রত্নসিংহ ১২৩৮ খ্রিস্টাব্দে অরিমত্তের মন্ত্রী সমুদ্র কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়। ফলে সমুদ্র এবং সমুদ্রের পরে তৎপুত্র মনোহর রাজ্যের অধীশ্বর হন। মনোহরের মেয়ে লক্ষীর দুই ছেলে ছিল। তাদের নাম শান্তনু এবং সামন্ত। শান্তনু এবং সামন্তের প্রত্যেকের বারজন করে ছেলে ছিল। কালক্রমে শান্তনুর বারজন ছেলে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে নওগাঁও জেলার এবং অন্যদিকে সামন্তের বারজন ছেলে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে লখিমপুর জেলার কর্তৃত্ব লাভ করে। শান্তনু এবং সামন্তের প্রত্যেকের ছেলেরাই "বার-ভূঁঞা" নামে পরিচিত হয়। অহোমরাজ সুখংপা-ফার রাজত্বকালে। (১২৯৩-১৩৩২ খ্রিঃ) এই ভূঁঞারা আত্মসমর্পণ করে। এই ভূঁঞাদের আদি ভূঁঞা বলা হয়।

অন্য কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ দুর্লভ নারায়ণ নামক একজন রাজা ১৩১৪ খ্রিস্টাব্দে কামতায় রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে অহোমদের লুটতরাজ ও অরাজকতা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে প্রহরী স্বরূপ একদল সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। দুর্লভ নারায়ণের রাজত্বকালেই এরা সেখানে আধা-স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। দুর্লভ নারায়ণের মৃত্যুর পরে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায় এবং বার-ভূঁঞা রূপে পরিচিতি লাভ করে। তারা প্রায় দুশ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করে। ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব সিংহ কোচবিহারে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে বার-ভূঁঞাদের একে একে পরাস্ত করে স্বীয় অধীনে আনয়ন করেন। বিশ্ব সিংহের পুত্র নরনারায়ণ পিতার মৃত্যুর পরে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। নরনারায়ণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলির তারিখ ১৪৭৭ শকাব্দ বা ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ। বুঝা যায় যে, নরনারায়ণ ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। অতএব ধরে নেয়া যায় যে, ১৫১৫ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বার-ভূঁঞাদের দমন করা হয়। এই ভূঁঞারা মধ্য আসামের শান্তনু ও সামন্তের উত্তরাধিকারী বার-ভূঁঞা থেকে স্বতন্ত্র।

অতঃপর ভট্টশালী নিম্নরূপ বলেন ঃ বাংলার বার-ভূঁঞাদের উৎপত্তি কররানী সুলতান দাউদের পতনের পরে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়। (এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য পরে দেয়া হবে)। আসামের ইতিহাসে দেখা যায় যে, রাজার মৃত্যু বা দুর্বলতার সুযোগে

Edited by Ripon Sarkar

ছোট ছোট সামন্তরাজের অভ্যুদয় হয় এবং তারা বার-ভূঁএগ নামে পরিচিতি লাভ করে। বাংলায় দাউদ কররানীর পতন ও মৃত্যুর পরে একটি অরাজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখনও আসামের বার-ভূঁএগদের কথা বাংলার জনগণের মনে জাগরূক। সুতরাং আসামের অনুকরণে বাংলার সদ্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ভূঁএগরাও বার-ভূঁএগ নামে পরিচিত হয়। ভট্টশালীর মতে বার-ভূঁএগ নামের উৎপত্তির এটাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। তবে এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন জাগে। ভট্টশালীর বিবরণ মতে, আসামের তিন দল ভূঁএগর সংখ্যাই বার-এ নির্দিষ্ট। কিন্তু বাংলার বার-ভূঁএগর সংখ্যা অনির্দিষ্ট এবং বহু বুঝাতেই বার সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে ভট্টশালীও মনে করেন। এর কোন ব্যাখ্যা তিনি দেননি। অতঃপর, ভট্টশালী আরাকানের বার-ভূঁএগর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তাঁর মতে মনুসংহিতার দৃষ্টান্ত মতে, আরাকানে বার-ভূঁএগর উৎপত্তি হয়, কারণ আরাকানে ব্রাহ্মণ্যবাদ অনেক পরে অনুপ্রবেশ করে। আরাকানের নতুন শাসন ব্যবস্থায় মনুসংহিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে বারজন ভূঁএগ বা প্রধান নিয়োগ করা অপরিহার্য বিবেচিত হয়। ভট্টশালী উপসংহারে বলেন যে, আসাম এবং বাংলার বার-ভূঁএগরা অরাজক পরিস্থিতির ফসল, কিন্তু আরাকানের বার-ভূঁএগ শান্তিপূর্ণ শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফসল।[৩০]

এম. এ. রহীমও বার-ভূঁএগ নামের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি সতীশচন্দ্র মিত্র এবং ভট্টশালীর সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে, বার সংখ্যাটি অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত অর্থাৎ বার-ভূঁএগ বলতে ঠিক বারজনই ভূঁএগ ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নাই। তিনি দুটি বাংলা প্রবচন উল্লেখ করেন, যেমন "বার জনে বার কথা কয়" এবং "বার ভূতে খায়"। এই দুটি প্রবচনেই বার সংখ্যাটি অনির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। তিনি বার-ভূঁএগ কথাটির কিভাবে উৎপত্তি হল তা আলোচনা করেননি। মনে হয় তিনি ভট্টশালীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন।[৩১]

সতীশচন্দ্র মিত্র এবং এম. এ. রহীম উভয়েই একটি পূর্ব ধারণা নিয়ে বিষয়টির মীমাংসা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, বার-ভূঁএগ সারা বাংলায় বিভিন্ন অঞ্চলে বা এলাকায় ক্ষমতা অধিকার করে, কিন্তু আমরা পরে দেখব যে সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং মির্যা নাথন বার-ভূঁএগ বলতে সঙ্গে সঙ্গে ভাটির কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ তারা বার-ভূঁএগ ভাটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অবশ্য বার-ভূঁএগ সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায় সবাই একই ধারণা মনে নিয়ে সারা বাংলার ভূঁএগকেই বার-ভূঁএগ র অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সারা বাংলায় তখন অনেক স্বাধীন বা আধা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, এই রাজ্যের অধিপতি কেউ কেউ রাজা, আবার কেউ কেউ মসনদ-ই-আলা রূপে অভিহিত হয়, শুধু ভূঁএগ নাম নিয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। ইউরোপীয় লেখকেরা এই খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি বা তাদের অধিপতিদের বিবরণ দিতে গিয়ে সবাইকে ঢালাওভাবে বার-ভূঁএগ রূপে উল্লেখ করেছেন। এই কারণে সতীশ বাবু এম, এ, রহিম এবং অন্যান্য লেখকেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন। আগেই বলা হয়েছে বার-ভূঁএগ সারা বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল বা বাংলার একাংশে তারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, এই বিষয়ে সতীশ বাবুর মনে সংশয় ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও বিভ্রান্তি থেকে রেহাই পাননি। ভট্টশালী ইহা উপলব্ধি করেন, যদিও তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, বার-ভূঁএগর পরিচিতি দেয়ার সময় তিনি শুধু পূর্ব বাংলার ভাটি অঞ্চলের

Edited by Ripon Sarkar

ভূঁঞার পরিচিতি দিয়েছেন। কিন্তু ভট্টশালী আর এক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি দেখেন। যে সকল ভূঁঞা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন তিনি শুধু সেই সকল ভূঁঞাকেই বার-ভূঁঞা রূপে চিহ্নিত করেন। যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং ভূষণার শত্রুজিতকে বাদ দেয়ার কারণ স্বরূপ তিনি বলেন ঃ[৩২]

> The omission of the well-known name of Pratapaditya will surprise many of the readers. As far as I have been able to understand and sift historical evidence. I have obtained no proofs to show that Pratapaditya ever fought with the forces of Akbar. Pratapaditya of Jessore and Anantamanikya of Bhulua appear to me to have fought the Mughals for the first and the last time in 1612 and 1613 in the reign of Jahangir when they had no other recourse but to fight, and they went down in the contest. Mukundaram of Bhushna never fought with the Mughals and Ram Chandra of Bacla submitted on the first onslaught. The dreams of an independent and united Bengal, of patriotism and valoure that have been ascribed to Pratapaditya, appear to me to be mere daydreams of those writers who ascribed them.
>
> I have not included Pratapaditya of Jessore and Satrajit son of Mukundaram of Bhushna in this list as both of them were imperial partisans and saw Islam Khan with presents...

প্রতাপাদিত্যকে আমরাও বার-ভূঁঞার অন্যতম বলে স্বীকার করি না, অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রী হরি এবং পিতৃব্য বসন্ত রায় যেভাবে তাদের প্রভু দাউদ কররানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ যশোরের জমিদারী লাভ করে (পরে আলোচনা করা হয়েছে), তাতে মোগলেরা তাঁকে শত্রু ভাবার প্রশ্নই উঠে না। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে, ইসলাম খান চিশতী যখন ভাটির বার-ভূঁঞাদের দমনের জন্য উদ্বিগ্ন এবং সেই জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা নিচ্ছিলেন, তখন প্রতাপাদিত্য নিজেই সুবাদারের নিকট উপহার পাঠান এবং পরে নিজে গিয়ে দেখা করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মোগলেরা প্রতাপাদিত্যকে স্বপক্ষের লোক বলে ভাবত এবং প্রতাপাদিত্যও প্রথম থেকেই মোগলদের প্রতি অনুগত ছিলেন। প্রতাপাদিত্য পরে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন, কিন্তু সেটা ভিন্ন কারণে। ভূষণার শত্রুজিতও প্রথম এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং পরে মোগলদের পক্ষ হয়ে আজীবন যুদ্ধ করেন। কিন্তু ভট্টশালী যে মাপকাঠিতে বার-ভূঁঞাদের বিচার করেছেন, সেই মাপকাঠি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করেননি। তিনি বাকলার রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যকেও বার-ভূঁঞার তালিকায় স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি মাসুম খান কাবুলীকেও বার-ভূঁঞার তালিকায় সন্থান দিয়েছেন। বার-ভূঁঞারা ছিলেন ভূ-স্বামী, ভূমিই তাঁদের ক্ষমতার উৎস, তাঁরা কোন সময়েই মোগলদের অধীনে চাকরি করেননি। কিন্তু মাসুম খান কাবুলী ছিলেন আকবরের অধীনে চাকরিরত সৈনিক বা সেনাধ্যক্ষ তিনি আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, বিদ্রোহীরূপেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। বিদ্রোহী হিসাবে তিনি ঈসা খানের সঙ্গে একযোগে মোগলদের প্রতিরোধ করেন। কিন্তু শুধু এই কারণে তিনি বার-ভূঁঞার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না।

Edited by Ripon Sarkar

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা প্রায় সকলেই একমত যে বার-ভূঁএগ্রা দ্বারা নির্দিষ্ট বারজন ভূঁএগ্রাকে বুঝায় না, বহু ভূঁএগ্রাকে বুঝাবার জন্য বার সংখ্যাটি ব্যবহৃত। প্রকৃতপক্ষে অনেক চেষ্টা করেও এই পর্যন্ত কেউ বারজন ভূঁএগ্রা চিহ্নিত করতে পারেননি। যাঁরা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই। পরে আমরা বার-ভূঁএগ্রার পরিচিতি দেয়ার চেষ্টা করব। দ্বিতীয়ত বার-ভূঁএগ্রার উৎপত্তি সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র মনে করেন যে হিন্দু বা প্রাচীন কাল থেকে বার-ভূঁএগ্রার ধারণা চলে আসছে এবং তিনি মনুসংহিতার উদাহরণ তুলে ধরেছেন। এই বিষয়ে ভট্টশালী সতীশ বাবুর সঙ্গে একমত নন। ভট্টশালী মনে করেন যে, আসাম ও কোচবিহারের অনুকরণে বাংলায় বার-ভূঁএগ্রার ধারণা প্রচলিত হয়। মনে হয় বার-ভূঁএগ্রার ধারণাটি পূর্ব ভারতীয়, বিশেষ করে কোচবিহার, আসাম, আরাকান এবং পূর্ব-বাংলার চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই বিষয়ে ভট্টশালীর মতামত গ্রহণ করা যায়। তৃতীয়ত, ভট্টশালী আরও মনে করেন যে, বার-ভূঁএগ্রারা স্বাধীনতার জন্য মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, যারা যুদ্ধ করেনি, তারা বার-ভূঁএগ্রা রূপে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং মিরযা নাথন এই ধারণাই দেন যে, বার-ভূঁএগ্রারাই ছিলেন মোগল বিজয়ের প্রধান প্রতিবন্ধক এবং সেই কারণে মোগল সুবাদারেরা বার-ভূঁএগ্রাদের দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সুতরাং এই বিষয়েও ভট্টশালীর মতামত গ্রহণযোগ্য। বার-ভূঁএগ্রার পরিচিতি এই অধ্যায়ের শেষ দিকে দেয়া হয়েছে।

মোগল বিজয়ের প্রাক্কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা

বাংলার মোগল বিজয়ের ইতিহাস বুঝতে হলে বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে সমস্যক ধারণা থাকা দরকার। স্মরণীয় যে, সমসাময়িক কালে বাংলার নদ-নদী মোগল সৈন্যদের অভিযানে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র ও তাদের শাখা প্রশাখা বাংলার বিভিন্ন এলাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে এবং বিশেষ করে বর্ষাকালে এই নদীগুলি পার হওয়া এবং নদী পার হয়ে বাঙ্গালি ভূঁএগ্রা-জমিদারদের আক্রমণ বা পরাস্ত করা সহজ ছিল না। অপরপক্ষে বাংলার ভূঁএগ্রারা নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিল। রাজমহলের নিকটে তেলিয়াগড় এবং সিকড়িগড় দুর্গ ছিল দুর্ভেদ্য। শক্তিশালী নৌবহর ছাড়া কোন সেনানায়কের পক্ষে এই দুর্গগুলি জয় করা অসম্ভব ছিল। এর দক্ষিণে ছিল সাঁওতাল পরগণা, ছোট নাগপুর এবং নিকটেই ঝাড়খণ্ড, জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য পথ। মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে এবং পশ্চিমেও ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। এদিকে তিস্তা নদী পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়। ব্রহ্মপুত্র নদ পূর্ব বাংলাকে বেষ্টন করে রাখে এবং এই এলাকাতেই শক্তিশালী ভূঁএগ্রাদের প্রধান কেন্দ্রগুলি অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ বঙ্গ এবং উপকূলীয় এলাকাও নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ফলে সারা পূর্ব বাংলা, দক্ষিণ বাংলা, পাবনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা, উত্তরে রংপুর, চলনবিল এলাকা নদ-নদী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং যে কোন বহিরাক্রমণের জন্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত।

রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানীর পতন হলেও প্রায় সারা বাংলা মোগলদের হাতছাড়া থেকে যায়। মোগল শক্তি শুধু পশ্চিম-উত্তর বাংলার কিছু অংশে সীমিত থাকে। রাজধানী তখনও মালদহ শহরের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাঁড়া (মুসলমান ঐতিহাসিকদের তান্ডা) শহরে অবস্থিত। মোগল অধিকারও তাঁড়ার পারিপার্শ্বিক স্থানে সীমিত ছিল। মোগল অভিযানের কাহিনী পাঠ করলে বুঝা যায় যে, মোগল অধিকার তখন মালদহ-দিনাজপুর

Edited by Ripon Sarkar

হয়ে উত্তরে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পূর্বদিকে তাদের অধিকার করতোয়া নদীর দ্বারা সীমিত হয়. পাবনা জেলার পূর্ব অংশে মোগলদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

মোগল কর্তৃত্বের বাইরে সারা বাংলায় অনেক ভূঁঞা বা জমিদার (তাদের কেউ কেউ রাজা বা মসনদ-ই-আলা উপাধিধারী) তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। এদের সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। আকবরনামায় ভূঁঞাদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথকভাবে কিছু পাওয়া যায় না, কিন্তু মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মিরযা নাথন বাংলায় আসায় এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করায় তাঁর পক্ষে ভূঁঞা জমিদারদের সম্পর্কে তথ্যাদি দেয়া সম্ভবপর হয়েছে। ভূঁঞাদের সম্পূর্ণ দমন করতে প্রায় তিন যুগ সময় লাগে। ইতোমধ্যে আকবরের মৃত্যু হয়ে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল আসে। আকবরের আমলের ভূঁঞারাও অনেকেই প্রাণ্য ত্যাগ করে এবং তাদের পুত্ররা ক্ষমতায় আসে। তাই মোগলদের বিরুদ্ধে ভূঁঞাদের প্রতিরোধ কাহিনী আকবরের সময় পার হয়ে জাহাঙ্গীরের সময় (অন্তত ১৬১২ খ্রিঃ) পর্যন্ত বিস্তৃত। নিচে ভূঁঞাদের সম্পর্কে তথ্য সন্নিবেশিত হল।

বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির

তিনি বিষ্ণুপুরের জমিদার ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর প্রাচীনকালে মল্লভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং এখানকার রাজারা মল্ল নামে খ্যাত হয়। সুতরাং বীর হাম্বির মল্ল নামেও পরিচিত ছিলেন। বীরভূম বাঁকুড়া তাঁর অধীনে ছিল। বিষ্ণুপুর রাজবংশ অতি প্রাচীন, কথিত আছে যে, খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রঘুনাথ সিংহ নামক একজন ক্ষত্রিয় রাজপুত্র বৃন্দাবন থেকে এসে এখানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরের আদি মল্ল। রঘুনাথ সিংহের ৪৭তম অধস্তন পুরুষ বীর হাম্বির, তিনি ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দে বিষ্ণুপুরের জমিদারী লাভ করেন। উড়িষ্যার কতলু খানের বিরুদ্ধে মানসিংহের যুদ্ধের সময়, বীর হাম্বির মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে সাহায্য করেন। এমনকি জগৎ সিংহকে বিপদে উদ্ধার করেন।[৩৩] জাহাঙ্গীরের সময়েও তিনি স্বীয় জমিদারীতে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ইসলাম খান চিশতীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শুজার সময় বীরভূমের জমিদারের নাম কামাল এবং মুর্শিদ-কুলী খানের সময় বীরভূমের জমিদারের নাম আসাদ-উল্লাহ, মনে হয় শাহজাহানের সময় বীর হাম্বিরের বংশ জমিদারীর কিছু অংশ হারায়।[৩৪]

পাচেটের শামস খান

বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে পাচেট অবস্থিত। দুই সূত্রে পাচেটের জমিদারের দুটি ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়। এই দুটি সূত্রের একটি আবদুল লতীফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, অন্যটি মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী। দুটিই সমসাময়িক, দুজনই চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছেন অথচ দুটিতে পাচেটের জমিদারের নাম ভিন্ন। আবদুল লতীফ তাঁর বিবরণের এক স্থানে লিখেন ঃ[৩৫]

"ফতেপুর হইতে ৩০শে মার্চ (১৬০৯ খ্রিঃ) কুচ করিয়া রানা তালাপুর পৌছিলাম। এখানে উড়িষ্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার সলীম খাঁ, পাচেটের রাজা ইন্দ্র নারায়ণের ভ্রাতা, মন্দারনের রাজার পিতৃব্য পুত্র (একুনে) ১০৯টি ছোট বড় হাতী লইয়া আসিয়া

Edited by Ripon Sarkar

নবাবের (সুবাদার ইসলাম খানের) সহিত দেখা করিলেন। নবাবের বিশ্বাসী কর্মচারী শয়খ কামাল তাহাদিগকে উপস্থিত করিল।"

অতএব আবদুল লতীফের বিবরণে পাচেটের জমিদারের নাম ইন্দ্র নারায়ণ। মিরযা নাথন প্রথমে বলেন যে, সুবাদার ইসলাম খান শয়খ কামালকে বীর হাম্বির, শামস খান ও সলীম খানের বিরুদ্ধে পাঠান, তাঁদের তিনজনের জমিদারী সংলগ্ন ছিল। একটু পরে তিনি শয়খ কামাল কর্তৃক বীরভূম, পাচেট ও হিজলী বিজয়ের বিবরণ দেন এবং এই তিনটি জমিদারীর জমিদারের নাম দেন যথাক্রমে বীর হাম্বির, শামস খান্ ও সলীম খান। উপসংহারে মিরযা নাথন আরও বলেন : After a few days Shaykh Kamal reached Alaipur and presented the Zamindars to the august Khan, and submitted peshkash to the subahdar.

আবদুল লতীফ এবং মিরযা নাথনের বক্তব্যের মিল যেমন আছে, গরমিলও রয়েছে। শয়খ কামাল কর্তৃক জমিদারদের উপস্থিত করার কথা উভয়েই বলেছেন। কিন্তু আবদুল লতীফের বিবরণে পাচেটের জমিদারের নাম ইন্দ্র নারায়ণ এবং যে স্থানে জমিদারদের উপস্থিত করা হয়েছে তার নাম রানা তাঙাপুর; মিরযা নাথনের বিবরণে পাচেটের জমিদারের নাম শামস খান এবং স্থানের নাম আলাইপুর।

আবদুল লতীফের বিবরণ ডায়রী বা রোজনামচা আকারে লিখিত। তিনি বলেন, ২রা মার্চ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার আলাইপুর থেকে ফতেহপুরে যান। ফতেহপুরে কুরবানের ঈদ এবং নৌরোজ উৎসব পালন করা হয়। প্রায় একমাস ফতেহপুর থাকার পরে ৩০শে মার্চ তারিখে (১৬০৯ খ্রিঃ) সুবাদার রানা তাঙাপুরে যান। সুতরাং আবদুল লতীফের এই বিবরণ গ্রহণযোগ্য। তিনি সুবাদারের সঙ্গে ছিলেন, মিরযা নাথন তখন সেখানে ছিলেন না। সুতরাং শয়খ কামাল জমিদারদের রানা তাঙাপুরেই সুবাদারদের নিকট উপস্থিত করেন।

কিন্তু পাচেটের জমিদারের নাম নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করা দরকার। মিরযা নাথন শুধু যে জমিদারদের উপস্থিত করার কথা বলেছেন তা নয়, তিনি জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথাও বলেছেন। সুতরাং মিরযা নাথনের জমিদারের নাম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। মনে হয়, আবদুল লতীফ মন্দারনের জমিদারকে পাচেটের জমিদার বলে ভুল করেছেন।

মহেন্দ্র করণ লিখেছেন:[৩৬] 'সম্ভবত' বাহরিস্তানের লেখক ভ্রমক্রমে শামস খাঁ করিয়াছেন, ইহা ইন্দ্র নারায়ণ হইবে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয় (স্যার যদুনাথ সরকার) জিজ্ঞাসিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "বাহরিস্তানে দুইবার পাচেটের জমিদারকে শামস খাঁ বলা হইয়াছে। কিন্তু এটা লেখকের বৃদ্ধ বয়সের ভুল হওয়া সম্ভব। আবদুল লতীফের উল্লেখিত 'ইন্দ্র নারায়ণ' নাম বেশী বিশ্বাসযোগ্য। কারণ তিনি বাহরিস্তানের রচয়িতা অপেক্ষা বেশী বিদ্বান ছিলেন এবং ডায়রী লেখেন। শিতাব খাঁর (মিরযা নাথনের) গ্রন্থ তাঁহার কেরানী লেখেন এবং খাঁ নিজে মৌখিক বর্ণনা করিয়া যান, এরূপ স্থলে ভুল হওয়া সহজ।" কিন্তু তাঁর সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গল ২য় খণ্ডে,

Edited by Ripon Sarkar

স্যার যদুনাথ সরকার মিরযা নাথনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, শামস খান ছিলেন পাচেটের জমিদার। মিরযা নাথন যে বৃদ্ধ বয়সে লিখেন কথাটা ঠিক নয়, মিরযা নাথনের বাহরিস্তান ৪টি দফতর বা খণ্ডে লিখিত, তৃতীয় দফতর লেখার তারিখ পাওয়া যায়, ২৭শে মে ১৬৩২ খ্রিঃ[৩৭], ঐ সময়ে তাঁর বয়স চল্লিশের নিচে ছাড়া বেশি হবে না। আবদুল লতীফও ছিলেন কেরানী, সুতরাং তিনি মিরযা নাথন থেকে বেশি বিদ্বান হবেন তাও ঠিক নয়। আমরা এই বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করেছি এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, পাচেটের জমিদারের নাম শামস খান।

হিজলীর সলীম খান

পাচেটের দক্ষিণ-পূর্বে হিজলী মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। হিজলী কাঁথি মহকুমার একটি গ্রাম, রসুলপুর নদীর নদীর মোহনার নিকটবর্তী। হিজলী শহরের বর্তমান নাম নিজ কসবা।

হিজলীর প্রামাণ্য ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি। ঐতিহাসিক বিবরণ যা পাওয়া যায় তার একটির সঙ্গে অন্যটির কোন মিল নেই। এ বিবরণগুলি নিচে দেয়া হল। সতীশচন্দ্র মিত্র নিম্নরূপ বিবরণ দেনঃ[৩৮]

"হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন। উহার উদ্ধারের জন্য আমি বহু চেষ্টা করিয়াছি। যাহা পাইয়াছি, তাহা সামান্য এবং তাহার মধ্যে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হিজলীতে পাঠান আমলের একখানি প্রাচীন মসজিদ আছে। উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন মুসলমান গৃহে একখানি অতি জীর্ণ পারসীক পুঁথি পাওয়া যায়। কাঁথির সুযোগ্য মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট রায় সাহেব রামপদ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় উহা কিছুকালের জন্য আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্জিত গল্পপুঞ্জের মধ্য হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া হিজলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী পাইয়াছি। বহমার পুত্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দার ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে ভাগে সমুদ্রকূলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান প্রতিষ্ঠা করেন। পাতশাহের সেনাপতি খাঁ-খানানের নিকট হইতে তিনি জমিদারী সনন্দ পান এবং বহুদিন পরে পুত্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদারীর ভার দিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দাউদের তাজ খাঁ ও সেকন্দর পালোয়ান নামক দুই পুত্র হয়। তাজ খাঁর অন্য নাম এক্তিয়ার খাঁ, তিনি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট হন এবং সম্মানিত বলিয়া তাঁহার মসনদ-আলি বা মসন্দরী এই সাধারণ খেতাব ছিল। ভীমসিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কর্মচারীর চক্রান্তে সেকন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৫৫৪ খ্রিঃ অঃ); তাজ খাঁ সাধু পুরুষ, তিনি যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁহার অনুরক্ত ভ্রাতা সেকন্দরের বলগৌরবেই তাঁহার জমিদারীর বহুল বৃদ্ধি হইয়াছিল। এখন সেই বীর ভ্রাতার মৃত্যুর পর, তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি নিজে কবরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন মসজিদ আছে বলিয়াছি, উহার ফটো আমি পাইয়াছি এবং তাহার শিলালিপিও পাঠোদ্ধার করিয়াছি। শিলালিপি হইতে জানা যায়, দাউদ খাঁর পুত্র এক্তিয়ার খাঁ কর্তৃক এই মসজিদ নির্মিত। সুতরাং ঈসা খাঁ কর্তৃক এই মসজিদ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ চলিতেছে, তাহা সত্য নহে। ভীমসিংহ মহাপাত্র, তাজ খাঁ বা এক্তিয়ার খাঁ দেওয়ান ছিলেন। দেউল বাড় বা বাহিরিয়ামুটার উক্ত

ভীম সিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও মন্দির আছে। ভীম সিংহের উদ্যোগে তাজ খাঁর পুত্র বাহাদুর খাঁ রাজতক্তে বসেন। সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ভীম সিংহের মৃত্যুর পর কৃষ্ণপাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাজ খাঁর জামাতা জৈল খাঁর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বাহাদুরকে দূরীভূত করেন। জৈল খাঁ ১৫৭৩ খ্রিঃ অঃ পর্যন্ত ও পরে বাহাদুর পুনরায় ১৫৮৩ খ্রিঃ পর্যন্ত শাসন করেন। সেই সময়ে উক্ত কৃষ্ণপাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক হিজলী রাজ্য প্রধানত জালামুটা ও মাজনামুটা এই দুই সম্পত্তিতে বিভক্ত করিয়া নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহার পর আর হিজলীর বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস জানা যায় না।"

১৮১২ খ্রিস্টাব্দে হিজলীর কালেকটর ক্রোমলীন হিজলীর ইতিহাস সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখে রেভেনিউ বোর্ডের নিকট পাঠান। তিনি হিজলীর খাদিমের নিকট থেকে এই বিবরণ সংগ্রহ করেন। এই বিবরণ নিম্নরূপঃ[৩৯]

"হিজলীতে মসনদই-আলা শাহ অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সিকন্দর পালোয়ান বিলায়তী[৪০] ৯১২ ও ৯৫২ সালের (খ্রিস্টাব্দে ১৫০৫ ও ১৫৪৫) মধ্যবর্তী সময়ে সমগ্র হিজলী জিলা বিজিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতাকে রাজ পদে অভিষিক্ত করেন। কারণ তিনি ঈশ্বর পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, যুদ্ধ বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল না। তাঁহার পুত্র বাহাদুর খাঁ রাজশক্তির সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্বক বিলায়তী ৯৬৩ সালে (১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে) এই জিলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ভীমসেন মহাপাত্র নামক তাঁহার এক দেওয়ান ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার সময় হইতে এই কার্য করিতেন। এই ব্যক্তির কৃষ্ণপাণ্ডা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ পাচক এবং ঈশ্বরী পট্টনায়ক নামক জনৈক সরকার ছিল। ভীমসেন মহাপাত্র বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সমুদয় পরিবার বর্গের সহিত বাহিরিমুঠার একটি পুষ্করিণীতে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন বলিয়া কথিত আছে। তাঁহার মৃত্যুর পর এই কৃষ্ণপাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক মসনদ আলীর জামাতার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজার নিকট বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করেন। বাহাদুর এই সূত্রে বিলায়তী ৯৭০ সালে (১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে) কারারুদ্ধ হইলে জাইল খাঁ হিজলীর আধিপত্য লাভ করেন। কিন্তু বাহাদুর কারামুক্ত হইয়া স্ব ক্ষমতা পুনরুদ্ধার পূর্বক বিলায়তী ৯৮০ সালে (১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে) জাইলকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। ৯৯০ সালে (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে) বাহাদুরের মৃত্যু হইলে কৃষ্ণপাণ্ডা ও ঈশ্বরী পট্টনায়ক স্ব স্ব প্রভাবে রাজার নিকট কতকগুলি পরগণার জমিদারী লাভ করেন। এইগুলি বর্তমান জলামুঠা ও মাজনামুঠার জমিদারীভুক্ত।"

"হিজলীর মসনদ-ই-আলা" গ্রন্থের লেখক মহেন্দ্র করণ হিজলীর মসজিদের খাদিমের বাড়ি থেকে একখানি ফার্সি পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই পুস্তকের লেখক শয়খ বিসমিল্লাহ্ সাহেব, সাং সরো, জেলা বালেশ্বর। অনুলিপি লেখকের নাম পাহলোয়ান আলী, সাং কসবা, পরগণা অমর্শি, মেদিনীপুর। বিসমিল্লাহ সাহেব কাঁথির মুনশী নাসির উল্লাহ ও দারিয়াপুরের শয়খ মুহাম্মদ দায়েমের নিকট থেকে হিজলীর মসনদ-ই-আলার একখানি ফার্সি ইতিহাস পান, ঐ ফার্সি পুস্তকের সাহায্যে তিনি স্বীয় পুস্তকখানি লিখেন। পুস্তকখানি ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১৫টি করে পংক্তি আছে। মহেন্দ্র করণ এই পুস্তকের সাহায্যে যে বিবরণ দেন তার সারাংশ নিম্নরূপঃ[৪১]

Edited by Ripon Sarkar

বাংলার সুলতান হোসেন শাহের সময়ে (সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) উড়িষ্যার সীমায় সমুদ্র উপকূলে চণ্ডীভেটী (চণ্ডীর ভিটা, কাঁথির নিকটে) গ্রামে মনসুর ভূঁঞা নামে ক্ষমতাবান একজন লোক বাস করত। তার দুই পুত্র ছিল— জামাল ও রহমত। জামাল বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু রহমত ছিল ঠিক উল্টো, সে খেলাধুলা, কুস্তি, শিকার ও আমোদ প্রমোদ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। জামাল সুযোগ বুঝে রহমতকে হত্যা করে সমুদয় বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করার মতলব করে, কিন্তু জামালের স্ত্রী রহমতকে সতর্ক করে দিলে, রহমত পালিয়ে সমুদ্রের ধারে ধীবর পল্লীতে আশ্রয় নেয়। রহমত সেখানে ধীবরদের সংঘবদ্ধ করে এবং তাদের সাহায্যে একটি রাজ্য গঠন করে ও দুর্গ নির্মাণ করে। ভীমসেন মহাপাত্র তার কর্মচারী নিযুক্ত হয়। রহমত ক্রমে ক্রমে জেলমাই, পটাশপুরের কিছু অংশ, অমর্শি, ভূঁঞামুঠা, তজামুঠা ও জলামুঠা হস্তগত করে। রহমতের গঠিত রাজ্যে প্রচুর হিজল গাছ ছিল বলে তার রাজ্যের নাম হয় হিজলী। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে রহমত উড়িষ্যার মোগল সুবাদার বাকের খানের নিকট থেকে জমিদারীর সনদ ও ইখতিয়ার খান উপাধি লাভ করেন। ইখতিয়ার খানের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দাউদ খান হিজলীর জমিদারী লাভ করে। দাউদ খানের কয়েকজন পুত্র ছিল; এদের মধ্যে এক স্ত্রীর গর্ভের তাজ খান ও সিকান্দর খান এবং অন্য স্ত্রীর গর্ভে রসুল খান ও দরিয়া খান সহ মোট চার ভাই ছিল। দাউদ প্রত্যেক ছেলেকে জমিদারীর অংশ ভাগ করে দেয় কিন্তু সকলকে জ্যেষ্ঠ ভাই তাজ খানের অনুগত থাকতে উপদেশ দেয়। দাউদের মৃত্যুর পরে তাজ খান পিতৃ সিংহাসন লাভ করে। এই তাজ খান মসনদ-ই-আলা নামে পরিচিত। একবার তাজ খান কটকে গিয়ে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার সময় কতলু লোহানীর মাতা শাহী বেগমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। শাহী বেগম অত্যন্ত দীন দরিদ্রভাবে জীবন যাপন করছিলেন। তাজ খান তাঁকে আজীবন প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত হয়ে হিজলী নিয়ে আসে এবং স্বীয় পরিবারবর্গকে আদব কায়দা শিক্ষা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করে। তাজ খানের ভাই সিকান্দর অত্যন্ত পরাক্রমশালী বীর ছিল এবং তাজ খান তাকে অত্যন্ত স্নেহ করত। তাজ খানের কর্মচারীবৃন্দ, ভীম সেন মহাপাত্র, দিবাকর পাত্র ইত্যাদি এবং তাজ খানের পত্নী, তাজ খানের ভগিনী এবং জামাতা জৈন খান এতে সিকান্দরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তারা সকলে ষড়যন্ত্র করে সিকান্দরকে হত্যা করে। তাজ খান ভাই-এর মৃত্যুতে শোকাভিভূত হয়ে স্বীয় পুত্র বাহাদুরের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে নিজে সূফীবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সংসার ত্যাগ করেন। বাহাদুর ঢাকায় গিয়ে শাহ সুজার সঙ্গে অবস্থান করেন এবং আওরঙ্গজেবের হাতে সুজার পরাজয় ও পলায়ন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এবং বাহাদুর খানের অনুপস্থিতিতে হিজলী দিবাকর পাত্র ও দারুকালাসের হাতে থেকে যায়।

সতীশচন্দ্র মিত্র এবং মহেন্দ্র করণ বোধ হয় একই ফার্সি পুস্তক বা একই পুস্তকের বিভিন্ন কপির ভিত্তিতে তাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তবে সতীশচন্দ্রের বিবরণ অনেক সংক্ষেপ। সে যাহোক উপরোক্ত কাহিনীতে ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে যে কল্পনা বা অলীক কাহিনী মিশ্রিত হয়েছে তার প্রমাণ কাহিনীর ভিতরেই আছে। প্রথমত হোসেন শাহের সময়ের মনসুর ভূঁঞার পুত্র রহমত (ইখতিয়ার খান) এর পক্ষে শাহজাহানের সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। কারণ উভয়ের ব্যবধান একশ

Eidited by Ripon Sarkar

বৎসরেরও কিছু বেশি। কাহিনীতে এক স্থানে বলা হয়েছে যে, হোসেন শাহের সময়ে মনসুর ভূঁঞা চণ্ডীভেটী গ্রামে বসবাস করতেন। অন্যস্থানে বলা হয়েছে যে, রহমত (ইখতিয়ার খান) শাহজাহানের সময়ে উড়িষ্যার সুবাদার বাকের খানের নিকট থেকে সনদ ও উপাধি লাভ করেন। উভয় বক্তব্য সত্য হতে পারে না। যে কোন একটি সত্য। দ্বিতীয়তঃ বাকের খান ও শাহ তজা প্রায় সমসাময়িক, কিন্তু রহমত (ইখতিয়ার খান) ও বাহাদুর খানের মধ্যে চার পুরুষের ব্যবধান, অথচ উপরোক্ত কাহিনীতে রহমত থেকে বাহাদুর পর্যন্ত চারপুরুষকে বাকের খান ও শাহ তজার এক পুরুষের মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, উপরোক্ত কাহিনীতে ধারাবাহিকতা নেই, ঐতিহাসিক তথ্য যা আছে, তা কল্পকাহিনীর মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে।

সৌভাগ্যবশত হিজলীতে ইখতিয়ার খানের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শিলালিপিখানি মসনদ-ই-আলার মাযারে প্রাপ্ত। মহেন্দ্র করণ শিলালিপি পাঠ করে বলেছেন যে এটা মুনওওর খানের পুত্র ইখতিয়ার খান ৯৪৩ হিজরী বা ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে জারি করেন। আমি শিলালিপির আলোকচিত্র পরীক্ষা করেছি।[৪২] তারিখে শতকের সংখ্যা স্পষ্ট ৯০০ (তিছয়া মিআতিন), দশকের সংখ্যা ৪০ (আরবাঈন) কোন মতে পড়া যায়, কিন্তু এককের সংখ্যা অস্পষ্ট। সুতরাং তারিখ ৯৪১ থেকে ৯৪৯ হিজরীর যে কোন বৎসর হতে পারে। ইখতিয়ার খানের নাম স্পষ্টভাবে পড়া যায় কিন্তু তার পিতার নাম মুনওওর খান স্পষ্টভাবে পড়া যায় না। ফার্সি পুস্তকে ইখতিয়ার খানের পিতার নাম মনসুর। সুতরাং এই নামটি মনসুরও হতে পারে। সে যাহোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শিলালিপিখানি ইখতিয়ার খান কর্তৃক ৯৪১ থেকে ৯৪৯ হিজরীর মধ্যে উৎকীর্ণ। মহেন্দ্র করণের পাঠ মেনে নিলে ৯৪৩ হিজরী বা ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দ। ঐ সালে সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং এই শিলালিপি ফার্সি পুস্তকে প্রাপ্ত হিজলীর জমিদারী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জোরালোভাবে সমর্থন করে অর্থাৎ আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, হিজলি জমিদারী প্রথমে বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মহেন্দ্র করণ এই শিলালিপি প্রকাশ করলেও এবং শিলালিপির পাঠ সঠিকভাবে দিলেও কোন অজ্ঞাত কারণে হিজলীর জমিদারী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস পুনর্গঠনের সময় তিনি এই শিলালিপি ব্যবহার করেননি, শিলালিপির উল্লেখও করেননি। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, শাহজাহানের সময় থেকে হিজলীর জমিদারীর উৎপত্তি, ফার্সি পুস্তকে যে বলা হয়েছে, উড়িষ্যার সুবাদার বাকের খানের নিকট থেকে ইখতিয়ার খান সনদ ও উপাধি প্রাপ্ত হন, এই কথাটি তিনি অকাট্য সত্য রূপে মেনে নিয়েছেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে বাকের খান উড়িষ্যার সুবাদারী লাভ করেন। ফার্সি পুস্তকে আরও বলা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের হাতে শাহ তজার পরাজয়ের সময় বাহাদুর খান ঢাকায় ছিলেন। এই দুটি কথা, অর্থাৎ বাকের খানের নিকট থেকে ইখতিয়ার খানের সনদ ও উপাধি প্রাপ্তি এবং তজার পরাজয়ের সময় হিজলীর বাহাদুর খানের ঢাকায় উপস্থিতি, মহেন্দ্র বাবু অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন : ফলে তিনি তাঁর নিজের আবিষ্কৃত ৯৪৩ হিজরীর শিলালিপির সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য করেছেন।

মহেন্দ্র করণ আরও একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর পাঠ মতে হিজলীর মসজিদ ১০৫৮ হিজরী বা ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাজ খান নির্মাণ করেন : জরি

Edited by Ripon Sarkar

শিলালিপি বা তার আলোকচিত্র পরীক্ষা করতে পারিনি। মহেন্দ্র করণ মনে করেন যে, এই শিলালিপির তাজ খান ও তাজ খান মসনদ-ই-আলা এক ও অভিন্ন এবং তিনিই ছিলেন বাহাদুরের পিতা। সুতরাং সুবাদার বাকের খানের নিকট থেকে সনদ ও উপাধি প্রাপ্তি, ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে তাজ খানের শিলালিপি এবং শাহ শুজার পরাজয়ের সময় বাহাদুর খানের ঢাকায় উপস্থিতি, এই তিন সূত্র অবলম্বন করে মহেন্দ্র করণ হিজলীর জমিদারের নিম্নরূপ কালক্রম নির্মাণ করেছেনঃ[৪৩]

"তাজ খাঁ মসনদ-ই- আলা বংশের পাঁচজন রাজা হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ্য সংস্থাপক ইখতিয়ার ও তৎপুত্র দাউদের পাঁচ মাস মাত্র রাজত্বাবসানে তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা সিংহাসনারূঢ় হন। ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বীয় পুত্র বাহাদুর খাঁকে রাজ্যভার ন্যস্ত করেন। বাহাদুর গৃহচক্রান্তে রাজস্বের দায়ে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হইলে তাজ খাঁর জামাতা জৈন খাঁ হিজলীর রাজত্বভার গ্রহণ করেন। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় বাহাদুর স্ব ক্ষমতা লাভ করেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে মুঘল কর্তৃক বাহাদুরের পরাজয়ের পর এই বংশের গৌরব সূর্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়াছিল। ইহার পর এই বংশীয় কেহ হিজলীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন নাই।"

আগেই বলা হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য মহেন্দ্র বাবু স্বীয় আবিষ্কৃত ইখতিয়ার খানের শিলালিপি অগ্রাহ্য করেছেন। পাঁচ মাস সময়ের মধ্যে পিতা-পুত্র (ইখতিয়ার ও দাউদ) দুই জনের জীবনাবসান মহেন্দ্র বাবুর কল্পনার ফসল, এর স্বপক্ষে কোন তথ্যগত সমর্থন নেই। আবুল ফজলের আকবরনামায় হিজলীর জমিদারের নাম ফতেহ খান। মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত আফগান সেনানায়কেরা হিজলীর ফতেহ খানের নিকট আশ্রয় লাভ করেন।[৪৪] মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী এবং আবদুল লতীফের বিবরণে হিজলীর ভূঁঞা জমিদারের উল্লেখ আছে। আবদুল লতীফের বিবরণে বলা হয়েছে যে, ইসলাম খান চিশতী ৩০শে মার্চ, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে রানা তাজপুর পৌঁছুলে হিজলীর জমিদার সলীম খান কর্তৃক প্রেরিত উপাহারাদি পান। মিরযা নাথন বলেন যে, সুবাদার ইসলাম খান বীরভূমের বীর হাম্বির, পাচেটের শামস খান ও হিজরির সলীম খানের বিরুদ্ধে শেখ কামালকে পাঠান। সলীম খানও শেখ কামালের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বাহরিস্তানে সুবাদার কাসিম খান ও ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সময়ে বাহাদুর খানকে হিজলীর জমিদার রূপে উল্লেখ আছে। শাহ শুজার সময় পর্যন্ত পরবর্তী মোগল ইতিহাসগুলিতেও বাহাদুর খানকে হিজলীর জমিদার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এই সূত্রগুলিতে অন্তত ১৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে থেকে ফতেহ খান, ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে সলীম খান এবং অন্তত, ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাহাদুর খান হিজলীর জমিদার ছিলেন। উপরে উল্লেখিত এবং সতীশচন্দ্র মিত্র ও মহেন্দ্র করণ কর্তৃক আবিষ্কৃত ফার্সি পুস্তকে ফতেহ খান বা সলীম খানের নাম পাওয়া যায় না, বাহাদুর খানের নাম আছে, কিন্তু তাঁকে তাজ খানের পুত্র রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বাহরিস্তানে বাহাদুর খান সলীম খানের ভাইপো, এখানে তাজ খানের কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং আবদুল লতীফের বিবরণ এবং বাহরিস্তানের সঙ্গে ফার্সি পুস্তকের গরমিল রয়েছে। মহেন্দ্র করণ বাহরিস্তানের সাক্ষ্য গ্রহণ করে বলেছেন যে, সলীম খান ও বাহাদুর খান এক বংশের লোক এই বংশের পতনের পরে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে তাজ খানের বংশের উত্থান হয়।[৪৫] এক বংশের পতনের

Edited by Ripon Sarkar

পরে অন্য বংশের উত্থান হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এই মত গ্রহণ করার প্রধান বাধা এই যে, বাহরিস্তান এবং পরবর্তী মোগল ইতিহাসগুলিতে সলীম খানের পর থেকে শুধু বাহাদুর খানের নাম পাওয়া যায়, ফার্সি পুস্তকে উল্লেখিত অন্য কোন ভুঁঞা বা রাজার নাম নেই।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, হিজলীর জমিদারদের বা ভূঁঞাদের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া গেল না। ইখতিয়ার খানের শিলালিপির সাক্ষ্য মত আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, হিজলীর এই বংশের ভুঁঞা জমিদারেরা হোসেন শাহী আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়। আবুল ফজল, আবদুল লতীফ এবং মিরযা নাথন প্রমুখ সমসাময়িক ও প্রামাণ্য ঐতিহাসিকদের সাক্ষ্য মত আরও বলা যায় যে, আকবরের আমলে ফতেহ খান, জাহাঙ্গীরের আমলে প্রথমে সলীম খান ও পরে তাঁর ভাইপো বাহাদুর খান হিজলীর জমিদার ছিলেন। ফতেহ খানের সঙ্গে সলীম খানের সম্পর্ক কি ছিল জানা যাচ্ছে না, হয়ত সলীম খান ফতেহ খানের ভাই বা ছেলে হবে। যদি সলীম খান ফতেহ খানের ভাই হয়, তাহলে বাহাদুর খান ফতেহ খানের ছেলে হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

চন্দ্রকোনার বীরভান এবং বরদা ঝকরার দলপত

মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত আরও দুজন ভূঁঞার নাম পাওয়া যায়। বীরভান বা চন্দ্রভান ছিলেন চন্দ্রকোনার জমিদার আর দলপত ছিলেন বরদা বা ঝারগ্রামের জমিদার। তাঁরাও সুযোগ বুঝে পার্শ্ববর্তী জমিদারের সঙ্গে মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতেন।[৪৬]

যশোহরের শ্রীহরি ও তৎপুত্র প্রতাপাদিত্য

এই বংশের উত্থান দাউদ কররানীর পতনের পরে শুরু হয়। লোদী খান নামে দাউদ কররানীর একজন অতি বিশ্বস্ত এবং দক্ষ মন্ত্রী ছিলেন। মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় লোদী খান অত্যন্ত বিজ্ঞের পরিচয় দেন। কিন্তু ক্রমে দাউদ কররানীর দরবারে লোদী খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠে। অন্যান্যদের মধ্যে কতলু খান এবং শ্রীহরি নামক দাউদ কররানীর দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাও লোদী খানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। দাউদ কররানী নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে লোদী খানকে হত্যা করেন এবং কতলু খান ও শ্রী হরিকে যথাক্রমে উকীল ও উজীর পদে নিযুক্ত করেন। তিনি শ্রীহরিকে বিক্রমাদিত্য উপাধিও দান করেন। শ্রীহরির ভাই জানকী বল্লভও বসন্ত রায় উপাধি লাভ করেন। কিন্তু রাজমহলের যুদ্ধের আগে কতলু খান ও শ্রীহরি বুঝতে পারেন যে দাউদের পতন অত্যাসন্ন। তারা মোগল সেনাপতি খান জাহানের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করে। খান জাহানও দূত মারফৎ জানান যে যে কেউ দাউদের গোপন দলীলপত্র তাঁর দহস্তগত করলে তিনি তাকে পুরস্কৃত করবেন। কতলু খান, শ্রীহরি এবং বসন্ত রায় ইহার সুযোগ গ্রহণ করেন। দাউদের ভৃত্য রাজমহলের বাজারে শ্রীহরির বিশ্বাসঘাতকতার কানাঘুষা শুনে দাউদকে এই ব্যাপারে অবহিত করে। কিন্তু দাউদ এতই নির্বোধ ছিলেন যে তিনি তাহা বিশ্বাস না করে বরং বলেন যে এইরূপ হলে শ্রীহরি নিশ্চয়ই তাঁকে তা বলতো। ভৃত্য দাউদকে বলে যে মহামান্য সুলতান যেরূপ বলেছেন, ঘটনা সেইরূপই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখন সময়টা বিশ্বাসঘাতকদের

Edited by Ripon Sarkar

অনুকূলে। তাছাড়া শ্রীহরিরা হিন্দু এবং তারা কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। তারা যদি স্বাধানি হতে পারে সুলতানের প্রতি অনুগত হয়ে তাদের লাভ কি? যাহোক শ্রীহরি ও কতলু খান গোপন দলীলপত্র মোগল সেনাপতি খান জাহানের হস্তগত করেন। দাউদের পতনের আগেই স্থির হয় যে, কতলু খানকে উড়িষ্যায় এবং শ্রহীরি ও বসন্ত রায়কে যশোরের জমিদারীতে বহাল রাখা হবে। শ্রীহরি এবং বসন্ত রায় দাউদের অর্থ-সম্পদের রক্ষক ছিলেন। দাউদের পতনের আগেই তারা এই অর্থ-সম্পদ এবং নিজের অর্থ-সম্পদ নিরাপদে যশোরে পাঠিয়ে দেন। ফলে রাজমহলের যুদ্ধে কতলু খান ও শ্রীহরি এবং তাঁদের অনুচরবর্গ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। ফলে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী দাউদের মৃত্যুর পরে কতলু খান ও শ্রীহরি যথাক্রমে উড়িষ্যা এবং যশোরের জমিদারী লাভ করেন।[৪৭]

অতএব শ্রীহরি এবং তৎপুত্র প্রতাপাদিত্যের যশোর রাজ দাউদ কররানীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার ফসল। আকবরের সময়ে শ্রীহরি এবং জাহাঙ্গীরের সময়ে প্রতাপাদিত্য যশোরের অধিপতি ছিলেন। আকবরের সময়ে মোগলরা এখনও যশোর আক্রমণ করেনি, জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খান চিশতী রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রার দিনে প্রতাপাদিত্যের ছেলে ও দূত উপহারাদি সহ সুবাদারের সঙ্গে দেখা করে আনুগত্যের প্রমাণ দেন। এর পরে ঘোড়াঘাটের পথে বজ্রপুরে প্রতাপাদিত্য নিজে গিয়ে সুবাদার ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[৪৮]

আগে বলা হয়েছে যে, শ্রীহরি গোপন দলীলপত্র মোগলদের নিকট দিয়ে মোগলদের সঙ্গে আঁতাত করেন। এই গোপন দলীলপত্রগুলি কি এখন দেখা যাক। শ্রীহরির পিতৃব্য পুত্র বসন্ত রায়ও দাউদ কররানীর অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহরি ছিলেন মন্ত্রী এবং বসন্ত রায় ছিলেন খালিসা বিভাগের কর্তা বা রাজস্ব সচিব। আবার বসন্ত রায়ের পিতৃব্য শিবানন্দ ছিলেন প্রধান কানুনগো। সুতরাং জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত সকল দলীলপত্র তাঁদের হাতে গচ্ছিত ছিল।[৪৯] এই জমি সংক্রান্ত দলীলপত্রগুলি দাউদের মৃত্যুর পূর্বেই মোগলরা শ্রীহরি, বসন্ত রায় এবং শিবানন্দের নিকট থেকে হস্তগত করে। রাজা তোডর মল্ল বাংলার ভূমি বন্দোবস্তে এই দলীলপত্রের সাহায্য নেন। আইন-ই-আকবরীতে বাংলার ভূমি রাজস্বের পূর্ণ বিবরণ আছে। এই বিবরণে সারা বাংলাকে ১৯টি সরকারে এবং প্রত্যেক সরকারকে কয়েকটি পরগণা বা মহালে বিভক্ত করা হয়েছে। আবার প্রত্যেক পরগণা বা মহালের রাজস্বের হিসাব ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এই ভূমি ব্যবস্থা তোডর মল্লের ভূমি ব্যবস্থা বা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। আমরা জানি এবং এই অধ্যায় ও পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় প্রকাশ পাবে যে, তোডর মল্লের সময় বা আকবরের সময় সারা বাংলা বিজিত হয়নি, চট্টগ্রাম মোগল কর্তৃক বিজিত হয় আরও ৮০ বৎসর পরে। অথচ চট্টগ্রামসহ সারা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা তোডর মল্লের বন্দোবস্তে রয়েছে যা আইন-ই-আকবরীতে হুবহু উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তোডর মল্ল এই ভূমি বন্দোবস্ত কিভাবে করলেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে শ্রীহরি, বসন্ত রায় ও শিবানন্দের বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে। তারাই ভূমি ও রাজস্বের সম্পূর্ণ হিসাব, দলীলপত্র মোগলদের নিকট সমর্পণ করে।

Edited by Ripon Sarkar

মাসুম খান কাবুলী ও তৎপুত্র মিরযা মোমিন

মাসুদ খান কাবুলী ছিলেন আকবরের সেনাপতি। মাসুম খানের পূর্ব পরিচয় সম্পর্কে হেনরি ব্লখম্যান বলেনঃ[৫০]

> The chief rebel was Masum Khan-i-Kabuli.... He was a Turbati Sayyid. His uncle Mirza Aziz had been wazir under Humayun, and Masum himself was the foster-brother (Koka) of Mirza Muhammad Hakim, Akbar's brother. Having been involved in quarrels with Khwaja Hasan Naqshbandi who had married the widow of Mir Shah Abul-Maali, Masum in the 20th year, went to Akbar and was made a commander of five hundred. He distinguished himself in the war with the Afghans, and was wounded in a fight with Kala Pahar. For his bravery he was made a commander of one thousand. In the 24th year, he received Orissa as tuyul, when Mansur and Muzaffar's strictness drove him into rebellion.

১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে আকবর দীন-ই-এলাহী নামে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। প্রায় একই সময়ে আকবরের অর্থমন্ত্রী ঘোড়ায় দাগ দেয়ার নীতি (branding regulation) প্রবর্তন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানরত সৈন্যদের ভাতা কমিয়ে দেন। ফলে যুদ্ধরত সৈনিকদের এবং সেনাপতিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়, এই অসন্তোষ বাংলা বিহারে বিদ্রোহের রূপ নেয়। বিদ্রোহীরা আকবরের ভাই কাবুলের অধিপতি মিরযা হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং তাঁকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করে। মাসুম খান কাবুলী ছিলেন এই বিদ্রোহের একজন নেতা। বিদ্রোহীদের দমন করা হয় কিন্তু মাসুম খান কাবুলী আর কখনও আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ৯৮৯ হিজরীতে (১৫৮১-৮২ খ্রিঃ) পাবনার চাটমোহরে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের শিলালিপিতে তিনি সুলতান-উল-আযম উমদাত-উস-সাদাত (বড় সুলতান এবং সৈয়দদের নেতা) আবুল ফতহ্ মুহাম্মদ মাসুদ খান উপাধি নেন।[৫১] তিনি যে সৈয়দ বংশীয় ছিলেন তা শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত। মাসুম খান কাবুলী ঈসা খান মসনদ-ই-আলার সঙ্গে যোগ দিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং ১০০৭ হিজরী বা ১৫৯৮-৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন (স্মরণীয় যে ঈসা খানও একই সালে পরলোকগমন করেন) মাসুম খানের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র মিরযা মোমিন মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যান। জাহাঙ্গীরের সময় দেখা যায় যে, মিরযা মোমিন ঈসা খানের ছেলে মুসা খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

চাটমোহর ছিল মাসুম খান কাবুলীর রাজধানী, তাঁর কর্মক্ষেত্রও ছিল চাটমোহরকে কেন্দ্র করেই। দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত সাতটি কামানের একটিতে এইচ. ই. ষ্ট্যাপলটন সরকার মাবুদ খান পাঠ করেন।[৫২] কিন্তু ভট্টশালী বলেন যে, সরকার মাসুম খানই শুদ্ধ পাঠ হবে।[৫৩] অতএব ভট্টশালী মনে করেন যে, ঐ কামানটি মাসুম খান কাবুলীর সম্পদ এবং তিনিই এটা তৈরি করান। সম্ভবত মাসুম খান মোগল সেনাপতি থাকাকালে পাবনার চাটমোহর কেন্দ্রী এলাকায় জাগীর লাভ করেন এবং তাঁর জাগীরেই তিনি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন।

Edited by Ripon Sarkar

খান-ই-আলম বাহবুদীর পুত্র দরিয়া খান

বাহারিস্তানে মাসুম খান কাবুলীর জমিদারীর পাশাপাশি আরও কয়েকটি জমিদারীর উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে দরিয়া খানের নাম প্রথম, তিনি খান-ই-আলম বাহবুদীর পুত্র ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে মনে হয়, তাঁর জমিদারী পাবনা জেলাতেই ছিল। তিনি মুসা খানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে মোগলদের প্রতিরোধ করেন।

খালসীর জমিদার মধু রায় বা মাধব রায়

মেজর রেনেলের ১৬নং মানচিত্রে খালসীর অবস্থান দেখা যায়। রেনেলের সময়ে জাফরগঞ্জ নামে একটি স্থান বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। পদ্মা থেকে যেখানে ধলেশ্বরীর উৎপত্তি সেখানেই জাফরগঞ্জ দেখান হয়েছে। নদীর গতির অনেক পরিবর্তনের পরেও জাফরগঞ্জ নামের অস্তিত্ব টিকে আছে, তবে প্রাচীন জাফরগঞ্জ আছে কিনা, না কি নতুন স্থানের নাম জাফরগঞ্জ দেয়া হয়েছে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। ১৮৫৭ সালের প্রধান সার্কিট মানচিত্রে মানিকগঞ্জের চাঁদপ্রতাপ পরগণার পশ্চিমে খালসী চিহ্নিত করা হয়েছে এবং খালসীর দক্ষিণ পশ্চিমে সিন্দুরী পরগণার অবস্থান দেখান হয়েছে। এই খালসী পরগণাই ছিল মধু রায়ের জমিদারী। মধু রায়ও ছিলেন মুসা খানের মিত্র।

শাহজাদপুরের রাজা রায়

শাহজাদপুর বৃহত্তর পাবনা জেলার একটি বিখ্যাত স্থান এবং এটা বিখ্যাত সুফী মখদুম শাহ দৌলত শহীদের স্মৃতি বিজড়িত। এখানে রাজা রায়ের জমিদারী ছিল। তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরে মোগলদের পক্ষে যোগ দেন। তাঁর সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

চাঁদ প্রতাপের বিনোদ রায়

মানিকগঞ্জের উত্তর পার্শ্বে চাঁদ প্রতাপ একটি বিশাল পরগণা। এটা ধলেশ্বরী নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। সঞ্জয় হাজারী ছিলেন চাঁদ প্রতাপের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। সঞ্জয়ের দুই পুত্র ছিল—পার্বব এবং শ্রীচন্দ্র। আবার শ্রীচন্দ্রের দুই পুত্র—মদন ও কমল। বাহরিস্তানে চাঁদ প্রতাপের জমিদারের নাম দেয়া হয়েছে নাবোদ রায়। নাবোদের কোন অর্থ হয় না। এটা সংস্কৃত শব্দও নয়। তাই স্যার যদুনাথ এটা শুদ্ধ করে বিনোদ করেছেন।[৫৪] ভট্টশালী মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে নামটি মদন রায় হবে। কারণ চাঁদ প্রতাপের জমিদারদের বংশ তালিকায় নাবোদ বা বিনোদ নামের কাউকে পাওয়া যায় না।[৫৫] চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ বা মদন রায়ও মুসা খানের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে মোগলদের প্রতিরোধ করেন।

ফতহাবাদের মজলিশ কুতুব

ফতহাবাদ আধুনিক ফরিদপুর। আকবরের সময় মুরাদ খান ফতহাবাদের জাগীরদার ছিলেন। তিনি আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। একদিন ভূষণার জমিদার মুকুন্দরায় মুরাদ খানের পুত্রদের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে নিমন্ত্রণ

Edited by Ripon Sarkar

করেন এবং সবাইকে হত্যা করেন। ফলে স্বল্প সময়ের জন্য ভূষণার জমিদার মুকুন্দরায় ফতহাবাদের জমিদারী দখল করেন।[৫৬] কিন্তু বাহরিস্তানে দেখা যায়, জাহাঙ্গীরের সময়ে মজলিশ কুতুব ফতহাবাদের জমিদার ছিলেন। কখন কিভাবে মজলিশ কুতুব ফতহাবাদের জমিদারী লাভ করেন তা জানা যায় না। মজলিশ কুতুব মুসা খানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। ইসলাম খান চিশতী মজলিশ কুতুবের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে মুসা খান নৌ-বাহিনী পাঠিয়ে মজলিশ কুতুবকে সাহায্য করেন।

ভূষণার মুকুন্দরায় ও তৎপুত্র শত্রুজিত

উপরে বলা হয়েছে যে, ভূষণার জমিদার ছিলেন মুকুন্দরায়। তিনি আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে মুকুন্দরায়ের পুত্র শত্রুজিত ভূষণার জমিদার ছিলেন। শত্রুজিত প্রথম চোটেই মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং বরাবর মোগলদের অনুগত ছিলেন। জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের সময়ে শত্রুজিত মোগল বাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীনতাকামী ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে এবং সীমান্তবর্তী কামরূপ ও আসামের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

বাকলার রাজা কন্দর্প নারায়ণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র

জেমস ওয়াইজ চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি, চন্দ্রদ্বীপের পূর্বের রাজাদের পরিচয় এবং বংশের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। কিছু জনকাহিনী এবং কিছু তথ্য সমন্বয়ে এই ইতিহাস পুনর্গঠিত।[৫৭] ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বাকলায় জলোচ্ছ্বাস হয়। ঐ সময়ে রাজা নৌকায় আশ্রয় নেন এবং রাজার ছেলে মন্দিরে আশ্রয় নেন। রাজার নাম দেয়া হয়নি, কিন্তু রাজার ছেলের নাম দেয়া হয়েছে পরমানন্দ রায়। ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ ভ্রমণকারী রালফ্ ফিচ্ কন্দর্প নারায়ণকে চন্দ্রদ্বীপে দেখতে পান। রালফ ফিচের বিবরণ নিম্নরূপঃ

> From Chatigan in Bengal, I came to Bacola (Bakla) the king whereof is a Gentile, a man very well disposed, and delighteth much to shoot a gun. His country is very great and fruitful, and hath store of rice, much cotton cloth and cloth of silk. The houses be very fair and high builded, the streets large, the people naked, except a little cloth about their waist. The women wear great store of silver hoops about their necks and arms, and their legs are ringed about with silver and copper, and rings made of elephant's teeth.[৫৮]

জেমস ওয়াইজ কন্দর্প নারায়ণের একটি কামান দেখতে পান। তিনি কামানটির নিম্নরূপ বিবরণ দেনঃ

> The only memorial of this Bhuya is a brass gun, still preserved at Chandradip, with his name and that of the maker Rupiya Khan of Sripur engraved on the breech. This gun is $7^3/_4$ feet in length; $2^1/_4$ feet in girth at the breech; and $19^1/_2$ inches at the muzzle. Through the

Edited by Ripon Sarkar

trunnions, rings had been inserted by which the gun was fastened to the carriage.[৫৯]

কন্দর্প নারায়ণের মৃত্যুর পরে তাঁর অল্প বয়স্ক পুত্র রামচন্দ্র জমিদারী লাভ করেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময় তিনি ছিলেন বাকলার জমিদার। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করে ভুলুয়ার রাজা লক্ষণ মাণিক্যকে হত্যা করেন।[৬০]

ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য

বর্তমান নোয়াখালীর প্রাচীন নাম ভুলুয়া। ভুলুয়া রাজ্য সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত ছিল। সুলতানী আমলে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বাংলার সুলতান, ত্রিপুরা এবং আরাকানের রাজাদের মধ্যে ত্রি-পক্ষীয় যুদ্ধ চলত। বাংলার সুলতানের চট্টগ্রাম যাওয়ার পথেই ছিল ভুলুয়া। ভুলুয়া রাজবংশের কয়েকজনের নাম পাওয়া যায়, যেমন, দুর্লভ নারায়ণ, লক্ষণ মাণিক্য, অনন্ত মাণিক্য এবং গন্ধর্ব নারায়ণ। এঁদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল ঠিক করে বলা যায় না। ভট্টশালী ত্রিপুরার ইতিহাস আলোচনা করে মনে করেন যে, লক্ষণ মাণিক্যের পরে অনন্ত মাণিক্য ভুলুয়ার জমিদারী লাভ করেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে বাকলার রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্যকে হত্যা করেন। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে, বাকলার রামচন্দ্র ইসলাম খান চিশতীর সময়ে পরাজিত হন। রামচন্দ্র কোন তারিখে লক্ষণ মাণিক্যকে হত্যা করেন তা সঠিক জানা যায় না। লক্ষণ মাণিক্যের পরবর্তী ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্য ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের হাতে পরাজিত হন। এই তারিখ বাহরিস্তান অনুসরণ করে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং লক্ষণ মাণিক্য আকবরের রাজত্বকাল থেকে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম অংশে জীবিত ছিলেন ধরে নেয়া যায়।

লক্ষণ মাণিক্য একজন বিদ্বান লোক ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁর কয়েকখানি নাটক পাওয়া যায়। ভট্টশালী বলেন:[৬১]

> He was an author of considerable repute, and wrote a number of Sanskrit dramas. Kailash Babu speaks of his drama Bikhyata-Vijaya. I obtained for the Dacca university a Ms. of another drama by Raghunath, court pandit of Lakshmana Manikya, called Kautuka-ratnakara. The Ms. is complete in 37 folia. (Dacca University Ms. S. No. 1871). I found another Ms. of this drama in the Tippera State Collection of Mss. There is a copy of the Ms. of Bikhyata-Vijaya, in the collection of the Asiatic Nociety of Bengal. In the "Report for the search of Sanskrit Manuscripts." 1895-1900 by M. M. Haraprasad Shastri, another drama by Lakshmana Manikya viz. Kubalayasva.—Charit is mentioned.

আগে বলা হয়েছে যে, লক্ষণ মাণিক্য বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিহত হন। কথিত আছে যে, লক্ষণ মাণিক্য এবং রামচন্দ্র একে অপরকে সুনজরে দেখতেন না। উভয়ের রাজ্যের সাধারণ সীমান্ত ছিল। মেঘনা নদীই উভয়ের রাজ্যের সীমারেখা। সেই কারণেই বোধ হয় তাঁদের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। তবুও একদিন অকস্মাৎ রামচন্দ্র যখন ভুলুয়ার

Edited by Ripon Sarkar

আসেন, লক্ষণ মাণিক্য তাঁর অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তাঁর নৌকায় যান। রামচন্দ্র লক্ষণ মাণিক্যের প্রতি সদ্ব্যবহার না করে তাঁকে কৌশলে বন্দী করেন এবং বাকলায় নিয়ে যান এবং সেখানে তাঁকে হত্যা করেন।[৬২]

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়

বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায় তাঁদের সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতাবান ও ঐশ্বর্যশালী ভূঁঞা-জমিদার ছিলেন। বিক্রমপুর একটি সমৃদ্ধশালী পরগণা। পদ্মার নিকটে এর অবস্থিতি। সেন রাজাদের রাজধানী এখানে ছিল। এখনও এখানে বল্লাল বাড়ি দেখান হয়। এখানে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল। চাঁদ রায় কেদার রায় দু ভাই, তাঁরা ছিলেন কায়স্থ। কথিত আছে যে, আকবরের রাজত্বের প্রায় দেড়শ বৎসর পূর্বে কর্ণাট থেকে নিম রায় নামক একজন লোক এসে বিক্রমপুরের আরা ফুলবাড়িয়ায় বসবাস শুরু করে। নিম রায়ের উত্তর পুরুষদের নাম-ধাম বা কালক্রম জানা যায় না, তবে আফগান আমলে চাঁদ রায় ও কেদার রায় দু ভাই বেশ পরাক্রমশালী হয়ে উঠেন এবং বিস্তীর্ণ জমিদারীর মালিক হন।

কথিত আছে যে, খিজিরপুরের ঈসা খানের (ঈসা খান মসনদ-ই-আলা) সঙ্গে চাঁদ রায় কেদার রায়ের বিরোধ ছিল। একবার ঈসা খান বিক্রমপুর আক্রমণ করে চাঁদ রায়ের একমাত্র মেয়ে সোনাই (সোনামণি) কে জোর পূর্বক ধরে নিয়ে আসেন এবং বিয়ে করেন। খিজিরপুরের অদূরে লক্ষ্যা নদীর অপর পারে সোনাকান্দা নামে একটি দুর্গ আছে। কথিত আছে, ঈসা খান সোনাইকে ঐ দুর্গে রাখেন; এখানে সোনাই কাঁদতেন বলে দুর্গের নাম হয় সোনাকান্দা। চাঁদ রায় কেদার রায়ের পরিবার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। তাঁদের নির্মিত রাজবাড়ি মঠটি অত্যন্ত বিখ্যাত। জেমস ওয়াইজ এই মঠের নিম্নরূপ বিবরণ দেন:[৬৩]

There is the lofty Rajbari Math, which is a prominent landmark for miles around, on the left bank of the river Padma. It stands at a short distance from where the great city of Sripur formerly was. This Math is a four sided tower, twenty nine feet square at the base. In the first thirty feet, the walls are ornamented with various patterned bricks in imitation of flowers. Tho middle of each face is raised and ribbed. The walls are eleven feet thick, and the bricks used in their construction are of peculiar shape. They are larger than those found in Muhammadan buildings of the same age, being eight inches square, and one and a half thick. On the summit is a large spherical mass, round which severel picturesque pipal trees have entwined their roots and are gradually destroying the stability of the spire. The Math was a shrine dedicated to Shiv; but as it is buried in the midst of dense jungle and marshes, it is rarely visited at the present day.

এই মঠ ছাড়াও একটি দীঘি আছে, এটা চাঁদ রায়ের এক দাসীর নামানুসারে "কেশব মা কা দীঘি" নামে পরিচিত। পদ্মার দক্ষিণে আরা ফুলবাড়িয়ায় চাঁদ রায়

Edited by Ripon Sarkar

কেদার রায়ের আবাস ভূমি ছিল। সেখানে একখণ্ড জমি এখনও কেদার বাড়ি নামে পরিচিত। সেখানে দু ভাইয়ের খননকৃত একটি দীঘিও আছে। চাঁদ রায় কেদার রায় সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। চাঁদ রায়ের বংশ লোপ পেয়েছে, এই পরিবার থেকে জমিদারী এক বৈদ্য পরিবারের অধিকারে যায় এবং তাঁরা বেশ কিছু দিন সমাজপতি ছিলেন। পরে রাজ বল্লভ সমাজপতি হন। কিন্তু এঁদের সকল কীর্তি পদ্মা ভাসিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে দেয়। ঊনবিংশ শতকের শেষে কেদার রায়ের বংশ মুন্সীগঞ্জের দক্ষিণে মূলচরে বর্তমান ছিল।

চাঁদ রায় কেদার রায় উভয়েই আকবরের সমসাময়িক ছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে তাঁদের জমিদারীর অবসান হয়। কিভাবে অবসান হয় সে সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর বিবরণ পাওয়া যায়। আকবরনামায় বলা হয় যে খাজা উসমান ও তাঁর আফগান সঙ্গীরা ভূষণায় চাঁদ রায়কে হত্যা করেন। এই সূত্রে আরও বলা হয় যে, কেদার রায় চাঁদ রায়ের পিতা। খাজা উসমান শীর্ষক আলোচনায় আমরা বলেছি যে চাঁদ রায় কেদার রায় ভূষণার জমিদার ছিলেন না। সুতরাং আকবরনামার এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। আবার কেউ কেউ বলেন যে, শ্রীপুরের কেদার রায়ের সঙ্গে খাজা উসমানের বিবাদ বাধে ঈসা খান সোলায়মানকে কেদার রায়ের সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করে এই বিবাদের মীমাংসা করে দেন। যাহোক এই বিষয়ে কোন প্রামাণ্য কিছু পাওয়া যায় না। এটুকু নিশ্চিত করে জানা যায় যে, কেদার রায় ঈসা খানের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন (পরে আলোচিত) এবং ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে পরলোক গমন করেন।[৬৪]

ঈসা খান মসনদ-ই-আলা ও তৎপুত্র মুসা খান ও অন্যান্যরা :

বাংলার ভূঁঞাদের মধ্যে ঈসা খানই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আকবরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা দেন এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেননি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্ররাও একইভাবে মোগলদের প্রতিরোধ করেন, যদিও তাঁরা শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তবুও তাঁরাই ছিলেন মোগলদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল এবং মিরযা নাথনও তা স্বীকার করেন। আবুল ফজল বলেন:[৬৫] The tract of country on the east called Bhati is reckoned a part of this province. It is ruled by Isa Afghan and the Khutba is read and the coin struck in the name of his present Majesty...Adjoining it is an extensive tract of country inhabited by the Tipperah tribes. The name of the ruler is Bijay Manik.

এখানে ঈসা খানকে স্বাধীন নৃপতির মত উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও আবুল ফজল তাঁর পৃষ্ঠপোষক আকবরের মান রক্ষার জন্য আকবরের নামে খুতবা পাঠ বা মুদ্রা জারির কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, আকবরের নামাঙ্কিত ঈসা খান কর্তৃক জারিকৃত কোন মুদ্রা যাবৎ আবিষ্কৃত হয়নি। এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, ঈসা খানের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার স্বাধীন নৃপতি বিজয় মাণিক্যের কথাও বলা হয়েছে। আকবরনামায় আবুল ফজল ঈসা খান সম্পর্কে নিম্নরূপ উক্তি করেন:[৬৬]

Edited by Ripon Sarkar

Isa Khan, Zamindar of Bhati spent his time in dissimulation" এবং "Isa acquired fame by his ripe judgement and deliberateness and made the 12 Zamindars of Bengal subject to himself. Out of foresight and cautiousness, he refrained from waiting upon the rulers of Bengal, though he rendered service to them and sent them presents. From a distance, he made use of submissive language.

এখানে ঈসা খানের অবস্থান ও কূটনীতি সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ঈসা খান বাংলার শাসকদের দরবারে কোন সময় যাননি, শুধু তাঁদের সাহায্য করেন এবং দূর থেকে আনুগত্য প্রকাশ করেন। বাংলার শাসক বলতে এখানে মোগল পূর্ববর্তী সুলতানদের কথা বলা হয়েছে; অর্থাৎ আবুল ফজল বলেছেন যে বাংলার আফগানদের সময় ঈসা খান ক্ষমতাবান ভূঁঞা-জমিদার ছিলেন। ঈসা খানকে সোলায়মান কররানীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। সোলায়মান কররানী যেমন নিজের নামে খুতবা পাঠ করেননি বা মুদ্রা জারি করেননি, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন কিন্তু প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। তেমনি ঈসা খানও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, যদিও নিজ এলাকায় তিনি স্বাধীন ছিলেন। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা খান সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ[৬৭]

They be all hereabout rebels against their King Zebaldin Echebar (Jalaluddin Akbar). For here are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them...Sianergan (Sonargaon) is a town six leagues (i.e. 18 miles) from Serrepore (Sripur) .... The chief king of all these countries is called Isacan (Isa Khan), and he is chief of all other kings....

রালফ্ ফিচের বক্তব্যে ঈসা খানের প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মোগলদের বিরুদ্ধে যারা প্রাণপণ যুদ্ধ করেছে এবং মোগল বিজয়ে যারা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তাদের মধ্যে ঈসা খান সর্বশ্রেষ্ঠ। হেনরী বেভেরীজ বলেন,[৬৮]

"We are told more than once of his (Isa Khan's) making submission and sending presents. But he was never really subdued and his swamps and creeks enabled him to preserve his independence as effectually as the Aravalli Hills protected Rana Pratap of Udaipur."

বাংলার বীর সন্তান ঈসা খানের জীবন ইতিহাস এখনও অন্ধকারের অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে। মুসলমানদের ইতিহাস চেতনা সর্বজনবিদিত। দিল্লী এবং অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের শাসনের সমসাময়িক ইতিহাসের অভাব নেই, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বাংলার মুসলমান শাসনের ধারাবাহিক বা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখেননি। ফলে বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ইতিহাস যেমন তিমিরাবৃত, বার-ভূঁঞা প্রমুখ বীর পুরুষদের ইতিহাসও তেমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ছিটেফোঁটা যা খবরাখবর পাওয়া যায় তা হয় দিল্লীর আশ্রয়পুষ্ট একদেশদর্শী ঐতিহাসিকদের মারফত বা সত্য-অসত্যে পরিপূর্ণ দেশে প্রচলিত লোকগীতি, গাথা বা কিংবদন্তীর মাধ্যমে।

Edited by Ripon Sarkar

দেওয়ান উপাধি-ধারী ঈসা খানের বংশধরেরা এখনও কিশোরগঞ্জের জঙ্গলবাড়িতে এবং হয়বতনগরে বর্তমান, কিন্তু ঈসা খানের জীবনের উপর আলোকপাত করার মত কোন তথ্য প্রমাণ তাঁদের কাছে নেই। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে জেমস ওয়াইজ তাঁদের নিকট খোঁজ খবর করেন। তিনি তাঁদের নিকট থেকে ঈসা খানের পৌত্র-প্রপৌত্র সম্পর্কে সামান্য তথ্য পেলেও ঈসা খান সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য পাননি। জেমস ওয়াইজ তিনখানি সনদ উদ্ধার করেন, দুখানি শাহ শুজার সময়ের এবং একখানি আজিম-উশ-শানের সময়ের। বেশ কিছু দিন আগে ঈসা খানের বংশধরদের প্রচেষ্টায় ঈসা খানের জীবনীমূলক "মসনদ-ই-আলীর ইতিহাস": নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।[৬৯] কিন্তু পণ্ডিত কালীকুমার চক্রবর্তী এবং মুন্সি রাজচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক লিখিত এই জীবনী গ্রন্থখানিতে সত্য ঘটনার চেয়ে বেশির ভাগ কাল্পনিক গল্প স্থান পেয়েছে। প্রতিভাবান মহাপুরুষদের জীবদ্দশাতেই তাদের সম্পর্কে নানা রকম আজগুবী ও অবিশ্বাস্য গল্পের প্রচলন হয়। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধাচরণকারী পূর্ব বাংলার ভূঁঞা-জমিদারের নেতা ঈসা খানের নামেও এরূপ নানা কাল্পনিক গীতিকবিতা রচিত হয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকায় দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত 'দেওয়ান ঈসা খান মসনদালী'ও এমনই একটি পল্লীগীতি। ফলে ঈসা খানের প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পুনরুদ্ধার করা অধিকতর কষ্টকর হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা ক্ষান্ত হননি। ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত অনেক প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ঈসা খানের জীবনী আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে বর্তমানে ঈসা খান সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়। যে সকল মনীষী ঈসা খানের কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাদের মধ্যে জেমস ওয়াইজ, হেনরী ব্লখম্যান, হেনরী বেভেরীজ এবং নলিনী কান্ত ভট্টশালীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থাদি সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আইন-ই-আকবরী, আকবরনামা, রাজমালা ইত্যাদি গ্রন্থের সাথে জেমস ওয়াইজ এবং নলিনী কান্ত ভট্টশালীর মৌলিক গবেষণাই বর্তমানে ঈসা খানের জীবনী আলোচনার প্রধান উপকরণ।

১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে জেমস ওয়াইজ হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়ি বসবাসরত ঈসা খানের বংশধরদের নিকট থেকে ঈসা খানের বাল্য ইতিহাস ও বংশ পরিচয় সম্পর্কে সামান্য কিছু অবগত হন। ওয়াইজ বলেন :

> The family tradition is, that during the reign of Husain Shah (1493 to 1520[৭০]). Kali Das Gajdani, a Bais Rajput of Audh, became a Muhammadan, and received the title of Sulaiman Khan. He afterwards married a daughter of the reigning monarch. He is said to have been killed in battle by Salim Khan and Taj Khan. He left three children, Isa, Isamail and a daughter afterwards known as Shahinsha Bibi. Their father being slain, the two sons were taken prisoners and sold as slaves.

Edited by Ripon Sarkar

They were subsequently traced to Turan, whence they were brought back by their uncle Qutbuddin.

Isa Khan is said to have married Fatimah Khatun, a cousin of his own, and grand daughter of Husain Shah of Bengal.[৭১]

আবুল ফজল আকবরনামায়ও ঈসা খানের বাল্য ইতিহাস ও পিতৃ পরিচয় সম্পর্কে নিম্নরূপ লিখেন,[৭২]

The father of this chief (bumi) belonged to the Bais tribe of Rajputs. In that fluviatile region (i. e. Bhati) he continually displayed presumption and refractoriness. In the time of Salim Khan, Taj Khan and Dariya Khan went to that country with large forces and after many contests he surrendered. In a short while he again rebelled. They managed by a trick to get hold of him and sent him to the abode of annihilation and sold his two sons Isa and Ismail to merchants. When the cup of Salim Khan's. life was full, and Taj Khan became predominant in Bengal. Qutbuddin the paternal uncle of Isa obtained glory by good service and by making diligent search, brought back both brothers from Turan.

জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত কাহিনী এবং আবুল ফজলের বক্তব্যের মধ্যে মিল আছে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ঈসা খানের প্রথম জীবনের সম্বন্ধে কিছু কথা পাওয়া যায়। বস্তুত, ঈসা খানের পিতা ছিলেন রাজপুত এবং রাজপুতদের বাইস সম্প্রদায়[৭৩] ভুক্ত। শের শাহের পুত্র সলীম শাহের (ইসলাম শাহ্ সূর) সময়ে ঈসা খানের পিতা বিদ্রোহ করেন। সুলতান সলীম শাহ্ তাজ খান ও দরিয়া খানকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠান। ঈসা খানের পিতা আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু পরে আবার বিদ্রোহ করেন। সুলতানের বাহিনী কায়দা করে তাঁকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন এবং তাঁর দুই পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বন্দী করে বণিকদের নিকট বিক্রি করে দেন। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে তাজ খান যখন বাংলায় ক্ষমতাশালী হন, তখন ঈসা খানের পিতৃব্য কুতুব-উদ-দীন তাজ খানের সহযোগিতা করে তাঁর (তাজ খানের) সহানুভূতি লাভ করেন এবং ঈসা ও ইসমাইলকে তুরান থেকে ফিরিয়ে আনেন। ঈসা খান তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বার-ভূঁইয়াকে তাঁর অধীনস্থ করেন।

কিন্তু এত কিছু বলা সত্ত্বেও আবুল ফজল ঈসা খানের পিতার নাম বলেননি। ওয়াইজ কর্তৃক সংগৃহীত কাহিনীতে ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী।[৭৪] দেশে প্রচলিত অন্যান্য কিংবদন্তী ও লোককাহিনীতেও এই নাম পাওয়া যায়। ওয়াইজ আরও জানতে পারেন যে, কালিদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সোলায়মান খান নাম ধারণ করেন। তাছাড়া তিনি সুলতান হোসেন শাহের (আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ) মেয়ে বিয়ে করে শাসকদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। ঈসা খানের বংশধরদের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত "মসনদালির ইতিহাসে" কালিদাস গজদানী বা সোলায়মান খানের শ্বশুর সুলতানের নাম জলা শাহ। পূর্ব-বঙ্গ গীতিকায় "দেওয়ান ঈসা খাঁর পালায়" এই

Edited by Ripon Sarkar

নাম জালাল-উদ-দীন। যদিও এই তিনটি সূত্রের কোনটিই প্রামাণ্য নয়, তবুও এই তিনটির মধ্যে একটি কথার মিল আছে। এটা এই যে, কালিদাস গজদানী ইসলাম গ্রহণ করে সোলায়মান নাম ধারণ করেন এবং বাংলার একজন সুলতানের মেয়ে বিয়ে করেন। এক সূত্রে এই সুলতানের নাম হোসেন শাহ, দ্বিতীয় সূত্রে জলাশাহ এবং তৃতীয় সূত্রে জালাল-উদ-দীন। সোলায়মান খান কোন্ সুলতানের মেয়ে বিয়ে করেন তা নির্ধারণ করতে হলে বাংলার ইতিহাসের নিম্নলিখিত কালক্রম বিবেচনা করা দরকার ঃ

১৪৯৩ খ্রিঃ- সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫১৯ খ্রিঃ- হোসেন শাহের মৃত্যু ও নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫৩২ খ্রিঃ- নসরত শাহ্‌র মৃত্যু ও আলা-উদ-দীন ফীরুজ শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫৩২ খ্রিঃ- আলা-উদ-দীন ফীরুজ শাহকে হত্যা করে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫৩৮ খ্রিঃ- শের শাহ্ কর্তৃক গৌড় দখল (১৫৪০ খ্রিঃ দিল্লীর সুলতান)।

১৫৪৫ খ্রিঃ- শের শাহ্‌র মৃত্যু এবং তৎপুত্র সলীম শাহ্‌র দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ।

১৫৫২ খ্রিঃ- সলীম শাহ্‌র মৃত্যু। বাংলায় শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ্‌র স্বাধীনতা ঘোষণা।

১৫৫৪ খ্রিঃ- শামস-উদ-দীনের মৃত্যু ও তৎপুত্র গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫৬০ খ্রিঃ- বাহাদুর শাহ্‌র মৃত্যু এবং তাঁর ভাই গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্‌র সিংহাসন আরোহণ।

১৫৬৩ খ্রিঃ- গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ্‌র মৃত্যু।

১৫৬৩ খ্রিঃ- সোলায়মান কররানীর ক্ষমতা লাভ।

১৫৭২ খ্রিঃ- সোলায়মান কররানীর মৃত্যু।

১৫৭৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে ঈসা খানের সঙ্গে মোগলদের প্রথম সংঘর্ষ ও মোগল নৌ-অধ্যক্ষের পশ্চাদপসরণ।

শিলালিপি, মুদ্রা এবং প্রামাণ্য ইতিহাসের সূত্রের সাহায্যে উপরোক্ত কালক্রম নির্ণয় করা হয়েছে। এই কালক্রমে জলাশাহ বা জালাল-উদ-দীন নামধারী শুধু একজন সুলতানের নাম পাওয়া যায় এবং তিনি হচ্ছেন শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ গাজীর পুত্র গিয়াস-উদ-দীন জালাল শাহ। তিনি ১৫৬০ খ্রিঃ থেকে ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু তিনি সোলায়মান খানের শ্বশুর হতে পারেন না। কারণ তাঁর রাজত্বের বেশ কয়েক বৎসর আগে সলীম শাহ্‌র (ইসলাম শাহ) সময়ে ১৫৪৫-১৫৫২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সোলায়মান খান বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হন।

Edited by Ripon Sarkar

নলিনী কান্ত ভট্টশালী মত প্রকাশ করেন যে, সোলায়মান খান হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র (১৫৩২-১৫৩৮ খ্রিঃ) মেয়ে বিয়ে করেন। তিনি বলেনঃ[৭৫]

> What led Kalidas to rebel again and again in the reign of Islam Shah? From his repeated rebellions, it appears as if he had particular animosity against the reigning family. Sher Shah became master of Bengal after ousting Sultan Mahmud Shah, the last of the Husseini Sultans. This took place in 1538 A. D. Rebellion or insubordination was inopportune during the vigorous rule of Sher Shah upto 1545 A. D. Kalidas's rebellion came in the next and comparatively weaker (sic) reign of Islam Shah. The rebellion of Kalidas looks like an attempt to reestablish the lost political power of the Husseini dynasty ousted by Sher Shah. Jalal Shah whose daughter Kalidas is represented in the ballads to have married had Ghiyasuddin as his first name.[৭৬] We have seen above that Jalal Shah cannot be thought of as the Sultan whose daughter Kalidas may have married. The only Ghiyasuddin before Islam Shah is Ghiyasuddin Mahmud Shah and possibly he was the father-in-law of Kalidas. With the massacre of Ghiyasuddin Mahmud Shah's sons by the son of Sher Shah after the capture of Gaur, Kalidas, as the husband of a daughter of Mahmud Shah, possibly considered himself de jure succesor to the kingdom of Mahmud Shah and as such entitled to rebel against the usurping family.

জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়ি পরিবারের ভাষ্য অনুযায়ী সোলায়মান খান (কালিদাস গজদানী) সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করেন। যে যুক্তিতে ভট্টশালী গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করার কারণে সোলায়মান খানের বারবার বিদ্রোহের যৌক্তিকতা খুঁজে পেয়েছেন, সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করলেও সেই একই যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র পুত্র, উভয়ের পরিবার বা বংশ একই বংশ, এই বংশকে উৎখাত করেই শের শাহ বাংলা দখল করেন। এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই সোলায়মান খান ইসলাম শাহ্‌র রাজত্বকালে বারবার বিদ্রোহ করেন।

উপরে আমরা উভয় সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করলাম, অর্থাৎ সোলায়মানের পক্ষে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করা যেমন সম্ভব, আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে অন্য একটি কারণে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্‌র মেয়ে বিয়ে করার সম্ভাবনা বেশি। গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ-শাহ্‌র রাজত্বকাল ১৫৩২ থেকে ১৫৩৮ খ্রিঃ পর্যন্ত। সকল সূত্রেই বলা হয়েছে যে, সুলতান রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় সোলায়মানের বিয়ে হয় এবং ঐ সময়ের কোন এক সালে ঈসা খানের জন্ম হয়। এই হিসাবে ইসলাম শাহ কর্তৃক সোলায়মানের হত্যার সময় ঈসা খানের বয়স হয় ১২/১৩ বৎসর বা বেশির পক্ষে ১৫

Eidited by Ripon Sarkar

বৎসর এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খানের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৪/৬৫ বৎসর বা সামান্য বেশি। ঈসা খানের কর্মময় জীবন এই কালক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যদিকে সোলায়মান খান হোসেন শাহ্র মেয়ে বিয়ে করলে পিতার মৃত্যুর সময় ঈসা খানের বয়স হবে প্রায় ৩২/৩৩ বৎসর বা কিছু বেশি, এবং ঈসা খানের মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স প্রায় ৮০ বৎসর বা তারও বেশি। যদিও প্রামাণ্য সূত্রে পাওয়া যায় না, কিংবদন্তী মতে ঈসা খান মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মানসিংহের সঙ্গে একক যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং মানসিংহকে পরাজিত করেন।[৭৭] কিংবদন্তী সত্য হকো বা না হকো, এটা সত্য যে, ১৫৯৬-৯৭ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের কয়েকবার সংঘর্ষ হয় এবং ঈসা খান এই সংঘর্ষে বীরত্বের পরিচয় দেন। ৮০ বৎসর বয়সে কারও পক্ষে এরূপ বীরত্বের পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভট্টশালীর অভিমত গ্রহণযোগ্য, অর্থাৎ সোলায়মান খান (কালিদাস) সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র মেয়ে বিয়ে করেন এবং ঈসা খান ঐ সুলতানের দৌহিত্র ছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ঈসা খানের পিতৃ পরিচয় এবং বাল্যজীবন সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত জানতে পারি। ঈসা খানের পিতার নাম কালিদাস গজদানী, মুসলমানী নাম সোলায়মান খান। সোলায়মান মূলত অযোধ্যা থেকে আগত এবং বাইশ রাজপুত সম্প্রদায়ভুক্ত। পূর্ববঙ্গ গীতিকার মতে, ঈসা খানের পিতামহ ভগীরত প্রথমে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন এবং বাংলায় সুলতানের অধীনে দীওয়ানের চাকরি গ্রহণ করেন। ঈসা খানের পিতা কালিদাসও পিতার, মৃত্যুর পরে বাংলার সুলতানের দীওয়ানের পদ লাভ করেন। কালিদাস বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ্র মেয়ে বিয়ে করেন এবং মুসলমান হয়ে সোলায়মান খান নাম গ্রহণ করেন। সোলায়মান দিল্লীর সুর সুলতান সলীম শাহ্র (ইসলাম শাহ) বিরুদ্ধে অন্তত দুবার বিদ্রোহ করেন। শেষ বারে তিনি নিহত হন এবং তাঁর দুই পুত্র ঈসা ও ইসমাইলকে বন্দী করে বিক্রি করে দেয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে আনুমানিক ১৫৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঈসা ও ইসমাইল তুরান থেকে আনীত হন এবং এর পরে ঈসা খানের কর্মময় ও গৌরবময় জীবনের শুরু হয়। ধারণা করা যায় যে, ঈসা খান স্বদেশে ফিরে এসে পিতার জমিদারীর মালিক হন।[৭৮] তাঁর পিতা যেহেতু সুলতানের দীওয়ান ছিলেন এবং খান উপাধি পান, এমনকি সুলতানের জামাতাও ছিলেন, সেহেতু তিনি প্রভূত ভূ-সম্পত্তি জাগীর লাভ করেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না। এই জাগীরই তাঁর জমিদারীতে পরিণত হয়। এই জাগীর বা জমিদারীকে কেন্দ্র করেই তিনি সুলতান সলীম শাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ লাভ করেন, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে না। কিন্তু ঈসা খানের পিতার জমিদারী কোথায় অবস্থিত ছিল, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে ঈসা খানের ক্ষমতা লাভের প্রথম দিকে তিনি সরাইল পরগণার জমিদার ছিলেন বলে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় প্রকাশ পায়। এই সময়ে ঈসা খানের কর্মময় জীবন ত্রিপুরার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই ঈসা খানের ক্ষমতা লাভের প্রথম যুগের ইতিহাস জানতে হলে ত্রিপুরার সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, আইন-ই-আকবরীতে ঈসা খানের সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সংগে ত্রিপুরার রাজা বিজয় মাণিক্যের নামও উল্লেখ করা হয়। এতেও দেখা যায় যে, প্রথমদিকে ত্রিপুরার

Edited by Ripon Sarkar

রাজাদের সঙ্গে ঈসা খানের সম্পর্ক ছিল। ঈসা খানের সমসাময়িক ত্রিপুরার কয়েকজন রাজার কালক্রম নিম্নরূপঃ[৭৯]

১। বিজয় মাণিক্য ১৫৪০-১৫৭১ খ্রিঃ।

২। অনন্ত মাণিক্য ১৫৭১-৭২ খ্রিঃ (১নং এর ছেলে, কিন্তু তাঁর শ্বশুর উদয় মাণিক্য তাঁকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করেন)।

৩। উদয় মাণিক্য ১৫৭২-৭৬ খ্রিঃ (২নং এর শ্বশুর)।

৪। অমর মাণিক্য ১৫৭৭-১৫৮৬ খ্রিঃ (১নং এর ভাই)।

৫। রাজধর মাণিক্য ১৫৮৬-১৬০০ খ্রিঃ (৪নং এর ছেলে)।

ত্রিপুরার এই পাঁচজন রাজা ঈসা খানের সমসাময়িক। বিজয় মাণিক্যের রাজত্বের প্রায় শেষদিকে ঈসা খানের ক্ষমতায় আরোহণ, এবং রাজধর মাণিক্যের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ঈসা খানের মৃত্যু হয়। রাজমালায় প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় যে, রাজা অমর মাণিক্যের সময়ে ত্রিপুরার সঙ্গে ঈসা খানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই সময়ে ঈসা খান মোগল সেনাপতি খান জাহান কর্তৃক আক্রান্ত হন। ঈসা খান তখন সরাইল পরগণার জমিদার। ঈসা খান মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে এবং পরাজিত হয়ে ত্রিপুরার রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন। অমর মাণিক্য এক সৈন্যবাহিনী ঈসা খানের সাহায্যার্থে পাঠান। এই খবর পেয়ে মোগল বাহিনী ফিরে যায়।[৮০] এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা খান তখন সরাইলের জমিদার ছিলেন। সরাইল নামটি এখনও বর্তমান। সুতরাং এর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করা সহজ। সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরে মেঘনা নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত। সরাইলের বিপরীতে মেঘনা নদীর অপর তীরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জোয়ান শাহী পরগণা অবস্থিত। বুঝা যায় যে, মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের এই যুদ্ধ মেঘনা নদী এবং তার তীরবর্তী অঞ্চলে সংঘটিত হয়। রাজমালায় মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের এই যুদ্ধের কোন তারিখ দেয়া হয়নি। আকবরনামায় ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে ঈসা খানের বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতি খান জাহানের প্রথম যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই যুদ্ধ মেঘনার তীরে ভাটিয়ালের নিকটে কস্তুল বা কাইটাইল নামক স্থানে সংঘটিত হয় (পরে দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাজমালা এবং আকবরনামায় একই যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে আমরা ঈসা খানকে সরাইলের জমিদার রূপে দেখতে পাই এবং এটা বলা যায় যে, সরাইলেই ঈসা খান প্রথম ক্ষমতায় আসেন এবং সরাইলেই ঈসা খানের ক্ষমতার উৎপত্তি।

রাজমালায় ঈসা খানের দ্বিতীয় উল্লেখ পাই আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে। ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের অমর সাগর[৮১] দীঘি খনন করার জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। অমর মাণিক্য পূর্ব বাংলার জমিদারদের নিকট শ্রমিক পাঠাবার অনুরোধ জানালে নিম্নলিখিত জমিদাররা শ্রমিক পাঠিয়ে সাহায্য করেন।[৮২]

Edited by Ripon Sarkar

১। বিক্রমপুরের চাঁদ রায়		৭০০ শ্রমিক
২। বাকলার বসু জমিদার		৭০০ শ্রমিক
৩। সরাই গোয়াল পাড়ার গাজী		৭০০ শ্রমিক
৪। ভাওয়ালের জমিদার		১০০০ শ্রমিক
৫। অষ্টগ্রামের জমিদার		৫০০ শ্রমিক
৬। বানিয়াচঙ্গের জমিদার		৫০০ শ্রমিক
৭। রন-ভাওয়ালের জমিদার		১০০০ শ্রমিক
৮। সরাইলের ঈসা খান		১০০০ শ্রমিক
৯। ভুলুয়ার জমিদার		১০০০ শ্রমিক
	মোট	৭,১০০ জন

এতে দেখা যায় যে, অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে সরাইলের ঈসা খানও এক হাজার শ্রমিক অমর মাণিক্যের নিকট পাঠিয়েছিলেন। রাজমালায় আরও বলা হয়েছেঃ

কেহ ভয়ে কেহ প্রীতে, কেহ মান্যে দিল।

বার বাঙ্গালায় দিছে তরপে না দিল।

কেহ ভয়ে, কেহ ভালবাসার খাতিরে, কেহ বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য ত্রিপুরা রাজের কাজে লোক সরবরাহ করেন। "বার বাঙ্গালা" মানে বার-ভূঁঞা। কিন্তু সিলেটের তরফের জমিদার ফতেহ খান লোক পাঠাননি। এতে অমর মাণিক্য তরফ আক্রমণ করেন। এই সূত্রে রাজমালায় ঈসা খানের তৃতীয় বারের মত উল্লেখ পাওয়া যায়। তরফের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঈসা খান ত্রিপুরা রাজের নৌ-বাহিনী পরিচালনা করেন। ফতেহ খানকে বন্দী করে উদয়পুরে নিয়ে আসা হয়। রাজামালায় এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আছে। ঈসা খান ও তাঁর সঙ্গীরা যুদ্ধে যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তাঁদের নাম এবং গুণকীর্তনও রাজমালায় পাওয়া যায়। যুদ্ধ জয়ের পরে ত্রিপুরা-রাজ ঈসা খানের বীরত্বের প্রশংসা করেন। সৌভাগ্যবশত তরফের যুদ্ধের সঠিক তারিখ পাওয়া যায়। অমর মাণিক্য তরফ জয়ের স্মারক স্বরূপ মুদ্রা জারি করেন। এই মুদ্রার পাঠ নিম্নরূপঃ[৮৩]

প্রথম পিঠ শ্রীহট্ট বিজয় শ্রী শ্রীযুতামর মাণিক্য দেব

অন্য পিঠ শ্রী অমরাবতী দেব্যৌঃ শাক ১৫০৩

সুতরাং নিশ্চিতভাবে দেখা যায় যে, ১৫০৩ শকে বা ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে অমর মাণিক্য তরফ জয় করেন। ঈসা খান ঐ যুদ্ধে অংশ নেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঈসা খানের জীবনের তিনটি ঘটনা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। ১ম, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে ঈসা খান পরাজিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ত্রিপুরার সাহায্য আসলে মোগল বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে। ২য়, আনুমানিক ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান অন্যান্য জমিদারের সঙ্গে অমর সাগর দীঘি খননের জন্য ত্রিপুরায় শ্রমিক পাঠান। ৩য়, ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান অমর মাণিক্যের নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ রূপে

Edited by Ripon Sarkar

তরফের জমিদার ফতেহ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। লক্ষণীয় যে, এই সময় ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে ঈসা খানের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি

ঈসা খানের উপাধি ছিল মসনদ-ই-আলা। ঢাকা শহরের অদূরে শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত সাতটি কামানের একটিতে ঈসা খানের নাম, উপাধি ও সন তারিখ খোদিত আছে। কামানটি এখন ঢাকায় বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত। কামানের লিপি নিম্নরূপ:[৮৪]

১ম ছত্র ঃ সরকার শ্রীযুত ঈছা খাঁ

২য় ছত্র ঃ ন মসনদাল্বি সন হিজরী

৩য় ছত্র ঃ ১০০২

১০০২ হিজরী বা ১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে কামানটি নির্মিত হয়। অতএব ১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দের আগে কোন এক সময়ে ঈসা মসনদ-ই-আলা উপাধি লাভ করেন বা গ্রহণ করেন। ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন মত পাওয়া যায়। এগুলি আলোচিত হচ্ছে।

জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত তথ্য। তিনি বলেন:[৮৫]

> When Man Singh invaded Bengal about 1595, he advanced to Igarah-Sindhu and besieged the garrison of the fort. Isa Khan hastened to its relief, but his troops were disaffected and refused to fight. He, however, challenged Man Singh to single combat, stipulating that the survivor should receive peaceful possession of Bengal. Man Singh accepted the challenge and its conditions, but when Isa Khan rode into the field, he recognised in his opponent a young man, the son-in-law of the Raja. They fought and the latter was slain. Upbraiding Man Singh for his cowardice, Isa Khan returned to his camp. Scarcely had he done so when word was brought to him that Man Singh himself was in the field. He again mounted and galloped to the ground, but refused to engage with his opponent until satisfied of his identity. Being assured that Man Singh was opposed to him, the combat began. In the first encounter Man Singh lost his sword. Isa Khan offered his but without accepting it Man Singh dismounted. His adversary did the same and dared him to have a wrestling bout. Instead of acceding to his wish, Man Singh, struck by the generosity and chivalry of the man, embraced him and claimed as a friend. After entertaining Isa Khan, he loaded him with presents on his taking leave.

Edited by Ripon Sarkar

The behaviour of the Hindu prince excited the disapprobation of many of his followers, and the Rani was so indignant at his pusillanimous conduct, that she vowed she would never return to court, where he would be put to death and she be made a widow.

This domestic quarrel, however, was quelled by Isa Khan who volunteered to return with Man Singh to Agrah and trust to the magnanimity of the emperor for pardon.

On their arrival at Agrah, Isa Khan was thrown into prison, but when the story of the combat at Igarah Sindhu was told, the emperor ordered his immediate release, conferred on the titles of Diwan and Masnad-i-Ali, and gave him a grant of numerous parganahs in Bengal.

ওয়াইজের বিবরণে মানসিংহের সঙ্গে ঈসা খানের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধে ঈসা খান পরাজিত হন, তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ফলে ঈসা খান মানসিংহের সঙ্গে একক সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই বিবরণে মানসিংহকে ভীরু এবং ঈসা খানকে বীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। একক সম্মুখ যুদ্ধে মানসিংহ পরাজিত হলে মানসিংহের স্ত্রী তাঁর কাপুরুষতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং সম্রাটের দরবারে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, সম্রাট মানসিংহকে নিশ্চয়ই হত্যার আদেশ দেবেন এবং তিনি বিধবা হবেন। তাই মানসিংহের মান মর্যাদা রক্ষার জন্য ঈসা খান আগ্রায় সম্রাটের দরবারে যেতে রাজি হন। আগ্রায় গেলে সম্রাট আকবর ঈসা খানকে দীওয়ান ও মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করেন এবং জাগীর স্বরূপ অনেক পরগণা দান করেন।

দেওয়ান ইছা খাঁর পালা : এই পালাগানেও উপরোক্ত একই বিবরণ দেয়া হয়েছে, তবে এখানে মানসিংহের সঙ্গে ঈসা খানের একক যুদ্ধের কথা নেই, বরং মানসিংহ কর্তৃক চালাকী করে ঈসা খানকে বন্দী করার কথা বলা হয়েছে। ঈসা খান সম্রাটের দরবারে গেলে সম্রাট ঈসা খানের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন এবং দশ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাইশ পরগণার মালিকানা দেন।

উপরোক্ত উভয় সূত্রে ঈসা খান মোগল সম্রাট আকবরের দরবারে যান এবং আকবর তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন (পরগণার মালিকানা বা ২২ পরগণার কথা পরে আলোচনা করা হচ্ছে)। কিন্তু এই সূত্রগুলির সাক্ষ্য কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আবুল ফজল আকবরনামায় কোথাও বলেননি যে ঈসা খান সম্রাটের দরবারে যান, বরং তিনি বলেন যে ঈসা খান কোন সময় বাংলার সুলতানদের দরবারেও যাননি, অবশ্য বেকায়দায় পড়লে মাঝে মাঝে আনুগত্যের সংবাদ পাঠাতেন। ঈসা খানের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে আবুল ফজল বলেন :[৮৬] One of the occurences was the death of Isa Khan. He was a great land holder of Bengal. He had some share of prudence, but from somnolence of fortune, he did not come to court এখানে আবুল ফজল দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, ঈসা খান আকবরের দরবারে যাননি। আবুল

Edited by Ripon Sarkar

ফজলের এই দ্ব্যর্থহীন উক্তির সামনে কেউ ভুল করেও বলতে পারবে না যে ঈসা খান আগ্রায় গিয়ে আকবরের সঙ্গে দেখা করেন। আবুল ফজল আকবরের একজন তোষামুদী দরবারী ঐতিহাসিক, সম্রাটের পোষকতায় তিনি ইতিহাস লিখেন; আকবরের প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ; আকবরের প্রশংসাসূচক কোন কথা তিনি কোন সময় বাদ দেননি। বার-ভুঁঞার নেতা ঈসা খান আকবরের দরবারে গেলে তিনি সেই সংবাদ গোপন রাখার প্রশ্ন উঠে না। ভট্টশালী বলেন ঃ[৮৭]

> No statement can be more clear and it is inconceivable that Abul Fazl would needlessly conceal or forget to mention so important, and from the imperial point of view, so welcome a piece of information, as Isa Khan's submission and his journey to the Muhgal capital. I cannot admire the historical insight of those writers who, in the face of these overwhelming evidences, have taken as true history the puerile tradition about the single combat of Man Sinha and Isa Khan, resulting in the latter's submission to Akbar and journey to Agra to receive the fabulous Farman for the 22 parganas.

কিন্তু জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ এবং "ইছা খাঁর পালাগান" এর বক্তব্য যে সত্য নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঈসা খানের কামান। উক্ত বক্তব্যগুলির মূল কথা এই যে, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধের পরে ঈসা খান আগ্রায় যান এবং আকবর তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন। মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ তারিখে, বাংলার সুবাদারীর দায়িত্ব নেবার জন্য বাংলার দিকে যাত্রা করেন ঐ সালের ৪ঠা মে তারিখে।[৮৮] ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে ডিসেম্বর মাসে মানসিংহ ভাটির ঈসা খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। ১৫৯৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে মানসিংহের ছেলে হিম্মত সিংহ এগারসিন্দুর লুণ্ঠন করেন।[৮৯] ১৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে মানসিংহের ছেলে দুর্জন সিংহ ঈসা খানের রাজধানী কতরাব আক্রমণ করেন। ঐ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে ঈসা খান বিক্রমপুরের অদূরে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে ঈসা খান জয়ী হন এবং দুর্জন সিংহ নিহত হন।[৯০] আকবরনামায় ঈসা খানের সঙ্গে মানসিংহের একক যুদ্ধের কোন কথা নেই। ঈসা খানের কামানের তারিখ ১০০২ হিজরী বা ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ মানসিংহ বাংলায় আসার এক বৎসর পূর্বে, এবং এগারসিন্দুরের যুদ্ধের তিন বৎসর আগেও ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল। তাই জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণ এবং 'ইছা খাঁর পালায়' প্রাপ্ত তথ্যের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

মসনদ-ই-আলা উপাধি সম্পর্কে দ্বিতীয় বক্তব্য পাওয়া যায় ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায়। আগেই বলা হয়েছে যে, সরাইলের জমিদার থাকাকালে (১৫৭৮ খ্রিঃ) মোগল বাহিনী কর্তৃক পরাজিত হয়ে ঈসা খান ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের সাহায্য ভিক্ষা করেন। এই বিবরণ দিয়ে রাজমালায় বলা হয়ঃ[৯১]

Edited by Ripon Sarkar

"ইছা খাঁয়ে সেই কালে মনে বিবেচিল। মহারাণী প্রতি সেই মাতৃ সম্বোদিল॥
রাণী স্তন ধৌত জল ইছা খাঁ খাইল। মহারাণী পিতৃতুল্য তাকে স্নেহ কৈল॥
সেই কারণ হৈল ইছা খাঁর তরে। ইছা খাঁ মচলন্দানি খ্যাতি ছিল পরে॥
ইছা খাঁর প্রতি রাণী রাজাতে কহিল। মহারাজা সৈন্য দিতে তাকে আদেশিল॥
... ...
"তদবধি ইছা খাঁর মচলন্দানি খ্যাতি। সৈন্য সমে বিদায় হৈয়া গেল শীঘ্রগতি॥"

রাজমালার এই উক্তির ভিত্তিতে নলিনী কান্ত ভট্টশালী বলেন যে ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন। তিনি বলেনঃ[১২]

As regards Isa Khan's title of Masnad-i-Ali, when the Rajmala expressly states that the title was given to him by Amara Manikya, I do not see why the statement should be disbelieved. No one can seriously contend that a powerful and independent king like Amara Manikya had not authority or power enough to confer a title on an Afghan protege.

কোন তথ্যই যেখানে পাওয়া যায় না, সেখানে রাজমালার এই উক্তির বিশেষ মূল্য আছে এবং ভট্টশালী তার যথার্থ মূল্যই দিয়েছেন। ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধি বাংলার সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ কর্তৃক প্রদত্ত।[১৩] তাছাড়া মুসলমান রাজা বাদশাহ কর্তৃক প্রদত্ত হিন্দু রাজা মহারাজাদের উপাধিরও অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি হিন্দু রাজা অমর মাণিক্য কর্তৃক প্রদত্ত কথাটি বিশেষ অযৌক্তিক নয়। কিন্তু তবুও রাজমালায় কথাটা যেভাবে পরিবেশিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে কিছু কথা উঠাটা অস্বভাবিক নয়। প্রথমত, রাজমালায় যে সময়ে ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেয়ার কথা আছে, সে সময় ঈসা খান মাত্র সরাইল পরগণার জমিদার ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান মোগলদের নিকট পরাজিত হয়ে ত্রিপুরার রাজার সাহায্য ভিক্ষা করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, একটি পরগণার জমিদারকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? তাছাড়া যে লোকটি কৃপার পাত্র হয়ে কৃপা ভিক্ষা করে ত্রিপুরার রাজার নিকট যান, তিনি তাকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা ছাড়া উপাধিও দিলেন, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য না স্বাভাবিক? দ্বিতীয়ত, ত্রিপুরার রাজাদের আশ্রয়পুষ্ট ঐতিহাসিকদের দ্বারাই রাজমালা লিখিত। সুতরাং ত্রিপুরার রাজাদের তিল পরিমাণ সাফল্যকে তাল পরিমাণ বর্ণনা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তাছাড়া রাজমালার এই অংশ ঘটনার প্রায় একশ বৎসর পরে লিখিত; সময়ের ব্যবধানে অনেক কল্পকাহিনী প্রচার হয়ে গেছে। অন্য সূত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ব্যতিরেকে রাজমালার বক্তব্য গ্রহণ করায় বাধা থেকে যায়। তৃতীয়ত, রাজমালার বর্ণনাও সন্দেহের উদ্রেক করে। বর্ণনা মতে সরাইলের জমিদার ঈসা খান শুধু যে ত্রিপুরা রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন তাই নয়, এই "যবন" জমিদারটি সরাসরি রাণীর অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পায়, এমনকি রাণীর স্তন ধৌত পানিও পান করে। এটা রীতিমত সন্দেহজনক, এবং এই কারণে রাজমালার সাক্ষ্য বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না।

Edited by Ripon Sarkar

এম. এ. রহীম ঈসা খানের উপাধি সম্পর্কে বলেন যে, দাউদ খান কররানী ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ তারিখে তুকারয়ের যুদ্ধে মোগল সুবাদার মুনিম খানের হাতে দাউদ কররানী পরাজিত হয়ে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন।[৯৪] ঐ একই সালের অক্টোবর মাসে মুনিম খান মহামারীতে গৌড়ে মৃত্যু বরণ করেন। এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সংগে দাউদ তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করেন। অন্যদিকে পূর্ব বাংলায় ঈসা খান মোগল নৌ-অধ্যক্ষ শাহ্‌-বরদীকে পরাজিত করে পিছু হটিয়ে দেন। এতে বুঝা যায় যে, ঈসা খান দাউদ কররানীর অনুগত ছিলেন। আবুল ফজলও বলেন:[৯৫]

He (Isa Khan) rendered service to them (the rulers of Bengal) and sent them presents, though he refrained from waiting upon them. আবুল ফজলের এই বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে এম. এ. রহীম বলেন:[৯৬]

"The rulers to whom he rendered service could be no other than the Karranis. Isa Khan never rendered any service to Emperor Akbar. On the contrary, he defied the Mughal Emperor right from the beginning. It was in recognition of his services that Daud Karrani conferred on him the title of Masnad-i-Ali.

এম. এ. রহীম এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি, বরং তিনি ঈসা খানের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

এম. এ. রহীমের উপরোক্ত সিদ্ধান্তও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান সরাইল পরগণার জমিদার ছিলেন, তিন বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দেও তিনি সরাইল পরগণার জমিদারই ছিলেন তিনি তার চেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী ছিলেন না। ঈসা খান শাহ্‌ বরদীর বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধে জয়লাভ করেই কি দাউদ কররানীর সুনজরে পড়ে যান? তাছাড়া তখন দাউদ কররানীর নিজের অবস্থা সংকটময়; চুক্তি ভঙ্গ করে তাঁর সম্পূর্ণ শক্তি মোগলদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত তাঁর প্রধান লক্ষ্য তখন তেলিয়াগড় সুরক্ষিত করে রাজমহল রক্ষার দিকে নিবদ্ধ। অল্প দিনের মধ্যে মোগল সেনাপতি খান জাহান ও তোডর মল্লের সঙ্গে তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়ে নিহত হন। এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার এক অখ্যাত (তখনও ঈসা খান মাত্র একটি পরগণার জমিদার) জমিদারকে সম্মানিত করার অবকাশ কি তাঁর ছিল? এর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কারণ তাঁর নিজের জীবন নিয়েই তিনি ব্যস্ত, পূর্ব বাংলাকে নিয়ে নয়। দ্বিতীয়ত, এম. এ. রহীম আবুল ফজলের যে বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ঈসা খান বাংলার সুলতানদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করলেও তিনি কোন সময় সুলতানের দরবারে যাননি। এরূপ লোককে সুলতান উপাধি দিয়েছেন মনে করার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আমাদের মনে হয় বার-ভূঁঞার নেতৃত্ব লাভের পরে ঈসা খান নিজেই মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে মসনদ-ই-আলা উপাধি

Edited by Ripon Sarkar

নতুন কিছু নয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে মজলিস, মজলিস-ই-আলা, মজলিস-উল-মজালিস ইত্যাদি উপাধি বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর অভাব ছিল না। আফগান আমলে স্বয়ং শের শাহ প্রথমে হযরত-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। সোলায়মান কররানী এবং তাজ খান কররানীর উপাধি ছিল যথাক্রমে হযরত-ই-আলা ও মসনদ-ই-আলা। এই উপাধিগুলি মূলত আফগান আমলের। সুতরাং আফগান আমলের জমিদার এবং আফগানদের প্রথা ও ঐতিহ্যে লালিত ও প্রভাবান্বিত ঈসা খানের মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করা বিচিত্র নয়। সামান্য পরগণার জমিদার ভাটি বা প্রায় সারা পূর্ব বাংলায় কর্তৃত্ব স্থাপনের পরে এবং বারংবার প্রবল পরাক্রান্ত মোগল শক্তিকে পর্যুদস্ত করার পরে ঈসা খান নিজে মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, ঈসা খান কখন ভাটির বিস্তীর্ণ এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হন? এই বিষয়ে আকবরনামায় কিছু আলোক পাওয়া যায়। মোগল সেনাপতি শাহবাজ খান ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে যে অভিযান চালান, তা প্রধানতঃ ঈসা খানের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ক্ষেত্র তখন ঢাকা, বিক্রমপুর, সোনারগাঁও, কতরাব ইত্যাদি এলাকায় বিস্তৃত, অর্থাৎ ঐ সময়ে ঈসা খান প্রায় সম্পূর্ণ ভাটি এলাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন এবং তখন তাঁর রাজধানী ছিল কতরাব। কতরাব লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত (পরে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।) এই সময়ে ঈসা খানের মিত্রদের মধ্যে মাসুম খান কাবুলীকেও দেখা যায়। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, আকবরের বিরুদ্ধে বাংলা বিহারস্থ তাঁর সেনাপতিরা যখন বিদ্রোহ করেন, সেই সুযোগে ঈসা খানও তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে আকবরের বিরুদ্ধে সেনাপতিদের এই বিদ্রোহ হয়, আকবর ক্রমে ক্রমে তাদের পরাজিত করে কিন্তু মাসুম খান কাবুলী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পরে আর আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেননি। তিনি ১৫৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে এক শিলালিপিতে নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা দেন, মাসুম খান কাবুলীকে কেউ সুলতান উপাধি দেননি, নিজেই তিনি এটা গ্রহণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানের অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করে আকবরনামায় বলা হয়ঃ[১৭] "Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness and made the 12 zamindars of Bengal subject to himself." অর্থাৎ এই সূত্রে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের আগেই ঈসা খান বার-ভূঁঞার নেতৃত্ব লাভ করেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের কথা বলে রালফ্ ফিচ্ও বলেন যে, ঈসা খান বার-ভূঁঞার নেতা ছিলেন।[১৮] সুতরাং ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঈসা খান তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, এবং মোগল সেনাপতিদের বিদ্রোহের সুযোগেই তিনি ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। তাঁর মিত্র মাসুম খান কাবুলী ১৫৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর অনুকরণে এবং অনুসরণে ঈসা খানও মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মনে হয়, ঈসা খান তাঁর রাজ্য যেমন স্বীয় বাহুবলে অর্জন করেন, মসনদ-ই-আলা উপাধিও নিজেই গ্রহণ করেন, কারও প্রদান করার প্রয়োজন ছিল না। এই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া না গেলেও ঈসা খানের দুর্যোগপূর্ণ বাল্য-জীবন, সাফল্যমণ্ডিত কর্মময় জীবন এবং মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজল কর্তৃক প্রশংসিত কূটনীতিজ্ঞান এই ধারণারই সাক্ষ্য বহন করে।

Edited by Ripon Sarkar

ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি

কিংবদন্তী মতে ঈসা খান ২২ পরগণার মালিক ছিলেন। জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত বিবরণে বলা হয় যে, আকবর ঈসা খানকে অনেক পরগণা দান করে সনদ দেন। "ইছা খাঁর পালাগানে" বলা হয় যে, আকবর দশ হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে ঈসা খানকে ২২ পরগণা দান করেন। আমরা আগেই বলেছি যে, ঈসা খান আকবরের দরবারে যাননি। সুতরাং আকবর কর্তৃক ২২ পরগণা দেয়ার কথা সত্য নয়। কিন্তু ঈসা খান যে ২২ পরগণা বা কমবেশি পরগণার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। কারণ মোগলদের বিরুদ্ধে ঈসা খানের যুদ্ধের যে বিবরণ আকবরনামায় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ ক্ষেত্র পূর্ব বাংলায় ভাটি এলাকায় বিস্তৃত ছিল। ঈসা খানের রাজ্যের প্রকৃত আয়তন বা সীমা-চৌহদ্দির সঠিক বিবরণ হয়ত এখন আর পাওয়া যাবে না, তবুও ২২ পরগণার মালিকানা সম্পর্কে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সেটা বোধ হয় খুব একটা মিথ্যা হবে না। সঠিক আয়তন ও সীমা চৌহদ্দি না হলেও ২২ পরগণার দ্বারা ঈসা খানের জমিদারীর মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যাবে। ভট্টশালী বলেনঃ[৯৯] That Isa Khan ultimately made himself master of 22 parganas, is universally known and remembered and the memory of the public in general is not likely to err very much in this respect.

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ঈসা খানের পরগণাগুলির নাম পাওয়া যায়। কেদার নাথ মজুমদারের রচিত "ময়মনসিংহের ইতিহাস" গ্রন্থে, ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এবং পূর্ব বঙ্গ গীতিকা "দেওয়ান ইছা খাঁর পালা। গানে।[১০০] তিনটি তালিকা পাশাপাশি দেয়া হল :

ময়মনসিংহের ইতিহাস	ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার	ইছা খাঁর পালা
১। আলপশাহী	১। আলপ সিংহ	১। আলপ সিংহ
২। মমিন শাহী	২। ময়মনসিংহ	২। মইমনসিংহ
৩। হোসেন শাহী	৩। হোসেন শাহী	৩। হোসেন শাহী
৪। বড় বাজু	৪। বড় বাজু	--
৫। মেরৌনা	--	--
৬। হেরৌনা	--	--
৭। খয়রানা	--	---
৮। শের আলী	--	--
৯। জাওয়াল বাজু	৫। জাওয়াল	৪। জাওয়াল
১০। দশকাহনিয়া বাজু	--	--
১১। সিরর জলকর	--	--
১২। সিংধা মাইন	৬। সিংধা	৫। সিংধা
১৩। সিং নসরত উজিয়াল	৭। নাসির উজিয়াল	৬। নাসির উজিয়াল
১৪। দরজী বাজু	৮। দরজী বাজু	৭। দরজী বাজু

Edited by Ripon Sarkar

ময়মনসিংহের ইতিহাস	ময়মনসিংহ গেজেটিয়ার	ইছা খাঁর পালা
১৫। হাজরাদি	৯। হাজরাদি	৮। হাজরাদি
১৬। জাফরশাহী	১০। জাফরশাহী	৯। জোয়ারশাহী
১৭। বলদা খাল	১১। বরদাখাত এবং বরদাখাত মগরা	১০। বরদাখাত
১৮। সোনারগাঁও	১২। সোনারগাঁও	১১। বরদাখাত মনরা
১৯। মহেশ্বরদী	১৩। মহেশ্বরদী	১২। স্বর্ণগ্রাম
২০। পাইতকারা	১৪। পাইতকারা	১৩। মহেশ্বরদী
২১। কতরাব	১৫। কতরাব এবং কুরিখাই	১৪। পাইতকারা
২২। গঙ্গামন্ডল	১৬। গঙ্গামন্ডল	১৫। কতরাব
	১৭। কাগমারী	১৬। গঙ্গামন্ডল
	১৮। আতিয়া	--
	১৯। শেরপুর	১৭। শেরপুর
	২০। খালিয়াজুরী	১৮। খালিয়াজুরী
	২১। জোয়ার হুসেনপুর	১৯। জোয়ার হুসেনপুর
	২২। জোয়ান শাহী	২০। জোয়ান শাহী
		২১। কুরিখাই

এই তিনটি তালিকায় গরমিল আছে, অবশ্য গরমিল থাকা স্বাভাবিক। কারণ কোন তালিকাই সমসাময়িক নয়। তাছাড়া দীর্ঘদিনের ব্যবধানে নামেরও পরিবর্তন হয়। তৃতীয় তালিকায় ২১টি নাম আছে, অর্থাৎ একটি নাম কম। এই তালিকায় বড় বাজুর নাম নেই। মেরৌনা, হেরৌনা, খরানা এবং শের আলীর নাম শুধু প্রথম তালিকাতে আছে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকায় শেরপুরের নাম আছে। মেরৌনা, হেরৌনা এবং খরানা, বড় বাজু পরগণার অংশ বিশেষ অর্থাৎ প্রথম তালিকায় তিনটি পরগণা কমে যাচ্ছে। এই বিরাট বড় বাজু পরগণাটি ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর তীরে বিস্তৃত। বর্তমানে এই পরগণার বিরাট অংশ ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। কাগমারী এবং আতিয়া পরগণার নাম শুধু দ্বিতীয় তালিকায় আছে, অথচ পুখরিয়া পরগণার নাম কোন তালিকাতেই নেই। পুখরিয়া পরগণাটি টাংগাইলের উত্তরে যমুনার ধারার বরাবরে জামালপুর, শেরপুর এবং নলিতাবাড়ির কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। আইন-ই-আকবরীর সরকার বাজুহায়, এটা একটি ভিন্ন পরগণা নামে উল্লেখিত। এই পুখরিয়া পরগণাও নিশ্চয়ই ঈসা খানের অধীনে ছিল। কারণ ঈসা খানের জমিদারীর মাঝখানে অন্য কারও কর্তৃত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং তালিকাগুলিতে পুখরিয়া পরগণার অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে তালিকাগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়। প্রথম তালিকায় সিয়র জলকর নামে একটি পরগণার উল্লেখ আছে। মোগল রাজস্ব তালিকায় রাজস্বকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, মাল এবং সিয়র বা সায়ের। ভূমি রাজস্বকে মাল এবং অন্যান্য সকল কর, যেমন বাহর্বণিজ্য শুল্ক, অন্তর্বাণিজ্য শুল্ক, জলকর ইত্যাদিকে সায়ের বলা হত। আইন-ই-আকবরীতে প্রত্যেক সরকার কয়েকটি পরগণা বা মহালে বিভক্ত কিন্তু পরগণার তালিকার মধ্যে সায়ের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং সায়ের জলকর কোন পরগণার নাম নয়, ভূমি রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য শুল্কের বা করের, বিশেষ করে

Edited by Ripon Sarkar

জলকরের জন্য এটা ব্যবহৃত।[১০১] একে বর্তমানের জলমহালের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। হোসেন শাহী পরগণা প্রত্যেক তালিকাতেই আছে, কিন্তু জোয়ার হোসেনপুর শুধু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তালিকাতেই আছে। জোয়ার হোসেনপুর হোসেনশাহী পরগণার ক্ষুদ্র অংশ। দ্বিতীয় তালিকার বরদাখাত মনরা, তৃতীয় তালিকার বরদাখাত মনরার সঙ্গে বোধ হয় অভিন্ন। এইগুলি বরদাখাত পরগণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হতে পারে। কুরিখাই একটি ছোট পরগণা, জোয়ান শাহী, বরদাখাত এবং মহেশ্বরদী পরগণাগুলির মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এই তালিকাগুলিতে ভাওয়াল পরগণার উপস্থিতি প্রণিধানযোগ্য। ভাওয়ালের জমিদার গাজীরাও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ঈসা খান ও তৎপুত্র মুসা খানের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সুতরাং ভাওয়াল ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এই কারণে ভট্টশালী মনে করেন যে, তালিকাগুলির ভাওয়াল প্রকৃতপক্ষে রন ভাওয়াল এবং তিনি রন ভাওয়ালের নিম্নরূপ বিবরণ দেন।[১০২]

> Bhawal Baju proper belonged to the Ghazi zamindars from a period anterior to the rise of Isa Khan. The Bhawal under Isa Khan must be taken as Ran-Bhawal. This pargana is bounded on the east by the Brahmaputra, on the south by the Bhawal pargana of the Dacca district (the river Banar, known as the Kaoraid river, runs, between Bhawal and Ran Bhawal), on the north by the pargana of Alapsing and on the west by the pargana of Atia.

কেল্লা বুকাইনগর মুমিনশাহী পরগণায় অবস্থিত। পরে দেখা যাবে যে, এই কেল্লা খাজা উসমানের অধীনে ছিল। এখান থেকে মোগল বাহিনী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে উসমান সিলেটে চলে যান। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই তালিকাগুলির কোনটিতেই সরাইল পরগণার নাম নেই, অথচ আমরা আগে দেখেছি যে, ঈসা খান প্রথমে সরাইল পরগণাতেই ক্ষমতায় আরোহণ করেন। সরাইল থেকেই তিনি ক্ষমতা বিস্তার করে বার-ভুঁঞার নেতৃত্বে বরিত হন। তালিকাগুলিতে সরাইলের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে, তালিকাগুলি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবে ঈসা খানের কর্মকাণ্ড এই পরগণাগুলিতেই বিস্তৃত ছিল।[১০৩]

আমরা ঈসা খানের পিতৃ-পরিচয়, বাল্যজীবন, ক্ষমতায় আরোহণ, মসনদ-ই-আলা উপাধি এবং ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আগেই বলা হয়েছে, ঈসা খান আকবরের রাজত্বকালে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পরলোকগমন করেন। মানসিংহ তখন বাংলার মোগল সুবাদার। ঈসা খানের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র মুসা খান, দাউদ খান, আবদুল্লাহ খান, মাহমুদ খান এবং ঈসা খানের ভাইপো আলাওল খান মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। বাহরিস্তানে দেখা যায়, মুসা খান পিতার মসনদ-ই-আলা উপাধি গ্রহণ করেন। মুসা খান এবং তাঁর ভাইয়েরা প্রাণপণ যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মুসা খানের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র মাসুম খান এবং মাসুম খানের পরে তৎপুত্র মুনওওর খান মোগলদের অনুগত ছিলেন।

Edited by Ripon Sarkar

ঈসা খান মসনদ-ই-আলা কি দুই জন?

রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন বলেন যে, ঈসা খান দুইজন ছিলেন, একজন খিজিরপুরের ঈসা খান মসনদ-ই-আলা এবং অন্য জন সরাইলের ঈসা খান মসনদ-ই-আলা।[১০৪] তাঁর এই উক্তির স্বপক্ষে তিনি নিম্নরূপ যুক্তি দেন ঃ ১ম, সরাইলের ঈসা খান ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্য থেকে মসনদ-ই-আলা উপাধি পান, কিন্তু খিজিরপুরের ঈসা খানকে এই উপাধি দেন মোগল সম্রাট আকবর। ২য়, খিজিরপুরের ঈসা খানের ২২ পরগণার যে তালিকা পাওয়া যায় তাতে সরাইলের নাম নেই। ৩য়, কালীপ্রসন্ন বাবু খিজিরপুরের ঈসা খানের এবং সরাইলের ঈসা খানের দুটি ভিন্ন ভিন্ন বংশ তালিকা দেন এবং বলেন যে, ঈসা খান দুজন না হলে বংশ তালিকা ভিন্ন ভিন্ন হত না। বলা বাহুল্য, কালীপ্রসন্ন সেনের এই যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আগেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছি। এই কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, ঈসা খান কোন দিন আকবরের দরবারে যাননি, এবং আকবর কর্তৃক তাঁকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেয়ার কথা কাল্পনিক ছাড়া আর কিছুই নয়। আকবরনামায় এই রূপ কোন উক্তি নেই। দ্বিতীয় ২২ পরগণার যে তালিকা পাওয়া যায়, সেই তালিকাও বিশ্বাসযোগ্য কিনা সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ ২২ পরগণার নাম কোন সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায় না, এই নামগুলি পরবর্তীকালে কল্পকাহিনীর ভিত্তিতে লিখিত সূত্রে প্রকাশ। তাই সরাইল পরগণার নামের অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। তৃতীয়ত, ঈসা খানের যে দুটি বংশ তালিকা দেয়া হয়েছে, সেগুলিও ত্রুটিপূর্ণ। প্রথম তালিকা অবিশ্বাস করার প্রধান কারণ এই যে এই তালিকায় মুসা খান এবং তাঁর ভাইদের এবং মুসা খানের ছেলে মাসুম খানের নাম নেই অথচ বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে এবং বাদশাহনামা প্রমুখ প্রামাণ্য এবং সমসাময়িক ইতিহাসে তাঁদের নাম পাওয়া যায়। প্রথম তালিকায় যদি এত বড় ভুল থাকতে পারে, দ্বিতীয় তালিকা যে নির্ভুলযোগ্য হবে তার কি প্রমাণ আছে? সুতরাং আমাদের মনে হয়, ঈসা খান একজনই ছিলেন এবং প্রথমে তিনি সরাইলে ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে বার-ভূঁঞার নেতৃত্ব বরিত হন।

ইবরাহীম নারাল ও করিমদাদ মুসাজাই

এঁরা দুজনেই ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে খান জাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ঈসা খান মসনদ-ই-আলাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। আকবরনামায় তাঁদের জমিদারীর উল্লেখ নেই। ভট্টশালী মনে করেন যে, তাঁরা যথাক্রমে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণার জমিদার ছিলেন।[১০৫]

মজলিশ দিলাওয়ার ও মজলিশ প্রতাপ

এঁরা দুজনও ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে খান জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আকবারনামায় তাঁদের জমিদারীরও উল্লেখ নেই। ভট্টশালী মনে করেন যে, তাঁরা যথাক্রমে জোয়ানশাহী ও খালিয়াজুরী পরগণার জমিদার ছিলেন।[১০৬] স্যার যদুনাথ সরকার মনে করেন যে, মজলিশ প্রতাপের নাম মজলিশ কুতুব, ভুলে প্রতাপ লেখা হয়েছে।[১০৭] জাহাঙ্গীরের সময়ে মজলিশ কুতুবকে ফতহাবাদের জমিদার রূপে দেখা যায়।

Edited by Ripon Sarkar

ভাওয়ালের গাজী পরিবার

জেমস ওয়াইজ নিম্নরূপে ভাওয়ালের ভৌগোলিক পরিচিত দেন,[১০৮]

On the north of Dhaka, extending towards the Garo Hills lies the jungly tract of Bhawal. Its soil chiefly consists of red laterite. Its surface is traversed by numerous rivers which flow through a hilly and generally barren country. It is the home of the sal tree and of the wild date palm; and at the present day various Hinduized tribes, calling themselves Kochh-Mandi and Surajbansi, are found settled in villages throughout the forest. Its most northern portion, still known as Ran-Bhawal, formerly belonged to the kingdom of Kamrup.

ওয়াইজ ভাওয়ালের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন এবং পাল রাজাদের রাজবাড়ি নামে কথিত কিছু কিছু প্রাচীন স্থানের বিবরণ দেন। গাজীদের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে তিনি কিছু কাহিনী সংগ্রহ করেন। কাহিনী মতে, অনেক দিন আগে, আনুমানিক চৌদ্দ শতকের প্রথমদিকে পাহলওয়ান শাহ নামে একজন সাধু পুরুষ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভাওয়ালে আগমন করেন এবং স্থানীয় অমুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বীয় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর ছেলে কার ফরমান সাহেবও একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তিনি একবার দিল্লী গিয়ে অসাধ্য সাধন করে সম্রাটের সুনজর লাভ করেন। সম্রাট তাঁকে ভাওয়ালের জমিদারী দিয়ে এক সনদ প্রদান করেন। শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে কালিগঞ্জের নিকটে চৌরা নামক স্থানে তিনি বসতি স্থাপন করেন। কার ফরমান সাহেবের ১৫তম অধস্তন বাহাদুর গাজী। বাহাদুর অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁর ভাই মাহতাব গাজী জমিদারী লাভ করেন। ওয়াইজের সংগৃহীত তথ্য মতে, আকবরের সময় মাহতাব গাজীই ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন। ওয়াইজ আরও জানতে পারেন যে, গাজীদের জমিদারী চাঁদ প্রতাপ বা চাঁদ গাজী, তালিবাবাদ বা তালা গাজী এবং ভাওয়াল বা বড় গাজী নামে পরিচিত ছিল।[১০৯]

ওয়াইজ প্রকৃতপক্ষে গাজীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। প্রমাণ্য সূত্রে ভাওয়ালের গাজীদের প্রথম নাম পাওয়া যায় ফজল গাজী। দেওয়ানবাগে প্রাপ্ত সাতটি কামানের একটিতে শের শাহের নামের সঙ্গে সঙ্গে 'আয্ ফজল গাজী' বা 'ফজল গাজীর নিকট থেকে' কথাও খোদিত আছে।[১১০] কামানটি শের শাহ্র নাম বহন করে, কিন্তু এটি ফজল গাজীর নিকট থেকে প্রাপ্ত, অর্থাৎ ফজল গাজী কামানটি যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য শের শাহকে দেন। অতএব ফজল গাজী শের শাহ্র সমসাময়িক, অর্থাৎ অন্ততপক্ষে ১৫৩৮ খ্রিঃ থেকে ১৫৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ভাওয়ালের গাজী পরিবারে প্রাপ্ত একখানি সনদের ভিত্তিতে ভট্টশালী গাজীদের নিম্নরূপ বংশ তালিকা তৈরি করেন।[১১১]

Edited by Ripon Sarkar

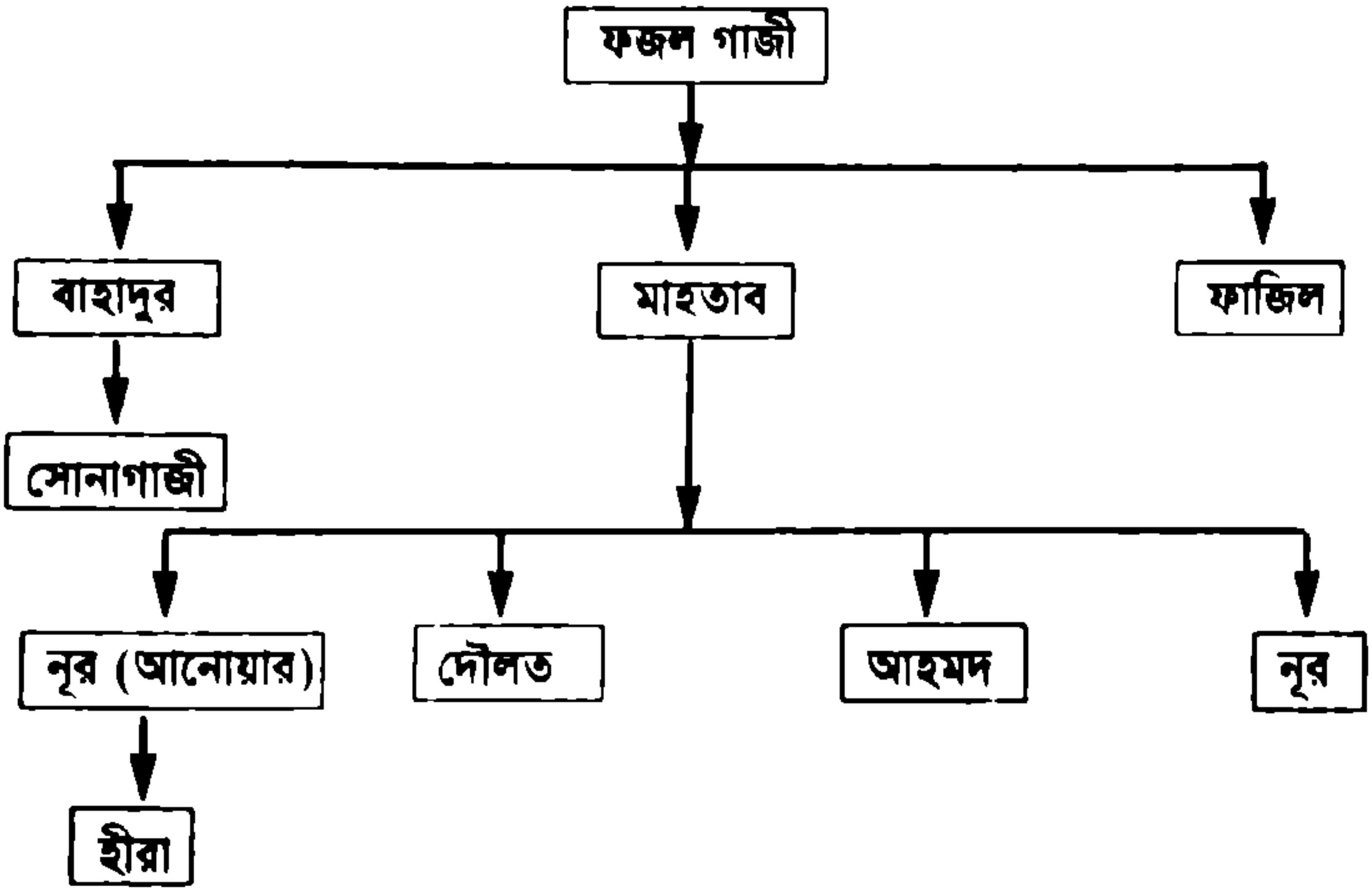

বাহাদুর গাজী আকবরের সময় জীবিত ছিলেন। উক্ত সনদ মতে বাহাদুর গাজী আকবরকে ৪৮,৩৭৯ টাকা ব্যয়ে ৩৫ খানি সুন্দর ও কোশা জাতের যুদ্ধ নৌকা সরবরাহের জন্য স্বীকৃত হন। কিন্তু বাহরিস্তানে দেখা যায় যে, বাহাদুর গাজী মুসা খানের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে বিস্তর যুদ্ধ করেন। বুঝা যায় যে, আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে বা আকবরের মৃত্যুর পরে বাহাদুর গাজী বিদ্রোহ করেন এবং অন্যান্য ভূঁঞাদের সঙ্গে বিশেষ করে মুসা খানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। এই পরিবারে আরও একজন গাজীর নাম পাওয়া যায়, তিনি আনেয়ার গাজী। উপরোক্ত সনদে আনোয়ার গাজীর নাম নেই, কিন্তু যেহেতু নূর নামে মাহতাবের দুজন ছেলের নাম আছে, সেহেতু মনে করা যায় যে, একজনের নাম নূর না হয়ে আনোয়ারই হবে।

এ ছাড়া আরও কয়েকজন গাজীর নাম পাওয়া যায়, যেমন চাঁদ গাজী, সুলতান গাজী, সেলিম গাজী, কাসিম গাজী এবং তালা গাজী। এঁদের সঙ্গে ভাওয়ালের মূল গাজী বংশের সম্পর্ক কি ছিল বা আদৌ সম্পর্ক ছিল কিনা নির্ণয় করা যায় না। তবে এদের নামানুসারে চাঁদ প্রতাপ, সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ, কাসিমপুর এবং তালিবাবাদ (বা তালিপাবাদ) পরগণাগুলির নামকরণ হয়। মনে হয়, এই গাজীরা ভাওয়ালের গাজী বংশের শাখা প্রশাখা। আকবরনামায় ভাওয়ালের জমিদার তালা বা টিলা গাজীর নাম পাওয়া যায়। তিনি মোগল সুবাদার খান জাহানের পশ্চাদপসরণের সময় খান জাহানকে সাহায্য করেন।[১১২] এই সূত্রে তালা বা টিলা গাজী ১৫৭৮-৮০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। চাঁদ প্রতাপ পরগণার পরিচিতি আগে দেয়া হয়েছে, বাহরিস্তানে নাবোদ বা বিনোদ রায়কে চাঁদ প্রতাপের জমিদার বলা হয়েছে। মনে হয়, মোগল প্রতিপক্ষ ছাড়াও ভূঁঞা জমিদারদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলও কম ছিল না, যার ফলে পরগণাগুলির হাত বদল হয়। চাঁদ প্রতাপের আশেপাশেই সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ, কাসিমপুর এবং তালিপাবাদ অবস্থিত। সেলিম প্রতাপ চাঁদ প্রতাপের উত্তরে, পশ্চিমে বংশী এবং ধলেশ্বরী এবং পূর্বে তুরাগ নদীর মধ্যবর্তী স্থানে কাসিমপুর, সুলতান প্রতাপ এবং তালিপাবাদ পরগণা।

Edited by Ripon Sarkar

মাতঙ্গ এর পাহলোয়ান

বাহরিস্তানে মাতংগ এর পাহলোয়ান এর উল্লেখ আছে. তিনিও মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, সরাইলের উত্তরে এবং তরফের দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পরগণা মাতঙ্গ নামে পরিচিত ছিল।[১১৩] বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সিলেট জেলাদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান মাতঙ্গ। বাহরিস্তানের বিরবণে মাতঙ্গ এর পাহলোয়ানকে অত্যন্ত সাহসী রূপে পরিচিতি দেয়া হয়েছে, তিনি মুসা খানের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে মোগলদের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ করেন।

হাজী বাকাউলের পুত্র শয়খ পীর

বাহরিস্তানে মুসা খানের মিত্র রূপে তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী

বাহরিস্তানে মুসা খানের মিত্র রূপে তাঁর উল্লেখ আছে। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, তিনি মুসা খানের অধীনস্থ একজন সেনানায়ক ছিলেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষায় তিনি নিযুক্ত থাকতেন।[১১৪] মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণের পরে তিনি মাতঙ্গ এর পাহলোয়ানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন।

বায়েজীদ কররানী

কররানীদের পতনের পরে আফগানরা প্রায় সমস্ত সিলেটে ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের সকলের নেতা ছিলেন বায়েজীদ কররানী এবং তাঁর ভাই ইয়াকুব। তাঁদের অধীনে হাতি ছিল এবং সিলেটের পার্বত্য অঞ্চলে হাতির সাহায্যে তাঁরা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। খাজা উসমানের সঙ্গে তাঁদের মিত্রতা ছিল। তাঁরা মোগলদের অনেকদিন প্রতিরোধ করেন। উসমানের পতনের পরেই তাঁরা মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। একমাত্র বাহরিস্তান ছাড়া অন্য কোথাও বায়েজীদ কররানীর নাম পাওয়া যায় না।

বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খান

তিনি হবিগঞ্জস্থ বানিয়াচঙ্গের জমিদার ছিলেন। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে, তিনি মুসা খান মসনদ-ই-আলার মতই একজন সাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। আনোয়ার খান এবং তার ভাই হুসেন খান প্রথমে মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করার ভান করেন কিন্তু পরে সুযোগ বুঝে মুসা খান এবং খাজা উসমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে মোগলদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলেন। পরে অবশ্য তাঁরাও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

খাজা উসমান

আগে বলা হয়েছে যে, দাউদ কররানীর পতনের অব্যবহিত পূর্বে কতলু লোহানী এবং শ্রীহরি মোগল সুবাদার খান জাহানের পক্ষে দাউদ কররানীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ শ্রীহরি যশোর এবং কতলু

Edited by Ripon Sarkar

খান উড়িষ্যার কর্তৃত্ব লাভ করেন। কিন্তু কতলু খান বেশি দিন শান্তিতে রাজ্য ভোগ করতে পারেননি। কতলু লোহানী বিদ্রোহ করলে মোগলরা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে কতলু লোহানীর মৃত্যু হয়। কতলুর মন্ত্রী এবং ভাই খাজা ঈসা বা ঈসা খান মিয়া খেল কতলুর অল্প বয়স্ক ছেলে নাসিরকে সিংহাসনে বসিয়ে মোগলদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্তানুসারে তারা মোগলদের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে। কিন্তু শীঘ্রই মন্ত্রী খাজা ঈসার মৃত্যু হলে উড়িষ্যার আফগানরা আবার মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। মানসিংহ তখন উড়িষ্যার মোগল সুবাদার, তিনি আফগানদের কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি আফগান বিদ্রোহ দমন করে আফগানদের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেন যাতে তারা পুনরায় একত্রিত হয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ না পায়। তিনি কতলু খানের মন্ত্রী খাজা ঈসার ছেলে সোলায়মান এবং উসমান ও আরও তিনজনকে খলীফতাবাদের জাগীর দিয়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে, অন্যান্য আফগান নেতাদের এত নিকটে তাদের পাঠানো বিপদজ্জনক, তাই তিনি তাঁর পূর্ব আদেশ বাতিল করেন। কিন্তু আফগানরা তাঁর দ্বিতীয় আদেশ লংঘন করে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা পথিমধ্যে লুট করতে করতে অগ্রসর হন এবং সাতগাঁও[১১৫] বন্দরে পৌছেন। সাতগাঁও বন্দর দখল করতে ব্যর্থ হয়ে তারা ভূষণার চাঁদ রায়ের জমিদারীতে যান। চাঁদ রায় তাঁর পিতার পরামর্শে আফগানদের হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। দিলাওয়ার, সোলায়মান এবং উসমান ভূষণার অদূরে শিবির স্থাপন করেন। চাঁদ রায় তাঁদের নিমন্ত্রণ করেন এবং কৌশলে দিলাওয়ারকে বন্দী করেন, সোলায়মান এবং উসমান চাঁদ রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। চাঁদ রায়ের সৈন্যদের মধ্যে অনেক আফগান ছিল, তাঁরা সোলায়মান এবং উসমানের পক্ষ অবলম্বন করে। ফলে যুদ্ধে চাঁদ রায় নিহত হয় এবং আফগানরা দুর্গ অধিকার করে। ঈসা খানের চেষ্টায় তাদের মধ্যে সমঝোতা হয় এবং আফগানরা দুর্গটি চাঁদ রায়ের পিতা কেদার রায়কে প্রত্যর্পণ করে।[১১৬]

আকবরনামার উপরোক্ত বিবরণ বিভ্রান্তিমূলক। ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরাও এই বিষয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, খাজা উসমান ও তাঁর সঙ্গীরা সাতগাঁও থেকে বিতাড়িত হয়ে (কে বিতাড়ন করেন তার উল্লেখ নেই) ভূষণায় যান এবং স্থানীয় জমিদার চাঁদ রায়ের পুত্র কেদার রায়কে হত্যা করেন এবং ভূষণা লুট করে ঢাকায় গিয়ে ঈসা খান মসনদ-ই-আলার সঙ্গে মিলিত হন।[১১৭] কিন্তু আমরা ইতোপূর্বে দেখেছি যে, আকবরের সময়ে ভূষণার জমিদার ছিলেন মুকুন্দরায় এবং পরে মুকুন্দরায়ের পুত্র শত্রুজিত যিনি জাহাঙ্গীরের সময়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। স্যার যদুনাথ সরকারও একথা স্বীকার করেন।[১১৮] ভূষণায় ঐ সময়ে (১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে) যখন খাজা উসমান ও তাঁর সংগীদের উড়িষ্যা থেকে বিতাড়ন করা হয়, চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের অস্তিত্ব দেখা যায় না। চাঁদ রায় বা কেদার রায় দুই ভাই ছিলেন শ্রীপুর বা বর্তমান মুন্সীগঞ্জের জমিদার। ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ শ্রীপুরে চাঁদ রায়কে দেখেন। ফিচ্ বলেন যে, এঁরা সবাই সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ছিলেন। অথচ স্যার যদুনাথ চাঁদ রায় এবং কেদার রায়কে কিভাবে ভূষণার জমিদার রূপে উল্লেখ করেন তা বোধগম্য নয়।

Edited by Ripon Sarkar

এম. এ. রহীম এই বিষয়ে কিছু নতুন কথা বলেন। তিনি বলেন যে, মানসিংহ কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে খাজা উসমান ও তাঁর ভাইয়েরা শ্রীপুরে কেদার রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পরে ঈসা খান খাজা উসমানকে বুকাইনগরের জমিদারী দান করেন।[১১৯] রহীম আবার অন্য স্থানে ঈসা খানের নেতৃত্বের গুণাবলী বর্ণনা করে বলেন যে, ঈসা খান শ্রীপুরের কেদার রায়কে আফগান নেতৃদ্বয় সোলায়মান এবং উসমানের হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি (ঈসা খান) সোলায়মানকে কেদার রায়ের সেনাপতি নিযুক্ত করে উভয় পক্ষের (কেদার রায় ও উসমান এবং সোলায়মান) ঝগড়া মীমাংসা করেন এবং নিজের (ঈসা খানের) জমিদারী বুকাইনগরে উসমানকে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২০] এম. এ. রহীম ঠিকই বলেছেন যে, কেদার রায় শ্রীপুরের জমিদার ছিলেন। তিনি ভূষণায় চাঁদ রায় এবং কেদার রায়ের অস্তিত্বের কথা বলেননি। কিন্তু ঈসা খান নিজের জমিদারী বুকাইনগর খাজা উসমানকে দেবেন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা আগেই বলেছি যে, বুকাইনগর আদৌ ঈসা খানের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা সন্দেহ। তবে সত্য এই যে, খাজা উসমানকে বুকাইনগরে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এখান থেকে সুবাদার ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে খাজা উসমান সিলেটে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই তিনি মোগলদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। খাজা উসমান ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনচেতা, তিনি জীবন দেন কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য খাজা উসমানের মোগল বিরোধী কার্যকলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেনঃ[১২১]

> Khwaja Usman son of Isa khan Lohani Miankhel, was probably the most romantic figure in the history of mediaeval Bengal. He proved to be the most valiant and redoubtable champion of Afghan independence; and as such the most formidable enemy of the Mughal peace in Bengal. Though he did not possess the political authority, territorial strength, and military resources of Musa khan, Usman seems to have excelled him in personal valour, dash and vigour, and tenacity of purpose, and, above all, in the love of freedom, all of which combined to inspire and sustain him in his defensive warfare against the expanding Mughal power till his death in the field of battle. Driven out from Orissa, Usman had established himself in the region east of the Brahmaputra in the Mymensingh District with the city of Bokainagar as his stronghold.

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, খাজা উসমান এবং তাঁর সঙ্গী আফগানরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাহুবলে বুকাইনগর দখল করেন। আকবরনামায় খাজা উসমান ও অন্যান্য আফগানেরা চাঁদ রায়কে হত্যা করার কথা আছে। হতে পারে যে শ্রীপুরের চাঁদ রায়কে তাঁরা হত্যা করেন, বুকাইনগর হয়ত চাঁদ রায়ের জমিদারীর অংশ হতে পারে। জমিদারী যে সংলগ্ন এবং লাগোয়া ছিল এমন মনে করার কোন কারণ নেই, জমিদারী বিচ্ছিন্ন এলাকায়ও থাকতে পারে। তাঁদের সঙ্গে খাজা উসমান এবং অন্যান্য আফগানদের মনোমালিন্যের পরে হয়ত খাজা উসমান এবং তাঁর সঙ্গীরা

Edited by Ripon Sarkar

বুকাইনগর দখল করেন। খাজা উসমানের হাতে চাঁদ রায়ের নিহত হওয়ার কথা সত্যও হতে পারে।

চিলাজওয়ারের পীতাম্বর ও অনন্ত

পিতাম্বর রাজশাহীর পুটিয়া রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ। নাটোর-রাজশাহী মহা-সড়কের প্রায় মধ্যবর্তী স্থান থেকে একটি শাখা রাস্তা গঙ্গার তীরে সরদহ (সারদা) পর্যন্ত চলে গেছে। পুটিয়া এই শাখা রাস্তায় অবস্থিত। পুটিয়া লস্করপুর পরগণায় এবং চিলাজওয়ার ভাতুরিয়া পরগণায় অবস্থিত। সুতরাং পীতাম্বর রাজশাহী পাবনা এলাকার একটি বড় অঞ্চলের জমিদার ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে প্রকাশ পিতাম্বর আকবরের সময় লস্করপুর পরগণার জমিদারী লাভ করেন। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে, সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সময়ে পিতাম্বর প্রথমে মোগলদের অনুগত ছিলেন, কিন্তু পরে কর দেয়া বন্ধ করে দেন। কিন্তু তাঁকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করা হয়। পিতাম্বরের ছোট ভাই নীলাম্বর এবং নীলাম্বরের ছেলে অনন্ত।

আলাইপুরের আলা বখশ

আলা বখশের পিতার নাম বরখুরদার। পুটিয়ার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে আলাইপুর। লস্কর খান ছিলেন আলাইপুরের জমিদার। লস্কর খান বিদ্রোহ করলে তাঁকে জমিদারীচ্যুত করে আলাইপুর পিতাম্বরকে দেয়া হয়। বরখুরদারের ছেলে আলা বখশ লস্কর খানের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়। জাহাঙ্গীরের সময় আলা বখশ মিরযা নাথনের হাতে পরাজিত হন। (চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত)।

বার-ভুঁঞা ও তাদের শাসিত অঞ্চল

আগেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বার-ভুঁঞা সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন। প্রায় সকলেই মনে করেন যে, বা-ভুঁঞার "বার" সংখ্যা দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভুঁঞাকে বুঝায়। এর প্রধান কারণ এই যে তাঁরা সারা বাংলার স্বাধীন, অর্ধ-স্বাধীন সকল ভুঁঞাকে বার-ভুঁঞার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বার ভুঁঞার প্রকৃত পরিচয়, তাদের উৎপত্তির কারণ এবং তাদের শাসিত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখা নির্ধারণ করার সহায়ক তথ্যাদির অভাব রয়েছে, কিন্তু যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাও নগণ্য নয়। বার-ভুঁঞা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা রক্ষা করেন এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে (১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে) তাঁদের স্বাধীনতা লোপ পায়। তাঁরা মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। সুতরাং আবুল ফজলের আকবরনামা, আইন-ই-আকবরী এবং মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বার-ভুঁঞা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, এবং পরে দেখা যাবে যে এই তথ্যগুলিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য এবং সত্য নির্ধারণে সহায়ক, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এই তথ্যগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারেননি। দ্বিতীয় প্রকারের তথ্য হচ্ছে ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণ। হেনরী ব্লখম্যান, হেনরী বেভেরীজ, রেভারেন্ড এইচ. হস্টেন এবং

Edited by Ripon Sarkar

সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এই বিবরণগুলি পরীক্ষা করেছেন এবং এর ভিত্তিতে তাঁদের মতামত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করেননি যে তথ্যগুলি সমসাময়িক হলেও বিভ্রান্তিপূর্ণ। এই ইউরোপীয় লেখকদের অনেকেই বাংলাদেশে আসেননি, বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যের আলোকে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁরা বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা তাঁদের মূখ্য উদ্দেশ্যও ছিল না, অনেক বিষয়ের মধ্যে তাঁরা এই বিষয়েও আলোকপাত করেন। ফলে তাঁদের বক্তব্য অস্পষ্ট, এবং বক্তব্যের উপর নির্ভর করে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিভ্রান্ত হয়েছেন।

ইউরোপীয় লেখকদের বিবরণ নিম্নরূপ

নিকোলাস পাইমেন্টা ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় অবস্থানরত খ্রিস্টান মিশনারীদের নিকট থেকে কতকগুলি চিঠি পান। এই চিঠিগুলির ভিত্তিতে ডু-জারিক ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে নিম্নরূপ লিখেনঃ[১২২]

> This country of Bengala, which comprises about two hundred leagues of sea-coast, was inhabited partly by native Bengalis, who are generally pagans, partly by Saracens, for the most part Patans or Parthians (Persians), who having been driven from the kingdom of Mogor, which they had seized upon, withdrew to this country, where they established themselves under the government of a king of theirs; shortly after, however, the Mogors attacked them, and, having killed their king and the chief of their leaders, they took themselves, possession of the country. They did not keep it long, however, the twelve Lords, the governors of the twelve kingdoms, which the said king of the Patans possessed, leagued together, dispossessed the Mogor, and usurped each of the state which they governed; so much so that they are now sovereign lords and acknowledge no one above them. Yet, they do not call themselves kings, though they consider themselves such; but, Boyons, which means perhaps the same as Princes. All the Patans and native Bengalis obey the Boyons: three of them are Gentiles, namely those of Chandecan, of Siripur and of Bacala. The others are Saracens; however, the king of Aracan, called king of the Mogos, also holds part of it.

ডু-জারিকের আর একটি মন্তব্য নিম্নরূপঃ[১২৩]

> The great Mogor attacked them with a powerful army, and having killed the tyrant (king Daud), who had usurped this country with his chief partisans, he left the government of that kingdom in the hands of twelve persons who plotting secretly against him subdued those of Mogor, and are at present very powerful lords, especially those of Siripur and Chandecan; but above all the Masandolin or Massodolin, as some call him. The king of Arracan also possessed part of it, even of

Edited by Ripon Sarkar

what is on the frontiers, towards the great harbour, where lies Chatigan (Chittagong). Of these twelve lords nine are Mahometans, which much retards the progress of the faith.

পর্তুগীজ আর এক বিবরণে পাওয়া যায়ঃ[১২৪]

About 1605, Philip de Brito de Nicote tried to persuade the king of Arakan that he would make him Emperor "Of the whole of Bengal, of the Bojoes, (or twelve lords), each of them a sovereign in his own territory, and all of them united against the Mogor king and against the Mogo (Magh), and of his other enemies. "These" twelve Bujoes of Bengala "ruled over all the low lands (?) watered by the Ganges.

১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ ডোম পেড্রো লিসবন থেকে গোয়ার ভাইসরয় ডোম জেরোনিমো ডি আজেবেদোর নিকট লিখেনঃ[১২৫]

In another letter of mine, sent with this packet, you will see what I write to you about the affairs of Siriao (Pegu). After this I was informed that the Mogor sent one of his captains with a great army to Bengala and took the whole of Siripur near (Island of) Sundiva, where he fortified himself, and the twelve Bojoes tendered him their submission and that he determined to march upto Chatigao (Chittagong) and pass into Aracao; and that at the very time when the Mogor marched against Siripur, the Mogo went to Bengala with all his fleet, for the sake of attacking his neighbour, the king of Tupara (Tippera) but that he withdrew to Aracao, leaving the greater part of his fleet and artillery at Chatigao.

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, বক্তব্যগুলি সাধারণভাবে লিখিত, এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির আভাস পাওয়া গেলেও তথ্য হিসাবে বিশেষ সহায়ক নয়। ডু-জারিকের বক্তব্যে প্রথমত বাংলার উপকূলের বিবৃতি এবং হিন্দু মুসলিম জনগণের কথা বলা হয়েছে, এটা জানা কথা, নতুনত্বের কিছু নেই। পাঠানকে পার্থিয়ান বলা হয়েছে, যাকে অনুবাদক পার্শিয়ান করেছেন। এটা সঠিক নয়, এটা তৎকালীন ইউরোপীয় লেখকদের অজ্ঞতাপ্রসূত। পাঠানরা পারস্য থেকে আগত নয়, তাছাড়া যাদের পাঠান বলা হয়েছে, তারা ছিল প্রকৃতপক্ষে আফগান।[১২৬] অতঃপর বলা হয়েছে যে পাঠানরা মগরদের (মোগলদের) দেশ অধিকার করেছিল, সেখান থেকে তারা (পাঠানরা) বিতাড়িত হয়। এখানে হয়ত মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে বিতাড়িত করে পাঠান (প্রকৃতপক্ষে আফগান) শেরশাহ কর্তৃক দিল্লী বা মোগল সাম্রাজ্য অধিকার, পরে হুমায়ুনের দিল্লী পুনরাধিকার এবং আকবর কর্তৃক কররানী আফগান দাউদ কররানীকে পরাজিত করার কথা বলা হতে পারে। অতঃপর বারজন ভূঁঞার কথা বলা হয়েছে, তারা দেশকে বারটি রাজ্যে বিভক্ত করে, তারা স্বাধীন রাজার উপাধি না নিয়ে নিজেদের ভূঁঞা রূপে পরিচয় দিলেও তারা নিজেদের স্বাধীন মনে করত। তাদের মধ্যে চণ্ডীকান,

Edited by Ripon Sarkar

শ্রীপুর ও বাকলার ভূঁঞারা ছিল হিন্দু, বাকি নয়জন মুসলমান, মুসলমান ভূঁঞা বা তাদের রাজ্যের নাম নেই। একজন মুসলমান ভূঁঞাকে মসনদলিন বা মান্দুদলিন উপাধিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে, বাংলার কিছু অংশ, বিশেষ করে চট্টগ্রাম বন্দর আরাকানের রাজার অধীনে ছিল।

ডু-জারিক ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে লিখিত চিঠির ভিত্তিতে এই সাধারণ তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তিনটি হিন্দু রাজ্যের নাম করেছেন, নয়টি মুসলিম রাজ্যের কোনটির নাম করেননি। একজন ভূঁঞার উপাধি দিয়েছেন, কিন্তু রাজ্য বা ভূঁঞার নাম দেননি। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সংকটজনক, ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে দাউদ কররানীর হত্যার পর থেকে ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধ চলছিল, প্রচুর লোক ও সম্পদ ক্ষয় হচ্ছিল, সারা দেশ অশান্তিতে পূর্ণ ছিল। জয়-পরাজয় ছিল অনিশ্চিত। এই সময়ে বিদেশীদের পক্ষে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজ ছিল না, তারা একস্থানে বসে জনশ্রুতির ভিত্তিতে পাওয়া সংবাদ ইউরোপে পাঠাত। এই কারণে ডু-জারিক বারজন ভূঁঞার কথা বললেও তাদের বা রাজ্যের নাম সংগ্রহ করতে পারেননি। পরবর্তী বক্তব্যগুলি আরও অস্পষ্ট, সকলেই বারজন ভূঁঞার কথা বললেও তাতে নতুন কিছু নেই। বিশপ ডোম পেড্রোর চিঠিতে একটি নতুন কথা বলা হয়েছে যে, মোগল বাহিনী শ্রীপুর অধিকার করে, বারজন ভূঁঞা আত্মসমর্পণ করে এবং মোগল বাহিনী চট্টগ্রাম ও আরাকানে যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই চিঠিখানি ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে লিখিত। এটা বোধ হয় জাহাঙ্গীরের আমলের ইসলাম খান চিশতীর অভিযানের কথা। কিন্তু ইসলাম খান চিশতী বার ভূঁঞাদের পরাজিত করলেও আরাকান জয়ের সংকল্প করেননি, অন্তত বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে এরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই লেখকদের কেউ বাংলায় আসেননি, বাংলা থেকে ছিটে-ফোঁটা যা খবরাখবর পেয়েছেন, তার ভিত্তিতেই তাদের বক্তব্য লিখিত। সুতরাং তারা সমসাময়িক হলেও বাংলা সম্পর্কে তাঁদের কারও ব্যক্তিগত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তাঁদের সাধারণ বক্তব্য বর্তমান আলোচনার জন্য তথ্য হিসাবে বিশেষ সহায়ক নয়।

পরবর্তী ইউরোপীয় লেখক এবং পরিব্রাজক ফ্রে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক। তাঁর বক্তব্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হল, কারণ তিনি বাংলাদেশে আসেন। তিনি হুগলীতে এক বৎসর, চট্টগ্রামে ছয় বৎসর অবস্থান করেন এবং চট্টগ্রাম থেকে স্থল ও জলপথে আরাকান ভ্রমণ করেন এবং ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যা থেকে ঢাকা, গৌড় ও রাজমহল হয়ে উত্তর ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি বলেনঃ[১২৭]

> The thirty seventh province is the very extensive one of Bengala. which includes in its length and breadth the twelve kingdoms. which I have said. the petty kings of which the natives call the twelve Biones. and I have metioned them too. The whole tract is most fertile. The largest towns are Daack or Daca. Rajamol or Ragmehel. Medinimpur,.............katrabo. Cateca. Its most frequented harbours are Ugulim (Hugli). a Portuguese foundation. Piple in the kingdom of Ourixa, and Balasor in the same Kingdom. It has other harbours; but, being less frequented. they are less known. All these lands are limited

Edited by Ripon Sarkar

to the south by the Gangetic strait, into which by four vast mouths the Ganges discharges its voluminous, rapid and wholesome waters.

পরে ম্যানরিক বারটি রাজ্যের নাম দেন। এইগুলি নিম্নরূপঃ[১২৮]

১। বেঙ্গালা, ২। এঙ্গেলিম (হিজলী), ৩। উড়িষ্যা, ৪। যশর (যশোহর), ৫। চণ্ডীকান, ৬। মেদিনীপুর, ৭। কতরাব, ৮। বাকলা, ৯। সলিমানবাজ (সোলায়মানাবাদ বা সোলিমাবাদ), ১০। বুলয়া (ভুলুয়া), ১১। ঢাকা, ১২। রাজামল (রাজমহল)।

ম্যানরিকের এই তালিকা আধুনিক ঐতিহাসিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সতীশচন্দ্র মিত্রের সম্পূর্ণ আলোচনা এই তালিকার ভিত্তিতে নির্মিত। এই তালিকার উপর ভিত্তি করে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মত প্রকাশ করেন যে, বার ভূঁঞার অধিকার সারা বাংলায় বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁরা দেখেন যে, বাংলায় আরও অনেক ভূঁঞার অস্তিত্ব ছিল। তাই তাঁরা মত প্রকাশ করেন যে বার ভূঁঞা দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভূঁঞাকে বুঝায়। এটা মনে করা ছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না। কারণ ইউরোপীয় লেখকের সকলেই বারজন ভূঁঞার কথা বলেছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভূঁঞাদের সংখ্যা ছিল বার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকেরা লক্ষ্য করেননি যে ম্যানরিক যখন বাংলাদেশে অবস্থান করেন, অর্থাৎ ১৬২৮ থেকে ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দ, তার বহু আগেই বার-ভূঁঞার ক্ষমতা এবং তাঁদের অস্তিত্ব লোপ পায়। সুতরাং ম্যানরিকের পক্ষে আকবর ও জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী বার-ভূঁঞার নাম জানা বা দেয়া সম্ভব ছিল না। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা আরও লক্ষ্য করেননি যে ম্যানরিকের তালিকা বিভ্রান্তিকর। ম্যানরিক প্রদত্ত বাংলার বারটি রাজ্যে উড়িষ্যাও অন্তর্ভুক্ত, অথচ তাঁর সময়ে মোগল প্রাদেশিক শাসন কাঠামোয় উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র সুবা বা প্রদেশ, উড়িষ্যা তখন বাংলার শাসনের অধীনে ছিল না। ম্যানরিকের সময়ে মেদিনীপুরও বাংলার অধীনে ছিল না, মেদিনীপুরের উত্তর অংশের ঘাটাল মহকুমা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বাকি সম্পূর্ণটাই উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ম্যানরিকের তালিকার প্রথম নাম বেঙ্গালাও ম্যানরিকের বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক করে। এটা কোন বেংগালা? বাঙ্গার সকল রাজ্যের নাম পৃথকভাবে দিয়েও তিনি আবার একটি রাজ্যের নাম বেংগালা দেন কেন?

ম্যানরিকের বেঙ্গালার পরিচিতি ঐতিহাসিকদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করেছে। রেভারেন্ড এইচ. হস্টেন এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ[১২৯]

> Since the twelve Bhuiyas are invariably represented as vassals of a King Emperor, we should understand that the king was not himself one of the twelve...The Bhuiya of Manrique's Bengala must then have been governor, not of a mythical city, but of the district where the king or Emperor had his capital at the time being.
>
> Now, since the twelve Bhuiyas depended in 1640 from the Moghul Emperor, and Gaur was reduced to a heap of ruins, while Satgaon had declined; since again the chief cities, such as Rajmahal and Dacca, are accounted for as having had a Bhuiya, the difficulty is where to place Bhuiya of Bengala .....I suggest then that the Bhuiya of Bengala in

Edited by Ripon Sarkar

Manrique's time governed the district of Tanda. It had become the capital of Bengala after Gaur, and was favourite residence of the Moghul governors of Bengal until the middle of the XVIIth century.

হস্টেনের এই আলোচনা তথ্য নির্ভর নয়, তাই ম্যানরিকের বেঙ্গালাকে তাঁড়ার (তান্ডা) সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। হস্টেন বলেন যে, সতের শতকের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত মোগল গবর্নরেরা তাঁড়ায় অবস্থান করত, কিন্তু এটা সত্য নয়। ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোগল সুবা বাংলার রাজধানী তাঁড়ায় ছিল কিন্তু ঐ সালে মানসিংহ রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তর করেন। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান চিশতী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং ম্যানরিকের সময় পর্যন্ত রাজধানী ঢাকাতেই ছিল, তাঁড়া তখন পরিত্যক্ত। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে হস্টেন যখন প্রবন্ধ লিখেন তখন উপরোক্ত তথ্যগুলি সকলের জানা ছিল, তখন আইন-ই-আকবরী এবং আকবরনামা ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে, বাহরিস্তান-ই-গায়বী অনাবিষ্কৃত থাকলেও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী তখন সকলের হাতে এসেছে। তা সত্ত্বেও হস্টেন এইরূপ ভুল করার কারণ বোধগম্য নয়। যাহোক হস্টেনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। মনে হয়, ম্যানরিকের পাণ্ডুলিপি পাঠের ভুলে এখানে অন্য কোন নামের স্থলে বেঙ্গালা পাঠ করা হয়েছে। ম্যানরিকের তালিকায় সোনারগাঁও, বিক্রমপুর বা ভূষণার মত কতকগুলি বিখ্যাত স্থানের নাম বাদ পড়েছে। সোনারগাঁও সুলতানী আমল থেকে আকবরের সময় পর্যন্ত ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, কিন্তু ম্যানরিকের সময়ে সোনারগাঁও এর গৌরব লোপ পেতে থাকে, ঢাকা সোনারগাঁও এর স্থলাভিষিক্ত হয়। বিক্রমপুর আকবরের সময়ে চাঁদ রায়, কেদার রায়ের বসতি হিসাবে খ্যাতি লাভ করে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় থেকে বিক্রমপুরের উল্লেখও বিশেষ দেখা যায় না, ম্যানরিকের সময়েও বিক্রমপুরের খ্যাতি কমে গেছে। সুতরাং সোনারগাঁও ও বিক্রমপুরের নাম ম্যানরিকের তালিকা থেকে বাদ পড়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভূষণা রাজ্যটি আকবরনামায় বার বার উল্লেখিত হয়েছে। জেমস ওয়াইজের তালিকায়ও ভূষণার রাজা মুকুন্দ রায়ের উল্লেখ আছে। ইসলাম খান চিশতীর সময়ে ভূষণার রাজা শত্রুজিত (বা শাহজাদা রায়) এর নাম পাওয়া যায়, তিনি ইসলাম খান চিশতীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর জমিদারী তাঁকে ফেরত দেয়া হয় এবং তিনি আজীবন মোগলদের পক্ষ অবলম্বন করে মোগলদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাই মনে হয়, ম্যানরিক হয়ত ভুল করে ভূষণার বা অন্য কোন নামের স্থলে বেঙ্গালা লিখেছেন, বা তাঁর পাণ্ডুলিপি বিকৃত হয়ে ভূষণা বা অন্য কোন নাম বেজলায় পরিণত হয়েছে।[১৩০]

ম্যানরিকের অন্যান্য নামগুলির পরিচয় দেয়া কঠিন নয়। এনজেলীম হিজলী। হিজলীর পরিচিতি এবং হিজলীর মসনদ-ই-আলা সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। উড়িষ্যা, যশোর, মেদিনীপুর, ঢাকা নামগুলি এখনও বর্তমান। চণ্ডীকানের পরিচিতি দেয়া প্রয়োজন। হেনরী বেভেরীজ চণ্ডীকানকে যশোরের নিকটে মধুমতী নদীর তীরে কালিগঞ্জের নিকটস্থ ধুমঘাট এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন এবং বর্তমানে সকলেই বেভেরীজের সঙ্গে একমত।[১৩১] সমসাময়িক পর্তুগীজ বিবরণে চণ্ডীকানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, চাঁদ খান প্রথমে এই এলাকার অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর নামানুসারেই চাঁদ খান,

Edited by Ripon Sarkar

পর্তুগীজ বিবরণে চণ্ডীকান। চাঁদ খানের পরে প্রতাপাদিত্যের পিতা শ্রীহরি দাউদ কররানীর নিকট থেকে এই এলাকা লাভ করেন। শ্রীহরি এবং প্রতাপাদিত্যের সময়ে চণ্ডীকান তাঁদের অধীনে ছিল।[১৩২] কতরাব ছিল ঈসা খান মসনদ-ই-আলার রাজধানী। এর পরিচিতি আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকদিন বিভ্রান্ত করেছিল। বর্তমানে এটা পরিষ্কার যে কতরাব লক্ষ্যা নদীর তীরে ঢাকার প্রায় দশ মাইল দূরত্বে বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার মাসুমাবাদ গ্রাম। এখানে ঈসা খানের দুর্গের চিহ্ন বর্তমান এবং স্থানীয় ভূমি রেকর্ডে টপ্পা কতরাব-এর নাম পাওয়া যায়।[১৩৩] জেমস ওয়াইজ অনেক আগেই এর সঠিক পরিচিতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেনঃ[১৩৪] Catrabo is Katrabo, now 'tappa' on the Lakhya, opposite Khizrpur, which for a long time was the property of the descendants of Isa khan Masnad-i-Ali.

ওয়াইজের সময়ে ঈসা খানের বংশের এক শাখা কতরাব-তে বসবাস করত। বাকলা ফরিদপুর এবং বাকেরগঞ্জের অংশ নিয়ে গঠিত ছিল এবং সলিমাবাদ (সোলায়মানবাদ বা সোলিমাবাদ) পশ্চিম মধ্য বাকেরগঞ্জ থেকে যশোরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। রাজামল বা রজমহলের পরিচিতি আগে দেয়া হয়েছে, মানসিংহ এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ম্যানরিক প্রায় এক যুগ ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য একেবারে অলীক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি কেন বাংলার বারটি রাজ্যের কথা বলেন তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে তোডর মল্ল বাংলার ভূমি ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। প্রায় একই সময়ে মোগল প্রাদেশিক কাঠামোয় বাংলা একটি সুবায় পরিণত হয় এবং সুবা বাংলাকে তোডর মল্ল উনিশটি সরকারে বিভক্ত করেন। ম্যানরিকের বিবরণে প্রাপ্ত রাজ্যগুলি তোডর মল্লের সরকারের সম-আয়তনের বা সমপর্যায়ভুক্ত নয়। অথচ দেখা যায়, ম্যানরিকের বিবরণের রাজ্যগুলি সারা সুবা বাংলা এবং উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত। আকবরের আমলে বাংলায় ভুঁঞা বা সামন্ত প্রধানদের সংখ্যা বার থেকে অনেক বেশি, তাদের বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আকবরের আমলের ভূঁঞাদের সঙ্গে বা উনিশটি সরকারের সঙ্গে ম্যানরিকের বিবরণের মিল নেই। জাহাঙ্গীরের আমলে সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সুপরিকল্পিত অভিযানের ফলে ভূঁঞা বা সামন্ত প্রধানেরা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইসলাম খানের নীতি ছিল এই যে, যারা আত্মসমর্পণ করে মোগলদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বা মোগল বাহিনীকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য বা নৌকা (যুদ্ধের নৌকা) সরবরাহ করতে স্বীকৃত হয়, তাদের স্ব স্ব রাজ্য ফিরিয়ে দেয়া হত। এভাবে ভূষণার রাজা শত্রুজিত, ঈসা খানের ছেলে মুসা খান ও অন্যান্যরা তাদের রাজ্য ফিরে পায়। এ রূপ ভূঁঞা জমিদারেরা ভূ-সম্পত্তির মালিক হয়ে নিজ নিজ এলাকায় শান্তিরক্ষাসহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব লাভ করে এবং মোগলদের অধীনে জমিদার হয়েও স্ব স্ব এলাকায় রাজা মহারাজার মত বসবাস করে এবং রায়ত ও প্রজাদের নিকট থেকে সেরূপ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করে। ম্যানরিক যখন বাংলাদেশে তখনও বড় বড় ভূঁঞাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বহাল ছিল। ম্যানরিকের সময় এরূপ বড় ভূঁঞাদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তিনি যাদের দেখেছেন তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন। ম্যানরিকের সময় বার-ভূঁঞার ক্ষমতা লোপ পেলেও এবং মোগল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ বন্ধ হয়ে গেলেও বার-ভূঁঞার স্মৃতি তখনও মুছে যায়নি,

Edited by Ripon Sarkar

দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রাণপণ যুদ্ধের কাহিনী জনগণ তখনও ভুলতে পারেনি। তাই তারা বার-ভূঁঞাকে স্মরণ করত। ম্যানরিকও বড় বড় ভূঁঞার বারটি রাজ্যের নাম পেয়ে বারটি রাজ্যের নাম দেন, যদিও মোগলদের ক্ষমতা, জাঁকজমক বা শানশওকতের কথা ম্যানরিকের অজানা ছিল না। এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ম্যানরিক উল্লেখিত বারটি রাজ্যে উত্তর বঙ্গের কোন রাজ্যের নাম নেই, তাঁর বারটি রাজ্যের সব কয়টিই গঙ্গার (পদ্মার) দক্ষিণ দিকে এবং ঢাকা কেন্দ্রী পূর্ব বাংলায় অবস্থিত। এই সময়ে উত্তর বঙ্গ বা বরেন্দ্র এলাকায় যে কোন ভূঁঞা-রাজ্য ছিল না, তা মনে করার কোন কারণ নেই। রাজশাহীর পুটিয়া রাজ-পরিবার এবং আলাইপুর ও লস্করপুরের জমিদারীও অনেক প্রাচীন, আকবরের সময় থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয় বার-ভূঁঞার পরিচিতির জন্য ম্যানরিকের বিবরণ মোটেই সহায়ক নয়।

আর একজন ইউরোপীয় লেখক ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ। সময়ের হিসাবে তিনি উপরোক্ত সকল ইউরোপীয় লেখকদের পূর্ববর্তী। তিনি নিজে বাংলায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য পরে দেয়া হচ্ছে এই কারণে যে, তিনি অন্যান্যদের চেয়ে ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ[১৩৫]

> They be all hereabouts rebels against their king Zebaldim Echebar: For here are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them...Sinnergan is a town six leagues (i.e.18 miles) from Serrepore...The chief king of all these countries is called Isacan, and he is chief of all other kings.

রালফ্ ফিচের এই বক্তব্য অতি মূল্যবান, এর গুরুত্ব বুঝতে হলে ফিচের সফরের কালানুক্রম জানা দরকার। ফিচ ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে আগ্রা থেকে বাংলায় আসেন, সাতগাঁও (হুগলীর নিকটস্থ ত্রিবেণীর সপ্তগ্রাম) পৌঁছেন ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। অতঃপর তিনি পূর্ব বাংলা (পূর্ব বাংলা বলতে এখানে ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চল বুঝান হয়েছে) ভ্রমণ করেন এবং ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁকে শ্রীপুরে দেখা যায়। এই মাসের ২৮ তারিখে তিনি শ্রীপুর থেকে জাহাজে করে বার্মায় চলে যান। সুতরাং ফিচের এই বক্তব্যের তারিখ ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক, জুলাই-নবেম্বর, এবং স্থান শ্রীপুর। শ্রীপুর বিক্রমপুরের নিকটস্থ একটি নদী বন্দর, চাঁদ রায় কেদার রায়ের রাজধানী, বর্তমানে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ১৫৮৫-৮৬ খ্রিস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি শাহবাজ খান বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু যুদ্ধে সফলতা লাভ করেননি (যুদ্ধের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে)। ফিচ এই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং ফিচ যখন শ্রীপুর থেকে বলেন যে, চতুর্দিকে সকলেই আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, এবং ঈসা খান সকল বিদ্রোহীদের নেতা। তিনি বার-ভূঁঞার কথাই বলেছেন, যদিও বার-ভূঁঞা কথাটি তিনি উল্লেখ করেননি। ফিচ আরও বলেন যে, অসংখ্য নদী নালা এবং দ্বীপ থাকার বিদ্রোহীদের সুবিধা ছিল। নদী নালা এবং দ্বীপের উল্লেখ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি নদী নালা বেষ্টিত পূর্ব বাংলার কথাই বলেছেন, সারা বাংলার কথা নয়। রালফ্ ফিচের বক্তব্য বার-ভূঁঞা সম্পর্কিত

Edited by Ripon Sarkar

আলোচনায় এবং বার-ভূঁঞার পরিচিতির ব্যাপারে নতুন আলোকপাত করে, যা অন্যান্য ইউরোপীয় লেখকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা ধরে নিতে পারি যে, বার-ভূঁঞা নদী নালা বেষ্টিত পূর্ব বাংলার লোক।

সবশেষে আমরা আবুল ফজল এবং মিরযা নাথনের বক্তব্য বিশ্লেষণ করব। আবুল ফজলের বক্তব্য নিম্নরূপঃ[১৩৬]

> Isa khan, Zamindar of Bhati spent his time in dissimulation.
>
> Isa acquired fame by his ripe judgment and deliberateness and made the 12 Zamindars of Bengal subject to himself.

এখানে প্রথম বক্তব্যে আবুল ফজল ঈসা খানকে ভাটির জমিদার বলেছেন এবং দ্বিতীয় বক্তব্যে ঈসা খানকে বার-ভূঁঞার নেতা বলেছেন। দ্বিতীয় বক্তব্যে বার-ভূঁঞাকে বাংলার বলা হয়েছে, ভাটির বলা হয়নি। সুতরাং আবুল ফজলের বক্তব্যে নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, বার-ভূঁঞা ভাটির বা পূর্ব বাংলার লোক ছিলেন। কিন্তু এই বিষয়ে মিরযা নাথনের বক্তব্য আরও স্পষ্ট। তিনি বলেনঃ[১৩৭]

> After the rainy season he (Islam Khan) would personally march to Bhati in order to punish Musa Khan and the Zamindars of that region......
>
> When the rainy season just set in, Islam Khan at the advice of the imperial officers, kept the expedition to Bhati in abeyance and marched towards Ghoraghat, and decided to proceed with his campaign against Musa Khan and the Twelve Bhuiyans at the first appearance of the canopus.
>
> Now I shall give a short account of Masnad-i-Ala Musa Khan and the Twelve Bhuiyans.

মিরযা নাথনের বক্তব্য এতই স্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তিনি প্রথম বক্তব্যে বলেছেন সুবাদার ইসলাম খান মুসা খান ও জমিদারদের দমন করার জন্য ভাটি যাবেন। সুতরাং জমিদারেরা সকলেই ভাটির লোক। (এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে মিরযা নাথনের সময়ে ঈসা খানের নাম পাওয়া যাবে না, তিনি ১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান, এবং তাঁর ছেলে মুসা খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।) মিরযা নাথন দ্বিতীয় বক্তব্যে মুসা খান এবং বার-ভূঁঞাকে ভাটির লোক বলেছেন, তৃতীয় বক্তব্যেও মুসা খান এবং বার ভূঁঞার কথা বলেছেন। মিরযা নাথনের বক্তব্যে স্পষ্ট জানা যায় যে, বার-ভূঁঞা ভাটির লোক, সারা বাংলার নয়। রালফ্ ফিচ্, এবং আবুল ফজলের বক্তব্য মিরযা নাথনের বক্তব্যের সঙ্গে এক সঙ্গে পাঠ করলে এই বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়।

সুতরাং আমরা মনে করি বার-ভূঁঞা ভাটির লোক, তাদের পরিচয় জানতে হলে ভাটিতেই তাদের খুঁজতে হবে। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা বার-ভূঁঞাকে সারা বাংলার মনে করে বিভ্রান্ত হয়েছেন এবং সেই কারণে তাঁরা বার-ভূঁঞার সন্ধান পাননি এবং সেই কারণে তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে বার-ভূঁঞার বার সংখ্যা দ্বারা অনির্দিষ্ট সংখ্যক

Edited by Ripon Sarkar

ভূঁঞাকে বুঝায়। একমাত্র জেমস ওয়াইজ বিষয়টি বুঝেছিলেন, তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম "Bara Bhuiyans of Eastern Bengal" কিন্তু তিনি মাত্র পাঁচ জন ভূঁঞার নাম সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বী অনাবিষ্কৃত থাকায় জেমস ওয়াইজ এই বিষয়ে অগ্রগতি সাধন করতে পারেননি। এই একই কারণে রেভারেন্ড হস্টেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে জেমস ওয়াইজের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন। হস্টেন বলেন:[১৩৮]

Dr. Wise's list has the disadvantage of relegating to a small portion of Eastern Bengal a preponderinng number of the Bhuiyans, and of not accounting for the rest. Manrique's enumeration takes in the whole of Bangal. Dr. Wise objected to it because Orissa, "Jagannath," and Medinipur could not have had separate rulers and the name Bengala seemed to recall the fabulous city on which so much was written by the travellers of the XVIth and XVIIth centuries. These objections must be overruled.

জেমস ওয়াইজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে হস্টেনের যুক্তি আমরা উপরে খণ্ডন করেছি। তবে বলা দরকার যে, হস্টেন তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত দ্বারা জেমস্ ওয়াইজের সঠিক বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বীর সাহায্য ছাড়া জেমস্ ওয়াইজ যে এক শতাব্দীরও বেশি আগে এরূপ একটি সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য তুলে ধরতে পেরেছিলেন তার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সঠিক তথ্যটি তিনি ছাড়া আর কারও নজরে আসেনি, এমনকি নলিনীকান্ত ভট্টশালী, যাঁর বিশ্লেষণ ক্ষমতা এবং যত্ন করাকরই উচ্চমানের, তিনি বাহরিস্তান-ই-গায়বী আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও বিষয়টি ধরতে পারেননি।

ভাটির পরিচিতি

আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে, বার-ভূঁঞা ভাটির বার-ভূঁঞা, সারা বাংলার নয়। কিন্তু ভাটির পরিচিতি নিয়েও মতভেদ আছে। আবুল ফজল ভাটির সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ:[১৩৯]

Bhati is a low country and has received this name because Bengal is higher. It is nearly 400 kos in length from east to west and about 300 kos from north to south. East of this country are the ocean and the country of Habsha. West is the hilly country where are the houses of the kahin tribe. South is Tanda. North also the ocean and the terminations of the hilly country of Tibet.

The tract of country on the East called Bhati is reckoned a part of this province (Bengal). It is ruled by Isa Afghan and the Khutba is read and the coin struck in the name of his present Majesty...Adjoining it is an extensive tract of country inhabited by the Tipperah tribes.[১৪০]

Edited by Ripon Sarkar

আবুল ফজলের এই উক্তিগুলি বিভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথমত, তিনি বলেন যে ভাটি পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩০০ ক্রোশ বিস্তৃত। কিন্তু তিনিই আইন-ই-আকবরীতে বলেন যে, সুবা বাঙ্গালা চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে মান্দারন (হুগলী জেলায়) পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত।[১৪১] অতএব আবুল ফজলের মতে সুবা বাঙ্গালা থেকে ভাটি আয়তনে বড় যা সত্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন যে ভাটির উত্তরে এবং পূর্বে-সাগর, তাও সত্য নয়। তৃতীয়ত হাবশা এবং কাহিন গোত্রদের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়, বেভেরীজ হাবশা এবং কাহিন গোত্রের পরিচিতি দেয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা আবুল ফজলের উক্ত বিভ্রান্তিপূর্ণ বক্তব্যে হতাশ হয়ে বলেন যে আবুল ফজল প্রদত্ত ভাটির সংজ্ঞা দুর্বোধ্য। বেভেরীজ মনে করেন যে বাংলা শব্দ ভাটা বা ভাটি (নিম্নাঞ্চল) (জোয়ার ভাটা) থেকে ভাটি নামের উৎপত্তি,[১৪২] জেমস গ্রান্ট হিজলী, যশোহর এবং বাকেরগঞ্জকে ভাটির অন্তর্ভূক্ত করেন।[১৪৩] হেনরী ব্লখম্যান বলেন যে, হুগলী থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা নিয়ে ভাটি,[১৪৪] এবং সকলেই মনে করেন যে বাংলাদেশের সকল নিম্ন অঞ্চল ভাটি। ভাটি অবশ্যই নিম্ন অঞ্চল এবং সেই সুবাদে বাংলাদেশের সকল নিম্নাঞ্চলই ভাটি, কিন্তু ভাটির অর্থ নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, বার-ভূঁঞা শাসিত অঞ্চল ভাটির পরিচয় দেয়া। আবুল ফজল এবং মিরযা নাথন যেহেতু মোগলদের বিরুদ্ধে বার-ভূঁঞার যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন, সেহেতু তাঁদের পুস্তকেই ভাটির পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দেখেছি যে আবুল ফজল প্রদত্ত ভাটির সংজ্ঞা দুর্বোধ্য, কিন্তু তিনি যখন যুদ্ধের বিবরণ দেন, তখন যুদ্ধ ক্ষেত্রেরও বিবরণ দেন এবং তাতেই ভাটির পরিচয় মিলে। আমরা এখন আবুল ফজল ও মিরযা নাথনের যুদ্ধের বিবরণে প্রাপ্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থান পরীক্ষা করব।

আবুল ফজল ঈসা খানের প্রথম যুদ্ধের কথা বলেন সুবাদার মুনিম খানের মৃত্যুর পরে। মুনিম খান ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তারিখে পরলোক গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে দাউদ কররানী মুনিম খানের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে মোগলদের বিরুদ্ধাচরণ করেন। ঠিক একই সময়ে ঈসা খান মোগল নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ শাহ বরদীকে আক্রমণ করে পরাস্ত করেন।[১৪৫] এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের কোন কথা নেই, তবে পরবর্তী ঘটনা দৃষ্টে মনে হয় পূর্ব বাংলার কোথাও এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা বর্ণনা করে আবুল ফজল বলেনঃ[১৪৬]

> Among the occurences was the arrival of a report from Khan Jahan. When by the glory of activity and skill the delightful country of Bengal had been cleared of the weeds and rubbish of the ingrates, Ibrahim Naral and Karimdad Musazai waited for an opportunity of making a disturbance in the country of Bhati. Isa the Zamindar of that country spent his time in dissimulation.

এখানে ইবরাহীম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই এবং ঈসা খানকে ভাটির জমিদার বলা হয়েছে। সুবাদার খান জাহান তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং ভাওয়াল-এ পৌছেন;[১৪৭] ইবরাহীম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু ঈসা খান ঐ দলে ছিলেন না। তাই খান জাহান শাহ বরদী এবং মুহাম্মদ কুলীকে ঈসা খানের

Edited by Ripon Sarkar

বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মোগল বাহিনী "কিয়ারা সুন্দর" অতিক্রম করে কত্রুল-এর নিকটে ঈসা খানকে পরাজিত করেন কিন্তু মজলিশ দিলাওর এবং মজলিশ প্রতাপ নামক দুজন জমিদার মোগল বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। আর একজন জমিদার টিলা গাজীর সহায়তায় মোগল বাহিনী কোনরূপে ফিরে আসতে সমর্থ হয়।[১৪৮] খান জাহানের ভাটি অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তিনি রাজধানীতে ফিরে যান।

বার-ভূঁঞা বা তাঁদের শাসিত ভাটির পরিচিতির জন্য এই যুদ্ধের বিবরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রের পরিচিতি পাওয়া যায়। উপরে উল্লেখিত কিয়ারা সুন্দরের নাম আকবরনামায় বিভিন্ন রূপে লিখিত হয়, যেমন, 'কিনার সুন্দর' 'গিয়ার সুন্দর,' 'বড় সুন্দর' এবং 'ইয়ার সিন্দুর'। 'গিয়ার সুন্দর' এবং 'ইয়ার সিন্দুর' অবশ্যই এগার সুন্দর বা এগার সিন্দুর এবং স্থানটি বর্তমানের এগার সিন্দুর। এই স্থান এখনও বহুল পরিচিত। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়ায়, এটা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারার তীরে, ঠিক যেখান থেকে বিপরীত দিকে বনার নদী নির্গত হয়েছে এবং যেখানে টোক অবস্থিত। ইহার শুদ্ধ নাম এগার সিন্ধু, এগার নদীর মিলিত স্থান, এবং প্রকৃতপক্ষে এই স্থানে অনেক নদ-নদী মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্থানটি কত্রুল, একে মাঝে মাঝে কাঠাইলও বলা হয়েছে। এই স্থানটি অষ্টগ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত এবং সাধারণভাবে ইহাকে কাইঠাইল বলা হয়। এখানে দেখা যায় ভাওয়াল থেকে এগার সিন্দুর এবং কত্রুল পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত অর্থাৎ ঐ এলাকা ভাটির অন্তর্ভুক্ত।

আকবরনামায় ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই-এর কোন পরিচয় দেয়া হয়নি। মোগল বাহিনী ভাওয়ালে পৌঁছলে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন। এতে মনে হয় তাঁরা ভাওয়ালের নিকটস্থ এলাকার জমিদার ছিলেন। এই কারণে ভট্টশালী মনে করেন যে তাঁরা যথাক্রমে সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদীর জমিদার ছিলেন। আবুল ফজল এই দুজন জমিদার সম্পর্কে নিম্নরূপ উক্তি করেন:[১৪৯] Ibrahim Naral and Karimdad Musazai waited for an opportunity of making a disturbance in the country of Bhati.

অতএব ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই ভাটির জমিদার ছিলেন এবং সোনারগাঁও ও মহেশ্বরদী পরগণাদ্বয় ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আকবরের সময়ে ভাটিতে পরের যুদ্ধ হয় ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে এবং সেনাপতি শাহবাজ খান এটা পরিচালনা করেন। মাসুম খান কাবুলী পরাজিত হয়ে ভাটিতে আশ্রয় নেন এবং তাঁকে তাড়া করাই এই যুদ্ধের প্রাথমিক কারণ। যুদ্ধ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেন:[১৫০]

> When the bank of the river Ganges near Khizrpur became an imperial camp, there were strong forts on the two sides of the river owing to the spot's being a throughfare. In a short time both of these were taken with severe fighting, and Sonargaon came into the possession of the imperial servants. They also reached Karabuh which was his (Isa Khan's) home.

আবুল ফজলের করাভু অবশ্যই কতরাব। এটা ঈসা খানের রাজধানী ছিল এবং এর পরিচয় আগে দেয়া হয়েছে। খিজিরপুর এবং সোনারগাঁও-এর পরিচিতির প্রয়োজন নেই, স্থান এবং নাম এখনও বর্তমান। অতএব, কতরাব, খিজিরপুর এবং সোনারগাঁও ঈসা খানের রাজ্যের এবং ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। খিজিরপুর এবং কতরাব থেকে

Edited by Ripon Sarkar

শাহবাজ খান একটি বাহিনী মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে পাঠান। এই বাহিনী লক্ষ্যা নদী দিয়ে এগার সিন্দুর যায় এবং ব্রহ্মপুত্র নদে পৌঁছে মাসুম খান কাবুলীকে আক্রমণ করে। মাসুম খান বাধা দিতে অপারগ হয়ে একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন। মোগল বাহিনীর অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে মাসুম খান কাবুলী তাদের পরাজিত এবং ছত্রভংগ করে দেন। অন্যদিকে ভূঁঞারা ব্রহ্মপুত্র নদের বাঁধ পনের স্থানে কেটে দিয়ে সমগ্র অঞ্চল পানিতে ভাসিয়ে দেয়। শাহবাজ খানের শিবিরও ভেসে যায়। তিনি কোনমতে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন।[১৫১] লক্ষণীয় যে, এইবার যুদ্ধ ক্ষেত্র খিজিরপুর থেকে টৌক এবং বাজিতপুর পর্যন্ত সম্প্রসারিত। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে খান জাহানের এবং ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানের সঙ্গে বার-ভূঁঞার যুদ্ধের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল একই। সুতরাং এই ভাটি সম্পর্কে নতুন তথ্য না থাকলেও লক্ষ্যা থেকে ব্রহ্মপুত্র হয়ে মেঘনা এলাকা যে ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আকবরনামায় বর্ণিত শেষ যুদ্ধ ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে পরিচালিত মানসিংহের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের নিম্নরূপ দীর্ঘ বিবরণ পাওয়া যায়ঃ[১৫২]

> Next news came to the Rajah that Usman the accursed had crossed the Brahmaputra with a large force and that Baz Bahadur Qalmaq, the thanadar of that quarter, had abandoned his post, and had come to Bhawal. The Rajah came to Bhawal in the space of a day and a night, and next day had a fight with the enemy on the bank of the river Bihar...When he had made the thana strong by entrusting it to able men he came to Dhaka, and ordered a number of brave men to cross the Anjhamati and to punish Isa and Kedar, the ruler of Bikrampur and Sarhanpur. The wicked Afghans leagued with Daud, the son of Isa and the landholders and closed the ferries and prepared for war. For some days the imperialists were unable to cross, the Rajah on perceiving the state of affairs came from Dhaka to Shahpur...The Rajah followed them and marching by night came to Burhanpuri and Tarah. Sher Khan the proprietor, then had the wisdom to wait upon the Rajah. From there he went to Sirhanpur and Bikrampur. Daud and other Afghans went off to Sonargaon. The Rajah's mind became at ease about the enemy and he went to Dhaka.

এই বক্তব্যে কিছু নামের বিভ্রাট রয়েছে। বিহার নদীকে বনার নদী, আঞ্জামতী নদীকে ইছামতী নদী, সিরহানপুর (বা সরহানপুর) কে কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুর ধরে নেয়া যায়। শাহপুর ইছামতি নদীর তীরবর্তী একটি স্থান, রেনেলের মানচিত্রে এটা স্থান পেয়েছে, কিন্তু বুরহানপুরী এবং তরাহ এর পরিচিতি দেয়া সম্ভব নয়। যুদ্ধের বিবরণেও কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। সে বিষয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। পরবর্তী অধ্যায়ে যুদ্ধের বিবরণে এটা আলোচনা করা হয়েছে। তবে আকবরনামায় এই বক্তব্যের গুরুত্ব এই যে, বিক্রমপুর এবং শ্রীপুরকেও ভাটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও ভাটির স্পষ্ট উল্লেখ এই বক্তব্যে নেই।

Edited by Ripon Sarkar

মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে ভাটির উল্লেখ আরও স্পষ্ট। নাথন প্রথমেই বলেন যে, ইসলাম খান চিশতী প্রধানত, ভাটি আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়েই রাজমহল ত্যাগ করেন।[১৫৩] আবদুল লতীফ তাঁর ডায়রীতে একই কথা বলেছেন। সুবাদার ইসলাম খান মোগল বাহিনী নিয়ে আলাইপুরে (রাজশাহীর সরদহ বা সারদার বিপরীত দিকের একটি পরগণা) অবস্থান করছিলেন, তখনই বার-ভূঁঞা আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু মোগল বাহিনী সময়মত এসে পড়ায় তাঁরা সোনারগাঁও-এ ফিরে আসেন।[১৫৪] মুসা খান ঢাকার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ইছামতী নদীর তীরে অবস্থিত যাত্রাপুরে সর্বপ্রথম মোগলদের বাধা দেন। যাত্রাপুর চাঁদ প্রতাপ পরগণায় অবস্থিত এবং এই পরগণার জমিদার ছিলেন বিনোদ রায়। আমরা পরে দেখব যে বিনোদ রায় বার-ভূঞার অন্যতম। মুসা খান যাত্রাপুরে মোগলদের বাধা দেয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি মিরযা মুমিন, দরিয়া খান এবং মাধব রায় নামক তিনজন ভূঁঞাকে যাত্রাপুর রক্ষার দায়িত্ব দেন। নাথন বলেনঃ[১৫৫]

> Then all these three men were deputed (by Musa Khan to guard) the mohana of Isamati at Jatrapur and they were given much encouragement thus: 'Immediately after the arrival of the imperial army, you would find me at the aforesaid Mohana along with the Twelve Bhuiyans.

এতে বুঝা যায় যে, যাত্রাপুর মুসা খান এবং তাঁর মিত্র বার-ভূঁঞা শাসিত অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত।

অতএব ভাটির পশ্চিম সীমা পরগণা চাঁদ প্রতাপ বা আরও নির্দিষ্ট করে ইছামতি নদী ধরে নিতে পারি। মিরযা নাথনের আরও একটি বক্তব্য এর সমর্থন করে। ইসলাম খান যখন কলাকোপায় (ঢাকার ১৭ মাইল পশ্চিমে) পৌঁছেন, তখন নাথন বলেন;[১৫৬]

> On the arrival of Iftikhar Khan after a while, Islam Khan decided to send Iftikhar Khan to the Thana of Shirpur Murcha to watch the state of affairs at Ghoraghat and other places of that region so that before the arrival of the army at Bhati no movement might be led by the rebellious Usman, nor any other mishap might occur.

এখানে "before the arrival of the army at Bhati" দ্বারা নাথন বুঝাতে চেয়েছেন যে ইসলাম খান ভাটিতে এসে পৌঁছলেও, সম্পূর্ণ বাহিনী তখনও এসে ভাটিতে পৌঁছায়নি।

ভাটির দক্ষিণ সীমা নির্ধারণের জন্য মিরযা নাথনের নিম্নরূপ বক্তব্য সহায়ক। মোগল বাহিনী ফতহাবাদের (ফরিদপুর) মজলিশ কুতুবকে আক্রমণ কালে মজলিশ কুতুব মুসা খানের নিকট নিম্নরূপ পত্র লিখেনঃ[১৫৭]

> Uptill now whatever was possible to be done by me, has been done. Now I have been brought to this critical situation. If you help me, I will never betray you as long as I live, and I will join the fight. If you

Edited by Ripon Sarkar

do not come to aid and leave me in neglect, I shall be compelled to surrender to the imperial army and shall have to go forward with the imperial army from this side to Bhati.

এতে বুঝা যায় যে, ফরিদপুর ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখানে রাল্‌ফ ফিচের বক্তব্য স্মরণ করা দরকার; ফিচ শ্রীপুর থেকে বলেছেন যে চতুর্দিকস্থ সকলেই আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী, কারণ অসংখ্য নদী নালা এবং দ্বীপ তাদের রক্ষা করে। নাথন এবং রাল্‌ফ ফিচের বক্তব্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে ভাটির দক্ষিণ সীমা ছিল গঙ্গা (পদ্মা) নদী।[১৫৮]

ভাটির পূর্ব সীমা আইন-ই-আকবরীতেই পাওয়া যায়, এতে বলা হয়েছে যে ভাটির পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য। তাই পূর্ব-সীমা নির্ধারণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

ভাটির উত্তর সীমা নির্ধারণ করার মত কোন তথ্য আবুল ফজল বা মিরযা নাথনের বক্তব্যে নেই। আবুল ফজল বুকাইনগরকে ভাটির অন্তর্ভুক্ত করেননি এবং খাজা উসমানকেও বার-ভূঁঞা বলেননি। তবে আকবরনামায় ঈসা খানের যুদ্ধ বিগ্রহের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সারা বৃহত্তর ময়মনসিংহ ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। ভাটির উত্তর-পূর্ব সীমানা নির্ধারণ করার সহায়ক একটি বক্তব্য বাহরিস্থান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়। বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনওয়ার খান (বা আনওয়ার গাজী) ঢাকায় মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান চিশতী তাঁকে খাজা উসমান আফগানর বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু এগার সিন্দুর এসে তিনি আবার বিদ্রোহ করেন। এখানে মিরযা নাথন লিখেনঃ[১৫৯]

> Anwar Khan again became disturbed. He wrote to Mahmud Khan (brother of Musa Khan who submitted before), 'As the whole of the imperial army is engaged in this expedition and the rest is with me and the strength of Islam Khan's force is also known, you do ally yourself with Usman, and securing a solemn covenant from him ask him to come and attack from outside. You, with all the Zamindars, fall upon the imperial army from within and put them to severe straits till the arrival of Usman, who will slaughter and imprison them. And here, I shall imprison all the Sardars of the army and carry them off to Baniachung with me. In short Ghias Khan (imperial commander) immediately on receipt of this news, will fly from Shah Bandar (to punish the rebels) and I will imprison Islam Khan alive at Dhaka, Musa Khan will also be released with his family and thus the whole of Bhati will be freed and will again come under the sway of the Zamindars.

মিরযা নাথন আনওয়ার খানকে মুসা খানের জমিদার মিত্রও বলেছেন। সুতরাং উপরোক্ত বক্তব্যে সুস্পষ্ট যে, বানিয়াচঙ্গও ভাটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব ভাটির উত্তর-পূর্ব সীমা বানিয়াচঙ্গের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ধরে নেয়া যায়।

Edited by Ripon Sarkar

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে ভাটির সীমানা নিম্নরূপঃ পশ্চিমে ইছামতী নদী, দক্ষিণে গঙ্গা (পদ্মা) নদী, পূর্বে ত্রিপুরা রাজ্য, এবং উত্তরে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সহ উত্তর-পূর্ব সিলেটের বানিয়াচঙ্গ। গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা, এই তিন বৃহৎ নদী ও তাদের শাখা প্রশাখা বিধৌত এবং বেষ্টিত ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও সিলেটের নিম্ন অঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত। এই ভাটিতেই বার-ভূঁঞার অভ্যুদয় এবং এই ভাটির স্বাধীতনচেতা বার-ভূঁঞাই আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মোগল আগ্রাসনের তীব্র বিরোধিতা করেন।

বার-ভূঁঞার পরিচিতি

উক্তরোক্ত দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দুটি সত্যে উপনীত হয়েছি। প্রথম, ইতিহাস প্রসিদ্ধ বার-ভূঁঞা ছিল ভাটির বার-ভূঁঞা, সারা বাংলার নয়। দ্বিতীয়ত, আমরা আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে যে বার-ভূঁঞা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তাদের শাসিত ভাটির সীমানা নির্ধারণ করেছি। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা বার-ভূঁঞার পরিচয়ের জন্য সারা বাংলা খুঁজেছেন, বার জন ভূঁঞার পরিবর্তে অনেক ভূঁঞার সন্ধান পেয়েছেন এবং তাই মত প্রকাশ করেছেন যে বার-ভূঁঞা একটি কল্পিত বস্তু, এবং অনির্দিষ্ট সংখ্যক ভূঁঞা বুঝাবার জন্য বার-ভূঁঞা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। আমরা অনুসন্ধান ভাটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বার-ভূঁঞার পরিচয় পাওয়ার চেষ্টা করব। মনে রাখতে হবে যে আকবরের সময়ের বার-ভূঁঞা এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের বার-ভূঁঞা এক নয়। মধ্যবর্তী সময়ে কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করায় তাদের ছেলেরা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। এর প্রধান উদাহরণ ঈসা খান। তিনি আকবরের রাজত্বকালে মারা যান, তাঁর পুত্র মুসা খান তার স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয়ত, মধ্যবর্তী সময়ে কোন কোন পরগণা হাত বদল হয়। এর প্রধান উদাহরণ বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের জমিদার কেদার রায়। আকবরের সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন এবং মানসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কিন্তু ঐ সময়ে তার মৃত্যু হওয়ায় জাহাঙ্গীরের সময়ে তাঁর নাম পাওয়া যায় না। ইতোমধ্যে তাঁর রাজ্য অন্য ভূঁঞার, সম্ভবত ঈসা খানের অধিকারে চলে যায়।

আকবরনামায় যুদ্ধের বিবরণ অনুসরণ করে ভাটির ভূঁঞাদের নিম্নরূপ তালিকা প্রণয়ন করা যায়ঃ

১। ইবরাহীম নারাল
২। করিমদাদ মুসাজাই
৩। ঈসা খান
৪। মজলিশ দিলাওর
৫। মজলিশ প্রতাপ
৬। টিলা গাজী
৭। কেদার রায়
৮। শের খান

এই আটজন ছাড়া ভাওয়ালের বাহাদুর গাজীর নাম উল্লেখ করতে হয়, এই পরিবারের বংশ তালিকা উপরে আলোচনা করা হয়েছে। এই তালিকায় তিনটি নাম

Edited by Ripon Sarkar

পাওয়া যায়, তার মধ্যে বাহাদুর গাজী আকবরের সমসাময়িক। তিনি আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, এরূপ প্রমাণ আকবরনামায় নেই বরং একখানি সনদে দেখা যায় যে আকবরের সময় ভাওয়ালের জমিদারীতে তাঁকে বহাল রাখা হয়। তিনি জাহাঙ্গীরের সময়েও জীবিত ছিলেন এবং তখন মুসা খানের মিত্র রূপে এবং বার-ভূঁঞার একজন রূপে ইসলাম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। অতএব বাহাদুর গাজীর নাম এই তালিকায় স্থান পেতে পারে।

৯। বাহাদুর গাজী

তাছাড়া আরও পাঁচ জন গাজীর নাম পাওয়া যায়, চাঁদ গাজী, সুলতান গাজী, সেলিম গাজী, কাসিম গাজী এবং তালা গাজী। ভাওয়ালের গাজী পরিবারের সঙ্গে এঁদের কোন সম্পর্ক ছিল কিনা বলা যায় না। তবে এঁদের নামানুসারে চাঁদ প্রতাপ, সুলতান প্রতাপ, সেলিম প্রতাপ, কাসিমপুর এবং তালিপাবাদ পরগণার নামকরণ হয়েছে। এই পরগণাগুলি ভাটির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাঁদেরও বার-ভূঁঞার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যদিও তাঁরা আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন কিনা তার সংবাদ আকবরনামায় পাওয়া যায় না। এই পাঁচ জনের মধ্যে তালা গাজী বা টিলা গাজীর নাম উপরের তালিকায় আছে, বাকি চারজনের নাম যোগ করা হলঃ

১০। চাঁদ গাজী

১১। সুলতান গাজী

১২। সেলিম গাজী

১৩। কাসিম গাজী

জাহাঙ্গীরের সময়ের বার-ভূঁঞার নামের তালিকা বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে কোন ঐতিহাসিক এই তালিকার গুরুত্ব দেননি। স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ[১৬০]

> The great strength of Musa Khan lay in the 'Twelve Bhuiyans', who were his close associates in his struggle against the Mughals. Though the Baharistan repeatedly mentions Musa Khan and the Twelve Bhuiyans, it does not definitely tell us who the Twelve Bhuiyans were. In only one passage it supplies a string of names.

বার-ভূঁঞার আধিপত্য সারা বাংলায় বিস্তৃত ছিল এই ধারণা স্যার যদুনাথের চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বলে তিনি মিরযা নাথনের তালিকাকে "string of names" বলে ছেড়ে দিয়েছেন। এখন দেখা যাক মিরযা নাথন কি বলেন। দীর্ঘ উদ্ধৃতি দেয়া হল, কারণ সম্পূর্ণ বক্তব্যের উদ্ধৃতি ছাড়া নাথনের বক্তব্যের সার কথা বুঝা যাবে না। নাথন বলেন ঃ[১৬১]

> Now I shall give a short account of Masnad-i-Ala Musa Khan and the Twelve Bhuiyans. When the letter of Madhava Ray reached (Musa Khan) conveying the news of the arrival of the imperial force at the Mohana of Katasgarh and the murder of Dariya Khan by Mirza Mumin and his overtures for peace with the imperial officers, he

Edited by Ripon Sarkar

(Musa Khan) came in great haste **with all the Zamindars whose names will be mentioned later on,** and with seven hundred boats consisting of kusas, Jalia, dhura, sundara, bajra and khelna. Mirza Mumin and Madhava Ray joined Musa Khan. They all came by the river Isamati and opened fire on the camp of the imperial army. When it became night, Musa Khan went with all his zamindar allies to a place called Dakchara; during the night he constructed in this place a high fort and a deep trench on that bank of the river Padmavati, on which the imperial army was halting. In Bengal, there was no ancient forts except those at Gaur, Akbarnagar alias Rajmahal, Ghoragahat, Dacca, and some other places of this type, but in time of need, the boatmen quickly construct such a fort that even the expert masters are unable to build one like it within months and years. Such a fort was made, and arranging the artillery and the weapons of defence of the fort, he (Musa Khan) became ready for battle. Musa Khan Masnad-i-Ala, Alaul Khan his cousin (maternal uncle's son), Abdullah Khan and Mahmud Khan, the younger brothers of Musa Khan, Bahadur Ghazi, Suna Ghazi, Anwar Ghazi, Shaykh Pir, son of Haji Bhakul, Mirza Mumin, Madhava Ray, Zamindar of Khalsi, Binud Ray, Zamindar of Chandpratap, Pahlawan, Zamindar of Matang and Haji Shamsud-Din Banghdadi were in Musa Khan's camp.

মিরযা নাথন "With all the Zamindars whose names will be mentioned later on" বলে একই সঙ্গে একই অনুচ্ছেদের শেষদিকে নামগুলি দেয়ার পরেও কি সন্দেহ থাকে যে তিনি বার-ভূঁঞার নাম দেননি। আমরা মনে করি যে, মিরযা নাথন এখানে জাহাঙ্গীরের আমলের বার-ভূঁঞার নাম দিয়েছেন এবং এইগুলিকে "String of names" বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

অতএব মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বার-ভূঁঞার তালিকা নিম্নরূপঃ

১। মুসা খান মসনদ-ই-আলা

২। আলাওল খান

৩। আবদুল্লাহ খান

৪। মাহমুদ খান

৫। বাহাদুর গাজী

৬। সোনা গাজী

৭। আনওয়ার গাজী

৮। শয়খ পীর

৯। মিরযা মুমিন

Edited by Ripon Sarkar

১০। মাধব রায়

১১। বিনোদ রায়

১২। পাহলোয়ান

১৩। হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী।

ভূঁঞারা বার-ভূঁঞা নামে পরিচিত, কিন্তু আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের উভয় তালিকায় তের জনের নাম আছে। আবুল ফজল এবং মিরযা নাথনের বক্তব্যেও দেখা যায় তারা ভূঁঞা বলতে তেরজনের কথা বলেছে, যেমন আবুল ফজল ঈসা খান সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বার জন জমিদারকে স্বীয় অধীনস্থ করেন,[১৬২] অর্থাৎ বার জন ভূঁঞা এবং ঈসা খানসহ তের জন। মিরযা নাথন মুসা খান ও জমিদারদের সম্পর্কে উল্লেখ করার সময় সর্বদা মুসা খান এবং তাঁর বার জন জমিদার মিত্র বলেছেন, অর্থাৎ এখানেও মুসা খানসহ ভূঁঞার সংখ্যা তের জন। এর কারণ বোধ হয় এই যে, ভাটির ভূঁঞার সংখ্যা বার, তাঁরাই ছিলেন পুরুষানুক্রমে ঐতিহাসিক ভূঁঞা। ঈসা খান ভূঁঞাদের নিজ বাহুবলে অধীনস্থ করেছিলেন। আবুল ফজলের ঈসা খান "made the twelve Zamindars subject to himself" এই কথাই প্রমাণ করে। মুসা খান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

এর পরেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। আকবরের সময়ের চাঁদ গাজী, সুলতান গাজী প্রমুখ গাজীদের কি হল? তাঁরা কখন কিভাবে জমিদারীচ্যুত হন? বিনোদ রায় কিভাবে চাঁদ প্রতাপের জমিদারী হস্তগত করেন? কেদার রায়ের মৃত্যুর পরে বিক্রমপুর শ্রীপুরের জমিদারী কি হল? মিরযা মুমিন মাসুম খান কাবুলীর ছেলে, মাসুম খান ছিলেন আকবরের সেনাপতি কিন্তু বিদ্রোহ করে আজীবন মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মিরযা মুমিন কখন কিভাবে জমিদারী লাভ করেন? কয়েকটি পরগণা মুসা খান এবং তাঁর ভাইদের দখলে আসে, এটা কখন কিভাবে হয়? ঈসা খানের বাইশ পরগণার জমিদারীর কথা আগে বলা হয়েছে। বাইশ পরগণার জমিদারী লাভের সঙ্গে বোধ হয় কোন কোন পুরাতন জমিদারীর অবলুপ্তির কাহিনী জড়িত। তবুও এই সকল প্রশ্নের সমাধান হওয়া দরকার। কিন্তু আমাদের বর্তমান জ্ঞানে তা সম্ভব নয়। ভাটিতে সরেজমিনে জরিপ চালালে এখনও হয়ত কোন কোন প্রশ্নের মীমাংসা হতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে এটা সম্ভব নয়, প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। জে. সি. জ্যাক যেমন কয়েকজন নিবেদিত প্রাণ অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট নিয়ে ফরিদপুরের অর্থনৈতিক ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সেরূপ উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রত্যেক ঘরে ঘরে সন্ধান করে অসংখ্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়, পরিবারের ব্যবহৃত হাঁড়ি-পাতিল, পাটি-বিছানার কথাও বাদ যায় না। দুর্ভাগ্যবশত মাত্র কয়েকদিনের নোটিশে তাঁকে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিতে হওয়ায় জ্যাক তথ্যগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারেননি, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে Economic History of a Bengal District নামে যে বইটি তিনি লিখতে সমর্থ হন, তা বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক অনবদ্য সংযোজন। বার-ভূঁঞার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহের জন্যও সেরূপ নিবেদিত গবেষকের প্রয়োজন, যারা ভাটির গ্রামে গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। কল্পকাহিনী, আজগুবী গল্প, পালা, গাঁথা, গীতি ইত্যাদি যা সংগৃহীত হবে, কোন দক্ষ ঐতিহাসিক তা পরীক্ষা করে যে

Edited by Ripon Sarkar

নির্যাস বের করতে পারবে তার ঐতিহাসিক মূল্য প্রকল্পে ব্যয়িত টাকার অংকের চেয়ে ঢের বেশি হবে। বাংলাদেশে সেরূপ উদ্যোগ কি কখনও নেয়া হবে?

বার-ভূঁঞার উৎপত্তি

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বার-ভূঁঞার উৎপত্তি কখন থেকে হয়? সি. ডব্লিউ.বি. রাউজ আফগানদের পতন এবং মোগলদের আগমনের সময় ভূমির মালিক কে ছিলেন প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, তখন বাংলায় কোন একক নেতৃত্ব ছিল না, বরং স্বাধীন ভূঁঞারা সারা বাংলা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কথাটা ঠিক এবং এই বক্তব্য সারা বাংলার জন্য প্রযোজ্য। রাউজ বার-ভূঁঞা সম্পর্কে কিছু বলেননি, কিন্তু ভট্টশালী বলেনঃ[১৬৩]

"The rise of the Bara-Bhuiyans of Bengal is to be dated from 1576 A. D., the year of the fall of Daud, the last Karrani King of Bengal."

কিন্তু ভট্টশালী লক্ষ্য করেননি যে, দাউদের হত্যার আগেই ঈসা খান মোগল নৌ-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার মত শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন। অবশ্য ভট্টশালী অন্যদের মত মনে করতেন যে বার-ভূঁঞার শাসন সারা বাংলায় বিস্তৃত ছিল। কিন্তু আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে বার-ভূঁঞা মানে ভাটির বার-ভূঁঞা। ভাটিতে যখন কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে বা দুর্বলতার কারণে অরাজক অবস্থা বিরাজ করছিল, তখনই বার-ভূঁঞার উত্থান হয় এবং ভাটিতে এরূপ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বাংলার দুশ বৎসরের প্রাচীন স্বাধীন সুলতানদের পতনের পরে। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ বাংলার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে গৌড় দখল করেন এবং বাংলাকে তাঁর দিল্লী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন।

শের শাহ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে প্রথম গৌড় দখল করেন কিন্তু ঐ বৎসরের জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়ে হুমায়ুন তাঁকে বিতাড়িত করেন। হুমায়ুন গৌড়ে প্রায় ছয় মাস অবস্থান করেন, কিন্তু পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শের শাহের নিকট পরাজিত হন। শের শাহ গৌড় পুনর্দখল করেন এবং ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতএব দেখা যায়, প্রথম গৌড় দখলের পরে প্রায় দুই বৎসরকাল শের শাহ বাংলায় তাঁর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারেননি। হুমায়ুন যখন গৌড়ে ছিলেন, তখন দেশে না ছিল শের শাহের শাসন, না ছিল হুমায়ুনের শাসন, হুমায়ুন গৌড় দুর্গে আরাম আয়েশে ডুবে থাকেন, এমনকি একদিনের জন্যও বাইরে আসেননি। এমন অবস্থায় হুমায়ুনের শাসন কতটুকু কার্যকর হয় তা অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত, ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার আগে পর্যন্ত শের শাহ নিজেই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটান। হুমায়ুনের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জয় পরাজয় তখনও অনিশ্চিত। তাই ঐ সময়েও শের শাহ বাংলায় তাঁর শাসন যন্ত্র পুনরায় চালু করতে পারেন কিনা সন্দেহ। এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল কি মোগল-আফগান যুদ্ধের ফলাফলের জন্য নিশ্চুপ বসে ছিল? একটানা দুশ বৎসরের স্বাধীন বাঙালিরা নিশ্চয়ই তাদের স্বাধীনতা হননকারীদের জয় পরাজয়ের অপেক্ষা করে বসে থাকার লোক ছিল না। বাংলাদেশ বরাবরই নদী নালায় পরিপূর্ণ, যেখানে দিল্লীর

Edited by Ripon Sarkar

অশ্ব-বাহিনী বৎসরের অধিকাংশ সময়ে অচল। তাছাড়া দিল্লীর চোখে বাংলাদেশ বরাবরই বলগাকপুর (বিদ্রোহী অঞ্চল) এবং বাঙালিরা বলগাকীয়ান (বিদ্রোহী) নামে খ্যাত ছিল।[১৬৩] তাই ধারণা করা যায় যে, এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় শক্তির অনুপস্থিতি বা দুর্বলতার সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভুঁঞা প্রধানরা স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন হয়ে যায়। এই বক্তব্য যে শুধু অনুমান ভিত্তিক তা নয় শের শাহের সময় থেকে এমন কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় যাতে এই বক্তব্যের সমর্থন মিলে। এখন তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা হচ্ছেঃ

প্রথমত, মুদ্রার সাক্ষ্য। শের শাহের মুদ্রার টাকশালের নাম এবং তারিখ নিম্নরূপঃ[১৬৫]

টাকশাল	তারিখ (হিজরী সন)
পাণ্ডুয়া	৯৪৭, ৯৪৮
সাতগাঁও	৯৫০
শরীফাবাদ	৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫১
ফতহাবাদ	৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫১

অতএব বাংলার কোন টাকশাল থেকে শের শাহের উৎকীর্ণ প্রথম মুদ্রার তারিখ ৯৪৬ হিজরী বা ১৫৩৯-৪০ খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ কোন মুদ্রা নেই। মুদ্রাগুলি পূর্ব বাংলার মাত্র একটি টাকশাল, ফতহাবাদ (ফরিদপুর) এবং পশ্চিম বাংলার (পশ্চিম বাংলা মানে বাংলার পশ্চিম অংশ, অবশ্য এই পশ্চিম অংশ এখন ভারতের পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ) তিনটি টাকশাল থেকে উৎকীর্ণ। ঢাকা, ময়মনসিংহ সিলেট বা ভাটি অঞ্চলে এবং মেঘনা পূর্ববর্তী অঞ্চলে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এলাকায় শের শাহের কোন টাকশাল ছিল না। মুদ্রার তারিখ পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, পাণ্ডুয়া এবং সাতগাঁও-এ প্রাপ্ত মুদ্রার তারিখ শের শাহের রাজত্বকালের প্রতিনিধিত্ব করে না। সাধারণত টাকশাল না থাকলেই বা রাজত্বকালের প্রত্যেক বৎসরের তারিখ বিশিষ্ট মুদ্রা না থাকলেই কোন বিশেষ অঞ্চলে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকবে না এমন কথা জোর করে বলা যায় না, তবে শের শাহের ব্যাপারে এটা তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সত্য উদঘাটনে সাহায্য করে।

শের শাহের রাজত্বকালে বারবক শাহ নামক একজন সুলতান কর্তৃক উৎকীর্ণ দুটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[১৬৬] প্রথম মুদ্রাটি অন্যান্য অনেক মুদ্রার সঙ্গে কিশোরগঞ্জের (ভাটির কেন্দ্রস্থলে) যশোদল থেকে আবিষ্কৃত, এবং দ্বিতীয় মুদ্রাটি পাওয়া যায় সিলেটের সোনাখিরা থেকে। মুদ্রাগুলির পাঠ নিম্নরূপঃ

"বারবক-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুযফফর বারবক শাহ ইবন হুমায়ুন শাহ-খল্লদাল্লাহু ওয়া সুলতানুহু"

(হুমায়ুন শাহের পুত্র বারবক-উদ-দুনিয়া ওয়াদ-দীন আবুল মুযফফর বারবক শাহ আল্লাহ তাঁর রাজ্য ও রাজত্ব চিরস্থায়ী করুন।)

Edited by Ripon Sarkar

প্রথম মুদ্রার তারিখে শতক ৯, দশক ৪, কিন্তু একক পড়া যায় না, অর্থাৎ মুদ্রায় তারিখ ৯৪০ থেকে ৯৪৯ হিজরী পর্যন্ত হতে পারে। দ্বিতীয় মুদ্রার তারিখ পরিষ্কার ৯৪৯ হিজরী। অতএব প্রথম মুদ্রার তারিখও ৯৪৯ হওয়ার সম্ভাবনা, মুদ্রা দুটি একই ছাঁচের (ডাই) নয়, সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, দুটি ছাঁচের দুটি মুদ্রা যখন পাওয়া গেছে, এই দুই ছাঁচ থেকে আরও অনেক মুদ্রা উৎকীর্ণ হয়। মুদ্রার হুমায়ুন শাহ পাঠ খুব পরিষ্কার নয়, তবে বারবক শাহ নাম পাঠে কোন সন্দেহ নেই।

মুদ্রা দুটি শের শাহের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ। এইগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শের শাহের রাজত্বকালে ময়মনসিংহ-সিলেট অঞ্চলে সুলতান উপাধি নিয়ে বারবক শাহ মুদ্রা জারি করেন। আমরা আগে দেখেছি যে এই অঞ্চলই ভাটি অর্থাৎ ভাটিতে শের শাহের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে উঠে এবং সত্যি সত্যিই ৯৪৯ হিজরী সনে (১৫৪২-৪৩ খ্রিঃ) একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব পূর্ব বাংলায়, বিশেষ করে ভাটি এবং চট্টগ্রামে শের শাহের মুদ্রার এবং টাকশালের অনুপস্থিতি এবং শের শাহের রাজত্বকালেই বারবক শাহ নামক একজন স্বাধীন সুলতানের মুদ্রা প্রাপ্তি একযোগে বিবেচনা করলে সন্দেহ থাকে না যে ভাটি এলাকায় (অন্তত ৯৪৯ হিজরী বা ১৫৪২-৪৩ সালে) শের শাহের কোন কর্তৃত্ব ছিল না।

উপরোক্ত মতের সমর্থক আরও তথ্য রয়েছে। শের শাহ খিজির খানকে শাসক (গবর্নর, ফার্সিতে হাকিম) নিযুক্ত করে বাংলায় তাঁর শাসনের সূচনা করেন। শের শাহ নিজে তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত দিল্লী সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য দিল্লীতে চলে যান। সেখানে তিনি খবর পান যে, বাংলার গবর্নর খিজির খান বাংলার বিতাড়িত ও পরলোকগত সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের মেয়ে বিয়ে করে বাংলার সুলতানদের মত চৌকিতে (উচ্চ মঞ্চ) বসেছেন (অর্থাৎ বিদ্রোহীভাবাপন্ন হয়েছেন)। খিজির খানের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করার সুযোগ না দিয়ে শের শাহ তাড়াতাড়ি বাংলায় ছুটে আসেন এবং খিজির খানকে শাস্তি দেন। তিনি কাযী ফযীলতকে বাংলায় নিযুক্ত করে আগ্রায় ফিরে যান।[১৬৭] খিজির খানের বিদ্রোহের তারিখ ১৫৪১ খ্রিঃ অর্থাৎ বারবক শাহের স্বাধীন মুদ্রার পূর্ববর্তী বৎসর। অতএব দেখা যায়, ভাটিতে বিদ্রোহ এবং বারবক শাহের স্বাধীনতা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, খিজির খানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। খিজির খান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের মেয়ে বিয়ে করায় এই ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, স্বাধীনতা ঘোষণাকারীরা তাঁদের সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদের ও তাঁর পরিবারের প্রতি অনুগত ছিলেন।

৯৪৯ হিজরীর স্বাধীন মুদ্রা ছাড়া বারবক শাহের আর কোন খবর পাওয়া যায় না। তাঁর কি হল বা শের শাহ তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেন কিনা, সে বিষয়ে সমসাময়িক ইতিহাসে, এমনকি আফগান ইতিহাসেও কোন উল্লেখ নেই। আব্বাস খান সরওয়ানী শুধু সংক্ষেপে বলেন যে, শের শাহ কাযী ফযীলতকে বাংলায় নিযুক্ত করে আগ্রায় ফিরে যান। কিন্তু পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায়, দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এখানেই শেষ নয়। ঈসা খানের জীবনী আলোচনাকালে দেখেছি যে, ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান (কালিদাস গজদানী) শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহের সময়ে দুবার বিদ্রোহ করেন, দুবারই পরাজিত হন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। সোলায়মান খানও

Edited by Ripon Sarkar

সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের মেয়ে বিয়ে করেন। তিনিও নিজেকে গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী রূপে মনে করতেন। অতএব শের শাহ এবং ইসলাম শাহের সময়ে ভাটিতে তাঁদের অধিকার শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। খিজির খানের বিদ্রোহ, বারবক শাহের স্বাধীন মুদ্রা, সোলায়মান খানের বিদ্রোহ এটাই প্রমাণ করে যে, ভাটির রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল ছিল না। *এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে বার-ভুঁঞার অভ্যুদয়। অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল বাংলার স্বাধীন সলতনতের পতনের পরে, অর্থাৎ বার-ভুঁঞা ছিল বাংলার দুশ বৎসরের স্বাধীন সলতনতের উত্তরাধিকারী।*

আফগান ইতিহাসেও অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সমর্থন মিলে। শের শাহ কর্তৃক খিজির খানকে শাস্তি দেয়ার কথা বলে আব্বাস খান সরওয়ানী তাঁর তারীখ-ই-শেরশাহীতে বলেনঃ[১৬৮]

> "তিনি (শের শাহ) মুলক-ই-বাঙ্গালাকে মুলুক-উত-তওয়ায়েফে পরিণত করেন এবং কাযী ফযীলতকে যিনি কাযী ফযীহত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন, বাঙ্গালার আমীন নিযুক্ত করে আগ্রায় ফিরে যান।"

এখানে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ" অর্থ করেছেন যে, শের শাহ বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে শাসন বিকেন্দ্রীকরণ করেন এবং কাযী ফযীলতকে সকল আঞ্চলিক শাসনকর্তার উপরে আমীন বা সমন্বয়কারী নিযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে আব্বাস সরওয়ানী এত সংক্ষেপে কথা বলেছেন যে এটা ছাড়া আর কোন অর্থ করা যায় না। কিন্তু "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ" কথাটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। ইসলাম শাহ সূরের মৃত্যুর পরবর্তী অরাজক ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উল্লেখ করে নিমত উল্লাহ তাঁর তারীখ-ই-খান জাহানী গ্রন্থে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেনঃ[১৬৯]

> "যখন ইসলাম শাহের মৃত্যু, ফীরুজ খানের (ইসলাম শাহের ছেলে) হত্যা, এবং আদলীর (ফীরুজ খানের হত্যাকারী) সিংহাসন আরোহণের সংবাদ হিন্দুস্থানের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, প্রত্যেক আমীর যে যেখানেই ছিল, বিদ্রোহ করে এবং "মুলুক-উত-তওয়ায়েফের" মত রাজা হয়ে বসে এবং সর্বত্র অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়।"

এখানে "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ" দ্বারা বুঝা যায় যে, দেশের পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল, অরাজক, অস্থিতিশীল। সকলেই নিজ নিজ এলাকায় রাজা হয়ে বসে, কেন্দ্রীয় শক্তির ক্ষমতা খর্ব হয়। মনে হয়, আব্বাস সরওয়ানীও শের শাহের সময়ে "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ" শব্দ ব্যবহার করে বাংলায় ঐরূপ অরাজক ও অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, যদিও তিনি কথাটির কোন ব্যাখ্যা দেননি।

বাংলার গবর্নরেরা প্রায়ই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত। শের শাহ বিদ্রোহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেন এবং একক ক্ষমতাসম্পন্ন গবর্নরের পরিবর্তে বাংলাকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অঞ্চলে এক একজন ক্ষুদে শাসক নিযুক্ত করেন। ফলে এই ক্ষুদে শাসকদের পক্ষে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা সম্ভবপর ছিল না। শের শাহের এই বিকেন্দ্রীকরণ ঐতিহাসিকদের নিকট প্রশংসিত। আব্বাস সরওয়ানী বোধ হয় "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ"

Edited by Ripon Sarkar

শব্দটি ব্যবহার করে শের শাহের বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কুফলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন বিকেন্দ্রীকরণ করে শের শাহের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু তিনি বাংলার স্বচ্ছন্দ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারেননি, যার প্রমাণ বাবরক শাহের স্বাধীন মুদ্রা এবং সোলায়মান খানের বিদ্রোহ। পরবর্তী আমলে, অর্থাৎ প্রাদেশিক সূর সুলতানদের এবং কররানী আমলেও যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয় তা বলা যায় না ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে, যখন বাংলায় স্বাধীন সূর বংশ (শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ সূরের বংশ) প্রতিষ্ঠিত, তখনও দেখা যায় তাজ খান কররানী বাংলার বিভিন্ন এলাকায় দুঃসাহসিক অভিযান চালায়, লুঠতরাজ করে, পরে গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর সূরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে এবং শেষ পর্যন্ত কররানী বংশের প্রতিষ্ঠা করে।[১৭০] কি রকম অরাজক এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে একজন দুঃসাহসিক অভিযানকারীর (এডভেনচারার) পক্ষে এতটা করা সম্ভব তা অনুমেয়। দাউদ কররানীর হত্যার পরে খাজা উসমান আফগান মোগল সেনাপতি কর্তৃক উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে সোজা বাংলায় চলে আসেন এবং সাতগাঁও ও ভূষণায় কিছু সময় কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ময়মনসিংহের বুকাইনগরে দিব্যি স্বাধীন রাজ্য গঠন করে ফেলেন। সুতরাং দেখা যায় যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ এবং বাংলার দুশ বৎসরের স্বাধীন সলতনতের পরে বাংলায় বিশেষ করে ভাটি অঞ্চলে যে বিশৃঙ্খলা, অরাজক পরিস্থিতি এবং অস্থিতিশীলতার জন্ম নেয়, সেই পরিস্থিতি অনেক দিন চলে।

উপরোক্ত সকল তথ্যের বিশ্লেষণ আমাদের শুধু একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে, তা এই যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহের পতন এবং শের শাহের গৌড় অধিকারের পরে ভাটি অঞ্চলে স্বাধীনচেতা ভূঁঞারা মাথে মাথেই এবং সুযোগ পেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে। *দেশে অরাজক এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং সেই সুযোগে যে সকল ভূঁঞার অভ্যুদয় হয় তারা সংখ্যায় বারজন ছিল বলে বার-ভূঁঞা নামে পরিচিতি লাভ করে।*

১। আব্দুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৭, ৩৮৩-৩৮৪।

২। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮ এবং দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৭২ খ্রিঃ।

৩। এইচ. বি. ২, ২২৫-২২৬।

৪। শামস-উদ-দীন আহমদঃ ইনসক্রীপশনস্ অব বেঙ্গল, চতুর্থ ৪, ২৫৯-২৭০।

৫। জে. এ. এস. বি, ১৯০৯, ৩১৯-২০।

৬। ঐ, ১৯২০, ১৯৯-২১২।

৭। বি.পি.পি. ৩৮,৭।

৮। লন্ডন থেকে ১৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত।

৯। জেমস ওয়াইজ ছিলেন ঢাকার সিভিল সার্জন। তিনি একজন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে অনুরাগী লোক ছিলেন। বার-ভূঁঞা সম্পর্কে প্রবন্ধ ছাড়াও তিনি *"Notes on the Races Castes and Trades of Eastern Bengal"* নামে একখানি প্রামাণ্য বই লিখেন। এটা ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি ঢাকা থেকে অনেক আরবি ও ফার্সি শিলালিপি আবিষ্কার করেন এবং এগুলির ছাপ কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান, যদিও তিনি নিজে কোন শিলালিপি প্রকাশ করেননি। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের

পরিচালক আলেকজান্ডার কানিংহাম তথ্য অনুসন্ধানে ঢাকা এলে জেমস ওয়াইজ তাঁকে সাহায্য করেন। কানিংহাম বলেন "I started by rail and steamer for Dhaka for the purpose of visiting the ruins of Sonargaon, the old capital of Eastern Bengal. This trip, which might have been very trying to health, as well as meagre in its results, was made both pleasant and fruitful by the kind thoughtfulness of my friend Dr. James Wise. He not only made all the necessary arrangements for boats and elephants, but accompanied me himself to Sonargaon and Vikrampur..." (Quoted in Abu Imam: *Sir Alexander Cunningham and the Beginning of Indian Archaeology. Dhaka,* 1966, p. 123) জেমস ওয়াইজ একজন নীলকর ছিলেন। তিনি শাহুয়ার জমিদারের নিকট থেকে ভাওয়াল জমিদারী কিনেন এবং পরে ঐ জমিদারী ভাওয়াল রাজ পরিবারের প্রথম পুরুষ কালী নারায়ণ রায়ের নিকট ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেশে ফিরে যান।

("S. M. Taifoor : *Glimpses of old Dhaka, p. 340).*

১০। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, ১১৭-২১৪।

১১। ঐ, ১৮৭৫, ১৮১-৮২।

১২। ঐ, ১৮৭০, ১৮৭৪, ১৮৭৫।

১৩। J. Westland: *A Report on the District of Jessore. Its antiquities, its history and its commerce. Calcutta,* 1871.

১৪। H. Beveridge: *The District of Bakarganj. London,* 1876.

১৫। *JSSB*. 1904, pp. 57 ff.

১৬। বি. পি. পি. জানুয়ারি ৩৫, ১৯২৮, ২৯।

১৭। জে. এ. এস. বি. ১৯০৯।

১৮। ঐ, জানুয়ারি ৯, ১৯১০।

১৯। প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সরল সত্যের বঙ্গবাণী, বঙ্গবাণী, কার্তিক ১৩২৭ বাংলা, আষাঢ় ১৩২৮ বাংলায় প্রকাশিত।

২০। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১৩২৯ বাংলা।

২১। কলকাতা, ১৯১৯।

২২। বি.পি.পি. জানুয়ারি ৩৮, ১৯২৮, ২৯।

২৩। "Where Pratapaditya Reigned" *in Calcutta Review*, 1920.

২৪। বি. পি. পি. ৩৫, ১৯২৮, ২৯।

২৫। ঐ।

২৬। ঐ, ২৯-৩০।

২৭। আকবরনামা, ৩য়. ৬৪৮, বাহারিস্তান, ১ম, ২৮।

২৮। রাজমালা, ৩য়, ১৭।

২৯। সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৬৫, ২২-২৪।

৩০। ঈশা খাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যের জন্য দেখুন বি. পি. পি. ৩৫, ১৯২৮, ৩১-৩২।

৩১। M. A. Rahim: History of the Afghans In India, Karachi, 1961, 217.

Edited by Ripon Sarkar

৩২। বি. পি. পি. ৩৫, ১৯২৮, ৩৭, ৩৯

৩৩। আকবরনামা, ৩য়, ৮৭৯

৩৪। A. Karim: *Murshid Quli Khan and His Times*: 74

৩৫। প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫৩।

৩৬। মহেন্দ্রকরণঃ হিজলীর মসনদ-ই-আলা, ১২৭ টীকা।

৩৭। বাহরিস্তান, ভূমিকা, ২৪।

৩৮। সতীশ চন্দ্র মিত্রঃ যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড ২৮৬-২৮৭।

৩৯। Crommelin's Letter date 3rd October, 1812, reproduced in Bayley's Report, 1844, quoted in
মহেন্দ্রকরণ প্রাগুক্ত, ৪-৫।

৪০। বিলায়তী বা আমলী সন উড়িষ্যায় প্রচলিত, ভাদ্র মাসে নববর্ষ আরম্ভ হয়। তারিখ বাংলা তারিখের একদিন অগ্রগামী (মহেন্দ্রকরণঃ হিজলীর মসনদ-ই-আলা, মেদিনীপুর, ১৩৩৩ বাং ৪, টীকা (Firminger: *Fifth Report*, vol. II 458)।

৪১। মহেন্দ্রকরণঃ হিজলীর মসনদ-ই-আলা, ১১-২৭

৪২। ঐ, পরিশিষ্ট (ক)। আমি কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি থেকে মহেন্দ্রকরণের বই-এর ফটোস্ট্যাট কপি সংগ্রহ করেছি। ঐ বইতে শিলালিপির আলোকচিত্র দেয়া থাকলেও ফটোস্ট্যাট করার সময় চিত্রগুলি পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ডে, ২৫৬ও ২৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে লিপিগুলি সংযোজিত। মহেন্দ্রকরণ বলেছেন শিলালিপিগুলি মসনদ-ই-আলার মাজারে আছে, কিন্তু সতীশচন্দ্র মিত্র বলেছেন যে এটা হিজলীর মসজিদের শিলালিপি। আমি সতীশ বাবুর দেয়া লিপিগুলি পরীক্ষা করেছি।

৪৩। মহেন্দ্রকরণ, প্রাগুক্ত, পরিশিষ্ট (ক) ২, ৫২২।

৪৪। আকবরনামা, ৩য়, ৯১৪।

৪৫। মহেন্দ্রকরণ, প্রাগুক্ত, ১২৬-২৯।

৪৬। এইচ. বি. ২য়, ২৩৬।

৪৭। বি. পি. পি. জানুয়-৩৬ নং, ৫, ১৫-১৭।

৪৮। বাহরিস্তান, ১ম, ১৪।

৪৯। সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য়, ৮৩।

৫০। আইন, ১, ৪৭৬, টীকা ১।

৫১। S. Ahmad: *Inscriptions of Bengal* vol. IV, 259-60.

৫২। জে. এ. এস. বি. ১৯০৯, ৩৬৮ ও পরে

৫৩। বি. পি. পি. ৩৫, ১৯২৮, ৩৪।

৫৪। এইচ. বি. ২য়, ২৩৬।

৫৫। বি. পি. পি. ৩৫, ১৯২৮, ৩৪।

৫৬। ঐ পৃঃ ৩৬।

৫৭। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, নং ৩, ২০৫, ২০৯।

৫৮। Hakluyts' Voyages, vol. II p. 257, quoted in *JASB*, 1874, No. 3, 207

Edited by Ripon Sarkar

৫৯। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪ নং ৩, ২০৭।

৬০। ঐ, ২০৪

৬১। বি পি. পি., ৩৫. ১৯২৮, ৩৯।

৬২। ঐ.

৬৩। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪ নং ৩, ২০২।

৬৪। এইচ. বি. ২য়, ২৪৫।

৬৫। আইন, ২য়, ১১৭।

৬৬। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৬, ৬৪৮।

৬৭। Ralph Fitch: *Travels*, ed. by H. Ryley, London. 1899, 99.

৬৮। জে. এস. এস. বি. ১৯০৪, ৬১।

৬৯। ১২৯৮ বাংলা সনে বা ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।

৭০। হোসেন শাহ (আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ) ১৫১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, ১৫২০ খ্রিঃ পর্যন্ত নয়।

৭১। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, নং ৩, ২১০।

৭২। আকবরনামা, ৩য় ৬৪৭।

৭৩। অশালী বাইশ রাজপুত সম্পর্কে নিম্নরূপ লিখেনঃ "These Bais Rajputs are said to belong to Baiswara in Oudh. The name is given to several tract of country in various part of the United Provinces. ... The most improtant of these include a number of parganas (traditionally twenty two), in the Eastern half of the Unao district, the Western half of the Rai Bareli district and the extreme south of the Lucknow district, with a total area of about 2,000 square miles. The Bais Rajputs first became of importance here in the 13th Cenutury...are supposed to have come from Mungi Patan in the Deccan...the tract has given its name to an eastern dialect of Hindi...Its inhabitants still bear a reputation for bravery'. Imperial Gezetter, under the word Baiswara, 1908, p. 218. Mr. Crooke in his "North Western Provinces of India" says (p.86) that the Bais Rajputs came from Rajputana. There is undoubtedly a Baiswara in Rajputana, but it is spelt Banswara in Ain-i-Akbari and Akbarnama. In the former it is included in the Sarkar of Sirohi (II.p.. 276) and said to have been ruled by an independent chief of the family of the Rana of Mewar. (II, p. 251)"
বি. পি. পি., ৩৮, ১৪, টীকা ৬।

৭৪। পূর্ব বঙ্গ গীতিকায় "দেওয়ান ঈসা খাঁর পালায়" বলা হয় যে ধনপত সিংহের পুত্র ভগীরথ সর্বপ্রথম "পশ্চিম দেশ" থেকে ভাগ্যান্বেষণে বাংলায় আসেন। বাংলার তৎকালীন সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তাঁকে দীওয়ান নিযুক্ত করেন। ভগীরথের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র কালিদাস পিতার দীওয়ানগিরি লাভ করেন। এই কথাটি গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ উচ্চপদে নিযুক্ত না থাকলে কালিদাসের পক্ষে সুলতানের মেয়ে বিয়ে করা সম্ভব হত না। হয়বতনগর ও জঙ্গলবাড়িতে বসবাসরত ঈসা খানের বংশধরেরা দেওয়ান (বা দীওয়ান) নামে পরিচিত। ঈসা খান ও তাঁর পুত্রেরা মসনদ-ই-আলা নামে ইতিহাসে পরিচিত, তাঁরা দীওয়ান রূপে পরিচিত ছিলেন না। তাঁদের উত্তর পুরুষেরা দীওয়ান নামে পরিচিত হওয়ার কারণ বোধ হয় এই যে

Edited by Ripon Sarkar

তাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষ ভগীরথ ও কালিদাসের উপাধি ব্যবহার করেন। কালিদাস এবং তাঁর ভাই রামদাস এবং গজদানী উপাধি সম্পর্কে ভট্টশালী আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি বলেন: "Tradition also says that Kalidas had a brother called Ramdas Gajdani. Some Kayastha families of eastern Mymensingh claim Ramdas as their fore father. Babu Jaychandra Mahalanabis, the well known compiler of some drawing books, is one of such claimants. Portions of his letter on the subject is quoted in translation below :-

"I am communicating to you what I have heard form my father and grandfather.

"Ramdas Gajdani and Kalidas Gajdani were two brothers. The elder Ramdas was a high officer (Dewan) of the Badsha. He used to give away (Golden effigies of) elephants in daily worship and thus acquired the name of Gajdani (i. e. the giver of elephants). After sometime they incurred the displeasure of the Badsha and had to fly from the country with their family. They migrated to Haripur in the Birbhum district with their family preceptor, but as Haripur did not prove an asylum safe enough, they settled the perceptor there and themselves moved on to Kettaba in the Pargana of Maheswardi in the Dacca district... In am 16th in descent from Ramdas. It is said that Kalidas accepted Islam at Delhi and remained there, after having married the daughter of the Badsha...His son is Isa Khan" বি.পি.পি. ৩৮, ১৫-১৬।

ভট্টশালীর সংগৃহীত এই তথ্য কল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে মূল্যবান নয়। পত্র লেখক একটি নতুন কথা বলেছেন যে কালিদাসের এক ভাই ছিল নাম রামদাস এবং পত্র লেখক নিজে ঐ রামদাসের উত্তর পুরুষ বলে দাবি করেন। এই তথ্য জেমস ওয়াইজের সংগৃহীত তথ্য বা পূর্ব-বঙ্গ গীতিকায় পাওয়া যায় না। কিন্তু এই তথ্যের কোন ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না।

৭৫। ঐ ১৭।

৭৬। ভট্টশালীর এই কথাটি ঠিক নয়। গীতিকায় সুলতানের নাম জালাল-উদ-দীন, গিয়াস-উদ-দীন নয়। তবে গীতিকায় বলা হয়েছে কালিদাসের পিতা ভগীরথ গিয়াস-উদ-দীন এর সময় বাংলায় এসে দীওয়ানগিরি লাভ করেন। ভগীরথের পরে তাঁর পুত্র কালিদাস পিতার দীওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। তবে কালিদাসের বিয়ের কথা বলার সময় সুলতানের নাম পরিষ্কারভাবে জালাল-উদ-দীন বলা হয়েছে।

৭৭। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪ নং ৩, ২১৩।

১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে মানসিংহ রাজমহল থেকে ভাটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ১৫৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ঈসা খানের সঙ্গে মোগলদের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। (এইচ. বি. ২য় ১১১-২১২) একক যুদ্ধের কথা যদি সত্য হয়, তা হলে ১৫৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দের কোন এক সময় এটা সংঘটিত হয়ে থাকবে। তবে একক যুদ্ধের কথা বোধ হয় কাল্পনিক, এর সত্যতা আছে বলে মনে হয় না।

৭৮। ভট্টশালী বলেন, "Taking his stand on and using as his ancestral properties, he rapidly rose to power and fame and by 1575 A. D. only 11 years after his recovery from Turan, he was powerful enough to engage the Imperial Nawara on equal terms and to be regarded as one of the 'Bhuiyans of Bengal."

বি. পি.পি. ৩৮, ১৯।

৭৯। রাজমালায় রাজাদের কালক্রম ত্রুটিপূর্ণ, সন তারিখ অবিশ্বাস্য রকম ভুল। প্রাপ্ত মুদ্রা এবং সমসাময়িক অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে রাজাদের কালক্রম নির্ধারণ করতে হয়। এখানে যে কালক্রম দেয়া হয়েছে তা ভট্টশালী কর্তৃক নিরূপিত। আমরা ভট্টশালীর সঙ্গে একমত। বি.পি.পি. ৩৮, ১৯-২৪।

Edited by Ripon Sarkar

৮০ রাজমালা, ৩য়, ১৯২১।

৮১। চন্দ্রপুর পাহাড়ের পশ্চিমে চৌধুরগ্রামে অমর সাগর দীঘি অবস্থিত।

৮২ রাজমালা, ৩য়, ১৯২।

৮৩ বি. পি. পি. ৩৮ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পরে চিত্রের ৪নং।

৮৪। ঐ, চিত্র ৭।

৮৫। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, ২১৩-১৪।

৮৬। আকবরনামা, ৩য়, ১১৪০।

৮৭। বি. পি. পি. অধ্যায় ৩৮, ৫।

৮৮। আকবরনামা, ৩য়, ৯৯৮, ১০০১।

৮৯। ঐ ১০৬৩।

৯০। ঐ, ১০৮১-৮২, ১০৯৩।

৯১। রাজমালা, ৩য়, ৯৬।

৯২। বি. পি. পি. অধ্যায়, ৩৮, ২৪।

৯৩ আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ২য় সংস্করণ, ১৬৯-৭০।

৯৪ ঐ, ৩৭৯-৩৮২।

৯৫। আকবরনামা, ৩য়, ৯৬১।

৯৬ M. A. Rahim: *The History of the Afghans in india.* 226

৯৭। আকবরনামা, ৩য়, ৬৪৮।

৯৮। উদ্ধৃতি উপরে দেয়া হয়েছে।

৯৯। বি. পি. পি. অধ্যায় ৩৮, ৮।

১০০। কেদার নাথ মজুমদারঃ ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৫৭, বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ময়মনসিংহ, ১৬৮, ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিকঃ প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ৭ম খণ্ড, ২১৬।

১০১। জৌনপুরী "সিয়ার আলকদমে" দ্বিতীয় ও তৃতীয় জমিদার খলিলাবাদী ও জোয়ানশাহী পরগণার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন, কিন্তু এর পক্ষে কোন যুক্তি দেখাননি। বি. পি. পি., অধ্যায় ৩৮, পৃষ্ঠা ৯।

১০২। ঐ, ১১।

১০৩। রাজমালায় ঈসা খানকে সরাইলের জমিদার বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে সরাইলের জমিদারী সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কৈলাসচন্দ্র সিংহের মতে ঈসা খানের পরে তাঁর উত্তরাধিকারী দেওয়ান মজলিশ গাজী সরাইলের জমিদার হন। (কৈলাসচন্দ্র সিংহঃ রাজমালা; ৪৪৯) জরিপ রিপোর্ট-এ বলা হয়েছে : "About the time of Isa Khan. Sarail Pargana passed into the hands of the Dewan family, the first Zamindar Majlis Ghazi being of Isa Khan's family." (*Final Report on the survey and settlement operations in the district of Tippera. 1915-1919.* p. 76).

সরাইলের জনৈক নূর মুহাম্মদের স্ত্রী ১০৮০ হিজরী বা ১৬৬৯-১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদের শিলালিপির পাঠের অনুবাদ নিম্নরূপঃ

"বাদশাহ আওরঙ্গজেব গাজীর আলমগীরের রাজত্বকালে ১০৮০ হিজরীর রমজান মাসে মজলিশ শাহবাজের পুত্র নূর মুহাম্মদের স্ত্রী মসজিদ খানি নির্মাণ করেন।" (বি. পি. পি., অধ্যায় ৩৮, পৃ.: ১০, চিত্র ৪)।

Eidited by Ripon Sarkar

১০৮০ হিজরী রমজান মাস ২৩শে জানুয়ারি ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে ঈসা খানের পরে সরাইলের জমিদারী ঈসা খানেরই কোন এক উত্তরাধিকারীর হাতে চলে যায়। কেউ কেউ মনে করেন যে নূর মুহাম্মদ দীওয়ান মজলিশ গাজীর পৌত্র। নূর মুহাম্মদ যদি ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত থাকেন, তাঁর তৃতীয় পূর্ব-পুরুষ ঈসা খানের সমসাময়িক হতে কোন বাধা নেই। তবে ১৬৭০ খ্রিষ্টাব্দে নূর মুহাম্মদ জীবিত ছিলেন কিনা জানা যায় না, জীবিত না থাকলেও তিনি ঐ সনের মোটামুটি সমসাময়িক। ঈসা খানের সঙ্গে দীওয়ান মজলিশ গাজী বা তাঁর পরিবারের সম্পর্ক নির্ণয় করা যাচ্ছে না।

১০৪। রাজমালা, ৩য়, ১৩২-৩৪।

১০৫। বি. পি. পি. ২৬।

১০৬। ঐ, ২৮।

১০৭। এইচ. বি. ২য়, ১৯৫।

১০৮। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪ নং ৩, ১৯৯-২০০।

১০৯। ঐ, ২০০-২০১।

১১০। শামস-উদ-দীন আহমদঃ ইনসক্রীপশনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, ৩১৩। এইচ. ই. ষ্ট্যাপলটন, এবং শামস-উদ-দীন আহমদ ফজল গাজীর স্থলে "রুকন গাজী" পড়েছেন, কিন্তু এই পাঠ ভুল। সৈয়দ আওলাদ হাসান এবং ভট্টশালীর মত পাঠ "ফজল গাজী")। (ঢাকা রিভিউ, ১৯১১, ২১৯, বি. পি. পি. ভল্যুম, ৩৫, ৩৫।

১১১। বি. পি. পি. ভল্যুম ৩৫, ৩৫।

১১২। আকবরনামা, ২য়, ২৭৪-৮০।

১১৩। এইচ. বি. ২য়, ২৪০।

১১৪। ঐ, ২৩৯।

১১৫। ভাগিরথী, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে সাতগাঁও বন্দর অবস্থিত। মুসলমানী আমলে সাতগাঁও একটি বর্ধিষ্ণু বন্দর এবং প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। পর্তুগীজরা সাতগাঁওকে "পোর্টো পিকানো" বলে উল্লেখ করত। সরস্বতী নদী মজিয়ে যাওয়ার ফলে বন্দর পরিত্যক্ত হয় এবং হুগলী বন্দর প্রাধান্য লাভ করে। (A. Karim: *Murshid Quli Khan and His Times*. 214).

১১৬। আকবরনামা, ৩য়, ১৬৮-১৬৯।

১১৭। এইচ. বি. ২য়, ২১০।

১১৮। ঐ, ২০৭

১১৯। M. A. Rahim : *The History of the Afghans in India*, 228

১২০। ঐ, ২২৭-২২৮।

১২১। এইচ. বি. ২য়, ২৪০-২৪১।

১২২। Translation by Rev., H. Hosten in *JASB*, vol. IX. No. 10 N. S. November. 1913, 437-38.

১২৩। ঐ, ৪৩৮।

১২৪। ঐ।

১২৫। ঐ।

১২৬ পাণ্ডুয়াবীর পন্নুন বা পাঠান ... ন্যায় পন্নু তারা সকল আফগান পাঠান। কিন্তু আফগান ছাড়াও পার্বত্য অঞ্চলের ... পন্নু অথবা অবস্থান করত তারা পাঠান, কিন্তু আফগান নয়। আফগান শব্দটি ...শব্দ, পাঠান শব্দটি ভারতীয়। তাই বলা যায়, সকল

Eidited by Ripon Sarkar

আফগান পাঠান, কিন্তু সকল পাঠান আফগান নয়। ইউরোপীয়দের নিকট এই কথাটি অজ্ঞাত থাকায় তারা পাঠান শব্দটি ঢালাওভাবে ব্যবহার করে। তবে এটা ঠিক যে শের শাহ এবং দাউদ খান যেমন আফগান ছিলেন তেমন পাঠানও ছিলেন।

১২৭। *Travels of Fray Sebastien Manrique*, quoted in *JASB*, vol. IX, No. 10, N. S November, 1913, P. 439.

১২৮। ঐ।

১২৯। ঐ, ৪৪৫।

১৩০। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও বেঙ্গালা শহর (বা City of Bengala) এর উল্লেখ করতে হয়, কারণ কেউ কেউ City of Bengala-কে ম্যানরিকের বেঙ্গালা বলে ভুল করতে পারেন এবং প্রকৃতপক্ষে হস্টেন ম্যানরিকের বেঙ্গালার পরিচিত দিতে গিয়ে বেঙ্গালা শহরের অবতারণা করেছেন, যদিও তিনি বেঙ্গালা শহরকে ম্যানরিকের বেঙ্গালার সঙ্গে অভিন্ন মনে করেননি। (জে. এ. এস. বি. ভল্যুম ৯, ১৯১৩ পৃঃ ৪৪৪।) ষোল শতকের ইউরোপীয় লেখক, যেমন বারবোসা, ভারথেমা বেঙ্গালা নামে একটি শহরের (City of Bengala) উল্লেখ করেছেন। গসতালদির মানচিত্রে (১৬৫১ খ্রিঃ) The Travels of Cornelius de Bruyan এ সংযোজিত মানচিত্রে (১৬৫২ খ্রিঃ) বেঙ্গালা শহরকে চট্টগ্রাম এলাকায় চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বেঙ্গালা শহরের অস্তিত্ব এবং পরিচিতি নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রশ্নের সমাধান হয়নি। রেনেল প্রমুখ পরবর্তী ইউরোপীয় লেখক বেঙ্গালা শহরের অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। ১৬৮৯ খ্রিষ্টাব্দে ওভিংটন বলেন, "A late French geographer (Baudraud) has put Bengala into his catalogue of imaginary cities, and such as have no real existence in the world."

(বি. পি. পি. ভল্যুম ১৩, ২৬২; ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ভল্যুম, ১৬, ২৩০, টীকা)। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতানৈক্য, কেউ কেউ বেঙ্গালা শহরকে সোনারগাঁও-এর সঙ্গে, কেউ কেউ চট্টগ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন; কেউ বলেন বেঙ্গালা শহরের অস্তিত্বই ছিল না, বেঙ্গালার (বাংলার) কোন একটি বড় শহরকে বেঙ্গালা শহর (city of Bengala) বলা হয়েছে। এটা কোন একটি বিশেষ বা নির্দিষ্ট শহরের নাম নয়, আবার কেউ কেউ বলেন বেঙ্গালা সমুদ্রে বিলীন হয়েছে। ঐতিহাসিকদের নিকট বেঙ্গালা শহরের পরিচিতি এমন একটি সমস্যা যার সমাধান করা এখন আর বোধ হয় সম্ভব নয়।

এই বিষয়ে হস্টেনের আলোচনা তথ্যপূর্ণ। তাই উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

"The term Bengala as applied to a town, can never have created any difficulty to the travellers visiting Bengal in the XVIth and XVIIth centuries. Urfortunately, so little attention has been paid to the accounts of Bengal written by the earliest European travellers in Bengal, especially the Portuguese, that the passages in which the name of Bengala is found, as applied to a town, have never been properly collated. The general impression produced on me by my reading is that the term has been used for a veriety of places: Sonargaon, Satgaon, Chittagong, and even such places as Hugli and Chandernagar: that in fact it applied to the chief port at the time. It is easy to understand why "Bengala" should have been placed at Chittagong by Portuguese Cartographers. The first Portuguese settlement was at Chittagong from about 1534, and till the time when they founded Hugli (1578), "to go to Bengal" must have meant for the Portuguese "to go to Chittagong". Bengala once located at Chittagong by the Portuguese geographers, the mistake continued to be reproduced in the old maps even as late as in 1743. (Yule, *Hobson-Jobson*, s. v. Bengal). Lubinus, an

Edited by Ripon Sarkar

Augustinian writer seeling the Hugli convent of his Order described in 1634 as the convent of Bengala, placed it at Chittagong, on the Cosmi (Bassein) river, too...The difficulty for us now is to know to what particular city the traveller of a particular period applied the term. But this is no reason why we should get impatient and speak of Bengala as a mythical city, or fancy that it was somewhere in the Sundarbans and has long since been swept away by a tidal wave." *(JASB.)* vol. IX, No. 10 N. S. November, 1913, (444-45)

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বেঙ্গালা শহরকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত দিয়াং-এর সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বলেন, এই বেঙ্গালা শহর থেকে "বাংগালা" (বাংলা) নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ভল্যুম ১৬, ২৩০).

কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে দিয়াঙ্গ (বা দিয়াং) একটি বিস্তীর্ণ এলাকা, দিয়াঙ্গ এর পাহাড় এখনও কয়েক মাইল বিস্তৃত এবং এই পাহাড় ঘেঁষে নদীর তীরে পর্তুগীজদের কুঠির এবং গীর্জা ছিল। পর্তুগীজদের লেখায় স্থানটি দিয়াঙ্গা (Dianga)। সতের শতকের প্রথম দিকে ফ্রে সেবাস্টিয়ান ম্যানরিক এই গীর্জায় প্রায় ছয় বৎসর অবস্থান করেন এবং এখান থেকেই তিনি পর্তুগীজদের পক্ষে ওকালতি করার জন্য স্থল ও নদীপথে আরাকানের রাজার নিকট যান। ম্যানরিকের বিবরণে দিয়াং এবং চট্টগ্রামের অনেক উল্লেখ থাকলেও একবারও বেঙ্গালা রূপে উল্লেখ পাই না। বেঙ্গালা শহরের যারা উল্লেখ করেছে তারা কেউ ষোল শতকের আগের লোক নয়, অথচ চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৩৫৬ খ্রিঃ) লিখিত ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বরানীর তারিখ-ই-ফীরুজ শাহীতে "বঙ্গকে" "বাঙ্গালা" নামে পাওয়া যায়। সুতরাং ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের দেয়া বেঙ্গালা শহরের পরিচিতি সত্য হলেও (অবশ্য সত্য বলে মনে হয় না) বেংগালা শহরের নাম থেকে বাঙ্গালা (বা বাঙ্গালা) নামের উৎপত্তি হয়েছে বা বেঙ্গালা শহর প্রাচীন বাঙ্গালা (বা বাঙ্গালা) দেশের সঙ্গে অভিন্ন এই অভিমত তথ্য ভিত্তিক নয়। ডি. সি. সরকার বলেন :

"As Bengala (Like modern name Bengal) is a foreign corruption of Vangala a celebrated historian (Dr. Majumdar) has suggested that this late medieval city of Bengala (which he locates near modern Chittagong) was the capital of the ancient Vangala and gave its name to the kingdom, or vice versa, and in either case, the old kingdom of Vangala must be located in the region round the city ... the above theories appear to be unwarranted; (D. C. *Sircar : Studies in the Geography of Ancient and Medieval India, Delhi,* 2nd adition. 1971. P. 131).

১৩১। H. Beveridge : The District of Bakarganj, London, 1876, pp 28-36; জে. এ. এস. বি. ১৮৭৬. ৭১-৭৬।

১৩২। জে. এ. এস. বি. ভল্যুম ৯, ১৯১৩, ৪৪১-৪২।

১৩৩। *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh* vol. XXXI. No. 2, December 1986., 37-50.

১৩৪। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৫, ১৮২।

১৩৫। *Early Travels in India,* ed. Horton Ryley, London, 1899, pp. 99, 111, 153.

১৩৬। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৬, ৬৪৮।

১৩৭। বাহরিস্তান, ১ম, ৯, ২৮, ৫৬।

১৩৮। জে. এ. এস. বি. ১৯১৩, ৪৪৪।

Edited by Ripon Sarkar

১৩৯। আকবরনামা, ৩য়, ৬৪৫-৪৭।

১৪০। আইন, ২য়, ১৩০।

১৪১। ঐ, ১১৬।

১৪২। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৬, টীকা ২।

১৪৩। *Analysis of the Finances of Bengal in* W.K. Firminger: Fifth report. Vol II. Calcutta, 1917 p. 180.

১৪৪। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৩, ১৮।

১৪৫। আকবরনামা, ৩য়, ২২৮।

১৪৬। ঐ, ৩৭৬।

১৪৭। ভাওয়াল একটি বিস্তীর্ণ পরগণা, খান জাহান যেখানে পৌছেন সেটি ভাওয়াল-এর কেন্দ্রস্থল হবে। এই কেন্দ্রস্থল চৌরার সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বি. পি. পি., ভল্যুম ৩৮, ১৯২৯, ৪৪, টীকা ১৫।

১৪৮। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৭।

১৪৯। ঐ, ৩য়, ৩৭৬।

১৫০। ঐ, ৬৪৮।

১৫১। ঐ, ৬৪৮-৫১।

১৫২। ঐ ১২১৪-১৫।

১৫৩। বাহরিস্তান, ১ম, ৯।

১৫৪। ঐ, ২২।

১৫৫। ঐ, ৫৫।

১৫৬। ঐ, ৭৩।

১৫৭। ঐ, ৫৯।

১৫৮। "Bhati as mentioned by Abul Fadl and Mirza Nathan" in *N. K. Bhattashali Commemoration Volume*. Dhaka 1963.

শীর্ষক আমার প্রবন্ধে ভাটির পশ্চিম সীমা এবং দক্ষিণ সীমা সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছিলাম, এখানে তা সংশোধন করা হল।

১৫৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১০৬।

১৬০। এইচ. বি. ২য়, ২৩৯।

১৬১। বাহরিস্তান, ১ম, ৫৬-৫৭।

১৬২। আকবরনামা, ৩য়, ৯৬৮-৬৯।

১৬৩। বি. পি. পি., ভল্যুম ৩৮, পৃ. ৩২।

১৬৪। আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল ২য়, সংস্করণ, ১০১।

১৬৫। *Journal of the Numismatic society of India*. vol. XXVII, part I. 1965. pp. 66-69.

Edited by Ripon Sarkar

১৬৬। H. N. Wright. *Catalogue of Coins in the Indian Museum* Calcutta, vol. II p. 182 No. 239 Botham: Catalogue of Coins in the Shillong Cabinet, p. 160 No.24.

বি. পি. পি. ভল্যুম ৩৮, ১ম পৃষ্ঠার পরে চিত্র নং ২।

১৬৭। আব্বাস খান সরওয়ানীঃ তারিখ-ই-শেরশাহী, এস. এম. ইমাম-উদ-দীন কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা, ১৭১-১৭২।

১৬৮। ঐ।

১৬৯। নিয়ামত উল্লাহঃ তারিখ-ই-খান জাহানী, এস. এম. ইমাম-উদ-দীন কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা, ১ম খণ্ড, ৩৯১।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ আবদুস সাঈদ আমার তত্ত্বাবধানে "Afhgan Rule in Bengal" শীর্ষক গবেষণা থিসিস লিখার সময় "মুলুক-উত-তওয়ায়েফ" কথাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

১৭০। এইচ. বি. ২য়, ১৮১।

Edited by Ripon Sarkar

তৃতীয় অধ্যায়

আকবরের রাজত্বকালে মোগল অভিযান মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ বাংলা ভুঁঞাদের প্রতিরোধ

বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ কররানীর পতনের প্রাক্কালে মুনিম খান খান খানান ছিলেন বাংলার মোগল সুবাদার। তিনি দাউদ কররানীকে তুকারয় বা মোগলমারীর যুদ্ধে পরাজিত করেন। দাউদ মোগলদের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হন। এই চুক্তি কটকের চুক্তি নামে খ্যাত এবং এটা ১২ই এপ্রিল ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত হয়। কিন্তু ঐ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মুনিম খান গৌড়ে মহামারীতে প্রাণত্যাগ করেন। খান জাহান মুনিম খানের স্থলে নতুন সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।

সুবাদার খান জাহান (১৫৭৫-১৫৭৮ খ্রিঃ)

খান জাহানের প্রকৃত নাম হোসেন কুলী বেগ, খান জাহান তাঁর উপাধি। তাঁর পিতার নাম ওলি বেগ জুলকদর। হোসেন কুলি বেগ আকবরের প্রথম জীবনের অভিভাবক বিখ্যাত বৈরাম খান খান খানানের ভাগ্নে ছিলেন। বৈরাম খানের বিদ্রোহের সময় হোসেন কুলী বেগ পিতার সঙ্গে মামার দলে ছিলেন। বৈরাম খানের পরাজয়ের সময় ওলী বেগ জুলকদর যুদ্ধে আহত হন এবং আহত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। হোসেন কুলী বেগ বৈরাম খানের সাজ সরঞ্জাম আকবরের নিকট নিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি যেহেতু বৈরাম খানের নিকট-আত্মীয় ছিলেন, আকবর তাঁকে বন্দী করে রাখেন। পরে বৈরাম খানকে ক্ষমা করা হলে হোসেন কুলী বেগকেও মুক্তি দেয়া হয়। অতঃপর হোসেন কুলী আজীবন আকবরের অনুগত থাকেন এবং বিভিন্ন পদে কার্যরত থাকেন। জীবনের শেষ দিকে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদারের পদ লাভ করেন।

আকবরের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে হোসেন কুলী বেগ খান উপাধি লাভ করেন এবং দশ বৎসর পরে, অর্থাৎ অষ্টাদশ বর্ষে খান জাহান উপাধি লাভ করেন। মুনিম খানের মৃত্যুর সময় তিনি পাঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজে বদখশান যাওয়ার জন্য আদিষ্ট হন। কিন্তু মুমিন খানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে সম্রাট বাংলার মত বিদ্রোহী প্রদেশের সুবাদারী পদের জন্য খান জাহানকেই উপযুক্ত ব্যক্তি রূপে বিবেচনা করেন। তাই পূর্ব আদেশ বাতিল করে আকবর খান জাহানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। রাজা তোডর মল্লকে খান জাহানের সহকারী নিযুক্ত করা হয়।

বৈরাম খানের মত হোসেন কুলী বেগও শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে খান জাহান বাংলার দিকে যাত্রা করেন।[১]

ইতোমধ্যে মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দাউদ কররানী কটক চুক্তি ভঙ্গ করে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অন্যান্য দিকেও

Edited by Ripon Sarkar

আফগান এবং ভুঁএরা মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। মোগল বাহিনীতে তখন বিশৃঙ্খল অবস্থা; সুবাদার পরলোকগত, নতুন সুবাদার এসে পৌঁছায়নি; আফগানরা এবং ভুঁএরা তাদের বিরুদ্ধে; দাউদের বাহিনী তাদের গতি রোধ করার কাজে ব্যস্ত; এমন অবস্থায় মোগল বাহিনী বাংলা ছেড়ে পলায়ন করতে পারলে বাঁচে। রাজধানী তাঁড়া বা তাণ্ডায় অবস্থানরত মোগল সৈন্যরা শাহাম খানকে নেতা নির্বাচিত করে,[২] কিন্তু অতঃপর কি করবে ঠিক করতে পারে না। জালেশ্বরের মোগল সেনাপতি মুরাদ খান পালিয়ে তাঁড়ায় চলে যান, কিন্তু সেখানে মোগল বাহিনীর অবস্থা দেখে তিনি হতবাক হয়ে যান। তাঁড়ার মোগল বাহিনী পালিয়ে গঙ্গার অপর পারে চলে যায়। শাহ বরদীর অধীনে মোগল নৌ-বাহিনী পূর্ব বাংলায় ছিল ; ঈসা খান শাহ বরদীকে আক্রমণ করেন। এখানেই আকবরনামায় ঈসা খানের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ প্রসঙ্গে আবুল ফজল বলেনঃ[৩]

> At this time of confusion, Isa Zamindar fell upon Shah Bardi, who had charge of the boats and the artillery of the province. Though he put forth the foot of courage and raised the standard of victory, yet out of excessive apprehension he left that country and joined the officers with the artillery and flotilla.

শাহ বরদীর সঙ্গে ঈসা খানের যুদ্ধ কোন্ স্থানে সংঘটিত হয় তার উল্লেখ নেই, তবে পূর্ব বাংলার নদ-নদী বিধৌত এলাকায় কোথাও হওয়ার সম্ভাবনা। যদিও আবুল ফজল বলতে চেয়েছেন যে মোগল নৌ-অধ্যক্ষ শাহ বরদী যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাঁর কথায় তেমন কোন জোর নেই। শাহ বরদী জয়লাভ করে গৌড়ের দিকে ফিরে গিয়ে মোগল মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন। হতে পারে যে সারা বাংলা থেকে মোগল বাহিনী বিতাড়িত হওয়ায় যুদ্ধে জয়লাভ করেও শাহ বরদী পূর্ব বাংলায় একা থাকা সমীচীন মনে করেননি। তা সত্ত্বেও সন্দেহ হয় যে হয়তঃ শাহ বরদী ঈসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুবিধা করতে পারেননি। মোগল বাহিনীর তখনকার মনের অবস্থা আবুল ফজলের বর্ণনায় নিম্নরূপঃ[৪]

> The chiefs of the victorious army on account of their being disgusted with the country, and the want of right thinking, dropped from their hands the thread of work. They crossed the Ganges and came towards Gaur. The whole soul of those paltry minded men was engaged in carrying their acquisitions out of that country (Bengal), while outwardly they said, 'When we have put the river between us and the enemy, we shall give our minds to fighting, and then the Qaqshal from Ghoraghat will join us. When they had crossed the river, Qutlaq, Qadam produced a lying letter (muzauwir nama) and spread unpleasing reports about the world's lord (i.e. Akbar). Those friends of pelf, foes of fame (azdostan, namus dushman) used this false statement as their credentials and went off towards Bihar by way of Purniya and Tirhut. They gave up such a fine country without regarding it. Still stranger, Adam Tajband, who at this time had brought firmans from H. M. (His

Edited by Ripon Sarkar

Majesty) to the Khan Khanan and the Bengal officers, from wickedness and the instigation of evil men appropriated to himself the elephants and other property of Munim Khan. He opened a thousand doors of plundering and gave out that he was by orders of the Shahinshah taking measures for the preservation of the goods. In reality he was sunk in cupidity and was enriching his house for his own harm and by his own efforts arranging for himself the materials of eternal ruin.

আবুল ফজলের বক্তব্যে পরিষ্কার যে বাংলার মোগল সৈন্যরা তখন ভীত সন্ত্রস্ত, পলায়নের জন্য নানা রকম মিথ্যা কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছিল এবং যুদ্ধের জন্য তারা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এক কথায় তারা তখন বাংলার প্রতি বিরক্ত, তারা লুঠপাট করে যে যা পারে সঙ্গে নিয়ে দিল্লী ফিরে গিয়ে সুখে বাস করার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাদের সে স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ঠিক ঐ সময়েই নতুন সুবাদার খান জাহান বিহারে পৌছেন। ভাগলপুরে তিনি পলায়নপর মোগল সৈন্যদের গতি রোধ করেন। পলায়নপর মোগল সৈন্যরা তখন বেকায়দায় পড়ে যায়। তারা খান জাহানকে নানাভাবে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে। তারা বলে যে বাংলা মুলুক প্লেগ মহামারীর দেশ, মুনিম খান ও আরও অনেক সেনানায়ক এখানে প্রাণ হারিয়েছে। তাছাড়া বাঙ্গালিরা সকলে বিদ্রোহী, এখানে টিকে থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু খান জাহান তাদের কথায় কান দিলেন না। তখন মোগল সৈন্যরা অন্য প্রশ্ন তুলেন। খান জাহান ছিলেন শিয়া, কিন্তু মোগল সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল সুন্নী। সুন্নীরা শিয়ার নেতৃত্ব মানতে রাজি হল না। আবুল ফজল এই বিষয়ে নিম্নরূপ বিবরণ দেন ঃ[৫]

The Bengal officers had reached the neighbourhood of Bhagalpur when the victorious army arrived there. The bewilderment of the self-interested men increased. They were not inclined to turn back and co-operate (with Khan Jahan) and they could not venture to proceed to Court. Most of them threw off the veil of shame, and eloquently discoursed upon the refractoriness of the people, the pestilential atmosphere of the country, and the large mortality, and objected to go back. Some from evil disposition and strifemongering brought forward the affair of religion, and began to chatter foolishly about the headship of Khan Jahan. By the halo of the Shahinshah's Majesty, the politic conduct of Rajah Todar mal, and the wide capacity and toleration of Khan Jahan, the seal of silence was impressed on the lips of every one, and they elected to accompany him.

খান জাহান অত্যন্ত শান্তভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন, তিনি এবং রাজা তোডর মল্ল সৈন্যদের বুঝান এবং সমঝোতায় পৌছার চেষ্টা করেন। দিল্লী ফিরে গেলে সম্রাট যে তাদের ক্ষমা করবেন না এবং কঠোর শাস্তি দেবেন তাও তাদের বুঝান হল। ফলে সৈন্যদের মধ্যে সুবুদ্ধির উদয় হয়, তারা খান জাহানের সঙ্গে সহযোগিতা করে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়। খান জাহান সতর্কভাবে অগ্রসর হন। ইসমাইল কুলী খান

Edited by Ripon Sarkar

একদল সৈন্য নিয়ে তেলিয়াগড় দুর্গ আক্রমণ করেন এবং ঐ দুর্গ সহজেই জয় করে নেন। আয়ায খাসা খেল নামক আফগান সেনানায়ক ঐ দুর্গের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি প্রায় বিনা যুদ্ধে মোগলদের হাতে বন্দী হন এবং তাঁকে হত্যা করা হয়। দাউদ কররানী ভাবতেই পারেননি যে পলায়নপর মোগল সৈন্যরা এত তাড়াতাড়ি পুনরায় একত্রিত হয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে পারবে। যাহোক তেলিয়াগড় সহজে জয় করতে পারলেও খান জাহান রাজমহলে বাধার সম্মুখীন হন। দাউদ কররানী রাজমহলকে সুদৃঢ় এবং সুরক্ষিত করে খান জাহানের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

রাজমহলের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রিঃ)

রাজমহলের যুদ্ধ আলোচনা আমাদের এই অধ্যায়ের জন্য খুব প্রাসঙ্গিক নয়, কারণ এটা আফগান আমলের ঘটনা, এই যুদ্ধে আফগান সুলতান দাউদ কররানীর পতন হয়, আমাদের "বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল)" এ আমরা এই যুদ্ধ আলোচনা করেছি। কিন্তু তবুও ধারাবাহিকতার খাতিরে রাজমহলের যুদ্ধ এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে।

তেলিয়াগড় জয় করার পরে রাজমহলে[৬] মোগল বাহিনী আফগানদের সম্মুখীন হয়। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের-জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘদিন উভয় পক্ষ সামনাসামনি শিবির স্থাপন করে দিন কাটায়। এই সময়ে ছোট খাট সংঘর্ষ হত, যেমন আবদুল্লাহ খান নামক একজন মোগল সেনাপতি অগ্রসর হয়ে আফগান ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফল হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। অন্য পক্ষে ইসমাইল খান নামক একজন আফগান কাকশালদের শিবির আক্রমণ করে প্রাণত্যাগ করেন। এইভাবে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হলেও কোন পক্ষই অগ্রসর হয়ে অন্য পক্ষকে আক্রমণ করেনি।

আগের মত এই শেষ যুদ্ধেও দাউদ কররানী চরম নির্বোধের পরিচয় দেন। দীর্ঘদিনের অবকাশ পাওয়ায় খান জাহান তাঁর শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন। তিনি সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ সৈন্যদের রসদ আনার ব্যবস্থা করেন। আকবর শুধু রসদ পাঠালেন তাই নয়, তিনি নতুন সৈন্যবাহিনীও পাঠান। তিনি বিহারের সুবাদার মুজফফর খানকে খান জাহানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। দাউদ প্রথম চোটে আক্রমণ করলে ঐক্যবিহীন মোগল বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারতেন। তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখলে এবং তাঁর গোয়েন্দারা সতর্ক দৃষ্টি রাখলে তিনি শত্রুদের রসদ ঘাটতির সংবাদ পেতেন, এবং রসদের সরবরাহ পাওয়ার পূর্বে বা সহায়ক বাহিনীর উপস্থিতির পূর্বে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করলে যুদ্ধের ফলাফল বোধ হয় ভিন্ন হতে পারত। রাজমহল ছিল পার্বত্য এলাকা, দাউদের পক্ষে পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করার মত পারদর্শী আফগান সৈন্যের অভাব ছিল না। সুতরাং দাউদ কররানী সমর-নিপুণ হলে কিছু সংখ্যক সৈন্যকে পাহাড়ের আড়ালে শত্রু শিবিরের পেছনে পাঠিয়ে শত্রুবাহিনীকে দু দিক থেকে আক্রমণ করতে পারতেন। দাউদ কররানী এরূপ কোন ব্যবস্থা না নেয়ার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে, তিনি মোটেই যুদ্ধনীতি জানতেন না। অপর পক্ষে মোগল সুবাদার খান জাহান দাউদ কররানীর নিষ্ক্রিয়তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি দাউদ কররানীর

Edited by Ripon Sarkar

দুজন সেনাপতি কতলু খান ও শ্রীহরিকে স্বপক্ষে টেনে নেন। এই দুজন দাউদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে খান জাহানের নিকট গোপন তথ্য ফাঁস করে দেন এবং গোপন দলিলপত্র হস্তান্তর করেন। ফলে দাউদের পতনের পরে কতলু খান উড়িষ্যায় এবং শ্রীহরি যশোরে জমিদারী প্রাপ্ত হন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কতলু খান ও শ্রীহরির বিশ্বাসঘাতকতার কথা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে রাজমহলের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম চোটেই জোনায়দ কররানী মৃত্যুবরণ করেন। কতলু খান ও শ্রীহরি যুদ্ধক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। দাউদ কররানী প্রাণপণে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়া কাদায় আটকে যায়, তিনি ধরা পড়ে বন্দী অবস্থায় খান জাহানের নিকট উপস্থিত হন। দাউদ সন্ধির কথা বলেন, খান জাহানেরও সন্ধি করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অন্যান্য মোগল সেনানায়কেরা দাউদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। ফলে দাউদ কররানীকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর ছিন্ন মাথা আকবরের নিকট পাঠানো হয়। এই সঙ্গে বাংলার স্বাধীন আফগান সলতনতেরও অবসান হয়।[৭]

খান জাহানের পরবর্তী পদক্ষেপ

রাজমহলের যুদ্ধে জয় এবং দাউদের মৃত্যু অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বাংলা বিজয় এখনও সুদূরপরাহত হলেও এই বিজয়ের ফলে রাজধানী তাঁড়াকে কেন্দ্র করে একটি এলাকায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা তোডর মল্ল যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী নিয়ে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে যান। ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আকবর যখন রাজপুতানার বাঁশওয়াড়ায় অবস্থান করছিলেন, তখন তোডর মল্ল এবং ইতিমাদ খান খাজাসেরাই সম্রাটকে কুর্নিশ করেন এবং বাংলার যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী সম্রাটের সম্মুখে পেশ করেন।এই সামগ্রীর মধ্যে ছিল তিনশ চারটি হাতি। সঙ্গে সঙ্গে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিবরণ সম্রাটকে অবহিত করা হয়।

রাজমহলের যুদ্ধের পরে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ অংশ এবং ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথম অংশে বাংলার কোন বিবরণ আকবরনামায় পাওয়া যায় না। মনে হয় আকবরনামায় স্থান পাওয়ার মত কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তখন বাংলায় ঘটেনি। ধারণা করা যেতে পারে যে, দাউদের পতনের পরে আফগানরা এবং বাংলার ভুঁঞারা হতবাক হয়ে যায় এবং তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে কিছু ঠিক করতে কিছু সময় লাগে। অন্যদিকে খান জাহান এই সময়ে তাঁর বিজিত এলাকায় শান্তি স্থাপন ও শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন।

এই সময়ে দাউদ কররানীর মা নওলাখার সঙ্গে কয়েকজন আফগান সেনানায়ক সাতগাঁও-এ জড়ো হয়েছিলেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, সাতগাঁও হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি বন্দর, তখনও পর্যন্ত এই বন্দরের কার্যকারিতা নষ্ট হয়নি। তাছাড়া সাতগাঁও একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপেও সুলতানী আমলে গুরুত্ব বহন করত। দাউদ-এর মায়ের সঙ্গে বিস্তর ধন-সম্পদ ছিল; মতি এবং জমশেদ নামে দুজন আফগান সেনানায়ক তাঁর সঙ্গে ছিল। মতির পূর্ব নাম মাহমুদ খান খাসখেল; এমতাবস্থায় যা ঘটে এই ক্ষেত্রেও তাই ঘটতে যাচ্ছিল, অর্থাৎ মতি দাউদের ধন-সম্পদ গ্রাস করে মোগল শিবিরে আশ্রয় নেয়ার মতলব করছিল। জমশেদ এতে বাধা দেয়, ফলে উভয়ের মনোমালিন্যের মধ্যে

Edited by Ripon Sarkar

মতির লোকেরা জমশেদকে হত্যা করে। খবর পেয়ে খান জাহান সাতগাঁও যান। মতি পালিয়ে যায়, দাউদের মা খান জাহানের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কথা হয় যে, মোগল বাহিনী তাঁড়ায় ফিরে গেলে দাউদের মা পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে সেখানে যাবেন। কথা মত দাউদের মা এবং অন্যান্য পরিবার পরিজন খান জাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[৮] প্রকৃতপক্ষে মুর্শিদাবাদের গোয়াস[৯] নামক স্থানে আত্ম-সমর্পণ পর্ব সমাপ্ত হয়। মতিও আত্মসমর্পণ করেছিল, কিন্তু তাকে হত্যা করা হয়।[১০] খান জাহান কেন দাউদের পরিবারকে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় দিলেন না, কেন পরে তাঁড়ায় গিয়ে মোগল আশ্রয় নেওয়ার কথা বলা হল, তা বোধগম্য নয়। সন্দেহ হয় যে, খান জাহান সাতগাঁও এলাকা সম্পূর্ণ জয় করতে না পেরে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সেই কারণে দাউদের পরিবারকে পরে তাঁড়ায় যেতে বলা হয়। ভাবখানা এই, তারা রাজধানীতে আসতে পারলে আশ্রয় দেয়া হবে, না হয় তাদের ভাগ্যে যা থাকে তাই ঘটবে।

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মে মাসে খান জাহান সম্রাটের নিকট বাংলার সুসংবাদ পাঠান। আকবর তখন পাঞ্জাবের ঝিলাম নদীর তীরে শিকার ও আনন্দ ভ্রমণ করছিলেন। খান জাহান সংবাদ দেন যে বাংলা শান্ত, কোথাও কোন যুদ্ধ বিগ্রহ নেই। সংবাদ দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার উপহার সমূহ সম্রাটকে দেয়া হয়, উপহারের মধ্যে ছিল ৫৪টি হাতি। এই তথ্য দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকবরনামায় আরও বলা হয়েছে কোচবিহারের রাজা মাল গোসাঞি আবার আত্মসমর্পণ করেন (again made his submission) এবং রাজার উপহারাদিও সম্রাটের সম্মুখে পেশ করা হয়।[১১]

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে খান জাহান বাংলার শান্ত অবস্থা সম্পর্কে সম্রাটের নিকট যে সংবাদ দেন তাতে বুঝা যায় যে, তিনি তখনও বাংলার আবহাওয়া এবং বাংলার ভূঁএগদের মন মানসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পরিচিত হয়ে উঠেননি। পরের আলোচনায় দেখা যাবে যে বৎসরের শেষ দিকে বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পূর্ব বাংলায় ছুটতে হয় এবং প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদের মোকাবেলা করতে হয়। আবুল ফজলের দ্বিতীয় বক্তব্যটিও আলোচনা সাপেক্ষ। তিনি বলেছেন যে, কোচ রাজা "আবার আত্মসমর্পণ করেন" এবং কোচবিহারের রাজার উপহারও সম্রাটের সম্মুখে পেশ করা হয়। এর মানে কি এই যে, কোচবিহারের রাজা আগেও মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন?

এখানে কোচবিহার সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। এই সময়ে বাংলার বিভিন্ন সীমান্তে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য ছিল; উত্তর-পূর্বে কোচবিহার, তার পূর্বে কামরূপ এবং তারও পূর্বে আসাম। বাংলার পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আরাকান। পরে দেখা যাবে যে, এই সব কয়টি সীমান্ত রাজ্যের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ হয় এবং মাঝে মাঝে মোগল অধিকার ঐ রাজ্যগুলি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অন্যান্য সীমান্ত রাজ্যগুলির কথা পরে আলোচনা করা হবে, এখানে কোচবিহার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের প্রাপ্ত সকল মুদ্রার তারিখ ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ।[১২] এই সময়ে সাধারণত কোচবিহার বা ত্রিপুরার রাজারা শুধু সিংহাসনে বসার তারিখেই মুদ্রা উৎকীর্ণ করত, কোন কোন সময় বিশেষ বিশেষ ঘটনার স্মারক রূপেও মুদ্রা চালু করা হত। সুতরাং রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৫

Edited by Ripon Sarkar

খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি ১৫০৯ শক বা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন, কারণ ঐ সালে তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ মুদ্রা চালু করেন। সুতরাং ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের যে রাজা আকবরের নিকট উপহার পাঠান তাঁর নাম নরনারায়ণ, আবুল ফজল তাঁর নাম লিখেছেন রাজা মাল গোসাঞি। কোচবিহারের রাজা তখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় কোচবিহার ছিল ক্ষুদ্র রাজ্য। কিন্তু ইতোপূর্বে কোচবিহারের রাজা কোন উপহার পাঠিয়েছিলেন কিনা তা স্পষ্ট জানা যায় না। তাই ভট্টশালী আবুল ফজলের "আবার আত্মসমর্পণ" করার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন ঃ[১৩]

> Nowhere in Akbarnama have I succeeded in finding when the first submission took place. Cooch Bihar is previously referred to after Daud's disastrous evacuation of Patna, when Kalapahad and some other partisans of Daud took shelter at Ghoraghat and the Qaqshals succeeded in driving them into Cooch Bihar. It was perhaps at this time that the king of Cooch Bihar was of some help to the Mughals in checkmating the Afghans and this action of the king of Cooch Bihar may have been cited as an act of "submission" for the first time.

ভট্টশালী বলেছেন যে, আফগানদের তাড়া করার সময় কোচবিহারের রাজা মোগল বাহিনীকে সাহায্য করেন, যাকে আবুল ফজল "আত্মসমর্পণ" রূপে ধরে নিয়েছেন। ভট্টশালীর অনুমান হয়ত ঠিক, কিন্তু আবুল ফজলের বক্তব্যে বোধ হয়, কোচবিহারের রাজা কর্তৃক মোগল বাহিনীকে সাহায্য করার চেয়েও আরও কিছু ইঙ্গিত আছে। ইতোপূর্বে আবুল ফজল কোচবিহারের উল্লেখ করেছেন একবার। দাউদ কররানী পাটনা থেকে সরে আসার পরে কিছু সংখ্যক আফগান সেনানায়ক ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রা করেন। আবুল ফজলের উক্তির বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপঃ[১৪]

"আল্লার সাহায্যে যখন বাংলা জয় হল (তখনও অবশ্য জয় সম্পূর্ণ হয়নি), দাউদ সাতগাঁও এবং উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করল। কালাপাহাড়, সোলায়মান, বাবুই মনকলি এবং আরও কয়েকজন আফগান ঘোড়াঘাটে[১৫] চলে যায়। তারা যেখানে যায়, সেখানেই গোলযোগ সৃষ্টি করে।

"কাকশালরা (মোগল বাহিনী) ঘোড়াঘাটে বীরত্ব প্রদর্শন করে এবং পরাজিত শত্রুরা কোচবিহারের দিকে পালিয়ে যায়। সোলায়মান মনকলিকে হত্যা করা হয় এবং বিজয়ীরা অনেক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পায় এবং আফগানদের পরিবার পরিজনকে বন্দী করে। ঐ বিস্তীর্ণ দেশ সম্রাটের বাহিনীর দখলে আসে।"

এখানে বলা হয়েছে যে, আফগানরা কোচবিহারে পালিয়ে যায়, মোগলরা আফগানদের পরাস্ত করে অনেক ধন-সম্পদ লাভ করে এবং "ঐ বিস্তীর্ণ দেশ" মোগলদের দখলে আসে। "ঐ বিস্তীর্ণ দেশ" বলতে এখানে কোন দেশকে বুঝান হয়েছে? আবুল ফজলের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে "ঐ বিস্তীর্ণ দেশ" দ্বারা কোচবিহার বুঝা যায়। মনে হয়, ঐ সময়েই কোচবিহারের রাজা প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন। এর অর্থ এই নয় যে, মোগলরা কোচবিহার দখল করে, তবে কোচবিহারের রাজা মৌখিক আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে। আর আনুগত্য প্রকাশ যদি নাই করে থাকেন

Edited by Ripon Sarkar

এবং কোন প্রকার চুক্তিতে আবদ্ধ না হবেন, তা হলে খান জাহানের মারফত উপহার পাঠাবার কি কারণ থাকতে পারে? খান জাহান কোচ বিহারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এমন কোন প্রমাণ নেই। তাই মনে হয়, আবুল ফজলের "আবার আত্মসমর্পণের" কথার ভিতর কিছু ঐতিহাসিক সত্য রয়েছে।

ভাটিতে খান জাহানের যুদ্ধ

১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের বর্ষা মৌসুমে খান জাহান নদ-নদী বেষ্টিত ভাটি এলাকার বার-ভুঁঞাদের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী এবং তাঁর জীবনের শেষ যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আকবরনামায় এই যুদ্ধের দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে এবং তা নিম্নরূপঃ[১৬]

"বাংলা যখন শান্ত এবং বিদ্রোহীদের যখন দমন করা হয়েছে, তখন ভাটিতে ইবরাহীম নারাল (বা তারাল) ও করিমদাদ মুসাজাই গোলযোগ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজছিলেন। সেই দেশের (ভাটির) ঈসা জমিদারও কপটতার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলেন। মোগল নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ শাহ বরদীও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেন (অর্থাৎ বিদ্রোহ করেন।) সুতরাং খান জাহান সেদিকে সৈন্য পরিচালনা করেন। শাহ বরদী বিদ্রোহের মরুভূমিতে ভবঘুরের মত কাজ করছিলেন, কিন্তু (খান জাহানের আগমনের সংবাদ পেয়ে) আবার অনুগত হন। খান জাহানের সৈন্যবাহিনী ভাওয়াল পৌঁছলে ইবরাহীম নারাল, করিমদাদ মুসাজাই এবং ঐ এলাকার অন্যান্য আফগানেরা অনুগত থাকার প্রস্তাব করেন এবং আনুগত্যের ভাষায় কথা বলেন। ঈসা কিন্তু অবাধ্য এবং বিদ্রোহীই থেকে যান। শাহ বরদী এবং মুহাম্মদ কুলীর অধীনে তাঁর (ঈসা খানের) বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান হয়। এই বাহিনী কিয়ারা সুন্দর (বা গিয়ারা সুন্দর) নদী দিয়ে অগ্রসর হয় এবং কত্রুলের (বা কাইথাল) নিকটে (ঈসা খানের বিরুদ্ধে) যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ঈসা খান পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং মোগল সৈন্যরা অনেক সম্পদ লাভ করে। কিন্তু যেহেতু আত্মম্ভরিতা অন্তর এবং চক্ষু বন্ধ করে দেয়, সেহেতু মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিশ প্রতাপ নামক ঐ এলাকার দুজন ভুঁঞা নিকটবর্তী নদী এবং খাল থেকে অনেক নৌকা এনে বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়। ফলে মোগল বাহিনী হতাশ হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে এবং অনেকেই নৌকা ফেলে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুহাম্মদ কুলী সাহস করে শত্রুদের নৌকায় লাফিয়ে উঠে এবং যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অবশেষে সে বন্দী হয়। মোগল বাহিনী যখন পলায়নরত, তখন সম্রাটের সৌভাগ্যের ফলে টিলা গাজী নামক একজন ভুঁঞা মোগলদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে (অর্থাৎ মোগল বাহিনীকে পলায়ন করতে সাহায্য করে), ফলে যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদসহ মোগল বাহিনী ফিরে যায়। শত্রুরা নিরাশ হয়ে পড়ে। ঠিক ঐ সময় ইবরাহীম নারাল উপহারসহ তাঁর ছেলেকে খান জাহানের নিকট পাঠান, খান জাহান ইবরাহীম নারালের ওজর আপত্তি (excuses) গ্রহণ করেন এবং প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি সিংহভপুরের দিকে গমন করেন, যা (যে শহর অর্থাৎ সিংহভপুর) তিনি তাঁড়ার নিকটে নিজে তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁর বিজয় কাহিনী সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন।"

আবুল ফজলের উপরোক্ত বিবরণ ব্যর্থহীন, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উল্লেখিত ভৌগোলিক স্থানগুলির পরিচয় জানা দরকার।

Edited by Ripon Sarkar

ভাওয়াল : খান জাহান তাঁড়া থেকে যাত্রা করার পরে প্রথমে যে স্থানে পৌঁছেন তার নাম ভাওয়াল। ভাওয়াল শহরে খান জাহান শিবির স্থাপন করেন। হেনরী বেভেরীজ বলেন এটা রন ভাওয়াল,[১৭] কিন্তু তাঁর এই কথা সত্য হতে পারে না। রন ভাওয়াল ময়মনসিংহে, কিন্তু ভাওয়াল ঢাকায় অবস্থিত। রন ভাওয়াল জঙ্গলাকীর্ণ, খান জাহান নৌ-বাহিনী নিয়ে রন ভাওয়ালে যেতে পারেননি। ভাওয়াল নদীর তীরে, নৌ-বাহিনীর নিয়ে ভাওয়ালে যাওয়াই সহজ। তাছাড়া খান জাহানের বাহিনী পরাজিত হয়ে ফিরে আসার সময় টিলা গাজী সাহায্য করেন। টিলা গাজী তালিপাবাদের জমিদার। তাই ধরে নেয়া যায় যে মোগল বাহিনী যে পথে যান সেই পথেই ফিরে আসেন। সুতরাং আকবরনামায় বর্ণিত ভাওয়াল ভাওয়াল পরগণার ভাওয়াল, রন ভাওয়াল হতে পারে না। ভাওয়ালের গাজীদের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌরায়। চৌরা লক্ষ্যা নদীর তীরে বর্তমান কালিগঞ্জের নিকটে অবস্থিত। বর্তমান কালিগঞ্জ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। মেজর রেনেল ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের ৬নং মানচিত্রে যেখানে ভাওয়ালের অবস্থান দেখিয়েছেন, সেই স্থানটি বর্তমানে নাগরী নামে পরিচিত। কিন্তু ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মোগলদের সঙ্গে বার-ভূঁঞার যুদ্ধের সময় নাগরী নামের অস্তিত্ব ছিল না। নাগরী বর্তমানে দেশীয় খ্রিষ্টানদের বাসস্থান, সপ্তদশ শতকে দেশীয় খ্রিষ্টানদের বাসভূমি রূপে নাগরী প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৮] চৌরা কালিগঞ্জের এক মাইল উত্তরে, টঙ্গী-ভৈরববাজার রেল লাইনের আধা মাইল উত্তরে, বর্তমান আড়িখোলা রেল স্টেশনের দেড় মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

এগার সিন্দুর : আবুল ফজলের কিয়ারা সুন্দর বা পিয়ারা সুন্দর বা গিয়ারা সুন্দর আসলে এগার সিন্দুর, যা প্রকৃত পক্ষে এগার সিন্ধু হওয়াই বাঞ্ছনীয় কিন্তু আধুনিক কালে এটা এগার সিন্দুর নামে সমধিক পরিচিত। এগার সিন্দু অর্থ এগারটি নদী, এবং প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি নদী ও খাল এখানে মিলিত হয়েছে। আধুনিক বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা মানচিত্রে এগারটির বেশি নদী এবং খাল এই স্থানে মিলিত হতে দেখা যায়। এগার সিন্দুরে ঈসা মসনদ-ই-আলা পরে একটি দুর্গ তৈরি করেন এবং এই দুর্গ ছিল প্রায় দুর্ভেদ্য। ভট্টশালী এগার সিন্দুরের নিম্নরূপ বিবরণ দেন:[১৯]

> The fort of Egarasindur must have commanded a very strong position when the Brahmaputra flowed below its ramparts. The Brahamaputra has dried up to the narrowness of a canal, and nearly the whole of the old river bed, which is more than a mile broad, is now under cultivation. But the grandeur of the position of Egarasindur can still be seen at a glance, if one stands on the citadel of the fort. Occupying the apex of the angular piece of land formed by the sharp bend of the Brahmaputra, it was almost unassailable, when the river was full. The now dried up channel called the Sankha river, whose old bed can still be seen near Shahjahan's mosque[20] also afforded protection. The earthen rampart of the fort still stands about 8 ft. high in places and the buruz and the gateway still show traces of masonry constructio... The town of Egarasindur must have been a considerable one, at the time of its highest prosperity. Toke, on the opposite side,

Edited by Ripon Sarkar

was a big mart, and seems to have been to Egarasindur what Howrah now is to Calcutta.

এগার সিন্দুর ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান ধারার পূর্ব তীরে অবস্থিত, ঠিক যে স্থানে পশ্চিম তীরে বনার নদী শাখারূপে বের হয়েছে, তার সামনে। বনার নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের শাখা হয়ে বের হয়েছে সেখানেই টোক অবস্থিত।

কত্রুল বা কাইথাল : কত্রুল বা কাইথাল মেঘনা নদীর তীরে অষ্টগ্রামের দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এটা জোয়ানশাহী পরগণায় অবস্থিত এবং কত্রুল বা জোয়ানশাহীর পূর্ব দিকে মেঘনার অপর পারে অবস্থিত সরাইল পরগণা, যেখানে ঈসা খান প্রথমে ক্ষমতায় আরোহণ করেন।

এখন আমরা বার-ভুঁঞার সঙ্গে খান জাহানের যুদ্ধের গতি প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি। খান জাহান তাঁড়া থেকে বের হয়ে প্রথমে গোয়াস যান, এখানে দাউদের মা নওলাখা খান জাহানের সাথে দেখা করেন।[২১] এরপর খান জাহান গঙ্গা নদী ধরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হন। পথে তিনি কোথায় কোথায় অবস্থান করেন, তা আকবরনামায় পাওয়া যায় না। উক্ত সূত্রে দেখা যায় যে, খান জাহান ভাওয়াল পৌঁছে যান। দেখা যাচ্ছে যে, তিনি লক্ষ্যা নদী দিয়ে অগ্রসর হন এবং লক্ষ্যার তীরে অবস্থিত ভাওয়াল শহরে (চৌরা নামক স্থান) পৌঁছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, খান জাহানের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই। আকবরনামায় যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় যে, সরাইলের জমিদার ঈসা খান এবং অন্য দুই পরগণার জমিদার মজলিশ দিলওয়ার, মজলিশ প্রতাপও খান জাহানের প্রতিপক্ষ ছিলেন, অর্থাৎ সোনারগাঁও, মহেশ্বরদী, জোয়ানশাহী, খালিয়াজুরী এবং সরাইল-এর জমিদাররা মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সুতরাং বলা যায় যে লক্ষ্যা, বনার, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা বিধৌত এক বিস্তীর্ণ এলাকা মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, এই ভুঁঞারা মোগল নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ শাহ বরদীকেও তাদের পক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন। খান জাহান ভাওয়াল-এ পৌঁছলে নিকটবর্তী সোনারগাঁও এবং মহেশ্বরদী পরগণার জমিদার যথাক্রমে ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই আত্মসমর্পণ করেন। শাহ বরদীও তাঁর ভুল বুঝতে পেরে খান জাহানের প্রতি পুনরায় আনুগত্য প্রদর্শন করেন এবং মোগল শিবিরে ফিরে আসেন। দেখা যায় যে, প্রাথমিকভাবে খান জাহান সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু প্রধান প্রতিপক্ষ ঈসা খান আত্মসমর্পণ করেননি। তাই খান জাহান শাহ বরদী ও মুহাম্মদ কুলীকে ঈসা খানের বিরুদ্ধে পাঠালেন। তাঁরা এগার সিন্দুর গিয়ে পৌঁছেন এবং ব্রহ্মপুত্রের মাধ্যমে মেঘনা নদী দিয়ে সরাইল, জোয়ানশাহীর দিকে গমন করেন। মেঘনার তীরে কত্রুল নামক স্থানে ঈসা খানের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিশ প্রতাপ কোন ভূমিকা পালন করেন কিনা আকবরনামায় বলা হয়নি। বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধে ঈসা খান পরাজিত হন এবং পালিয়ে যান, কিন্তু হঠাৎ মজলিস দিলাওয়ার এবং মজলিস প্রতাপ মোগলদের আক্রমণ করে এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন যে, মোগল সৈন্যরা সাহস হারিয়ে পালাবার পথ পাচ্ছিল না।

এই স্তরে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালায় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রাজমালায় বলা হয়েছে যে, ঈসা খান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মেহেরকুলের[২২] পথ ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যান এবং ত্রিপুরা রাজ অমর মাণিক্যের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঈসা খানের প্রতিপক্ষ ছিলেন

Edited by Ripon Sarkar

মোগল সম্রাট আকবর। ঈসা খানের পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়ায় ত্রিপুরার রাজার কোন স্বার্থ ছিল না, বরং প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের বিপক্ষে কিছু না করাই ত্রিপুরার রাজার স্বার্থের অনুকূল ছিল। তাই ঈসা খানকে সাহায্য করার ইচ্ছা রাজা অমর মাণিক্যের ছিল না। তাঁর মন্ত্রীরাও তাঁকে এই যুদ্ধে না জড়াবার উপদেশ দিলেন। রাজা অমর মাণিক্যের তাজ খান ও বাজ খান নামে দুজন আফগান সেনানায়ক ছিলেন। ঈসা খান তাঁদের পরামর্শ চাইলে তাঁরা ঈসা খানকে রাণী অমরাবতীর সাহায্য কামনা করার উপদেশ দেন। ঈসা খান রাণীকে মা ডাকেন এবং রাণীর স্তন-ধোয়া পানি পান করেন। রাণী ঈসা খানকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন এবং ঈসা খানকে সাহায্য করার জন্য রাজার নিকট অনুরোধ জানান। রাজা ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন এবং ৫২,০০০ সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন।[২৩]

রাজমালার উপরোক্ত বিবরণের কিছু কিছু আগেই আলোচনা করা হয়েছে। রাজা অমর মাণিক্য ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন কিনা এই বিষয়ে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছি। ত্রিপুরার রাজা যে ঈসা খানকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাও থাকতে পারে। তবে ত্রিপুরার সৈন্যদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি। আকবরনামায় বলা হয়েছে যে, মজলিস দিলাওয়ার ও মজলিস প্রতাপ নামক দুজন জমিদার মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। মোগল বাহিনী এমন শোচনীয় পরাজয় বরণ করে যে, তারা আর যুদ্ধ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। এমনকি ভাওয়াবাদের জমিদার টিলা গাজী মোগলদের পশ্চাদপসরণে সাহায্য না করলে মোগল বাহিনী হয়ত ধ্বংস হয়ে যেত। আবুল ফজল মুখ রক্ষার জন্য বলেছেন যে যুদ্ধ-লব্ধ সামগ্রী নিয়ে খান জাহান সিহহতপুরে ফিরে আসেন এবং

The black hearted foe fell into the billows of despair,"[২৪] ভট্টশালী ঠিকই বলেছেন[২৫] "Khan Jahan returned to Sihhatpur, a town which he had founded near Tanda, and sent reports to the Emperor about the celestial aid, i, e, in plain language, about the fortunate help from Tala Ghazi and Ibrahim Naral, which enabled him to return safely.

ভাটি থেকে ফিরে আসার অল্প দিন পরে, ১৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে খান জাহান সিহহতপুরে পরলোক গমন করেন। আবুল ফজল বলেনঃ[২৬] When he returned sucessful from Bhati he took up his abode at Sihhatpur. The sincerity of his soul had become somewhat clouded by the senserobbing wine of self love. Fortunately the veil of honour was not rent. In a short space of time he fell on the bed of pain. He suffered pains in his belly for $1^1/_2$ months and died." আবুল ফজলের এই বক্তব্যে শেষ জীবনে, মৃত্যুর পূর্বে সম্রাট আকবরের প্রতি খান জাহানের আনুগত্যে ফাটল ধরার এবং বিদ্রোহ করার কথা ফুটে উঠে। বিশেষ করে "The sincerity of his soul had become somewhat clouded by the sense-robbing wine of self-love.

Edited by Ripon Sarkar

কথার মধ্যে বিদ্রোহের ইঙ্গিত আছে। হেনরী ব্লখম্যান ঠিকই বলেছেন যে খান জাহান বিদ্রোহ করার সংকল্প করেন কিন্তু মৃত্যু তাঁকে শেষ বয়সে অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে রক্ষা করে। তিনি বলেনঃ[২৭]

Abul-Fazl remarks that his death was opportune, in as much as the immense plunder collected by Khan Jahan in Bengal, had led him to the verge of rebellion.

নলিনী কান্ত ভট্টশালীও ব্লখম্যানের এই বক্তব্য সমর্থন করেন।[২৮]

সুবাদার মুজফফর খান তুরবতী

খান জাহানের মৃত্যুর পরে তাঁর ছোট ভাই ইসমাইল কুলী খান সুবাদারের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি হয়ত সুবাদারের পরে নিযুক্তির আশা করছিলেন, কিন্তু আকবর মুজফফর খান তুরবতীকে সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং ইসমাইল কুলী খানের নিকট আদেশ পাঠান যেন নতুন সুবাদারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়।[২৯]

নতুন সুবাদারের পূর্ণ নাম ছিল খাজা মুজফফর আলী খান-ই-তুরবতী। তুরবত খোরাসানের একটি গুষ্টির নাম। প্রথমে জীবনে মুজফফর বৈরাম খানের দিওয়ান ছিলেন। বৈরাম খান আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, তিনি তাঁর পরিবার এবং ছেলে আবদুর রহীম সহ মুজফফর খানকে দিপালপুরে তাঁর (বৈরাম খানের) পালকপুত্র এবং তবারহিন্দার জাগীরদার শের মুহাম্মদ দিওয়ানের নিকট নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাঠান। কিন্তু শের মুহাম্মদ মুজফফরকে শৃঙ্খলিত করে আকবরের নিকট পাঠিয়ে দেন। আকবরের সভাসদরা মুজফফরকে হত্যা করার পরামর্শ দিলেও আকবর তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং একজন আমিল (রাজস্ব সংগ্রাহক) নিযুক্ত করেন। মুজফফর অত্যন্ত দক্ষ লোক ছিলেন, আবুল ফজলের ভাষায়[৩০] "(He) had an abundant share of choice qualities." মুজফফর স্বীয় দক্ষতা ও উপযুক্ততার পুরস্কারস্বরূপ ধাপে ধাপে উন্নতি করতে থাকেন এবং প্রথমে দিওয়ান-ই বুয়ুতাত (সাম্রাজ্যের মালখানার দিওয়ান) এবং পরে ৯৭১ হিজরী (১৫৬৩-৬৪ খ্রিঃ) সনে সাম্রাজ্যের প্রধান দিওয়ানের পদে উন্নীত হন এবং খান উপাধি লাভ করেন। রাজা তোডর মল্ল মুজফফর খানের অধীনে ছিলেন। বদায়ুনী বলেন যে, মুজফফর খান এবং রাজা তোডর মল্ল উভয়ে সর্বদা ঝগড়া করতেন এবং লোকে বলাবলি করত যে রাজকোষের অধ্যক্ষ হিসেবে রাজা তোডর মল্ল অধিকতর যোগ্য ছিলেন। প্রতিভাবান লোকের কোন কোন সময় বদ-খেয়াল বা বদ-অভ্যাসও থাকে। মুজফফর খানেরও এরূপ কিছু বদ-অভ্যাস ছিল। আকবরের রাজত্বের দ্বাদশ বর্ষে সম্রাট জানতে পারেন যে, মুজফফর খান কুতুব নামক একটি ছেলেকে ভালবাসতেন। সম্রাট ছেলেটিকে জোর করে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। ফলে মুজফফর খান ফকীরের বেশে জঙ্গলে চলে যান। সম্রাট বাধ্য হয়ে ছেলেটিকে ফিরিয়ে আনেন। রাজত্বের ১৭শ বর্ষে দরবারে চৌপর[৩১] খেলার বেশ প্রচলন হয়। মুজফফর খানও এই খেলায় আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি এই খেলায় অনেক সোনার মোহর হারান। ফলে তাঁর মেজাজ বিগড়ে যায়। আকবরও মুজফফর খানের প্রতি বিরক্ত হয়ে তাঁকে মক্কা চলে যেতে বলেন। কিন্তু মুজফফর খান কাজের লোক ছিলেন। তাই সম্রাট শীঘ্রই তাঁর পূর্ব আদেশ বাতিল

Edited by Ripon Sarkar

করেন। রাজত্বের ১৮শ বর্ষে মুজফফর খান প্রধান উকিল নিযুক্ত হন এবং জুমলত-উল-মুলক উপাধি লাভ করেন। অতঃপর মুজফফর খান বিহারের রোটাস দুর্গ আক্রমণে অংশ নেন এবং বীরত্ব প্রদর্শন করেন, তিনি হাজিপুরও জয় করেন। ফলে আকবর তাঁকে তাঁর রাজত্বের ২০শ বর্ষে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। ২২শ বর্ষে তিনি সম্রাটের দরবারে ফিরে যান, সেখানে তাঁর তত্ত্বাবধানে শাহ মনসুর এবং রাজা তোডর মল্ল রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। এই অত্যন্ত কর্মঠ এবং রাজস্ব প্রশাসনে পারদর্শী মুজফফর খান এখন বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন।[৩২]

কিন্তু মুজফফর খান যখন বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন, তখন তিনি বয়স্ক, তাঁর আগের উদ্যম এবং কর্মক্ষমতা এবং নেতৃত্বের গুণাবলী আর নেই। পরে দেখা যাবে যে, তিনি বাংলার বিদ্রোহী ভুঁঞাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেননি, মোগল শিবিরেই মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং মুজফফর খান নিজের লোকের হাতেই প্রাণত্যাগ করেন। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন:[৩৩]

> But evidently his mental powers had now deteriorated and he had lost his former clearness of vision and rapid power of decision. The sad tale of his viceroyalty ended in his murder at the hands of his own mutinous officers after one year only.

সম্রাট সুবাদার মুজফফর খানের সঙ্গে রজভী খানকে বখশী, মীর আদহাম ও রায় পত্র দাসকে দিওয়ান এবং হাকিম আবুল ফতহকে সদর ও আমীন নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠান। তাঁদের সঙ্গে নিজাবত খান, মীর জামাল-উদ-দীন হোসেন আঞ্জো এবং আরও অনেক সেনানায়ক সম্মানসূচক পোশাক ও উপহার পেয়ে বাংলায় আসেন।

রজভী খানের প্রকৃত নাম মিরযা মীরক, তিনি মশহাদের রজভী সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে খান জামানের সঙ্গী ছিলেন। খান জামান বিদ্রোহ করলে তাঁর ক্ষমা লাভের জন্য মিরযা মীরক সম্রাটের দরবারে যান। খান জামানের মৃত্যুর পরে আকবর তাঁকে বন্দী করেন এবং প্রত্যেক দিন একবার করে তাঁকে মত্ত হাতির সামনে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু মিরযা মীরক যেহেতু সৎ বংশের লোক ছিলেন, সম্রাট মাহুতকে গোপনে নির্দেশ দেন যেন মিরযা মীরককে হত্যা করা না হয়। পাঁচদিন মত্ত হাতির সামনে দেওয়ার পরে সভাসদদের অনুরোধক্রমে সম্রাট তাঁকে মুক্তি দেন। কিছুদিন পরে তিনি মনসব[৩৪] এবং রজভী খান উপাধি লাভ করেন। সম্রাটের রাজত্বের ১৯শ বর্ষে রজভী খান জৌনপুরের দিওয়ান নিযুক্ত হন এবং ২৪শ বর্ষে বাংলার বখশী নিযুক্ত হন। তাঁর এই নিযুক্তি তাঁর আগের দায়িত্বের অতিরিক্ত।[৩৫]

দুজন দিওয়ান মীর আদহাম এবং রায় পত্র দাসের পূর্ব ইতিহাস বিশেষ জানা যায় না। সদর ও আমীন পদে নিযুক্ত হাকিম আবুল ফতহ একজন অতি জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি জিলানের মোল্লা আবদুর রাজ্জাকের পুত্র, তাঁর পিতাও একজন জ্ঞানী লোক ছিলেন এবং জিলানের সদর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে হাকিম আবুল ফতহ ও তাঁর দুই ভাই হাকিম হুমাম ও হাকিম নূর-উদ-দীন আকবরের রাজত্বের ২০শ বর্ষে আকবরের দরবারে আসেন এবং ২৪শ বর্ষে হাকিম আবুল ফতহ বাংলার সদর ও আমীন নিযুক্ত হয়ে আসেন।[৩৬] মীর জামাল-উদ-দীন হোসেন আঞ্জো সৈয়দ পরিবারে জন্ম গ্রহণ

Edited by Ripon Sarkar

করেন। তিনি ইরানের শিরাজ নগর থেকে ভারত উপমহাদেশে আসেন[৩৭] এবং আকবরের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। সুবাদার মুজফফর খান তুরবতীর সঙ্গে তিনি বাংলায় আসেন। নিজামত খান ছিলেন সুবাদার মুজফফর খানের জামাতা।

এই প্রথমবার বাংলার সুবাদার নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে দিওয়ান, বখশী, সদর ও আমীন অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসন কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করে পাঠান হয়। অবশ্য এটা বাংলা প্রদেশের জন্য কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এ সময়ে সম্রাট আকবর তাঁর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। তিনি সাম্রাজ্যকে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক সুবার সুশাসনের জন্য একই ধরনের শাসন প্রবর্তন করেন। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সুবার শাসনভার একজন সুবাদারের হাতে ন্যস্ত হয়। প্রথমদিকে এই কর্মকর্তাকে সিপাহসালার বলা হলেও পরে সুবাদার এবং আরও পরে নাযিম রূপে অভিহিত করা হয়। সুবাদারের দায়িত্ব ছিল প্রতিরক্ষা, সাধারণ শাসন এবং ফৌজদারী আইন কানুন করা। সুবা বা প্রদেশের অন্যান্য কর্মকর্তাদের উপর নজর রাখা এবং তাদের কাজের তত্ত্বাবধান করাও সুবাদারের দায়িত্ব ছিল। সুবাদারের নিচেই দিওয়ান এর স্থান; কিন্তু যেহেতু দীওয়ানদের কাজ ছিল রাজস্ব আদায় করা এবং রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধান করা, সেহেতু দিওয়ানরা সুবাদারের অধীনস্থ কর্মকর্তা হলেও তাঁদের সুবাদারের নিকট জবাবদিহি করতে হত না, বরং রাজস্ব বিভাগীয় কাজকর্মে তাঁরা সরাসরি কেন্দ্রীয় দিওয়ানের অধীনে ছিল এবং কেন্দ্রীয় দিওয়ানের কাছেই তাঁরা জবাবদিহি করতেন। বখশী ছিলেন প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্তা; সৈন্যদের বেতন, রসদ ইত্যাদি ব্যবস্থা করা তাঁদের দায়িত্ব ছিল। সদর ছিলেন ধর্মীয় বিভাগের কর্তা। তাছাড়া কাযী, মীর বহর, কোতোয়াল এবং ওয়াকিয়ানবিশও প্রত্যেক সুবায় নিযুক্ত হত। বাংলায় এই সকল কর্মকর্তাদের নিযুক্তির কথা সুবাদারের নিযুক্তির সঙ্গে নেই। তবে মীর বহর পদে যে শাহ বরদী বাংলায় ছিলেন তার প্রমাণ আগেই দেয়া হয়েছে। আকবরনামায় এই সময় বাংলা কোতোয়াল ও ওয়াকিয়ানবিশ নিযুক্তির কথা পাওয়া যায় না।

শুধু যে সুবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠিত হয় তাই নয়, আকবর এ সময়ে আরও কতকগুলি পদক্ষেপ নেন এবং আরও কতকগুলি আইন বা বিধি বিধান প্রবর্তন করেন যার দ্বারা প্রাদেশিক শাসন প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। ইতোপূর্বে সুবাদাররা সুবার শাসন ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিল এবং তাদের ইচ্ছামতই শাসন কাজ পরিচালিত হত। কিন্তু অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়োগের ফলে প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা আলাদা কর্মকর্তা নিযুক্ত হওয়ায় প্রত্যেক বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকে। নতুন শাসন ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজস্বনীতি নির্ধারণ এবং সাম্রাজ্যের আয় বাড়ানো। এর উপায় হচ্ছে বেআইনীভাবে ভূমির অধিকারকারীদের বিতাড়িত করে ভূমি রাজস্ব দিওয়ানের এখতিয়ারভুক্ত করা এবং সামরিক কর্মকর্তাদের হিসাবের কারচুপি বন্ধ করা। সামরিক কর্মকর্তারা সাধারণত অতিরিক্ত ঘোড়া দেখিয়ে অর্থ আয়ের ব্যবস্থা করত। সুতরাং ঘোড়ার দাগ দেওয়া প্রথা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়।

কররানী সুলতানদের আমলে বাংলায় মোটামুটিভাবে শান্তি বিরাজ করত। ফলে শাসকগুষ্টির হাতে অনেক সম্পদ জমা হয়। মোগল বিজয়ীদের নিকট যখন এই সম্পদ

Edited by Ripon Sarkar

লাভের লোভ হয় এবং কার্যত মোগল সেনানায়কেরা যুদ্ধলব্ধ অর্থ নিজেদের কাছে রেখে দেয়, সুবাদার প্রমুখ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এই লোভ সংবরণ করতে পারেনি। উপরে বলা হয়েছে যে, আকবরনামায় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, মোগল সৈন্যরা তাদের লব্ধ প্রভূত সম্পদ নিয়ে কিভাবে মহামারী কবলিত বাংলা ছেড়ে দিল্লী আগ্রায় চলে যাবে তার চেষ্টায় ছিল। খান জাহানের আগমনের প্রাক্কালে মোগল সৈন্যরা বাংলা ছেড়ে ভাগলপুর পর্যন্ত চলে যায়। এরূপ বেআইনিভাবে প্রাপ্ত মোগল সেনানায়ক ও সৈন্যদের সম্পদের হিসাব নেয়াও নতুন কর্মকর্তাদের দায়িত্বে দেয়া হয়। তাছাড়া নতুন দিওয়ান খাজা শাহ মনসুরের নতুন নীতিতে বাংলায় যুদ্ধরত সৈনিকদের ভাতা কমিয়ে দেয়া হয়। এ সময়েই আবার সম্রাট আকবর মুজতাহিদের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং দীন-ই-এলাহী নামক নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। বাংলা এবং বিহারের মোগল সৈন্য এবং সেনানায়কেরা এমনিতেই নতুন বিধি-বিধানের ফলে বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হয়, নতুন ধর্মমত প্রবর্তনের ফলে। তারা সত্যি সত্যিই বিদ্রোহ করেন এমনকি বিদ্রোহীরা কাবুলের মিরযা হাকিমের (আকবরের ভাই) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাঁকে (মিরযা হাকিমকে) দিল্লীর সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করে।

মুজফফর খান তুরবতী বাংলায় আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বিহারে মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহ হয়। নতুন সুবাদারের ভাগ্যই খারাপ বলতে হবে, কারণ তিনি বাংলায় এসে সুখ পাননি, প্রথম থেকেই তিনি বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হন এবং বিদ্রোহীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলার ভুঁঞাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার তাঁর কোন সুযোগ হয়নি। আবুল ফজল আকবরনামায় সুবাদার মুজফফর খান তুরবতীর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, মুজফফর খান বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন না (he did not recognize the measure of greatness), তিনি সৈন্যবাহিনী পরিচালনা বা দেশ শাসনের প্রতি বিশেষ নযর দেননি। যেহেতু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দিওয়ান এবং বখশীও নিযুক্ত হয়, তিনি তাঁদের হাতে তাঁদের স্ব-স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের ভার দেন। আবুল ফজল আরও বলেনঃ[৩৮]

> He (Muzaffar Khan) from short sightedness regarded them as partners and was displeased and withdrew his hand from business, and assumed grand airs. He left affairs to them and witheld himself from conciliating the soldiers and the peasantry. In private or in public he did not return thanks for favours received, but made complaints. That ruined intellect did not know that in administrative work the more one is helped and helps. the better is the work accomplished.

মুজফফর খান তুরবতী দিওয়ান, বখশী ইত্যাদি কর্মকর্তাকে স্ব স্ব দায়িত্বে বহাল করে আইনের দিক দিয়ে কোন ভুল করেননি, তবে আবুল ফজল বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে সুবাদার তাঁর তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রয়োগ করেননি। যেমন তিনি আরও বলেনঃ[৩৯]

"He gave up finance which was his strong point and always had the forehead of his heart full of wrinkles."

এই বক্তব্যেই বুঝা যায় আবুল ফজল কেন মুজফফর খান তুরবতীকে সমালোচনা করেছেন। যে অর্থ ও রাজস্ব ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যে বিষয়ে পারদর্শিতার

Edited by Ripon Sarkar

মাধ্যমে তাঁর নিজের উন্নতি, সেই অর্থ এবং রাজস্ব বিষয়েই তিনি আগ্রহ দেখাননি। সৈন্যদের বেতন ভাতা হ্রাস, অন্যায়ভাবে সঞ্চিত অর্থ সম্পদ ফিরিয়ে নেয়া ইত্যাদি নিয়েই মূলত সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। আবুল ফজল হয়ত বলতে চেয়েছেন যে এই বিষয়গুলিতে মুজফফর খান পারদর্শী, তাই তিনি এই বিষয়ের সমাধান করেননি কেন? প্রশ্নটি পরে আলোচিত হবে এবং দেখা যাবে যে এতে মুজফফর খান তুরবতীর করার কিছু ছিল না। আবুল ফজল অন্য যে বিষয়ে সমালোচনা করেছেন তা বোধ হয় এই যে, মুজফফর খান গুণের বা গুণীর সমাদর করেননি। তিনি কাউকে সাহায্য করেননি বা কেউ তাঁকে সাহায্য করেনি, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব ছিল না। আবুল ফজলের এই সমালোচনা সঠিক বলেই মনে হয়। তাঁর সময়ে বিদ্রোহীদের শান্ত করার প্রচেষ্টা বা বিদ্রোহীদের সম্মিলিতভাবে মোকাবিলা করার কোন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। স্যার যদুনাথ সরকারও তাঁর সিদ্ধান্তহীনতা এবং কৌশলের অভাব তাঁর পতনের জন্য দায়ী বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেনঃ[৪০] "Muzaffar Khan's administration was doomed to tragic failure by a political convulsion which arose from circumstances beyond his control, but whose evil effect was aggravated by his habitual wavering and want of tact."

বিদ্রোহের প্রাক্কালে বাংলায় অবস্থানরত মোগল সেনানায়কদের কার্যকলাপ এবং মনোভাব সম্পর্কে আবুল ফজল দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন এবং তা নিম্নরূপঃ[৪১]

"বাংলা এমন একটি দেশ যেখানে আবহাওয়া নীচু স্তরের লোকদের সাহায্য করে এবং যেখানে বিভেদ ও অনৈক্য সর্বদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মানুষের দুষ্কৃতির ফলে অনেক পরিবার নষ্ট হয়েছে এবং রাজ্য ধ্বংস হয়ে গেছে। এই কারণে প্রাচীন লেখায় ইহাকে বলগাকখানা[৪২] বা দাঙ্গা-হাঙ্গামাকারী দেশ বলা হয়েছে। সেনাপতি (মুজফফর খান) বদ মেজাজী হওয়ায় বন্ধু এবং অপরিচিতদের বশে রাখেননি। অন্যান্য সেনানায়কেরা ছিল লোভী, উপহার পাওয়ার জন্য তারা উৎপীড়ন করত। তাদের লোভে-তাদের মাথায় ধূলা ছিটানো হউক, তারা সম্পূর্ণ নির্লজ্জ হতে পারেনি, বরং তখনও পর্যন্ত বাস্তব কারণে মোটামুটি অনুগতই থাকে। যে কেউ দুর্বলের ঘর ধ্বংস করে নিজের ঘর সুদৃঢ় করেছে, সে সম্মান হারিয়েছে এবং স্বীয় অস্তিত্ব ধ্বংস করেছে। অল্প বুদ্ধির লোকেরা খান জাহানের সংগৃহীত সম্পদের খোঁজ-খবর নিয়ে গোলযোগ আরম্ভ করে (ফলে খান জাহানের ভাই) ইসমাইল কুলী খান এবং অন্যান্য তাতার সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দান করে।[৪৩] কিন্তু তিনি (ইসমাইল কুলী) যেহেতু দক্ষ এবং অনুগত ছিলেন, তিনি অপমান সহ্য করেন এবং লোভীদের ক্ষুধা নিবৃত্ত করাকে (এই সমস্যার) সমাধান মনে করলেন। একটি নেকড়ে বাঘের টুকরা দিয়ে তাঁরা সম্রাটের দরবারে যাত্রা করেন।[৪৪] পরে সেনানায়কেরা বিহারের (বিদ্রোহীদের) অনুকরণে অনেক হৈ-চৈ শুরু করে এবং সকল তাতারদের নিকট থেকে অর্থ দাবী করতে থাকে এবং এই জন্য (তাতারদের বিরুদ্ধে) কঠোরতা অবলম্বন করে। বিদ্রোহীদের নেতা বাবা খান বলতে থাকে, আমি এই পর্যন্ত ৭০,০০০ হাজার টাকা উপহার দিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত একশত ঘোড়ারও দাগ দেয়া হয়নি, অন্যান্য জায়গীরদারদের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ"। অন্তরশূন্য অফিসারেরা যখন দাবীর পর দাবী করছিল এবং তাদের মনের কালিমায় অন্যের ক্ষতি করে নিজেদের ধনী হওয়ার চেষ্টায় ছিল, তখন গোলযোগ সৃষ্টিকারী এবং বেতনভোগী সৈন্যরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং বিদ্রোহ করে।"

Edited by Ripon Sarkar

আবুল ফজলের উক্ত বক্তব্যে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী এবং পরলোকগত সুবাদার খান জাহানের পুঞ্জীকৃত (accumulated) ধন-সম্পদই বিদ্রোহের সূচনা করে। বাবা খানের কথায় মনে হয় ঘোড়ায় দাগ দেয়ার ব্যাপারেও দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। খান জাহানের মৃত্যুর কথা আলোচনা করে আমরা আগেই সন্দেহ পোষণ করেছি যে, খান জাহান বিদ্রোহের চিন্তা করছিলেন কিন্তু মৃত্যু তাঁকে অকৃতজ্ঞ হওয়া থেকে রক্ষা করেন। ব্লখম্যান এবং আশালীও তাই মনে করেন। এখন দেখা যাচ্ছে যে, খান জাহানের জমাকৃত ধন সম্পদ তাঁর জীবনকালে অনর্থের সৃষ্টি করতে না পারলেও তাঁর মৃত্যুর পরে অনর্থ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। খান জাহান যে অবৈধভাবে সম্পদ সংগ্রহ করেন, তা নিশ্চয়ই বিদ্রোহীরা জানত, তা না হলে তারা খান জাহানের সম্পদের অংশ দাবি করত না। কিন্তু মুজফফর খান খান জাহানের সম্পদ[৪৫] এবং খান জাহানের সময়ে সংগৃহীত বাংলার রাজস্ব এবং বাংলার হাতি ফতেহ চাঁদ মনকলির তত্ত্বাবধানে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে দাউদ কররানীর মা এবং দাউদের পরিবারের অন্যান্য মহিলাদেরও পাঠান হয়। তখন বিহারে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং বিদ্রোহীরা খান জাহানের সম্পদ লুট করার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত খান জাহানের সম্পদ সম্রাটের দরবারে পৌঁছে (১৫৮১) খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) এবং দিওয়ানে জমা হয়। ঐ সম্পদের মধ্যে একশ সত্তরটি হাতিও ছিল।[৪৬]

বাঙলার মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহের কারণ

ইতোমধ্যেই মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহের কারণ কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। আবুল ফজল কারণসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মতে নিম্নবর্ণিত নয়টি কারণে বাংলায় বিদ্রোহ হয় :

১ম. যুক্তির কুটিলতা। দুষ্ট লোকেরা অশুভ কাজকে শুভ মনে করে এবং ক্ষতিকে লাভ রূপে মনে করে।

২য়. বিদ্রোহীদের মজ্জাগত দোষ, আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়াই তারা পছন্দ করে।

৩য়. সম্পদ বৃদ্ধি। সম্পদের প্রাচুর্য মানুষকে ভাল থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং বোকা ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ করে দেয়।[৪৭]

৪র্থ. জৌনপুরে রজভী খানের দুর্ব্যবহার। তিনি জৌনপুরের দিওয়ান ছিলেন এবং স্মরণ থাকতে পারে যে, তাঁকে একই সঙ্গে বাংলার বখশী নিযুক্ত করা হয়। রজভী খান জৌনপুরে খালসা ভূমির রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। তিনি রাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কার না করে সম্পূর্ণ পুনর্গঠন করেন। ফলে জাগীরদারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

৫ম. সৎ চিন্তাযুক্ত লোকজন (অর্থাৎ সৎ লোকজন) হয় অবসর নেয় বা দূরে সরে যায়। সুতরাং বিদ্রোহীদের যারা সৎ পরামর্শ দিতে পারত তাদের অভাব দেখা দেয়। সমাজে এই ধরনের লোকের প্রয়োজন্ আছে। আবুল ফজল এর দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। কারা অবসর নিয়েছে বা কারা দূরে সরে গিয়েছে, এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। হয়ত আবুল ফজল সাধারণভাবেই দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সমাজে তখন সৎ লোকের অভাব ছিল।

Edited by Ripon Sarkar

৬ষ্ঠ. খাল্‌দিন খানকে অপমান করা হয়। খাল্‌দিন খানের জাগীর জালেশ্বর খাল্‌দিন খান থেকে নিয়ে জামাল-উদ-দীন হোসেন আঞ্জোকে দেয়া হয়। খাল্‌দিন খান ইতোমধ্যেই কিছু খাজনা আদায় করেন, কিন্তু তা না দেয়ার ফলে মুজফফর খান তাঁর এক বস্ত্র লটকিয়ে তাঁর উপর অত্যাচার করেন।[৪৮] এতে সকলেই সুবাদারের প্রতি বিরক্ত হন এবং জাগীরদারেরা ভয় পেয়ে যায়। অন্যান্য জাগীরদারেরা নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক সৈন্য রাখত। খান জাহানের মৃত্যুর সময়ে তাঁর ভাই ইসমাইল কুলী খানকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে সম্রাটের অনুমোদন ছাড়া তাঁর জাগীর বৃদ্ধি করা হয়। মুজফফর খান এই উভয় ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন, অর্থাৎ যারা কম সংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করেছিল তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ এবং বিনা অনুমতিতে ইসমাইল কুলী খান অতিরিক্ত জাগীর ভোগ করার ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এই উভয় ক্ষেত্রে মুজফফর খান সঠিক পদক্ষেপ নেন, কিন্তু আবুল ফজল এর জন্যও সুবাদারকে দায়ী করেন, কারণ তাঁর ভাষায় "From somnolency of intellect he did not take note of the circumstances of the time." আবুল ফজল বলতে চেয়েছেন যে সৈন্যদের বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে সুবাদার এই পাওনা দাবি না করলেই ভাল হত।

৭ম. রোশন বেগের হত্যা। রোশন বেগ একজন রাজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা ছিলেন এবং সরকারি রাজস্ব আত্মসাৎ করে কাবুলে পালিয়ে যান। বাংলার বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে তিনি বাংলায় চলে আসেন। আকবর তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন এবং মুজফফর খান তুরবতী রোশন বেগকে ধরতে পেরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই বিষয়েও সুবাদারের কোন দোষ ছিল না, কিন্তু এখানেও আবুল ফজল বলেন,

"Muzaffar Khan did not understand the times and thought that by putting him to death at the beginning of the rebellion he would induce men to be submissive. But it only enhanced their turbulence"

অর্থাৎ সময়ের দিকে দৃষ্টি রেখে সুবাদার রোশন বেগকে মৃত্যুদণ্ড না দিলেই ভাল করতেন।

৮ম. কেন্দ্রীয় সরকারের দিওয়ান খাজা শাহ মনসুর কর্তৃক অসময়ভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করা। বিহার এবং বাংলার মোগল অভিযান শুরু করার সময় থেকে সম্রাট বিহারে এবং বাংলায় যুদ্ধরত সৈনিকদের উৎসাহ দেয়ার জন্য একটি বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করেন। মোগল সৈনিকরা বাংলা বিহারের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিত ছিল না, এখানে ঘোড়া লালন পালন করাও কষ্টকর, এখানকার আবহাওয়াও তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই সব কথা চিন্তা করে সম্রাট বিহারে যুদ্ধরত সৈনিকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করে এবং বাংলার সৈনিকদের শতকরা একশ ভাগ করে ভাতা বৃদ্ধির আদেশ দেন। কিন্তু এ সময়ে খাজা শাহ মনসুর এই আদেশ পরিবর্তন করে বিহারে শতকরা বিশ ভাগ করে এবং বাংলায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করে ভাতা দেয়ার আদেশ দেন। সুবাদারের পক্ষে এই আদেশ অনুসারে কাজ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু এখানে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন যে, ইতোপূর্বে পূর্বের নির্ধারিত হারে যা দেয়া হয়েছিল তা কি ফেরত চাওয়া হয়? বেভেরীজ মনে করেন যে, শাহ মনসুর বৎসরের প্রথম থেকে এই নীতি বলবৎ করার আদেশ দেন এবং ফলে সুবাদার বৎসরের

Edited by Ripon Sarkar

প্রথম থেকে যা বেশি দেয়া হয় তা ফেরত দেয়ার আদেশ দেন।[৪৯] কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়। বৎসরের প্রথম থেকে পূর্ব হারে দেয়া ভাতা ফেরত না দিলেও এ নতুন হার প্রবর্তনের ফলে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিত এবং সৈন্যরা বিদ্রোহ করত। কারণ একশ ভাগ থেকে পঞ্চাশ ভাগে ভাতা কমিয়ে দেয়া মানে সর্বসাকুল্য পাওনার এক-চতুর্থাংশ কমিয়ে দেয়া।

৯ম. আকবর কর্তৃক সুলহ-ই-কুল বা সকলের প্রতি শান্তি নীতি (universal toleration) প্রবর্তন। সকলেই জানে যে, আকবর সকল ধর্মের প্রতি উদার ছিলেন, কোন ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। এই নীতির আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি দীন-ই-এলাহী নামে নতুন ধর্মমত প্রচার করেন।

আবুল ফজল বর্ণিত এই নয়টি কারণের মধ্যে আসলে দুটি, অর্থাৎ ৮ম ও ৯ম কারণই গুরুত্বপূর্ণ, বাকিগুলি ইন্ধন যোগায় মাত্র। অষ্টম কারণটি সৈনিকদের জীবিকা এবং নবম কারণটি সৈনিকদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ। এই কারণে আকবরের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের সৈন্যরাই বিদ্রোহ করে, ভিনসেন্ট স্মীথ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে, এই বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের ভিত নেড়ে দেয়। বিদ্রোহী সৈনিকেরা আকবরের ভাই কাবুলে অবস্থানরত মিরযা হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁকে সিংহাসনে বসাবার পরিকল্পনা করে।

সম্রাট আকবর স্বভাবতই উদার ছিলেন এবং বিশেষ করে সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু ছিলেন। রাজপুত রমণী বিয়ে করে এবং হিন্দু কর্মচারীদের সংস্পর্শে এসে তিনি আরও বেশি উদার হয়ে পড়েন। তিনি বিজিত শত্রুদের দাস করার প্রথা রহিত করেন এবং বিজিতদের স্ত্রীপুত্রের উপর অত্যাচার করা নিষিদ্ধ করেন। তিনি পিলগ্রিম ট্যাক্স বা হিন্দুদের মন্দিরে বা মেলায় যাতায়াতের উপর থেকে কর রহিত করেন এবং হিন্দুদের উপর জিজিয়া করও বন্ধ করে দেন। আকবর হিন্দুদের সতীদাহ প্রথাও বন্ধ করেন। হিন্দুদের প্রতি এই উদার মনোভাবকে সুলহ-ই-কুল বলা হয়েছে, যার অর্থ সকলের জন্য শান্তি বা সার্বজনীন শান্তি। রক্ষণশীল আলেমরা এটা পছন্দ করত না, কিন্তু আকবর কারও কথায় কান না দিয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহারের নীতি গ্রহণ করেন। ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে আকবর মুজতাহিদের ভূমিকা গ্রহণ করেন। আবুল ফজলের পিতা শয়খ মুবারকের নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট ওলামা ঘোষণা করে যে আলেমরা ধর্মীয় কোন প্রশ্নে একমত হতে না পারলে সম্রাট সেব সব প্রশ্নে চূড়ান্ত রায় দেবেন। এভাবে সম্রাটকে ইমাম-ই-আদিল বা মুজতাহিদের ভূমিকা দেয়া হয়। এই ঘোষণাপত্র প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষণশীল আলেমরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, তাদের এই ক্ষোভ সৈনিক এবং সেনানায়কদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। সুতরাং আবুল ফজল বর্ণিত ৮ম ও ৯ম কারণই বাংলার মোগল সেনানায়কদের বিদ্রোহের জন্য প্রধানত দায়ী।

বিদ্রোহীদের পদক্ষেপ

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি বিদ্রোহীরা রাজধানী তাঁড়ার নিকটে গংগা নদী পার হয়ে অপর পারে চলে যায়। ২৮শে জানুয়ারি ছিল বকরী ঈদের দিন, ঐদিন তারা ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি করে। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে ছিলেন বাবা খান কাকশাল, জববারী, এবং উজীর জামিল। অন্যান্য যারা তাদের সঙ্গে যোগ দেয় তারা হল সাঈদ

Edited by Ripon Sarkar

তকবাই, হাজী লঙ্গ, আরব বখশী, সালিহ, মীরকী খান, মুরতুজা কুলী এবং ফররুখ ইরগালীক। উড়িষ্যার কিয়া খান, ফতহাবাদের মুরাদ খান এবং সোনারগাঁও-এ শাহ বরদী (নৌ-বাহিনী অধ্যক্ষ) মুখে আনুগত্যের কথা বললেও সুবাদারের কোন সাহায্যে আসল না। মুজফফর খান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান। তিনি মীর জামাল-উদ-দীন হোসেন, রজভী খান, তিমুর খান; রায় পত্র দাস, মীর আদহাম, হোসেন বেগ ইতরাত আলী, হাকিম আবুল ফতহ, খাজা শামস-উদ-দীন, জাফর বেগ, মুহাম্মদ কুলী, কাসিম আলী সিসতান, ইওজ বাহাদুর, জুলফ আলী, এজদী ইয়াকাবেজ, সৈয়দ আবু ইছহাক সফভী, মুজফফর বেগ, হোসেন বেগ গুরদ্‌কে গঙ্গার দিকে পাঠালেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেন। নিজাবত খান সুবাদারের আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কাপুরুষের মত যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে। উজির জামিলও সুবাদারের বাহিনীর সঙ্গে যাত্রা করে, কিন্তু সে দ্বিমুখী নীতি গ্রহণ করে, অর্থাৎ তার আনুগত্যে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। মনে হয় তখনও পর্যন্ত উজীর জামিল সুবাদারের সঙ্গেই ছিল। উভয় পক্ষ রাজমহলের নিকটে গঙ্গা নদীকে মাঝখানে রেখে সামনা সামনি অবস্থান নেয়। বিদ্রোহীরা আশা করছিল যে কেউ সম্রাটের নিকট তাদের অভিযোগ পৌঁছাবে এবং সম্রাট এই অভিযোগগুলি বিবেচনা করবেন। এদিকে সম্রাট বিদ্রোহের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং দুটি আদেশ জারি করে একটি আদেশ সুবাদার মুজফফর খানের নিকট এবং অন্য আদেশ বিদ্রোহীদের নেতা বাবা খানের নিকট পাঠান। সুবাদারকে বলা হয় যে, কাকশালরা (বাবা খান কাকশাল ও তাঁর দল) অনেকদিন থেকে সাম্রাজ্যের অনেক সেবা করেছে, সুতরাং তাদের জাগীর তাদের নিকট ফেরত দেয়া হোক। বাবা খানের নিকট লিখিত আদেশে তাদের অনেক প্রশংসা করা হয়। ফলে উভয় পক্ষ খুশি হয়ে যায়, কিন্তু বিদ্রোহীরা বলে যে, সুবাদার মুজফফর খানকে এই আদেশ মুতাবেক কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে, যাতে তারা নির্ভয়ে তাদের স্ব স্ব দায়িত্বে ফিরে যেতে পারে। সুবাদার মীর আবু ইছহাককে বিদ্রোহীদের মনোভাব জানার জন্য পাঠান। তিনি গিয়ে দেখেন যে বিদ্রোহীরা সত্যিই অনুতপ্ত, তাই পরের দিন রজভী খান, রায় পত্র দাস, আবু ইছহাক, মীর আহমদ মুনসীকে অনুতপ্ত বিদ্রোহীদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য পাঠান হয়। কিন্তু কিছু লোকের দুষ্ট বুদ্ধিতে সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। রায় পত্র দাসের কয়েকজন লোক পরামর্শ করে যে, এই সুযোগে বিদ্রোহীদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে পারলে বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যাবে। তারা এই গোপন কথাটি রজভী খানকে বলে এবং রজভী খানের নিকট থেকে কোন ক্রমে কথাটি ফাঁস হয়ে যায়। বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ আলোচনার স্থান থেকে নানারূপ টাল বাহানা করে বেরিয়ে যায় এবং পুরামাত্রায় গোলযোগ আরম্ভ করে। বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাটের অনুগত বাহিনীর কয়েকজনের কপটতা, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং শঠতাই এর জন্য দায়ী। আবুল ফজল এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে বলেন:[৫০]

> The alert and wakeful of heart will draw from this story the moral that the breaking of promises, cowardice, disobedience, and the failure to recognize the proper place for telling secrets, build a house of evil and heap up the meterials of ruin.

মুজফফর খান অবশ্য রজভী খান এবং আবু ইছহাককে তিরস্কার করেন এবং রজভী খানকে বন্দী করেন। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছলে সভাসদেরা

Edited by Ripon Sarkar

সম্রাটকে বাংলা বিহারে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আকবর ঠিকই বুঝতে পারেন যে, প্রকৃত গোলযোগ পূর্ব ভারতে হলেও বিদ্রোহ দমন করার জন্য তাঁকে রাজধানীতে থাকতে হবে। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহীরা কাবুলে তাঁর (আকবরের) ভাই মিরযা হাকিমের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে।

> It is clear that the audacity of the rebels is being backed up by the ruler of Kabul. It is not unlikely that flatterers may bring that lightheaded, evil-thinking one into India. If the royal standards be transferred to the eastern provinces what will be the condition of the generality of my subjects?[৫১]

সুতরাং মিরযা হাকিমের পদক্ষেপ পর্যালোচনা করে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সম্রাট রাজধানীতেই থেকে গেলেন এবং বিদ্রোহ দমনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন।

বিদ্রোহীরা সরাসরি রাজধানী তাঁড়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা করে। মুহাম্মদ বেগ কাকশাল এবং হামজাবান নামক দুজন সেনাপতি নদী পার হয়ে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হয়। মুজফফর খান খাজা শামস-উদ-দীন, মীর রফি-উদ-দীন, কাসিম আলী সিসতানী এবং হোসেন বেগ গুরদ্‌কে বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার জন্য পাঠান। যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয় এবং সমঝোতা করার আবেদন জানায়। কিন্তু সুবাদারের বাহিনী তাদের কথায় কান দিল না। যদিও তারা জানত যে বিহারেও বিদ্রোহ চলছিল, এবং যদিও বিহারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে বাংলার বিদ্রোহীদের সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনাও ছিল, তবুও সুবাদারের বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতা করার চিন্তা করেনি। অল্পদিনের মধ্যে সত্যি সত্যিই বিহার ও বাংলার বিদ্রোহীরা সংযোগ স্থাপন করে। ইতোমধ্যে সম্রাটের অনুগত বাহিনী বিহারের বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। বিহারের বিদ্রোহীরা এ সময়ে বাংলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে চুক্তিতে উপনীত হয়, এবং কেউ কেউ বিহার থেকে পালিয়ে বাংলায় চলে আসে। বিহার থেকে যারা আসে, তাদের মধ্যে মাসুম খান কাবুলী প্রধান। (এই মাসুম খান কাবুলীর কথা পরে আরও আলোচিত হবে) বিহার ও বাংলার বিদ্রোহীদের সংযোগের কথা বাংলার অনুগত বাহিনী জানতে পারলে মুজফফর খান তুরবতী তেলিয়াগড় দুর্গ রক্ষার জন্য তিমুর খান, খাজা শামস-উদ-দীন, জাফর বেগ এবং অন্যান্য সেনানায়ককে তেলিয়াগড়ে পাঠান, কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছার একদিন আগে বিদ্রোহীরা তেলিয়াগড় দখল করে এবং তেলিয়াগড়কে সুরক্ষিত করে। উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, কিন্তু তিমুর খান এবং আরও অনেকে কাপুরুষের মত যুদ্ধ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে, খাজা শামস-উদ-দীন এবং আরও কেউ কেউ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে আহত হয়। এই সময়ে বাবা খান কাকশাল এবং আরও কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা রাজমহলের নিকটে গঙ্গা নদী পার হয়ে বিহারের বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হয়। মুজফফর খান হোসেন বেগ এবং ইতরত আলী নামক কয়েকজন অফিসারকে গঙ্গার একটি খাড়ির মুখ দখল করে বিদ্রোহীদের পথ রোধ করার আদেশ দেন।[৫২] অনুগত সৈন্যরা ঐ খাড়ি পাহারা দিতে থাকে। এক রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হলে পাহারারত সান্ত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ে, এই সুযোগে বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ করে। অন্যান্য বিদ্রোহী যারা মুজফফর খানের সামনা সামনি অপেক্ষা করছিল তারাও খাড়ির পারে চলে আসে। যুদ্ধে অনুগত বাহিনী জয়লাভ করে এবং উভয় পক্ষ নিজ নিজ অবস্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

Edited by Ripon Sarkar

সুদৃঢ় করে অপেক্ষা করতে থাকে। প্রত্যেক দিন কিছু কিছু সংঘর্ষ হয়, কিছু কিছু লোক ক্ষয় হয়, কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় না। উনিশ দিন উভয় পক্ষ সামনা সামনি অবস্থান করে। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে, সম্রাট নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠাচ্ছেন। বিদ্রোহীরা বুঝতে পারে যে, তাদের আর ঐ অবস্থানে থাকা নিরাপদ নয়, তাই তারা উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের পলায়নের সংবাদে অনুগত বাহিনীতে শিথিলতা দেখা দেয়। বিদ্রোহীরা এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে। কাকশাল এবং অন্যান্য বিদ্রোহীরা ঐ খাড়ি দিয়ে গঙ্গা নদীতে এসে অনুগত বাহিনীর অনেক নৌকা দখল করে নেয়। মাসুম খান কাবুলীও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অনুগত বাহিনী এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। ফলে অনুগত বাহিনীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সেনানায়ক বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেয়। সুবাদার মুজফফর খান তুরবতী এই সংবাদ পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন। অনুগত সেনাপতিরা তাঁকে আবার যুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেও তিনি নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকেন এবং তাঁড়ায় আশ্রয় নেন। বিদ্রোহীরা রাজধানী আক্রমণ করেন এবং মুজফফর খানকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেন। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তারিখে বিদ্রোহীরা সুবাদার মুজফফর খানকে হত্যা করেন এবং তাঁর ধন-সম্পদ লুঠ করেন।[৫৩]

আবুল ফজল অনুগত বাহিনীর পরাজয় এবং মুজফফর খানের নিহত হওয়ার জন্য মুজফফর খানের কাপুরুষতা এবং নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেন। সুবাদারের হাতে তখনও যা সম্পদ বা অনুগত বাহিনী ছিল, তাদের সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলে তিনি শত্রুদের পরাজিত করতে পারতেন। আবুল ফজল বলেন:[৫৪]

> Muzaffar K. lost the thread of counsel and became foolish from suspiciousness and want of heart. He had neither the guidance of reason, nor the power of listening to advice. Though right-thinking and experienced men represented saying: what loss have you sustained from the departure of that handful of short-sighted men, and what good will the enemy get from this success? The proper thing is not to give way to discouragement, and for the army to fight according to proper methods. Their sound advice was of no use, and his perturbation increased.
>
> Owing to his wrong ideas, the slipping away of his reason and misplaced fancies, irrecognition of enemies and love of life, his actions became disordered. He neither would himself arrange the troops nor would give permission to engage to the officers who were everywhere ready for service, when the heart of the commander does not remain steady, what firmness can there be among the commanded?

বাংলায় বিদ্রোহীদের সরকার গঠন

সুবাদারকে হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বিদ্রোহীরা সরকার গঠন করে। তারা আকবরের ভাই এবং কাবুলের শাসনকর্তা মির্যা হাকিমকে সম্রাট নির্বাচিত করে এবং তাঁর নামে খুতবা পাঠ শুরু করে। পূর্ববর্তী সুবাদার খান জাহানের পরিত্যক্ত তাঁবু

Edited by Ripon Sarkar

বিভিন্নভাবে সজ্জিত করা হয় এবং সেখানে দরবার বসে এবং নজরানা পাওয়ার ও উপাধি, নিযুক্তি, খেলাত ইত্যাদি দেয়ার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে জাগীরও বিতরণ করা হয়। এ বিষয়ে বিদ্রোহীদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হলেও তা তারা সমঝোতার মাধ্যমে মীমাংসা করে নেয়। উপাধি, খেলাত, জাগীর ইত্যাদি এমনভাবে বিলি করা হয় যাতে প্রত্যেকেই (প্রত্যেক সেনানায়ক) কিছু কিছু পায়। ফলে অনৈক্য বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মাসুম খান কাবুলীকে মিরযা হাকিমের উকিল বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়; তাঁর উপাধি হয় খান দৌরান। বাংলা সরকারের নেতা (সুবাদার) হয় বাবা খান কাকশাল তাঁর উপাধি হয় খান খানান। জব্বারীকে খান জাহান উপাধি এবং দশ হাজার মনসব দেয়া হয়। উজীর জামিলকে খান জামান উপাধি দিয়ে তুজক বেগী নিযুক্ত করা হয়। খালদিনের উপাধি হয় আযীম খান এবং জান মুহাম্মদ বাসুদীর উপাধি হয় খান আলম। তাছাড়া আবদুল খোদাওন্দ খান, মুহাম্মদ বেগ বাহাদুর খান; খাজা শামস-উদ-দীন লস্কর খান এবং জাফর বেগ আসদ খান উপাধি লাভ করেন। আরবকে তাঁর অনুপস্থিতিতে শুজাত খান এবং সাইদ খান তকবাইকে দেড় হাজার মনসব সহ খান উপাধি দেয়া হয়। প্রত্যেককে জাগীর, পতাকা এবং বাদ্য দেয়া হয়। মুহাম্মদ হাজী লঙ্গ; ফররুখ ইরগালিক, ফরীদুন, তইমুর তাশ, আযীয দাস্তাম বেগ, মুহাম্মদ তকবাই, মুহাম্মদ কুলী, হামজা বেগ, আবদুল্লাহ বেগ বদখশী, আলী কাসিম বারলাস, মকসুদ আলী কোর, ইওজ বাহাদুর, মিরযা আরব, দোস্ত মুহাম্মদ তুলকচী, মুরাদ কাকশাল, তাশ বেগ, জুলফ আলী লঙ্গ, খোদা বর্দী, গজনফর বেগ প্রত্যেককে এক হাজার মনসব, খান উপাধি এবং পতাকা দেয়া হয়। মীর কালান, ওয়াফা বেগ, মুহাম্মদ কীচক, ইয়ারবেগ মুহাম্মদ, শেরম বাহাদুর, লতীফ হোসেন, ইলান চক, বাবা দোস্ত মুহাম্মদ, মিহির আলী, মুহাম্মদ বেগ এবং কুরবান বেগকে পাঁচশ মনসব, পতাকা এবং খান উপাধি দেয়া হয়। এভাবে বিদ্রোহীরা সকলেই আমীর হয়ে বসে।

বিদ্রোহীরা এভাবে যখন আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত তখন সংবাদ পাওয়া গেল যে, সম্রাট তাদের দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন। ফলে মাসুম খান কাবুলী এবং বাবা খান কাকশালের নেতৃত্বে তারা আবার অস্ত্র ধারণ করে। বাংলার মোগল অধিকৃত এলাকা দুই বৎসর ধরে বিদ্রোহীদের হাতে থাকে। এদিকে ফতহাবাদের ফৌজদার মুরাদ খান পরলোক গমন করেন, ভূষণার জমিদার মুকুন্দ তাঁর ছেলেদের হত্যা করেন। হুগলীর ফৌজদার নিজাত খানকে উড়িষ্যার আফগান নেতা কতলু খান তাড়িয়ে দেন। সুতরাং যেটুকুই বা অনুগত সৈন্যদের হাতে ছিল, তাও হাত ছাড়া হয়ে যায়।

আকবর কর্তৃক হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারঃ

প্রথমে বিহারের বিদ্রোহীদের দমন করা হয়। সাইদ বদখশীর ছেলে বাহাদুর বদখশী ত্রিহুত অধিকার করে বাহাদুর শাহ উপাধি নেয়। ঐদিকে রোটাস দুর্গের শাসনকর্তা সম্রাটের অনুগত মুহিব আলী খান আরব বাহাদুরকে পরাজিত করে পাটনা দুর্গ বিদ্রোহীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। আকবর নতুন সৈন্যবাহিনী পাঠান এবং তোডর মল্ল ও তরসুন খানকে নেতৃত্ব দেন। এই দুজন সেনাপতি অত্যন্ত সতর্কতার

Edited by Ripon Sarkar

সঙ্গে অগ্রসর হন এবং ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে মুঙ্গেরে পৌছে যান। বাংলার বিদ্রোহীরা তেলিয়াগড় অতিক্রম করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। তোডর মল্ল তখন মুঙ্গেরে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করে অপেক্ষা করতে থাকেন। ৭ই জুনের মধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁর শিবির আক্রমণ করে কিন্তু অনুগত সৈন্যরা বিদ্রোহীদের তিনশ নৌকা হস্তগত করে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এর পরে তারা বিদ্রোহীদের গোলা বারুদ এবং রসদবাহী যানগুলি অধিকার বা নষ্ট করতে থাকে। ২৬শে জুলাইয়ের (১৫৮০) মধ্যে আকবর কর্তৃক প্রেরিত নতুন সৈন্যবাহিনী এসে পৌছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। পাটনা এবং মুঙ্গের তোডর মল্লের দখলে আসে। বর্ষা মৌসুম এসে পড়ায় তোডর মল্ল অগ্রযাত্রা বন্ধ করে সেখানেই অবস্থান নেন।

এদিকে দক্ষিণ বিহারে একদল অনুগত সৈন্য মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে গমন করে এবং বিহার শহর, গয়া এবং শের ঘাঁটি দখল করে নেয়। এ সময়েই মাসুম খান কাবুলী বাংলায় পলায়ন করে এবং স্মরণ থাকতে পারে মুজফফর খান তুরবতীর হত্যার সময় তিনি তাঁড়ায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী সরকারে মিরযা হাকিমের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন।

১৫৮১ খ্রিস্টাব্দেও বিদ্রোহীরা তৎপর ছিল, কিন্তু বলতে গেলে ঐ বৎসরেই যুদ্ধের মোড় সম্রাটের অনুকূলে চলে যায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতা মৃত্যুবরণ করে। মাসুম খান কাবুলী শরফ-উদ-দীন হোসেনকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করে। মুঙ্গেরের নিকটে বাংলার বিদ্রোহী নেতা বাহাদুর খেশগী সাদিক খানের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়; বাবা খান কাকশাল ক্যানসারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; বিদ্রোহীদের আর এক নেতা মাসুম খান ফরান খুদীকে শাহবাজ খান চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ১৫৮১ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে আকবর কাবুল অধিকার করেন; মিরযা হাকিম পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করেন। বিদ্রোহীদের নির্বাচিত অনুপস্থিত সম্রাটের এহেন পরিণতিতে বিদ্রোহীদের মনও ভেঙ্গে যায়।[৫৫]

সুবাদার খান আযম

বিদ্রোহের অবস্থা যখন এই পর্যায়ে তখন ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে আকবর খান আযমকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তাঁর আসল নাম মিরযা আযীয কোকা, খান আযম উপাধি। পিতার নাম শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ আতকা খান এবং মাতার নাম জিজি আনগা। আনগা অর্থ ধাত্রী মাতা, জিজি আনগা ছিলেন আকবরের ধাত্রী মাতা এবং মিরযা আযীয ছিলেন আকবরের ধাত্রী ভাই। কোকা শব্দের অর্থও ধাত্রী ভাই। মিরযা আযীয কোকা সারা জীবন আকবরের প্রতি অনুগত ছিলেন, মাঝে মাঝে আকবর তাঁর প্রতি বিরক্ত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করেননি। যে তাঁর ও আযীয কোকার মধ্যে এক দুধের নদী বহমান, তিনি (আকবর) এই নদী অতিক্রম করতে পারেন না।

মিরযা আযীয কোকা বিভিন্ন সময়ে উচ্চপদে কাজ করেন এবং বেশ কিছু দিন সুবাদারের দায়িত্বও পালন করেন। আকবরের দাগ প্রথায় (branding of horses) মিরযা আযীয বিরক্ত হন এবং অবাধ্যতার পরিচয় দেন। আকবর তাঁর মনসব প্রত্যাহার করে তাঁকে শাস্তি দেন।[৫৬] কিন্তু আকবর শীঘ্রই তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং মুজফফর খান তুরবতী নিহত হওয়ার পরে তাঁকে পাঁচ হাজারি মনসব দিয়ে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান।[৫৭]

Edited by Ripon Sarkar

আগেই বলা হয়েছে যে, খান আযমের আগমনের পূর্বেই বিদ্রোহীরা কয়েকটি সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় তবে তারা সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়নি। এলাহাবাদ, অযোধ্যা এবং বিহারের জাগীরদারেরা হাজিপুরে সমবেত হয়। খান আযম এই বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে তেলিয়াগড়ের দিকে অগ্রসর হন। অনুগত বাহিনী প্রথমে মুঙ্গেরে একত্রিত হয় এবং পরে খলগাঁও এর নিকটে পৌঁছে যায়। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের কয়েকজন নেতা, যেমন শরফ-উদ-দীন হোসেন এবং বাবা খান কাকশাল মৃত্যুবরণ করে। এখন মাসুম খান কাবুলীই বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। অন্যদিকে উড়িষ্যায় কতলু খান লোহানী বিদ্রোহ করে এবং বাংলার কিছু অংশও দখল করে নেয়। মাসুম খান কাবুলী কতলু খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং অনুরোধ করেন যে অনুগত বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে কতলু খান যেন তাঁর সাহায্যে সৈন্য পাঠান। কতলু খানের অনুকূল সাড়া পাওয়ায় মাসুম খান তাড়াতাড়ি ঘোড়াঘাটে যান এবং সেখানে জব্বারী, মিরযা বেগ এবং অন্যান্য কাকশালদের সঙ্গে মিত্রতা করেন এবং সেখানে তাঁর পরিবার পরিজন রেখে আসেন। অতঃপর তিনি বিদ্রোহীদের নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ইতোমধ্যে খান আযম তেলিয়াগড় এসে পৌঁছেন। তাঁর সৈন্যরা কালিগঙ্গার (বা কাটিগঙ্গা) তীরে সমবেত হয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা সংখ্যায় অনেক বেশি থাকায় তারা আক্রমণ করতে ভয় পায়। প্রতিদিন বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু সংঘর্ষ চলতে থাকে। সম্রাটের নিকট আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ জানিয়ে সংবাদ পাঠান হয় এবং সম্রাটও তাড়াতাড়ি বিপুল সংখ্যক অফিসারকে সৈন্যসহ পূর্ব সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। প্রায় একমাস ধরে উভয় বাহিনী সামনা সামনি থাকার পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। বিদ্রোহীদের কাযীজাদা নামক একজন নেতা ফরিদপুর থেকে অনেক নৌকা নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু ২৪শে এপ্রিল (১৫৮২ খ্রিঃ) হঠাৎ করে একটি কামানের গোলায় তিনি নিহত হন। মাসুম খান তাঁর স্থলে কালাপাহাড়কে পাঠান, কালাপাহাড় নৌ-যুদ্ধে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, কিন্তু কালাপাহাড়ও নিহত হন। এই সময়ে মাসুম খান কাবুলী ও কাকশাল এবং খালদিন-এর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়; কাকশালরা, এমনকি তাদের নেতা জব্বারীও অনুগতদের সঙ্গে গোপনে সংযোগ স্থাপন করে এবং খান আযমের আনুগত্য স্বীকার করে। এই সংবাদ পেয়ে মাসুম খান কাবুলী তাড়াতাড়ি ঘোড়াঘাটের দিকে যাত্রা করে। তার উদ্দেশ্য ছিল ঘোড়াঘাটে অবস্থানকারী তার পরিবার পরিজনকে উদ্ধার করা এবং কাকশালদের সমুচিত শাস্তি দেয়া। কাকশালদেরই একজন মুহাম্মদ কাকশালের সঙ্গে মাসুম খানের হৃদ্যতা ছিল। এই কাকশাল মাসুম খানের পরিবার পরিজনকে সময়মত নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে মাসুম খান ঘোড়াঘাট আক্রমণ করলে কাকশালরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কিন্তু খান আযম তরসুন খানের নেতৃত্বে মুহিব আলী খান, ইবরাহীম ফতেহপুরী, বাবুই মনকলি প্রমুখ সেনানায়কসহ প্রায় চার হাজার সৈন্য মাসুম খানের বিরুদ্ধে পাঠান। মাসুম খান পরাজিত হয় এবং খালদিন, উজীর জামিল ইত্যাদি তাদের পূর্ব প্রতিজ্ঞা মত সুবাদারের শিবিরে চলে আসে এবং অনুগতদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মাসুম খান কাবুলীকে শাস্তি দিতে সংকল্পবদ্ধ হয়।[৫৮]

আগেই বলা হয়েছে যে, মাসুম খান কাবুলী ছিলেন মোগল সেনাপতি, তিনি অন্যান্য মোগল সেনাপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বিদ্রোহী সরকার গঠন করেন। তাঁর পূর্ব মিত্ররা সবাই দল ত্যাগ করলে মাসুম খান

Edited by Ripon Sarkar

ভূঁএরা প্রধান ঈসা খানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন এবং বার-ভূঁএরার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন এবং আজীবন মোগল শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যান। এমনকি তিনি নিজেকে সুলতান রূপে ঘোষণা করে শিলালিপি জারি করেন।[৫৯] মাসুম খানের পরবর্তী ইতিহাস বার-ভূঁএরার তৎপরতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় যে, সুবাদার খান আযম বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে বেশ সাফল্য লাভ করেন। কিন্তু এখন তিনি সম্রাটের নিকট বদলীর আবেদন করেন এবং সম্রাট তাঁর আবেদন গ্রহণ করেন। আবুল ফজল বলেনঃ[৬০]

> As the Khan Azim disliked the climate of the country, he begged for employment elsewhere. The gracious sovereign accepted his earnest request and issued orders that if some officer could undertake the control of the army and the administration of the country for some time, he might make over charge to him, and come to Bihar, and repose in his fief. Otherwise he should wait a little, and Shahbaz Khan would be sent.

মনে হয় খান আযম আসলে বাংলায় থাকতে সাহস করেননি। তাঁর পূর্ববর্তী তিনজন সুবাদারের কেউ বাংলা থেকে ফিরে যেতে পারেননি। দুজন (মুনিম খান এবং খান জাহান) স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন এবং একজন (মুজফফর খান তুরবতী) বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। সুতরাং বিদ্রোহ দমনে কিছুটা সাফল্য লাভ করেই তিনি বাংলা ত্যাগ করেন।

সুবাদার শাহবাজ খান কানবো

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মে তারিখে আকবর শাহবাজ খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির আদেশ দেন। খান আযম তৎক্ষণাৎ বাংলার সীমান্ত ছেড়ে (তিনি রাজধানী তাঁড়ায় আদৌ এসেছিলেন কিনা তার প্রমাণ নেই, তিনি তেলিয়াগড় পর্যন্ত এসেছিলেন মনে হয়) বিহারের হাজিপুরে চলে যান। যাওয়ার সময় তিনি উজির খান নামক একজন সেনাপতির হাতে দায়িত্ব অর্পণ করেন। উজীর খান প্রায় পাঁচ মাস দায়িত্বে ছিলেন।

শাহবাজ খান কানবো গোত্রের লোক ছিলেন। একটি বহুল প্রচলিত ফার্সী কবিতায় তিন প্রকার লোককে বজ্জাত(বদ-জাত বা খারাপ বংশ) লোক বলা হয়, ১ম, আফগান, ২য়, কানবো এবং ৩য়, কাশমীরী।[৬১] ব্লখম্যান মনে করেন যে, এই কবিতাটি আধুনিক এবং আসলে কানবো গোত্রের লোকেরা সদ্বংশজাত। তিনি বলেন যে, শাহবাজ খানের ষষ্ঠ পূর্বপুরুষ হাজী ইসমাইল মুলতানের শয়খ বাহা-উদ-দীন যকরিয়ার শিষ্য ছিলেন। একদিন একজন ভিখারী এসে শয়খ বাহা-উদ-দীনকে বলেন যে, তিনি (ভিখারী) যতজন নবীর নাম করবেন, শয়খকে ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা দিতে হবে। শয়খ এর নিকট স্বর্ণমুদ্রা না থাকায় তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন। হাজী ইসমাইল ভিখারীকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান এবং ভিখারী দশ কি বিশজন নবীর নাম করায় তাঁকে ততগুলি স্বর্ণমুদ্রা দেন। অন্য একদিন হাজী ইসমাইল এসে বলে যে তাঁর (হাজী

Edited by Ripon Sarkar

ইসমাইলের) বোধশক্তি কম, শয়খ তাঁকে দোয়া করেন। এর পর থেকে ভারত উপমহাদেশে কানবোরা বোধশক্তি, বিচক্ষণতা এবং বিজ্ঞতার জন্য প্রসিদ্ধ।

শাহবাজ খান তাঁর পূর্ব-পুরুষদের মত কৃচ্ছ্র সাধনা করতেন। তিনি প্রথমে সামান্য কোতোয়ালের চাকরি লাভ করেন, কিন্তু তাঁর সৎ জীবন যাপন আকবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকেন। প্রথমে তাঁকে মীর তুজুক (quarter-master) নিযুক্ত করা হয়, এবং সম্রাটের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে তিনি মীর বখশীর পদ লাভ করেন। এর পর তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে সেনাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত থাকেন এবং রাজত্বের ২৮শ বর্ষে খান আযমের স্থলে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইতোপূর্বেও বিহারে এবং মুনিম খানের সময়ে বাংলায় শাহবাজ খান সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় দেন। সুতরাং শাহবাজ খানকে বাংলায় নিযুক্ত করে সম্রাট একজন যোগ্য সেনাপতিকেই দায়িত্ব দেন। পরে দেখা যাবে যে, শাহবাজ খান বাংলায় কিছুটা দক্ষতার পরিচয় দেন।

শাহবাজ খান একজন ধার্মিক লোক ছিলেন, তিনি সুন্নী ছিলেন এবং আকবরের ধর্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দিনের পাঁচবার নামায কোন মতেই বাদ দিতেন না এবং তাঁকে প্রায়ই তসবীহ হাতে দেখা যেত। একবার আকবর ফতেহপুরের দীঘির পাড়ে পায়চারি করার সময় ঘটনাচক্রে শাহবাজ খান সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আকবর তাঁর হাত ধরে হাঁটতে থাকেন। ইতোমধ্যে আছরের নামাযের (বিকালের নামায) সময় হলে শাহবাজ খান অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। শাহবাজ খান কোনক্রমে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের চাদর বিছিয়ে নামায শুরু করে দেন। আকবর ডাকাডাকি করাতেও তিনি নামায ছেড়ে দিলেন না। শেষে আবুল ফজল এসে শাহবাজ খানের পক্ষে সম্রাটের নিকট সুপারিশ করেন। আবুল ফজল আকবরের একজন গুণগ্রাহী হলেও শাহবাজ খানের ধর্মানুরাগের প্রশংসা করতেন।

শাহবাজ খানের অন্তিম ইচ্ছা ছিল আজমীরে শয়খ মুঈন-উদ-দীন চিশতীর মাযারের ভিতরেই যেন তাঁকে দাফন করা হয়। কিন্তু খাদিমের আপত্তিতে তাঁকে মাযারের বাহিরে দাফন করা হয়। কথিত আছে যে, খাদিমরা স্বপ্নে দেখে যে শাহবাজ খানকে যে, মাযারের ভিতরে নিয়ে আসা হয়, অতঃপর শাহবাজ খানকে মাযারের ভিতরে এনে পুনরায় দাফন করা হয়।[৮২]

শাহবাজ খানের নিযুক্তি এবং বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব গ্রহণের মধ্যে প্রায় পাঁচ মাস কেটে যায়। এই পাঁচ মাস উজীর খান সুবাদারের পক্ষে দায়িত্ব পালন করেন। খান আযমের সময়েই বিদ্রোহীরা হতবল হয়ে পড়ে। কাকশালদের কেউ কেউ অনুগত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। আগেই বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের মধ্যে মাসুম খান কাবুলী প্রথমে ঘোড়াঘাট দখল করতে যায় কিন্তু সেখানে পরাজিত হয়ে বার-ভূঁঞাদের সঙ্গে মিলিত হয়। অপরদিকে কতলু খান লোহানী উড়িষ্যায় বিদ্রোহ করে। সুতরাং উজীর খান দুই দিকে দুই দল শক্তিশালী বাহিনী পাঠান, একদল মাসুম খান কাবুলী এবং অন্যদল কতলু লোহানীর বিরুদ্ধে। মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনী তরসুন খানের নেতৃত্বে তাজপুরে[৮৩] শিবির স্থাপন করে। মাসুম খান কাবুলী ভাটি থেকে এসে [illegible] বেগ কাকশালের নেতৃত্বে গঠিত অনুগত বাহিনীকে আক্রমণ করে; [illegible] বেগ কাকশাল পালিয়ে তাজপুরে গিয়ে তরসুন খানের সঙ্গে মিলিত হয়।

Eidited by Ripon Sarkar

তরসুন খান নিজেও ভয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় নিয়ে ফটক বন্ধ করে দেয়। এই সুযোগে মাসুম খান টাঁড়া বা তান্ডার সাত ক্রোশ দূরে পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা লুঠ করে। চারদিকে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই সংবাদ পেয়ে শাহবাজ খান অকুস্থলের দিকে যাত্রা করেন। তিনি পাটনা থেকে যাত্রা করেন, একদল সৈন্যকে নৌকাসহ পাঠান এবং তিনি নিজে স্থল পথে যাত্রা করেন। তিনি টাঁড়ায় এসে দেখেন যে, মাসুম খান পশ্চাদপসরণ করেছে এবং যমুনার[৬৪] নিকটে অবস্থান নিয়েছে। শাহবাজ খান উড়িষ্যায় অবস্থানরত সেনানায়কদের লিখেন যে যেহেতু কতলু লোহানী এখন অনুগত এবং মোগল বাহিনীর সঙ্গে এখন যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম, সেহেতু কিছু সংখ্যক সেনানায়ক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যেন তাঁর কাছে পাঠান হয়। ফলে উজীর খান কিছু সেনানায়ককে তাঁর কাছে রেখে দেন এবং শাহকুলী খান মাহরম, সাদিক খান, মুহিব আলী খান প্রমুখ কয়েকজন সেনানায়ককে শাহবাজ খানের নিকট পাঠিয়ে দেন। শাহবাজ খান গঙ্গা নদী পার হয়ে বিদ্রোহীদের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে মোগল নৌ-অধ্যক্ষ শাহবরদীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর অধীনস্থ তিন হাজার গোলন্দাজ বাহিনী ভাটি থেকে এসে শাহবাজ খানের সঙ্গে যোগ দেয়। তরসুন খান এবং মুহাম্মদ বেগ কাকশালও তাঁর সঙ্গে যোগদান করে। সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাবায় তাকারীর অধীনে একদল শত্রু সৈন্য সন্তোষ[৬৫] আক্রমণ করেছে এবং তরসুন খানের সৈন্যরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। শাহবাজ খান প্রথমে মুহিব আলী খান, কাসিম খান, তৈমুর বদখশী এবং সেলিম খানের অধীনে একদল সৈন্য ঘটনাস্থলে পাঠান এবং পরে নিজেই যাত্রা করেন। এই সংবাদ পেয়ে শত্রুবাহিনী পালিয়ে যায় এবং মোগল বাহিনী ১৮ ক্রোশ পর্যন্ত দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে যমুনার তীরে পৌঁছে এবং মাসুম খান কাবুলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। মাসুম খান নদীর অপর তীরে শত্রুর সম্মুখীন হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়।

শাহবাজ খান শত্রুর সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করেন। তিনি মাসুম কাবুলীর নিকট চিঠি পাঠান। চিঠিতে মাসুম খানের প্রথম দিকে অনুগত থাকার কথা এবং তাঁর প্রতি সম্রাটের অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা বিবৃত করে সম্রাটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার ঔচিত্যের কথা বলা হয় এবং আরও অনেক উপদেশ দেন। একই দিনে তিনখানি চিঠি পাঠান হয় এবং প্রত্যেকবারই মাসুম খান অনুকূল সাড়া দেন। পরের দিন উভয় পক্ষের সমঝোতা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়, মাসুম খান (নদীর) দুই-তৃতীয়াংশ অতিক্রম করে আসে[৬৬] এবং তীর থেকে একটি বর্শা নিক্ষেপের দূরত্বে আসে। বৈঠকে মাসুম খান আনুগত্য স্বীকার করার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটি চুক্তিও সম্পাদিত হয়। স্থির হয় যে, পরের দিন মাসুম খান অতীতে ব্যবহারের (বিদ্রোহের) জন্য ক্ষমা চাইবে। চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে উভয় পক্ষ ভোজে মিলিত হয় কিন্তু নিজ শিবিরে ফিরে গিয়ে মাসুম খান কাবুলী মত পরিবর্তন করে। আবুল ফজল বলেন যে, কেউ গোপন চিঠি দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেয় এবং মাসুম খান কমানপুরীর হত্যার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৬৭] ফলে মাসুম খান কাবুলী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে শাহবাজ খানের নিকট তাঁর আনুগত্য স্বীকারে অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেয়। শাহবাজ খান অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হন এবং যুদ্ধের আদেশ দেন। ১৫ই নভেম্বর ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের এই যুদ্ধে মাসুম খান কাবুলী পরাজিত হয়ে ভাটির দিকে পলায়ন করেন, জব্বারী[৬৮] এবং তার কতিপয় সংগী কোচবিহারে পলায়ন করে, ঘোড়াঘাট শত্রুমুক্ত হয়ে শাহবাজ খানের

Edited by Ripon Sarkar

দখলে আসে। শাহবাজ খান তাড়াতাড়ি শেরপুরে যান, সেখানেও বিদ্রোহীদের ঘাঁটি ছিল। শেরপুর[৬৯] অধিকৃত হয় এবং ১৫০ বিদ্রোহী বন্দী হয়।

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যমুনা নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত এলাকা মোগলদের দখলে আসে। এই সময়ে বার-ভুঁঞার সঙ্গে মোগলদের তেমন কোন বড় যুদ্ধ হয়নি, বরং যুদ্ধ মোগল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি ঘোড়াঘাট এবং শেরপুর শাহবাজ খানের অধিকারে যাওয়ায় বিদ্রোহীদের ক্ষমতা প্রায় খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু মাসুম কাবুলী তখনও আনুগত্যের কথা চিন্তা না করে ভাটির বার-ভুঁঞাদের সঙ্গে মিলিত হয়। তাই শাহবাজ খান এখন বার-ভুঁঞাদের কেন্দ্র ভাটি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খান ভাটির উদ্দেশে যাত্রা করেন। আকবরনামায় এই যুদ্ধের বিবরণ নিম্নরূপঃ

শাহবাজ খান গঙ্গার তীরবর্তী খিজিরপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থানে (খিজিরপুরে) নদীর দুই তীরে দুটি দুর্গ আছে, কারণ এ পথেই সৈন্যবাহিনী চলাচলের প্রধান রাস্তা রূপে ব্যবহৃত হয়। মোগল বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ করে এই দুর্গ দুটি অধিকার করে, সোনারগাঁও এবং কতরাব অধিকৃত হয়। এখান থেকে একটি বাহিনী এগার সিন্দুরে পাঠান হয়, এই শহরটিও অনেক বড় এবং এটাও লুট করা হয়। সেখান থেকে ঐ বাহিনী ব্রহ্মপুত্রে আসে, ঐ নদী আসাম থেকে নির্গত হয়। এখানে মাসুম কাবুলীর সঙ্গে যুদ্ধ হয়, মাসুম পরাজিত হন, তিনি প্রায় ধরা পড়ছিলেন, এমন সময় পালিয়ে একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন। এ সময় ঈসা খান কোচবিহারে ছিলেন, তিনি সেখান থেকে বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিরে আসেন। মোগল বাহিনী নদীর তীরে এগারসিন্দুরের ঠিক বিপরীতে টোকে অবস্থান নেয় এবং একটি দুর্গ নির্মাণ করে। উভয় বাহিনীর মধ্যে প্রায়ই স্থল ও নৌ-যুদ্ধ চলতে থাকে এবং মোগল বাহিনী অনবরত যুদ্ধ জয় করতে থাকে। শাহবাজ খান তরসুন খানের নেতৃত্বে এক বাহিনী বাজিতপুরে যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং ঐ বাহিনীকে যুদ্ধের মহড়া দেয়ার আদেশ দেন যেন শত্রুদের লক্ষ্য সেদিকে যায় এবং শত্রুরা সামনে পিছনে উভয় দিকে শত্রু দেখে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ভাওয়াল থেকে দুটি রাস্তায় বাজিতপুর যাওয়া যেত, প্রথম রাস্তাটি শত্রুদের ঘাঁটি থেকে অনেক দূরে ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় রাস্তাটি নদীর তীর দিয়ে হওয়ায় শত্রুদের বেশ নিকটে ছিল। তরসুন খান দ্বিতীয় রাস্তা দিয়ে যাত্রা করেন। মাসুম খান কাবুলী সংবাদ পেয়ে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ তরসুন খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহবাজ খান মাসুম খানের গতিবিধির খবর পেয়ে মুহিব আলী খান, রাজা গোপাল, খানগার এবং অন্যান্য সেনানায়ককে তরসুন খানের সাহায্যার্থে পাঠান। তিনি তরসুন খানকে সতর্ক করে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়ে দেন। তরসুন খান এই সংবাদ বিশ্বাস করলেন না, তিনি বরং মনে করলেন যে, শাহবাজ খানকে বেকায়দায় ফেলার জন্য মাসুম খান তরসুন খানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে শাহবাজ খানের নিকট থেকে আরও কিছু সৈন্য অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছেন। তাই তরসুন খান সতর্ক সংকেত পাওয়া সত্ত্বেও সতর্ক হলেন না। শত্রুবাহিনী সহসা তাঁকে আক্রমণ করে, তিনি নিকটবর্তী কোন দুর্গে আশ্রয় নিয়ে শাহবাজ খান কর্তৃক পাঠানো সৈন্যবাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই

Edited by Ripon Sarkar

বিপদের সম্মুখীন হয়ে তরসুন খানের নিজের সৈন্যরাও যুদ্ধে অংশ না নিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈন্য নিয়ে তরসুন খান যুদ্ধ করে আহত ও বন্দী হন এবং বন্দী অবস্থায় মাসুম খান কাবুলী তাঁকে হত্যা করেন।

এদিকে শাহবাজ খান বনার (আকবরনামায় পনার নদী) নদীর তীরে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন। ঈসা খানের নিকট প্রস্তাব দেয়া হয় যে, হয় তিনি (ঈসা খান) মোগল বিদ্রোহীদের সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেবেন, না হয় তাদের (বিদ্রোহীদের) তাঁর (ঈসা খানের) দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবেন। ঈসা খান তালবাহানা করতে থাকেন এবং কোন কোন সময় মোগলদের প্রশংসা করেন। কিন্তু যখন বুঝা গেল যে, তাঁর (ঈসা খানের) জিহ্বা এবং অন্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, (কথায় ও কাজে মিল নেই) তখন যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠে। সাত মাস ধরে সংঘর্ষ চলতে থাকে কিন্তু জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় না। ঐ সময় শাহবাজ খানের মেজাজ রুক্ষ হয় এবং তিনি তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের প্রতিও দুর্ব্যবহার করতে থাকেন। শত্রুদের তৎপরতাও বেড়ে যায়। শত্রুরা বর্ষা মৌসুমের বন্যার জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু সেই বৎসর বর্ষা কম হওয়ায় তাদের সেই আশা পূরণ হল না। কিন্তু শত্রুরা অন্যভাবে পরিস্থিতির মুকাবিলা করে, যার জন্য শাহবাজ খান মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। বার-ভূঁঞারা পনর স্থানে ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কেটে দিলে সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়, শাহবাজ খানের শিবির ডুবে যায়। তখন ভূঁঞারা বিরাট বিরাট পালওয়ার নৌকাগুলি শাহবাজ খানের দুর্গের অতি নিকটে নিয়ে আসে এবং গোলা বর্ষণ করতে থাকে। সৌভাগ্যবশত হঠাৎ মোগল বাহিনীর গুলীতে ভূঁঞাদের একজন নেতা আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং ভূঁঞাদের সৈন্যরা পলায়ন করে। আরও সৌভাগ্যবশত নদীর পানিও কমতে শুরু করে। কিন্তু ঢাকার মোগল থানাদার সৈয়দ হোসেন ভূঁঞাদের বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। ঈসা খান সৈয়দ হোসেনের মারফত শাহবাজ খানের নিকট শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন এবং শাহবাজ খানও তা গ্রহণ করেন। চুক্তির শর্তগুলি হচ্ছে, (১) সোনারগাঁও বন্দরে একজন মোগল দারোগা নিযুক্ত হবে, (২) মাসুম খান কাবুলীকে মক্কায় পাঠান হবে এবং (৩) মোগল সৈন্যরা ভাটি এলাকা ত্যাগ করে যাবে। চুক্তির শর্ত উভয় পক্ষে গ্রহণযোগ্য হওয়ায় শাহবাজ খান ফিরে যাচ্ছিলেন, তিনি যখন ভাওয়ালে পৌঁছেন তখন সংবাদ পান যে, ঈসা খান ইতস্তত করছেন এবং আরও শর্ত যোগ করছেন। শাহবাজ খান রাগ করে বলেন, বারবার চুক্তির শর্ত বদলালে কোন চুক্তিই করা যায় না। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ঈসা খানও প্রস্তুত। তাই ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ইতোমধ্যে মোগল সেনানায়কেরা শাহবাজ খানের প্রতি বিরূপ হয়ে যায়। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে, শাহবাজ খান রুক্ষ মেজাজে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন। সুতরাং মোগল সেনানায়কেরা যুদ্ধ না করে শাহবাজ খানের পরাজয় কামনা করে। মুহিব আলী খান প্রথমেই যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শাহকুলী খান মাহরম কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে আহত হয়ে ভাওয়াল থেকে পলায়ন করে। অবশেষে শাহবাজ খান তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সৈন্য এবং সেনানায়কদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে থাকেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। শাহবাজ খান তখন রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যা জয় করেছিলেন সব তাঁর হাতছাড়া হয়ে

Edited by Ripon Sarkar

যায়। অনেক মোগল সৈন্য ক্ষয় হয়। ফিরবার পথে তিনি শেরপুর মুর্চায় (বগুড়া) আবার প্রস্তুতি নিয়ে ভাটি আক্রমণ করার সংকল্প প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর বাহিনীতে কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি অবশেষে তাঁড়ায় ফিরে যান।

অতএব ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানের ভাটি আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তিনি মাসুম খান কাবুলী বা ঈসা খান মসনদ-ই-আলা কাউকে পরাজিত করতে পারেননি। তবে এই বৎসরের যুদ্ধ পরিচালিত হয় সম্পূর্ণভাবে ভাটি অঞ্চলে বার-ভূঁঞাদের কেন্দ্রস্থলে। আকবরনামায় যুদ্ধের গতি, সৈন্য পরিচালনা ইত্যাদি যেভাবে দেয়া হয়েছে, তাতে যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। তবে আকবরনামায় ব্যবহৃত স্থানের নাম এবং তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের সঠিক পরিচিতি দেয়া দরকার।

শাহবাজ খান ভাটি আক্রমণের জন্য কোন স্থান থেকে যাত্রা করেন তার উল্লেখ আকবরনামায় নেই। তবে বলা যায় যে, তিনি রাজধানী তাঁড়া থেকে যাত্রা করেন। ১৫৮৩ সালের নবেম্বর মাসে তিনি বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় ছিলেন। ভাটি যাত্রার কথা বলে আবুল ফজল বলেন, " ...he went off to the country of Bhati, and did not heed the typhoon like violence of the rivers."

এই উক্তিতে মনে হয়, শাহবাজ খান বর্ষার মৌসুমে (১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে) যাত্রা করেন। আবার যুদ্ধ চলার মাঝামাঝি সময়ে শাহবাজ খান যখন বনার নদীর তীরে অবস্থান নিয়েছেন, তখন আবুল ফজল বলেন যে বর্ষা মৌসুমের জন্য মাসুম খান, ঈসা খান এবং অন্যান্য ভূঁঞারা অপেক্ষা করছিলেন। এতে মনে হয়, তখনও ঘোর বর্ষা আরম্ভ হয়নি। তাই মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, শাহবাজ খান ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলের দিকে ভাটি আক্রমণ শুরু করেন। তাঁর যাত্রাপথের প্রথম যে স্থানের নাম করা হয়েছে তা খিজিরপুর। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে, শাহবাজ খান ঈসা খানের দেশ বিক্রমপুরে যান[৭০] কিন্তু আকবরনামায় এই সময়ে বিক্রমপুরের কোন উল্লেখ নেই। খিজিরপুর সারা মোগল আমলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি রূপে বিবেচিত হয়, বিশেষত বার-ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে অভিযানে খিজিরপুরের বিশেষ অবদান ছিল। এটা বর্তমান নারায়ণগঞ্জের প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে খিজিরপুর সোনারগাঁও সরকারের একটি মহাল রূপে চিহ্নিত। মিরযা নাথন বলেন যে, দোলাই খাল (বা নদী) দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে এক শাখা খিজিরপুরে লক্ষ্যা নদীতে মিলিত হয়েছে এবং অন্য শাখা ডেমরায় একই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।[৭১] মীর জুমলার সময়েও খিজিরপুরে একটি দুর্গ ছিল, কিন্তু মনে হয় খিজিরপুরে ঈসা খানই প্রথম দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গ মীর জুমলার সময়, এমনকি পরেও সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং খিজিরপুরের অবস্থান নিয়ে বর্তমানে কোন মতভেদ নেই। রেনেলের মানচিত্রেও খিজিরপুরের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারিত, নারায়ণগঞ্জের অদূরে নদীর এক তীরে হাজিগঞ্জ দুর্গ, অন্য তীরে নবীগঞ্জ এবং সামান্য দূরে খিজিরপুর চিহ্নিত।[৭২] খিজিরপুরের তিন মাইল পূর্বে সোনারগাঁও। সুতরাং খিজিরপুরের অবস্থান সম্পর্কে আবুল ফজলের বিবরণ সঠিক।[৭৩] শাহবাজ খান খিজিরপুরের শিবিরে অবস্থানকালেই সোনারগাঁও তাঁর দখলে আসে। এর পরের স্তরে শাহবাজ খান কতরাব পৌঁছেন, (মূলে শব্দটি Karabuh বা করাবু এবং Katrabuh বা কতরাবু) যাকে আবুল ফজল বলেছেন

Edited by Ripon Sarkar

"which was his (Isa's) home." সুতরাং আবুল ফজলের মতে কতরাব তখন ঈসা খানের রাজধানী বা বাসস্থান ছিল। কতরাব শহরের অবস্থান নিয়ে অনেক মতভেদ দেখা যায়.[৭৪] কিন্তু বর্তমানে কতরাব চিহ্নিত করা মোটেই কঠিন নয়। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা হাবীবা খাতুন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, কতরাব শীতলক্ষ্যা নদীর পূর্ব তীরে রূপগঞ্জ উপজেলার মাসুমাবাদ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন। তিনি বলেনঃ

> But where is this Katrabo? We may now try to indentify the site of 'Katrabo'. 'Katrabo' was one of the twenty two parganas under Diwan Isa Khan Masnad-i-Ala of Bhati. Once it was a populous city and the residence of the Diwan. Even today it is a "tappa" of revenue sub-division under Rupganj Upazila.
>
> It appears from the narratives in the Baharistan that 'Katrabo' was situated about twelve miles off Khizirpur and Qudamrasul, to the north, on the left bank of the Sitalakhya. The 'Hatabo' On the north and 'Dewan Bari' on the south... The 'Dewan Bari' is still famous for its conspicuous ruins. During the life time of Isa Khan the city included Hatabo, Masumabad and Dewan Bari within its area and was renamed Masumabad afterwards by Masum Khan Kabuli,[৭৫] the rebel general of the Mughals. This area is still a tappa named 'Katrabo'. So 'Dewan Bari' as the name suggests, in all llikelihood, was the residential palace of 'Katrabo' of Isa Khan. The toponomy itself suggests it to be the residence of a Diwan. The Diwan was none but Diwan Isa Khan.[৭৬]

আবুল ফজল কতরাবকে অত্যন্ত জনাকীর্ণ শহর (populous city) রূপে উল্লেখ করেছেন। কতরাব লুণ্ঠন করার পরে শাহবাজ খান একদল সৈন্য এগার সিন্দুরে পাঠিয়ে দেন। এই স্থানের পরিচয় আগে দেয়া হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে যে স্থানে বনার নদী বেরিয়ে আসছে তার বিপরীতে এগার সিন্দুর এবং এই তীরে টোক। শাহবাজ খান নিজে বনার নদীর তীরে গিয়ে শিবির স্থাপন করেন এবং তরসুন খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বাজিতপুরে যাওয়ার আদেশ দেন। তরসুন খান ভাওয়াল থেকে যাত্রা করেন কিন্তু শত্রুবাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হন। তাহলে দেখা যায়, মোগল বাহিনী খিজিরপুর থেকে প্রথমে লক্ষ্যা ও পরে বনার নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে এগার সিন্দুর পর্যন্ত যায় এবং সেখান থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে একেবারে তাঁড়ায় চলে আসে।

১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের এই যুদ্ধের সময় ঈসা খানের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কেও কিছু ধারণা করা যায়। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে খান জাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় যুদ্ধ হয় অষ্টগ্রামের নিকটে কস্তুল নামক স্থানে, ঈসা খান তখন সরাইলের জমিদার, তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ত্রিপুরার রাজার সাহায্য নেন। তখন সোনারগাঁও এর জমিদার ছিলেন ইবরাহীম নারাল এবং মহেশ্বরদীর জমিদার ছিলেন করিমদাদ মুসাজাই। কিন্তু ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে মহেশ্বরদী এবং সোনারগাঁও দেখা যায় ঈসা খানের দখলে এবং ঈসা খানের রাজধানীও সোনারগাঁও পরগণার লক্ষ্যা নদীর তীরে কতরাব (মাসুমাবাদ) নামক স্থানে অবস্থিত। এখন আর ইবরাহীম নারাল এবং করিমদাদ মুসাজাই-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে

Edited by Ripon Sarkar

না। স্মরণ থাকতে পারে যে, ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের শেষে খান জাহান যখন বিফল হয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন তালিপাবাদের টিলা গাজী প্রত্যাবর্তনরত মোগল বাহিনীকে সাহায্য করেন এবং ইবরাহীম নারাল খান জাহানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই দুজন লোক মোগল পক্ষ না নিলে, অন্য কথায় বার-ভূঁএগ্রাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা না করলে মজলিশ দিলাওয়ার, মজলিশ প্রতাপ এবং ঈসা খানের হাতে খান জাহানসহ সম্পূর্ণ মোগল বাহিনী ধ্বংস হয়ে যেত। তাই মনে হয় ১৫৭৮ থেকে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের এই অন্তর্বর্তী সময়ে ঈসা খান বিশ্বাসঘাতকদের পরাজিত করে এই এলাকা দখল করেন। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান ছিলেন সরাইল পরগণার জমিদার, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে ঈসা খান খিজিরপুর সোনারগাঁও থেকে এগার সিন্দুর পর্যন্ত, এমনকি এগার সিন্দুর থেকে সরাইল পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকার কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। কোচবিহার আক্রমণ করার মত শক্তিও এই সময়ে তাঁর ছিল। আবুল ফজল বলেছেন, শাহবাজ খান যখন খিজিরপুরে পৌছেন এবং রাজধানী কতরাব লুট করেন, তখন ঈসা খান কোচবিহার থেকে ফিরে আসেন।

১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের অভিযান

আগে আমরা আলোচনা করেছি যে, ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানের ভাটি অভিযান ব্যর্থ হয় এবং তিনি রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে যান। ঠিক ঐ সময়ে উজীর খানও তাঁড়ায় ফিরে আসেন। উজীর খান উড়িষ্যার কতলু লোহানীকে দমন করার জন্য সাতগাঁও এবং বর্ধমান সীমান্তে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁড়ায় শাহবাজ খান সেনানায়কদের নিকট তাঁর পূর্ব প্রস্তাব আবার পেশ করেন, তাঁর পূর্ব প্রস্তাব ছিল পুনরায় ভাটি আক্রমণ করা। কিন্তু সেনানায়কেরা একমত হতে পারলেন না, তবে তাঁরা একমত হলেন যে, বিষয়টি সম্রাটের গোচরে আনা হোক। সম্রাট সংবাদ শুনে ভীষণ রাগ করেন এবং বাংলায় নিযুক্ত সেনানায়কদের তিরস্কার করে দ্রুত সংবাদ পাঠান। সম্রাট আদেশ দেন যেন ঈসা জমিদারকে দমন করা হয়, সাইদ খান এবং বিহার ও বাংলার অন্যান্য জাগীরদারদের বিশেষ তৎপর হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। সম্রাট রাজধানী থেকে প্রথমে পেশরাও খান ও খাজগী ফহত-উল্লাহ এবং পরে রামদাস কাচওয়াহা এবং মুজাহিদ কানবোর মারফত উপরোক্ত আদেশ বাংলার সেনানায়কদের নিকট পাঠান।

এদিকে শাহবাজ খানের সঙ্গে তাঁর সেনানায়কদের মতানৈক্য উপশম না হয়ে বরং বাড়তেই থাকে। ফলে শাহবাজ খান সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য রাজধানীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি কাকেও সুবাদারের দায়িত্ব দিয়ে যান কিনা সে বিষয়ে আকবরনামায় কোন উল্লেখ নেই। আকবরনামার বিবরণ পাঠে মনে হয় উজীর খান তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইতোমধ্যে মাসুম খান কাবুলী শেরপুরে যান (বোধহয় দখল করেন) এবং অন্যান্য বিদ্রোহীরা তাঁড়ার ১২ ক্রোশ দূরত্বে অবস্থিত মালদহ পর্যন্ত অধিকার করে। উজীর খান বিদ্রোহীদের বাধা দিতে অগ্রসর হওয়ার সাহস না করলেও রাজধানী তাঁড়াকে সুরক্ষিত করে বিদ্রোহীরা রাজধানী আক্রমণ করলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। মাসুম খান যে শেরপুর দখল করেন, তা বগুড়ার শেরপুর মুর্চা,[৭৭] অর্থাৎ দেখা যায় যে, মোগল অধিকার আবার সংকুচিত হয়ে যায়। কারণ রাজধানীর ১২ ক্রোশ (২৪ মাইল) দূরত্ব পর্যন্ত শুধু মোগল অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্যান্য এলাকা বিদ্রোহীদের অধিকারে চলে যায়। ঐ সময়ে আকবর কর্তৃক প্রেরিত সংবাদবাহকেরা

Edited by Ripon Sarkar

রাজধানী তাঁড়ায় যাওয়ার পথে বিহারে শাহবাজ খানের দেখা পান এবং শাহবাজ খানকে সম্রাটের আদেশের কথা বলেন। সম্রাট আরও সংবাদ পাঠিয়েছিলেন যে, শাহবাজ খানের যদি আরও সৈন্য দরকার হয় তিনি (সম্রাট) পাঠাবেন এবং রাজা তোডর মল্ল, মুত্তালিব খান এবং জামাল বখতিয়ার প্রমুখ সেনাপতিদের তাঁর (শাহবাজ খানের) সাহায্যার্থে পাঠাবেন। শাহবাজ খান বলেন যে, তাঁর কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না এবং নিজে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আবার বাংলায় ফিরে আসেন এবং ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে বাংলার সীমান্তে পৌঁছেন।

শাহবাজ খান সরাসরি ভাটির দিকে অগ্রসর হয়ে নদীর তীরে[৭৮] এসে শুনতে পান যে মাসুম খান শেরপুরে অবস্থান করছেন। ইতোমধ্যে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ শুরু হয়ে গেছে। শাহবাজ খানের অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহীরা যুদ্ধ না করেই পলায়ন করে। শাহবাজ খান নদী পার হয়ে শত্রুদের তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেন, সেনানায়কেরা অনেক বাদানুবাদ করে শেষ পর্যন্ত সুবাদারের অনুগমন করতে বাধ্য হয়। শত্রু পালিয়ে গেলেও শাহবাজ খান বলেন যে, তিনি কয়েকজন সেনানায়ককে নিয়ে শত্রুদের পেছনে যাত্রা করবেন এবং আর একদল সৈন্য রাজধানীতে থেকে যাবে। কারণ রাজধানী অরক্ষিত রাখা তিনি উচিত মনে করলেন না। সেনানায়কেরা তাঁর এই সিদ্ধান্তে সম্মতি না দেয়ায় শাহবাজ খান নিজে কয়েকজন সেনাপতিসহ সেখানে থেকে যান এবং সাইদ খান, উজীর খান, সাদিক খান এবং মুহিব আলী খান প্রমুখ সেনাপতিরা শত্রুদের পেছনে যাত্রা করেন। তাঁদের যাত্রার খবর পেয়ে শত্রুরা পলায়ন করে। সেনাপতিরা শেরপুরে ফিরে আসেন। আবুল ফজল একে বিরাট বিজয় আখ্যা দিয়ে বলেনঃ "By celestial aid the dust of dissension and the tumult of rebellion were dispersed, and victory declared itself. The enemy was discomfited."[৭৯]

এরপর মাসুম খান কাবুলী ফতহাবাদে বা আধুনিক ফরিদপুরে চলে যান, কিন্তু দাসতাম খান কাকশাল নামক আর একজন বিদ্রোহী সেনাপতি শেরপুরের দিকে অগ্রসর হন এবং শেরপুরস্থ মোগল শিবিরের প্রায় বার ক্রোশের মধ্যে চলে আসেন। মোগল সেনাপতিরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলে দাসতাম খান কাকশাল শাহজাদপুরের[৮০] দিকে পালিয়ে যান।

এই সময়ে মোগল বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে উজীর খান, শাহকুলী খান মাহরম, সাদিক খান, মুহিব আলী খান, রাজা গোপাল দাস এবং কীচক খাজা মাসুম খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহবাজ খান এবং অন্যান্যরা যেখানে ছিলেন, সেখানেই থেকে যান, অর্থাৎ মনে হয় তাঁরা বগুড়ার শেরপুর মুর্চায় অবস্থান করতে থাকেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, মাসুম খান কাবুলী ফতহাবাদে যান, সেখান থেকে তিনি ত্রিমোহনীতে যান এবং সেখানে দুটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ত্রিমোহনীর অবস্থান যে কোথায়, তা সঠিক নির্ধারণ করা কষ্টকর। আবুল ফজল বলেন যে, গঙ্গা, যমুনা এবং সকনি নদীর সঙ্গমস্থল ত্রিমোহনী।[৮১] এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেভেরীজ ত্রিমোহনীকে হুগলীর ত্রিবেণীর সঙ্গে চিহ্নিত করেন,[৮২] স্যার যদুনাথ সরকারও এটা সমর্থন করেন।[৮৩] কিন্তু ত্রিমোহনীকে হুগলীর ত্রিবেণীর সঙ্গে চিহ্নিত করা যৌক্তিক বলে মনে হয় না। মাসুম খান ছিলেন ভাটিতে, তিনি ভাটির ঈসা খানের সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। হুগলীর ত্রিবেণীর সঙ্গে ঈসা খানের কোন সম্পর্ক

Edited by Ripon Sarkar

ছিল না। অবশ্য ধারণা করা যায় যে, মাসুম খান উড়িষ্যার কতলু লোহানীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করার জন্য হয়ত হুগলীর ত্রিবেণীর দিকে যেতে পারেন। কিন্তু যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, সে সময়ের আগেই কতলু লোহানী উজীর খানের হাতে পরাজিত হয়ে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করেন।[৮৪] সাতগাঁও অর্থাৎ হুগলীর ত্রিবেণী তখন সম্পূর্ণ মোগলদের অধিকারে। সুতরাং এই অবস্থায় মাসুম খানের পক্ষে হুগলীর ত্রিবেণী যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তৃতীয়ত, একটু পরে যুদ্ধের বিবরণে দেখা যাবে যে, মাসুম খানের সঙ্গে ঈসা খানও ছিলেন, যদিও ঈসা খান সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেননি। সুতরাং এই ত্রিমোহনী ভাটি এলাকার নিকটেই কোথাও অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বাংলাদেশে যমুনা নদী বা ত্রিমোহনীর কোন অভাব নেই। যদিও মাসুম খান যে ত্রিমোহনীতে অবস্থান নিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়, তবু এই ত্রিমোহনীকে বাহরিস্তানে উল্লিখিত যাত্রাপুর বা কাটাসগড়স্থ বা খাল যোগিনীর ত্রিমোহনীর সঙ্গে চিহ্নিত করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কাটাসগড় ত্রিমোহনী গঙ্গা, ইছামতী এবং ধলেশ্বরীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।[৮৫] খাল যোগিনীর ত্রিমোহনীও নিকটে অবস্থিত।[৮৬] যাত্রাপুরের ত্রিমোহনীও নিকটে অবস্থিত, এটা গঙ্গার তিনটি শাখা দ্বারা গঠিত।[৮৭] মাসুম খান কাবুলী এর যে কোন একটি ত্রিমোহনীতে গিয়ে দুর্গ নির্মাণ করেন। মিরযা নাথন নিজে বাংলায় আসেন এবং যুদ্ধেও অংশ নেন। তাই তিনি সকল স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করেছেন, কিন্তু আবুল ফজলের সেই সুযোগ ছিল না। তাই তিনি ত্রিমোহনীর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারেননি। তিনি ত্রিমোহনীকে গঙ্গা, যমুনা ও সকনির সঙ্গমস্থল বলেছেন।

মাসুম খান কাবুলী ত্রিমোহনীতে দুটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং বেগ মুহাম্মদ ও উলুগ বেগ নামক দুজন সেনানায়ক এবং কয়েকজন জমিদারকে সেখানে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন। মাসুম খান নিজে পেছনে থেকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। মোগল বাহিনীও উজীর খানের নেতৃত্বে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় ঈসা খান মোগল সেনাপতির নিকট লোক পাঠান। কিন্তু ঈসা খান অনুতপ্ত না হওয়ায় মোগলেরা তাঁর কথায় কান না দিয়ে দুর্গ অধিকারের কাজে লিপ্ত থাকে। অনেক যুদ্ধের পর দুর্গ দুটি অধিকৃত হয়, মাসুম খান নদীতে পলায়ন করেন, তাঁকে তাড়া করলে তাঁর নৌকা উল্টে গিয়ে অনেক সৈন্য প্রাণ ত্যাগ করে, মাসুম খানসহ অনেকে পলায়ন করে। অপরদিকে তরখান দিওয়ানা এবং তাহির ইলানচক নামক দুজন বিদ্রোহী এই সুযোগে তাজপুর দখল করে এবং রাজধানী তাঁড়া আক্রমণ করে। শাহবাজ খান সময়মত হস্তক্ষেপ করায় তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়।

এই সময়ে শাহবাজ খানের স্থলে সাদিক খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। আবুল ফজল অনেকবার রাজকীয় বাহিনীর জয়ের কথা বললেও প্রকৃতপক্ষে শাহবাজ খান কিছুই জয় করতে পারেননি, শুধু বগুড়ার শেরপুর মুর্চা পর্যন্ত মোগল অধিকারে থাকে। অন্যপক্ষে বিদ্রোহীরা মাঝে মাঝেই মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে এমনকি রাজধানী তাঁড়াও আক্রমণ করে। স্যার যদুনাথ সরকারও শাহবাজ খান কর্তৃক বাংলাকে ঠাণ্ডা করার (pacify) কথা বলেছেন, কিন্তু কয়েক বৎসর ধরে যুদ্ধ করার পরেও শাহবাজ খান বাংলায় মোগল শক্তি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হন। তাঁর ব্যর্থতার প্রধান কারণ মোগল সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্য। আবুল ফজলও একথা স্বীকার করেন। তিনি বলেনঃ[৮৮]

Edited by Ripon Sarkar

It has been mentioned that the Bengal officers out of conceit and selfishness severed the thread of singleness of heart. Sadiq went off with some men in one direction, and Shahbaz went off in another. As ignorance was in the ascendant, the separation was not advantageous. They withdrew their hands from work and indulged in mutual animosity.

শাহবাজ খান নিজেও উগ্র মস্তিষ্কের লোক ছিলেন, তিনি তাঁর অধীনস্থ সেনাপতিদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতেন না। আকবর তাঁর সেনাপতিদের মতানৈক্যের কারণ বুঝতে পারেন এবং তিনি বাংলার অফিসারদের উপদেশ দেয়ার জন্য খাজা সোলায়মানকে পাঠান। "...an order was given that it was not right to do one work in two divisions. Acute and well meaning men should hold a meeting, and the subject should be fully considered among the leaders."[৮৯] আকবর সুস্পষ্ট নির্দেশ দেন যে, শাহবাজ খান এবং সাদিক খানের মধ্যে একজনকে বাংলায় এবং অন্যজনকে বিহারে থাকতে হবে। তাঁরা উভয়ে বসে ঠিক করবেন কে বাংলায় থাকবেন এবং কে বিহারে যাবেন। যে কেউ বাংলায় থাকতে চাইবেন, তাঁকে বাংলায় এবং অন্যজনকে বিহারে যাওয়ার নির্দেশ দেন। খাজা সোলায়মান সম্রাটের আদেশ অনুসারে শাহবাজ খান ও সাদিক খানকে এক সঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে প্রথমে সাদিক খানের নিকট যান এবং সাদিক খান বাংলায় থাকতে রাজি হওয়ায় তাঁকে বাংলার দায়িত্ব দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহবাজ খান রাগান্বিত হয়ে বাংলা ছেড়ে যান।[৯০]

শাহবাজ খান বাংলা ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালে ঈসা খান মসনদ-ই-আলা সমঝোতার প্রস্তাব দিয়ে সংবাদ পাঠান। আবুল ফজল বলেন যে, যুদ্ধে সম্রাটের বাহিনীর পরাজয়ের পরে (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে) ঈসা খান বেশ সতর্ক অবস্থায় ছিলেন। (হয়ত তিনি পুনরায় মোগল বাহিনীর আক্রমণের অপেক্ষায় ছিলেন।) কিন্তু মোগল বাহিনীতে মতানৈক্যর সংবাদ পেয়ে ঈসা খানের সেই শংকা দূর হয়। কিন্তু তবুও তিনি সাদিক খানের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠান। তিনি বলেন যে, তিনি মাসুম খান কাবুলীকে হেজাজে পাঠাবেন এবং তিনি নিজে অনুগত থাকবেন। তিনি আরও বলেন যে, তিনি তাঁর এক আত্মীয়কে সম্রাটের দরবারে পাঠাবেন এবং মূল্যবান উপহার পাঠাবেন। তিনি (ঈসা খান) যখন তাঁর এই প্রতিশ্রুতি পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে শাহবাজ খান এবং সাইদ খান প্রমুখ সেনাপতিরা বাংলা ছেড়ে যান। ফলে ঈসা খান আনুগত্য প্রকাশের ইচ্ছা ত্যাগ করেন।[৯১] কিন্তু আবুল ফজল আরও বলেন যে, ঈসা খান আগের যুদ্ধে (১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে) মোগলদের নিকট থেকে অধিকৃত হাতি এবং কামানগুলি সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি মাসুম খানকে ত্যাগ না করলেও তাঁকে আর গোলযোগ সৃষ্টি করতে দেননি।[৯২] আবুল ফজলের এই বক্তব্য কতটুকু সত্য বলা যায় না।

এই সময়ে উড়িষ্যার কতলু খানের উজীর ঈসা লোহানী (ঈসা খান লোহানী মিঞা খেল, খাজা উসমান আফগানের পিতা) অনেক আফগান সৈন্য নিয়ে মোগল এলাকায় গোলযোগ সৃষ্টি করেন এবং বর্ধমানে অবস্থানরত উজীর খানের ছেলে সালিহকে আক্রমণ করেন। সালিহ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বর্ধমান দুর্গে আশ্রয় নেন। সাদিক খান

Edited by Ripon Sarkar

সালিহব সাহায্যার্থে সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন। এই বাহিনী পৌছলে ঈসা লোহানী দুর্গ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। মঙ্গলকোট নদীর তীরে[৯৩] মোগল বাহিনী দুর্গ নির্মাণ করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে মোগল বাহিনী প্রথম বিজয় লাভ করে। রাত্রে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় মোগল সৈন্যরা নদী পার হতে গিয়ে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পরের দিন উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আবুল ফজল বলেন যে, আফগানরা ঐদিন যুদ্ধ হবে না মনে করে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ঐ সময় সাদিক খান যুদ্ধের আদেশ দেন। যুদ্ধে প্রায় তিনশ আফগান এবং একশ মোগল সৈন্য নিহত হয়। পলায়নের সময় আফগানদের আরও এক হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। আফগানরা মোগল এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

শাহবাজ খানের চলে যাওয়ার কথা শুনে দাসতাম কাকশাল তৎপর হয়ে উঠেন এবং ঘোড়াঘাট আক্রমণ ও অবরোধ করেন। তাহির সাইফুল মুলক এবং খাজা মুকীম তখন ঘোড়াঘাটে ছিলেন, তাঁরা বিদ্রোহীদের প্রবল বাধা দেন। এদিকে শেরপুর মুর্চা থেকে বাবুই মনকলি এবং (বোধ হয় তাঁড়া থেকে) মুহিব আলী খান ঘোড়াঘাটে গিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন। দাসতাম কাকশাল পলায়ন করেন কিন্তু ধরা পড়ে নিহত হন। তাঁর ছেলে খুশ ফাল বন্দী হয়। তাঁর হাত এবং অন্যান্য সরঞ্জাম মোগলদের হাতে পড়ে।

ইতোমধ্যে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ শেষ হয়ে আসে। বাংলা অধিকার এখনও সুদূর-পরাহত। বার-ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, মাসুম খান কাবুলী এখনও তৎপর, উড়িষ্যার কতলু খানও মাঝে মাঝে গোলযোগ সৃষ্টি করেন। ঘোড়াঘাট প্রায়ই বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বলতে গেলে মোগল এলাকা পূর্ব দিকে শুধু শেরপুর মুর্চা পর্যন্ত বিস্তৃত। আকবর লক্ষ্য করেন যে, মোগল সেনাপতিদের ঘন ঘন মতানৈক্য মোগল বিজয়ের প্রধান অন্তরায়। শাহবাজ খান বাংলা ছেড়ে যাওয়ার পরে সাদিক খান বাংলায় মোগল সেনাপতির দায়িত্ব নেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। তাই আকবর শাহবাজ খানকে পুনরায় বাংলায় পাঠাবার মনস্থ করেন এবং তাঁকে বিহার থেকে বাংলায় গিয়ে পুনরায় দায়িত্ব গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।[৯৪] ফলে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাহবাজ খান পুনরায় বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৯৫]

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় শাহবাজ খান

আবুল ফজল এই আলোচনার শুরুতে বলেন যে, বাংলায় শান্তি স্থাপিত হয় (pacification of Bengal)। তিনি বলেন শাহবাজ খান ঈসা খানকে শাস্তি দেয়ার জন্য ভাটিতে সৈন্য পাঠান। ঈসা খানের যুদ্ধ করার সাহস ছিল না এবং ইতোপূর্বে সাদিক খান যে এলাকা হারিয়েছিলেন, তা মোগল অধিকারে চলে আসে। বিজয় (মোগল বিজয়) চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সন্তোষজনকভাবে কাজ সমাধা করা হয়। ঈসা খান দুর্লভ উপহার সামগ্রী পাঠান এবং সমঝোতার ভাষা ব্যবহার করেন। তিনি বলেন যে, মাসুম খান কাবুলী যেহেতু তাঁর দুর্ভাগ্যের কারণে অকৃতজ্ঞ হয়েছেন, সেজন্য তিনি (মাসুম) এখন অনুতপ্ত এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। সে জন্য তিনি অনুপস্থিত থেকে (গায়েবানা, অর্থাৎ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত না হয়েও) দূর থেকে আকবরের সেবা করবেন। তিনি তাঁর (মাসুমের) ছেলেকে সম্রাটের দরবারে পাঠাচ্ছেন। শাহবাজ খান উত্তর দেন যে, মাসুম খান কাবুলী এখন হেজাজে যাক, হেজাজ থেকে ফেরার সময় সম্রাটের দরবারে গেলেই ভাল হয়। অপরদিকে (উড়িষ্যায়) অনেক আফগান কতলু খান লোহানীকে ত্যাগ

Edited by Ripon Sarkar

করে। তিনি (কতলু) সমঝোতার কথাবার্তা বলেন এবং শাহবাজ খান সরলভাবে তাঁর কথায় বিশ্বাস করেন এবং উড়িষ্যা তাঁকে ফিরিয়ে দেন। মগ রাজাও (আরাকানের রাজা) হাতিসহ অনেক উপহার পাঠান এবং মিত্রতা স্থাপন করেন।[৯৬]

আবুল ফজলের বক্তব্য অতি সংক্ষেপ, তিনি বলেন যে বাংলায় শান্তি স্থাপিত হয়। স্যার যদুনাথ সরকারও আবুল ফজলের এই বক্তব্য গ্রহণ করেন।[৯৭] কিন্তু এই বক্তব্য কতটুকু সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। এখানে যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই, এমন ভাবে আবুল ফজল শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা লিখেছেন, যাতে মনে হয় শাহবাজ খান আসার সাথে সাথে ঈসা খান দুর্বল হয়ে পড়েন, সাহস হারিয়ে ফেলেন এবং মোগলদের আনুগত্য স্বীকার বা মোগলদের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। মাসুম খান কাবুলীও রাতারাতি ভাল হয়ে যান এবং বিদ্রোহের পথ ছেড়ে শান্তির পথে চলে আসেন। আবুল ফজল শুধু এই কথা বলে শেষ করেননি, তিনি বলেছেন যে চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত জয় হয়ে গেছে। এমনকি আরাকানের মগ রাজাও সম্রাটের নিকট উপহার পাঠান এবং মৈত্রী স্থাপনের কথা বলেন (made propositions of concord)। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে যেখানে খান জাহান এবং ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে যেখানে শাহবাজ খান নিজে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন, সেখানে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে বিনা যুদ্ধে বিদ্রোহীরা এবং বার-ভূঁএগ্রা প্রধান ঈসা খান বশ্যতা স্বীকার করবেন এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। চট্টগ্রাম বন্দর পর্যন্ত বিজয়ের কথা বলে আবুল ফজল সন্দেহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। কারণ এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, চট্টগ্রাম তখন আরাকানের রাজার অধিকারে ছিল[৯৮] কিন্তু আবুল ফজল একথা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আরাকানের মগ রাজার উপহার পাঠাবার এবং মৈত্রীর কথা বলার ব্যাপারেও উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়ত একটু পরে দেখা যাবে যে, ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে (নবেম্বর মাসে) উজীর খান বাংলায় সুবাদার এবং শাহবাজ খান বখশী নিযুক্ত হন। শাহবাজ খান যদি ঐ সালেই বলগাকপুর (বিদ্রোহী) বাংলাকে শান্ত করার মত অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন, তাহলে তাঁর পদোন্নতি না হয়ে অবনতি হল কেন এই প্রশ্নের উত্তর আবুল ফজল কোথাও দেননি। তৃতীয়ত, ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খান বাংলা থেকে অন্যত্র বদলী হয়ে যান এবং প্রথমে উজীর খান ও পরে সাইদ খান বাংলার দায়িত্ব নেন। তাঁদের সময়েও বাংলায় কোন যুদ্ধ বিদ্রোহের কথা নেই, যেন বাংলার সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছিল। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে আবুল ফজলের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, সুবাদার রাজা মানসিংহের সময় আবার পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, আবার উড়িষ্যায় কতলু খান, এবং কতলু খানের মৃত্যুর পরে কতলুর ছেলের সময়ে বিদ্রোহ, আবার মাসুম খানের বিদ্রোহ। আবার বার-ভূঁএগ্রাকে দমন করার জন্য মানসিংহের ভাটি এলাকায় সৈন্য চালনা, মানসিংহের সময়েও ভাটিতে মোগলদের পরাজয় সব কিছু ঘটতে থাকে। এর পরেও কি বলা যায় যে, শাহবাজ খান ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মানসিংহের সময় পর্যন্ত ঘটনা একইরূপ, যুদ্ধক্ষেত্র প্রায় একই স্থানে, প্রতিপক্ষও একই (অবশ্য যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করে তারা বাদে।) কিন্তু মাঝের কয়েক বৎসরের ঘটনাগুলি আবুল ফজলের বিবরণে বাদ পড়েছে।

Edited by Ripon Sarkar

সুবাদার উজীর খান

১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাসে আকবর সকল সুবা বা প্রদেশের জন্য একই রকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা করে একটি নতুন আদেশ জারি করেন। এই আদেশের বলে বাংলায় উজীর খানকে সুবাদার, মুহিব আলী খানকে সহকারী সুবাদার, শাহবাজ খানকে বখশী, করম-উল্লাহকে দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়।[৯৯]

উজীর খান হেরাতের অধিবাসী ছিলেন। উজীর খান একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন এবং উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। তিনি বেশিরভাগ সময় বাংলা বিহারে কাটান। সুবাদার খান আযম বাংলা থেকে বিহারে বদলী হলে নতুন সুবাদার না আসা পর্যন্ত তিনি উজীর খানকে বাংলা সুবার দায়িত্ব দিয়ে যান। এর পরে উজীর খানকে বাংলার বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা যায়, তবে শাহবাজ খানের সময় উড়িষ্যার কতলু খানের গোলযোগ দমনের জন্য তিনি প্রায়ই বর্ধমানে থাকতেন।

উজীর খান সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পরে বেশি দিন বাঁচেননি। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাজধানী তাঁড়ায় উদরাময় রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আকবর উজীর খানের স্থলে সাইদ খানকে বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত করেন।

সুবাদার সাইদ খান

তিনি সাইদ খান চাগতাই নামেও পরিচিত। তাঁর পিতার নাম ইয়াকুব বেগ এবং পিতামহের নাম ইবরাহীম বেগ। তাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে মোগল সম্রাটের অধীনে চাকরিরত ছিলেন। ইবরাহীম বেগ হুমায়ুনের অধীনে বাংলাদেশে যুদ্ধ করেন। ইবরাহীম বেগের এক ছেলে ইউসুফ বেগ শের শাহ্‌র ছেলে জালাল খানের (পরে সলীম শাহ্‌ বা ইসলাম শাহ্‌) সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। সাইদ খানের পিতা ইয়াকুব বেগও হুমায়ুনের অধীনে চাকরি করেন।

সাইদ খান আকবরের অধীনে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি কিছু দিন মুলতানের গবর্নর ছিলেন এবং আকবরের রাজত্বের ২২শ বর্ষে শাহজাদা দানিয়ালের অভিভাবক নিযুক্ত হন। পরে তিনি পাঞ্জাবের গবর্নর নিযুক্ত হন। ২৮শ বর্ষে সাইদ খান তিন হাজার মনসব লাভ করেন এবং বিহারের হাজিপুরে নিযুক্তি পান। রাজত্বের ৩২শ বর্ষে সাইদ খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে পাঁচ হাজার করা হয়। জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণের পরে সাইদ খানের মৃত্যু হয়।[১০০]

১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সাইদ খান তাঁড়ায় পৌঁছেন; তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গে শাহবাজ খানও সম্রাটের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বাংলা ছেড়ে চলে যান। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে সুলতান কুলী কলমক এবং কাচকেনা গোলযোগের সৃষ্টি করে; তারা ঘোড়াঘাট হয়ে তাজপুর এবং পূর্ণিয়া লুট করে দ্বারভাঙ্গায় যায়। রাজা মানসিংহ তখন বিহারের সুবাদার; তাঁর ছেলে জগত সিংহ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে গমন করে। (বাংলার সুবাদার সাইদ খান বা বাংলার অন্যান্য সেনাপতিরা কোন ব্যবস্থা নেয় কিনা, আকবরনামায় উল্লেখ নেই) করক্ষণ এবং বিহারের অন্যান্য জাগীরদারেরাও জগত

Edited by Ripon Sarkar

সিংহের সঙ্গে অগ্রসর হয়। বিদ্রোহীরা হাজিপুরের সাত ক্রোশের মধ্যে পৌছলে যুদ্ধ হয় এবং বিদ্রোহীরা পলায়ন করে। জগত সিংহ তাদের তাড়া করে এবং তাদের ফেলে যাওয়া হাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি হস্তগত করে। এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এবং ৫৪টি হাতি সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল তারিখে এগুলি সম্রাটের নিকট দেয়া হয়।[১০১] ৩১শে অক্টোবর ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় দুজন অফিসার পাঠান হয়। একজন শরীফ সরমদী, তিনি শাহবাজ খানের স্থলে বখশী নিযুক্ত হন। আর একজন মীর শরীফ আমুলী, তিনি একই সঙ্গে আমীন, সদর এবং কাযী নিযুক্ত হন।[১০২]

১৫৯০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৎকালীন বিহারের সুবাদার রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। তিনি বাংলার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে ভাগলপুর এবং বর্ধমানের পথে হুগলীর পশ্চিমে জাহানাবাদে[১০৩] পৌছেন; এখানেই তখন উড়িষ্যার সীমানা ছিল। উড়িষ্যার আফগান নেতা কতলু লোহানী বাহাদুর কুরুহ-এর নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী মানসিংহের বিরুদ্ধে পাঠান। আফগান বাহিনী মোগল শিবিরের প্রায় পঞ্চাশ মাইল পশ্চিমে অবস্থান নেয়। মানসিংহের পুত্র জগত সিংহের অধীনে অগ্রবর্তী সৈন্যদল ২১শে মে তারিখে হঠাৎ আফগানদের সম্মুখীন হয়। জগত সিংহ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন, ফলে তিনি সম্পূর্ণ পরাজিত হন। জগত সিংহ নিজে আহত হন; তিনি ধরা পড়ার উপক্রম হলে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির তাঁকে উদ্ধার করে নিজ দুর্গে নিয়ে আসেন।

এর দশ দিন পরে কতলু লোহানীর মৃত্যু হয় এবং তাঁর পুত্র নাসির সিংহাসনে বসেন। কতলুর বিশ্বস্ত উজীর খাজা ঈসা মিঞা খেল অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন, তিনি অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাড়াতাড়ি মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। তিনি আকবরের নামে খুতবা পাঠ করতে এবং মুদ্রা উৎকীর্ণ করতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও আশে পাশের এলাকা মোগলদের অধিকারে দেয়ার জন্যও স্বীকৃত হন। ১৫ই আগস্ট তারিখে কতলুর ছেলে মানসিংহকে কুর্নিশ করেন এবং একশ পঞ্চাশটি হাতিসহ মূল্যবান উপহার সামগ্রী দেন। এর পর মানসিংহ বিহারে ফিরে আসেন।[১০৪]

কিন্তু উজীর ঈসা লোহানীর মৃত্যু হলে উড়িষ্যার আফগানরা চুক্তি ভঙ্গ করে আবার বিদ্রোহ করে। মানসিংহ বিহার থেকে যাত্রা করেন এবং সাইদ খান তাঁড়া থেকে গিয়ে মানসিংহের সাথে যোগ দেন। যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে কিন্তু এর পরেই বাংলার সুবাদার সাইদ খান তাঁড়ায় ফিরে আসেন। যুদ্ধের পরে মানসিংহ ঈসা লোহানীর ছেলে উসমান, সোলায়মান এবং তাঁদের ভাইদের বাংলায় নির্বাসিত করেন। উসমান কিভাবে বুকাইনগরে প্রতিষ্ঠিত হন তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

সাইদ খান ১৫৮৮ খ্রিঃ থেকে ১৫৯৪ খ্রিঃ পর্যন্ত প্রায় ছয় বৎসর বাংলার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ে বাংলায় তাঁর কোন যুদ্ধের বিবরণ আকবরনামায় নেই; তিনি শুধু উড়িষ্যার যুদ্ধে দুবার মানসিংহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। মনে হয় এই সুদীর্ঘ সময়ে সাইদ খান বাংলার মাসুম খান কাবুলী প্রমুখ বিদ্রোহী বা বার-ভূঁঞা বা অন্যান্য ভূঁঞাদের অনুগত করার কোন চেষ্টা না করে শুধু মোগল এলাকা রক্ষা করেই সন্তুষ্ট ছিলেন।

Edited by Ripon Sarkar

সুবাদার রাজা মানসিংহ কাচওয়াহা

আকবর সাইদ খানের স্থলে মানসিংহকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে তারিখে তাঁকে নানারকম উপদেশ দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দেন। সাইদ খানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়।

অম্বরের রাজা ভগবান দাসের ছেলে রাজা মানসিংহ, তিনি মিরযা রাজা নামেও পরিচিত ছিলেন এবং আকবর তাকে ফরজন্দ (বা পুত্র) উপাধি দেন। রাজা ভগবান দাস পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত হলে মানসিংহ সিন্ধু নদের তীরবর্তী জেলাসমূহের সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে কাবুলে আকবরের ভাই মিরযা হাকিমের মৃত্যু হলে মানসিংহকে সেখানে পাঠান হয়। মানসিংহ কাবুলে বেশ কিছু দিন ছিলেন। এতদিন পর্যন্ত মানসিংহকে কুনওয়ার (কুমার) বলা হত, কিন্তু ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দে রাজা ভগবান দাসের মৃত্যু হলে মানসিংহকে রাজা উপাধি দেয়া হয় এবং পাঁচ হাজার মনসবে উন্নীত করা হয়। ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। মানসিংহ ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় ছিলেন। আকবর পীড়িত হয়ে পড়লে তিনি মানসিংহ ও তাঁর অন্যান্য বিশ্বস্ত অফিসারদের রাজধানীতে ডেকে পাঠান। মানসিংহও তখন রাজধানীতে চলে যান। আকবরের মৃত্যুর পরে মানসিংহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে জাহাঙ্গীরের ছেলে খসরুকে সিংহাসনে বসাতে চান। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে মানসিংহের ষড়যন্ত্রের কথা ভুলে গিয়ে তাঁকে আবার বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু শীঘ্রই তাঁকে ডেকে পাঠান হয় এবং রোটাস দুর্গে পাঠান হয়। মানসিংহ আরও কয়েক বছর চাকরিতে বহাল থাকেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে মানসিংহকে তাঁর স্বদেশে ফিরে যেতে অনুমতি দেয়া হয়। মানসিংহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের নবম বর্ষে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দেড় হাজার স্ত্রীর ষাটজন তাঁর চিতায় সহমরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর অসংখ্য ছেলের মধ্যে মাত্র ভাও সিংহ নামক একজন জীবিত ছিলেন। আগ্রার তাজমহল যে স্থানে অবস্থিত সেই জায়গাটি মানসিংহের মালিকানাধীন ছিল। শাহজাহান এই জায়গাটি খরিদ করেন।[১০৫]

১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী তাঁড়ায় পৌঁছার পরে রাজা মানসিংহ বিভিন্ন দিকে সৈন্য পাঠিয়ে দেন। তাঁর ছেলে হিম্মত সিংহের অধীনে একদল সৈন্য ভূষণা জয়ের জন্য পাঠান। আবুল ফজল বলেন যে, ভূষণায় একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল এবং এখানে অনেক লোক বসবাস করত। তখন ভূষণার জমিদার ছিলেন মুকুন্দরায়। এই যুদ্ধে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে।[১০৬] ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দেই মানসিংহ রাজমহল শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাংলায় এসে একটি উপযুক্ত রাজধানী শহর স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন এবং ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই নবেম্বর তারিখে রাজমহল শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং এখানে তাঁড়া থেকে রাজধানী স্থানান্তর করেন। আবুল ফজল বলেন যে, তিনি এমন একটি স্থান নির্বাচন করেন, যা নৌ-বাহিনীর আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকে এবং রাজমহলকে নির্বাচিত করেন। কিন্তু রাজমহলও নদীর তীরে এবং নৌ-বাহিনীর আক্রমণ থেকে মোটেই নিরাপদ নয়। তবে এটা ঠিক যে, ভাটির বার-ভূঁঞার এলাকা থেকে তাঁড়ার তুলনায় রাজমহল দূরে অবস্থিত ছিল। মনে হয় মানসিংহ বার-ভূঁঞার সঙ্গে শেষ এবং চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে প্রস্তুতি

Edited by Ripon Sarkar

নিচ্ছিলেন। যদি তাই হয়, তাহলে মানসিংহের পরিকল্পনা নির্ভুল ছিল না, বরং এই বিষয়ে ইসলাম খান চিশতীর পরিকল্পনা অধিক বাস্তব ভিত্তিক ছিল। ইসলাম খান ভাটিতেই রাজধানী স্থাপন করেন, সমস্ত শক্তি সেখানেই কেন্দ্রীভূত করেন এবং বার-ভুঁঞার বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানেন। বার-ভুঁঞার বা অন্যান্য বিদ্রোহীদের গতিবিধির খবর পেয়ে তাঁড়া বা রাজমহল থেকে অকুস্থলে আসতেই অনেক দীর্ঘ দিন সময় লেগে যেত। যাহোক মানসিংহ রাজমহলেই রাজধানী স্থাপন করেন এবং নতুন রাজধানীর নাম দেন আকবরনগর। রাজমহলের পূর্ব নাম ছিল আকমহল। শের শাহর সময় থেকে স্থানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।[১০৭]

রাজমহল থেকে মানসিংহ ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঈসা খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। আবুল ফজলের বক্তব্যে ঈসা খানের রাজ্যের অনেকাংশ মোগলদের অধিকারে আসে। শত্রুরা বাধা দিতে অসমর্থ হয়ে ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে চলে যায়। বর্ষা মৌসুম এসে পড়ায় মানসিংহ অগ্রসর না হয়ে শেরপুরে শিবির স্থাপন করেন এবং সেখানে সলিমনগর নামে একটা দুর্গ নির্মাণ করেন।[১০৮]

আবুল ফজলের উপরোক্ত বক্তব্য যদুনাথ সরকার গ্রহণ করেছেন,[১০৯] কিন্তু ইহার সত্যতা যাচাই করার মত তথ্য আকবরনামায় নেই। ঈসা খানের রাজ্যের অনেকাংশ মোগল অধিকারে আসে কথাটা সত্য নয়। দ্বিতীয়ত, দেখা যায় মানসিংহ শেরপুরে অবস্থান নিয়েছেন। বেভেরীজ শেরপুরকে ময়মনসিংহের শেরপুরের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেছেন। কিন্তু এটা বগুড়ার শেরপুর মুর্চা। তৃতীয়ত, শেরপুরে মানসিংহ যে দুর্গ নির্মাণ করেন, তার নাম সলিমনগর বলা হয়েছে। মানসিংহ যুবরাজ সেলিম, (জাহাঙ্গীর) এর নামে দুর্গের নামকরণ করবেন, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। সেলিমের সঙ্গে মানসিংহের সম্পর্ক ভাল ছিল না, মানসিংহ জাহাঙ্গীরের পরিবর্তে তাঁর ছেলে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন।[১১০] তাই মনে হয় সলিমনগর নামে একটি দুর্গ আগে থেকেই ছিল, এটা শের শাহ্‌র ছেলে সলীমশাহ্‌র নামানুসারে নির্মিত হয়। মানসিংহ হয়ত এই দুর্গটি সংস্কার করেছিলেন।

১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে মানসিংহ ঘোড়াঘাটে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকেরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দেন। এই সময়ে ঈসা খান এবং মাসুম খান কাবুলী ঘোড়াঘাট আক্রমণ করেন এবং ঘোড়াঘাটের বার ক্রোশ দূরত্বের মধ্যে চলে আসেন। মোগল বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু বৃষ্টিপাত কম হওয়ার দরুন নদীর পানি কমে যায়। ফলে নৌ-বাহিনী নদীতে আটকে পড়ার ভয়ে ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলী ফিরে যান। মানসিংহ সুস্থ হওয়ার পরে তাঁর পুত্র হিম্মত সিংহের অধীনে একদল সৈন্য ভাটির দিকে প্রেরণ করেন। ঈসা খান ও মাসুম খান কাবুলী এগার সিন্দুরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে থাকেন।

এই বছরের (১৫৯৬ খ্রিঃ) শেষ দিকে কোচবিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পিতা নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে কোচ বিহারের সিংহাসনে বসেন। লক্ষ্মী নারায়ণের পিতৃব্য পুত্র রঘুদেব ঈসা খানের সাহায্যে লক্ষ্মী নারায়ণকে আক্রমণ করেন। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে কোচ বিহারের রাজা নরনারায়ণ দুইবার মোগল সম্রাটের নিকট উপহারাদি পাঠান। মোগলদের জন্য কোচ বিহারের সামরিক গুরুত্ব ছিল অত্যধিক; আমরা আগে বলেছি যে,

Edited by Ripon Sarkar

বিদ্রোহীরা ঘোড়াঘাটে পরাজিত হলেই কোচ বিহারে আশ্রয় নিত। মানসিংহও কোচ বিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তিনি সলীমনগর (শেরপুর মুর্চা) থেকে গোবিন্দপুর গমন করেন। এতে দেখা যায় যে, এই সময় মানসিংহ ঘোড়াঘাট থেকে শেরপুর মুর্চায় চলে আসেন। ১৫৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহকে অভ্যর্থনা জানান। মানসিংহের অগ্রসর হওয়ার কথা শুনে রঘুদেব এবং ঈসা খান পলায়ন করেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ অনেক উপহারাদি নিয়ে মানসিংহকে বিদায় করেন। কোচ বিহারের রাজা তাঁর বোনকে রাজা মানসিংহের সঙ্গে বিয়ে দেন। এইভাবে কোচ বিহারের সঙ্গে মোগলদের মৈত্রী স্থাপিত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে পূর্ব সীমান্তে মোগলদের একটি সামন্ত রাজ্য স্থাপিত হয়। এই বছর মানসিংহের ছেলে হিম্মত সিংহ বাংলায় কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ করেন।[১১১]

মানসিংহ ফিরে আসলে রঘুদেব[১১২] পুনরায় রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ করেন এবং শেষোক্ত ব্যক্তি আবার মানসিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মানসিংহ ঝাজর খান ও ফতেহ খান সূরের নেতৃত্বে এক বিরাট বাহিনী তাঁর সাহায্যার্থে পাঠান। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মে তারিখে মোগল সৈন্য সেখানে পৌঁছে এবং অনেক যুদ্ধের পরে রঘুদেব সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হন। ঈসা খান রঘুদেবের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে মানসিংহ ঈসা খানের ভাটি আক্রমণ করার জন্য সৈন্য পাঠান, ফলে ঈসা খানকে তাঁর নিজের রাজ্যেই থাকতে হয়। মানসিংহ ঈসা খানের বিরুদ্ধে জলে ও স্থলে দুটি বাহিনী পাঠান। নৌ-বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন মানসিংহের ছেলে দুর্জন সিংহ। ঈসা খানকে একজন লোক বিশ্বাসঘাতকতা করে এই সংবাদ দেয়। আবুল ফজল বলেনঃ "In as much as domestic broils produce great injury, one of the double faced and crooked ones gave information to those men." দুর্জন সিংহ ঈসা খানের কিছু এলাকা লুট করে রাজধানী কতরাব আক্রমণ করেন। কিন্তু ঈসা খান এবং মাসুম খান প্রস্তুত ছিলেন; তাঁরা বিক্রমপুরের ছয় ক্রোশ দূরে অনেক নৌকা নিয়ে উপস্থিত হন এবং মোগল নৌ-বাহিনীকে চারদিকে ঘিরে ফেলেন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে দুর্জন সিংহ সহ মোগল বাহিনীর অনেকে নিহত হয়; অনেক মোগল সৈন্য ঈসা খানের হাতে বন্দী হয়। আবুল ফজল বলেন যে এই যুদ্ধে মোগলদের পরাজয় হলেও কোচ রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁর জ্ঞাতি রঘুদেবের এবং ঈসা খানের মিলিত বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। ঈসা খান সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন যে দূরদর্শিতার ফলে ঈসা খান (মোগলদের) তোষামোদ করেন এবং বন্দীদের ফেরত দেন। (Isa, from farsightedness, had recourse to blandishments and sent back his prisoners). এটাই আবুল ফজলের রীতি, সম্রাটের মুখ রক্ষার জন্য তিনি ঈসা খনের জয়লাভের পরেও তোষামোদ করার কথা বলেন। স্যার যদুনাথ সরকারও আবুল ফজলের অনুসরণে বলেন যে ঈসা খান সন্ধি করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন, তিনি যুদ্ধ বন্দীদের ফেরত দেন, লক্ষ্মীনারায়ণকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকেন এবং সম্রাটের প্রতি আত্মসমর্পণ করেন।[১১৩] কিন্তু এত বড় যুদ্ধে জয়লাভ করেও এবং মোগল সেনাপতি সহ অনেক মোগল সৈন্য নিহত হওয়ার পরেও ঈসা খান কেন আত্মসমর্পণ করবেন, তা আমাদের নিকট বোধগম্য নয়।

Edited by Ripon Sarkar

মানসিংহ তাঁর দুই যোগ্য পুত্রই, হিম্মত সিংহ এবং দুর্জন সিংহ বাংলাদেশে হারান, হিম্মত সিংহ অসুখে মারা যান এবং দুর্জন সিংহ ঈসা খান ও মাসুম খানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। ভাটি অঞ্চল জয় করাও মানসিংহের পক্ষে সম্ভব হয়নি। স্বভাবতই তিনি মনমরা হয়ে পড়েন। তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর স্বদেশের নিকটে আজমীরে যাওয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বা ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি বাংলা ছেড়ে যাওয়ার মনস্থ করেন। তাঁকে অনুমতি দেয়া হয় এবং তাঁর ছেলে জগৎ সিংহকে তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলার শাসনভার নেয়ার জন্য সম্রাট আদেশ দান করেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে তারিখে মাসুম খান কাবুলী অসুস্থ হয়ে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন।[১১৪] আবুল ফজল খুশি হয়ে বলেন, পূর্ব দেশের বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। কিছুদিন পরে মানসিংহ সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হন এবং সম্রাটের সম্মুখে তাঁর নজরানা পেশ করেন। এর মধ্যে ছিল পঞ্চাশটি মূল্যবান হীরা। ঐ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা মানসিংহ আকবরের সঙ্গে মালওয়ায় গমন করেন, ঐদিনেই জগৎ সিংহকে বাংলার দায়িত্ব নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। এই সময় (১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) ঈসা খান মসনদ-ই-আলার মৃত্যু হয়। আবুল ফজল আবার খুশি হয়ে বলেন যে ভাগ্যের আশ্চর্য পরিবর্তন, সেই জমিদারের মৃত্যু হয় এবং বিদ্রোহের কাঁটা দূরীভূত হয়।[১১৫] আবুল ফজলের বক্তব্য অবশ্যই ঠিক, একই বছরে মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে বার-ভূঁঞা প্রধান ঈসা খান এবং মোগল বিদ্রোহী প্রধান মাসুম খান কাবুলী উভয়েই প্রাণত্যাগ করেন। মোগল শাসকদের পক্ষে এর চেয়ে বেশি ভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে?

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এখনও বাকি, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে মানসিংহের ছেলে জগৎ সিংহ বাংলায় যাওয়ার পথে আগ্রায় পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে মহাসিংহকে বাংলায় মানসিংহের অনুপস্থিতিতে সুবাদারের দায়িত্ব নেয়ার জন্য পাঠান হয়। মহাসিংহ তখন মাত্র অল্প বয়স্ক যুবক, তবুও তাঁকে তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আবুল ফজল কটাক্ষ করে বলেন, রাজা মানসিংহ তাঁর বোকামির ফলে মনে করেন যে বাংলা শাসন করা অত্যন্ত সোজা কাজ, তাই তিনি আজমীরে থেকে (বাংলা শাসনের) দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১১৬]

১৬০০ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহের অনুপস্থিতিতে উড়িষ্যা সীমান্তে আফগানরা আবার বিদ্রোহ করে এবং গোলযোগ শুরু করে। উসমান (ইনি বুকাইনগরের উসমান নন) এবং সজাওয়াল নামক দুইজন আফগান সেনাপতি এই গোলযোগের সূত্রপাত করে। মহাসিংহ এবং তাঁর পিতৃব্য প্রতাপ সিংহ তাদের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু ভদ্রকে এক যুদ্ধে মোগল বাহিনী পরাজিত হয়। আবুল ফজল বলেন, যদিও বাংলা হাতছাড়া হয়নি, তবুও উত্তর উড়িষ্যার কিছু অংশ শত্রুরা দখল করে নেয়।[১১৭] বখশী আবদুর রাজ্জাক মামুরী শত্রুদের হাতে বন্দী হয়। রাজা মানসিংহ সংবাদ পেয়ে বাংলার দিকে অগ্রসর হন। তিনি রোটাস দুর্গে অবস্থান করে প্রস্তুতি কাজ সম্পন্ন করেন এবং সেখান থেকেই শত্রুদের বিরুদ্ধে গমন করেন। শেরপুর আতাই-এর নিকটে উভয় পক্ষ সম্মুখীন হয় এবং উভয় পক্ষ দুর্গ নির্মাণ করে। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। সৌভাগ্য ক্রমে শত্রুপক্ষের একটি হাতি গুলিবিদ্ধ হয়ে তাদেরই দিকে ছুটে যায় এবং সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। মানসিংহ এই সুযোগে শত্রুদের পিছু হটিয়ে দেন এবং চার ক্রোশ পর্যন্ত তাদের তাড়া করে নিয়ে যান। আগের বারের

Edited by Ripon Sarkar

যুদ্ধে (মহাসিংহ কর্তৃক পরিচালিত) বখশী আবদুল রাজ্জাক মামুরী শত্রুদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, তিনিও ছাড়া পেয়ে যান। তাঁকে যাঁর নিকট বন্দী রাখা হয়েছিল, তিনি এই যুদ্ধে নিহত হলে আবদুল রাজ্জাক সুযোগ বুঝে পালিয়ে আসেন।[১১৮] কিন্তু মানসিংহ সেখান থেকে ফিরে না এসে আফগানদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তিনি ভূষণা এবং যশোরের নিকট মহেশপুরে যান, ঐ এলাকা জলাভূমিতে পূর্ণ হওয়ায় মানসিংহ সেখানে দক্ষ সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং আফগানদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে বলেন। তিনি নিজে দেশের উন্নতি বিধানের প্রতি নজর দেন। এখানে আবুল ফজলের বক্তব্য পরিষ্কার নয়। তিনি বলেন ঃ[১১৯]

> When Rajah Man Singh gained victory, he pursued the enemy, and did not turn back till he came to Maheshpur near Bushna and Jessore. The Afghans chose a strong position. As on every side there were marshes and it was impossible to reach the place easily, Rajah appointed active people (to watch them) and addressed himself to opening out the country, and increasing cultivation.

প্রথমে যুদ্ধ হয় ভদ্রকে। ভদ্রক বাংলার সীমান্তে উড়িষ্যায় অবস্থিত। আইন-ই-আকবরীতে ভদ্রক উড়িষ্যার একটি সরকার।[১২০] মহাসিংহ ও প্রতাপ সিংহ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সংবাদ শুনে মানসিংহ নিজে এসে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং আফগানদের বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় শেরপুর আতাই নামক স্থানে। শেরপুর আতাই সরকার শরীফাবাদের একটি মহাল।[১২১] সরকার শরীফাবাদ মোটামুটিভাবে বর্তমান বর্ধমান নিয়ে গঠিত। সুতরাং এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয় বর্ধমানে। এই যুদ্ধে আফগানরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মানসিংহ তাদের তাড়া করে ভূষণা এবং যশোরের নিকটে মহেশপুরে যান। দেখা যায় আফগানরা উড়িষ্যার অভ্যন্তরে আশ্রয় না নিয়ে খুলনার দিকে চলে যায় এবং খুব সম্ভব উপকূলীয় জলাভূমিতে আশ্রয় নেয়। মহেশপুর যশোরের নিকটে নয়, ভূষণার ত নয়ই, মহেশপুর খুলনার নিকটে। তবে যশোর এবং ভূষণা তখন প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলে আবুল ফজল ভূষণা এবং যশোরের নিকটে বলেছেন। জলাভূমি হওয়ায় মানসিংহ আর অগ্রসর হতে না পেরে দক্ষ সেনাপতি নিযুক্ত করে নিজে "addressed himself to opening out the country and increasing cultivation." আমরা এর অর্থ করেছি যে মানসিংহ দেশে শান্তি স্থাপনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন।

স্যার যদুনাথ সরকার শেরপুর আতাই এর যুদ্ধকে পূর্ব বাংলার ভাটি এলাকায় নিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন ঃ[১২২]

> He (Man Singh) hastened east from Allahabad, halted for some weeks at Rohtas to make preparations, and then passed on to face the rebels in East Bengal. Near Sherpur Atia in a single field he routed them with heavy loss (12th February, 1601), pursued them for eight miles and rescued his captive Bakhshi from threatened death at their hands.

শেরপুর আতাই এর নাম স্যার যদুনাথকে বিভ্রান্ত করেছে বলে মনে হয়, তিনি শেরপুর আতাইকে শেরপুর আতিয়া মনে করে যুদ্ধক্ষেত্র পূর্ব বাংলায় নির্ধারণ করেছেন।

Edited by Ripon Sarkar

আতিয়া পরগণা ময়মনসিংহের ৬৩৫ বর্গমাইল এবং ঢাকার মাত্র ৩৭১ একর নিয়ে গঠিত।[১২৩] কিন্তু স্যার যদুনাথ লক্ষ্য করেননি যে সরকার শরীফাবাদে শেরপুর আতাই মহাল রয়েছে। তাছাড়া মহাসিংহ আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হল ভদ্রক-এ আর মানসিংহ যুদ্ধ করতে ছুটে আসেন ঢাকা ময়মনসিংহে, তা কেমন করে হয়? সবচেয়ে বড় কথা, বখশী আবদুল রাজ্জাক মামুরী ভদ্রকের যুদ্ধে বন্দী হন এবং শেরপুর আতাই এর যুদ্ধে মুক্তি পান। স্যার যদুনাথের বক্তব্য সত্য হলে বলতে হয় যে বখশী আবদুর রাজ্জাক উড়িষ্যার আফগানদের হাতে বন্দী হয়ে ঢাকা-মমেনসিংহের বার-ভূঁঞাদের হাত থেকে মুক্তি পান। অতএব স্যার যদুনাথ নিশ্চিতভাবে নামের পরিচিতি নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।[১২৪]

উড়িষ্যার আফগানদের দমনের পরে মাসুম খান কাবুলীর ছেলে শুজা এবং লাচিন কাকশালের ছেলে (নাম নেই) আত্মসমর্পণ করেন। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে ইসলাম খান চিশতি রাজমহল থেকে সম্রাটের আদেশে মাসুম খান ও লাচি খানের ছেলেদের সম্রাটের দরবারে পাঠান। মাসুম খানের এই ছেলে শুজা শাহজাহানের সময়ে গজনীর থানাদার ছিলেন এবং আসদ খান উপাধি লাভ করেন। মাসুম খানের আর এক ছেলে মিরযা মুমিন বিদ্রোহী থেকে যান এবং বার-ভূঁঞাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকেও যুদ্ধ করেন। মাসুম খান কাবুলীর মৃত্যুর পরে মুজফফর খানের এক ক্রীতদাস তুরানীদের একত্রিত করে বেশ ক্ষমতাবান হয় এবং বাজ বাহাদুর নাম ধারণ করেন, তিনিও আত্মসমর্পণ করেন। রাজা মানসিংহ তাদের সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেন এবং আবুল ফজল বলেন, "ঐ দেশে বিদ্রোহ বন্ধ হয়ে যায়।"[১২৫] কিন্তু কোন অঞ্চলে বিদ্রোহ বন্ধ হয়, তার কোন উল্লেখ নেই।

১৬০২ খ্রিস্টাব্দে মানসিংহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধে লিপ্ত হন। প্রথমে তিনি ঢাকার যান এবং অনেক ভাল কথা বলে শ্রীপুরের কেদার রায়কে বশে আনেন। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে জালাল খান কাহ্‌করা অনেক সৈন্য সংগ্রহ করে আক্রা এবং মালদহ আক্রমণ করে এবং ব্যবসায়ী ও জনগণের উপর অত্যাচার করতে থাকে। আক্রা সরকার জান্নাতাবাদ (বা সরকার লখনৌতির) অধীনে একটি মহাল এবং মালদহে অবস্থিত।[১২৬] মালদহ শহর এবং আক্রা কাছাকাছি অবস্থিত, কারণ আইন-ই-আকবরীতে আক্রাকে শহরতলী বলা হয়েছে। মহাসিংহ তখন ঘোড়াঘাটে অবস্থান করছিলেন, মানসিংহ (বোধ হয় তখন ঢাকাতে ছিলেন) খাজা বাকের আনসারীকে মহাসিংহের নিকট পাঠিয়ে বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে গমনের আদেশ দেন। মহানন্দা[১২৭] নদীর উভয় তীরে উভয় বাহিনী অবস্থান নেয়। জালাল খান পাঁচ হাজার পদাতিক এবং পাঁচ শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মহাসিংহ ঘোড়া নিয়ে নদী অতিক্রম করেন; নদীতে পানি বেশি থাকায় অনেক সৈন্য নদী পার হওয়ার সময় মৃত্যু বরণ করেন। মহাসিংহ ভ্রূক্ষেপ না করে শত্রুদের আক্রমণ করে পরাজিত করেন। এর পরে মহাসিংহ কাযী মুমিনকে শাস্তি দেবার উদ্দেশে পূর্ণিয়া যান। কাযী মুমিন এই স্থানে অনেক সৈন্য যোগাড় করে গোলযোগ সৃষ্টি করেন এবং কুশী নদীর তীরে দুর্গ নির্মাণ করেন। মোগল সৈন্যরা অগ্রসর হলে কাযী মুমিন পলায়ন করে এক দ্বীপে আশ্রয় নেন কিন্তু সেখানেও মোগল সৈন্যরা তাঁকে তাড়া করে। কিন্তু কাযী মুমিনের অবস্থান জঙ্গলাকীর্ণ হওয়ায় মোগল সৈন্যরা সকলে একসঙ্গে দ্বীপে যেতে অসমর্থ হয়। এই

Edited by Ripon Sarkar

সুযোগে কাযী মুমিন মোগলদের এক ছোট অগ্রবর্তী দলকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। মুরাদ বেগ উজবেগ এবং নূর-উদ-দীন মুহাম্মদ নামক দুইজন সেনানায়ক অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন, শেষোক্ত ব্যক্তি নিহত হয়। মোগল বাহিনী পরাজয়ের মুখে, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ কাযী মুমিন আহত হয়ে পড়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে।[১২৮]

এই সময়ে (১৬০২ খ্রিস্টাব্দে) ভাটি অঞ্চলে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের নেতা খাজা উসমান। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি উড়িষ্যার কতলু লোহানীর উজীর খাজা ঈসার ছেলে। স্মরণীয় যে উড়িষ্যার সুবাদার থাকাকালে রাজা মানসিংহ খাজা উসমান এবং আরও কয়েকজনকে উড়িষ্যা থেকে তাড়িয়ে দেন। খাজা উসমান ময়মনসিংহের বুকাইনগরে দুর্গ নির্মাণ করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হন; বাজ-বাহাদুর কালমাক সেখানে (ঠিক কোন স্থানে তার উল্লেখ নেই) মোগল থানাদার ছিলেন এবং অল্প কিছু দিন আগে মানসিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাজ-বাহাদুর কালমাক পালিয়ে ভাওয়ালে চলে আসেন। রাজা মানসিংহ সংবাদ পেয়ে ভাওয়ালের দিকে যাত্রা করেন এবং এক দিন এক রাত্রির মধ্যে ভাওয়ালে পৌঁছেন। মনে হয় মানসিংহ তখন ঢাকায় ছিলেন এবং ঢাকা থেকে ভাওয়ালে আসেন। বনার[১২৯] নদীর তীরে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। আফগানরা পরাজিত হয়, তাদের অনেক সৈন্য নিহত হয় এবং অনেক নৌকা মোগলদের হস্তগত হয়। বাজ বাহাদুর কালমাককে আবার স্বীয় থানায় প্রতিষ্ঠিত করে রাজা মানসিংহ ঢাকায় ফিরে আসেন। কিন্তু যুদ্ধ তখন সারা ভাটিতে বিস্তার লাভ করেছে; মানসিংহ তখন একদল সৈন্যকে ইছামতি নদী অতিক্রম করে ঈসা[১৩০] (আসলে মুসা খান) এবং বিক্রমপুর ও শ্রীপুরের[১৩১] কেদার রায়ের বিরুদ্ধে পাঠান। আফগানরা (খাজা উসমান) ঈসা খানের ছেলে দাউদের[১৩২] সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে এবং সকল ফেরী চলাচল বন্ধ করে দেয়। মোগল বাহিনীর নদী অতিক্রম করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে রাজা মানসিংহ ঢাকা থেকে শাহপুরে যান।[১৩৩] ইছামতি পার হয়ে যাদের আগে পাঠান হয়েছিল তাদের সাহায্যার্থে মানসিংহ আর একদল সৈন্য পাঠান। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন যে যাদের আগে পাঠান হয়েছে তাদের দ্বারা শত্রুদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়, তাই তিনি নিজে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ফেরী বন্ধ থাকায় মানসিংহ নিজে এবং সৈন্যরা হাতির সাহায্যে ইছামতি নদী পার[১৩৪] হন। শত্রুরা হতবাক হয়ে যায় এবং পালিয়ে যায়। মানসিংহ তখন বুরহানপুরী এবং তরাহ্[১৩৫] যান, সেখানে স্থানীয় জমিদার শের খান (বা শের গাজী) তাঁর সঙ্গে দেখা করে আনুগত্য প্রকাশ করেন। সেখান থেকে মানসিংহ বিক্রমপুর ও শ্রীপুরে চলে যান। দাউদ এবং অন্যান্য আফগানরা সোনারগাঁও-এ চলে যান। মানসিংহ সন্তুষ্ট চিত্তে ঢাকায় চলে যান।

১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের মগ রাজা এক বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে আসেন এবং সোনারগাঁও-এর দিকে যাত্রা করেন এবং ত্রিমোহনী[১৩৬] দুর্গ আক্রমণ করেন। এখানে সুলতান কুলী কালমাকে মুজফফর খানী[১৩৭] আরাকানীদের বাধা দেন এবং শত্রুরা পরাজিত হয়। অতঃপর তিনি দুর্গে যান। দুর্গে কাশ্মিরীদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে তাঁর কিছু সৈন্য নিহত হয়। তিনি নিজে আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেন। রাজা মানসিংহ এই সংবাদ পেয়ে ইবরাহীম বেগ আতকা, রঘুদাস, আসকরণ এবং

Edited by Ripon Sarkar

দলপত রায়কে পাঠান। শত্রুরা থানা আক্রমণ করতে থাকে এবং বেশ কয়েকবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। শেষে শত্রুরা তাদের নৌকায় আশ্রয় নেয়। মোগল সৈন্যরা শত্রুদের কয়েকটি নৌকাও ডুবিয়ে দেয়। এই অবস্থায় কেদার রায় আরাকানীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং বিক্রমপুরের শ্রীনগরে মোগল থানা আক্রমণ করেন। রাজা মানসিংহ তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠান। বিক্রমপুরের[১৩৮] নিকট ভীষণ যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে শত্রুরা পরাজিত হয় এবং অনেকেই নিহত হয়। কেদার রায় নিজে যুদ্ধে আহত হয়ে বন্দী হন। তাঁকে মানসিংহের নিকট নিয়ে যাওয়া হয় এবং মানসিংহের নিকট পৌছার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মানসিংহ ভাওয়ালে চলে আসেন এবং খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু খাজা উসমানও পালিয়ে যান। মানসিংহ বিভিন্ন থানার প্রতিরক্ষার জন্য থানাদার নিযুক্ত করে ঢাকায় ফিরে যান। উপরে বলা হয়েছে যে মোগল সেনানায়ক সুলতান কুলী কালমাক কাশ্মিরীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, এই কাশ্মিরী কারা সেই বিষয়ে কেউ আলোকপাত করেনি। আমার মনে হয় শব্দটি কাশ্মিরী না হয়ে ফিরিঙ্গী হবে। আরাকানের রাজার সঙ্গে পর্তুগীজ বা ফিরিঙ্গীদের মৈত্রী ছিল, প্রায় সময় আরাকানের মগ এবং ফিরিঙ্গীরা একযোগে বাংলায় আক্রমণ চালাত।

মানসিংহ যখন দেখেন যে সর্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়েছে, তিনি বিশ্রাম নেয়ার জন্য নাজিরপুর যান।[১৩৯] ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে আকবর বুঝতে পারেন যে তাঁর মৃত্যু নিকটবর্তী; তিনি তাঁর আত্মীয়-বন্ধু সকলকে নিজের কাছে ডেকে পাঠান। মানসিংহও অনেক হাতি নিয়ে রাজধানীতে চলে যান এবং আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকেন। ১৫ই অক্টোবর, ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।[১৪০]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে সম্রাট আকবরের আমলে বাংলার শুধু একাংশে মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল অধিকৃত এলাকা পশ্চিমে রাজমহল, পূর্বে বগুড়ার শেরপুর মুর্চা, উত্তরে ঘোড়াঘাট, দক্ষিণে সাতগাঁও এবং বর্ধমান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঘোড়াঘাট এবং শেরপুর মাঝে মাঝেই মোগল বিদ্রোহীরা আক্রমণ করত, কিন্তু মোগল অধিকার অক্ষুন্ন ছিল বলেই মনে হয়। উড়িষ্যার আফগানেরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত, তাদের বিরুদ্ধে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে, তবে বর্ধমানে এবং সাতগাঁও এলাকায়ও মোগল অধিকার অক্ষুণ্ন ছিল বলে ধারণা করা যায়। এই সকল এলাকায় বিদ্রোহীরা ছিল এককালের মোগল সেনাপতি, মাসুম খান কাবুলী এবং কাকশালরা। এমনকি তারা দুই বৎসর বিদ্রোহী সরকার গঠন করে শাসন চালায়, এই দুই বৎসর (১৫৮০-১৫৮২) বাংলায় আকবরের কোন কর্তৃত্বই ছিল না। বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের মধ্যে যশোরের শ্রীহরি বা প্রতাপাদিত্যের বিদ্রোহের কোন কথা নেই। মনে হয় যশোর সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল। শ্রীহরি ও বসন্ত রায় যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে মোগল পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন, তাতে মনে হয় মোগলরাও শ্রীহরিকে সুনজরে দেখত। ভূষণার কথা আছে খাজা উসমানের বাংলাদেশে তৎপরতাকে কেন্দ্র করে। ভূষণার জমিদার মুকুন্দরায়ও মনে হয় মোগলদের প্রতি অনুগত ছিলেন। অন্যান্য ভূঁঞা বা জমিদারদের সম্বন্ধে কোন উল্লেখ আকবরনামায় নেই। বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বির মোগলদের অনুগত ছিলেন। ভাটি ছাড়া অন্যান্য এলাকার ভূঁঞা জমিদারদের সম্পর্কে আকবরনামায় বিশেষ কোন উল্লেখ নেই। মনে হয় তারা মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করে স্ব-স্ব জমিদারীতে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকে। মোগল সুবাদার মোগল বিদ্রোহীদের

Edited by Ripon Sarkar

দমনের জন্য এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্যান্য জমিদারের প্রতি দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি, মৌখিক আনুগত্যেই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মোগল বাহিনী বাংলাদেশে প্রধানত মোগল বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। মাত্র চার বার ভাটি আক্রমণে বিশেষ করে বার-ভূঁঞা প্রধান ঈসা খানকে দমন করার চেষ্টা করা হয়। প্রথমবার সুবাদার খান জাহান ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভাটির কেন্দ্রস্থল কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম পর্যন্ত যান; প্রথম দিকে জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত খান জাহান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে যান। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খানের ভাটি অভিযানও ব্যর্থ হয়; প্রধানত মাসুম খান কাবুলীকে ত্যাগ করতে ঈসা খানকে বাধ্য করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয়। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে শাহবাজ খান আবার ভাটি আক্রমণ করেন; যদিও আবুল ফজল এ অভিযানকে সফল বলে অভিহিত করেছেন, আমরা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেছি। আবুল ফজলের কথিত সাফল্য সত্ত্বেও মাসুম খান কাবুলী বা ঈসা খান নিরাপদে স্ব-স্ব স্থানে বহাল থাকেন। ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে রাজা মানসিংহ চতুর্থবারের মত তাঁর ছেলে দুর্জন সিংহের অধীনে এক সৈন্যবাহিনী ভাটি অভিযানে পাঠান। এবারে সম্পূর্ণ মোগল বাহিনী ধ্বংস হয়ে যায় এবং দুর্জন সিংহও নিহত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঈসা খানের জীবদ্দশায় রাজা মানসিংহ ভাটি আক্রমণে যাননি, অন্ততপক্ষে আকবরনামায় এরূপ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সুতরাং মানসিংহের সঙ্গে ঈসা খানের যুদ্ধ বা একক যুদ্ধ এবং মানসিংহের মান রক্ষার জন্য ঈসা খানের সম্রাটের দরবারে যাওয়া, সম্রাট কর্তৃক ঈসা খানকে মসনদ-ই-আলা উপাধি এবং অনেক ভূ-সম্পত্তি (বা বাইশ পরগণা) দেয়ার যে কাহিনী জেমস ওয়াইজ সংগ্রহ করেছেন বা পূর্ববঙ্গ গীতিকায় "দেওয়ান ইছা খাঁর পালায়" পাওয়া যায়, তার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। ঈসা খানের মৃত্যুর পরে রাজা মানসিংহ নিজে ভাটি যান এবং ঈসা খানের ছেলেদের ও অন্যান্য ভূঁঞাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন; এই সময়ের এক যুদ্ধে শ্রীপুরের কেদার রায় নিহত হন। এবারও জয়ের কথা বলা হলেও বার-ভূঁঞারা স্ব-স্ব অধিকারে বহাল থাকতে দেখা যায়।

সম্রাট আকবরের সময়ে নিম্নলিখিত কয়েকজন সুবাদার বাংলায় আসেনঃ

১। মুনিম খান, ১৫৭৪-১৫৭৫ (১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর স্বাভাবিক মৃত্যু)।
২। খান জাহান, ১৫৭৫-১৫৭৮ (১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর স্বাভাবিক মৃত্যু)।
৩। মুজফফর খান, এপ্রিল ১৫৭৯-১৫৮০ (১৯শে এপ্রিল ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে নিহত)।
বিদ্রোহী সরকার ১৫৮০-১৫৮২
৪। খান আযম, এপ্রিল ১৫৮২-মে ১৫৮৩
উজীর খান দায়িত্বে থাকেন।
৫। শাহবাজ খান, অক্টোবর ১৫৮৩-মার্চ ১৫৮৫ (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৫৮৪ বিহারে থাকেন) সাদিক খান দায়িত্বে থাকেন।
৬। শাহবাজ খান, জুন, ১৫৮৬-নবেম্বর, ১৬৮৬

Edited by Ripon Sarkar

৭। উজীর খান, নবেম্বর ১৫৮৬-১৫৮৭ (১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বাভাবিক মৃত্যু)।

৮। সাইদ খান, আগস্ট ১৫৮৭-মে ১৫৯৪

৯। রাজা মানসিংহ, মে ১৫৯৪-আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত।

এঁদের মধ্যে প্রথম দুজন এবং উজীর খান বাংলাদেশেই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, ৩নং বিদ্রোহীগণ কর্তৃক নিহত হন, ৬নং শাহবাজ খানের পদাবনতি হয়। ৪নং খান আযম কোনক্রমে তেলিয়াগড় বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত করে সম্রাটের অনুমতি নিয়ে অন্যত্র বদলী হয়ে যান, বাংলায় আসার সাহস করেননি। রাজা মানসিংহের বড় ছেলে জগৎ সিংহ আফগানের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন, বিষ্ণুপুরের অনুগত রাজা বীর হাম্বীর তাঁকে উদ্ধার না করলে তিনি শত্রুদের হাতে নিহত হতেন। রাজার আর এক ছেলে হিম্মত সিংহ বাংলাদেশেই কলেরায় মারা যান এবং অন্য ছেলে দুর্জন সিংহ ভাটির বার-ভূঁঞাদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। যে বাংলাদেশে মোগলদের এত সৈন্য ক্ষয় হয়, এতজন সুবাদার ও সেনাপতি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, সেই বাংলাদেশ আবুল ফজলের ভাষায় সত্যিই বলগাকপুর।

টীকা

১। খান জাহানের জীবন কাহিনীর জন্য দেখুন, আইন, ১ম, ৩৪৮-৬১।

২। আকবরনামা, ৩য়, ২২৮।

৩। ঐ।

৪। ঐ, ২৮৮-২২৯।

৫। ঐ, ২৩০।

৬। এই সময়ে রাজমহলের নাম আক্‌মহল বা আগ্‌মহল। রাজমহল জেলা গঙ্গা নদীর তীরে উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চল্লিশ মাইল বিস্তৃত। রাজমহল শহর গৌড়ের বিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রাজা মানসিংহ রাজমহল শহর প্রতিষ্ঠা করেন, আলোচ্য ঘটনার প্রায় পনর বছর পরে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে এবং সম্রাটের নামানুসারে এর নাম দেন আকবরনগর। আবদুল লতীফের বিবরণে এর নাম আগমহল, অর্থ সম্মুখবর্তী স্থান। বাংলার সুলতানেরা বিহারে যাওয়ার পথে এই স্থানে প্রথম বিশ্রাম নিতেন এবং সে জন্য এর নাম হয় আগ্‌মহল বা সামনের বিশ্রাম স্থান। পূর্ব বাংলা বা উড়িষ্যার দিকে তাদের একটি পাচ মহল বা পেছনের বিশ্রামস্থলও ছিল। আবদুল লতীফ আরও বলেন যে স্থানীয় লোকেরা কৌতুক করে ইহাকে "আগ্‌মহল" বলত, এর অর্থ যে স্থান সর্বদা আগুনে পুড়ে যায়। এই স্থানের ঘর-বাড়িগুলো হোগলা এবং খড় দ্বারা তৈরি হত বলে প্রায় এগুলোতে আগুন ধরে যেত। (জার্নাল অব দি বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি, ভল্যুম ৫, ১৯১৯, ৬০১) হেনরী বেভেরীজ আকবরনামার অনুবাদে আক্‌মহল পড়েছেন, আক্ তুর্কী শব্দ, "আক্ মহল" অর্থ সাদা দালান। (আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ২৩০)। এই পাঠ বা এই অর্থ বোধ হয় রাজমহলের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়।

৭। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দেখুন আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ২য় সংস্করণ, ৩৮৩-৩৮৪।

৮। আকবরনামা, ৩য় খণ্ড, ৩২৭-২৮।

৯। ঐ, ৩৭৬। গোয়াস মুর্শিদাবাদে অবস্থিত। HB II. 195.

Edited by Ripon Sarkar

১০। আবুল ফজল বলেন যে মন্ত্রির নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মন্ত্রিকে হত্যা করা হয়। তিনি বলেনঃ "Khan Jahan who wanted to send him to annihilation, put him to death, ostensibly in order that he might be punished for the charge of fraud which was brought against him but also that the properties seized might remain concealed." (আকবরনামা, ৩য় ৩৭৬, আরও দেখুন HB II, 195.)

১১। আকবরনামা, ৩য়, ৩৪৯।

১২। BPP, vol. XXXVIII, plate, coin No. I.

১৩। ঐ, ৩।

১৪। আকবরনামা, ৩য়, ১৬৯, ১৭০।

১৫। আইন-ই-আকবরীতে ঘোড়াঘাট একটি সরকার, এর অধীনে ৮৪টি মহাল। এই সরকার দক্ষিণ রংপুর, দক্ষিণ-পূর্ব দিনাজপুর এবং উত্তর বগুড়া নিয়ে গঠিত ছিল। (আইন, দ্বিতীয়, ১২৮, ১৪৮-৪৯) মুসলমান আমলে গোড়া থেকে ঘোড়াঘাট একটি গুরুত্বপূর্ণ সেনা-ছাউনিতে পরিণত হয়। বর্তমানে ঘোড়াঘাট দিনাজপুর জেলায়।

১৬। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৬-৩৭৮।

১৭। ঐ, ৩য়, ৩৭৭, টীকা ১।

১৮। J. J. A. Campos: *History of the Portuguese in Bengal*, 248.

১৯। ঢাকা রিভিউ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৭, ৩২৬-২৭।

২০। শাহজাহানের আমলের মসজিদের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। শয়খ সিকন্দর পুত্র শয়খ সাদী মসজিদখানি ১০৬২ হিজরী (১৬৫২ খ্রিঃ) সনে নির্মাণ করেন। (JASB, V, New Series, 1909, 373-374.)

২১। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৬।

২২। মেহেরকুল বর্তমান কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত। এখানে ত্রিপুরা রাজ্যের একটি দুর্গ ছিল।

২৩। রাজমালা, ৩য়, ১৫-১৬।

২৪। আকবরনামা, ৩য়, ৩৭৭।

২৫। BPP, vol. XXXVIII, 29.

২৬। আকবরনামা, ৩য়, ৩৮১।

২৭। জে. এ. এস. বি. ১৮৭৪, ৩৩১।

২৮। BPP, XXXVIII, 29.

২৯। আকবরনামা, ৩য়, ৩৮৬।

৩০। ঐ।

৩১। চৌপর খেলা দুদু খেলার মত, দুদুর ছকের মতই চৌপর খেলার ছক। সম্রাট আকবর নিজেও এই খেলায় অংশ নিতেন। অর্থ বাজী রেখে এই খেলা হত। আবুল ফজল চৌপর খেলার দুন্দর বিবরণ দিয়েছেন। দেখুন, আইন, ১ম, ৩১৫-১৬।

৩২। মুজফফর খান তুরবতীর জীবন কাহিনীর জন্য দেখুন, আইন, ১ম, ৩৭৩-৭৫।

৩৩। এইচ. বি. ২য়, ১৯৫-৯৬।

Edited by Ripon Sarkar

৩৪। মোগল অফিসারদের প্রত্যেকের মান বা মর্যাদা নির্ধারিত হত, একে বলা হত মনসব। প্রত্যেক মনসবের মান নির্দিষ্ট থাকত এবং এই মান দশ থেকে দশ হাজার পর্যন্ত হ্রাস বৃদ্ধি হত। সাধারণত যুবরাজরা উচ্চতম মনসব লাভ করত। পরবর্তীকালে মনসবের মান ত্রিশ হাজার পর্যন্ত উঠে।

৩৫। আইন, ১ম, ৪৮৫-৪৮৬।

৩৬। ঐ, ৪৬৮।

৩৭। ঐ, ৫০০।

৩৮। আকবরনামা, ৩য়, ৪২৭।

৩৯। ঐ।

৪০। HB II. 196.

৪১। আকবরনামা, ৩য়, ৪২৭-৪২৯। এটা আকবরনামার একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ না হলেও মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ।

৪২। যিয়া-উদ-দীন বরানী বলেছেন বলগাকপুর। বরানীঃ তারীখ-ই-ফীরুজশাহী, ৮২।

৪৩। ইংরেজি অনুবাদে "rose up in arms" অর্থ বিদ্রোহ করে। কিন্তু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাধা দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪৪। নেকড়ে বাঘকে কিছু খাবার দিয়ে সাময়িকভাবে সন্তুষ্ট করে যেমন কাজ সমাধা করা যায়, তেমনি আমার মনে হয় এখানেও তাই বলা হয়েছে। হৈ-চৈ কারীদের কিছু দিয়ে সন্তুষ্ট করে তারা রাজধানীর দিকে যাত্রা করে। একেই ইংরেজি অনুবাদে wolf's peace বলা হয়েছে যা বভনীতে insincere peace বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪৫। মোগল Law of escheat-এর অধীনে যে কোন কর্মকর্তার মৃত্যু হলে তাঁর সকল সম্পদ সম্রাট বাজেয়াপ্ত করতেন, সমস্ত সম্পদ সম্রাটের দরবারে পাঠাতে হত। সম্রাট ইচ্ছা করলে মৃত ব্যক্তির পুত্র কন্যাদের কিছু দিতেন এবং পুত্রদের যোগ্যতা মত চাকরি দিতেন।

৪৬। আকবরনামা, ৩য়, ৪৩৯।

৪৭। সুলতান আলা-উদ-দীন খলজী বলতেন যে সম্পদ এবং প্রাচুর্য মানুষকে বাজে চিন্তার সুযোগ দেয় এবং তারা বিদ্রোহের কথা চিন্তা করার সময় পায়। তাই তিনি অতিরিক্ত কর আরোপ করে জনগণকে দরিদ্র করে রাখতেন এবং এভাবে বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করেন।

৪৮। কেউ কেউ বলেন যে মুজফফর খানের জামাতা নিজামত খান খালদিন খানকে অপমান করেন। আকবরনামা, ৩য়, ৪৩০, টিকা ১।

৪৯। আকবরনামা, ৩য়, ৪৩১, টিকা নং ৩। আবুল ফজলও বোধ হয় তাই মনে করেন, কারণ তিনি বলেন, "Muzaffar Khan was bound by the order and made out the accounts from the beginning of the years and so instituted heavy demands." ঐ।

৫০। ঐ, ৪৩৪।

৫১। ঐ।

৫২। শব্দটি "সর-ই-খাড়ি"। আবুল ফজল বলেন যে এই খাড়িটি আসলে একটি খাল, প্রাচীনকালে খালটি কেটে নদীর সঙ্গে সংযোগ করা হয়। আকবরনামা, ৩য়, ৪৪৩। এই স্থানে প্রাচীন কাল থেকে অনেক যুদ্ধ হয়, হয়ত যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এই খালটি খনন করা হয়েছিল।

৫৩। আকবরনামার অনুসরণে যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

৫৪। আকবরনামা, ৩য়, ৪৪৫।

Edited by Ripon Sarkar

৫৫। বাংলার পরবর্তী মোগল সুবাদার খান আযম ১৫৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে নিযুক্তি পেলেও কর্মক্ষেত্রে এসে যোগদান করতে তাঁর বেশ কিছুদিন সময় লাগে। ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি তেলিয়াগড় পৌছেন।

৫৬। বাংলা বিহারে বিদ্রোহের একটি কারণও ছিল এই দাগ প্রথা।

৫৭। আইন, ১ম, ৩৪৩-৩৪৪। আমরা পরে দেখব যে খান আযম মিরযা আযীয কোকা মাত্র এক বছরের মধ্যে বাংলার সুবাদারী ছেড়ে দেন। তাঁর পরবর্তী জীবন বৈচিত্র্যময়, তাই এখানে সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে। আকবরের রাজত্বের ৩১তম বর্ষে (১৫৮৭ খ্রিঃ) খান আযম দাক্ষিণাত্যে নিযুক্তি পান এবং সেখানে যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ৩২তম বর্ষে আকবরের পুত্র মুরাদ তাঁর মেয়ে বিয়ে করেন, ৩৪তম বর্ষে খান আযম গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত হন। রাজত্বের ৩৯তম বর্ষে আকবর খান আযমকে দরবারে আসতে বলেন, কিন্তু দীন-ই-এলাহীর সদস্য হওয়ার ভয়ে তিনি দরবারে না এসে স্ত্রী পুত্র পরিজনসহ মক্কা শরীফে গমন করেন। মক্কায় তিনি বিস্তর অর্থ খরচ করেন; কথিত আছে যে তাঁকে অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য করা হয়। ফলে তিনি ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। আকবরের নিকট থেকে সান্ত্বনার বাণী পেয়ে খান আযম মক্কা থেকে ১০০৩ হিজরী (১৫৯৪-৯৫খ্রিঃ) সনে সম্রাটের দরবারে ফিরে আসেন এবং দীন-ই-এলাহীর সদস্যভুক্ত হন। ১০০৮ (১৫৯৯-১৬০০ খ্রিঃ) তিনি সম্রাট আকবরের সঙ্গে আসিরগড় দুর্গ জয় করতে যান, কথিত আছে যে তাঁর মধ্যস্থতায় খান্দেশের সুলতান বাহাদুর শাহ আসিরগড় দুর্গ আকবরের নিকট হস্তান্তর করেন। অল্প পরে আকবরের পৌত্র (জাহাঙ্গীরের পুত্র) খসরু খান আযমের এক মেয়ে বিয়ে করেন। আকবরের মৃত্যুর পরে খান আযম এবং রাজা মানসিংহ খসরুকে সিংহাসনে বসবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খান আযম কোন রকমে মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পান। কিন্তু জাহাঙ্গীরের হাতে একখানি চিঠি পৌছে। চিঠিখানি খান আযম খান্দেশের রাজা আলী খানের নিকট লিখেছিলেন এবং চিঠিতে আকবর সম্পর্কে নানারূপ ব্যঙ্গ কথা লিখিত ছিল। জাহাঙ্গীর খান আযমকে চিঠিখানি দরবারে সকলের সামনে পড়তে বলেন এবং খান আযমও বিনা দ্বিধায় তা পড়ে শুনান। জাহাঙ্গীর খান আযমের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে তাঁকে বন্দী করেন। রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে জাহাঙ্গীর খান আযমকে পুনরায় বহাল করেন। আরও উত্থান পতনের পরে খান আযম জাহাঙ্গীরের রাজত্বের উনিশতম বর্ষে ১০৩৩ হিজরী (১৬২৩-২৪ খ্রিঃ) সনে পরলোক গমন করেন। (আইন, ১ম, ৩৪৪-৪৭)।

৫৮। আকবরনামা, ৩য়, ৫৯২-৯৩।

৫৯। শামস-উদ-দীন আহমদঃ ইনসক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, ২৫৯-৬০।

৬০। আকবরনামা, ৩য়, ৫৯৪।

৬১। আইন, ১ম, ৪৩৬।

৬২। শাহবাজ খানের জীবনকথার জন্য দেখুন, আইন, ১ম, ৪৩৬-৪৪০।

৬৩। আইন-ই-আকবরীতে তাজপুর একটি সরকার, এটা বিহারের পূর্ণিয়ার পূর্বাংশ এবং দিনাজপুরের পশ্চিম অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। (আইন, ২য়, ১২৮)। সরকার তাঁড়ার একটি মহালের নামও তাজপুর, সরকার তাঁড়া রাজমহল মহকুমা, উত্তর পশ্চিম মুর্শিদাবাদ এবং বীর ভূমের উত্তর অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। (ঐ, ১৪২)। বেভেরীজ এই তাজপুরকে পশ্চিম দিনাজপুরের তাজপুরের সঙ্গে পরিচিতি দেন (আকবরনামা, ৩য়, ৬১৯, টীকা ১)। ব্লকম্যানও তাই মনে করেন এবং তিনি বলেন যে তাজপুর নামে কোন শহর ছিল না। (জার্নাল অব দি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৮৯৬, ১০৯)। কিন্তু এই তাজপুর সরকার তাঁড়ার মহাল এবং তাঁড়ার নিকটে অবস্থিত ছিল বলে মনে হয়, কারণ যুদ্ধের বর্ণনায় বলা হয় যে তরসুন খান তাজপুর দুর্গে আশ্রয় নিলে মাসুম খান কাবুলী তাঁড়ার ৭ ক্রোশের মধ্যে সম্পূর্ণ এলাকা লুঠ করেন।

৬৪। ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ বাংলাদেশে যমুনা নামে পরিচিত। "রেনেল পরবর্তী কোন সময়ে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ হয়েছে বর্তমানের যমুনা, বগুড়া-পাবনার পূর্ব সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনাই ব্রহ্মপুত্রের বিপুল জলরাশি গোয়ালন্দের কাছে

Eidited by Ripon Sarkar

পদ্মা-প্রবাহে এনে ফেলেছে।" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৮৬, ১২)

৬৫। সন্তোষ মূলে দিনাজপুর জেলার পরগণা, এটা আত্রেয়ী নদীর পূর্ব তীরে পত্নীতলা উপজেলার মাহিগঞ্জের সঙ্গে অভিন্ন, বর্তমানে নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্র নং ৭।

৬৬। শব্দটি 'দুবখশ'। বৈঠক নদীতে নৌকায় হয়, মাসুম খান কাবুলী নদীর অপর পার থেকে দুই-তৃতীয়াংশ নদী অতিক্রম করে আসেন। এর দ্বারা বোধ হয় বুঝান হয়েছে যে মাসুম খানই সমঝোতার জন্য বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।

৬৭। আকবরনামা, ৩য়, ৬২১। মাসুম খান ফরানখুদীও মাসুম খান কাবুলীর মত বিদ্রোহ করেন। তাঁরা উভয়ে বিহারে ছিলেন, মাসুম খান ফরানখুদী পরাজিত হয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁকে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়া হলেও বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাঁকে হত্যা করা হয়। (আকবরনামা, ৩য়, ৫৭৬-৭৭)।

৬৮। খান আযমের সময় জব্বারীর আনুগত্য প্রকাশের কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু পরে কবে আবার বিদ্রোহ করে বা তখন আনুগত্য স্বীকার করেছিল কিনা, সে সম্বন্ধে আকবরনামায় কিছুই পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় জব্বারী আনুগত্যের কথা বললেও তখন অনুগত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়নি।

৬৯। আকবরনামা, ৩য়, ৬২২। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে শেরপুর মূর্চা লিখিত থাকায় এই শেরপুরকে বগুড়ার শেরপুর রূপে চিহ্নিত করা যায়। ঐ, টীকা ৩।

৭০। এইচ. বি. ২য়, ২৩০।

৭১। বাহরিস্তান, ১ম, ৫৪।

৭২। রেনেলের মানচিত্রের প্রতিলিপির জন্য দেখুন, A. Karim: Dacca The Mughal Capital, মানচিত্র নং ২।

৭৩। বেভেরীজ যদিও এখানে ব্লখম্যান ও বীমস্ এর অনুসরণে খিজিরপুরের অবস্থান সঠিক নির্দেশ করেন, পরে বলেন ঃ "There is however, another Khizrpur (Kidderpur) marked on Rennell's map which is perhaps the one here meant. It is on the Brahmaputra to the N. of Dacca." (আকবরনামা, ৩য়, ৬৪৮, টীকা ৩)। কিন্তু বেভেরীজের এই ধারণা নির্ভুল নয়, কারণ আকবরনামায় শাহবাজ খানের যাত্রা পথে দেখা যায় যে তিনি তখনও লক্ষ্যা নদীতেই আছেন, ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত আসেননি, লক্ষ্যীর যে খিজিরপুরের পরেই কতরাব-এর উল্লেখ আছে। একটু পরেই দেখা যাবে যে কতরাবও লক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত।

৭৪। স্যার যদুনাথ সরকার কতরাব চিহ্নিত করার কোন চেষ্টাই করেননি (HB, II, 203)। নলিনীকান্ত ভট্টশালী রেনেলের ৬নং ফর্দের মানচিত্র অবলম্বনে যে চিত্র দিয়েছেন তাতে কতরাবকে খিজিরপুরের উল্টোদিকে চিহ্নিত করেছেন। তবে এই চিহ্নিতকরণ কতরাব এর প্রকৃত অবস্থানের মোটামুটি কাছাকাছি হয়েছে। ("BPP, vol. XXXVIII map of 22 parganas of Isa Khan) ভট্টশালী রায়দাস গজনানীর বাসস্থান কেতরব এর অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "I cannot find the name in the village Directory of the Dacca district. Villages with nearest sounding names are 'Katarab', about two miles north east from Ghorasal on the Tongi-Bhairabbazar Railway; and 'Kesraba' about 4 miles north -east of the well known village of Murapara on the Lakshya." (Ibid, 15 note 1). ভট্টশালী 'কেসরাব'কে যেখানে চিহ্নিত করেছেন, সেখানেই অধ্যাপিকা হাবীবা খাতুন চিহ্নিত কতরাব বা বর্তমান যাসুকখান।

মুঈনুল ইসলাম বোরাহ বাহরিস্তানের অনুবাদে কতরাব নিম্নরূপে চিহ্নিত করেন: "Katrabu is also called Katrabhu or Katrapur. It is situated on the river Lakhiya opposite Khizrpur, at present known as Katarab". (বাহরিস্তান, ২য়, ৮১৫)।

Edited by Ripon Sarkar

আরও পূর্ববর্তী লেখকদের মন্তব্য বেনরী বেভেরীজের নিম্নরূপ টীকা পাওয়া যায়ঃ "This name (Karabuh) is doubtful The Maasir in its account of Shahbaz K. II, 595 has Katrapur. I. O. Ms. 236 has Kashrabu and No. 235 has Katralu. Blochmann suggests Baktearpur. Possibly the ba of the text is part of the name and the word is Bikrampur. Or the name may be a corruption of Khatabazu in Sarkar Bazuha J. II. 139. or it may be Kerapur in Sarkar Sonargaon. J. II 138. In Rennel's map of the Ganges and Brahmaputra there is a place called Gorabue, marked near Ekdalla, which is probably the place in text. It was probably near the place called Doordoreah by Dr. Taylor, p. 112 of Topography of Dacca, and situated eight miles above Ekdalla, but Dorrdoreah was on the other side of the river. The name Karabuh recurs at p. 733, and there as here we have the variant Katrabuh. Now in Dr. Wise's paper Katrabo is mentioned, p. 211 as a place in Dacca where a branch of Isa's family still resides. It seems probable that this is the place meant by the text. Dr. Wise also in his supplementary paper, J. A. S. B. for 1875, p. 181, quotes Sebastien Manrique's mention of Catrabo as one of the twelve provinces of Bengal, and in the following page he says, "Catrabo is Katrabo, now a tappa on the Lakhya, opposite Khizrpur and which for long was the property of the descendants of Isa K..." (আকবরনামা, ৩য়, ৬৪৮, টীকা ৪)।

এই লেখকদের অনেকেই কতরাবকে খিজিরপুরের উল্টোদিকে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু আবুল ফজলের বর্ণনায়ও দেখা যায় যে কতরাব এবং খিজিরপুর কাছাকাছি নয়, বরং খিজিরপুর থেকে কতরাব কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। আবুল ফজল বলেন যে শাহবাজ খান খিজিরপুরে শিবির স্থাপন করেন। (Khizrpur became an Imperial camp)। শাহবাজ খান প্রথমে খিজিরপুরের নদীর দু তীরে দুটি দুর্গ অধিকার করেন, পরে সোনারগাঁও অধিকার করেন। তারপরে শাহবাজ খান কতরাব যান (They also reached Karabhu) (variation Katrabuh) সুতরাং কতরাব খিজিরপুরে নদীর অপর তীরে অত কাছাকাছি হতে পারে না।

৭৫। আমার মনে হয় মাসুমাবাদ মাসুম খান কাবুলীর নামানুসারে হয়নি, ঈসা খানের পৌত্র মাসুম খানের নামানুসারে হয়েছে। দিওয়ান বাড়ি নামও পরের বলে মনে হয়। ঈসা খানের উপাধি ছিল মসনদ-ই-আলা, মুসা খানের উপাধিও তাই। সুতরাং ঈসা খান এবং মুসা খানের সময়ে তাঁদের দিওয়ান উপাধি ছিল বলে মনে হয় না। আমরা পূর্বে বলেছি যে (প্রথম অধ্যায়) ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান প্রথম জীবনে বাংলার সুলতানের দিওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঈসা খানের মৃত্যু এবং মুসা খানের আত্মসমর্পণের পরে এবং বিশেষ করে মাসুম খান মোগলদের অধীনস্থ জমিদারে পরিণত হওয়ার পরে তাঁদের আর মসনদ-ই-আলা উপাধি ছিল না, তাই মনে হয় মাসুম খানের সময় থেকে পূর্বপুরুষ সোলায়মান খানের (কালিদাস গজদানীর) দিওয়ান উপাধিই তাঁরা গ্রহণ করেন। কতরাব নাম ঈসা খান এবং মুসা খানের সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল, মাসুম খানের সময় থেকে মাসুমাবাদ নামকরণের পরে মাসুমাবাদ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং কতরাব নাম আস্তে আস্তে বিস্মৃত হয়। শুধু ভূমি রেকর্ডে কতরাব নাম উল্লেখ থাকে, যার সাহায্যে অধ্যাপিকা হাবীবা খাতুন কতরাব সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে সমর্থ হন। মাসুমাবাদ গ্রামটি আমার পরিচিত। আমার এম. এ. পরীক্ষার পরে ফল প্রকাশের আগে ১৯৫১ সালে দশ মাস রূপগঞ্জ উপজেলার মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলে প্রথমে সহকারী শিক্ষক এবং পরে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকি। ঐ সময় খিজিরপুর, হাজীগঞ্জ, সোনাকান্দা, নবীগঞ্জ, সোনারগাঁও এবং হাতাব থেকে কালীগঞ্জ পর্যন্ত লক্ষ্যা নদীর উভয় তীরের গ্রামগুলিতে বেশ ঘোরাফেরা করি। 'ব' অন্তযুক্ত গ্রামগুলি যেমন হাতাব, পেরাব, তারাব, পোড়াব ইত্যাদিও

Eidited by Ripon Sarkar

দেখেছি। জানতাম এলাকাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক, কিন্তু কতরাবো যে এখানেই ছিল তা কোন সময় মনে হয়নি। মাসুমাবাদের দুর্গের যে চিত্র অধ্যাপিকা হাবীবা দিয়েছেন তাও দেখেছি। তাই অধ্যাপিকা হাবীবার প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ১৯৮৮ সালে সার্ক ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান করতে ঢাকা গেলে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তাঁর নানা বাড়ি মাসুমাবাদের কাজী বাড়ি, মরহুম মওলানা এলাহী বখশ তাঁর নানা; তিনি বুড়াপাড়া হাই স্কুলে আমার সহকর্মী ছিলেন এবং ঐ বছরই (১৯৫১) ইন্তেকাল করেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা, ধর্মপরায়ণ এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক ছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পরে জমিজমা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিলে অধ্যাপিকা হাবীবা খাতুন জমির দলিলপত্র খুঁজাখুজি করেন এবং ঐভাবেই তিনি কতরাবর পরিচিতি পেয়ে যান। যে কতরাবর পরিচিতি যুগ যুগ ধরে খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদের বিভ্রান্ত করেছে, তার সমাধান দেয়ার জন্য অধ্যাপিকা হাবীবা খাতুন অবশ্যই কৃতিত্বের অধিকারী।

৭৬। জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ভল্যুম ৩১, নং ২, ডিসেম্বর, ১৯৮৬, ৩৭-৪৯।

৭৭। বেভেরীজ মনে করেন যে, এই শেরপুর মানে শেরপুর ফিরিঙ্গী, যা বিক্রমপুর বা রালফ ফিচ-এর শ্রীপুরের সঙ্গে অভিন্ন (আকবরনামা, ৩য়, ৬৭২, টীকা ২) কিন্তু বেভেরীজের এই ধারণা ভুল। মাসুম খান কাবুলী মুন্সীগঞ্জে থাকলে, রাজধানী তাঁড়া দখলে উজীর খানের ভয় করার কি কারণ থাকতে পারে? দ্বিতীয়ত, মাসুম খান কর্তৃক শেরপুর দখলের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীরা তাঁড়ার ১২ ক্রোশ দূরে মালদহ দখল করার কথাও বলা হয়েছে, সুতরাং এই শেরপুর মালদহ এবং তাঁড়ার নিকটস্থ শেরপুর, দূরবর্তী আরও যে কয়েকটি শেরপুর আছে সেগুলি নয়।

৭৮। আকবরনামায় যমুনা নদী, কিন্তু যমুনা নদী অনেক দূরে আর শাহবাজ খান সরেজমিনে যাত্রা শুরু করেছেন। সুতরাং আমরা একে গঙ্গার সঙ্গে চিহ্নিত করি। বেভেরীজও তাই মনে করেন। তিনি বলেন : "This is apparently the Ganges and not the Janai, or What is now known as Brahmaputra." (আকবরনামা, ৩য়, ৬৭৩, টীকা নং ১)

৭৯। আকবরনামা, ৩য়, ৬৭৩।

৮০। বেভেরীজ শাহজাদপুরকে সরকার জান্নাতাবাদের (লখনৌতির) শাহজাদপুর মহালের সঙ্গে চিহ্নিত করেন। (আকবরনামা, ৩য়, ৬৭৪, টীকা নং ৮)। স্যার যদুনাথ সরকার শাহজাদপুরকে পাবনার শাহজাদপুরের সঙ্গে চিহ্নিত করেন (HB II, 204) মনে হয় স্যার যদুনাথের অভিমত গ্রহণযোগ্য।

৮১। আকবরনামা, ৩য়, ৬৯৩।

৮২। বেভেরীজ বলেন: "... Trimohini, which, I presume, is another from or Tribeni, mohini, i. e. enchantment, standing for a lock or braid of hair. I think that the Trimohini must be Tribeni in the Hooghly district, and which is on the Bhagirathi. It is a well known place of pilgrimage, and is considered to be the place where the Ganges, Jumna and Saraswati join. The Sakni of the text is probably shakti, i.e. power, and another name for the Saraswati, which was regarded as the power of Brahma." (আকবরনামা, ৩য়, ৬৯৩, টীকা নং ৫)। শক্তির দ্বারা সরস্বতীকে বুঝান যাবে কিনা সন্দেহজনক, কারণ সরস্বতী শক্তির দেবী নয়।

৮৩। HB II, p. 204.

৮৪। আকবরনামা, ৩য়, ৬৫৩।

৮৫। রেনেলের মানচিত্র, বর্গ নং ১৬। আরও দেখুন HB II, 253.

৮৬। ঐ।

৮৭। ট্যাভারনিয়র তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে যাত্রাপুরের ত্রিমোহনীর উল্লেখ করেছেন। ট্যাভারনিয়রের ভ্রমণ বৃত্তান্ত, ফিলিপ কর্তৃক অনূদিত, ১০২।

৮৮। আকবরনামা, ৩য়, ৬৯৬।

৮৯। ঐ।

৯০। ঐ।

৯১। ঐ, ৬৯৬-৯৭।

৯২। ঐ, ৬৯৭।

৯৩। মঙ্গলকোট নদী দ্বারা অজয় নদীকে বুঝান হয়েছে।

৯৪। আকবরনামা, ৩য়, ৭০১।

৯৫। ঐ, ৭২১।

৯৬। ঐ, ৭২২।

৯৭। HB II. 205.

৯৮। শায়েস্তা খান ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম জয় করার আগে চট্টগ্রাম কখনও মোগল অধিকারে ছিল না।

৯৯। আকবরনামা, ৩য়, ৭৭৯।

১০০। সাইদ খানের জীবন কাহিনীর জন্য দেখুন, আইন, ১ম, ৩৫১-৫২।

১০১। আকবরনামা, ৩য়, ৮৭২-৭৩।

১০২। ঐ, ৯১৬।

১০৩। বর্তমান আরামবাগ মহকুমা।

১০৪। আকবরনামা, ৩য়, ৮৭৯-৮০।

১০৫। মানসিংহের জীবন কাহিনীর জন্য দেখুন, আইন, ১ম, ৩৬১-৬৩।

১০৬। আকবরনামা, ৩য়, ১০২৩। এখানে মানসিংহ কর্তৃক বিভিন্ন দিকে সৈন্য পাঠাবার কথা বলা হলেও শুধু ভূষণা জয়ের কথাই বলা হয়েছে এবং তাও অতি সংক্ষেপে।

১০৭। ঐ, ১০৪২।

১০৮। ঐ ১০৪৩।

১০৯। HB II. 211.

১১০। আইন, ১ম, ৩৬৩।

১১১। আকবরনামা, ৩য়, ১০৬৭।

১১২। আবুল ফজল বারবার এই লোকের নাম লিখেছেন পাত কুমওয়ার, কিন্তু অহোম বুরঞ্জীতে তাঁর নাম রঘুদেব বা রঘুরায় (E. A. Gait: History of Assam, 295)

১১৩। আকবরনামা, ৩য়, ১০৯৩-৯৪; HB II. 212.

১১৪। আকবরনামা, ৩য়, ১১৩০।

১১৫। ঐ, ১১৪০।

১১৬। ঐ।

১১৭। ঐ, ১১৫১।

Edited by Ripon Sarkar

১১৮। ঐ, ১১৭৪।

১১৯। ঐ, ১১৭৯-৮০।

১২০। আইন, ২য়, ১৩৮, ১৫৬।

১২১। ঐ, ১৫২।

১২২। HB II, 213.

১২৩। BPP, vol. XXXVIII, 11.

১২৪। স্যার যদুনাথই জেরেট অনূদিত আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ডের সংশোধনীসহ সম্পাদনা করেছেন। তাঁর পক্ষে সরকার শরীফাবাদের শেরপুর আতাই-এর কথা না জানার কথা নয়, তবে তাঁর সম্পাদিত আইন-ই-আকবরী, ২য় খণ্ড তাঁর সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গল, ২য় খণ্ডের এক বছর পরে প্রকাশিত হয়।

১২৫। আকবরনামা, ৩য়, ১১৮০।

১২৬। আইন, ২য়, ১৪৩।

১২৭। মূলে মন্দারী নদী, তবে মনে হয় মহানন্দা নদীকেই বুঝান হয়েছে। বেভেরীজও তাই মনে করেন। আকবরনামা, ৩য়, ১২১৩, টীকা ৩।

১২৮। আকবরনামা, ৩য়, ১২১৩-১৪।

১২৯। মূলে বিহার নদী, কিন্তু এটা বনার নদী হবে।

১৩০। মূলে 'ঈসা' কিন্তু ঈসা খান তিন বছর পূর্বে ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। মুসা খান মসনদ-ই-আলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। এখানে 'ঈসা' বোধ হয় বেভেরীজের অনুবাদে ছাপার ভুল।

১৩১। মূলে সরহয়নপুর, এটা শ্রীপুর। মাত্র কিছু দিন আগে মানসিংহ কেদার রায়কে বশকে নিয়ে আসেন, কিন্তু কেদার রায়ের এই আনুগত্য ছিল নিতান্ত সাময়িক; বেকায়দায় পড়লে এঁরা আনুগত্যের ভান করতেন।

১৩২। মূলে পরিষ্কার লেখা আছে ঈসা খানের ছেলে দাউদ। স্যার যদুনাথ বলেছেন, উড়িষ্যার কতলু খানের উজীর ঈসার ছেলে দাউদ, কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আবুল ফজলের বক্তব্য নিম্নরূপঃ "The wicked Afghans leagued with Daud, the son of Isa and the landholders..." (আকবরনামা, ৩য়, ১২১৫) দাউদ উড়িষ্যার কতলু খানের উজীর ঈসার ছেলে হলে তিনিও একজন আফগান, তাহলে "the wicked Afghan leagued with হত না। আরও মনে রাখা দরকার যে দাউদ যদি ঈসা আফগানের ছেলে হয়, তাহলে তিনি খাজা উসমানের ভাই হবেন, তাহলে আফগানরা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের দরকার কি, যোগাযোগ ত ছিলই। দ্বিতীয়ত, শুধু দাউদ নয়, বরং অন্যান্য জমিদারদের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং দাউদ জমিদারদের একজন, তাই তিনি ভাটির ভূঁঞা-প্রধান ঈসা খানের ছেলেই হবেন।

১৩৩। মালদহ জেলায় এক শাহপুর আছে, এটা এখানে প্রযোজ্য নয়। এখানে শাহপুরকে ইছামতি নদীর তীরে বলা হয়েছে। পাবনার শাহজাদপুরে একটি শাহপুর আছে। (বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, পাবনা, ৮৮)। এই শাহপুরই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৩৪। মূলে আনজামতী, কিন্তু এটা পাবনার ইছামতি। (আকবরনামা, ৩য়, ১২১৪, টীকা ৬)।

১৩৫। এই স্থানগুলি নারায়ণগঞ্জের নিকটে (এইচ. বি. ২য়, ২১৪)।

১৩৬। মূলে পত্রসহানী, কিন্তু এর পাঠ ত্রিমোহনী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এই ত্রিমোহনীর পরিচিতি দেয়া সম্ভব নয়। বেভেরীজ বলেন যে এটা সাতগাঁও বা হুগলীর ত্রিবেণী। (আকবরনামা, ৩য়, ১২৩১, টীকা ৫)। কিন্তু যুদ্ধের বিবরণ যা পাওয়া যায় এবং সোনারগাঁও ও ভাওয়াল-এর উল্লেখে এবং কেদার রায়ের জড়িয়ে পড়ার ফলে মনে হয়, যুদ্ধ ক্ষেত্র দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে না হয়ে পূর্ব বঙ্গেই হবে। তাই এই ত্রিমোহনী বিক্রমপুর শ্রীপুরের নিকটে কোথাও হবে বলে মনে হয়।

Edited by Ripon Sarkar

১৩৭। তিনি মুজফফর খানের ক্রীতদাস ছিলেন। উপরে বলা হয়েছে যে মুজফফর খানের আর একজন ক্রীতদাস বাজ বাহাদুর কালমাক নাম নিয়েছিলেন, তিনিও মোগল থানাদার ছিলেন।

১৩৮। মূলে নগরপুর, কিন্তু পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে এটা প্রকৃতপক্ষে বিক্রমপুর হবে। (এইচ. বি. ২য়. ২১৪; আকবরনামা, ৩য়, ১২৩৫, টীকা ১)।

১৩৯। আকবরনামা, ৩য়, ১২৩৫-৩৬, ১২৪০। নাজিরপুরের পরিচিতির জন্য দেখুন, জার্নাল অব দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী, ভল্যুম ১৩, ১৯৯০, ৩১।

১৪০। আকবরনামা, ৩য়, ১২৫৬-৬১।

Edited by Ripon Sarkar

চতুর্থ অধ্যায়
সুবাদার ইসলাম খান চিশতী
ভাটি বিজয় ও বার ভুঁঞার পতন

আকবরের মৃত্যুর পরে শাহজাদা সেলিম নূর-উদ-দীন মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর উপাধি নিয়ে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর তারিখে সিংহাসনে বসেন। বাংলার সুবাদার রাজা মানসিংহ তখন রাজধানীতে ছিলেন, জাহাংগীর তাঁকে পুনরায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। জাহাঙ্গীর মানসিংহের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। মানসিংহ ছিলেন জাহাঙ্গীরের বড় ছেলে খসরুর মামা, খান আযম মিরযা আযীয কোকা ছিলেন খসরুর শ্বশুর। আকবরের এই দুই প্রধান অমাত্য মানসিংহ এবং খান আযম আকবরের পরে খসরুকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ হন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে জাহাঙ্গীর মানসিংহকে ভণ্ড এবং পুরাতন ধূর্ত নেকড়ে রূপে উল্লেখ করেন। তাই সম্রাট বলেন যে যদিও তাঁর কিছু অতীত কীর্তিকলাপের জন্য মানসিংহ সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশা করতে পারেন না, তবুও তিনি তাঁকে খিলাত, মণিমুক্তাখচিত তরবারি এবং নিজের একটি ঘোড়া উপহার দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দেন।[১] কিন্তু মানসিংহ বেশি দিন বাংলায় ছিলেন না, ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে কুতব-উদ-দীন খান কোকাকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। এই এক বছরকাল সময়ের মধ্যে মানসিংহ বাংলায় কৃতিত্বপূর্ণ কিছু করতে পারেন বলে মনে হয় না।

কুতব-উদ-দীন খান কোকা

তাঁর নাম শয়খ খুবু, কুতব-উদ-দীন খান তাঁর উপাধি, জাহাঙ্গীর যুবরাজ থাকাকালে তাঁকে এই উপাধি দেন। তিনি ছিলেন জাহাঙ্গীরের দুধ-ভাই, এবং সেই জন্য নামের সঙ্গে কোকা শব্দটি যুক্ত। কুতব-উদ-দীনের মা ছিলেন শয়খ সলীম চিশতীর মেয়ে। জাহাঙ্গীর বলেন যে তিনি কুতব-উদ-দীনের মায়ের যত্নে লালিত পালিত হন, জাহাঙ্গীর তাঁকে মা ডাকতেন।[২] সুতরাং সম্রাটের সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই কুতব-উদ-দীনের অন্তরংগতা ছিল। কুতব-উদ-দীন যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, এমনকি সেলিম যখন পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখনও তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন এবং সেলিমের সিংহাসনে বসার দিনের অপেক্ষা করতেন। বাংলায় কুতব-উদ-দীন খানের শাসন সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। শুধু জানা যায় যে তিনি বর্ধমানের জায়গীরদার আলীকুলী ইস্তজলু শের আফগন (শের আফগন বা আফকন, শের আফগান নয়)-কে দমন করতে যান এবং পরিণতিতে উভয়েই নিহত হন।

আলীকুলী ইস্তজলু পারস্যের সম্রাট দ্বিতীয় শাহ ইসমাইলের (১৫৭৬-৭৮) সফরচী বা খাবার টেবিলের পরিচারক বা খাদ্য পরিবেশক ছিল। প্রভুর মৃত্যুর পরে আলীকুলী দেশ থেকে পালিয়ে যায় এবং অনেক ঘুরাঘুরি করে কান্দাহারের ভিতর দিয়ে মুলতানে আসে। ঐ সময়ে আকবরের সেনাপতি খান খানান আবদুর রহীম সিন্ধুর থাট্টা অভিযানে যাচ্ছিলেন, আলীকুলী তাঁর সৈন্যদলে যোগ দেয়। যুদ্ধে আলীকুলী এমন বীরত্ব প্রদর্শন

Edited by Ripon Sarkar

করে যে খান খানান মুগ্ধ হয়ে তাকে রাজধানীতে নিয়ে এসে উচ্চ মহলে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা সেলিম মেবার অভিযানে যাচ্ছিলেন, আলীকুলী তাঁর সৈন্যদলে ভর্তি হয়। পরে আলীকুলী একটি বাঘ হত্যা করে শাহজাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, শাহজাদা তাকে শের আফগন (বা বাঘ হত্যাকারী) উপাধি দেন। সেলিম পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে আলীকুলী প্রথমে শাহজাদার পক্ষে যোগ দেয় কিন্তু পরে তাঁকে পরিত্যাগ করে সম্রাটের পক্ষে চলে যায়। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে আলীকুলীর পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে বর্ধমানের জায়গীরদার নিযুক্ত করে বাংলায় পাঠিয়ে দেন।[৩] ইতোমধ্যে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে আলীকুলী মিরযা গিয়াস বেগের (পরে ইতমাদ-উদ-দৌলা) বিদূষী ও পরমা সুন্দরী কন্যা মেহের-উন-নিসাকে (পরে জাহাঙ্গীরের মহিষী নূরজাহান) বিয়ে করে।[৪] আলীকুলী সস্ত্রীক বাংলায় আসে।

জাহাঙ্গীর আলীকুলী ইস্তজলুকে বর্ধমানে পাঠিয়ে স্বস্তিবোধ করেননি। তিনি মনে করেন যে, আলীকুলীর মত একজন ঝামেলাকারী লোককে বাংলার মত বিদ্রোহী সুবায় রাখা ঠিক নয়, তাই তিনি সুবাদার কুতব-উদ-দীন খানকে আদেশ দেন যেন আলীকুলীকে সম্রাটের দরবারে পাঠান হয়, যদি আলীকুলী নির্বিবাদে আদেশ মানে ভাল, আর যদি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বা বিবাদে লিপ্ত হয়, তাকে যেন শাস্তি দেয়া হয়।[৫] মাসির-উল-উমারায় এই বিষয়ে অন্য কথা পাওয়া যায়। মাসিরে বলা হয়েছে যে আলীকুলীর সঙ্গে বিয়ের আগে শাহজাদা সেলিম মেহের-উন-নিসাকে দেখে তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁকে বিয়ে করতে চান। আকবর এই সংবাদ পেয়ে মেহের-উন-নিসাকে আলীকুলীর সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এখন জাহাঙ্গীর সম্রাট হয়ে মেহের-উন-নিসাকে পাওয়ার উদ্দেশে আলীকুলীকে শাস্তি দেয়ার জন্য সুবাদারকে নির্দেশ প্রদান করেন।[৬] এই বিষয়টি বিতর্কিত; জাহাঙ্গীর মেহের-উন-নিসাকে পাওয়ার জন্য বা আলীকুলীর আনুগত্যে সন্দেহ করে, অর্থাৎ ঠিক কি কারণে আলীকুলীকে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ দেন, সেই বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে যেমন বিতর্ক আছে, মোগল আমলে ফার্সি ভাষায় লিখিত ইতিহাসেও তেমনি বিতর্ক আছে। বিষয়টি আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক নয়, তাই আমরা এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করব না।[৭]

জাহাঙ্গীর নিজেই কুতব-উদ-দীন খান ও শের আফগন-এর মৃত্যু-কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খানের নিকট থেকে ইসলাম খান চিশতীর (তখন তিনি আগ্রায় ছিলেন) মারফত এই সংবাদ পান এবং এটাই এই কাহিনীর একমাত্র সমসাময়িক সূত্র। সম্রাটের আদেশ পাওয়ার পরে কুতব-উদ-দীন খান তাড়াতাড়ি নিজে বর্ধমানে যান। শের আফগন সংবাদ পেয়ে দুজন অনুচরসহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। কুতব-উদ-দীনের সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলে। এতে আলীকুলী শের আফগন এর মনে সন্দেহ জাগে এবং বলে 'এটা আপনার কিরূপ ব্যবহার'। কুতব-উদ-দীন সৈন্যদের পেছনে রেখে সম্রাটের আদেশের মর্ম বুঝাবার জন্য আলীকুলীর নিকটে যান এবং এই সুযোগে আলীকুলী তরবারি বের করে কুতব-উদ-দীনকে দুই তিনবার আঘাত করে। আম্বা খান কাশ্মিরী নামে কুতব-উদ-দীনের একজন অনুচর ছিল, সে ছিল কাশ্মীরের রাজবংশের লোক এবং কুতব-উদ-দীনের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে সম্পর্কিত। কুতব-উদ-দীনের প্রতি তার অগাধ আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা ছিল। আম্বা খান তাড়াতাড়ি সামনে অগ্রসর হয়ে আলীকুলীর মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে

Edited by Ripon Sarkar

এবং আলীকুলীও আম্বা খানকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে। কুতব-উদ-দীনের সৈন্যরা তাঁকে আহত দেখে আলীকুলীকে আক্রমণ করে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে। আম্বা খান ঘটনাস্থলেই মারা যায় এবং কুতব-উদ-দীন খান চার ঘণ্টা পরে মৃত্যুবরণ করেন, মৃত্যু তারিখ ৩০শে মে, ১৬০৭ খ্রিঃ।[৮]

জাহাঙ্গীর কুলী খান

কুতব-উদ-দীন খান কোকার মৃত্যুর পরে বিহারের সুবাদার জাহাংগীর কুলীখানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। তাঁর নাম ছিল লালা বেগ, পিতার নাম নিযাম। তাঁর পিতা হুমায়ুনের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। জাহাঙ্গীর কুলী আকবরের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং আকবর তাঁকে যুবরাজ সেলিমের অধীনে ন্যস্ত করেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের ভৃত্য (জাহাঙ্গীর কুলী অর্থ জাহাঙ্গীরের ভৃত্য), কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিমত্তা, সাহস এবং চারিত্রিক গুণাবলীর দ্বারা আমীরের মর্যাদা লাভ করেন। তাঁর মনসব ছিল ৪৫০০/৩৫০০। বাংলায় তাঁর কীর্তিকলাপ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তিনি বয়স্ক লোক ছিলেন; বাংলার আবহাওয়া সহ্য না হওয়ায় তিনি রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রাণ ত্যাগ করেন। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে সম্রাট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পান।[৯]

ইসলাম খান চিশতী

জাহাঙ্গীর কুলী খানের মৃত্যুর পরে সম্রাট বিহারের সুবাদার ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে যে তারিখে জাহাঙ্গীর কুলী খানের মৃত্যুর সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌছে, সেই তারিখেই ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির কথা বলা হয়, অতএব ইসলাম খান ৬ই মে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। একই দিনে তাঁর মনসব ৪০০০/৩০০০ ধার্য করা হয়। ইসলাম খান ছিলেন শয়খ সলীম চিশতীর পৌত্র, সম্রাট এবং ইসলাম খান উভয়ে সমবয়সী ছিলেন এবং ছেলেবেলা থেকে উভয়ে এক সঙ্গে বড় হয়ে উঠেন। জাহাঙ্গীর তাঁকে ফরজন্দ বা ছেলে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। জাহাঙ্গীর বলেন যে তিনি যখন ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন, উচ্চপদস্থ আমীরেরা ইসলাম খানের অল্প বয়স এবং অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[১০] কিন্তু ইসলাম খানের চরিত্র, সাহস এবং কর্মদক্ষতার প্রতি সম্রাটের আস্থা থাকায় সম্রাট কারও কথায় কান না দিয়ে তাঁকে নিযুক্তি দেন। ইসলাম খান কর্তৃক বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে সম্রাট সন্তুষ্টির সঙ্গে বলেন যে ইসলাম খান বাংলার শাসন এত সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন যে ঐ এলাকা মোগল শাসনে আসার পর থেকে কোন কর্মকর্তা ঐরূপ সফলতা লাভ করেনি।[১১] ইসলাম খান চিশতী সত্যিই বাংলায় এসে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। যদিও পূর্বে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি গুণের সমাবেশ হয়, যার ফলে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞ মোগল সুবাদারেরা যা করতে পারেননি, তিনি তা সফলভাবে সম্পন্ন করেন। ইসলাম খান বাংলার স্বাধীনচেতা সকল ভূঁঞা, বিশেষ করে বার-ভূঁঞাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন, খাজা উসমানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন এবং সারা বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তার করেন। ইসলাম খান ছিলেন সাহসী, মিতাচারী,[১২] নিষ্ঠাবান এবং সিদ্ধান্তে স্থির এবং অটল। তিনি ধীর স্থিরভাবে পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতেন, উচ্চপদস্থ সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে

Edited by Ripon Sarkar

পরিকল্পনা তৈরি করতেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত এবং যুদ্ধ বা অন্য যে কোন সময়ে বিপদ এলে তিনি সাহসের সঙ্গে তা মুকাবিলা করতেন। পরামর্শ করে কর্তব্য নির্ধারণ করলেও সকলের মতামত জেনে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত দিতেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকতেন। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, তাঁর মধ্যে ছিল স্বেচ্ছাচারিতা এবং কর্তৃত্বের মনোভাব, ফলে অধীনস্থ সেনাপতি এবং সৈনিকেরা তাঁকে ভয় করত। বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েই তিনি বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করেন এবং অল্প কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তাঁর সংকল্প বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হন। একটির পর একটি যুদ্ধে তিনি সফলতা লাভ করেন, সম্রাট তাঁকে সমর্থন দেন এবং তাঁর পছন্দমত সেনাপতি, সৈন্যবাহিনী, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করে দেন। কিন্তু শেষ দিকে সফলতা তাঁর স্বেচ্ছাচারিতা এবং ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি করতে ইন্ধন যোগায়। সম্রাটের অকুণ্ঠ সমর্থনের নিশ্চয়তা তাঁকে আরও বেশি স্বেচ্ছাচারী করে তোলে, এমনকি সম্রাটের অনুকরণে সম্রাটের সংরক্ষিত বিশেষ ক্ষমতা (prerogative power) প্রয়োগেও দ্বিধা করেননি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাটের আদেশও অমান্য করেন। এর জন্য সম্রাটকে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

আগেই বলা হয়েছে, ইসলাম খান ৬ই মে ১৬০৮ তারিখে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন, তখন তিনি বিহারের সুবাদার ছিলেন, সম্রাটের আদেশ পেয়ে তিনি বাংলার তৎকালীন রাজধানী রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন এবং ঐ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে রাজমহল পৌঁছেন। এখানেই তিনি তাঁর কর্মসূচি এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, কর্মকর্তারা তাঁকে এই ব্যাপারে সাহায্য করেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বী পাঠে তাঁর পরিকল্পনার যে রূপরেখা পাওয়া যায়, তা মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ

১ম, ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে বাংলার মত বিদ্রোহী সুবায় মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে একদল দক্ষ, অনুগত এবং কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা এবং সেনাপতি দরকার। পূর্ববর্তী আমলের অকর্মণ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের পরিবর্তন করে নতুন একদল কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

২য়, তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলায় মোগল আধিপত্য বিস্তারের প্রধান শত্রু ভাটি এবং ভাটির বার-ভূঁঞা। তাই তিনি ভাটিতে গমন করার এবং যুদ্ধ পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন।

৩য়, ভাটি নিম্ন অঞ্চল, নদী-নালায় পরিপূর্ণ, যেখানে যুদ্ধ করতে হলে শক্তিশালী নৌ-বহরের প্রয়োজন। তাই তিনি নৌ-বহর শক্তিশালী করার পরিকল্পনা নেন।

৪র্থ, রাজধানী রাজমহল সুবা বাংলার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত এবং প্রধান গোলযোগপূর্ণ এলাকা ভাটি থেকে অনেক দূরে। সুবাদার রাজধানীতে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করলে তাতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই তিনি রাজধানী বাংলার কেন্দ্রস্থলে, বিশেষ করে ভাটির কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করার কথা চিন্তা করেন। অবশ্য ঢাকাকে রাজধানী স্থাপন করার কথা তখন তিনি চিন্তা করেন কিনা, সে বিষয়ে সমসাময়িক সূত্রে কোন ইঙ্গিত নেই। পরে আমরা দেখব যে ইসলাম খান রাজমহল থেকে বেরিয়ে প্রথমে ঘোড়াঘাট যান এবং সেখানে

Edited by Ripon Sarkar

বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এতে মনে হয় বর্ষাকাল অতিবাহিত করা ছাড়াও রাজধানীর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করার কথা তখন তাঁর মনে ছিল।

৫ম. যদিও তিনি মনে করেন যে ভাটিই এবং ভাটির বার-ভূঁঞারাই মোগল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়, এবং তিনি ভাটি অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তিনি এও বুঝতে পারেন যে ভাটি যাওয়ার পথে পিছনে, ডানে ও বামে আরও কিছু ভূঁঞা জমিদারের অস্তিত্ব রয়েছে, যাঁরা বার-ভূঁঞার মত দুর্ধর্ষ না হলেও মোগল বাহিনীকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি ভাটি যাওয়ার পথে পেছনে রেখে যাওয়া ভূঁঞা জমিদারদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। যাঁদের আনুগত্যে সন্দেহ হয় তাঁদের বিরুদ্ধে তিনি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন।

৬ষ্ঠ, ইসলাম খান ভূঁঞা জমিদারদের সম্পর্কে পূর্বের চেয়ে ভিন্ন নীতি অবলম্বন করেন। পূর্ববর্তী আমলে কোন ভূঁঞা জমিদার পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে তাঁদের জমিদারী ছেড়ে দেয়া হত এবং তাঁদের স্ব স্ব জমিদারীতে বহাল করা হত। ফলে এই সকল জমিদার সুযোগ বুঝে আবার বিদ্রোহ করত। তাই কোন কোন ভূঁঞাকে পরাজিত করা হলেও তাঁদের সম্পূর্ণ দমন করা হয়নি। ইসলাম খানও পরাজিত ও আনুগত্য প্রদর্শনকারী ভূঁঞাদের জমিদারী তাঁদের দখলে ছেড়ে দিতেন, কিন্তু তাঁদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী, যুদ্ধের নৌকা এবং নাবিক নিয়ে মোগল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হত। ফলে অনুগত ভূঁঞারাই শত্রু-ভূঁঞাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত, স্ব স্ব জমিদারীতে ফিরে গিয়ে পুনরায় মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার সুযোগ ছিল না।

পরিকল্পনা তৈরি করে ইসলাম খান সম্রাটের নিকট নিম্নরূপ আবেদন পাঠান ঃ[১৩] সাম্রাজ্যের কর্মকর্তাদের এই প্রদেশের (সুবা বাংলার) অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। একজন অত্যন্ত সৎ ও নিষ্ঠাবান লোককে দিওয়ান নিযুক্ত করা দরকার। ইহতিমাম খান যিনি সম্রাটের দরবারের একজন দক্ষ কর্মকর্তা, বা ঐরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন কর্মকর্তাকে নৌবহর এবং গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ নিয়োগ করে পাঠান দরকার। যে সকল কর্মকর্তা দূর্নীতিপরায়ণ এবং বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে, তাদের দরবারে ফেরত নেয়া হোক।

সম্রাট এই আবেদনে সাড়া দেন এবং নিম্নরূপ আদেশ দেন ঃ[১৪]

প্রদেশের পূর্ববর্তী দিওয়ান উজীর খান, মাসুম খানের পুত্রগণ এবং লাচী খান যারা গোলযোগের কারণ, তাদের বন্দী করে দরবারে পাঠান হোক।[১৫] যে কোন প্রবীণ কর্মকর্তা যদি তাদের পুরাতন অভ্যাস পরিবর্তন না করে বা ইসলাম খানের আদেশ উপদেশ অমান্য করে, তাদের বরখাস্ত করা হোক। সম্রাট আরও আদেশ দেন যে রাজধানী থেকে ইসলাম খান যাকেই চান তাকে বাংলায় নিযুক্তি দেয়া হবে।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আবুল হাসান শিহাব খানীকে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করেন। বাহরিস্তানে নতুন দিওয়ানের উপাধি মুতাকিদ খান।[১৬] একই সঙ্গে ইহতিমাম

Edited by Ripon Sarkar

খানকে মীর বহর বা নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়।[১৭] ইহতিমাম খানকে আদেশ দেয়া হয় যেন তিনি বাংলায় যাওয়ার পথে পাটনা থেকে মানসিংহের সকল সৈন্য এবং মানসিংহ বাংলা ও রোটাস দুর্গ[১৮] থেকে যে সকল কামান নিয়ে আসেন সেগুলি হস্তগত করেন। পরলোকগত সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খান যে দুটি বড় কামান তৈরি করেন এবং যেগুলি তাঁর স্ত্রী নিয়ে আসেন সেগুলিও হস্তগত করার জন্য ইহতিমাম খানকে নির্দেশ দেয়া হয়। আরও আদেশ দেয়া হয় যেন ইহতিমাম খান রোটাস দুর্গে দুর্গের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া বাকিগুলি তাঁর সঙ্গে বাংলায় নিয়ে যান। চুন্দ[১৯] এর কামান, গোলা এবং নৌবহর পরীক্ষা করে ইহতিমাম খান যেগুলি বাংলায় নেয়ার উপযুক্ত মনে করেন, তাও তাঁকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়।[২০] এক কথায়, বাংলা জয়ের জন্য ইসলাম খানের সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং অস্ত্রশস্ত্র যা যা প্রয়োজন, সম্রাট সব কিছুই ইসলাম খানের অধীনস্থ করে দেন।

বাহরিস্তানে ইসলাম খানের দুজন সহযোগী কর্মকর্তার নাম বলা হয়েছে, দিওয়ান মুতাকিদ খান এবং মীর বহর ইহতিমাম খান। মুতাকিদ খানের পরিচয় প্রথম অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে। মীর বহর ইহতিমাম খানের আসল নাম মালিক আলী, তিনি আকবরের সময় ২৫০ মনসবে চাকরিতে নিযুক্ত হন। তিনি কিছুদিন আগ্রায় কোতওয়াল ছিলেন, বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুর বিরুদ্ধে তাঁকে পাঠান হয়। ইসলাম খানকে সুবাদার নিযুক্ত করার সময় ইহতিমাম খানকে মীর বহর নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর মনসব হয় ১০০০/৩০০।[২১]

দিওয়ান মুতাকিদ খান এবং মীর বহর ইহতিমাম খান রাজমহলে এসে পৌঁছলে ইসলাম খান প্রথমে সৈন্য ও নৌ-বাহিনী পরিদর্শন করেন এবং অভিযানের সকল প্রস্তুতি শেষ করে রাজমহল ত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার ইতিহাসের প্রধান সূত্র মির্যা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে শুধু খাজা উসমান আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও বিজয়ের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে, তুজুক-এর অনুসরণে রিয়াজ-উস-সলাতীনেও একই কথা বলা হয়েছে। এই দুই সূত্রে বার-ভূঁঞার উল্লেখ মাত্র নেই। কিন্তু বাহরিস্তানে এবং আবদুল লতীফের ডায়রীতে দেখা যায় যে ইসলাম খান ভাটির বার-ভূঁঞাকেই প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করেন এবং এই দুই সূত্রে ইসলাম খানের ভাটির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার কথাই বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে। ইসলাম খান বাংলার রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক পরিস্থিতি সঠিকভাবে অনুধাবন করেন, তিনি বুঝতে পারেন যে খাজা উসমান আফগান যদিও একজন প্রধান শত্রু, বার-ভূঁঞাকে দমন করতে না পারলে উসমানকে দমন করা যাবে না। তাই তিনি ভাটি অভিযানই তাঁর প্রথম লক্ষ্য রূপে স্থির করেন।

বার-ভূঁঞা এবং খাজা উসমান ছাড়াও আরও অনেক ভূঁঞাকে দমন করতে হয় এবং কারও কারও বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযান প্রেরিত হয়। বাহরিস্তানে কালানুক্রমিক আলোচনা থাকায়, একই ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ একাধিকবার একাধিক স্থানে আলোচিত হয়। তাই আমরা কালানুক্রম অনুসরণ না করে একেকজন ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিবরণ একবারেই আলোচনা করব। এতে প্রত্যেক ভূঁঞার দমন কাহিনী একস্থানেই পাওয়া যাবে। যুদ্ধের বিবরণে যাওয়ার আগে ইসলাম খানের ঢাকা গমন পথ এবং ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠার তারিখ আলোচনা করা হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত

Edited by Ripon Sarkar

রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত ইসলাম খানের গমন পথের কথা তাঁর একজন সহগামী আবদুল লতীফের ডায়েরীতে পাওয়া যায়। গুজরাটস্থ আহমদাবাদের আবদুল্লাহ আব্বাসীর পুত্র আবদুল লতীফ ছিলেন বাংলার নতুন দিওয়ান আবুল হাসান মুতাকিদ খানের বিশ্বস্ত অনুচর, তিনি তাঁর মনিবের সঙ্গে বাংলায় আসেন। তাঁর ডায়েরীতে প্রাপ্ত গমন পথ এবং তারিখ নিম্নরূপ ঃ[২২]

৭ই ডিসেম্বর ১৬০৯ খ্রিঃ ইসলাম খান চিশতী ভাটির উদ্দেশে রাজমহল ত্যাগ করেন। দিওয়ান মুতাকিদ খান এবং আবদুল লতীফ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা গঙ্গা ধরে সরকার নারঙ্গাবাদের[২৩] গোয়াশ[২৪] পরগণায় আসেন। তাঁদের বামে ছিল গৌড়, তাঁড়া, মালদহ এবং পাণ্ডুয়া শহরসমূহ।

২রা জানুয়ারি, ১৬০৯ খ্রিঃ তাঁরা গোয়াশ পৌছেন। গোয়াশে গঙ্গা পার হন।

তারিখ নাই...সরকার নারঙ্গাবাদের আলাইপুরে[২৫] তাঁরা ১ মাস কি ২ মাস অবস্থান করেন।

২রা মার্চ, ১৬০৯ খ্রিঃ তাঁরা আলাইপুর থেকে নাজিরপুরের[২৬] দিকে যাত্রা করেন, তাঁদের প্রথম অবস্থানস্থল ফতেহপুর নামক একটি গ্রাম।

৩০শে মার্চ, ১৬০৯ খ্রিঃ তাঁরা ফতেহপুর ত্যাগ করে রানা তাণ্ডাপুরে পৌছেন। এখানে কয়েকজন জমিদার ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করে আনুগত্য প্রকাশ করেন।

২৬শে এপ্রিল, ১৬০৯ খ্রিঃ ইসলাম খান বজরাপুরে পৌছলে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নযরানা দেন।

৩০শে এপ্রিল, ১৬০৯ খ্রিঃ বজরাপুর[২৭] থেকে তাঁরা শাহপুর[২৮] পৌছেন। এখানে ইসলাম খান শিবির ত্যাগ করে কিছু অনুচর নিয়ে নাজিরপুর যান, সেখানে নয় দিন অবস্থান করে ৩২টি হাতি শিকার করেন। শাহপুরে ফিরে এসে পুল তৈরি করে নদী পার হন।

২রা জুন, ১৬০৯ খ্রিঃ ইসলাম খান ঘোড়াঘাট পৌছেন। খড়ের ঘর তৈরি করে তাঁরা ঘোড়াঘাটে বর্ষাকাল কাটান।

১৫ই অক্টোবর, ১৬০৯ খ্রিঃ ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থেকে ভাটির দিকে যাত্রা করেন।

দুর্ভাগ্যবশত এই মূল্যবান ডায়েরীটি অপ্রত্যাশিতভাবে এখানেই শেষ হয়।

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতেও ইসলাম খানের রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাট যাওয়ার পথের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, কিন্তু কোন তারিখ নেই। এই গমন পথেও সুবাদার কোন কোন এলাকায় বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সৈন্য পাঠান এবং বিভিন্ন ভূঁঞারা তাঁর সঙ্গে দেখা করে আনুগত্য প্রদর্শন করেন। বাহরিস্তানে এ সকল বিবরণ দেয়া হয়েছে। তাই বাহরিস্তান পাঠ করে ইসলাম খানের গমন পথ নির্মাণ করতে হয়। এটা নিম্নরূপঃ

রাজমহল থেকে ১ম মঞ্জিল—ত্রিপুরা। ইহতিমাম খান পেছন পেছন এসে তিতুলীতে পৌছেন। এখানে মিরযা নাথন এক সপ্তাহেরও বেশি সময়

Edited by Ripon Sarkar

অসুস্থ থাকায় ইহতিমাম খান অগ্রসর হতে না পারায় ইসলাম খানকেও ত্রিপুরায় কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হয়।[২৯]

২য় মঞ্জিল—গৌড় (অর্থাৎ গৌড়ের পাশে গঙ্গায়)

৩য় মঞ্জিল—আলাইপুর

৪র্থ মঞ্জিল—নাজিরপুর (আলাইপুর থেকে নাজিরপুর আসতে বেশ সময় লাগে)।

৫ম মঞ্জিল—শাহপুরের বিপরীতে

৬ষ্ঠ মঞ্জিল—ঘোড়াঘাট।

অতএব আবদুল লতীফের ডায়েরী এবং বাহরিস্তানে গমন পথের মিল আছে, আবদুল লতীফ নিজে সুবাদারের সফর সংগী ছিলেন এবং ডায়েরী লিখেন বলে সন, তারিখ এবং কিছু বেশি স্থানের নাম দেন। মিরযা নাথন সফর সংগী ছিলেন না, তবে সেনাপতি হিসেবে সুবাদারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, তিনি নাজিরপুরের হাতি শিকারেও যোগ দেন। তিনি মোটামুটিভাবে ইসলাম খানের গমন পথের বিবরণ দেন। উভয় সূত্রই একমত যে ইসলাম খান বর্ষাকাল ঘোড়াঘাটে কাটান।

বর্ষাকাল শেষে ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থেকে যাত্রা করেন এবং ঢাকা আসেন। মোটামুটিভাবে অর্ধেক পথ শেষ হলে তিনি বার-ভূঁঞার রাজ্যের সীমান্তে এসে পড়েন এবং এখানে ভূঁঞারা তাঁকে প্রবল বাধা দেন। ইসলাম খান যুদ্ধ করে শত্রু দুর্গগুলি অধিকার করে অগ্রসর হন, তাই এইপথে অনেক সময় লাগে। বাহরিস্তান পাঠে ঘোড়াঘাট থেকে ঢাকা পর্যন্ত ইসলাম খানের গমন পথ নিম্নরূপে নির্মাণ করা যায়ঃ

ঘোড়াঘাট থেকে সিয়ালগড়,[৩০] ৩ মঞ্জিল। এখানে ইসলাম খান নৌ-বহরের জন্য এক সপ্তাহের বেশি সময় অবস্থান করেন।

সিয়ালগড় থেকে শাহজাদপুর,[৩১] এখানে ইসলাম খানকে ঈদ-উল-ফিতরের উৎসব পালন করেন।

শাহজাদপুর থেকে বলিয়া,[৩২] ৩ মঞ্জিল। এখানে ইসলাম খান নৌ-বহর পৌছার জন্য দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় অবস্থান করতে হয়।

বালিয়া থেকে কাটাসগড়,[৩৩] ২ মঞ্জিল। ইসলাম খান এখানে পৌছে একদল সেনাবাহিনী ঢাকা পাঠান, তাদের আদেশ দেয়া হয় তারা যেন ঢাকা দুর্গ নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ করেন। ইসলাম খান কাটাসগড়ে পৌছলেই মুসা খান ও বার-ভূঁঞা মোগলদের বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এখান থেকেই বার-ভূঁঞার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়।

কাটাসগড় থেকে কাথৌরিয়ার মোহনা[৩৪] এখানে ইসলাম খানকে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতে হয়, কারণ এখানে বার-ভূঁঞার সঙ্গে বিস্তর যুদ্ধ হয় এবং মোগল বাহিনী অনেকগুলি দুর্গ অধিকার করে।

Edited by Ripon Sarkar

কাথৌরিয়া থেকে বলরা[৩৫]—
বলরা থেকে কলাকোপা[৩৬]—
কলাকোপা থেকে ঢাকা।

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের তারিখ ও প্রকৃতি

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের তারিখ ও প্রকৃতি নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। চার্লস স্টুয়ার্ট বলেন যে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুরা বাংলায় উপকূলীয় এলাকায় প্রায়ই লুটতরাজ করত, তাদের দমন করার উদ্দেশেই রাজধানী প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত রাজমহল থেকে পূর্ব বাংলায় ঢাকায় সরিয়ে আনা হয়।[৩৭] এর পরে ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন যে মগ ও পর্তুগীজ দস্যু এবং পূর্ব বাংলার বিদ্রোহী ভূঁঞা ও জমিদারদের দমন করার উদ্দেশেই রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।[৩৮] কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিরযা নাথন মুসা খান ও বার-ভূঁঞা এবং উসমান খান আফগান প্রমুখ শত্রুদের দমনের কথাই বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, তিনি মগ-পর্তুগীজ দস্যুদের কোন উল্লেখ করেননি। বাহরিস্তান পাঠে মনে হয় ইসলাম খান চিশতী মগ-পর্তুগীজ দস্যুদের দমন করার জন্য বিশেষ মাথা ঘামাননি। অতএব দেখা যায় যে বিদ্রোহী ভূঁঞা জমিদারদের দমন করাই ছিল ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের প্রধান কারণ। ডঃ ভট্টাচার্য ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের তারিখও নিরূপণ করেন এবং এই উদ্দেশে ইসলাম খান চিশতীর সুবাদার নিযুক্তি এবং ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের তারিখ একসঙ্গে আলোচনা করেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, এবং আবদুল লতীফের ডায়রী অবলম্বন করে তিনি বলেন যে ইসলাম খান চিশতী ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বর্ষাকালের প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে মাসে) বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তিনি ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (জুলাই মাসে) ঢাকায় এসে পৌঁছেন। রাজধানী পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন যে কোন পূর্ব পরিকল্পনা নিয়ে রাজধানী স্থানান্তর করা হয়নি, তাই রাজধানী একবারে স্থানান্তরিত না হয়ে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়। সামরিক কারণে ইসলাম খানকে অনেকদিন ঢাকায় অবস্থান করতে হয়। ফলে ঢাকার সামরিক ছাউনী ক্রমে স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হয়। ডঃ ভট্টাচার্য আরও বলেন যে ইসলাম খান ঢাকায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক ভাবে ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন, কিন্তু খাজা উসমানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করার পরে রাজমহলের পরিবর্তে ঢাকাকে রাজধানীর পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

পরে নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং এম. আই. বোরাহ এ বিষয়ে আলোচনা করেন।[৩৯] রাজধানী স্থানান্তরের প্রকৃতি সম্পর্কে ভট্টশালী ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলেন যে রাজধানী পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু বোরাহ মনে করেন যে ইসলাম খানের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ইসলাম খানের ঢাকা পৌঁছার তারিখ সম্পর্কে ভট্টশালী এবং বোরাহ উভয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে সাধারণত সন তারিখের বিশেষ অভাব থাকলেও নিম্নের তিনটি তারিখ পাওয়া যায়ঃ[৪০]

Edited by Ripon Sarkar

৫ই রবিউল-আউয়াল ১০১৬ হিজরী/৩০শে জুন ১৬০৭ খ্রিঃ—এই তারিখে জাহাংগীর নবনিযুক্ত মীর বহর ইহতিমাম খানকে বাংলায় যাত্রার অনুমতি দেন।

৯ই রবিউল-আউয়াল, ১০১৬ হিজরী/৪ঠা জুলাই ১৬০৭ খ্রিঃ—এই তারিখে মোগল জাহাংগীর ইহতিমাম খানের নৌবহর পরিদর্শন করেন।

২৭শে রবি উল-আউয়াল, ১০১৭ হিজরী/১৪ই জুলাই ১৬০৮ খ্রিঃ—এই তারিখে মোগল নৌ-বহর ইছামতি নদীতে পৌছে মুসা খান এবং তাঁর ১২ জন জমিদার মিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়।

ভট্টশালী এবং রোয়াহ এই তারিখগুলি অনুসরণ করে বলেন যে ইসলাম খান চিশতী ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার নিযুক্ত হন এবং ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা পৌছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক ডঃ আহমদ হাসান দানী এবং এস. এম. তইফুরও তাঁদের এই মত গ্রহণ করেন।[৪১] কিন্তু এই তারিখ গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁরা তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এবং আবদুল লতীফের ডায়রীতে প্রাপ্ত তারিখের প্রতি মোটেই আমল দেননি।

ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরে আবার এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁর পূর্ব মতের পক্ষে আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন।[৪২] বাহরিস্তানে মিরযা নাথনের আলোচনার সূত্র ধরে তিনি বলেন যে বাহরিস্তানে প্রাপ্ত তারিখগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। মিরযা নাথনের বিবরণেই দেখা যায় যে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পরে এবং ঢাকা পৌছার পূর্বে দুটি বর্ষাকাল কাটান, একটি রাজমহলে এবং দ্বিতীয়টি ঘোড়াঘাটে, এবং তৃতীয় বর্ষাকালে তিনি ঢাকা পৌছেন। কিন্তু তারিখ লেখার সময় মিরযা নাথন দু বছরের স্থলে এক বছর করেন।

প্রকৃতপক্ষে বাহরিস্তানের উপরোক্ত তারিখগুলি বিভ্রান্তিকর এবং বাহরিস্তানে প্রাপ্ত ইহতিমাম খানের আগ্রা থেকে রাজমহল গমনের, এবং ইসলাম খানের রাজমহল থেকে ঢাকা গমনের বিবরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মিরযা নাথনের বিবরণ মতে ইহতিমাম খান আগ্রা থেকে বিশাল নৌবহর নিয়ে যাত্রা করে রাজমহল পর্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল পথ অতিক্রম করেন। পথে তিনি এলাহাবাদ এবং পাটনায় যাত্রা বিরতি করেন; যোশীতে[৪৩] গমন করেন, চাজুহায়[৪৪] দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আবার পাটনা থেকে রোটাস দুর্গে গমন করেন, এবং যাতায়াত উভয় পথে আরও প্রায় ২০০ মাইল অতিক্রম করেন। সুতরাং মিরযা নাথনের তারিখ গ্রহণ করলেও ইহতিমাম খান ১৬০৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তারিখে আগ্রা থেকে যাত্রা করলে রাজমহল পৌছুতে তাঁর ঐ বছর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। ইহতিমাম খান রাজমহলে পৌছার পরে ইসলাম খান ভাটির উদ্দেশে রাজমহল ত্যাগ করেন এবং মিরযা নাথনের বর্ণনা মতেই তিনি আর একটি বর্ষাকাল, অর্থাৎ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকাল ঘোড়াঘাটে কাটান। ঐ বছরের শেষদিকে (১৬০৮) ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থেকে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পরবর্তী বছর অর্থাৎ ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা পৌছেন। সুতরাং মিরযা নাথনের বিবরণ অনুসারেই ইসলাম খান ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা পৌছেন, অথচ ভট্টশালী প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ঢাকা পৌছেন।

Edited by Ripon Sarkar

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে নিম্নরূপ তারিখগুলি পাওয়া যায়ঃ

২০শে জমাদিউস-সানি, ১০১৪ হিজরী/২৪শে অক্টোবর ১৬০৫—মানসিংহ বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

৯ই জমাদিউল-আউয়াল, ১০১৫/১২ই সেপ্টেম্বর, ১৬০৬—কুতব-উদ-দীন খান কোকা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

২রা সফর, ১০১৬/৩০শে মে ১৬০৭—বর্ধমানে কুতব-উদ-দীন খান কোকার মৃত্যু।

২৭শে রবিউল-আউয়াল, ১০১৬/২১শে আগস্ট ১৬০৭—জাহাঙ্গীর কুতব-উদ-দীন খানের মৃত্যু সংবাদ পান।

২০শে মহরম, ১০১৭/৬ই মে, ১৬০৮—জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খানের মৃত্যু সংবাদ পান।

২০শে মহরম, ১০১৭/৬ই মে, ১৬০৮—ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন।

২০শে মহরম, ১০১৭/৬ই মে, ১৬০৮—ইহতিমাম খান মীর বহর নিযুক্ত হন।

তুজুকের এই তারিখগুলি পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ। আবদুল লতীফের ডায়রীর তারিখও তুজুকের তারিখের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তুজুকে ইসলাম খানের বাংলার সুবাদার নিযুক্তির তারিখ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে। তুজুক ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে মিরযা নাথনের বাহরিস্তান থেকে তুজুকের তারিখ অধিকতর গ্রহণযোগ্য। উভয় পুস্তকই কালানুক্রমিকভাবে লিখিত, কিন্তু বাহরিস্তানে তারিখের বিশেষ অভাব রয়েছে, মাত্র কয়েকটি ছাড়া কোন তারিখই পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে তুজুকের কালানুক্রম অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। জাহাঙ্গীরের সিংহাসন আরোহণ, তাঁর প্রাথমিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ, খসরুকে তাড়া করে লাহোর গমন, লাহোর থেকে কাবুল গমন, কাবুল থেকে পুনরায় লাহোর এবং পরে আগ্রা গমন, এই সবকয়টি বিষয় কালানুক্রমিকভাবে লিখিত। ফলে এই কালানুক্রম ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। দ্বিতীয়ত, জাহাঙ্গীর বলেন যে লাহোরেই তিনি বাংলার সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলী খানের মৃত্যু সংবাদ পান এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিহারের সুবাদার ইসলাম খান চিশতীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। জাহাঙ্গীর যদি খসরুকে তাড়া করে লাহোরে অবস্থানকালে এই নিযুক্তি দিতেন, তাহলে মিরযা নাথনের বাহরিস্তানে প্রাপ্ত তারিখ ১৬০৭ খ্রিঃ গ্রহণযোগ্য হত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তা নয়, জাহাঙ্গীর কাবুল থেকে লাহোরে ফিরে এসে এই নিযুক্তি দেন, কারণ অল্প পরেই সম্রাট ইহতিমাম খানকে আগ্রা থেকে বিদায় দেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। আবদুল লতীফের ডায়রীতে দেখা যায় যে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ইসলাম খান অন্যান্য কর্মকর্তা ও রাজকীয় নৌবহরসহ ভাটির উদ্দেশে রাজমহল ত্যাগ করেন; তিনি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকাল ঘোড়াঘাটে কাটান এবং বর্ষা শেষে অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখে ঢাকার উদ্দেশে ঘোড়াঘাট ত্যাগ করেন এবং পরের বছর, অর্থাৎ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে (জুলাই মাসে) ঢাকা পৌঁছেন।

Edited by Ripon Sarkar

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের কথা কোন সূত্রেই উল্লেখ নেই, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী বা বাহরিস্তান-ই-গায়বী কোথাও বলা হয়নি যে ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন বা স্থানান্তরিত করেন। সুতরাং রাজধানী কি পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয় বা ইসলাম খান ঢাকায় পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে, এ বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। তবে মিরযা নাথন ইসলাম খানের ঢাকা পৌঁছার পরেই ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা ওরফে জাহাঙ্গীরনগর বা জাহাঙ্গীরনগর ওরফে ঢাকা) রূপে অভিহিত করেন। আবদুল লতীফের ডায়রী এবং বাহরিস্তানে দেখা যায় যে সুবাদার রাজমহল থেকে আসার সময় প্রাদেশিক সকল কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে আসেন এবং সুবাদারসহ সকল কর্মকর্তা প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ড যাত্রা পথেই সমাধা করেন। সুবাদার নিজে নৌবহরে অবস্থানকালেই জমিদার এবং তাদের প্রতিনিধি ও দূতদের সাক্ষাৎ দান করেন, উপহার নযরানা গ্রহণ করেন, তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আদেশ নির্দেশ দেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। দিওয়ানও নৌবহর থেকেই জায়গীর এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি বিতরণ করেন। এ সকল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁদের রাজমহলে ফিরে যেতে হয়নি। অতএব সুবাদার এবং প্রাদেশিক কর্মকর্তারা ঢাকায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই যে ঢাকা রাজধানীতে পরিণত হয়, এতে সন্দেহ করার অবকাশ কম। মিরযা নাথন ইসলাম খানের ঢাকা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাকে জাহাঙ্গীরনগর রূপে উল্লেখ করায়ও এর সমর্থন মিলে। মনে হয় ঢাকা পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান ঢাকাকে রাজধানী রূপে ঘোষণা করেন এবং ঢাকার নাম জাহাঙ্গীরনগর রাখেন।

ইসলাম খানের বিজয়

আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খান রাজমহলে পৌঁছেই বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। তিনি ভাটির বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে গমন করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এমন সময় তিনি রাজমহলে থাকতেই দুটি ঘটনা ঘটে। ১ম, তিনি সংবাদ পান যে বুকাইনগরের খাজা উসমান আফগান আলপসিংহ[৪৫] আক্রমণ করে থানার অধ্যক্ষ সাজাউল খানকে হত্যা করেন। ইসলাম খান তাঁর ভাই শয়খ গিয়াস-উদ-দীনের অধীনে সেখানে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠান। এই বাহিনী আলপসিংহ থানা পুনরাধিকার করে। এই কৃতিত্বের জন্য শয়খ গিয়াস-উদ-দীনকে ইনায়েত খান উপাধি দেয়া হয়।[৪৬] কিন্তু বর্ষাকাল এলে চতুর্দিকে শত্রু বেষ্টিত আলপসিংহ থানা নিজেদের দখলে রাখা সমীচীন মনে হল না। তাই ইসলাম খানের আদেশে সেনাপতিরা নিজ নিজ জায়গীরে চলে যায়।[৪৭] ২য়, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য অনেক উপঢৌকনসহ তাঁর দূত শয়খ বদাইকে রাজমহলে ইসলাম খানের নিকট পাঠান, রাজার ছোট ছেলে সংগ্রামাদিত্যও ছিল। ইসলাম খান রাজার ছেলে এবং দূতকে স্বরাজ্যে পাঠিয়ে দেন; নির্দেশ দেয়া হয় রাজা প্রতাপাদিত্য যেন সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রচুর যুদ্ধ সরঞ্জামসহ আলাইপুরে সুবাদারের সাথে সাক্ষাৎ করেন।[৪৮]

ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে ভাটির বার-ভূঁঞা এবং বুকাইনগরের খাজা উসমান ছিলেন বাংলায় মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায়, তাই তিনি রাজমহল থেকে ভাটির উদ্দেশে যাত্রা করেন। কিন্তু ভাটি অনেক দূরে, যেতে হবে নদীপথে,

Edited by Ripon Sarkar

অনেক পথ ঘুরে এবং সামনে পেছনে শত্রুদের গতিবিধির উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে। ভাটি যেতে হলে আরও অনেক জমিদারদের ভূখণ্ডের ভিতর দিয়ে যেতে হবে। এই সকল ভূঁঞা জমিদারকে কোনমতেই মোগলদের মিত্র ভাবা যায় না, সুযোগ পেলে তারাও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে। কোন শত্রুকে পেছনে রেখে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের পরিচায়ক নয়, তাই ইসলাম খান পেছনে ফেলে যাওয়া জমিদারদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান। যারা অনুগত নয়, তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হয় এবং তাদের আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা হয়। এই কারণে ভাটি যাওয়ার পথেও ইসলাম খান কোন কোন জমিদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

বীরভূম, পাচেট এবং হিজলী অভিযান

রাজমহল থেকে বেরিয়ে এসে গৌড়ের নিকট পৌছে ইসলাম খান শয়খ কামালকে ২ হাজার অশ্বারোহী ও ৪ হাজার পদাতিক বাহিনীসহ বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাচেটের শামস খান ও হিজলীর সলীম খানের বিরুদ্ধে পাঠান। এই তিনটি রাজ্য বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উড়িষ্যার সীমান্তে অবস্থিত ছিল এবং তিনটি রাজ্যই পরস্পর সংলগ্ন ছিল। শয়খ কামালকে নির্দেশ দেয়া হয় যে যদি জমিদারেরা আনুগত্য স্বীকার করে তাদের অভয় দেয়া হবে এবং সসম্মানে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসা হবে। আর যদি তারা ঔদ্ধত্যের পরিচয় দেয়, তাদের রাজ্য জয় করা হবে এবং তাদের বন্দী করে আনা হবে, তারা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে তাদের মাথা সুবাদারের নিকট নিয়ে আসা হবে।[৪৯] শয়খ কামাল প্রথমে বীর হাম্বীরের রাজ্যে যান, বীর হাম্বীর যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করেন এবং তিনি নিজে শয়খ কামালকে শামস খানের রাজ্যে নিয়ে যান। বীর হাম্বীর আনুগত্য প্রদর্শনের পরামর্শ দিলেও শামস খান ১৫ দিন পর্যন্ত মোগল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। অবশেষে মোগল বাহিনী ডরনী পাহাড়ে অবস্থিত সুরক্ষিত দুর্গের নিকটে পৌছলে শামস খান শয়খ কামালের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং প্রতিরোধ করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষে শয়খ কামাল হিজলী গমন করেন। হিজলীর সলীম খানের সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেও সলীম খান নিজে আত্মসমর্পণ করাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন এবং সৈন্যদের কথায় কান না দিয়ে শয়খ কামালের সঙ্গে দেখা করেন এবং উপহারাদি দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। শয়খ কামাল বীর হাম্বীর, শামস খান ও সলীম খান এবং তাঁদের প্রদত্ত উপহারাদি সঙ্গে নিয়ে সুবাদারের নিকট ফিরে আসেন।[৫০]

মিরযা নাথন বলেন যে শয়খ কামাল এই তিনজন জমিদারকে সঙ্গে নিয়ে আলাইপুরে সুবাদারের সঙ্গে মিলিত হন,[৫১] কিন্তু আবদুল লতীফের ডায়রীতে এই সংবাদ একটু ভিন্নভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। আবদুল লতীফ বলেন যে সুবাদার যখন আলাইপুর থেকে এসে রানা তাড়াপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন সলীম খান, রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভাই এবং বীর হাম্বীর শয়খ কামালের সঙ্গে এসে সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁরা মোট ১০৯টি হাতি সুবাদারকে উপহার দেন।[৫২] ডায়রীতে বন্ধনীর মধ্যে জমিদারদের পরিচিতি দেয়া হয়েছে, সলীম খান (হিজলীর জমিদার), রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভাই (ঝাড়খণ্ড পাহাড়ের পাচেটের জমিদার) এবং বীর হাম্বীর (সরকার মন্দারণের রাজা)। এই পরিচিতি অবশ্যই অনুবাদক স্যার যদুনাথ সরকারের

Edited by Ripon Sarkar

দেয়া, কিন্তু সলীম খানের পরিচিতি ছাড়া অন্যদের পরিচিতি বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। মিরযা নাথন এক স্থানে বলেন যে "বীর হাম্বীর, শামস খান এবং সলীম খানের রাজ্যগুলি পরস্পর সংলগ্ন", কিন্তু এখানে জমিদারদের জমিদারীর নাম দেয়া হয়নি, কিন্তু অধ্যায়টির শিরোনামে মিরযা নাথন বলেন, "বীর হাম্বীর শামস খান সলীম খান যথাক্রমে বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদার ছিলেন।"[৫৩] তৃতীয় এক স্থানে মিরযা নাথন বলেন যে বীর হাম্বীর, শামস খান ও বাহাদুর খান (ইতোমধ্যে সলীম খানের মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর ভাইপো বাহাদুর খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন) যথাক্রমে পাচেট, বীরভূম ও হিজলীর জমিদার ছিলেন।[৫৪] সুতরাং দুটি সমসাময়িক সূত্র, আবদুল লতীফ এবং মিরযা নাথনের মধ্যে এবং মিরযা নাথনের দুটি বক্তব্যেও অসঙ্গতি রয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্যার যদুনাথ সরকার এই অসঙ্গতির প্রতি আমল দেননি, ডঃ এম. আই. বোরাহ বীর হাম্বীর, শামস খান ও সলীম খানকে যথাক্রমে পাচেট, বীরভূম ও হিজলীর জমিদার বলেছেন[৫৫] এবং ডঃ ভট্টাচার্য তাঁদের যথাক্রমে বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদার মনে করেছেন।[৫৬]

উড়িষ্যার সীমান্তে বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের ভৌগোলিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যায়। মেদিনীপুরের দক্ষিণ এবং পশ্চিমে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রেনেলের জরীপের সময়েও এই এলাকা ছিল জঙ্গলাকীর্ণ, বর্ধমান থেকে কটক পর্যন্ত একটি সরু সামরিক পথ ছাড়া এই এলাকা যাতায়াতের বিশেষ উপযোগী ছিল না। এই সরু সামরিক পথের পশ্চিমে ছিল জংগল এবং জঙ্গলে অসভ্য জাতির বসবাস। মিরযা নাথন বীরভূম, পাচেট ও হিজলীকে পরস্পর সংলগ্ন স্থান বলেছেন এবং শামস খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ডরনী পাহাড়ের দুর্গের কথা বলা হয়েছে। ডরনী পাহাড় ছোট নাগপুরের ডুরাণ্ডা পাহাড়ের সঙ্গে অভিন্ন,[৫৭] এই জঙ্গলাকীর্ণ এলাকাই ছিল পাচেট এবং পাচেট অবশ্যই বীরভূম ও হিজলির মধ্যবর্তী স্থান। মিরযা নাথন বলেন যে শয়খ কামাল প্রথমে বীরভূম, অতঃপর পাচেট এবং সবশেষে হিজলী আক্রমণ করেন। সামরিক কারণে সর্ব উত্তর দিকের রাজ্য প্রথমে, মধ্যম দিকের রাজ্য পরে এবং সবশেষে সর্ব দক্ষিণ রাজ্য আক্রমণ করার কথা, কারণ কোন দক্ষ সেনাপতি পেছনে শত্রু রেখে সামনে অগ্রসর হতে পারে না। সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করে বীর হাম্বীরকে বীরভূমের, শামস খানকে পাচেটের এবং সলীম খানকে হিজলীর জমিদার রূপে চিহ্নিত করা যায়। বীর হাম্বীর নাম নয়, এটা বিষ্ণুপুর রাজার উপাধি এবং স্মরণাতীতকাল থেকে বিষ্ণুপুরের সামন্ত রাজারা বীর হাম্বীর উপাধি গ্রহণ করতেন। বীরভূম বাঁকুড়া নিয়ে ছিল বিষ্ণুপুর রাজ্য, আকবরের সময়েও বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন, মানসিংহের ছেলে জগৎ সিংহকে রাজা হাম্বীর উড়িষ্যার কতলু খানের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন।[৫৮] আবদুল লতীফ একজন জমিদারকে "রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভাই" বলেছেন, এই রাজা ইন্দ্রনারায়ণের পরিচয় পাওয়া যায় না, তিনি মন্দারণ বা অন্য কোন স্থানের জমিদার ছিলেন। রাজা ইন্দ্রনারায়ণের ভাই রানা তাণ্ডাপুরে সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তিনি শয়খ কামালের সঙ্গে না থাকায় মিরযা নাথন তাঁর নাম উল্লেখ করেননি।

Edited by Ripon Sarkar

ভূষণার রাজা শত্রুজিতের বিরুদ্ধে অভিযান

বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের পরে ইসলাম খানের পেছনে দক্ষিণ বাংলার আরও দুটি বড় জমিদারী থেকে যায়, একটি রাজা প্রতাপাদিত্যের যশোর এবং অপরটি রাজা শত্রুজিতের ভূষণা। প্রতাপাদিত্য রাজমহলেই সুবাদারের নিকট তাঁর ছেলে এবং দূতকে উপহারসহ পাঠান, পরে গোয়াশ থেকে নদী পার হওয়ার সময় সুবাদারের নিকট একখানি দরখাস্ত পাঠান এবং তিনি নিজে দেখা করবেন কিনা জানতে চান। তাই বোধ হয় ইসলাম খান রাজা প্রতাপাদিত্যের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন। নদী পার হওয়ার সময় রাজা শত্রুজিতের ভাইও কয়েকটি হাতিসহ সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন, কিন্তু তবুও ইসলাম খান আলাইপুরে পৌঁছে ভূষণার শত্রুজিতের বিরুদ্ধে ইফতেখার খানের নেতৃত্বে একদল সৈন্য পাঠান।[৫৯] মনে হয় শত্রুজিত নিজে এসে দেখা না করায় ইসলাম খান তাঁর আনুগত্যে সন্দেহ পোষণ করেন।

ইফতেখার খানকে নির্দেশ দেয়া হয় যে যদি শত্রুজিত আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে তাঁর জমিদারী জায়গীর রূপে দেয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে এবং শত্রুজিতকে সসম্মানে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসা হবে। আর যদি শত্রুজিত যুদ্ধ করেন, তবে তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। শত্রুজিত মোগল অভিযানের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন এবং আতা খালের[৬০] তীরে একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু মোগল বাহিনী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুর্গের নিকট না গিয়ে খালের আরও উপরে খালটি যেখানে নাব্য ছিল, সেখানে পৌঁছে। স্মরণীয় যে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ শুষ্ক মৌসুমে এই অভিযান পরিচালিত হয়, সুতরাং নদীও স্থানে স্থানে শুকিয়ে যায়। শত্রুজিত যুদ্ধ করে কিন্তু মোগল বাহিনীকে বাধা দিতে অসমর্থ হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। ইফতেখার খান তাঁকে "ছেলে" উপাধি দেন এবং সুবাদারের নিকট নিয়ে আসেন।

আবদুল লতীফের ডায়রীতে দেখা যায় যে ইসলাম খান রাজা প্রতাপাদিত্য ও রাজা শত্রুজিতের আগমনের অপেক্ষায় আলাইপুরে বেশ কিছু দিন অবস্থান করছিলেন। কিন্তু তিনি যখন আলাইপুর থেকে যাত্রা করে ফতেহপুরে পৌঁছেন, সেখানে শত্রুজিত তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং ১৮টি হাতি উপহার দেন।[৬১] শত্রুজিতকে তাঁর জমিদারীতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তাঁকে বলা হয় যে ভাটি অভিযানের সময় তাঁকে যেরূপ আদেশ দেয়া হবে তিনি যেন সেভাবে কাজ করেন।[৬২] পরে ফতহাবাদের মজলিস কুতুবের বিরুদ্ধে মোগল বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়;[৬৩] এর পর থেকে শত্রুজিত মোগলদের পক্ষেই যুদ্ধ করেন।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ

ইসলাম খান ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকাল ঘোড়াঘাটে কাটান এবং ঐ বছরের ১৫ই অক্টোবর তারিখে ঘোড়াঘাট থেকে ভাটির দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে জমিদারদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ হয়। প্রথমে জমিদারেরা সোনাবাজু পরগণা আক্রমণ করে। সোনাবাজু ছিল ইহতিমাম খানের জায়গীর। ইসলাম খান এবং ইহতিমাম খান রাজমহলের নিকটে থাকতেই ইহতিমাম খানের সৈয়দ হাবীব নামক ভাতুড়িয়া বাজুর নিকটস্থ চিলাজওয়ারের একজন শিকদার (যাঁ রাজস্ব সংগ্রাহক) সংবাদ

Edited by Ripon Sarkar

দেয় যে সৈয়দ হাবীব নিজে চিলায় অবস্থান নেয় কিন্তু দিলীর বাহাদুর ও লুতফে আলী বেগ সোনাবাজু পরগণায় গিয়ে চাটমহলে অবস্থান নেয়। ইতোপূর্বে সোনাবাজু পরগণা মাসুম খান কাবুলীর ছেলে মিরযা মুমিন, খান আলম বাবুদীর ছেলে দরিয়া খান এবং খালসীর জমিদার মাধব রায়ের অধীনে ছিল। দিলীর বাহাদুর এবং লুতফে আলী বেগ যখন সুষ্ঠুভাবে তাদের কাজ সমাধা করছিল, তখন হঠাৎ উপরোক্ত জমিদারেরা একযোগে দুশ নৌকা, চারশ অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে দিলীর বাহাদুর এবং লুতফে আলী বেগকে আক্রমণ করে অবরোধ করে। অবরুদ্ধ মোগল বাহিনীর সকলেই নিহত হয়, শুধু দুজন আহত সৈন্য মারাত্মক শারীরিক জখম নিয়ে একটি গণ্ডোলায় (ছোট নৌকা) করে এবং দিলীর বাহাদুরের ছেলে আরও দুজন লোকসহ পায়ে হেঁটে চিলাজওয়ারে এসে সৈয়দ হাবীবের নিকট আশ্রয় নেয়। ইহতিমাম খান ইলাহদাদ খান ও শাহবাজ খান বরিজকে তিনশ অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্যসহ চিলাজওয়ারে সৈয়দ হাবীবের নিকট প্রেরণ করেন।[৬৪] মিরযা নাথনও আলাইপুর থেকে প্রথমে চিলাজওয়ারে এবং পরে চাটমহলে যান। পরে ইসলাম খান মিরযা নাথনের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য পাঠান। মিরযা নাথনের আগমনের সংবাদ পেয়ে জমিদারেরা ঐ এলাকা ছেড়ে সোনারগাঁয়ে মুসা খানের নিকট চলে যান।[৬৫]

ঐ একই সময়ে তুকমক খানকেও শাহজাদপুরে জায়গীর দেয়া হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে আলপসিংহ থানা জয় হওয়ার পরে বর্ষাকালে সেখানে থাকা নিরাপদ মনে না করে ইসলাম খান প্রত্যেক জায়গীরদারকে স্ব স্ব জায়গীরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তুকমক খান তাঁর জায়গীর শাহজাদপুরে চলে আসেন। রাজা রায় ছিলেন শাহজাদপুরের জমিদার। তুকমক খান শাহজাদপুর পৌঁছলে রাজা রায় তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাঁর ছেলে রঘু রায়কে তুকমক খানের নিকট রেখে দেন। কিন্তু বর্ষায় চতুর্দিক প্লাবিত হলে রাজা রায় তুকমক খানকে আক্রমণ করেন। তুকমক তিন দিন তিন রাত দুর্গে অবরুদ্ধ থাকেন, কিন্তু পরে সাহস করে বেরিয়ে আসেন এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করে রাজা রায়কে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য করেন। তুকমক খান রাজা রায়ের ছেলে রঘু রায়কে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাকে স্বীয় ভৃত্য নিয়োগ করেন। রাজা রায়ের ছেলেকে নীচ কাজে নিযুক্ত করায় ইসলাম খান তুকমক খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে তিরস্কার করেন। পরে শাস্তিস্বরূপ তুকমক খানকে শাহজাদপুর থেকে বদলী করা হয়।[৬৬]

অতঃপর জমিদারেরা চাঁদ প্রতাপ আক্রমণ করেন। বিনোদ রায় ছিলেন চাঁদ প্রতাপের জমিদার, ইসলাম খান মীরক বাহাদুর জালাইরকে চাঁদ প্রতাপে জায়গীর দেন। জমিদার বিনোদ রায় মিরযা মুমিন, দরিয়া খান এবং মাধব রায়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে চাঁদ প্রতাপে মীরক বাহাদুর জালাইরকে আক্রমণ করেন। ইতোপূর্বে এই জমিদারেরা সোনাবাজু পরগণা আক্রমণ করে দিলীর খান ও লুতফে আলী বেগকে হত্যা করেন। মীরক বাহাদুর জালাইর চাঁদ প্রতাপ দুর্গে অবরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সৌভাগ্যক্রমে সময়মত সংবাদ পেয়ে তুকমক খান শাহজাদপুর থেকে তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। তুকমক খান রাজা রায়ের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে অতি উৎসাহে জমিদারদের আক্রমণ করেন। জমিদারেরা হতবল হয়ে পড়ে এবং অবরোধ প্রত্যাহার করে পলায়ন করেন।[৬৭]

Edited by Ripon Sarkar

উপরোক্ত তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যথাক্রমে সোনাবাজু, শাহজাদপুর এবং চাঁদ প্রতাপ পরগণায়। তিনটি পরগণাই সরকার বাজুহার অন্তর্ভুক্ত। সোনাবাজু এবং শাহজাদপুর (ওরফে ইউসুফশাহী) বর্তমান পাবনার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। চাটমহল যেখানে প্রথম যুদ্ধ হয়, তা বর্তমানে চাটমোহর নামে পরিচিত। চাটমহল মাসুম খান কাবুলীর (মিরযা মুমিনের পিতা) রাজধানী ছিল, সুলতান উপাধিধারী মাসুম খান কাবুলীর শিলালিপি এই চাটমোহর থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছে। চাটমোহর বড়াল নদীর তীরে পাবনা থেকে উনিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। বর্তমানে চাটমোহর রেল স্টেশন প্রাচীন চাটমহল থেকে তিন মাইল দূরে। শাহজাদপুর করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত, বর্তমানেও একটি বিখ্যাত স্থান। খালসী পরগণা গঙ্গা-ধলেশ্বরীর মোহনার নিকটস্থ জাফরগঞ্জের পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। চাঁদ প্রতাপ পরগণা বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলায়, ধলেশ্বরী নদীর উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এই পরগণাগুলি বার-ভূঁঞার ভাটির নিকটে, প্রকৃতপক্ষে চাঁদ প্রতাপ পরগণা ভাটি এলাকাতেই অবস্থিত। ইসলাম খান তখনও ভাটির বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধ করেননি, সবে মাত্র ভাটি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অথচ এই সকল শত্রু এলাকায় ইহতিমাম খান এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের জায়গীর দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা হয়ত ইসলাম খান বার-ভূঁঞাকে ভয় দেখাতে চেয়েছেন বা হয়ত তিনি মোগল কর্মকর্তাদের সতর্কাবস্থায় রাখার জন্য বার-ভূঁঞার ভাটির সীমানায় এবং ভাটিতে জায়গীর দিয়েছিলেন।

কামতা কামরূপের সঙ্গে সম্পর্ক

ইসলাম খান শুধু পেছনে ফেলে আসা জমিদারদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি বাংলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত স্বাধীন রাজাদের মনোভাব সম্পর্কেও অবহিত হওয়ার উদ্যোগ নেন। ঘোড়াঘাটের উত্তর সীমান্তে কোচ বিহার। হিন্দু আমলে এই অঞ্চল প্রাগজ্যোতিষ ও কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুলতানী আমলে, বেশ কয়েকজন বাংলার সুলতান যেমন বখতিয়ার খলজী, গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী, মুগীস-উদ-দীন ইউজবক কামরূপ আক্রমণ করেন। প্রায় ঐ সময়েই শান জাতীয় অহোমগণ ব্রহ্মপুত্রের পূর্বাংশ অধিকার করায় এর নাম হয় আসাম। এ সময়েই কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম অংশে এক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোচ বিহারের নিকটে কামতা বা কামতাপুরে এর রাজধানী স্থাপিত হওয়ায় রাজ্যটি কামতা নামে পরিচিত হয়। বাংলার সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ কামতা ও কামরূপ জয় করেন। এর পরে ভূঁঞা উপাধিধারী কয়েকজন জননায়ক এই অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে; তাদেরই একজন কোচ জাতীয় বিশু অন্যদের পরাজিত করে আনুমানিক ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৪৯৬ বা ১৫৩০) কামতায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিশু উপাধি নেন বিশ্বসিংহ এবং রাজধানীর নাম হয় কোচ বিহার।

বিশ্বসিংহের আনুমানিক ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৩৩) মৃত্যু হলে তৎপুত্র নরসিংহ রাজা হন, অল্পদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর ভাই মল্লদেব নরনারায়ণ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। কোচ বিহারের রাজা নরনারায়ণ মোগলদের সমসাময়িক। সৌভাগ্যক্রমে নরনারায়ণ ও তাঁর ছেলে এবং পরবর্তী রাজা লক্ষীনারায়ণের মুদ্রা পাওয়া গেছে। নরনারায়ণের মুদ্রার তারিখ ১৪৭৭ শক বা ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ এবং লক্ষী নারায়ণের

Edited by Ripon Sarkar

মুদ্রার তারিখ ১৫০৯ শক বা ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ,[৬৮] অর্থাৎ নরনারায়ণ ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, কারণ কোচ বিহারের রাজারা সিংহাসনে আরোহণের স্মারকরূপে মুদ্রা উৎকীর্ণ করতেন। আমরা আগে দেখেছি যে ১৫৭৮ খ্রিস্টাব্দে কোচ বিহারের রাজা নরনারায়ণ সম্রাট আকবরের নিকট উপহারাদিসহ দূত পাঠান। নরনারায়ণ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেবকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে নরনারায়ণ বিয়ে করায় এবং তাঁর এক ছেলে হওয়ার সব ওলট পালট হয়ে যায়। রঘুদেব সিংহাসন লাভে নিরাশ হয়ে মনাস নদীর পূর্বদিকে একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করেন। নরনারায়ণ তাঁকে দমন করতে না পেরে তাঁর সঙ্গে মিটমাট করেন এবং স্থির করেন যে তাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ সনকোশ নদীর পশ্চিমের ভূভাগ এবং রঘুদেব ঐ নদীর পূর্ববর্তী ভূভাগে রাজত্ব করবেন। কোচ বিহার রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত হয়, পশ্চিম অংশ কামতা এবং পূর্ব অংশ কামরূপ নামে পরিচিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে নরনারায়ণের মৃত্যুর পরে লক্ষ্মীনারায়ণ কামতার রাজা হন, এদিকে রঘুদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র পরীক্ষিত নারায়ণ ১৫২৫ শক বা ১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে কামরূপের রাজা হন। লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন অপদার্থ, রাজ্য শাসনের গুণ তাঁর ছিল না, কিন্তু পরীক্ষিত ছিলেন পিতার যোগ্য উত্তরসূরী। কামরূপের পশ্চিম সীমান্তে ছিল সনকোশ নদী, মনাস নদীর তীরে বরানগরে ছিল রাজার বাসস্থান এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ধুবড়ীতে ছিল সুরক্ষিত দুর্গ।[৬৯] কামরূপের পরীক্ষিত নারায়ণের আগ্রাসনের মুখে কামতার লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলদের সঙ্গে সুসম্পর্ক কামনা করতেন। আবদুল লতীফের ডায়রীতে জানা যায় যে ইসলাম খান গোয়াশ থেকে নদী পার হওয়ার সময় কোচ রাজা মুকুট নারায়ণের দূত মুহাম্মদ ইয়ার সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং কোচ রাজার পক্ষ থেকে তিনটি হাতি এবং আশিটি টাঙ্গন ঘোড়া উপহার দেন।[৭০] এখানে আবদুল লতীফ নিজে বা অনুবাদক রাজার নাম ভুল করেছেন, কোচ বিহারের রাজার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, মুকুট নারায়ণ নয়, বাহরিস্তানে লক্ষ্মীনারায়ণ আছে, কোচ বিহারের ইতিহাসেও এ নামই পাওয়া যায়।

ইসলাম খান ঘোড়াঘাটে পৌঁছে কামতার লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কামরূপের পরীক্ষিতের নিকট দূত পাঠান এবং আনুগত্য প্রদর্শনের উপদেশ দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ সুসঙ্গ-এর জমিদার রঘুনাথের মারফত আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি ইসলাম খানের নিকট নযরানা এবং উপহার পাঠান এবং বলেন যে রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠালে তা যেন তাঁর (লক্ষ্মীনারায়ণের) রাজ্যের ভিতর দিয়ে পাঠান হয়। এর ফলে তিনি আত্মসমর্পণের এবং সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাত করার সুযোগ পাবেন। কিন্তু কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ আনুগত্য প্রদর্শন করতে অস্বীকার করেন। ইসলাম খান আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে এক বাহিনী কমরূপে পাঠান। আবদুল ওয়াহিদ ছিলেন মদ্যপ, যুদ্ধে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল না, তাই তিনি পরাজয় বরণ করে পলায়ন করেন এবং ইসলাম খানের নিকট ফিরে না এসে আগ্রায় চলে যান। ইসলাম খান তাঁর সম্পর্কে সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠান, সম্রাট আবদুল ওয়াহিদকে বন্দী করে আবার ইসলাম খানের নিকট পাঠিয়ে দেন। পরে অবশ্য ইসলাম খান আবদুল ওয়াহিদকে মুক্তি দেন।[৭১]

Edited by Ripon Sarkar

লাইব্রেরী

যুদ্ধে জয় লাভ করে পরীক্ষিত নারায়ণ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেন। তিনি জানতেন যে তাঁর জ্ঞাতি ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ এবং সুসঙ্গ এর জমিদার রঘুনাথ মোগলদের সঙ্গে মিত্রতা করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তাই মোগল আক্রমণ প্রতিহত করে তিনি কামতা ও সুসঙ্গ আক্রমণ করেন। তিনি কামতার বাহিরবন্দ ও ভিতরবন্দ নামক সীমান্ত পরগণাগুলি জয় করে তাঁর রাজ্যের সীমান্ত দক্ষিণ-পশ্চিমে সালকোনা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। সুসঙ্গ আক্রমণ করে পরীক্ষিত নারায়ণ সুসংগ-এর রাজার পরিবারবর্গকে বন্দী করে স্বদেশে নিয়ে যান। সুসঙ্গ-এর জমিদার রঘুনাথ যেহেতু মোগলদের মিত্র ছিলেন, তাঁর পরিবারবর্গকে মুক্ত করা ইসলাম খান তাঁর নিজ দায়িত্ব রূপে মনে করেন। কিন্তু ঐ সময় আবদুল ওয়াহিদের পলায়নের পরে ইসলাম খান কামরূপে আর কোন অভিযান পাঠান কিনা মিরযা নাথন তা উল্লেখ করেননি। মনে হয় ইসলাম খান আপাতত কামরূপ বিজয় মুলতবী রেখে ভাটি অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তবে ভাটি জয় করে, খাজা উসমানকে দমন করে ইসলাম খান ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে অনেক সৈন্য ও নৌবহর পাঠিয়ে কামরূপ আক্রমণ করেন এবং পরীক্ষিত নারায়ণকে পরাস্ত করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। এটা ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা এবং ইসলাম খানের মৃত্যুর আগে শেষ বিজয়। কামরূপ বিজয় পরে আলোচনা করা হবে।

ভাটি গমন এবং বার-ভুঁঞার পরাজয়

ইসলাম খান ঘোড়াঘাটে থাকতেই ভাটি অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অনেক কূটনৈতিক কার্যকলাপের ফলে তিনি ইতোমধ্যে উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ বাংলা শত্রুমুক্ত করে নিয়েছেন। এই এলাকার জমিদারেরা হয় আনুগত্য স্বীকার করে বা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদারেরা এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং উপহার প্রদান করেন। ভূষণার রাজা শত্রুজিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সুবাদারের সঙ্গে দেখা করে উপহার প্রদান করেন। তাঁকে ফতহাবাদের (ফরিদপুরের) মজলিশ কুতুবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মোগল বাহিনীর পক্ষে যোগ দেয়ার আদেশ দিয়ে স্বদেশে ফেরৎ পাঠান হয়। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ঘোড়াঘাটের পথে বজ্রপুরে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন এবং উপহার দেন। সুবাদার তাঁকে স্বদেশে ফেরত পাঠান এবং আদেশ দেন যেন তিনি নিজে স্বীয় সৈন্য ও নৌ-বাহিনীসহ ভাটির অভিযানের সময় মোগল বাহিনীর পক্ষে যোগ দেন। আরও বলা হয় তিনি যেন দেশে ফিরে তাঁর ছেলে সংগ্রামাদিত্যের অধীনে ৪০০ নৌকাসহ পাঠিয়ে দেন, সংগ্রামাদিত্য এই নৌকাসহ মীর বহর ইহতিমাম খানের অধীনে অবস্থান করবেন। প্রতাপাদিত্যকে আরও নির্দেশ দেয়া হয় যেন তিনি নিজে ২০ হাজার পদাতিক সৈন্য, ১০০ খানি নৌকা এবং এক হাজার মণ বারুদ নিয়ে ভাটি অভিযানের সময় মোগল বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন।[৭২] সরকার বাজুহার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধেও মোগল বাহিনী জমিদারদের পরাজিত করে তাদের শক্তি পরীক্ষা দেয়। কোচবিহার বা কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং সুসঙ্গ-এর রাজা রঘুনাথও মোগলদের প্রতি বশ্যতা স্বীকার করেন। সুতরাং পেছনে, ডানে, বামে শত্রুমুক্ত হয়ে ইসলাম খান ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর তারিখে ঘোড়াঘাট ত্যাগ করে ভাটি অভিযানে যাত্রা করেন।

Edited by Ripon Sarkar

ইসলাম খান প্রথমে মীর বহর ইহতিমাম খানকে করতোয়ার তীরে সিয়ালগড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইহতিমাম খান বর্ষাকালে যমুনা এবং আত্রাই নদীর সংযোগ স্থল আমরুল পরগণায় অবস্থান করছিলেন, তাঁকে বলা হয় তিনি যেন কুদিয়া খাল ধরে সিয়ালগড়ের দিকে যাত্রা করেন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত সেনাপতিদের ভাটি অভিযানে অংশ নেওয়ার উদ্দেশে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠান। তৃতীয়ত, ইসলাম খান তাঁর ভাই শয়খ হাবীব উল্লাহর নেতৃত্বে একদল বাহিনী ফতহাবাদের মজলিশ কুতুবের বিরুদ্ধে পাঠান, বেশ কয়েকজন সেনাপতি এবং সৈন্য ও নৌবাহিনী সেখানে পাঠান হয়। অতঃপর ইসলাম খান ঘোড়াঘাট ছেড়ে তিন মঞ্জিলে সিয়ালগড় পৌছেন। এখানে পৌছে তিনি দেখেন যে ইহতিমাম খানের রাজকীয় নৌবহর তখনও এসে পৌছেনি। তিনি ইহতিমাম খানের প্রতি বিরক্ত হন এবং ইহতিমাম খানের নিকট চিঠি পাঠিয়ে নিজে শাহজাদপুর গমন করেন। এদিকে ইহতিমাম খান তাঁর নৌবহর নিয়ে কুদালিয়া খালে পৌছে দেখেন যে খালের পানি শুকিয়ে গেছে এবং নৌবহর অতিক্রম করা সম্ভব নয়। তাঁরা এমন অবস্থায় পড়েন যে সামনে যাওয়াও সম্ভব নয়, আবার পেছনে আত্রাই নদীতে ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। তখন ইহতিমাম খান ও মিরযা নাথন পরামর্শ করে খালে বাঁধ দেন যাতে কিছু পানি জমা হয় এবং সেই সুযোগে নৌকা পার করে নেয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এই বাঁধেও কাজ হল না, কারণ পানির প্রবাহ ছিল অত্যন্ত কম। তখন মিরযা নাথন সিয়ালগড়ের দিকে যাত্রা করেন, তিনি প্রথমে একটি কোশা নৌকা নেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কোশা চলতে অসুবিধা হলে আরও ছোট একটি খেলনা নৌকা নেন, কিছুদূর গেলে খেলনা নৌকাও অকেজো হয়ে যায়, তখন তিনি একটি অত্যন্ত ছোট অর্থাৎ গন্ডোলা নৌকা নেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে পানির অভাবে গন্ডোলাও আর চলে না। তখন মিরযা নাথন পায়ে হেঁটে কাদার ভিতর দিয়ে যাত্রা করেন এবং রাত শেষ হওয়ার আগে সিয়ালগড়ে পৌছেন। পরের দিন মিরযা নাথন হাতি এবং ঘোড়া নিয়ে সিয়ালগড় থেকে যাত্রা করেন এবং করতোয়া নদীর সঙ্গে কুদিয়া খালের কোন সংযোগ স্থাপন করা যায় কিনা পরীক্ষা করে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ তিনি দুটি বৃহৎ জলা এবং একটি দহ (দহ অর্থ বড় জলাশয়, তাই এটাও একটি জলা হবে) দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার লোক নিযুক্ত করে খাল কেটে ঐ জলাগুলির পানি কুদিয়া খালে প্রবাহিত করেন। ফলে কুদিয়া খালে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পায় এবং ইহতিমাম খান ও মিরযা নাথন নৌবহর সিয়ালগড়ে নিয়ে আসেন। মিরযা নাথন বলেন যে নৌবহরের আটকা পড়া স্থান থেকে সিয়ালগড় পর্যন্ত দূরত্ব ৫৫ ক্রোশ বা ১১০ মাইল। বুঝা যায় যে নৌবহর আমরুল থেকে যাত্রা করে অল্প পরেই আটকা পড়ে যায়।[৭৩] জলাগুলি অবশ্যই চলনবিলের উত্তরে রাজশাহীর উত্তর-পূর্বে এবং বগুড়ার উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত কোন বিল হবে। সিয়ালগড়ে পৌছেই ইহতিমাম খান শাহজাদপুরের দিকে যাত্রা করেন এবং সেখানে সুবাদারের সঙ্গে মিলিত হন। ইতোমধ্যে ঈদ-উল-ফিতর এসে পড়ায় তাঁরা শাহজাদপুরে ঈদ-উৎসব পালন করেন।[৭৪] ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ঈদ-উল-ফিতর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই অক্টোবর ঘোড়াঘাট থেকে যাত্রা করে ইসলাম খান ও মোগল বাহিনী ডিসেম্বরের মধ্যে, অর্থাৎ প্রায় আড়াই মাসে শাহজাদপুর পৌছেন।

Edited by Ripon Sarkar

শাহজাদপুরে ঈদের নামাজ পড়ে ইসলাম খান রাজকীয় নৌবহর এবং মনসবদার ও জায়গীরদারদের নৌবহর পরিদর্শন করেন। সুবাদার তাঁর নিজের নৌকা "চাঁদনী" বা 'ফতেহদরিয়া'য় চড়ে মহড়া প্রত্যক্ষ করেন। রাজকীয় নৌবহর এমন সুন্দর মহড়া প্রদর্শন করে যে ইসলাম খান এবং অন্যান্য সকলে ইহতিমাম খান এবং বিশেষ করে মিরযা নাথনের বিশেষ প্রশংসা করেন। অতঃপর ইসলাম খান ঘোড়ায় চড়ে সড়ক পথে বালিয়া গমন করেন এবং ইহতিমাম খানকেও নৌবহর ও গুলন্দাজ বাহিনী নিয়ে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ইসলাম খান তিন মঞ্জিলে বালিয়া পৌঁছেন, কিন্তু ইহতিমাম খান আঁকাবাঁকা নদীপথে যাওয়ায় তাঁর বালিয়া পৌঁছতে পনর দিন সময় লাগে। বালিয়ায় ইসলাম খান ইহতিমাম খান ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মসূচি নির্ধারণ করেন। স্থির হয় যে ইহতিমাম খান নৌবহর নিয়ে খাল-যোগিনী ত্রিমোহনায় যাবেন এবং ইসলাম খান কাটাসগড় মোহনায় যাবেন। কাটাসগড়ে পৌঁছে ইসলাম খান যেরূপ নির্দেশ দেবেন, সকলে সেমতে কাজ করবেন। বালিয়া থেকে ইসলাম খান শয়খ কামাল, তুকমক খান এবং মীরক বাহাদুর জালাইরকে ঢাকা গিয়ে দুর্গ নির্মাণ করার (বা মেরামত করে সুবাদারের বাসের উপযুক্ত করার) নির্দেশ দেন। তাঁদের সঙ্গে বিশটি নৌকা, এক হাজার বন্দুকধারী বাহিনী, পাঁচটি ছোট বড় কামান, একশ মণ বারুদ, একশ মণ সীসা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় রসদপত্র দেয়ার জন্য ইহতিমাম খানকে নির্দেশ দেয়া হয়। শয়খ কামাল এবং অন্যান্যরা আরও মনসবদার সঙ্গে নিয়ে ঢাকা রওয়ানা হন এবং ঢাকা পৌঁছে দুর্গ নির্মাণের কাজে লেগে যান। ইহতিমাম খান পরের দিন খাল-যোগিনীর ত্রিমোহনায়[৮] পৌঁছে প্রত্যেক মোহনায় একটি করে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইসলাম খান কাটাসগড়ে পৌঁছে ইহতিমাম খানকে সেখানে যাওয়ার নির্দেশ দেন।

ইসলাম খান বালিয়া থেকে ঢাকায় কেন সৈন্য পাঠালেন বুঝা মুশকিল। যাদের ঢাকা পাঠান হয় তাদের জন্য পথটি নিরাপদ ছিল না, কারণ সবেমাত্র বার-ভূঁঞার এলাকা শুরু হয়েছে, মুসা খানের যাত্রাপুর নামক দুর্ভেদ্য দুর্গ তখনও আক্রমণই করা হয়নি, শুধু মাত্র আক্রমণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। শত্রুদের দৃষ্টি ইসলাম খানের গতিবিধি থেকে অন্যত্র সরান বা শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্যই কি ইসলাম খান ঢাকায় বাহিনী পাঠান তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। এই বাহিনী কোন বিপদের সম্মুখীন না হয়ে সত্যি সত্যিই ঢাকায় পৌঁছে এবং ঢাকায় দুর্গ নির্মাণের কাজে হাত দেয়। মুসা খান জানতেন ইসলাম খানের সঙ্গে তাঁর শক্তি পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী, তাই হয়ত শয়খ কামালের নেতৃত্বে ঢাকাগামী এই বাহিনীকে আক্রমণ করে মুসা খান তাঁর শক্তি ক্ষয় করতে চাননি। ঢাকায় দুর্গ নির্মাণের জন্য লোক পাঠিয়ে ইসলাম খান গভীর আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দেন; তিনি মুসা খান ও বার-ভূঁঞাকে পরাজিত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়েই অভিযান পরিচালনা করছিলেন। ঢাকায় সম্রাট আকবরের সময় থেকে একটি থানা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই মনে হয় ঢাকায় তখন থেকে একটি দুর্গও নির্মিত হয়। ইসলাম খান শয়খ কামাল এবং অন্যান্যদের হয় এই পুরাতন দুর্গ মেরামতের বা নতুন দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় এই দুর্গ নির্মিত হয়, দুর্গের চিহ্ন বর্তমানে পাওয়া যায় না, তবে দুর্গের পার্শ্বস্থ স্থান এখনও কিল্লা নামে পরিচিত।

Eidited by Ripon Sarkar

এখন মোগল বাহিনী বার-ভূঁঞার প্রায় মুখোমুখি এসে পড়েছে। কাটাসগড়ের পরেই ছিল বার-ভূঁঞা এবং ভূঁঞা-প্রধান মূসা খানের দুর্ভেদ্য দুর্গ যাত্রাপুর। যাত্রাপুর ঢাকার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত।[৭৬] মূসা খান মিরযা মুমিন, দরিয়া খান এবং মাধব রায়কে যাত্রাপুরে পাঠান এবং দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দেন। মূসা খান বলেন যে মোগল বাহিনী যাত্রাপুর আক্রমণ করলে তিনি নিজে সকল বার-ভূঁঞাসহ যাত্রাপুর আসবেন এবং যুদ্ধে তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। বুঝা যায় যে মূসা খান এবং বার-ভূঁঞাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, মোগল বাহিনী যেমন ধীরে ধীরে সতর্কভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, বার-ভূঁঞাও মোগলদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কোন এক কারণে মিরযা মুমিন ও তার ছেলেরা দরিয়া খানকে হত্যা করে এবং যাত্রাপুর দুর্গে ভূঁঞাদের মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মিরযা মুমিন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন, শত্রুদের আক্রমণের মুখে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হওয়ায় তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং বিশেষ করে মূসা খানের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। মাধব রায় মনে করেন যে মিরযা মুমিন মনের এই অবস্থায় মোগলদের পক্ষে চলে যেতে পারেন, তাই তিনি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে মূসা খানের নিকট চিঠি পাঠান। এদিকে যাত্রাপুরে ভূঁঞাদের অন্তর্বিরোধের খবর ইহতিমাম খানের নিকট পৌঁছে। তিনি ইসলাম খানের নিকট সংবাদ পাঠান যে মিরযা মুমিন দরিয়া খানকে হত্যা করায় যাত্রাপুরে জমিদারদের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করছে, তাই এই সুযোগে সুবাদারের অনুমতি পেলে তিনি যাত্রাপুরে নৌবাহিনী পাঠাতে পারেন। মিরযা মুমিন যুদ্ধ করলে হয় তাঁকে সশরীরে ধরে আনা হবে, নতুবা তার মাথা কেটে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসা হবে। ইসলাম খান এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না; মিরযা মুমিন দূত মারফত আত্মসমর্পণের ভান করলেও ইসলাম খান তা মেনে নিলেন না। তিনি সুসঙ্গ-এর রাজা রঘুরায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং কাটাসগড় থেকে যাত্রাপুর পর্যন্ত পর পর কতকগুলি প্রতিবন্ধক দেয়াল নির্মাণের আদেশ দেন। স্থল বাহিনীকে দেয়ালের আড়ালে পরিখায় নিযুক্ত করে তাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়। নৌবহরকে স্থল বাহিনীর পেছনে থাকতে বলা হয়, এবং স্থল ও নৌবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ইসলাম খান যাত্রাপুর দুর্গ জয় করার পরিকল্পনা করেন। এদিকে মূসা খান মাধব রায়ের চিঠি পেয়ে সকল ভূঁঞাকে নিয়ে ইছামতি নদীতে আসেন,[৭৭] তাঁর সঙ্গে ছিল কোশা, জালিয়া, ধুরা, সুন্দর, বজরা এবং খেলনা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের সাতশ নৌকা। মূসা খান এবং ভূঁঞারা আসার সাথে সাথে মিরযা মুমিন ও মাধব রায়ও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন।[৭৮]

রাত্রে মূসা খান এবং ভূঁঞারা ডাকছড়া[৭৯] নামক একটি স্থানে যান এবং সেখানে রাতারাতি একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। পদ্মার দিকে, অর্থাৎ যেদিকে মোগল বাহিনী অপেক্ষা করছিল, সেদিকে একটি গভীর পরিখাও খনন করা হয়। মিরযা নাথন বলেন যে বাংলায় গৌড়, রাজমহল, ঘোড়াঘাট এবং ঢাকা ছাড়া কোথাও তেমন ভাল দুর্গ ছিল না, কিন্তু বাংলার ভূঁঞারা মাঝি মাল্লার সাহায্যে প্রয়োজন হলে রাতারাতি এমন শক্ত দুর্গ নির্মাণ করতে পারত যে দক্ষ নির্মাতারাও কয়েক মাসে বা বছরে ঐরূপ দুর্গ নির্মাণ করতে পারত না। ডাকছড়া দুর্গ নির্মাণ করে মূসা খান সেখানে কামান এবং অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র স্থাপন করেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মোগল বাহিনীও মূসা খানের গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে, ডাকছড়া দুর্গ নির্মাণ করাতেই তারা বুঝতে পারে যে মূসা খান যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এবং যুদ্ধ অত্যাসন্ন। মূসা খান বুঝতে পারেন যে

Edited by Ripon Sarkar

মোগলদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা হবেই, তাই তিনি মোগলদের যাত্রাপুরে যাওয়ার পূর্বে পথেই বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। সকালে ইসলাম খান চিশতী মোগল বাহিনীর অবস্থান পরিদর্শন করেন এবং প্রত্যেক সেনাপতির জন্য নির্দিষ্ট পরিখার কাজ তত্ত্বাবধান করে নিজের জন্য নির্দিষ্ট পরিখায় যান এবং ভোজে লিপ্ত হন। এমন সময় মুসা খান আক্রমণ আরম্ভ করেন এবং কামান দাগাতে থাকেন। মুসা খানের কামানের প্রথম গোলা ইসলাম খানের খাবার টেবিলে এসে পড়ে, থালা বাসন, পেয়ালা পিরিচ, চামচ ভেঙ্গে ফেলে এবং ইসলাম খানের বিশ ত্রিশ জন অনুচর নিহত হয়। দ্বিতীয় গোলা হাতির পিঠে উপবিষ্ট ইসলাম খানের পতাকাবাহীকে এমনভাবে আঘাত করে যে পতাকাসহ পতাকাবাহী খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত চলতে থাকে। মোগল বাহিনী পরিখা থেকে যুদ্ধ করলেও তাদের অবস্থান ছিল অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়, তারা ছিল পদ্মার তীরে, এবং ভুঁঞারা ছিল নদীতে, তারা নৌকা থেকে কামান দাগতে থাকে। ভুঁঞাদের অনেক লোক নিহত হয়, তাদের কয়েকটি কোশা নৌকা ডুবে যায়, খালসীর জমিদার মাধব রায়ের ছেলে এবং চাঁদপ্রতাপের জমিদার বিনোদ রায়ের ভাই মৃত্যুবরণ করেন। ঠিক মধ্যাহ্নের সময় ভুঁঞারা নদীর অপর পারে চলে যান এবং ইসলাম খান তাঁর শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন। মোগল সেনাপতিরাও নিজ নিজ পরিখায় চলে যায়। দ্বিতীয় দিন সকালে ইসলাম খান তাঁর অভ্যাসমত পরিখা পরিদর্শনে আসেন, মুসা খানও আবার আক্রমণ শুরু করেন। মাধব রায় এবং বিনোদ রায় বিগত দিনে তাঁদের ছেলে ও ভাই হারাবার প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে তাঁদের নৌকা নিয়ে নদীর তীরে চলে আসেন এবং নৌকা থেকে নেমে শত্রুদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত হন। ভুঁঞারা যতবারই অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করে, মোগল বাহিনী ততবারই প্রতি আক্রমণ করে তাদের পেছনে হটিয়ে দেয়। অবশেষে ভুঁঞারা তাদের নৌকায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়। তৃতীয় দিন মোগল বাহিনী ভুঁঞাদের এমনভাবে হটিয়ে দেয় যে তারা আর অগ্রসর হতে পারে না; অনেক সৈন্য নদীতে ডুবে মারা যায়। মোগল বাহিনী তাদের পরিখায় ফিরে এসে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত করার উদ্যোগ নেয়।[৮০]

যুদ্ধের উপরোক্ত বিবরণ মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়। যদিও মিরযা নাথন বলেন যে মোগল বাহিনী ভুঁঞাদের অনেক ক্ষতি করে, প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষের জয় হয়েছে বলে মনে হয় না। বার-ভুঁঞার ডাকছড়া দুর্গ তখনও তাদের অধিকারে ছিল, ইসলাম খান এই দুর্গ জয় করতে পারেননি, এবং মুসা খান বা বার-ভুঁঞাকে তাঁদের অবস্থান থেকে হটাতে পারেননি। যুদ্ধের পূর্বে উভয় পক্ষ যে যেখানে ছিল, সেখানেই থেকে যায়।

এদিকে বার-ভুঁঞার সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল যখন অমীমাংসিত, তখন শয়খ হাবীব উল্লাহর নেতৃত্বে মোগল বাহিনী ফতহাবাদের মজলিশ কুতুবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে। শয়খ হাবীব উল্লাহ অনেক পথ অতিক্রম করে মাটি ভাঙ্গা[৮১] (মাথাভাঙ্গা) মোহনা অধিকার করেন এবং ফতহাবাদের বিরাট অংশ লুট করেন এবং ফতহাবাদ দুর্গ অবরোধ করেন। মজলিশ কুতুব তাঁর এই দুরবস্থার সময় মুসা খানকে চিঠি লিখে বলেন যে তাঁর একার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তা তিনি করেছেন। এখন যদি মুসা খান তাঁর সাহায্যে আসেন তাহলে তিনি যতদিন জীবিত থাকবেন, মুসা খানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। কিন্তু যদি মুসা খান তাঁকে সাহায্য না করেন, তাহলে তিনি মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন এবং মোগলদের পক্ষ নিয়ে

Edited by Ripon Sarkar

ফতহাবাদ থেকে মুসা খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বাধ্য হবেন। মুসা খান বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন এবং মিরযা মুমিনের নেতৃত্বে দুশ নৌকা এবং আরও কয়েকজন জমিদারসহ এক বাহিনী মজলিশ কুতুবের সাহায্যার্থে পাঠান। মিরযা মুমিন পদ্মার ধার দিয়ে মোগল বাহিনীর পরিখা অতিক্রম করে অগ্রসর হন এবং শয়খ হাবীব উল্লাহর দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু ভূষণার রাজা শত্রুজিত অন্য দিক থেকে শয়খ হাবীব উল্লাহর সাহায্যার্থে আসেন। তিনিও মাথাভাঙায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং মিরযা মুমিনের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয় কিন্তু শয়খ হাবীব উল্লাহ ও রাজা শত্রুজিতের মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে মিরযা মুমিন সুবিধা করতে পারলেন না। মিরযা মুমিন এবং তাঁর সংগী জমিদারেরা চিন্তা করেন যে তাঁদের সম্মুখে যেমন শত্রু, পেছনেও শত্রু, সুতরাং তাঁরা মুসা খানের নিকট ফিরে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। তাঁরা আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে ফিরবার চেষ্টা করেন কিন্তু অপারগ হয়ে যে পথে আসেন সেই পথেই মুসা খানের নিকট ফিরে যান। ইহতিমাম খান তাঁদের আক্রমণ করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু ইসলাম খান তাতে রাজি হলেন না।[৮২] পরে মুসা খান ও বার-ভুঁঞা পরাজিত হলে মজলিশ কুতুব আত্মসমর্পণ করা শ্রেয় মনে করেন। শয়খ হাবীব উল্লার সঙ্গে তিনি ইসলাম খানের নিকট আসেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন। জমিদারী তাঁকে ফেরত দেয়া হয়, কিন্তু ইসলাম খান তাঁর নৌবহর বাজেয়াপ্ত করেন। মজলিস কুতুবও মোগল বাহিনীতে যোগ দেন।[৮৩]

এদিকে ইসলাম খানও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, কিভাবে ডাকছড়া দুর্গ জয় করা যায় তিনি তা ভাবতে থাকেন। তিনি সকল সেনাপতিকে ইফতিখার খানের নেতৃত্বে ডাকছড়া দুর্গ জয় করার নির্দেশ দেন, কিন্তু ডাকছড়া দুর্গ জয় করা সহজ ছিল না। এই দুর্গের একদিকে ছিল নদী এবং অপর তিনদিকে জলা, ফলে মোগল অশ্বারোহী বাহিনী দুর্গের নিকটে যেতে পারে না। অন্যদিকে মোগল নৌবহরও দুর্গের নিকটে যেতে পারে না, কারণ নৌবহরের অবস্থান স্থল থেকে ডাকছড়া পর্যন্ত কোন নৌপথ ছিল না। এমন সময় সুসঙ্গ-এর রাজা রঘুনাথ একটি প্রস্তাব দেন। তিনি বলেন যে ইফতিখার খান এবং মুতাকিদ খানের পরিখার মধ্যবর্তী স্থানে একটি খাল আছে যার মুখ বালি পড়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খালটি শুকিয়ে গেছে। খালের মুখের বালির পাহাড় কেটে পানি প্রবাহিত করতে পারলে রাজকীয় নৌবহর ইছামতি নদীতে নেয়া যাবে এবং ডাকছড়া ও যাত্রাপুর উভয় দুর্গ সহজে জয় করা যাবে। ইসলাম খান এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কর্মকর্তাদের খাল কাটার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিন দিন পরে খাল কাটায় কোন অগ্রগতি না হওয়ায় মিরযা নাথনকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়। মিরযা নাথন নৌবহরের বার হাজার মাল্লার মধ্যে দু হাজার মাল্লা নৌকায় রেখে বাকি দশ হাজার মাল্লাকে খাল কাটার কাজে নিয়োগ করেন। তিনি তাদের তামার মুদ্রা, চাল, ভাঙ এবং আফিম দিয়ে তাদের কাজে উৎসাহ দেন এবং সাত দিনের মধ্যে খাল কাটার কাজ সমাধা করেন।[৮৪]

মুসা খান এখন মনে করেন যে তাঁর পক্ষে মোগলদের বাধা দেয়া সম্ভব হবে না, তাই তিনি ইহতিমাম খান, ইফতিখার খান ও মুতাকিদ খানের নিকট দূত পাঠান। ডাকছড়া দুর্গ এবং মোগল পরিখার মধ্যবর্তী স্থানে উপরোক্ত মোগল কর্মকর্তারা মুসা খান এবং তাঁর ভাইদের সঙ্গে দেখা করেন। উপরোক্ত মোগল কর্মকর্তারা কোরান ছুঁয়ে শপথ করে মুসা খানের নিরাপত্তার অঙ্গীকার করেন। মুসা খানের ভাইয়েরা অমত প্রকাশ

Edited by Ripon Sarkar

করলেও মুসা খান কর্মকর্তাদের শপথে বিশ্বাস করে ইসলাম খানের শিবিরে গমন করেন। ইসলাম খান মুসা খানের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন এবং তাঁর সম্মানে ভোজের আয়োজন করেন এবং ভোজের পরে উপহারাদি দিয়ে মুসা খানকে স্বীয় শিবিরে পাঠিয়ে দেন। উপহারাদির মধ্যে ছিল একটি সম্মানসূচক পোশাক, একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারির খাপ, একটি ইরাকি ও একটি তুর্কি ঘোড়া, ও একটি বাজপাখি। পরের দিনও মুসা খান সুবাদারের শিবিরে গমন করেন, কিন্তু তৃতীয় দিনে মুসা খান সুবাদারের শিবিরে গেলে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। একজন নর্তকীর স্বামী মুসা খানের অধীনে চাকরি করত এবং এই লোক কোন কারণে মুসা খান কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। নর্তকী ইসলাম খানের নিকট এসে এর প্রতিকার কামনা করে এবং ইসলাম খান মুসা খানের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য না রেখে মুসা খানকে এই ব্যাপারে ভর্ৎসনা করেন। মুসা খান তাঁর শিবিরে ফিরে এসে আবার বিদ্রোহ করেন, দুর্গ সুরক্ষিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার সংকল্প করেন।[৮৫]

স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে নর্তকীটি ইসলাম খানের,[৮৬] কিন্তু মিরযা নাথনের বর্ণনায় এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। ইসলাম খান যেরূপ স্বেচ্ছাচারী ও দাম্ভিক ছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে মুসা খানকে ভর্ৎসনা করার কথা বিশ্বাসযোগ্য। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে মুসা খান বশ্যতা স্বীকারের ভান করে সুবাদারের শিবিরে যান এবং কালক্ষেপণ করেন। ইসলাম খান মুসা খানের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরে তাঁর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেননি।[৮৭] মুসা খানের পক্ষে এরূপ ভান করা অসম্ভব নয়, ঐ সময় মোগল বশ্যতা স্বীকার করলে দুর্গসহ তাঁর সম্পূর্ণ এলাকা তাঁর অধিকারে থাকত এবং পরে আরও শক্তি সঞ্চয় করে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারতেন। ইসলাম খানের সঙ্গে মুসা খানের আপস আলোচনার কোন বিবরণ, এমনকি ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। ইসলাম খান মুসা খানকে তাঁর সম্পূর্ণ এলাকা ফিরিয়ে দিতে চান কিনা তাও জানা নেই। এমনও হতে পারে যে একটি গ্রহণযোগ্য আপসে পৌঁছুতে না পারায় মুসা খান আবার বিদ্রোহ করেন। যা হোক, প্রকৃত অবস্থা যে কি সঠিক বলা যায় না।

মুসা খান আবার বিদ্রোহ করার পরে ইসলাম খান এক নতুন পরিকল্পনা নেন। ডাকছড়া দুর্গ দখলের চেষ্টা না করে তিনি এখন নৈশ আক্রমণ করে যাত্রাপুর দুর্গ দখল করার পরিকল্পনা নেন। মিরযা নাথন তখনও খাল কাটার কাজে ব্যস্ত, এদিকে ইসলাম খান ইফতিখার খান, মুতাকিদ খানসহ কয়েকজন মনসবদারকে ডাকছড়া দুর্গের দিকে অগ্রসর হয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেতে বলেন। অন্যদিকে শয়খ কামালকে ঢাকা থেকে মীরক বাহাদুর জালাইর ও তুকমক খানকে ঢাকায় অবস্থানরত বিশখানি নৌকাসহ যথাক্রমে কাত্রাবিয়া ও কোদালিয়া[৮৮] মোহনায় চলে আসতে বলেন। ইসলাম খান নিজে আবদুল ওয়াহিদ ও তাঁর নিজস্ব বাহিনী নিয়ে কাটাসগড় থেকে অগ্রসর হয়ে রাত্রির শেষ প্রহরে কাত্রাবিয়া মোহনায় এসে পড়েন। ইসলাম খান ঐ বিশখানি নৌকায় ইছামতি নদী পার হতে থাকেন, এমন সময় এ সংবাদ মুসা খানের নিকট পৌঁছে। মুসা খান তাঁর নৌ-বাহিনী নিয়ে দ্রুত চলে আসেন, কিন্তু ইসলাম খান হাতির পিঠে তাঁর সমুদয় বাহিনী নদী পার করেন এবং শত্রুর নৌবাহিনী এসে পড়ার আগেই নদী পার হতে সক্ষম হন। শত্রুরা গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না, ইসলাম খান যাত্রাপুর দুর্গ অধিকার করেন।[৮৯]

Edited by Ripon Sarkar

যাত্রাপুর দুর্গ অধিকার করে ইসলাম খান তাঁর সৈন্যদের ঐদিক থেকে ডাকছড়া দুর্গ আক্রমণের নির্দেশ দেন। অন্যদিকে মিরযা নাথনের খালকাটা শেষ হলে মোগল নৌবহর খালের ভিতর দিয়ে ইছামতি নদীতে অগ্রসর হয়, ফলে স্থল এবং নৌ-বাহিনী যুগপৎ ভাবে ডাকছড়া দুর্গ আক্রমণ করে। সুবাদার মিরযা নাথনকে ডাকছড়া দুর্গ অধিকার করার দায়িত্ব দেন, স্মরণীয় যে ইফতিখার খান, মুতাকিদ খান প্রমুখ সেনাপতিরা আগেই সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন। মিরযা নাথন সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা নেন। মোগল বাহিনী প্রথম চোটে যতটুকু এলাকা অগ্রসর হয় সেখানে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবন্ধক দেয়াল নির্মাণ করে এবং দেয়ালের আড়ালে থেকে দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করে এবং এভাবে মোগল বাহিনী অগ্রসর হতে থাকে। মিরযা নাথন মাটিতে তিন হাজার টাকা রাখেন এবং যারা জখম হয় তাদের, এবং যারা নিহত হয় তাদের আত্মীয়দের মধ্যে মুঠি মুঠি টাকা বিতরণ করতে থাকেন। ফলে সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ নেয়। শত্রুরাও দুর্গের ভিতর থেকে এবং নদী থেকে গোলা ছুঁড়তে থাকে, ফলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। মোগল নৌবহরে গাড়ি (চাকা বা রথ) বসিয়ে পুলের মত তৈরি করা হয়েছিল, যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে মিরযা নাথন গাড়িগুলি নৌকা থেকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেন যাতে সৈন্যরা গাড়ির আড়ালে থেকে গোলা বর্ষণ করতে পারে। মিরযা নাথন আগে থেকেই ঘাস এবং মাটি জমা করে রেখেছিলেন। এখন তিনি অর্ধেক নাবিককে ঘাসের আঁটি এবং বাকি অর্ধেককে ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি গাড়ির পেছনে রাখতে নির্দেশ দেন, ফলে গাড়িগুলি দেয়ালের কাজ করে। এ সকল প্রতিবন্ধকের আড়াল থেকে মোগল বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করে। যে সকল মোগল সেনাপতি বিগত পঁয়ত্রিশ দিন ধরে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন, তাঁরা এ যুদ্ধে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। মিরযা নাথন তাঁদের যুদ্ধে অংশ নিতে অনুরোধ করে লোক পাঠান এবং বলেন তিনি যখন মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত তখন কি তাঁদের নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত? ইফতিখার খান উত্তর দেন যে তাঁদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের আশা করা মিরযা নাথনের উচিত নয়। তাঁরা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিলেন, কিন্তু নাথন অপরিণামদর্শীর মত হঠাৎ যুদ্ধ শুরু করেছেন, সুতরাং যুদ্ধের দায়দায়িত্ব তাঁর একার। মীরক বাহাদুর উত্তর দেন যে তাঁর বারুদ ফুরিয়ে গেছে এবং আবদুল ওয়াহিদ যুদ্ধ করার ভান করেন। এদিকে ইসলাম খান সেনাপতিদের নিষ্ক্রিয় থাকার খবর পেয়ে প্রত্যেকের নিকট লোক পাঠিয়ে যুদ্ধে অংশ নেয়ার নির্দেশ দেন এবং মিরযা নাথনের সাহসের তারিফ করেন। নাথন মীরক বাহাদুরের নিকট বারুদ পাঠিয়ে বলেন যে গোলাবারুদের কোন অভাব নেই, যে কোন ভাবে শত্রুদের প্রতি গোলা বর্ষণ করতে হবে, যাতে তারা দুর্গের দেয়াল ও বুরুজের উপর মাথা তুলতে না পারে। অন্যদিকে মূসা খানও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তাঁর দুর্গের একদিকে পরিখা ও অন্য তিন দিকে জলা ছিল। তিনি পরিখা ও জলার বহির্দিকে ছুঁচালো বাঁশ পুঁতে দিয়ে দুর্গকে আরও সুরক্ষিত করেন। মিরযা নাথন তাঁর নৌবহরের মাল্লাদের দুই ভাগে ভাগ করেন, এক ভাগকে ঘাস ও অন্য ভাগকে মাটি দিয়ে তৈরি করে রাখেন। দুর্গের নিকটে গেলে তারা ঘাস ও মাটি দিয়ে বাঁশের ফলা মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে থাকে, অনুরূপভাবে ঘাস ও মাটি দ্বারা দুর্গের পরিখা ভরাটের কাজও চলতে থাকে। এই প্রক্রিয়া সন্ধ্যার পরে শুরু হয় এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে বাঁশের ফলা নিষ্ক্রিয় করা হয় এবং পরিখা ভরাট করার কাজ শেষ হয়। অতঃপর মিরযা নাথন হাতি নিয়ে দুর্গ আক্রমণ করে, শত্রুরা প্রাণপণ গোলাবর্ষণ করতে থাকে, কিন্তু হাতিগুলি

Edited by Ripon Sarkar

ভ্রুক্ষেপ না করে অগ্রসর হয়ে দুর্গের দেয়াল ভেঙে দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করে। শত্রুদের অনেকে নিহত হয়, কেউ কেউ দুর্গ প্রাচীর থেকে নিচে ঝাঁপ দেয়, কিন্তু জলা এবং মাটি পরখ করতে না পেরে অনেকেই মৃত্যুবরণ করে। অনেক দিনের প্রস্তুতি এবং অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে ডাকছড়া দুর্গ জয় করা হয়।[৯০]

যদিও সেনাপতিরা প্রথমে যুদ্ধে অংশ নেননি, দুর্গ জয় হওয়ার পরে সকলেই দুর্গ জয়ের কৃতিত্ব দাবি করে এবং এই বিষয়ে ইফতিখার খান ও মিরযা নাথনের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। এরূপ অপ্রীতিকর অবস্থায় অন্য কয়েকজন সেনাপতি প্রস্তাব করেন যে এ বিষয়ে ফয়সালা করার ভার সুবাদারের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। সকালে ইসলাম খান এসে সকলের কথা শুনে বলেন যে যে সেনাপতির পরিখা সবচেয়ে অগ্রবর্তী এবং দুর্গের সবচেয়ে নিকটবর্তী, দুর্গ জয়ের কৃতিত্ব তাঁরই। জরিপ করে দেখা গেল, যদিও ইফতিখার খান ও অন্যান্য সেনাপতিরা পঁয়ত্রিশ দিন ধরে দুর্গ আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং মিরযা নাথন যুদ্ধের মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে এসে পৌঁছেন, নাথনের পরিখা দুর্গের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এবং অন্যান্যদের পরিখার চেয়ে বত্রিশ হাত অগ্রবর্তী। সুবাদার বলেন যে দুর্গ জয়ের কৃতিত্ব মিরযা নাথনের প্রাপ্য, কিন্তু ইফতিখার খানের সম্মান রক্ষার্থে তিনি সম্রাটের নিকট পাঠানো সংবাদে বলেন যে মিরযা নাথনের প্রচেষ্টায় ডাকছড়া দুর্গ জয় হয় এবং ইলাহ ইয়ার (ইফতিখার খানের ছেলে) তাঁর সঙ্গে ছিলেন।[৯১]

ডাকছড়া দুর্গ জয়ের উপরোক্ত বিবরণ মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া, এ ছাড়া অন্য কোন সূত্র নেই। দুর্গ জয়ের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নাথন নিজেই নিয়েছেন। তবে লক্ষণীয় যে ডাকছড়া দুর্গ বা যাত্রাপুর দুর্গ জয়ের পরে শত্রুদের কোন মালামাল, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌকা মোগলদের হস্তগত হওয়ার কথা নেই। ডাকছড়া দুর্গ সম্বন্ধে বলা যায় যে দুর্গটি স্থায়ী ছিল না, হঠাৎ করেই রাতারাতি নির্মাণ করা হয়, সুতরাং সেখানে মুসা খান বা অন্যান্য ভূঁঞাদের কোন মূল্যবান মালামাল থাকার কথা নয়, বা মুসা খান এবং ভূঁঞারা দুর্গের পতন আসন্ন দেখে তাদের অস্ত্রশস্ত্র গোলা বারুদ সময়মত সরিয়ে ফেলতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়ত, ডাকছড়া দুর্গের নির্মাণ এবং গঠনও প্রশংসনীয়। এমন স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়, যে স্থানটি মোগলদের জন্য সহজগম্য ছিল না। এর তিনদিকে জলা ছিল, যেদিকে জলা ছিল না সেদিকে পরিখা খনন করা হয়। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য বাঁশের ফলা চতুর্দিকে পুঁতে দেয়া হয়, দুর্গ রক্ষার জন্য এটাও অভিনব প্রক্রিয়া, বিশেষ করে হাতির আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এই কৌশল করা হয়। একবার হাতির পায়ে বাঁশের ফলা বিধলে হাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তৃতীয়ত, আক্রমণ প্রতিরোধ, আত্মরক্ষা এবং আক্রমণের জন্য মিরযা নাথন যে কৌশল অবলম্বন করেন, তাও প্রশংসনীয়। তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রথমে দেয়াল নির্মাণ করেন, পরে গাড়ি ঘাস ও মাটি দ্বারা আবৃত করে দেয়ালের মত করেন। এটা ছিল আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ প্রতিরোধের কৌশল। বাঁশের ফলা নিষ্ক্রিয় করার জন্য এবং পরিখা ভরাট করার জন্য তিনি ঘাস ও মাটি ব্যবহার করেন। যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় যে এই কৌশলও অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়। চতুর্থত, স্মরণ রাখতে হবে যে এটা ছিল অসম যুদ্ধ। একদিকে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবা বাংলার সকল সম্পদ ও শক্তি নিয়ে সুবাদার ইসলাম খান এবং অন্যদিকে সেই সুবারই একাংশের কয়েকজন জমিদার। ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় দেড় বছর ভাটি অভিযানের প্রস্তুতি নেন,

Edited by Ripon Sarkar

তাঁর ছিল অনেক সেনাপতি, অশ্বারোহী সৈন্য এবং নৌবহর, শুধু ইহতিমাম খানের নৌবহরেই ছিল বার হাজার মাল্লা। মোগল নৌবহরের নৌকার মোট সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না, কারণ রাজকীয় নৌবহর এবং মনসবদারদের নৌকার সংখ্যা পৃথক পৃথক দেয়া নেই, তবে ধারণা করা যায় যে মোগল নৌবহরে ছয়শ/সাতশ নৌকা ছিল। সুবাদারের নিকট আগে থেকেই হাতি ছিল, যার সংখ্যা দেয়া নেই; আবদুল লতীফের ডায়রীতে দেখা যায় যে ঘোড়াঘাট গমন পথে ইসলাম খান জমিদারদের নিকট থেকে একশ ছত্রিশটি হাতি এবং আশিটি টাঙ্গন ঘোড়া উপহার পান, ইসলাম খান নাজিরপুরে খেদায় আরো বত্রিশটি (আবদুল লতীফের বিবরণে কিন্তু মিরযা নাথনের বিবরণে একশ পঁয়ত্রিশটি) হাতি ধরেন। তাছাড়া সম্রাট সময় সময় সুবাদারের শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অন্যপক্ষে মুসা খান ও বার-ভূঁঞার অধীনে সাতশত নৌকার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাদের হাতি ছিল এরূপ কথা বাহরিস্তানে নেই। ভূঁঞাদের মনোবলই ছিল তাদের প্রধান শক্তি, মুসা খান এবং বার-ভূঁঞা যেভাবে মোগল বাহিনীকে তিন মাস বাধা দেয়, তাতেই তাদের সাহস ও মনোবলের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসা খানের প্রথম গোলা যেভাবে ইসলাম খানকে বিপর্যস্ত করে তোলে তার তুলনা পাওয়া যায় না। কি অব্যর্থ তাদের লক্ষ্য, প্রথম গোলাই সরাসরি ইসলাম খানের খাবার টেবিলে গিয়ে আঘাত করে। এই গোলায় ইসলাম খানের বিশ ত্রিশ জন লোক নিহত হয়, ইসলাম খান নিজে নিহত হলে বাংলার ইতিহাসে মোড় ঘুরে যেত, সন্দেহ নেই।

যাত্রাপুর এবং ডাকছড়া দুর্গ জয় করার পরে ঢাকা পর্যন্ত মোগল বাহিনীর আর কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না, তাই ইসলাম খান সন্তুষ্টচিত্তে ঢাকা যাত্রা করেন। মুবারিজ খান ফতহাবাদের যুদ্ধে জয়লাভ করে সেখানে এসে ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, ইসলাম খান তাঁকে যাত্রাপুরের মোহনা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইসলাম খান কাথৌরিয়া পৌছেন। এখানে মুসা খানের ভাই ইলিয়াস খান ভাই এর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং ইসলাম খানের সঙ্গে মিলিত হন।[৯২] পরের দিন ইসলাম খান কাথৌরিয়া থেকে বলরায় পৌছেন এবং শুনতে পান যে কলাকোপায় বার-ভূঁঞার একটি দুর্গ রয়েছে। ইসলাম খান মিরযা নাথনের নেতৃত্বে কলাকোপা জয়ের জন্য সৈন্য ও নৌ-বাহিনী পাঠান। মিরযা নাথন সাড়ে চারশ নৌকা নিয়ে অগ্রসর হন, কিন্তু বার-ভূঁঞা আগেই কলাকোপা দুর্গ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তাই বিনা যুদ্ধে কলাকোপা অধিকৃত হয়।[৯৩]

ইসলাম খান কলাকোপায় পৌছে প্রথম চিন্তা করেন যে সম্পূর্ণ মোগল বাহিনী যখন পূর্ব বাংলায় এসেছে, তখন উত্তরবংগকে অরক্ষিত রাখা সমীচীন নয়। বুকাইনগর থেকে খাজা উসমান বা অন্য কেউ অরক্ষিত উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করতে পারে। তাই তিনি ইফতিখার খানকে শেরপুর মুর্চায় (বগুড়ার শেরপুর) পাঠান।[৯৪] অতঃপর তিনি ঢাকা যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সুবাদার ইসলাম খান, দিওয়ান মুতাকিদ খান এবং বখশী তাহির মুহাম্মদ ঢাকা যাত্রা করেন। ইহতিমাম খানের নেতৃত্বে নৌবহর ও গুলন্দাজ বাহিনীকে নিম্নরূপে পাঠান হয়। ইসলাম খানের ভাই শয়খ ইউসুফ মকীর অধীনে কয়েকজন সেনাপতিকে নৌবহরের ডান দিক দিয়ে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে পাঠান হয়। শয়খ আবদুল ওয়াহিদের অধীনে স্থলবাহিনী নৌবহরের বামদিক দিয়ে কোদালিয়ার দিকে পাঠান হয়। নৌবহর এবং গুলন্দাজ বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে থেকে ইহতিমাম খানকে

Edited by Ripon Sarkar

পাথরঘাটায়[৯৫] যেতে বলা হয়। মিরযা নাথনকে সম্মুখে এবং ইসলাম কুলীকে পেছনে যেতে বলা হয় এবং মনসবদারদের নৌকাসমূহ রাজকীয় নৌবহরের ডানে, বামে এবং পেছনে থাকতে আদেশ দেয়া হয়। ইহতিমাম খানকে আদেশ দেয়া হয় তিনি যেন ইসলাম খানের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত নৌবহর এবং সকল সৈন্য ও সেনাপতিদের নিয়ে পাথরঘাটায় অবস্থান করেন।[৯৬]

মুসা খানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ

১৬১০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ইসলাম খান ঢাকা পৌছেন। তিনি বুঝতে পারেন যে মুসা খান পরাজিত না হলে ভাটি বিজয় অসম্পূর্ণ থাকবে এবং বাংলায় মোগল অধিকারও সম্পূর্ণ হবে না। তাই তিনি মুসা খানের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তিনি নিজে ঢাকা দুর্গে অবস্থান নেন এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলাম খানের ঢাকা উপস্থিতি থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত বা স্থানান্তরিত হয়। আগেই বলা হয়েছে যে সুবাদারের সঙ্গে দিওয়ান এবং বখশীও ঢাকায় আসেন। মীর বহর ইহতিমাম খান এবং অন্যান্য সেনাপতিরাও ঢাকার দিকে আসেন এবং ইসলাম খানের নির্দেশ মত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান নেন। ইহতিমাম খান ও মিরযা নাথনকে দোলাই নদীর দু তীরে বেগ মুরাদ খানের দুটি দুর্গে অবস্থান নেয়ার আদেশ দেয়া হয়। মিরযা নাথন বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বুড়িগঙ্গা নদীর নাম উল্লেখ করেননি, তিনি বলেন যে ঢাকা দোলাই নদীর তীরে অবস্থিত, দোলাই দু ভাগে বিভক্ত ছিল, একটি শাখা ডেমরার ভিতর দিয়ে লক্ষ্যা নদীতে পতিত হয় এবং অন্য শাখা খিজিরপুরের নিকটে একই নদীতে পতিত হয়।[৯৭] ফন ডেন ব্রুকের মানচিত্রে দেখা যায় বুড়িগঙ্গার ধলেশ্বরী মোহনা তখন ছিল না এবং দোলাই খিজিরপুরে লক্ষ্যার সঙ্গে মিলিত হয়। দোলাই যেখানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়, সেখানেই নদীর এই তীরে (বর্তমান মিল ব্যারাক) বেগ মুরাদের দুটি দুর্গ ছিল। ইহতিমাম খান একটিতে এবং মিরযা নাথন অপরটিতে অবস্থান নেন। একটু পরে দেখব যে লক্ষ্যা নদীতেই মুসা খান বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান সুরক্ষিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সুতরাং দোলাইর তীরে বেগ মুরাদের দুটি দুর্গ ছিল রাজধানী ঢাকা রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম খান মীরক বাহাদুরকে শ্রীপুর এবং বায়েজীদ খান পন্নীকে বিক্রমপুরে পাঠান।

এদিকে মুসা খানও যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। তিনি হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদীকে সোনারগাঁয়ে রাখেন এবং নিজে লক্ষ্যা নদীতে চলে আসেন, লক্ষ্যা নদীই হল তাঁর রণ কৌশলের কেন্দ্রবিন্দু। মুসা খান নিজে বন্দর খালের মুখে অবস্থান নেন, এই খাল সোনারগাঁয়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে লক্ষ্যা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। বর্তমানে এটা ত্রিবেণী খাল নামে পরিচিত। মুসা খান খালের মুখে দুদিকে দুটি দুর্গ নির্মাণ করেন, একটিতে তিনি নিজে অবস্থান নেন এবং অপরটিতে তাঁর চাচাত ভাই আলাওল খানকে নিযুক্ত করেন। তিনি মিরযা মুমিনকে তাঁদের পেছনে নৌকাসহ অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন। মুসা খানের ভাই আবদুল্লাহ খানকে নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে কদমরসূল দুর্গে (নবীগঞ্জ) নিযুক্ত করা হয় এবং অপর ভাই দাউদ খানকে কত্রাব রক্ষার দায়িত্ব দেয়া হয়। মুসা খানের অপর ভাই মাহমুদ খানকে লক্ষ্যার সঙ্গে দোলাইর সংযোগস্থল ডেমরায় নিযুক্ত করা হয় এবং বাহাদুর গাজীকে দুশ নৌকাসহ লক্ষ্যার আরও উপরে বর্তমান কালীগঞ্জের এক মাইল উত্তরে চৌরায় নিযুক্ত করা হয়।

Edited by Ripon Sarkar

মুসা খান শ্রীপুর ও বিক্রমপুরেও দুটি চৌকি স্থাপন করেন কিন্তু তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি লক্ষ্যা নদীর বাম তীরে নিয়োগ করেন। সামরিক দিক দিয়ে এটাই যুক্তিযুক্ত, কারণ মনে হয় রাজধানী সোনারগাঁ রক্ষার দিকেই মুসা খান বিশেষ মনোযোগ দেন।

ইসলাম খানও সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেন। তিনি মিরযা নাথন এবং শয়খ কামালকে কুমারসর[৯৮] (বা কুমারছড়া) এবং খিজিরপুরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মিরযা নাথন খিজিরপুরে এবং শয়খ কামাল কুমারসরে অবস্থান নেন। শয়খ কামাল কুমারসরে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং নদীর তীর পর্যন্ত পর পর তিনটি প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ করেন। মিরযা নাথন খিজিরপুর পৌঁছেই দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। শত্রুরা নৌকায় এসে গোলা নিক্ষেপ করতে থাকে, মোগল বাহিনীও পাল্টা গোলা নিক্ষেপ করে, ফলে অনেক হতাহত হয় এবং নৌকাও ডুবে যায়, কিন্তু দিনের শেষে মিরযা নাথনের দুর্গ নির্মাণ শেষ হয়। দুর্গ নির্মাণ শেষে মিরযা নাথন খিজিরপুরের মসজিদে তাঁর সদর দফতর স্থাপন করেন এবং দুর্গ রক্ষার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা নেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে গোলন্দাজ বাহিনী নিয়োগ করেন; মুহাম্মদ খান পন্নীকে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্যসহ প্রধান মোহনায় (দোলাইর সঙ্গে লক্ষ্যার সংযোগস্থল) নিয়োগ করেন। মিরযা নাথন গোলন্দাজ বাহিনীর কাটারী ও মানিকী নৌকার সাহায্যে নদীর উপর পুল তৈরি করেন এবং শাহবাজ খান বরীজকে পুলের বাম দিকে পঞ্চাশ জন সৈন্যের নেতৃত্ব পরিখা রক্ষার দায়িত্ব দেন। শাহবাজ খান বরীজের বাম দিকে শয়খ সোলায়মান উসমানীকে চল্লিশ জন সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে পাহারায় বসান। তাদের পেছনে সারি করে ইলাহদাদ খানকে সত্তর জন সৈন্য নিয়ে, শয়খ চমরু বখতিয়ারকে নব্বই জন সৈন্য নিয়ে, মিরযা ফতেহজঙ্গকে একশ চল্লিশ জন সৈন্য নিয়ে এবং আগা নোমান বখশীকে দুশ সৈন্য নিয়ে প্রহরায় বসান হয়। হাতিগুলিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়।[৯৯] স্পষ্টতই বুঝা যায় যে মিরযা নাথন খিজিরপুরের মোহনাকে দুর্গ এবং পুলের সাহায্যে সুরক্ষিত করেন, কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে মুসা খানের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে খিজিরপুর দুর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই দুর্গ থেকে ডানে এবং বামে উভয় দিকে, অর্থাৎ একদিকে মুসা খানের সোনারগাঁ, বন্দর খাল, রসুলপুর, এবং অন্যদিকে ডেমরা কতরাব এবং চৌরার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা যাবে।

উভয় পক্ষের প্রস্তুতি, দুর্গ নির্মাণ এবং সৈন্য ও নৌ-বাহিনী সমাবেশে মনে হয়, ইসলাম খান আক্রমণাত্মক এবং মুসা খান আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতিতে মুসা খান খিজিরপুরে কোন সৈন্য না পাঠিয়ে কেন এই অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি শত্রুদের অধিকারে ছেড়ে দেন, তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। খিজিরপুরের গুরুত্ব ইসলাম খানের চেয়ে মুসা খানের বেশি বুঝা উচিত ছিল। তিনি লক্ষ্যা নদীতে অনেকগুলো দুর্গ নির্মাণ করেন এবং প্রতিটি রক্ষার ব্যবস্থা নেন, কিন্তু তিনি কি বুঝতে পারেননি যে মোহনা নিজ অধিকারে না থাকলে লক্ষ্যা নদীর বাম তীর রক্ষা করা সম্ভব হবে না? ডঃ ভট্টাচার্য বলেন যে, মুসা খান খিজিরপুর দুর্গ ত্যাগ করেন।[১০০] যদি তাই হয়, তাহলে বলতে হবে যে মুসা খান খিজিরপুর ছেড়ে দিয়ে মারাত্মক ভুল করেন। আমরা এখনই দেখব যে খিজিরপুর থেকেই মোগল বাহিনী ডানে বামে উভয় দিকে অভিযান চালিয়ে মুসা খানকে পর্যুদস্ত করে। তবে মনে হয় ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ঘটে যায়, মুসা খান যেমন দ্রুত আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নেন, ইসলাম

Edited by Ripon Sarkar

খানও সেইরূপ দ্রুত আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। এই প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় ইসলাম খান মুসা খানের আগে খিজিরপুরে সৈন্য পাঠাতে সক্ষম হন।

খিজিরপুরে দুর্গ নির্মাণের পরের দিন ইসলাম খান খিজিরপুর ও কুমারসর পরিদর্শনে আসেন, তিনি খিজিরপুরের রক্ষা ব্যবস্থা দেখে অত্যন্ত খুশি হন। মসজিদে বসে তিনি পরামর্শ সভা ডেকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি ইহতিমাম খানকে খিজিরপুরে নিযুক্ত করেন এবং শয়খ রুকনকে ডেমরায় মাহমুদ খানের বিরুদ্ধে, কতরাবতে মিরযা নাথনকে দাউদ খানের বিরুদ্ধে এবং শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে চৌরায় বাহাদুর গাজীর বিরুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি শয়খ কামালকে কুমারসরে, তুকমক খানকে কোদালিয়া খালের মুখে, মীরক বাহাদুরকে শ্রীপুরে এবং জাহান খান পন্নী ও বায়েজীদ খানকে বিক্রমপুরে থাকার নির্দেশ দেন। সকল প্রস্তুতি শেষ হলে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আক্রমণ শুরু হয়।[১০১]

মিরযা নাথন কতরাব গিয়ে দাউদ খানের দুর্গের বিপরীতে নদীর অপর তীরে (পশ্চিম তীরে) দুর্গ নির্মাণ করেন এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। ইসলাম খান ইহতিমাম খানকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গ পরিদর্শনে যান এবং দুর্গ দেখে সন্তুষ্ট হন। ঐদিন নওরোজ উৎসব হওয়ায় নাথন দুর্গে সুবাদার এবং পিতার সম্মানে ভোজের আয়োজন করেন। ভোজের পরে নাথন রাত্রে আকস্মিকভাবে কতরাব আক্রমণ করার পরিকল্পনা পেশ করেন এবং সুবাদারের অনুমতি চান। খিজিরপুর থেকে রাজকীয় নৌবহর সরাবার অনুমতি ছিল না, তাই নাথন প্রস্তাব করেন যে তিনি গভোলায় (ছোট ডিঙ্গি নৌকা) এবং হাতির পিঠে নদী পার হবেন। মার্চ মাস, শুষ্ক মৌসুম, বর্ষা তখনও শুরু হয়নি, সুতরাং নদীর পানি কম। কিন্তু লক্ষ্যা নদী এমনিতেই গভীর, তাই এরূপ আক্রমণে বিপদের ঝুঁকি ছিল। মিরযা নাথনের প্রতি সুবাদারের আস্থা ছিল, তাই তিনি অনুমতি দেন এবং বলেন যে যুদ্ধে যাতে অধিক সৈন্য হতাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভোজের পরে ইসলাম খান ও ইহতিমাম খান ফিরে আসেন এবং মিরযা নাথন কতরাব আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হন। সৌভাগ্যক্রমে মধ্য রাত্রে একজন বেপারীর খেলনা নৌকা নাথনের হাতে ধরা পড়ে, বেপারীর নিকট থেকে জানা যায় যে চৌরায় আবদুল ওয়াহিদের নিকট পরাজিত হয়ে বাহাদুর গাজী সন্ধি করেন। বাহাদুর গাজী যাতে মোগল বাহিনীকে নদী পার হতে সাহায্য করতে না পারে সে জন্য দাউদ খান সতর্ক পাহারা দিচ্ছেন এবং তাঁর দৃষ্টি ঐদিকেই নিবদ্ধ। তারা বলাবলি করছে যে মোগল রাজকীয় নৌবহর দোলাই নদীতে রয়েছে এবং নাথনের প্রচুর লোকবল নেই, যাতে সেদিক থেকে আক্রমণ করতে পারে। মিরযা নাথন বুঝতে পারেন যে দাউদ খানের এই অসতর্ক মুহূর্তে আক্রমণ করাই উত্তম কাজ। তিনি বেপারীকে দিয়ে ইহতিমাম খানের নিকট খিজিরপুরে সংবাদ পাঠান এবং নিজে কতরাব আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন।

মিরযা নাথন কিছু গভোলা যোগাড় করে ১৪০ জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ জন পদাতিক সৈন্য নদী পার করে দেন। শাহবাজ খান বরীজকে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। তারপরে নাথন কিছু বাছাই করা সৈন্য নিয়ে হাতির পিঠে নদী অতিক্রম করেন। শাহবাজ খান বরীজকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন নদী পার হয়েই তুরী বাজিয়ে দাউদের দুর্গের দিকে ধাবিত হন, যাতে দাউদ ও তাঁর সৈন্যদের দৃষ্টি নদীর দিকে না থাকে এবং নাথনও হাতির পিঠে নিরাপদে নদী পার হতে সক্ষম হন। নাথন চাপী

Edited by Ripon Sarkar

পাইকদের (ঢাল তলোয়ারবাহী পদাতিক সৈন্য) নির্দেশ দেন তারা যেন কলাগাছ যোগাড় করে গাছে ভেসে নদী পার হয়। তিনি দুর্গের গোলন্দাজদের নির্দেশ দেন যেন তারা শত্রুর নৌকা নদীতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কামান দাগিয়ে তাড়িয়ে দেয়। মিরযা নাথনের এই অভিযান ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই মার্চ তারিখে পরিচালিত হয়। শাহবাজ খান বরীজ নদী অতিক্রম করেই দাউদ খানের দুর্গের দিকে তুরী বাজিয়ে অগ্রসর হয়, উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয়, মিরযা নাথন নদী থেকে উঠে যুদ্ধে অংশ নেন, এমনকি হাতাহাতি যুদ্ধও বেধে যায়। মুসা খান সংবাদ পেয়ে ভাই-এর সাহায্যার্থে কয়েকখানি নৌকা পাঠিয়ে দেন, এদিকে ইহতিমাম খানও খিজিরপুর থেকে বিশখানি নৌকা পাঠান। ফলে জলে স্থলে যুদ্ধ শুরু হয়। অনেক যুদ্ধের পরে দাউদ খান পলায়ন করেন এবং মিরযা নাথন কতরাব দুর্গ অধিকার করেন। আগেই বলা হয়েছে যে মিরযা নাথনের এই অভিযান ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ, কিন্তু তিনি এটা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন।[১০২]

যুদ্ধ জয় করার পরে মিরযা নাথন সংবাদ পান যে তার পিতা ইহতিমাম খান খিজিরপুর থেকে কদমরসুলে গিয়ে আবদুল্লাহ খানকে আক্রমণ করেছেন। নাথন সঙ্গে সঙ্গে দু তিনশ অশ্বারোহী এবং কিছু পদাতিক সৈন্য নিয়ে কদমরসুলে যান এবং পিতার সঙ্গে মিলিত হন। এখানে নদীতে ভীষণ যুদ্ধ বাধে, মোগল বাহিনী জয়লাভ করে, কিন্তু মোগল নৌবহর সেনাপতির নির্দেশ ব্যতিরেকে শত্রুদের নৌকার পশ্চাতে ধাওয়া করে, ফলে মোগল নৌ-বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শত্রুরা এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে মোগল নৌকা আক্রমণ করে এবং বেশ হতাহত করে। ইসলাম কুলীর অধীনে বাজ বাহাদুরের নৌবহর ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পেছনে পড়ে তুকমক খানের পরিখার নিকটে চলে আসে। তুকমক খান তাঁর অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আক্রমণ চালায়, ফলে নৌ-বাহিনী এবং অশ্বারোহী বাহিনী একযোগে শত্রুদের আক্রমণ করে, কিন্তু শত্রুর প্রতি-আক্রমণে মোগল বিশৃঙ্খল নৌবহরের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। এমন সময় মিরযা নাথন পিতার আদেশে নৌবহরের সাহায্যে অগ্রসর হন; তিনি অবস্থা বেগতিক দেখে চিৎকার করে সবাইকে মুসা খানের দুর্গ আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পারেন যে মুসা খানের দুর্গ আক্রান্ত হলে শত্রুরা এই যুদ্ধ পরিত্যাগ করে তাদের নেতার দুর্গ রক্ষার জন্য ছুটে যাবে। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে বন্দর খাল অধিকার করতে পারলে শত্রুদের নৌ-বাহিনীও পরাস্ত হবে। ফলে হলও তাই। মিরযা নাথন নিজে হাতি নিয়ে মুসা খানের দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন; দুর্গ প্রাচীরের নিকট হাতি এসে পড়ায় মুসা খান দুর্গ ছেড়ে নৌকায় করে পালিয়ে যান, মিরযা মুমিনও নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে মুসা খানের অনুসরণ করেন। মিরযা নাথন বন্দর খাল অতিক্রম করে খালের ওপর মুখে আলাওল খানের দুর্গ আক্রমণ করেন। আলাওল খানও দুর্গ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যান এবং মুসা খানকে অনুসরণ করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে জোয়ার আসায় বন্দর খাল পূর্ণ হয়ে যায় এবং মিরযা নাথনের ফিরে আসতে বেগ পেতে হয়। তিনি আদেশ দেন যে শত্রুদের ফেলে যাওয়া নৌকা এবং নদীতে অবস্থানরত অন্যান্য নৌকা নিয়ে পুল তৈরি করা হোক, পদাতিক বাহিনী নৌকার পুল দিয়ে পার হয়, কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনী ঘোড়ার জিন মাথায় নিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়াসহ সাঁতরিয়ে পার হয়। পলায়নপর শত্রুরা মোগল বাহিনীর এই দুরবস্থা দেখে ফিরে দাঁড়ায় এবং গোলা বর্ষণ করতে থাকে। বৈরাম বেগ নামক একজন মোগল সেনাপতি নিহত হয় এবং রুস্তম বেগ

Edited by Ripon Sarkar

নামক আর একজন আহত হয়, এবং আরও অনেক মোগল সৈন্য হতাহত হয়। মিরযা নাথন আবার বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হন এবং শত্রুদের আক্রমণ করেন। এবার আর শত্রুরা টিকতে পারে না এবং বিকুলিয়া চর[১০৩] দিয়ে সোনারগাঁয়ে পলায়ন করে।

অতঃপর মিরযা নাথন সোনারগাঁ আক্রমণ করেন, মুসা খান পালিয়ে যান এবং ইবরাহীমপুরে[১০৪] আশ্রয় নেন। মুসা খান মিরযা মুমিনকে সোনারগাঁ থেকে তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে আসতে বলেন।[১০৫] হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করেন এবং সোনারগাঁ ইসলাম খানের হাতে ছেড়ে দেন। বাহরিস্তানে সোনারগাঁ অধিকারের সময় যুদ্ধের কোন বিবরণ নেই, তাতে মনে হয় মুসা খান সোনারগাঁ রক্ষার কোন চেষ্টা করেননি, বারবার পরাজিত হয়ে তিনি মনোবল এবং সামরিক বলও হারিয়ে ফেলেন এবং "ভগ্ন হৃদয়ে ও কাঁদ কাঁদ অবস্থায়" ইবরাহীমপুরে আশ্রয় নেন। এদিকে মুসা খানের ভাই দাউদ খান হাল ছাড়লেন না, কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর এক নতুন বিপদ উপস্থিত হয়। ফিরিঙ্গী জলদস্যুরা তাঁকে আক্রমণ করে, দাউদ কোন কিছু সন্দেহ না করে মাচান থেকে নেমে আসেন, কিন্তু ফিরিঙ্গীরা তাঁকে চিনতে না পেরে গুলী করে হত্যা করে।[১০৬]

ভাই-এর মৃত্যুতে মুসা খান মর্মাহত হন এবং পুনরায় মোগলদের আক্রমণ করার সংকল্প করেন। তিনি তাঁর মিত্র জমিদারদের একত্র করে মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন মুসা খান হয়ত মনে করেন যে মোগলরাই ষড়যন্ত্র করে ফিরিঙ্গী দুস্যুদের দাউদ খানের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।[১০৭] মুসা খান হয়তঃ তাই মনে করেন কিন্তু মোগলরা সত্যিই এই হীন ষড়যন্ত্র করে কিনা জানার উপায় নাই, তবে এটা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রথমত, বাহরিস্তানে এরূপ কোন ইঙ্গিত নেই (অবশ্য মোগলরা এই ষড়যন্ত্র করলেও বাহরিস্তানে তা উল্লেখ করা হবে না); দ্বিতীয়ত, মোগলরা যেভাবে একের পর এক যুদ্ধে জয় লাভ করে এবং মুসা খান যেভাবে সোনারগাঁ ত্যাগ করে ইবরাহীমপুরে পালিয়ে যায়, তাতে বুঝা যায় যে মুসা খানের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে পড়েছে। এমতাবস্থায় মোগলদের ষড়যন্ত্র করার কোন প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়ত, ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে ইসলাম খানের যোগাযোগের খবর পাওয়া যায় না, এবং চতুর্থত, ফিরিঙ্গীরা ছিল দস্যু, দস্যুদের জাত-ধর্ম বা পক্ষ বিপক্ষ নেই। যেখানে লুটেরা মাল পাবে, সেখানেই তারা যাবে। এরূপ লোককে প্রশ্রয় দিলে তারা যে প্রশ্রয়দানকারীর বিরুদ্ধে যাবে না, এরূপ নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। ইসলাম খানের মত একজন রাজনীতিবিদ, সমরকুশলী তা নিশ্চয়ই জানতেন। যা হোক, এবার মুসা খান দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে গমনের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি একটি পরিত্যক্ত দুর্গ দখল করেন। এই দুর্গটি মানসিংহের সুবাদারী আমলে আরাকানের মগ রাজা নির্মাণ করেছিলেন। মুসা খান এই দুর্গ সুরক্ষিত করতে থাকেন। কিন্তু কোনক্রমে ইহতিমাম খান এই সংবাদ পান এবং মিরযা নাথনকে অবহিত করেন। মিরযা নাথন মুসা খানের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরে মুসা খান পলায়ন করে আবার ইবরাহীমপুরে আশ্রয় নেন। এই যুদ্ধে মুসা খান পরাজিত হলেও মোগল পক্ষে বেশ হতাহত হয়।[১০৮]

Edited by Ripon Sarkar

এদিকে ইসলাম খান সেনাপতিদের রদবদল করেন। তিনি তুকমক খানকে আলপসিংহে শয়খ গিয়াস-উদ-দীনের (এনায়েত খান) সাহায্যার্থে পাঠান এবং শয়খ রুকনকে তুকমক খানের স্থলে কোদালিয়া খানের দুর্গে নিযুক্ত করেন। শয়খ রুকন ছিলেন মদ্যপ, মুসা খান এটা জানতেন। তাই শয়খ রুকনের নিযুক্তির সংবাদ পেয়ে মুসা খান তাঁর দুর্গ আক্রমণ করেন। শয়খ রুকন মাতাল থাকায় বুঝতেই পারেননি যে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু বন্দর খাল থেকে মিরযা নাথন অবস্থা দেখে তাঁর গোলন্দাজ বাহিনীকে গোলা ছুঁড়তে আদেশ দেন। ইতোমধ্যে ইহতিমাম খান রাজকীয় নৌবহর পাঠিয়ে দেন এবং মোগলেরা মুসা খানকে তিনদিক থেকে আক্রমণ করে। মুসা খান কোদালিয়া খাল থেকে ফিরে মিরযা নাথনের দুর্গ আক্রমণ করেন। মুসা খান এরূপ প্রচণ্ড আক্রমণ চালান যে নাথনের গোলন্দাজ বাহিনী পেছনে সরতে বাধ্য হয়। মিরযা নাথন দুশ সৈন্যসহ দু জন সেনাপতিকে গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যার্থে পাঠান এবং শাহবাজ খান বরীজের নেতৃত্বে আরও দুশ পঞ্চাশ জন আফগান সৈন্য পাঠান । কিন্তু মুসা খানও তাঁর মিত্ররা অসীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকেন। যুদ্ধ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে ভূঁঞারা সমগ্র মোগল বাহিনীকে হটিয়ে দেয়ার উপক্রম হয়। এমন সময় মিরযা নাথন হাতি বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হন। তথাপি মুসা খান ও তাঁর ভূঁঞারা প্রাণপণ যুদ্ধ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক যুদ্ধের পরেও তাঁরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন।[১০৯] মুসা খান পলায়ন করে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে কোথায় যান, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই, তবে মনে হয় তিনি আবার ইবরাহীমপুরে আশ্রয় নেন। এটাই মোগলদের বিরুদ্ধে মুসা খানের শেষ যুদ্ধ, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণও করেননি, আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে অন্য কোন উপায় না দেখে তিনি শেষে আত্মসমর্পণ করেন (পরে দ্রষ্টব্য)। উপরোক্ত যুদ্ধের পরে মুসা খানের প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। ইসলাম খানও বুঝতে পারেন যে মুসা খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আর প্রয়োজন নেই। তাই তিনি অন্যদিকে মনোযোগ দেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে আবদুল ওয়াহিদকে চৌরায় বাহাদুর গাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়, যুদ্ধে বাহাদুর গাজী পরাজিত হন। তিনি বুঝতে পারেন যে মুসা খানের আর যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই, তাই তিনি মুসা খানের জন্য অপেক্ষা না করে মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। তিনি আবদুল ওয়াহিদের মাধ্যমে ইসলাম খানের নিকট আসেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন। ইসলাম খান বাহাদুর গাজীকে সসম্মানে গ্রহণ করেন, তাঁর জমিদারী তাঁকে ফেরত দেন, কিন্তু নৌবহর রাজকীয় নৌবহরে সংযুক্ত করেন। মুসা খানের পরাজয় এবং বাহাদুর গাজীর বশ্যতা স্বীকারের পরে ফতহাবাদের মজলিশ কুতুবও মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে শয়খ হাবীব উল্লাহ এবং রাজা শত্রুজিত তাঁকে পরাজিত করেন। তিনিও শয়খ হাবীব-উল্লাহর সঙ্গে এসে ইসলাম খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং আনুগত্য স্বীকার করেন। তাঁকেও তাঁর জমিদারী ফেরত দেয়া হয়, কিন্তু তাঁর নৌবহর বাজেয়াপ্ত করা হয়, মজলিশ কুতুবকে মোগল বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়। শয়খ হাবীব উল্লাহকে ঘোড়াঘাটের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়।[১১০]

এ সময়ে আরাকানের রাজা সলীম শাহর[১১১] (মিন রাদজগী, ১৫৯৩-১৬১২ খ্রিঃ) ভাইপো অনিক ফ্রাংক ইসলাম খানের নিকট দূত পাঠান। আরাকানে একটি প্রথা প্রচলিত ছিল যে যিনি সিংহাসনে বসতেন তাঁর ছোট ভাই চট্টগ্রামের শাসনকর্তা নিযুক্ত

Edited by Ripon Sarkar

হতেন। সলীম শাহর ছোট ভাই অনুপুরম চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন, কিন্তু বড় ভাই-এর সঙ্গে তাঁর বিবাদ হওয়ায় রাজার ভয়ে অনুপুরম সন্দ্বীপের পর্তুগীজ সেনাপতি গঞ্জালেসের নিকট আশ্রয় নেন। গঞ্জালেস বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন। অনুপুরমের ছেলে (বাহরিস্তানে নাম অনিক ফ্রাংক) পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য সুবাদার ইসলাম খানের নিকট দূত পাঠান। তিনি প্রস্তাব দেন যে তিনি নিজে এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করবেন, তাঁর ছেলেদের মোগল শিবিরে জিম্মি রাখবেন, এবং সুবাদারের সাহায্যে সন্দ্বীপ বিজিত হলে তিনি মোগলদের জায়গীরদার রূপে সন্দ্বীপ শাসন করবেন। ইসলাম খান দূতকে সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু যেহেতু অনিক ফ্রাংকের আসার পথ তখনও মুসা খানের অধিকারে ছিল, সেহেতু তিনি আসতে পারলেন না এবং বিষয়টিও মুলতবী হয়ে গেল।[১১২] ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে ইসলাম খান তাঁর প্রধান দায়িত্ব (অর্থাৎ বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা) থেকে অন্যদিকে মনোযোগ সরাতে চাননি।[১১৩] কি কারণে বিষয়টি মুলতবী হয় সঠিক বলা যায় না। মিরযা নাথনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য; মুসা খান তখনও মেঘনা নদী নিয়ন্ত্রণে রাখেন এবং ইচ্ছা করলেই অনিক ফ্রাংকের আসা যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন। আবার ইসলাম খানেরও তখন নতুন যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ার পক্ষে বিশেষ যুক্তি ছিল, বাংলা বিজয়ের কাজ তখনও অনেক বাকি এবং তিনি মনে করেন যে সারা বাংলায় মোগল প্রভুত্ব বিস্তার করা তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব।

আলী আকবরের বিদ্রোহ দমন

ইতোমধ্যে আলী আকবর নামক একজন মোগল মনসবদার মালদহে লুটতরাজ আরম্ভ করে, এমনকি রাজকীয় সম্পদও লুট করতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খানকে সুবাদার নিযুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এবং ইসলাম খানের অনুরোধে প্রাক্তন দিওয়ান উজীর খানকে বাংলা থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং অন্যান্য দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীতে ডেকে পাঠান হয়। আলী আকবরও উজীর খানের অধীনস্থ কর্মকর্তা হিসেবে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রভুর সঙ্গে রাজধানীতে চলে যান। কিন্তু উজীর খানকে গুজরাটে পাঠান হলে আলী আকবর উজীর খানকে ত্যাগ করে রাজধানীতে থেকে যান এবং দরবারের কোন এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সুপারিশে স্বল্প মনসবে সুবা বাংলার চাকরিতে নিযুক্ত হন এবং মালদহ শহরে আসেন। সেখানে আলী আকবর তাঁর শ্বশুরের খাজা বাকের আনসারী নামক একজন কর্মকর্তার নিকট থেকে চার হাজার টাকা লুট করে নেন। অতঃপর তিনি সুবাদারের দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য যাত্রা করেন। পথে ডিহিকোট[১১৪] নামক স্থানে পৌছে তিনি দেখেন যে মীর জলীল নামক একজন করোরী (রাজস্ব সংগ্রাহক) ঢাকায় রাজকীয় রাজস্ব নিয়ে যাচ্ছেন। আলী আকবর তখন চিন্তা করেন যে খাজা বাকের আনসারী নিশ্চয়ই টাকা লুট করার জন্য ইসলাম খানের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করবেন, ইসলাম খান যে শুধু তাঁকে টাকা ফেরত দিতে বাধ্য করবেন তা নয়, বরং তাঁর জায়গীরও কেড়ে নেবেন। এই ভেবে তিনি রাজকীয় রাজস্ব লুট করে বিদ্রোহ করার মনস্থ করেন। অতএব আলী আকবর মীর জলীলের নিকট থেকে দুটি হাতি ও সমস্ত সম্পদ লুট করে নেন। তারপর তিনি সহসপুরে[১১৫] গিয়ে শায়খ জামালের নিকট থেকে আরও চৌদ্দটি হাতি হস্তগত করেন। আলী আকবরের লুটতরাজে ভীত হয়ে মালদহ শহরের লোকেরা শহর ছাড়বার জন্য প্রস্তুত হয়। এমন সময় মাহমুদ খান শামলু

Edited by Ripon Sarkar

নামে একজন মনসবদার মালদহে আসেন এবং আলী আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু আলী আকবরের হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে সুবিধা করতে পারলেন না। আলী আকবর মালদহ শহর লুট করেন। অতঃপর আলী আকবর ইহতিমাম খানের জায়গীর এবং ধন-সম্পদ লুট করেন এবং তাজপুর পূর্ণিয়ায়[১১৬] গিয়ে ইফতিখার খানের জায়গীর লুট করে কুশী নদী[১১৭] পার হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ নিয়ে সুখে বাস করার মনস্থ করেন। ইতোমধ্যে শেরপুর মূর্চায় ফৌজদার ইফতিখার খান এবং ঘোড়াঘাটের ফৌজদার শয়খ হাবীব উল্লাহ সংবাদ পেয়ে আলী আকবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইফতিখার খান তখন চিন্তা করেন যে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বোঝা তাঁকেই বহন করতে হবে এবং তিনি যতই বীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব পাবেন শয়খ হাবীব উল্লাহ, কারণ তিনি সুবাদারের ভাই। তাই ইফতিখার খান শয়খ হাবীব উল্লাহকে বলে পাঠান যে তাঁরা দুজনেই মালদহ তাজপুরে চলে গেলে বগুড়া-ঘোড়াঘাট এলাকা সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকবে এবং খাজা উসমানের গতিবিধির প্রতি নজর রাখা সম্ভব হবে না, অথচ প্রধানত এই কাজের জন্যই তাঁদের দুজনকে নিযুক্ত করা হয়। এতএব তাঁদের একজনকে আলী আকবরের বিরুদ্ধে গিয়ে অন্য জনকে নিজের ফৌজদারীতে থাকা উচিত। শয়খ হাবীব উল্লাহ ঘোড়াঘাটে থেকে যেতে সম্মত হন, ফলে ইফতিখার খান আলী আকবরের বিরুদ্ধে গমন করেন। আলী আকবর কুশী নদী পার হওয়ার জন্য প্রায় প্রস্তুত, এমন সময় ইফতিখার খান তাঁর গতিরোধ করেন। ফলে আলী আকবরের যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় রইল না। উভয় পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ বেধে যায় কিন্তু অবশেষে ইফতিখার খানের সৈন্যরা আলী আকবরকে তাঁর ঘোড়াসহ হত্যা করতে সমর্থ হয়। যুদ্ধের পরে ইফতিখার খান তাঁর জায়গীরে অবস্থান নেন এবং যুদ্ধের সাফল্যের সংবাদ ইসলাম খানের নিকট প্রেরণ করেন।[১১৮]

ভুলুয়া বিজয়

ভুলুয়ার পরিচিতি এবং ভুলুয়ার রাজাদের সম্পর্কে পূর্বে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে, বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা নিয়ে প্রাচীন ভুলুয়া রাজ্য গঠিত ছিল। ইসলাম খানের সময় ভুলুয়ার রাজা ছিলেন অনন্ত মাণিক্য। মুসা খানের পরাজয়ের পরে এবং ইসলাম খান যখন বুঝতে পারেন যে মুসা খানের পক্ষ থেকে আর আক্রমণের আশঙ্কা নেই, তখন ইসলাম খান ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান। সামরিক বিবেচনায় এই অভিযানের প্রয়োজন ছিল। মুসা খান ও বার-ভূঁঞার পরাজয়ের পরে মোগল আধিপত্য বিস্তারের প্রধান বাধা থেকে যায় খাজা উসমান আফগান। ইসলাম খান তখন উসমানের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালাবার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বর্ষা মৌসুম শেষ হলেই এই অভিযান আরম্ভ হবে। সুতরাং পেছন দিকে শত্রু রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। এদিকে মুসা খান পরাজিত হলেও আত্মসমর্পণ করেননি, আবার যে কোন সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেন এবং ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যের সঙ্গে মুসা খানের যোগাযোগ হলে বিপদ হতে পারে। তাই ইসলাম খান মুসা খানের পরিত্যক্ত ঘাঁটিগুলিতে সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করেন, তিনি মিরযা নাথন বা শয়খ কামাল কাকেও সে দিক থেকে প্রত্যাহার করেননি। এখন ইসলাম খানের পরিকল্পনা হল মুসা খান আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখা, খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়া, এবং খাজা উসমানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের পূর্বেই পেছনের শত্রু ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যকে পরাজিত করা।

Edited by Ripon Sarkar

ইসলাম খান হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদীসহ কয়েকজন সেনাপতিকে আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে অনেক সৈন্যসামন্ত এবং পঞ্চাশটি হাতিসহ ভুলুয়ার বিরুদ্ধে পাঠান। আবদুল ওয়াহিদকে বলা হয়, যদি অনন্ত মাণিক্য আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁকে যেন সসম্মানে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসা হয়, আর যদি অনন্ত মাণিক্য যুদ্ধ করেন, তাহলে তাঁকে হয় শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আসতে হবে অথবা তাঁর মাথা কেটে নিয়ে আসতে হবে। অনন্ত মাণিক্য নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না, তিনি ইসলাম খানের আগ্রাসনের প্রতি সজাগ ছিলেন, এবং তাই আরাকানের মগ রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ভুলুয়ার পরেই চট্টগ্রাম এবং তখন চট্টগ্রাম পর্যন্ত আরাকানের অধিকারে ছিল এবং ফেনী নদী ছিল দু দেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত। সমুদ্রপথেও আরাকানের সঙ্গে ভুলুয়ার যোগাযোগ ছিল। আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে মোগল অভিযানের সংবাদ পেয়ে অনন্ত মাণিক্য আরাকানের রাজার সহযোগিতায় রাজধানী ভুলুয়াকে সুরক্ষিত করেন এবং নিজে কুচ করে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ডাকাতিয়া খালের[১১৯] তীরে এসে একটি দুর্গ তৈরি করেন এবং শত্রুদের আগমনের অপেক্ষা করতে থাকেন। মোগল বাহিনী সেখানে পৌঁছলে যুদ্ধ শুরু হয় এবং উভয় পক্ষে বহু হতাহত হয়। রাত্রে অনন্ত মাণিক্য নৈশ আক্রমণ পরিচালনা করেন, কিন্তু তাতে ফল লাভ হয়েছে কিনা বলা যায় না, কারণ মোগল বাহিনী নিজ অবস্থানেই অটল থাকে। এদিকে মোগল বাহিনী গ্রামে গ্রামে লুট করতে থাকে এবং গ্রামবাসীকে মোগলদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে চাপ দিতে থাকে, কেউ অস্বীকার করলে তাকে শৃঙ্খলিত করা হয় বা হত্যা করা হয়। অনন্ত মাণিক্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মিরযা ইউসুফ বারলাস। তিনি এই অবস্থা দেখে বুঝতে পারেন যে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কোন লাভ হবে না, তাই তিনি মোগল সেনাপতি আবদুল ওয়াহিদের নিকট এসে আত্মসমর্পণ করেন। আবদুল ওয়াহিদ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত মনসব দিয়ে তাঁকে মোগল বাহিনীতে ভর্তি করেন। অনন্ত মাণিক্য মন্ত্রী শত্রুপক্ষে যোগ দেয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে রাত্রে ডাকাতিয়া দুর্গ ত্যাগ করেন। ডঃ ভট্টাচার্য মনে করেন যে মোগল সেনাপতি আবদুল ওয়াহিদ ষড়যন্ত্র করে পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে মিরযা ইউসুফ বারলাসকে স্বপক্ষ ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করেন।[১২০] অনন্ত মাণিক্য রাজধানী ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে প্রতিরক্ষা জোরদার করে যুদ্ধ করার মনস্থ করেন। কিন্তু মোগল বাহিনী তাঁকে সে সুযোগ না দিয়ে তাঁকে এমনভাবে তাড়া করেন যে তিনি উভয় ফেনী নদী পার হয়ে আরাকানের রাজার আশ্রয়ে চলে যান।[১২১] ভুলুয়ার সকল হাতি এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি মোগলদের হস্তগত হয়। ফেনী নদী পর্যন্ত, অর্থাৎ চট্টগ্রাম সীমান্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা এখন মোগল অধিকারে চলে আসে। ভুলুয়ায় একটি মোগল থানা স্থাপিত হয় এবং ভুলুয়ার পূর্বে বড় ফেনী নদী ও মেঘনার সংযোগ স্থলে যোগদিয়ায় আরও একটি থানা স্থাপিত হয়। ফেনী নদী মোগল-আরকান সীমান্ত রূপে গণ্য হয় এবং পরে আরাকানের বিরুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধে এই নদী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইতোমধ্যে ভরা বর্ষা মৌসুম এসে যায়, চারিদিক বানের পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। ইসলাম খান এ সময়ে মুসা খানের সম্ভাব্য অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সকল ঘাঁটিকে সুরক্ষিত করার এবং সতর্ক প্রহরার নির্দেশ দেন। মিরযা নাথন ছিলেন তখন কদমরসুলে, তিনি তাঁর ঘাঁটির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন যে, বানের পানিতে সম্পূর্ণ

Edited by Ripon Sarkar

এলাকা প্লাবিত হয়, এবং নদীতে পানির স্রোত অত্যন্ত প্রবল হয়। এ সময়ে দুর্গের কোন চিহ্নই থাকে না। দুর্গের দেয়াল নষ্ট হয়ে যায় এবং বড় বড় কাঠের টুকরা একটির উপর আর একটি সাজিয়ে দেয়ালের মত করা হয়। মানুষ, ঘোড়া এবং হাতি সকলেই মাচানের উপর উঠে যায়, নৌকা ছাড়া কারও কোথাও যাওয়ার উপায় থাকে না। বন্যার কারণে দুর্গের ভিতরে খাদ্য সামগ্রীর অভাব দেখা দেয়, অনেকেই উপোস করতে থাকে এবং প্রত্যেক দিন পঞ্চাশ ষাটজন লোক মারা পড়ে।[১২২] এতেই বুঝা যায় যে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষায়, অর্থাৎ জুলাই আগস্ট মাসে বা কিছু আগে ভুলুয়া বিজয় সম্পূর্ণ হয়।

মুসা খান ও বার-ভূঁঞার আত্মসমর্পণ

ভুলুয়া বিজিত হওয়ার পরে মুসা খান ইবরাহীমপুরে বসে নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব নয় এবং মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তিনি শয়খ কামালের মাধ্যমে ইসলাম খানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং সুবাদারের অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর সকল ভাই এবং মিত্র জমিদারদের সঙ্গে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। ইসলাম খান তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা জানান; তাঁদের সান্ত্বনা দেন কিন্তু মুসা খানকে তাঁর পরিবার ও সকল ছোট ভাইসহ নজরবন্দী করে রাখেন এবং সুবাদারের বিশ্বস্ত কর্মকর্তা আবদুর রহমান পতনী ও তাঁর ভাইদের অধীনে রাখেন। তাঁদের জমিদারী তাঁদের ভরণপোষণের জন্য জায়গীর দেয়া হয়। মুসা খানের অন্য ভাইদের এবং মিত্র জমিদারদের খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নিযুক্ত করা হয়।

আনোয়ার খানের আত্মসমর্পণ

মুসা খান আত্ম—সমর্পণ করলেও আরও দুজন ভূঁঞা জমিদার থেকে যান- বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খান ও মাতঙ্গ-এর পাহলোয়ান। দুজনেই ডাকছড়া দুর্গের যুদ্ধে মুসা খানের সঙ্গে ছিলেন,[১২৩] কিন্তু মুসা খান ডাকছড়া ও যাত্রাপুর ত্যাগ করে লক্ষ্যা নদীতে তাঁর প্রতিরোধ গড়ে তুললে, আনোয়ার খান ও পাহলোয়ান স্ব স্ব জমিদারীতে চলে যান এবং সেখানে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনী হাসানপুর থেকে দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে যখন বুকাইনগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন আনোয়ার খান ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি দেখেন যে তাঁর মিত্র জমিদারেরা প্রায় সকলে আনুগত্য স্বীকার করেছে এবং মোগল বাহিনী বুকাইনগর দখল করতে যাচ্ছে, তাই হতাশ হয়ে পড়েন এবং আত্মসমর্পণ করা শ্রেয় মনে করেন। তিনি ইসলাম খানের নিকট প্রস্তাব দেন যে অনুমতি দেয়া হলে তিনি সিলেটে গিয়ে সেখানে অবস্থানরত আফগানদের বিদ্রোহের উস্কানি দেবেন, যাতে তাঁরা উসমানের সাহায্যে অগ্রসর হতে না পারেন। ইসলাম খান আনোয়ার খান ও তাঁর ভাইদের সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাঁদের জমিদারী জায়গীররূপে ফেরত দেন এবং তাঁদের বন্দী না করে সিলেটে (বা বানিয়াচঙ্গে) যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু ইসলাম কুলী নামক বাজ বাহাদুরের এক ভৃত্যকে তাঁর উপর নেতৃত্ব দেয়ায় আনোয়ার খান মর্মাহত হন। ইসলাম কুলী খানের নেতৃত্বে আনোয়ার খান এগার সিন্দুরে পৌঁছলে ইসলাম খান মুবারিজ খানকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে পাঠান এবং মুবারিজ খান

Edited by Ripon Sarkar

পৌঁছা পর্যন্ত আনোয়ার খানকে ঐ বাহিনীর নেতৃত্বে থাকতে বলা হয়। মুবারিজ খান এগার সিন্দুরে পৌঁছলে ইসলাম খান সংবাদ পাঠান যে তিনি নিজেই টোক-এ আসছেন। সুতরাং মুবারিজ খানকে টোক-এ থাকতে বলে ইসলাম কুলীকে আবার সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব নেয়ার আদেশ দেন। আনোয়ার খান ইসলাম খানের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হন, অবশ্য ইসলাম খানের এছাড়া উপায় ছিল না, তিনি আনোয়ার খানকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যা হোক, আনোয়ার খান আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তিনি মুসা খানের ভাই মাহমুদ খানকে (যিনি উসমানের বিরুদ্ধে গমন করেন) এই মর্মে পত্র লিখেন ঃ "মোগলদের সম্পূর্ণ বাহিনী খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, বাকি সৈন্যরা আমার সঙ্গে, ইসলাম খানের সঙ্গে অবস্থানরত সৈন্যদের সংখ্যাও জানা আছে। এমতাবস্থায় তুমি খাজা উসমানের সঙ্গে যোগাযোগ কর এবং তাঁকে মোগল বাহিনী আক্রমণ করতে বল। এদিকে তুমি সকল জমিদার নিয়ে মোগল বাহিনীতে গোলযোগ সৃষ্টি কর, ফলে ভিতরে বাইরে আক্রান্ত হয়ে মোগল বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে এবং উসমান তাদের হত্যা করবে বা বন্দী করবে। এদিকে আমি সেনানায়কদের বন্দী করে বানিয়াচঙ্গ নিয়ে যাব। এই সংবাদ পেয়ে গিয়াস খান শাহ বন্দর থেকে পলায়ন করবে এবং আমি ঢাকায় গিয়ে ইসলাম খানকে জীবিত বন্দী করব। মুসা খান তাঁর পরিবারসহ মুক্তি পাবে, সমগ্র ভাটি মুক্ত হবে এবং আবার জমিদারদের অধীনে আসবে।[১২৪] মাহমুদ খানের জন্য এটা একটি লোভনীয় প্রস্তাব, তিনি এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে খাজা উসমানের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উসমানও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন, অতঃপর উসমান, মাহমুদ খান, বাহাদুর গাজী এবং অন্যান্য জমিদারেরা প্রস্তাব মত নিজ নিজ ভূমিকা পালনের প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

এদিকে আনোয়ার খানও প্রস্তাব মত তাঁর ভূমিকা পালনের জন্য অগ্রসর হন। তিনি মুবারিজ খান, ইসলাম কুলী এবং অন্যান্য ছোট বড় সেনানায়কদের এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। মুবারিজ খান নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেও অসুস্থতাবশত যেতে পারলেন না, ইসলাম কুলী এবং রাজা রায়ও (তিনি শাহজাদপুরের জমিদার ছিলেন, তিনি আগেই আত্ম-সমর্পণ করেন) মুবারিজ খান না যাওয়ায় ভোজে অংশ নিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এতে আনোয়ার খান ইসলাম কুলী ও রাজা রায়কে বন্দী করে নৌকায় করে বানিয়াচংগ নিয়ে যান। ইতোমধ্যে সমস্ত ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে যায় এবং ইসলাম খান শয়খ কামালকে সংবাদ পাঠান যেন মাহমুদ খান ও বাহাদুর গাজীকে হত্যা করা হয় এবং অন্যান্য জমিদারদের বন্দী করা হয়। রাজা শত্রুজিত এবং অন্যান্য কয়েকজন অনুগত জমিদারকে আনোয়ার খানের বিরুদ্ধে পাঠান হয়। ইসলাম খান নিজেও টোক-এ আসেন এবং মুবারিজ খানকে আনোয়ার খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদ ইসলাম খানের আদেশ পেয়ে মাহমুদ খান ও বাহাদুর গাজীকে বন্দী করে ইসলাম খানের নিকট পাঠান এবং অন্যান্য জমিদারদের বন্দী করে বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের অধীনে রাখেন। মাহমুদ খান ও বাহাদুর গাজীকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় ইসলাম খানের নিকট আনা হয়, তিনিও তাদের অন্য কোন শাস্তি না দিয়ে বন্দী করে রাখেন।[১২৫]

রাজা শত্রুজিত আনোয়ার খানের জমিদারী বানিয়াচঙ্গ পৌঁছেন, আনোয়ার খানও অনেক নৌকা নিয়ে শত্রুজিতের নৌবাহিনীকে বাধা দেন। কিন্তু যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়ী হতে না পেরে নিজ নিজ শিবিরে অবস্থান নিয়ে অপেক্ষা করেন। ইতোমধ্যে মুবারিজ

Edited by Ripon Sarkar

খান তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌঁছলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায় এবং শত্রুজিত ও মুবারিজ খান উভয়ের মিলিত আক্রমণে আনোয়ার খান পশ্চাদপসরণ করতে থাকেন। অবশেষে টিকতে না পেরে আনোয়ার খান সন্ধির প্রস্তাব দেন এবং মোগল বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি করান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনোয়ার খান সময় কাটিয়ে উসমানের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের ফলাফল দেখার জন্য যুদ্ধ বিরতি করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যে উসমান বুকাইনগর ত্যাগ করেন এবং আনোয়ার খান এটা জানতে পেরে আত্মসমর্পণ করেন। মুবারিজ খান ও রাজা শত্রুজিত তাঁকে শৃঙ্খলিত করে ইসলাম খানের নিকট পাঠিয়ে দেন।[১২৬]

যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং বাকলার রাজা রামচন্দ্রের পতনের পরে (ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইসলাম খান আনোয়ার খানকে শাস্তি দেন। তিনি মুসা খানের চাচাত ভাই আলাওল খান এবং আনোয়ার খানকে অন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। ডাকছড়া যুদ্ধের পরে মুসা খানের আত্মসমর্পণ করে আবার বিদ্রোহী হওয়ার ষড়যন্ত্রে আলওয়াল খান যুক্ত ছিলেন এই অভিযোগে এবং আনোয়ার খানকে খাজা উসমানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে এই শাস্তি দেয়া হয়। এই আদেশ দেয়ার পরে ইসলাম খান আনোয়ার খানকে এক সংবাদ পাঠিয়ে বলেনঃ "বাজ বাহাদুরের ভৃত্য ইসলাম কুলীকে বিনা অপরাধে তুমি (বানিয়াচঙ্গে) ধরে নিয়ে গিয়েছিলে, তোমার উদ্দেশ্য ছিল তার সঙ্গে মিত্রতা করা। এখন তুমি হয় তোমার মেয়ে অথবা তোমার ভাই হোসেন খানের মেয়ে তার (ইসলাম কুলীর) সঙ্গে বিয়ে দাও এবং এর সম্মতি স্বরূপ নিজের হাতে পান বিতরণ কর।[১২৭] উভয় ভাই মনে করতেন যে এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার চেয়ে তাঁদের জন্য মৃত্যু হাজার গুণে ভাল, কিন্তু এ ছাড়া তাঁদের আর কোন উপায় ছিল না। প্রস্তাবে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম খান আলাওল খান এবং আনোয়ার খান উভয়কে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেন, সেখানে তাঁরা বন্দী জীবন যাপন করেন।[১২৮]

হোসেন খান এই অপমান সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বন্দীদশা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে থাকেন। একদিন তিনি ধুতরা ও চিনি মিশিয়ে রুটি তৈরি করেন এবং বন্দীশালার প্রহরীদের তা খাওয়ান। প্রহরীরা জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তিনি ঢাকা দুর্গ থেকে রাত্রে বেরিয়ে এসে চাঁদনী ঘাটে[১২৯] ইতোপূর্বে প্রস্তুত রাখা একখানি খেলনা নৌকা যোগাড় করে সোজা বানিয়াচঙ্গ চলে যান। চাঁদনী ঘাটে তাঁর আপন লোক তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। বানিয়াচঙ্গ পৌঁছে তিনি তাঁর ও তাঁর ভাই-এর (আনোয়ার খানের) সকল স্ত্রী এবং কন্যাদের হত্যা করেন এবং তাঁর নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলন্দাজ বাহিনীকে একত্র করেন, আফগানরাও দলে দলে তাঁর বাহিনীতে ভর্তি হয়। সকালে তাঁর পলায়নের খবর জানতে পেরে ইসলাম খান হোসেন খানের বন্দীশালায় প্রহরী এবং দুর্গের মোট পঁয়ত্রিশ জন প্রহরীকে শাস্তি দেন, তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করা হয়। অতঃপর শাহজাদপুরের জমিদার রাজা রায়কে দুশ নৌকাসহ হোসেন খানের বিরুদ্ধে পাঠান। রাজা রায় মনে করেন যে হোসেন খান তখনও সৈন্য সংগ্রহ করার সময় পাননি, তাই তিনি অসতর্কভাবে অগ্রসর হন। এদিকে হোসেন খান মাত্র কয়েকখানি খেলনা ও ডিঙ্গী নৌকায় অল্প সৈন্য রাজা রায়ের বিরুদ্ধে পাঠান এবং তাদের নির্দেশ দেন যেন তারা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে পশ্চাদ্ধাবন করে। হোসেন খান নিজে একটি খালে বিশটি কোশায় আফগান সৈন্য নিয়ে ওঁত পেতে থাকেন। রাজা রায় অগ্রবর্তী বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের পেছনে ধাওয়া করেন, এ সময় তাঁর

Edited by Ripon Sarkar

বাহিনীতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। হোসেন খান এর সুযোগ নিয়ে রাজা রায়কে প্রচণ্ড ভাবে আক্রমণ করেন। রাজা রায় কোনক্রমে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন কিন্তু তাঁর নৌকা, অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদ হোসেন খানের হাতে পড়ে। ইসলাম খান এই সংবাদ পেয়ে ভীষণ রেগে যান, তিনি মুসা খানকে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে এমনভাবে তিরস্কার করেন যে তরবারির আঘাতের চেয়ে এটা বেশি বেদনাদায়ক। তিনি মুসা খানকে বলেনঃ এই গোলাপ ফুল তোমার বাগানের (তাৎপর্য বোধ হয় এই যে হোসেন খান মুসা খানের দলের লোক), সুতরাং তাকে দমন করা তোমার দায়িত্ব। এতে মুসা খান মর্মাহত হন। তিনি ইসলাম খানের নিকট থেকে একখানি দা এবং এক টুকরা পান নেন (তাৎপর্য বোধ হয় এই যে দা যেমন পান তুচ্ছ করে কাটে, মুসা খানও হোসেন খানকে কেটে কেটে টুকরা করবেন) এবং তাঁর নিজের এবং তাঁর ভাইদের দুশ নৌকাসহ আলু খান আফগান নামে তাঁর এক বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হোসেন খানের বিরুদ্ধে পাঠান। মুসা খান আলু খানকে বলেন, হয় যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে বা মৃত্যুবরণ করতে হবে। আলু খান বানিয়াচঙ্গ গিয়ে হোসেন খানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়, আলু খান বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিহত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসা খানের সৈন্যরা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং হোসেন খানকে জীবিত ধরে ইসলাম খানের নিকট নিয়ে আসে। ইসলাম খান মুসা খানের প্রশংসা করেন, হোসেন খানকে আবার বন্দী করে রাখা হয়।[১৩০]

মাতঙ্গ-এর পাহলোয়ানের পতন

খাজা উসমান বুকাইনগর পরিত্যাগ করলে ইসলাম খান শামস-উদ-দীন বাগদাদীর নেতৃত্বে তরফ-এ অবস্থানরত উসমানের ছেলে মুমরিজ এবং ভাই মালহীর বিরুদ্ধে এবং মাতঙ্গ[১৩১] এর পাহলোয়ান-এর বিরুদ্ধে এক বাহিনী পাঠান। তরফ-এর যুদ্ধের বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। মুমরিজ ও মালহীর পরাজয়ের পরে হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী মাতঙ্গ-এর পাহলোয়ানের বিরুদ্ধে গমন করেন। পাহলোয়ান নিজে অত্যন্ত সাহসী ছিলেন, তাঁর অনেক ভাই ছিল, তাঁরাও দুর্ধর্ষ সেনানায়ক ছিলেন। তাঁরা হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদীর বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধের ভিতরে পাহলোয়ান একটি বর্শা নিয়ে হাজী শামস-উদ-দীন এর বুকে আঘাত করেন এবং ঠিক একই সময়ে হাজী শামস-উদ-দীনও পাহলোয়ানকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন, ফলে উভয় সেনাপতিই একে অন্যের হাতে প্রাণ হারান। হাজী শামস-উদ-দীনের পালক পুত্র কুরবান আলী এটা দেখে পিতার সৈন্যদের একত্র করেন এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। পাহলোয়ানের সৈন্যরাও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেন কিন্তু পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। কুরবান আলী জয়লাভ করে ইসলাম খানের নিকট বিজয় সংবাদ পাঠান। বার-ভূঁঞার শেষ ঘাঁটি মাতঙ্গও বিজিত হল।[১৩২]

এভাবে মোগলদের বিরুদ্ধে ভাটির বার-ভূঁঞার গৌরবময় প্রতিরোধের অবসান হয়। আগেই বলা হয়েছে যে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট ও তাঁর সুবাদারের বিরুদ্ধে বার-ভূঁঞার যুদ্ধ ছিল একটি অসম যুদ্ধ, কিন্তু ইসলাম খানের বিরুদ্ধে বার-ভূঁঞার যুদ্ধের যে বিবরণ আমরা পেয়েছি এবং উপরে বর্ণিত হল তাতে বার-ভূঁঞার সাহস, মনোবল এবং রণ-কৌশলের অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। ডাকছাড়া এবং বন্দর খালের যুদ্ধে মুসা খান ও তাঁর মিত্ররা যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দেন তার তুলনা পাওয়া যায় না। বিশেষ করে এ

Edited by Ripon Sarkar

দুই যুদ্ধে মোগল বাহিনী প্রায় পরাজয় বরণ করতে যাচ্ছিল এবং তাদের হাতি বাহিনী না থাকলে মোগলরা শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ। এই যুদ্ধ ছিল মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের যুদ্ধ, মুসা খানের পূর্বপুরুষ রাজপুতনা থেকে এলেও তিন পুরুষে তাঁরা বাঙালি হয়ে গেছেন। মিরযা মুমিন ছিলেন মাসুম খান কাবুলীর ছেলে, কিন্তু পিতা-পুত্র উভয়ে বাঙালিদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আজীবন যুদ্ধ করেন। বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খান বা আনোয়ার গাজী বাঙালি ছিলেন কি আফগান ছিলেন তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাচ্ছি না, মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধে অনেক আফগান সৈন্যের কথা বলা হয়েছে। মনে হয় বাহাদুর গাজী, সোনা গাজীদের মত তিনিও বাঙালি ছিলেন বা মূলত আফগান হলেও অনেকদিন থেকে বাংলায় থেকে তিনিও বাঙালি হয়ে গেছেন। যা হোক, বাঙালিরা পরাজয় বরণ করেছেন, আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এই পরাজয়ে গ্লানি নেই, হাতির সঙ্গে মাকড়সা আর কত যুদ্ধ করতে পারে? কিন্তু পুরো দেড় বছর তাঁরা যেরূপ বীরত্ব দেখিয়েছেন, তাতেই তাঁদের সাহস, মনোবল, রণকৌশল এবং সর্বোপরি অকুণ্ঠ দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়।

১। তুজুক ১ম, ১৫-১৬, ১৩৭-৩৮।

২। ঐ ৭৮।

৩। এই কাহিনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে পাওয়া যায়, দেখুন, তুজুক ১ম, ১১৩-১৪।

৪। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ১৩৭।

৫। তুজুক, ১ম, ১১৪।

৬। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ৮৩৭-৩৮।

৭। আধুনিক দুজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের বক্তব্য আমরা এখানে তুলে ধরব। স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ "Jahangir was disconsolate; his home was dark, because she who was coveted as the light of his Harem-and was destined afterwards to blaze forth as the light of the world (Nur-i-Jahan) was then illuminating the humble tent of her lawful husband Sher-Afkan Istajlu, a petty Turkish Jagirdar of Burdwan. The royal sorrow found a sympathetic listener in his foster-brother Qutbuddin Khan Koka, who was appointed on 2nd September, 1606 governor of Bengal with whispered instructions as to the means of procuring the healing balm for the afflicted royal heart." (HB II, 215)

অন্যপক্ষে বেণী প্রসাদ বলেন ঃ

"The received version that Jahangir fell in love with her (Meher-Un-Nisa) during the lifetime of Akbar, that the latter refused to gratify his wishes, and induced Mirza Ghiyas to marry her to Sher Afkun, that the disappointed lover, immediately on his accession to power, basely contrived the death of his more successful rival, that the high souled Meherunnisa indignantly rejected the overtures of his husband's murderer for four years, but that she yielded at last all this finds absolutely no support in the contemporary authorities."

Edited by Ripon Sarkar

"It has been assumed by many writers that Qutbuddin was appointed to Bengal with the sole object of procuring Meherunnisa for his master. There is absolutely no warrant for the opinion."

(Beni Prasad: History Jahangir, 5th edition, Allahabed, 1962, 162-63, 166)

বেণী প্রসাদের আলোচনা অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি প্রথমে দেখান যে সমসাময়িক কোন সূত্রে এইরূপ কোন ইঙ্গিত নেই যে জাহাঙ্গীর মেহের-উন-নিসাকে লাভ করার উদ্দেশে কুতব-উদ-দীন খানের প্রতি আলীকুলী ইস্তজলুকে শাস্তি দেয়ার আদেশ দেন। বিদেশী পরিব্রাজক যাঁরা এইরূপ কোন scandal-এর তিল পরিমাণ সংবাদ পেলে তাল পরিমাণ করে ছাড়তেন তাঁদের বিবরণেও এরূপ কোন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, বেণী প্রসাদ বলেন যে জাহাঙ্গীর সত্যি সত্যিই মেহের-উন-নিসাকে বিয়ে করতে চাইলে আকবরের পক্ষে তাঁকে বাধা দেয়ার কোন কারণ ছিল না, কারণ মেহের-উন-নিসা ছিলেন সদ্বংশজাত, বিদুষী এবং সংস্কৃতিবান। তৃতীয়ত, তিনি বলেন যে পরবর্তী লেখকেরাই জাহাঙ্গীর কর্তৃক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আলীকুলীকে শাস্তি দেয়ার কথা লিপিবদ্ধ করেন। বেণী প্রসাদের মতে এটা একটি বানোয়াট গল্প, এবং এই মুখরোচক গল্প পরে নির্মাণ করা হয়েছে।

আগেই বলেছি, বেণী প্রসাদের আলোচনা পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং তথ্য-নির্ভর কিন্তু নিম্নের প্রশ্নগুলির উত্তর বেণী প্রসাদের আলোচনায় পাওয়া যায় না।

১ম, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট বর্ধমানের জায়গীরদার একজন নিতান্তই ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তাকে শাস্তি দেয়ার জন্য সম্রাটের সুবাদারকে আদেশ দেয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

২য়, সম্রাট সুবাদারকে আদেশ দিলেও সুবাদার যে কোন একজন সেনাপতিকে পাঠিয়ে জায়গীরদারকে ধরে নিয়ে আসতে পারত, বা সংবাদ পাঠালেই জায়গীরদার নিজেই চলে আসত। সংবাদ পাঠাবার পরেও সুবাদারের দরবারে উপস্থিত না হলে তার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান যেত। এমতাবস্থায় সুবাদার নিজে বর্ধমানে যাওয়ার কি প্রয়োজন ছিল?

তাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা সন্দেহজনক। অবশ্য সকল প্রশ্নের সমাধান বা উত্তর পাওয়া যায় না। এই ঘটনাটা ইতিহাসের এমন একটি সমস্যা যার সন্তোষজনক সমাধান বোধ হয় পাওয়া যাবে না।

৮। তুযুক, ১ম, ১১৪-১১৫।

৯। ঐ, ১৪২।

১০। ঐ, ২০৮।

১১। ঐ, ২০৮-০৯।

১২। জাহাঙ্গীর বলেন যে ইসলাম খান মদ পান করতেন না। ঐ, ৩২।

১৩। বাহরিস্তান, ১ম, পৃঃ ৩-৪।

১৪। ঐ, ৪-৫।

১৫। যদিও বাহরিস্তানে মির্যা নাথনের বক্তব্যের এই রূপ অর্থ হয়, তবুও উজীর খানকে বন্দী করার কথা বোধ হয় বলা হয়নি, শুধু মাসুম খানের পুত্রগণ এবং লাটী খানের বন্দী করার কথা বলা হয়েছে। তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে বলা হয়েছে যে উজীর খান ২১শে আগস্ট ১৬০৮ তারিখে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে ৬০টি হাতি এবং একটি মিশরীয় মূল্যবান পাথর নযরানা দেন। যেহেতু উজীর খান একজন প্রবীণ কর্মকর্তা ছিলেন, সম্রাট তাঁকে তাঁর সঙ্গে থাকতে আদেশ দেন। (তুযুক, ১ম, ১৪৭)।

১৬। তুযুক-ই-জাহাংগীরীতে আবুল হাসান শিহাবখানীর উপাধি দেয়া হয়নি, তবে বাহরিস্তানে সর্বত্র তাঁকে তাঁর উপাধি মুতাকিদ খান রূপে উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও তাঁর পূর্ব নাম আবুল হাসান শিহাবখানী রূপে উল্লেখ করা হয়নি।

Edited by Ripon Sarkar

১৭। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে ইসলাম খানের বাংলার সুবাদার নিযুক্তির পরে একই তারিখে ইহতিমাম খানকে মীর বহর নিযুক্তির কথা বলা হয়েছে (তুজুক, ১ম, ১৪৪)।

১৮। রোটাস দুর্গ শাহবাদ জেলায় শোন নদীর তীরে অবস্থিত। পূর্ব-ভারতে এটা একটি প্রাচীন দুর্গ, রুহিতশ্ব নামক কোন হিন্দু রাজা এটা নির্মাণ করেন, তাই এর নাম হয় রৌতস বা রোহতাস। শের শাহও এটা দখল করেন এবং আফগান আমল থেকে দুর্গের সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

১৯। চুন্দ শাসারামের পশ্চিমে একটি পরগণা, আকবরনামায় এর নাম জৌন্দ (আকবরনামা, ১ম, বেভেরীজ কর্তৃক অনূদিত, ৩২৭)।

২০। বাহরিস্তান, ১ম, ৪-৫।

২১। তুজুক, ১ম, ১৪৩। মিরযা নাথন বলেন যে ইহতিমাম খানের মনসব ছিল ১০০০/৭০০ (বাহরিস্তান, ১ম, ৫)।

২২। BPP, vol. XXXV, 1928, 143-46.

২৩। সরকার নারঙ্গাবাদ (বা পরে নৌরঙ্গাবাদ) নামটি বিভ্রান্তিকর। আইন-ই-আকবরীতেই সর্বপ্রথম বাংলার ১৯টি সরকারের নামের তালিকা এবং বিবরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এই তালিকায় নারঙ্গাবাদ নামে কোন সরকার নেই। আইন-ই-আকবরী রচিত হওয়ার ২৪/২৫ বছর পরে আবদুল লতীফের ডায়েরী লিখিত হয়, এই সময়ের মধ্যে কোন নতুন সরকার গঠিত হওয়ার কথা জানা যায় না, সম্ভাবনাও নেই। গোয়াশের উল্লেখ থাকায় মনে হয়, গোয়াশ যে সরকারে অবস্থিত ছিল, সেটিকেই নারঙ্গাবাদ বলা হয়েছে। গোয়াশ ছিল সরকার উদাম্বর বা সরকার তাঁড়ায় অবস্থিত। গোয়াশ তাঁড়া শহরের নিকটেই অবস্থিত। তাই মনে হয় সরকার নারঙ্গাবাদ, সরকার তাঁড়া বা সরকার উদাম্বর একই।

২৪। গোয়াশ মুর্শিদাবাদ শহর এবং জলঙ্গীর মধ্যবর্তী স্থানে, বর্তমানে এটা পদ্মার ৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত, কিন্তু রেনেলে মানচিত্রে (নং-১০) পদ্মার অল্প দক্ষিণে দেখা যায়। খান জাহানও ভাটি অভিযানে আসার সময় প্রথমে গোয়াশে অবস্থান করেন, এখানে দাউদ কররানীর মা তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৫। আলাইপুর রাজশাহীর পুটিয়ার ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গংগার তীরে অবস্থিত। আলাইপুর জমিদারী সম্পর্কে ২য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৬। এস. আই. বোরাহ বলেন যে রাজশাহীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গুরুদাসপুর থানার প্রায় চার মাইল উত্তর-পূর্বে নন্দকুজ নদীর তীরে নাজিরপুর অবস্থিত, নন্দকুজ নদী পূর্ব দিকে গোমনী নদী নামে পরিচিত। নাজিরপুর নাটোরের প্রায় ১২ মাইল পূর্বে অবস্থিত। (বাহরিস্তান ২য়, পৃ. ৮০৩)। কিন্তু এটা ঠিক নয়। নাজিরপুর বর্তমান পত্নীতলা থানার পার্শ্বেই অবিস্থত।

২৭। বজরাপুর নাটোর থেকে ১৫ মাইল দূরত্বে এবং ভত্তিপাড়া থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

২৮। শাহপুর ঘোড়াঘাটের ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

২৯। ত্তিপুরা ও তিতুলী। মালদহ শহরের ২৩ মাইল পূর্বে তিতুলিয়া নামে একটি গ্রাম আছে। রেনেলের মানচিত্রে (নং-৫) নিশানপুরের মধ্য দিয়ে তিতুলিয়া থেকে ঘোড়াঘাট পর্যন্ত একটি রাস্তা দেখা যায়। কিন্তু ইহতিমাম খানের অবস্থান স্থল এই মালদহের তিতুলিয়ার সঙ্গে এক নয়, কারণ তাঁরা সবেমাত্র রাজমহল থেকে এক মঞ্জিল এসেছেন এবং গৌড় পর্যন্ত তখনও আসেননি। (দেখুন, বাহরিস্তান, ২য়, ৮০১)।

৩০। ঘোড়াঘাটের দক্ষিণে করতোয়ার তীরে, বর্তমান বগুড়ায়। (বাহরিস্তান, ২য়, ৮০৮)।

৩১। শাহজাদপুর এখনও একটি প্রসিদ্ধ স্থান। পাবনা জেলায় করতোয়ার পশ্চিম তীরে শাহজাদপুর অবস্থিত।

৩২। রেনেলের মানচিত্রে (৬ নং) শাহজাদপুরের ৬/৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাউলিয়া নামে একটি স্থান চিহ্নিত আছে, তবে মনে হয় ইসলাম খান দক্ষিণ-পশ্চিমে না গিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে আসেন,

Edited by Ripon Sarkar

কারণ তিনি শাহজাদপুর থেকে কাটাসগড়ের দিকে আসছিলেন। তাই শাহজাদপুরের প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে বোয়ালিয়াকে বালিয়া বলে মনে করা হয়। (বাহরিস্তান, ২য়, ৮১১)।

৩৩। কাটাসগড় নামেই বুঝা যায় এখানে একটি দুর্গ ছিল, তবে বর্তমানে দুর্গ পাওয়া যাবে না। বাহরিস্তানের বিবরণে মনে হয় গঙ্গা (পদ্মা), ধলেশ্বরী এবং ইছামতির সংযোগ স্থলে অবস্থিত ছিল। রেনেলের মানচিত্রের (নং-১৬) জাফরগঞ্জের নিকটেই হবে কাটাসগড়।

৩৪। কীর্তিনাশার অপর নাম কাথৌরিয়া, অর্থাৎ পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মেঘনা পতিত হয়েছে। প্রথমে এর নাম ছিল রথখোলা, পরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পরে কাথৌরিয়া এবং সব শেষে কীর্তিনাশা (বাহরিস্তান, ২য়, ৮১২)।

৩৫। বলরা ইছামতি নদীর তীরে ঢাকা থেকে প্রায় ২৪ মাইল পশ্চিমে।

৩৬। কলাকোপা ঢাকার প্রায় ১৭ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ইছামতির তীরে অবস্থিত।

৩৭। চার্লস স্টুয়ার্টঃ হিস্টরি অব বেঙ্গল, ১৮১৩, ২৩২-৩৩, ২৩৭।

৩৮। ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ভল্যুম ১, নং ১, ১৯৩৫, ৩৬-৬৩।

৩৯। BPP, vol. LI, 1936, 48-49 বাহরিস্তান, ২য়, ৮১৩-১৪।

৪০। বাহরিস্তান, ১ম, ৬, ৭, ৬৪।

৪১। A. H. Dani: Dacca, a record of its changing Fortunes, Dacca, 1962, p. 31 S. M. Taifoor: Gilmpses of old Dhaka, p, xlx.

৪২। এইচ. বি. ২য়, ২৭০-৭২।

৪৩। যোগী এলাহাবাদের নিকটে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত।

৪৪। চাবুয়া যোগীর প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

৪৫। ময়মনসিংহের পরগণা আলপসিংহ বা আলপশাহী প্রায় ৫৬০ মাইল জুড়ে একটি বিস্তীর্ণ পরগণা ছিল। এই পরগণা ঢাকা বাহাদুরাবাদ রেল লাইন ঘেঁষে পশ্চিম দিকে অবস্থিত, ত্রিশাল, ফুলবাড়িয়া এবং মুক্তাগাছা থানাগুলি এই পরগণার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রেনেলের ৬নং মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

৪৬। বাহরিস্তান, ১ম, ৯।

৪৭। ঐ, ৩২।

৪৮। ঐ, ১৪।

৪৯। ঐ, ১৮।

৫০। ঐ, ১৯-২০।

৫১। ঐ, ২০।

৫২। BPP. vol. XXXV. 1928. 144.

৫৩। বাহরিস্থান, ১ম, ১৮, ১৫।

৫৪। ঐ, ৩২৭।

৫৫। ঐ, ২য়, ৮০০-৮০১।

৫৬। এইচ. বি., ২য়, ২৫০ টীকা।

৫৭। বাহরিস্তান, ২য়, ৮০১।

৫৮। আকবরনামা, ৩য়, ৮৭৯-৮০।

৫৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১৮।

Edited by Ripon Sarkar

৬০ কাটা খাল বর্তমানে মধুমতী খাল নামে পরিচিত, আধুনিক মানচিত্রে এটা চিত্রা নদী থেকে নির্গত হয়ে ভৈরব নদীর সঙ্গে নড়াইলের প্রায় এক মাইল পূর্বে মিলিত হয়েছে। শত্রুজিতের রাজধানী ভূষণা এই স্থান থেকে আরও অনেক উত্তরে অবস্থিত ছিল, তাই ধারণা করা হয় যে তিনশ বছর পূর্বে এই নদী উত্তর দিকে আরও অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। (বাহারিস্তান, ২য়, টীকা নং ৯)।

৬১ BPP. vol. XXXV. 1928. 144.

৬২। বাহারিস্তান, ১ম, ২৯।

৬৩। ঐ, ৩৫।

৬৪। ঐ, ১৬-১৭।

৬৫। ঐ, ২১-২২।

৬৬। ঐ, ৩২।

৬৭ ঐ, ৩৩।

৬৮। BPP. vol. XXXVIII. Plate. Coin No. 1; রমেশচন্দ্র মজুমদার: বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড মধ্যযুগ, ২য় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮০ বাংলা, ৫০০-৫০১।

৬৯ ই. এ. গেইট: হিস্টরি অব আসাম, ৬৫।

৭০। ফারসীর বাংলা অনুবাদের পুনর্মুদ্রণের জন্য দেখুন, সতীশচন্দ্র মিত্র: যশোর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৮০৯।

৭১। বাহারিস্তান, ১ম, ৪০।

৭২। ঐ, ২৮।

৭৩। ঐ, ৩৫-৪৮।

৭৪। ঐ, ৪৮।

৭৫। যোহনা খাল বেতিলী এখন আর আধুনিক মানচিত্রে পাওয়া যাবে না কারণ এটা নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। তবে মির্জা নাথনের বিবরণে মনে হয় যোহনা খাল বেতিলী কাটাসগড় এবং কলিয়ার নিকটেই হবে।

৭৬। যাত্রাপুর থেকে একটি বড় সড়ক হরিরামপুরের ভিতর দিয়ে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। রেনেলের ১৬নং মানচিত্রে যাত্রাপুরের অবস্থান নির্দেশ করা আছে।

৭৭। একজন মির্জা নাথন বার-ভূঁইয়ার নাম দিয়েছেন। তাঁরা হলেন মুসা খান, আলাউল খান, আবদুল্লাহ খান, মাহমুদ খান, বাহাদুর গাজী, সোনা গাজী, আনোয়ার গাজী, শমস পীর, মির্জা মুমিন, মধু রায়, বিনোদ রায়, পাহলোয়ান, হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী। বাহারিস্তান, ১ম, ৫৭।

৭৮। বাহারিস্তান, ১ম, ৫৪-৫৭।

৭৯। ডাকচরা যাত্রাপুরের প্রায় ৩ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত। ডাকচরার দক্ষিণে পদ্মা এবং দেড় মাইল পশ্চিমে যোগিনী শিবির কাটাসগড়।

৮০। বাহারিস্তান, ১ম, ৫৬-৫৯।

৮১। কালীগঙ্গা বা কাজলগঙ্গা পদ্মার একটি শাখা নদী। পদ্মা থেকে যেখানে জলঙ্গী নির্গত হয়েছে, তার প্রায় ১০ মাইল নিচে কালীগঙ্গা নির্গত। এ স্থানকেই কালীগঙ্গার মোহনা বলা হয়েছে।

৮২। বাহারিস্তান, ১ম, ৫৯-৬০।

৮৩। ঐ, ৮৮-৮৯।

৮৪। ঐ, ৬১-৬২।

Edited by Ripon Sarkar

৮৫। ঐ, ৬২-৬৩।

৮৬। প্রবাসী, ২২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র ১৩২৯, ৬৪১।

৮৭। এইচ. বি. ২য়, ২৫৫।

৮৮। গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মা-যমুনার সংযোগ স্থলে কোদালিয়া নামক একটি স্থান আছে, এটা সাধারণত বাইশ কোদালিয়ার মোহনা নামে পরিচিত। কিন্তু এখানে এই স্থানের কথা বলা হয়নি। মির্জা নাথনের বিবরণে মনে হয় এই কোদালিয়া কলাকোপা ও পাকুরঘাটার মধ্যে হবে। নারায়ণগঞ্জের আড়াই মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এক কোদালিয়া আছে, কিন্তু এটা স্থান হওয়াও সম্ভব নয়। পাকুরঘাটার উত্তরে ধলেশ্বরীর উত্তর তীরে এক কোদালিয়া আছে, ইহা চর কোদালিয়া নামে পরিচিত, এই স্থান হওয়ার সম্ভাবনাও কম। (বাহারিস্তান, ২য়, ৮১২ টীকা ১৩, প্রবাসী ভাদ্র, ১৩২৬ বাংলা, ৬৪১, টীকা) বাহারিস্তানের বিবরণে মনে হয়, কলাকোপা এবং যাত্রাপুরের মধ্যবর্তী এলাকায় হবে, অর্থাৎ ঢাকা থেকে ৩০ মাইল এবং ১৭ মাইলের মধ্যে ইছামতি নদীর তীরে কোথাও হবে, কারণ সেখানে থেকে মীরক বাহাদুর জালাইর যাত্রাপুর আক্রমণে ইসলাম খানকে সাহায্য করেন। স্থানটি হয়ত এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে।

৮৯। বাহারিস্তান ১ম, ৬৩-৬৪।

৯০। ঐ, ৬৫-৬৯।

৯১। ঐ, ৬৮-৭০।

৯২। ঐ, ৭০। ইলিয়াস খানের নাম বাহারিস্তানে প্রধান বার-ভূঁঞার তালিকায় নেই, সুতরাং ডাকচরার যুদ্ধে মুসা খানের সঙ্গে ইলিয়াস খান ছিলেন না, কারণ ডাকচরার যুদ্ধের বর্ণনাতেই মির্জা নাথন বার-ভূঁঞার তালিকা দেন। তাই মনে হয় পূর্ব থেকেই মুসা খানের সঙ্গে ইলিয়াস খানের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ডঃ মুহীবুল্লাহ ভট্টাচার্য মনে করেন যে যাত্রাপুর ও ডাকচরা দুর্গের পতনের পরে মুসা খানের অবস্থা এতই খারাপ হয়ে যায় যে ইলিয়াস খান চাঁদপ্রতাপ ছেড়ে চলে যান, তাই তখন মুসা খানের ভাই ইলিয়াস খানের আত্মসমর্পণ। এইচ. বি. ২য় ২৫৬।

৯৩। বাহারিস্তান, ১ম, ৭০-৭১।

৯৪। ঐ, ৭৩।

৯৫। ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে ঢাকা থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

৯৬। বাহারিস্তান, ১ম, ৭৪-৭৫।

৯৭। ঐ, ৭৬। ডেমরা এবং খিজিরপুর নামগুলি এখনও বর্তমান। ডেমরা এখন শিল্প এলাকা, লক্ষ্যা এবং বালু নদীদ্বয়ের সংযোগ স্থল থেকে ডেমরা খাল নির্গত হয়ে ঢাকার শহরতলীর নিকট বুড়িগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। খিজিরপুর ঢাকা থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে নারায়ণগঞ্জের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, এটা সোনারগাঁ থেকে তিন মাইল দূরত্বে এবং বর্তমানেও খিজিরপুর দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

৯৮। নারায়ণগঞ্জের দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর তিনদিকে ধলেশ্বরী এবং লক্ষ্যা এবং পশ্চিম দিকে একটি ছোট খালে বেষ্টিত। বাহারিস্তান ২য়, ৮১৫ টীকা নং-৬।

৯৯। ঐ, ১ম, ৭৮।

১০০। এইচ. বি. ২য়, ২৫৭-৫৮।

১০০। মির্জা নাথন ঐ বছরের নওরোজ উৎসবের পরের দিন কদম রসুল আক্রমণ করেন (বাহারিস্তান, ১ম, ৭৯-৮০)। নওরোজের দিন ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ১১ই মার্চ, এই হিসেবে আক্রমণের সময় মার্চ মাস নির্ধারিত হয়।

১০২। বাহারিস্তান, ১ম, ৮০-৮২।

১০৩। এই স্থান এখন চিহ্নিত করা যায় না, সোনারগাঁ এবং কদম রসুলের মধ্যবর্তী কোন চর বা দ্বীপ হবে।

Edited by Ripon Sarkar

১০৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলায় নবীনগরের প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে মেঘনা নদী থেকে পাঁচ মাইল ভিতরের দিকে ইবরাহীমপুর নামে একটি বেশ বড় গ্রাম আছে। এই গ্রাম সোনারগাঁও প্রায় আটাশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। কিন্তু বাহরিস্তানের বিবরণে মনে হয় ইবরাহীমপুর সোনারগাঁ থেকে এত দূরে হবে না, তাছাড়া ইবরাহীমপুরকে দ্বীপ বলা হয়েছে, অথচ নবীনগরের ইবরাহীমপুর নদী থেকে পাঁচ মাইল দূরে। তাই মনে হয় ইবরাহীমপুর মেঘনা নদীর কোন চর বা দ্বীপ হবে, যা বর্তমান মানচিত্রে দেখা যায় না। (বাহরিস্তান, ২য়, ৮১৭ টীকা, ১৫)।

১০৫। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন যে মুসা খান মুমিনকে সোনারগাঁ থেকে তাঁর জিনিসপত্র ও পরিবারকে নিয়ে আসতে বলেন (এইচ. বি., ২য়, ২৫৯), কিন্তু বাহরিস্তানে পরিবারের কথা নেই। বস্তুতপক্ষে মুসা খানের পরিবার কোথায় ছিল, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তবে বলা হয় যে তাঁর পারিবারিক বাসস্থান ছিল কতরাব।

১০৬। বাহরিস্তান, ১ম, ৮৫-৮৬।

১০৭। এইচ. বি, ২য়, ২৫৯।

১০৮। বাহরিস্তান, ১ম, ৮৬।

১০৯। ঐ, ৮৭-৮৮।

১১০। ঐ, ৮৮-৮৯।

১১১। আরাকানের মগ রাজার মুসলমানী নাম সলীম শাহ হওয়ার কারণ আছে: বার্মার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আরাকানের রাজা মেঙ সামাউ বা মিন সামাউ (বা নরমিখলা) পালিয়ে এসে বাংলার সুলতানের দরবারে আশ্রয় নেন। এই ঘটনার তারিখ ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দ, তখন গিয়াস-উদ-দীন আযম শাহ বাংলার সুলতান, তিনি শীঘ্রই আরাকানের রাজাকে কোন সাহায্য করতে পারলেন না এবং তাই তিনি গৌড়ে থেকে যান। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ মিন সামাউকে একদল সৈন্যবাহিনীসহ স্বদেশে পাঠান এবং তাঁর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করে দেন। ফলে, আরাকানের রাজা বাংলার সামন্তে পরিণত হন। এর প্রমাণ এই যে প্রায় দুশ বছর ধরে আরাকানের রাজারা তাঁদের মগ নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম গ্রহণ করতেন, বাংলার সুলতানের অনুকরণে মুদ্রা জারী করতেন এবং মুদ্রার একটি পিঠে বর্মী ভাষা ও অক্ষরে মগ নাম এবং অন্য পিঠে ফার্সি বা আরবি অক্ষরে মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ করতেন। এই জন্যই মিন রাজগীর মুসলমানী নাম সলীম শাহ ব্যবহার করা হয়েছে। মুসলমানী নাম উৎকীর্ণ তাঁর অনেক মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ২য়, সংস্করণ ঢাকা, ১৯৮৭, ২০৪-২০৬; জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ভল্যুম ৩১, নং ১, জুন, ১৯৮৬, ১-১৬।

১১২। বাহরিস্তান, ১ম, ৮৯।

১১৩। এইচ. বি, ২য়, ২৬০।

১১৪। সরকার জান্নাতাবাদ বা লখনৌতিতে অর্থাৎ মালদহ জেলায় ডাহকোট নামে একটি মহাল আছে, দেখুন আইন, ২য়, ১৪৩।

১১৫। সরকার সোলায়মানবাদে সহলপুর নামে একটি মহাল আছে, এটা এই সহলপুর কিনা বলা যায় না (আইন, ২য়, ১৫৩)। সহলপুর কলকাতার নিকটেই কোথাও হবে।

১১৬। তাজপুর পূর্ণিয়া একটি সরকার, পূর্ণিয়ার পূর্ব অংশ এবং দিনাজপুরের পশ্চিম অংশ নিয়ে এই সরকার গঠিত ছিল।

১১৭। কুশী নদী নেপালের উত্তরে পর্বত থেকে নির্গত হয়ে পূর্ণিয়ার ভিতর দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

Edited by Ripon Sarkar

১১৮। বাহরিস্তান, ১ম, ৯১-৯৬।

১১৯। বর্তমানে চাঁদপুর জেলায় চাঁদপুর শহরের নিকটে এই ডাকাতিয়া খাল বা নদী। এটা ত্রিপুরা পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

১২০। এইচ. বি., ২য়, ২৬০।

১২১। দুটি ফেনী নদী আছে, একটিকে বলা হয় ছোট ফেনী এবং অন্যটিকে বড় ফেনী নদী বলা হয়। ছোট ফেনী ত্রিপুরা পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে কুমিল্লার মধ্য দিয়ে শিকারপুরের নিকটে নোয়াখালীতে প্রবেশ করেছে এবং বর্তমান ফেনী জেলার পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঘনায় পতিত হয়েছে। বড় ফেনী নদী বর্তমান ফেনী জেলার পূর্ব সীমান্তে ফেনীতে প্রবেশ করেছে, এটা বর্তমানে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার সীমা নির্ধারণ করে। (রেনেলের মানচিত্র নং ১; নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ৬)।

১২২। বাহরিস্তান, ১ম, ৯৯।

১২৩। ঐ, ৫৭।

১২৪। ঐ, ১০৬।

১২৫। ঐ, ১০৫-১০৭।

১২৬। ঐ ১০৮, ১১৩-১১৪।

১২৭। ঐ, ১৪০।

১২৮। ঐ।

১২৯। ঢাকা দুর্গের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গায় যেখানে রাজকীয় নৌকা বা সুলতানের নৌকা থাকত তাকে চাঁদনী ঘাট বলা হত। সুলতান ইসলাম খানের নিজস্ব ব্যবহারের নৌকার নাম ছিল 'চাঁদনী' বা 'কশতে মালিয়া' (বাহরিস্তান, ১ম, ৪৯) এই নৌকার নামানুসারেই বোধ হয় 'চাঁদনী ঘাট' নামকরণ হয়।

১৩০। ঐ, ১৪১-৪২।

১৩১। মাতংগ সরাইলের উত্তরে এবং তরফ-এর দক্ষিণে বর্তমান সিলেট সীমান্তে অবস্থিত। তরফ এর পরিচিতির জন্য পরবর্তী অধ্যায়ে ১নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩২। বাহরিস্তান, ১ম, ১১৮-১১৯।১৩২। বাহরিস্তান, ১ম, ১১৮-১১৯।

Edited by Ripon Sarkar

পঞ্চম অধ্যায়

সুবাদার ইসলাম খান চিশতী খাজা উসমান ও বায়েজীদ কররানীর পতন

খাজা উস্মান আফগানের পরিচিতি আগে দেয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার কতলু লোহানীর ভাই এবং মন্ত্রী লোহানী মিয়া খেল-এর ছেলে। আকবরের সময়ে রাজা মানসিংহ তাঁকে বাংলায় নির্বাসন দেন। উসমান তাঁর দুই ছেলে খাজা মুমরিজ ও খাজা ইয়াকুব এবং ভাই খাজা সোলায়মান, খাজা ওয়ালী, খাজা মালহী ও খাজা ইবরাহীমসহ বাংলায় আসেন। খাজা সোলায়মান ১০০২ হিজরী ১৫৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান, তাঁর পুত্র ছিলেন খাজা দাউদ। উসমান বাংলার সাতগাঁও এবং ভূষণা ঘুরে বুকাইনগরে[১] এসে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজ্যের আয়তন খুব বড় ছিল বলে মনে হয় না, বরং বার-ভূঁঞার জমিদারীর তুলনায় অনেক ছোট ছিল। প্রকৃতপক্ষে খাজা উসমানের রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে মনে হয় তাঁর বুকাইনগর রাজ্য বুকাইনগর থেকে উত্তর পূর্বে অন্ততঃপক্ষে সিলেটের কিছু অংশ নিয়ে বিস্তৃত ছিল। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে বুকাইনগর ছাড়া উসমানের আরও দুটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল, হাসানপুর এবং এগার সিন্দুর।[২] ডঃ ভট্টাচার্য কি ভিত্তিতে এই কথা বলেন, তা পরিষ্কার নয়, তবে এই বিষয়ে সন্দেহ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে এগার সিন্দুর বার-ভূঁঞার অধীনে ছিল এবং খাজা উসমানের বিরুদ্ধে ইসলাম খানের যুদ্ধের বিবরণে দেখা যাবে যে খাজা উসমান এগার সিন্দুর বা হাসানপুরে মোগলদের কোন বাধা দেননি। এই দুর্গগুলি যদি উসমানের অধীনে থাকত, তাহলে তিনি সেখানেই মোগলদের বাধা দিতেন। বাহরিস্তানে হাসানপুর বা এগার সিন্দুরে উসমানের দুর্গের কোন কথা নেই। তাছাড়া খাজা উসমানের নৌবাহিনী ছিল, এরূপ কথা কোনও সূত্রে পাওয়া যায় না, নৌবাহিনী ছাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী এগারসিন্দুর বা হাসানপুর দুর্গ রক্ষা করার কোন প্রশ্ন উঠে না। উসমানের রাজ্যের বিস্তৃতি যা হোক না কেন, তিনি এক বছর ধরে মোগলদের বাধা দেন। তাঁর ছিল অদম্য সাহস, তিনি লক্ষ্যে ছিলেন স্থির এবং স্বাধীনতা-প্রিয়। তাঁর ভাই ওয়ালী, মালহী এবং ইবরাহীম, তাঁর পুত্র মুমরিজ এবং ইয়াকুব এবং তাঁর ভাইপো দাউদ তাঁকে সর্বক্ষণ অকুণ্ঠ সমর্থন দেন। তাছাড়া তাঁর ছিল অনেক হাতি যা ছিল সমসাময়িককালে যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সিলেটের বায়েজীদ কররানী এবং বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খানের সঙ্গে তাঁর প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং তাই বুকাইনগর ত্যাগ করতে হলেও তিনি সিলেটের দক্ষিণে পার্বত্য অঞ্চলে মোগলদের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ করেন। বার-ভূঁঞা প্রধান ঈসা খান মসনদ-ই-আলার সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল, কিন্তু মুসা খানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিরূপণ করা যায় না। ডঃ ভট্টাচার্য বলেন যে মুসা খানের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধের সময় উসমান মোগলদের আক্রমণ করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।[৩] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোগলদের বিরুদ্ধে মুসা খানের যুদ্ধের সময় খাজা উসমানকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকতে দেখা যায়। তিনি যে মুসা খানের পক্ষে কিছু করেন এইরূপ কোন প্রমাণ বাহরিস্তানে পাওয়া যায় না। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে ইসলাম খান খাজা উসমানকে ঘিরে রেখে নিষ্ক্রিয় করেই রাখেন। প্রথমত, ইসলাম খান তাঁর ভাই মরখ গিয়াস-উদ-দীনকে (গিয়াস খান বা এনায়েত খান)

Edited by Ripon Sarkar

মুসা খানের সঙ্গে যুদ্ধের শময় সর্বক্ষণ আলপসিংহ পরগণায় প্রস্তুত রাখেন। দ্বিতীয়ত, ইফতিখার খানকে শেরপুর মুর্চায় (বগুড়া) এবং শয়খ হাবীব উল্লাহকে ঘোড়াঘাটে নিয়োগ করেন। ফলে খাজা উসমানের ইচ্ছা থাকলেও মুসা খানকে সাহায্য করা সম্ভব হয়নি। তবে খাজা উসমানের এরূপ আদৌ কোন ইচ্ছা ছিল কিনা তাও জানা যায় না।

ইসলাম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়ে রাজমহলে আসার পরে খাজা উসমান আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি মোগল থানা আলপসিংহ অধিকার করেন এবং মোগল থানাদার সাজাউল খানকে হত্যা করেন। শয়খ গিয়াস-উদ-দীন ঐ থানা পুনরুদ্ধার করেন এবং ফলে তাঁকে এনায়েত খান উপাধি দেয়া হয়। এরপর দেখা যায় ইসলাম খান যখন রাজমহল থেকে গোয়াশে আসেন, তখন ইসলাম খানের দূত মিরযা আলীর সঙ্গে খাজা উসমান তাঁর দূতকে ইসলাম খানের নিকট পাঠিয়ে আনুগত্য স্বীকার করেন এবং পত্রে জানান যে তিনি তাঁর ভাই-এর মারফত উপহার পাঠাবেন।[৪] মনে হয় শয়খ গিয়াস-উদ-দীন কর্তৃক আলপসিংহ পরগণা পুনরাধিকৃত হওয়ার পরে উসমান সুবাদারের নিকট তাঁর দূতকে পাঠান। আরও মনে হয় ইসলাম খান আগে উসমানের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন এবং উত্তরে উসমান সুবাদারের নিকট স্বীয় দূত পাঠান। এর পরে উসমানের সঙ্গে যুদ্ধ পর্যন্ত খাজা উসমান সম্পর্কে আরও কিছু সমসাময়িক সূত্রে পাওয়া যায় না। এতে মনে হয় মুসা খানকে সাহায্য করার ইচ্ছাও বোধ হয় উসমানের ছিল না।

মুসা খান এবং তাঁর মিত্র বার-ভূঁঞার আত্মসমর্পণের পরে ইসলাম খান নির্দ্বিধায় খাজা উসমান আফগানের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষ শেষে অক্টোবর মাসেই এই অভিযান শুরু হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযানে ইসলাম খান সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সকল প্রস্তুতি শেষে ইসলাম খান অনেক সেনাপতির সমন্বয়ে এক বিরাট স্থল ও নৌ-বাহিনী এবং অনেক হাতি উসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইসলাম খানের ভাই গিয়াস খানকে (এনায়েত খান) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, তিনি তখন আলপসিংহ থানায় ছিলেন, তাঁকে শাহ বন্দরে[৫] এসে অভিযানের নেতৃত্ব দেয়ার আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠান হয়। গিয়াস খানের অধীনে আরও দুজন সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদ। মুসা খানকে সুবাদারের দরবারে রাখা হয় কিন্তু তাঁর ভাই মাহমুদ খান ও তাঁর সকল মিত্র জমিদারকে শয়খ কামালের অধীনে এবং মুসা খানের অন্যান্য ভাইদের গিয়াস খানের অধীনে পাঠান হয়। এই তিন সেনাপতির নেতৃত্বে আরও অনেক সেনাপতি নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসহ এই অভিযানে অংশ নেন, তাঁরা হলেন খাজা খান, মুবারিজ খান, ইহতিমাম খান, তুকমক খান, মীরক বাহাদুর জালাইর, মিরযা নাথন, মিরযা কাজিম বেগ হাতিম বেগ, মিরযা কচকানা, আবদুর রাজ্জাক শিরাজী, মিরযা কুলী, মিরযা বেগম, আয়মাক, খোজা আসল এবং আদিল বেগ। তাছাড়া ইসলাম খান তাঁর বাছা বাছা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে তাঁর নিজস্ব কর্মকর্তা শয়খ ইসমাইলকে এই যুদ্ধে পাঠান। রাজকীয় নৌ-বাহিনীর তিনশ নৌকা ছাড়াও ভূঁঞাদের বাজেয়াপ্তকৃত সকল নৌকা পাঠান হয়, রাজকীয় নৌবহর বৃহৎ কামান দ্বারা সুসজ্জিত হয় এবং সমুদয় নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয় ইহতিমাম খানকে। নৌবহরে বন্দুকধারী বাহিনী ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার তীরন্দাজ বাহিনী এই অভিযানে যুক্ত হয়। রাজকীয় হাতি বাহিনী এবং ইসলাম খান,

Edited by Ripon Sarkar

ইহতিমাম খান এবং অন্যান্য মনসবদারদের হাতিসহ মোট তিনশ হাতিও পাঠান হয়, এর মধ্যে আশিটি হাতি ছিল মত্ত বা কামোত্তেজিত, এরূপ হাতি যুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ করে।

সকল প্রস্তুতি শেষে ইসলাম খান শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদকে যাত্রা করে হাসানপুরের[৬] দিক থেকে আক্রমণ পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। তাঁদের আরও বলা হয় তাঁরা যেন ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কেটে দেন যাতে বুকাইনগর সহ সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয় এবং নৌ-বাহিনী বুকাইনগর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারে। এর পরে ইসলাম খান খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশীকে হাসানপুরে তদারকি কাজে পাঠান। মনসবদারেরা তাঁদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য, ঘোড়া এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমত সঙ্গে নেন কিনা তা পরিদর্শন করাই ছিল বখশীর দায়িত্ব। বখশী হাসানপুরে গিয়ে তাঁর তদারকি কাজ শেষ করে ঢাকায় ফিরে এসে সুবাদারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন। অতঃপর ইসলাম খান নিজে ঢাকা থেকে টোক[৭] যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

মোগল বাহিনী হাসানপুরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কাটার কাজে লেগে যায়, কিন্তু আকস্মিকভাবে তিন দিনের মধ্যে নদীর পানি এত কমে যায় যে তাতে পার্শ্ববর্তী এলাকা প্লাবিত হল না এবং মোগল নৌ-বাহিনীর পক্ষে বুকাইনগরের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। ইতোমধ্যে মোগল বাহিনীতে অনৈক্য ও বিবাদের সূত্রপাত হয়। শয়খ কামাল এবং মীরক বাহাদুর জালাইর মাহমুদ খান ও অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুবাদারকে এই বিষয়ে অবহিত করেন। ইসলাম খান বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করেন; মোগল সেনাপতিদের মধ্যে অনৈক্যের কথা খাজা উসমান জানতে পারলে, তাঁর সাহস বেড়ে যাবে এবং এর সুযোগ নিয়ে তিনি আরও সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেন। তাই ইসলাম খান মনে করেন যে এই অভিযান প্রত্যাহার করা সমীচীন হবে না, পক্ষান্তরে সেনাপতিদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাও সম্ভব নয়। ইসলাম খান নিজে অভিযানে অংশ নিলে সেনাপতিদের মধ্যে অনৈক্য দূর হত। কারণ এই অভিযানে অনেক সেনাপতি নিয়োগ করা হয় এবং কেউ কারও কর্তৃত্ব মানতে রাজি ছিল না। সুবাদার নিজে উপস্থিত থাকলে এই প্রশ্ন উঠত না। তাই ইসলাম খান ঐ অবস্থাতেই অভিযান চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি গিয়াস খানকে শাহ বন্দরে থেকে অগ্রবর্তী দলের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেন এবং শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদকে হাসানপুর থেকে বুকাইনগর পর্যন্ত দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দেন।[৮] এ সময় বার-ভূঁঞার একজন বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার খান (বা আনোয়ার গাজী) ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করে আত্মসমর্পণ করেন, এই কাহিনী পূর্ব অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ইসলাম খানের নির্দেশমত শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদ দুর্গ তৈরি করে বুকাইনগরের দিকে অগ্রসর হন। প্রত্যেক দুর্গ তৈরির পরে চারদিকে পরিখা খনন করা হয় এবং ঐ দুর্গে চারদিন অবস্থান করার পরে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পরবর্তী দুর্গ নির্মাণ করা হয়। এ সময় খাজা উসমানও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি মাঝে মাঝে বুকাইনগর থেকে বেরিয়ে এসে দুর্গ তৈরিতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেন কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যেতেন। কোন কোন সময় উসমানের ভাইয়েরাও বাধা দিতে আসতেন, কিন্তু তাঁরা সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যেতেন। এভাবে যখন একাদশ দুর্গ তৈরি হয় তখন উসমান বাধা দিতে

Edited by Ripon Sarkar

আসেন; তাতার খান নাগীর নামক উসমানের একজন সেনাপতি দুর্গ আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়, দুজন মোগল সেনাপতি বাজা খান এবং মিরযা ইসফন্দিয়ার আহত হন কিন্তু তাতার খান নাগীর নিহত হন তাঁর লাশ সসম্মানে উসমানের শিবিরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এভাবে যখন অষ্টাদশ দুর্গ নির্মিত হয় তখন খাজা উসমান এসে দুর্গ আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মোগল সৈন্যরা তাঁকে বাধা দিতে দুর্গ থেকে বের হয়, শয়খ কামাল তাদের নিষেধ করেন কিন্তু সৈন্যরা তার আগেই উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় মীরক বাহাদুর জালাইর, মিরযা ইসফন্দিয়ার, তুকমক খান, ইহতিমাম খান ও মিরযা নাথনের সৈন্যরা ভীষণ যুদ্ধ করে। কিন্তু কিছু কিছু সৈন্য পিছু হটে দুর্গে ঢুকে পড়ে, ফলে মোগল বাহিনীতে কিছু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, কিন্তু দুর্গের ভিতর থেকে গোলন্দাজ বাহিনী এমন গোলাবর্ষণ করতে থাকে যে খাজা উসমান পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এর পরে মোগল বাহিনী উনবিংশ দুর্গ নির্মাণ করে। ইতোমধ্যে রমযান মাস এসে পড়ায় ঐ মাসে আর কোন যুদ্ধ হয়নি; মোগল বাহিনী রমযানের আনুষ্ঠানিকতা পালন করে ঐ সময় কাটিয়ে দেয়। ঈদ-উল-ফিতর অনুষ্ঠিত হয় ৭ই ডিসেম্বর ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে। ঈদের দিন মোগল বাহিনী সারাদিন ও সারারাত গুলী ও কামানের গোলা ছুঁড়ে আমোদ প্রমোদ করে। এর পরে সংবাদ পাওয়া গেল যে খাজা উসমান বুকাইনগর ত্যাগ করেছেন। তাঁর দুজন সহযোগী তাজপুরের[৯] নাসির খান ও দরিয়া খান পন্নি তাঁকে ত্যাগ করে মোগলদের আনুগত্য স্বীকার করে। উসমান ইহা জানতে পেরে নাসির খান ও দরিয়া খানের দুশ পঞ্চাশ জন আফগান সৈন্যকে ধরে নিয়ে লাউড়[১০] পাহাড়ের ভিতর দিয়ে সিলেটে চলে যান এবং উহর[১১] নামক স্থানে ঘাঁটি করেন। ঈদের নামায পড়েই মোগল বাহিনী বুকাইনগরে যায় ও উসমানের দুর্গ অধিকার করে।[১২] বুকাইনগর দুর্গ অধিকারের তারিখ ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর।[১৩]

বুকাইনগর দুর্গ অধিকারের পরে মোগল বাহিনীতে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। অজ্ঞাত কারণে দুর্গ অধিকার করার পরেও শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদ বুকাইনগরে অবস্থান না করে নিজেদের দুর্গে ফিরে আসেন।[১৪] অন্যান্য সেনানায়কেরা তাজপুরে যান এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন। এখানে সেনানায়কদের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্য হয়, এ বিষয়ে মিরযা নাথন দীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন। বাহরিস্তানে এই বিবরণ পাঠে মনে হয়, সকলেই সরদারের (সেনাপতির) অভাব অনুভব করছিলেন, সিদ্ধান্ত দেয়ার কেউ ছিল না। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন। সৈন্যরা যখন জয়ের পথে তখনই সেনাপতিরা তাদের ফেলে দুর্গে ফিরে এলে সৈন্যরা কোন ভরসায় অগ্রসর হবে? সকলেই সরদারের (সেনাপতির) অভাবের কথা বলছিল, কিন্তু কেউ শয়খ কামাল বা শয়খ আবদুল ওয়াহিদের অনুপস্থিতির প্রশ্ন তুলেনি, তাঁদের ব্যর্থতাই যে সেনানায়কদের মধ্যে অনৈক্যের মূল কারণ, তাও কেউ উত্থাপন করেনি। শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদ উভয়েই ছিলেন সুবাদারের নিজের লোক, তাই বোধ হয় সেনানায়কেরা তাঁদের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায়নি। এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়; এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয় ইসলাম খানের ভাই গিয়াস খানকে কিন্তু সুবাদার তাঁকে শাহ বন্দরে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দেন, আগাগোড়া তিনি শাহ বন্দরেই থেকে যান, যুদ্ধে তিনি কোন ভূমিকা পালন করেন কিনা বাহরিস্তানে তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না, তিনি একবারও যুদ্ধ ক্ষেত্রে যান, এরূপ কোন প্রমাণ নেই। তাঁকে প্রধান

Edited by Ripon Sarkar

সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় যাতে রাজকীয় অফিসারেরা শয়খ কামালের অধীনে যেতে আপত্তি না করে। প্রধান সেনাপতি অনুপস্থিত, যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত দুজন সেনাপতি অনুপস্থিত, এমতাবস্থায় সেনানায়কদের মধ্যে মতানৈক্য হবে, এটা আর বিচিত্র কি?

ইসলাম খান টোকে অবস্থানকালে শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদের বার্তা পান, বার্তায় তাঁরা সৈন্যদের মধ্যে মতানৈক্যের কথা সুবাদারকে অবহিত করেন। সুবাদার সেনানায়কদের ডেকে পাঠান এবং তাঁরা টোকে এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন। ইসলাম খান ঝারোকায় (উঁচু মঞ্চে) বসেছিলেন, তিনি সেনানায়কদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ "যা হবার হয়েছে, অতীত নিয়ে চিন্তা করে লাভ নেই, এখন আমরা ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করি। যেহেতু উসমান পালিয়েছেন, সেহেতু তাঁর ভাই ও ছেলেরাই এখন আমাদের প্রতিপক্ষ, আপনারা তাঁদের বিরুদ্ধে যান, না হয় উসমানকে ধরার চেষ্টা করুন।"[১৫] এই পর্যন্ত ইসলাম খান বিজ্ঞের পরিচয় দেন এবং অধস্তন সেনানায়কদের মনঃক্ষুণ্ন না করার কৌশল অবলম্বন করেন। কিন্তু এর পরেই ইসলাম খান বখশীকে (খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশী) নির্দেশ দেন, তিনি যেন উসমানের বিরুদ্ধে যাত্রা করার ব্যর্থতা সম্পর্কে প্রত্যেক সেনানায়কের জবানবন্দী পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। সুবাদার আরও বলেন যে প্রত্যেকের জবানবন্দী পরীক্ষা করে যথাবিহিত ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং জবানবন্দীসমূহ সম্রাটের নিকট পাঠান হবে। বখশী প্রথমে ইহতিমাম খানের নাম লিখেন এবং জবানবন্দী দিতে বলেন। এতে ইহতিমাম খান ক্ষেপে যান এবং বখশীর সঙ্গে বাদানুবাদ-এ লিপ্ত হন, পরে সুবাদারও এই বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে ইহতিমাম খান সুবাদারকে দোষারূপ করে পরিষ্কার ভাষায় বলেন ঃ "উসমানকে অনুসরণ না করার জন্য যদি আপনি আমাদের দোষারূপ করেন তাহলে আমি বলব, সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী সুবাদারকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পশ্চাতে ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে থাকতে হবে। সুবাদার ছিলেন ঢাকায় এবং তিনি চান যে সম্রাটের অনুগত সৈন্যরা উসমানের মত একজন (দুর্ধর্ষ) শত্রুকে একশ ক্রোশ দূর থেকে ধরে আনুক, এবং তিনি (সুবাদার) উসমানের হাত পা বেঁধে ফেলুন। আমরা উসমানকে অনুসরণ না করার কারণ যদি আপনি জানতে চান, তাহলে বলব সরদারের (সেনাপতির) অভাবেই আমরা দুর্বলতা দেখিয়েছি। এর জন্য সরদারেরাই দায়ী।[১৬] এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান ওঠে যান; স্পষ্টতই ইহতিমাম খান সোজাসুজি সেনাপতিদের দায়ী করায় তিনি বিরক্ত হন, কারণ সেনাপতিরা ছিলেন তাঁর আপন লোক। এর পরে ইসলাম খান ও ইহতিমাম খানের মধ্যে আরও তর্ক বিতর্ক হয়, মিরযা নাথন কোন রকমে মিষ্ট কথায় সুবাদারকে তুষ্ট করেন।

ইতোমধ্যে বানিয়াচঙ্গের আনোয়ার খান আত্মসমর্পণ করেছেন এবং তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। এই কাহিনী চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম খান বুকাইনগর রক্ষার ব্যবস্থা করে হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদীর নেতৃত্বে মাতঙ্গের জমিদার পাহলোয়ান ও তরফ এর বিরুদ্ধে এক অভিযান পাঠান। মাতঙ্গের পাহলোয়ানের পতন কাহিনীও পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তরফ[১৭] এ উসমানের ছেলে মুমরিজ ও ভাই মালহী অবস্থান করছিলেন। হাজী শামস-উদ-দীন বাগদাদী মিরযা সাকী, মিরযা বাকী ও মিরযা পতঙ্গনী নামক তিন ভাইসহ তরফ এর বিরুদ্ধে গমন করেন এবং সেখানে পৌঁছে একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। মাঝে মাঝে তিনি চতুর্দিকস্থ গ্রামে

Edited by Ripon Sarkar

লুটতরাজ চালান। মুমরিজ ও মালহী সংবাদ পেয়ে হাজী শামস-উদ-দীনের দুর্গ আক্রমণ করেন এবং উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। মোগল দুর্গ থেকে বৃষ্টির মত গুলী হলেও আফগানরা গুলী উপেক্ষা করে দুর্গের সদর দরজায় আঘাত করে। তারা বাজ নামক একটি হাতি সামনে দিয়ে হাতির আড়ালে এবং পেছনে থেকে আক্রমণ করে এবং হাতি দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে। হাজী শামস-উদ-দীন পরিখায় ছিলেন, তিনি বেরিয়ে এসে সৈন্যদের একত্র করেন এবং দরজার চারদিক ঘিরে ফেলেন। প্রথমে তারা হাতির পা কেটে টুকরা টুকরা করে। তখন উভয় পক্ষে হাতাহাতি যুদ্ধ শুরু হয়। আফগানরা তিনবার দুর্গে প্রবেশ করে, তিনবারই তাদের হটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর তারা পলায়ন করে এবং মোগল বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করে। অতঃপর ইসলাম খান খাজা উসমান আফগানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মুলতবী রেখে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং উভয় দেশ জয় করেন। এই যুদ্ধের কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ে বর্ণনা করা হবে। কয়েকজন সেনানায়ক ও মনসবদারকে এগার-সিন্দুরে অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। মীরক বাহাদুর জালাইরকে বুকাইনগরের এবং তুকমক খানকে হাসানপুরের জায়গীর দিয়ে স্ব স্ব জায়গীরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এভাবে খাজা উসমানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা করে ইসলাম খান টোক থেকে ঢাকা ফিরে আসেন।

ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে নেতৃত্বের অভাবে বা নেতৃত্বের কোন্দলে মোগল বাহিনী খাজা উসমানকে তাড়া করে পরাজিত করতে পারেনি। মোগল বাহিনীর নেতৃত্ব যাদের হাতে দেয়া হয়েছিল তারা অন্যদের তুলনায় খুব বেশি মনসবের অধিকারী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মোগল বাহিনীতে তখন খুব উচ্চ মনসবের সেনাপতি ছিল না, তাই ইসলাম খান শুজাত খানকে পাঠাবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। বাহরিস্তানে এই বিষয়ে নিম্নরূপ বিবরণ আছে। বুকাইনগর অধিকৃত হওয়ার পরে ইসলাম খান বিজয় সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠান, সম্রাট যখন ঐ সংবাদ পান তখন মর্তুজা খান সম্রাটের নিকট ছিলেন। সম্রাট মর্তুজা খানের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, তাই সম্রাট বলেন যে মর্তুজা খানকে ইসলাম খানের নিকট থেকে সুবাদারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা নেওয়া উচিত। মর্তুজা খান ছিলেন সৈয়দজাদা, তিনি সম্রাটের কথায় অপমান বোধ করেন এবং বলেন যে হিন্দুস্থানের (উত্তর ভারতের) যে কোন নিকৃষ্ট মানের জমিদারকে পাঠালেও উসমানের মত একজন বিদ্রোহীকে পরাজিত করতে পারতেন, কিন্তু ইসলাম খান ব্যর্থ হয়েছেন। উসমান বুকাইনগর পরিত্যাগ করেছে ঠিক, কিন্তু উহর-এ গিয়ে বহাল তবিয়তে আছে। সম্রাট এক ফরমানে মর্তুজা খানের কথাগুলি হুবহু ইসলাম খানের নিকট পাঠান। ইসলাম খান জবাবে উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে সম্রাটকে জানান যে সেনাপতিদের অনৈক্যের কারণেই খাজা উসমানকে পরাস্ত করা সম্ভব হয়নি। ইসলাম খান আরও বলেন যে তিনি যদি শুজাত খানের সহযোগিতা পান, তাহলে উসমানের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা সম্ভব হবে। সম্রাট ইসলাম খানের আবেদন গ্রহণ করেন। শুজাত খান দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, সম্রাট তাঁকে ডেকে পাঠান এবং শুজাত খানকে তাঁর ভাই ও ছেলেসহ বাংলায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট রোটাস দুর্গ থেকে কিশওয়র খানকে (কুতব-উদ-দীন খান কোকার ছেলে), মুংগের থেকে কাসিম খানকে (ইসলাম

Edited by Ripon Sarkar

খানের ভাই) বাংলায় পাঠান। মুয়াজ্জম খানের ছেলে মুকাররম খান ও তাঁর ভাইদের এবং শায়খ আছাই ও সৈয়দ আদম বারহাকেও শুজাত খানের সঙ্গে বাংলায় পাঠান হয়।[১৮]

মিরযা নাথনের উপরোক্ত বক্তব্য সামান্য কালানুক্রম সংশোধন করে গ্রহণযোগ্য; বক্তব্যের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ শুজাত খানের সঙ্গে যে সকল সেনাপতিদের বাংলায় পাঠান হয়, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, কারণ তাঁরা (কাসিম খান ছাড়া) বাংলায় এসে যুদ্ধে অংশ নেন। কিন্তু মিরযা নাথনের উক্ত বক্তব্যের মূল কথা হচ্ছে খাজা উসমানের বুকাইনগর ত্যাগের পরে ইসলাম খান শুজাত খানকে বাংলায় পাঠাবার আবেদন জানান এবং এই আবেদনের প্রেক্ষিতে সম্রাট শুজাত খানকে দাক্ষিণাত্য থেকে প্রত্যাহার করে বাংলায় পাঠান। আমরা আগেই দেখেছি যে মোগল বাহিনী ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে বুকাইনগর অধিকার করে, অতএব মিরযা নাথনের বক্তব্যে এই তারিখের পরে ইসলাম খান শুজাত খানকে পাঠাবার আবেদন জানান। এদিকে উসমানের বিরুদ্ধে শুজাত খানের যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায়, শুজাত খান ও অন্যান্য সেনানায়কেরা ঢাকা থেকে যাত্রা করে এগার সিন্দুর, সরাইল ও তরফ অতিক্রম করে যখন তোপিয়া নামক স্থানে পৌছে, তখন কুরবানীর ঈদ এসে যায় এবং তারা ঐ স্থানে ঈদ উৎসব পালন করে। কুরবানীর ঈদ উদযাপিত হয় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে। এই অল্প সময়ের মধ্যে (৭ই ডিসেম্বর থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫৮ দিন) ইসলাম খানের আবেদন সম্রাটের নিকট পৌছা, সম্রাট কর্তৃক শুজাত খানকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠান, শুজাত খানের বাংলায় আসা, বাংলায় এসে পৌছলে খাজা উসমানের নিকট দূত পাঠান এবং দূত উসমানের উত্তর নিয়ে ফিরে আসা (পরে আলোচিত) এবং শুজাত খান বিশাল সৈন্য ও নৌ-বাহিনী নিয়ে তোপিয়া পৌছা কি সম্ভবপর? তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে দেখা যায় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই মার্চ (১০২০ হিজরীর ৬ই মহরম) তারিখে শুজাত খান দাক্ষিণাত্য থেকে সম্রাটের দরবারে আসেন, তাঁর মনসব ২০০০/৬০০-এ উন্নীত করা হয়। সম্রাট লিখেনঃ "আমিই তাঁকে (শুজাত খানকে) দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, বাংলায় ইসলাম খানের নিকট পাঠাবার উদ্দেশে; প্রকৃতপক্ষে স্থায়ীভাবে তাঁর (ইসলাম খানের) স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য, এবং আমি তাঁকে (শুজাত খানকে) ঐ সুবার (বাংলার) দায়িত্ব দিলাম।"[১৯] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে সম্রাট ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে শুজাত খানকে বাংলায় পাঠাননি। বেণী প্রসাদ বলেন যে তুজুকের উপরোক্ত বক্তব্য নকলকারীদের ভুল (বা প্রক্ষিপ্ত), এর কোন গুরুত্ব নেই; ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম খান বাংলার সুবাদার ছিলেন।[২০] কিন্তু মনে হয় এই বক্তব্য কিছুটা সত্যও হতে পারে। জাহাঙ্গীর হয়ত ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে একবার ইসলাম খানের স্থলে শুজাত খানকে বাংলায় নিযুক্তির কথা চিন্তা করেছিলেন; ইসলাম খান তখন বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং যুদ্ধে ব্যাপক সাফল্যও লাভ করেছিলেন। তাই হয়ত সম্রাট মত পরিবর্তন করেন এবং জয়ের গতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সমীচিন মনে করেননি। এদিকে বাংলায় নিযুক্ত মোগল সেনাপতিদের দুর্বলতা এবং সেনানায়কদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে ইসলাম খানও এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেন। এটা ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসের কথা; মতানৈক্য সত্ত্বেও ইসলাম খান উসমানের বিরুদ্ধে বুকাইনগরের দিকে দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে এটা কোন সমাধান নয়, তাই মনে হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ অক্টোবর-নবেম্বর মাসে সম্রাটের

Edited by Ripon Sarkar

নিকট শুজাত খানকে বাংলায় পাঠাবার আবেদন জানান। মিরযা নাথন সম্রাটের সঙ্গে মর্তুজা খানের কথাবার্তার যে বিবরণ দেন, তাও বিশ্বাসযোগ্য মর্তুজা খানের আসল নাম শয়খ ফরীদ, তিনি শয়খ জালাল-উদ-দীন বুখারীর (জাহানিয়া জাহানগশত নামে সমধিক পরিচিত) বংশধর ছিলেন। তিনি যুবরাজ থাকাকালে জাহাঙ্গীরের চাকরি গ্রহণ করেন এবং পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ছিলেন। খান আযম মিরযা আযিয কোকা এবং মানসিংহে আকবরের মৃত্যুর পরে যখন খসরুকে সিংহাসনে বসাবার ষড়যন্ত্র করছিলেন, তখন শয়খ ফরীদ জাহাঙ্গীরকে সমর্থন করেন এবং তিনিই জাহাঙ্গীরকে সম্রাট রূপে সর্বপ্রথম অভিবাদন জানান। খসরুর বিদ্রোহের সময়েও শয়খ ফরীদ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং খসরুকে লাহোর থেকে তাড়িয়ে দেন। ফলে শয়খ ফরীদ জাহাঙ্গীরের বিশেষ আস্থাভাজন হন, তাঁকে গুজরাটের সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং মর্তুজা খান উপাধি দেয়া হয়।[২১] এরূপ আস্থাভাজন লোকের সঙ্গে সম্রাটের ঐরূপ কথোপোকথন হওয়া বিচিত্র নয়। সুবাদারেরা প্রত্যেক যুদ্ধের ফলাফল, বিশেষ করে বিজয় সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের নিকট পাঠাত, এবং অবশ্যই বুকাইনগর অধিকারের সংবাদও যথাযথভাবে পাঠান হয়। ৭ই ডিসেম্বরের পরে ইসলাম খান বিজয় সংবাদ পাঠালে ঐ সময়েই মর্তুজা খানের সঙ্গে সম্রাটের কথাবার্তা হতে পারে। তবে মিরযা নাথন যে বলেছেন, সম্রাট মর্তুজা খানের বক্তব্য ইসলাম খানের নিকট পাঠান এবং ইসলাম খানের উত্তর পেয়ে সম্রাট শুজাত খানকে দাক্ষিণাত্য থেকে ডেকে আনেন এবং বাংলায় পাঠান, তা বোধ হয় ঠিক নয়। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে কালানুক্রম বাহরিস্তানে পাওয়া যায়, তাতে বাংলা থেকে দিল্লীতে দুবার সংবাদ আদান প্রদান, শুজাত খানের দাক্ষিণাত্য থেকে দিল্লী এবং পরে দিল্লী থেকে বাংলায় আসা এবং যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে তোপিয়া পর্যন্ত পৌঁছ, এতগুলি কাজ এত অল্পদিনের মধ্যে হওয়া সম্ভব নয়। নাথন সম্রাটের দরবারে ছিলেন না, এমনকি সুবাদারের দরবারেও ছিলেন না, তাই তিনি কালানুক্রম রক্ষা করতে পারেননি। অতএব মনে হয় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে ইসলাম খান শুজাত খানকে পাঠাবার আবেদন করেন, শুজাত খান ঐ বছরের মার্চ মাস থেকেই সম্রাটের দরবারেই ছিলেন, সম্রাট তাড়াতাড়ি তাঁকে আরও অনেক সেনানায়কসহ (উপরে উল্লেখ করা হয়েছে) বাংলায় পাঠান। ডিসেম্বরের মধ্যেই শুজাত খান ঢাকায় পৌঁছেন, এবং উসমানের বিরুদ্ধে গমন করেন এবং ৪ঠা ফেব্রুয়ারির মধ্যে তোপিয়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেন।

শুজাত খান ছিলেন একজন প্রবীণ সেনাপতি, সম্রাট আকবরের সময়ে তিনি চাকরিতে ঢুকেন এবং যুবরাজ সেলিমের অধীনে ছিলেন। যুবরাজের বিদ্রোহের সময়ও তিনি তাঁর পক্ষে ছিলেন, যুবরাজ সিংহাসনে বসলে তাঁর মনসব বৃদ্ধি করা হয়। শুজাত খানের আসল নাম ছিল শয়খ কবীর, জাহাঙ্গীরই তাঁকে শুজাত খান উপাধি দেন। তিনি শয়খ সলীম চিশতীর পরিবারের (তাই ইসলাম খানের) আত্মীয় ছিলেন।[২২] কিন্তু আত্মীয়তা যে কিরূপ তা জানা যায় না, মনে হয় বৈবাহিক সূত্রে এই আত্মীয়তা ছিল। এম. আই. বোরাহ এবং সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে শুজাত খান শয়খ সলীম চিশতীর বংশধর বা পরিবারের লোক ছিলেন,[২৩] কিন্তু মাসির-উল-উমারায় আত্মীয় বলা হয়েছে। তাছাড়া বাহরিস্তানে বলা হয় যে শুজাত খান ও তাঁর পূর্বপুরুষেরা ইসলাম খানের পরিবারের মুরীদ ছিলেন।[২৪] এতে বুঝা যায় যে শুজাত খান শয়খ সলীম চিশতীর পরিবারের লোক ছিলেন না, মুরীদ ছিলেন, বা বড়জোর আত্মীয় ছিলেন। শয়খ

Edited by Ripon Sarkar

সলীম চিশতীর মুরীদ এবং চিশতীয়া তরীকার লোক হওয়ায় শুজাত খানের (শয়খ কবীর) নামের সঙ্গেও শয়খ শব্দ যুক্ত হয়েছে।

শুজাত খান দলবল সহ ঢাকা এসে পৌঁছলে ইসলাম খান তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান পরে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিরূপণ করার জন্য সকলে একসঙ্গে বসেন এবং ইসলাম খান সকলের মতামত জানতে চান। সকলে একমত হন যে খাজা উসমানের নিকট শান্তির বার্তা নিয়ে দূত পাঠান হোক, বার্তায় উসমানকে অনর্থক রক্তপাত এড়াবার উদ্দেশে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান হয়। উসমান ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা আফগান, উড়িষ্যা থেকে যুদ্ধ করতে করতে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত উহর-এ অবস্থান নেন। তিনি বশ্যতা স্বীকার করার মত লোক ছিলেন না। চিঠি নিয়ে ইসলাম খানের দূত তাঁর নিকটে গেলে তিনি বীরোচিত উত্তর দেন। তিনি বলেন যে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ এলাকা ছেড়ে দিয়ে এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন, এখানে তাঁকে নিরুপদ্রবে থাকতে দেয়া হলে তিনি খুশি হবেন, আর তা না হলে যুদ্ধক্ষেত্রেই তার মীমাংসা হবে।[২৫] উসমানের উত্তর পেয়ে ইসলাম খান সৈন্য পাঠাবার প্রস্তুতি নেন; সাম্রাজ্যবাদী মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি ইসলাম খান উসমানকে নিরুপদ্রবে থাকতে দিতে পারেন না। কিন্তু ইসলাম খান এখন ভেবে দেখেন যে শুধু উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে চলবে না, সিলেটের বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধেও একই সঙ্গে সৈন্য পাঠাতে হবে।[২৬] আগেই বলা হয়েছে উসমান বুকাইনগর ত্যাগ করে উহর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন, উহর ছিল দক্ষিণ সিলেটে বর্তমান মৌলবীবাজার জেলায়, কিন্তু উত্তর সিলেট ছিল বায়েজীদ কররানীর অধীনে। সমসাময়িককালে সিলেটের রাজনৈতিক অবস্থা একমাত্র বাহরিস্তান-ই-গায়বী ছাড়া অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। বায়েজীদ কররানী যে সিলেটে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিলেন, তাও একমাত্র বাহরিস্তানেই জানা যায়। বানিয়াচঙ্গ অঞ্চল যে আনোয়ার খানের অধীনে ছিল, তাও বাহরিস্তানেই পাওয়া যায়, আনোয়ার খান ছিলেন বার-ভূঁঞার একজন, মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ, তাঁর পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দি করে রোটাস দুর্গে পাঠাবার কাহিনী ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। যা হোক, বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে সিলেটের রাজনৈতিক কাঠামো যেভাবে পাওয়া যায়, তা নিম্নরূপ। উত্তর সিলেটে বায়েজীদ কররানী; বানিয়াচঙ্গ-এ আনোয়ার খান; তরফ-এ আকবরের সময়ে ছিলেন ফতেহ খান, এই সময়ে উসমানের ছেলে মুমরিজ এবং ভাই মালহী তরফ অধিকার করেন, পূর্ব দিকে মাতঙ্গ-এ পাহলোয়ান, ইনি বার-ভূঁঞার একজন ছিলেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে মোগল বাহিনী তরফ-এ গিয়ে মুমরিজ ও মালহীকে পরাজিত করেন (তারা বোধ হয় উহর-এ গিয়ে উসমানের সঙ্গে মিলিত হন) এবং পাহলোয়ান পরাজিত ও নিহত হন। অতএব মোগলদের জয় করা বাকি থাকে শুধু উহর-এ উসমান এবং সিলেটে বায়েজীদ কররানী।

বায়েজীদ কররানীর পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে নামে বুঝা যায় যে তিনি কররানী সুলতানদের বংশের একজন উত্তর পুরুষ। কররানী সুলতানদের রাজত্বকালে হয়ত বায়েজীদ বা তাঁর কোন পূর্ব পুরুষ (পিতা হতে পারেন) সিলেটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। দাউদ কররানীর হত্যা এবং রাজধানী তাঁড়া মোগল অধিকারে গেলে সিলেটের এই কররানী সেনাপতি স্বাধীন হয়ে যায়। সম্রাট আকবরের সময় মোগল সেনাপতিরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে শত্রুদের (মোগলদের ভাষায় বিদ্রোহী) বিরুদ্ধে খণ্ড

Edited by Ripon Sarkar

খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ করলেও সিলেট পর্যন্ত তারা অগ্রসর হতে পারেনি, তাই সিলেটের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। মোগলদের দ্বারা বিতাড়িত অনেক আফগান সেনানায়ক ও সৈন্য সিলেটে বায়েজীদ কররানীর আশ্রয় নেয়। বায়েজীদের বিরুদ্ধে মোগলদের যুদ্ধে মিরযা নাথন সরহঙ্গ-এর উল্লেখ করেছেন, এই সরহঙ্গরা আফগান সৈন্য ও সেনানায়ক। বায়েজীদের সঙ্গে উসমানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়, উসমান তা নাহলে উহর-এ গিয়ে নির্বিবাদে থাকতে পারতেন না। অবশ্য স্মরণীয় যে উসমান, বায়েজীদ উভয়েই আফগান ছিলেন, এবং আফগান রাজত্ব পুনঃস্থাপনের স্বপ্ন দেখছিলেন। ইসলাম খান এই পর্যন্ত বাংলায় যে সকল যুদ্ধ করেন তার সঙ্গে এই যুদ্ধের পার্থক্য আছে; এতদিন যুদ্ধ হয়েছে বাঙ্গালিদের সঙ্গে, বার-ভূঁঞা বা অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে, কিন্তু ইসলাম খানের এই যুদ্ধ আফগানদের বিরুদ্ধে, সিলেটের বায়েজীদ এবং উহর-এর উসমানের বিরুদ্ধে। ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে শুধু উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে বায়েজীদ কররানী উসমানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে পারেন এবং তাঁদের মিলিত শক্তি দুর্দমনীয় প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই ইসলাম খান উসমান এবং বায়েজীদের বিরুদ্ধে পৃথক পৃথক বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

এই সিদ্ধান্ত মতে ইসলাম খান পৃথক পৃথক দুটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন এবং উসমানের বিরুদ্ধে শুজাত খানকে এবং বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর (ইসলাম খানের) ভাই গিয়াস খানকে নেতৃত্ব দেন। শুজাত খানকে উৎসাহিত করার জন্য ইসলাম খান সম্রাটের নিকট আবেদন করেন যে শুজাত খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হোক। সম্রাট শুজাত খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন এবং শুজাত খান তাঁর ছেলে শয়খ কুতুবকে উড়িষ্যায় তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে পাঠান। অতঃপর ইসলাম খান শুজাত খানকে অনেক উপহার দেন, এর মধ্যে ছিল সম্মানিত পোশাক, একটি ভাল জাতের ঘোড়া, স্বর্ণখচিত ঘোড়ার জিন এবং লাগাম, একখানি তরবারি ও মণিমুক্তাখচিত হাওদা, ইরাকি ঘোড়া এবং মণিমুক্তা খচিত জিন ও লাগাম, শুজাত খানের নিজের ব্যবহারের জন্য একটি মাদী হাতি। অতঃপর ইসলাম খান শুজাত খানের অধীনে অনেক সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁদের মধ্যে ছিল, দিওয়ান মুতাকিদ খান, ইফতিখার খান, কিশওর খান, সৈয়দ আদম বারহা, শয়খ বায়েজীদ (শুজাত খানের বড় ভাই) শয়খ আছাই, সৈয়দ হোসেনী, মিরযা কাসিম খাজাঞ্চী, তাতার খান মেওয়াতী, শয়খ আশরাফ হাঁসিওয়াল, মিরযা আকবর কুলী, মিরযা বেগ, শুজাত খানের ছেলে শয়খ কাসিম, শয়খ ঈসা (শুজাত খানের ভাইপো) শয়খ মোমিন (শয়খ আবিয়ার ছেলে), শয়খ ইদ্রিস (শয়খ মারুফের ছেলে), শয়খ মাসুম, সাবিত খান এবং মুস্তফা (উভয়ে নসীব খানের ছেলে) এবং শয়খ ফরীদ দানা। তাছাড়া শুজাত খানের অধীনে ইসলাম খানের বাছাই করা পাঁচ শ অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুকধারী, ইহতিমাম খানের হাতি বাহিনী, রাজকীয় বিশটি হাতি, ইহতিমাম খানের অধীনস্থ রাজকীয় নৌবহর এবং সরাইলের জমিদার সোনাগাজীর নৌবহর সংযুক্ত করা হয়। গিয়াস খানের অধীনে বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধেও অনেক সেনানায়ককে নিযুক্ত করা হয়, এঁরা হলেন, মুবারিজ খান, তুকমক খান, মীরক বাহাদুর জালাইর এবং মীর আবদুল রাজ্জাক শিরাজী। এই বাহিনীতে অনেক পদাতিক সৈন্য, ইসলাম খানের বাছাই করা এক হাজার অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুকধারী, একশ রাজকীয় হাতি এবং বার-ভূঁঞার সমগ্র নৌ-বাহিনী যুক্ত করা হয়। মীর আলী বেগকে এই

Edited by Ripon Sarkar

বাহিনীর বখশী নিযুক্ত করা হয়। স্পষ্টতই বুঝা যায়, ইসলাম খান উসমান ও বায়েজীদ, অর্থাৎ আফগানদের দমন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেন; তিনি এই দুই যুদ্ধের প্রতি এত গুরুত্ব দেন যে একটু পরে দেখা যাবে যে মোগল এলাকা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় সৈন্যও তিনি নিজের কাছে রাখেননি।[২৭]

স্থির হয় যে শুজাত খান এবং গিয়াস খানের দুই বাহিনী একই দিনে খিজিরপুর থেকে যাত্রা করবে। শুজাত খান ঢাকা থেকে যাত্রা করে প্রথমে খিজিরপুরে পৌঁছেন, কিন্তু গিয়াস খান হতাশার ভাব দেখালে[২৮] তাঁর পরিবর্তে শয়খ কামালকে বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধে পাঠান হয়। ইসলাম খান নিজে খিজিরপুরে যান এবং সৈন্য ও নৌ-বাহিনীর মহড়া পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন। অতঃপর সুবাদার উভয় সেনাপতি, শুজাত খান ও শয়খ কামালকে বিদায় দেন। তাঁদের যাত্রার পরে ইসলাম খান চিন্তা করেন যে সমগ্র বাহিনী উসমান এবং বায়েজীদের বিরুদ্ধে গমন করেছে, এখন যদি কোন শত্রু আক্রমণ করে বা অন্য কোন অঘটন ঘটে, অথবা শুজাত খান বা শয়খ কামালের নিকট যদি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতে হয়, তাহলে তাঁর নিকট এমন কোন বাহিনী নেই যাতে তিনি এরূপ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। অতএব তিনি সম্রাটের নিকট অবস্থা বর্ণনা করে একখানি আবেদন পাঠান যাতে তাঁর নিকট অতিরিক্ত সৈন্য পাঠান হয়। সম্রাট এই আবেদনে সাড়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিহারের সুবাদার আফজাল খানের নিকট ফরমান জারি করেন। ফরমানে আফজাল খানকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন জাহাঙ্গীর কুলী খানের (পূর্ববর্তী সুবাদার ১৬০৭-১৬০৮) ভগ্নীপতি মিরযা ইমাম কুলী বেগ শামলুর নেতৃত্বে বিহারের সেনাবাহিনী ইসলাম খানের নিকট পাঠান। আফজাল খান তিন দিনের মধ্যে এই বাহিনী পাঠান এবং তারা পনর দিনের মধ্যে পাটনা থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেন। ইসলাম খান তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং প্রত্যেকের মর্যাদা অনুসারে তাদের ছয় মাসের খরচ দেয়া হয়। কিন্তু এই বাহিনী ইসলাম খান নিজের কাছে না রেখে শয়খ কামালের নিকট পাঠিয়ে দেন।[২৯]

খাজা উসমানের পতন

শুজাত খান খিজিরপুর থেকে লক্ষ্যা নদী ধরে নৌপথে খুব দ্রুতগতিতে যাত্রা করে ছয় মঞ্জিলে এগার সিন্দুর পৌঁছেন। এখানে এসে শুজাত খানকে কয়েকদিন অবস্থান করতে হয়, কারণ ইহতিমাম খানের অধীনে নৌবহর পৌঁছতে সময় লাগে। শুজাত খান ইহতিমাম খানকে দ্রুতগতিতে আসার জন্য তাগাদা দিতে থাকেন এবং অল্প পরে নৌ-বাহিনীও এসে পড়ে। এগার সিন্দুর থেকে মেঘনা নদীতে যাওয়ার সোজা কোন জলপথ ছিল না, তাই নৌ-বাহিনীকে ভাটিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে হয় এবং বর্তমান রামপুর হাট ও ভৈরব বাজারের নিকট দিয়ে মেঘনা নদীতে যেতে হয়। এগার সিন্দুরে স্থল- বাহিনী এবং নৌ-বাহিনী ভাগ হয়ে যায়, স্থলবাহিনী সড়ক পথে অগ্রসর হয়ে মেঘনা[৩০] নদী পার হয়ে নৌ-বাহিনী পৌঁছার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, কারণ নৌ-বাহিনীকে অনেক পথ ঘুরে আসতে হয়।[৩১]

শুজাত খানের অধীনে স্থলবাহিনী সরাইলে এসে পৌঁছে এবং পরে নৌ-বাহিনী এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। এ সময় ইসলাম খান সৈন্যবাহিনী গণনা ও পরিদর্শনের

Edited by Ripon Sarkar

জন্য ঢাকা থেকে বখশী খাজা মুহাম্মদ তাহিরকে পাঠান এবং তাঁর সহকারী রূপে মিরযা আবদুর রহীম এবং রায় ভাওয়াল দাস পরওরী নামক দুই কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেন। তাঁরাও সরাইলে এসে শুজাত খানের সঙ্গে মিলিত হন। সরাইলে উচ্চ নীচ সকল সেনানায়ককে তাদের নিজ নিজ সৈন্য এবং যুদ্ধাস্ত্রসহ মাঠে জমায়েত হতে বলা হয়, এবং উপরোক্ত কর্মকর্তারা গণনা ও পরিদর্শন শেষ করে ঢাকায় ফিরে যান এবং ইসলাম খানের নিকট প্রতিবেদন পেশ করেন। এখানে পরামর্শক্রমে স্থির হয় যে নৌ-বাহিনী আর সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত হবে না (কারণ নদীর পানি কমে যেতে পারে) এবং ইহতিমাম খানের ভাগিনেয় মালিক হোসেন সরাইল নদীতে[৩২] নৌবহর নিয়ে অপেক্ষা করবে এবং গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। অতঃপর শুজাত খান সৈন্যবাহিনী নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন।

সৈন্য গণনা ও পরিদর্শন শেষে বখশী ঢাকায় ফিরে আসার পরে ইসলাম খান দিওয়ান মুতাকিদ খান, তাতার খান মেওয়াতী এবং আরও কয়েকজন সেনানায়ককে শুজাত খানের নিকট পাঠিয়ে দেন। শুজাত খানের সঙ্গে যাওয়ার জন্যেই এঁদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, কিন্তু বোধ হয় কোন কারণে তাঁরা পিছিয়ে যায়। এঁরা এখন দ্রুতগতিতে গিয়ে শুজাত খানের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর শুজাত খান অগ্রসর হয়ে তরফ-এ পৌঁছেন। এখানে একদিন অপেক্ষা করে তিনি চতুর্দিকে খোঁজ খবর নেন। এখানে একদল সৈন্য মোতায়েন করে শুজাত খান পরের দিন সকালে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন এবং তুপিয়া (বা পুটিয়া জুরী, সংক্ষেপে পুটিয়া[৩৩]) গিরিপথের পাদদেশে পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। শুজাত খান ভাবলেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে দুর্গ নির্মাণ করতে হবেই, কিন্তু এই গিরিপথেও একটি দুর্গ তৈরি করে একজন সুদক্ষ সেনাপতির হাতে ন্যস্ত করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে খাজা উসমানের ভাই খাজা ওয়ালী তুপিয়া পাহাড়ের উপরে দুর্গ তৈরি করে অবস্থান করছিলেন এবং দুর্গের চারদিকে পরিখাও খনন করেন। সামরিক কারণে এই দুর্গ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, পাহাড়ের নিচে থেকে কোন শত্রুর পক্ষে পাহাড়ের উপরে অবস্থিত এই দুর্গ জয় করা সহজ ছিল না। সুতরাং খাজা ওয়ালী যাতে দুর্গ থেকে নেমে এসে সমতলে অবস্থানরত মোগল বাহিনীকে সহজে কাবু করতে না পারে, সে জন্য পাহাড়ের পাদদেশে দুর্গ তৈরি করে খাজা ওয়ালীর পদক্ষেপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। শুজাত খান মিরযা নাথনকে এই অগ্রবর্তী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং নাথন অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করে তার চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। মিরযা নাথনের সঙ্গে সৈয়দ আদম বারহা, শয়খ আশরাফ হাঁসিওয়াল, তাতার খান মেওয়াতী এবং শয়খ ফরীদ দানাও এই অগ্রবর্তী দলের সেনানায়ক নিযুক্ত হন। রাতের প্রায় শেষ দিকে মিরযা নাথন একদল বাছাই করা সৈন্য তুপিয়া দুর্গের দিকে পাঠান, উদ্দেশ্য ছিল আশে পাশে লুটপাট করে শত্রুদের ভয় দেখানো এবং শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হওয়া। তারা গিয়ে দেখে যে খাজা ওয়ালী দুর্গ ছেড়ে দিয়ে তাঁর ভাই উসমানের নিকট চলে গেছেন। দুর্গের চতুর্দিকস্থ পরিখা রক্ষার জন্য খাজা ওয়ালী যে সকল সৈন্য নিয়োগ করেছিলেন, তারাও পরিখা ছেড়ে দিয়ে ওয়ালীর অনুসরণ করে। মিরযা নাথনের প্রেরিত অগ্রবর্তী বাহিনী দুর্গ পরিত্যাগের সংবাদ মিরযা নাথনকে পাঠিয়ে দেয়। মিরযা নাথন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সকল সৈন্য সেখানে পাঠান, এবং দুর্গ অধিকার করে সেখানে শিবির স্থাপন করেন। ঐদিন ছিল কুরবানীর ঈদ, অর্থাৎ

Edited by Ripon Sarkar

১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে তুপিয়া দুর্গ মোগলদের হস্তগত হয়। (স্মরণীয় যে রমযানের ঈদের দিন বুকাইনগর দুর্গ অধিকৃত হয়)। পাহাড়ের পাদদেশে শিবিরে ঈদ উৎসব পালন করে এবং সামাজিকতা শেষে শুজাত খান এবং অন্যান্যরা ঈদের পরদিন তুপিয়া দুর্গে গিয়ে অবস্থান নেন।[৩৪]

খাজা উসমানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তুপিয়া দুর্গটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাহাড়ের উপরে এই দুর্গ বিশাল সেনাবাহিনীর পক্ষেও অধিকার করা সহজ ছিল না। এখানে অল্প সৈন্যের পক্ষে বিরাট বাহিনীকে বাধা দেয়া সম্ভব ছিল এবং খাজা ওয়ালী এই দুর্গ পরিত্যাগ করে মারাত্মক ভুল করেন। এই দুর্গ অধিকৃত হওয়ায় মোগল বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থান লাভ করেন। মিরযা নাথনও এই দুর্গের সামরিক গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং বলেন যে, খাজা ওয়ালী স্বেচ্ছায় দুর্গ পরিত্যাগ করে মোগলদের সুবিধাজনক অবস্থানে ঠেলে দেন, এবং আল্লার ইচ্ছাই যেন ছিল মোগলদের বিজয় মাল্যে ভূষিত করা।[৩৫]

তুপিয়া দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পরে মোগল বাহিনী খাজা উসমানের ঘাঁটির প্রায় নিকটে এসে পড়ে, এই কারণে মোগল বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা হয়। মোগল বাহিনীকে বিভিন্ন বাহুতে ভাগ করে এক পরিকল্পনাসহ ইসলাম খান ঢাকা থেকে মিরযা হাসান মাশহাদীকে পাঠান এবং তিনি সৈন্যবাহিনীকে নিম্নরূপে বিভক্ত করেন ঃ[৩৬]

অগ্রবর্তী দল (ভ্যানগার্ড)—মিরযা নাথনকে এই দলের নেতৃত্ব দেয়া হয়, যদিও তাঁর মনসব (বা মর্যাদা) খুব বেশি ছিল না (ঐ সময়ে তাঁর মনসব ছিল ১০০/৫০), একজন অত্যন্ত অনুগত সেনানায়ক এবং হাতি চালনায় বিশেষ দক্ষতার জন্য তাঁকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেয়া হয়। তাঁর সঙ্গে আরও বেশ কয়েকজন সেনানায়ককে এই দলে নিযুক্ত করা হয়, তাঁরা হলেন সৈয়দ আদম, সৈয়দ হোসেনী, শয়খ আছাই, শয়খ আশরাফ, তাতার খান, সাবিত খান, মুস্তফা, মিরযা কাসিম খাজাঞ্চী (তিনি এই সেনাবাহিনীরও খাজাঞ্চী ছিলেন), শয়খ ফরীদ দানা, মিরযা কাজিম বেগ, মিরযা বেগ আয়মাক, মিরযা আকবর কুলী, এবং সরাইলের জমিদার ও বার-ভূঁএর একজন সোনাগাজী।

দক্ষিণ বাহু (রাইট উইং)—ইফতিখার খান ও তাঁর বাহিনী।

বাম বাহু (লেফট উইং)—কিশওয়র খান ও তাঁর বাহিনী।

ইলতমিশ (বা অগ্রগামী রিজার্ভ)—শুজাত খানের পুত্র শয়খ কাসিম এবং শুজাত খানের সকল আত্মীয়। অগ্রগামী দলের সাহায্যের জন্য তাদের সর্বদা সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

মধ্য ভাগ (সেন্টার)—সেনাপতি শুজাত খান নিজে, তাঁর সঙ্গে ছিলেন দিওয়ান মুতাকিদ খান, মীর বহর ইহতিমাম খান ও তাঁদের সৈন্যবাহিনী।

এভাবে বিভক্ত হয়ে মোগল বাহিনী কুচ করে করে অগ্রসর হয়, মিরযা হাসান মাশহাদী তিন মঞ্জিল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন এবং তারপর প্রত্যেক বিভাগের বাহিনী পরিদর্শন করে ঢাকায় ফিরে যান এবং ইসলাম খানের নিকট সংবাদ দেন। ইসলাম খান শুজাত খানের সাহায্যার্থে আরও সৈন্য প্রেরণ করেন, তিনি মুয়াজ্জম খানের ছেলে মুকাররম খানকে ভাওয়ালে থানাদার নিযুক্ত করেন এবং তাঁর ছোট ভাই আবদুস সালামকে শুজাত খানের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গে দেয়া হয় এক

Edited by Ripon Sarkar

হাজার লৌহ-বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী, তাছাড়া মীর মুরাদের ছেলে মীর মকসুদকে সেনাবাহিনীর সাজাওল নিযুক্ত করে পাঠান হয়।[৩৭]

খাজা উসমান মোগল বাহিনীর প্রস্তুতির খবরাখবর রাখেন, তিনি সংবাদ পান যে মোগল বাহিনী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তিনিও তাঁর ভাই, ছেলে এবং বীর যোদ্ধা সরহঙ্গদের[৩৮] নিয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন এবং নিম্নরূপে সৈন্য বাহিনী সাজানঃ[৩৯]

অগ্রবর্তী দল—উসমান তাঁর ভাই খাজা মালহী এবং খাজা ইবরাহীম ও তাঁর ভাইপো খাজা দাউদ (পরলোকগত সোলায়মানের ছেলে)-কে পনর শ অশ্বারোহী দুই হাজার পদাতিক এবং পঞ্চাশটি হাতিসহ এই বিভাগের দায়িত্ব দেন।

দক্ষিণ বাহু—উসমানের এক ভৃত্য শের ময়দান (যুদ্ধক্ষেত্রের বাঘ) কে সাতশ আফগান সৈন্য, এক হাজার পদাতিক এবং বিশটি হাতিসহ এই বিভাগের নেতৃত্ব দেয়া হয়।

বাম বাহু—উসমানের ছোট ভাই (মালহী এবং ইবরাহীমের বড়) খাজা ওয়ালীকে এই বিভাগের নেতৃত্ব দেয়া হয়। তাঁর সঙ্গে ছিল এক হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার পদাতিক এবং ত্রিশটি হাতি।

মধ্যভাগ—মধ্যভাগের নেতৃত্ব দেন খাজা উসমান নিজে। তাঁর সঙ্গে ছিল দুই হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার পদাতিক এবং চল্লিশটি কামোত্তেজনাপূর্ণ হাতি।

লক্ষণীয় যে মোগল এবং আফগান সৈন্য বিন্যাসে কিছু পার্থক্য রয়েছে, মোগলদের সৈন্য সমাবেশে অগ্রবর্তী দলের পেছনে সাহায্যকারী আর একটি অগ্রবর্তী দল রয়েছে, যাকে বলা হয় ইলতমিশ বা অগ্রবর্তী রিজার্ভ, কিন্তু আফগান বাহিনীতে এরূপ কোন বিভাগ নেই। এটা তাদের যুদ্ধের রীতিনীতির পার্থক্য, মোগলদের সঙ্গে দাউদ কররানীর যুদ্ধেও এরূপ পার্থক্য ছিল।[৪০] এই পার্থক্য নিম্নরূপে দেখা যায়ঃ

উসমানের সৈন্যবিন্যাস

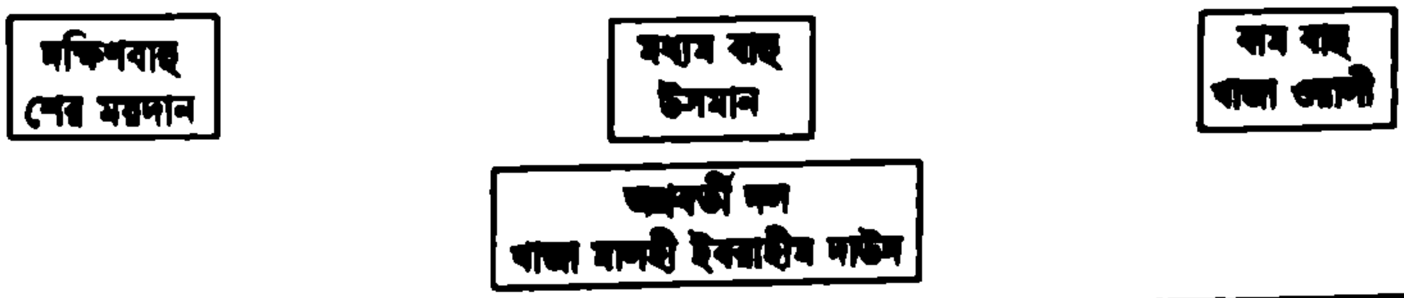

মোগল সৈন্য বিন্যাস

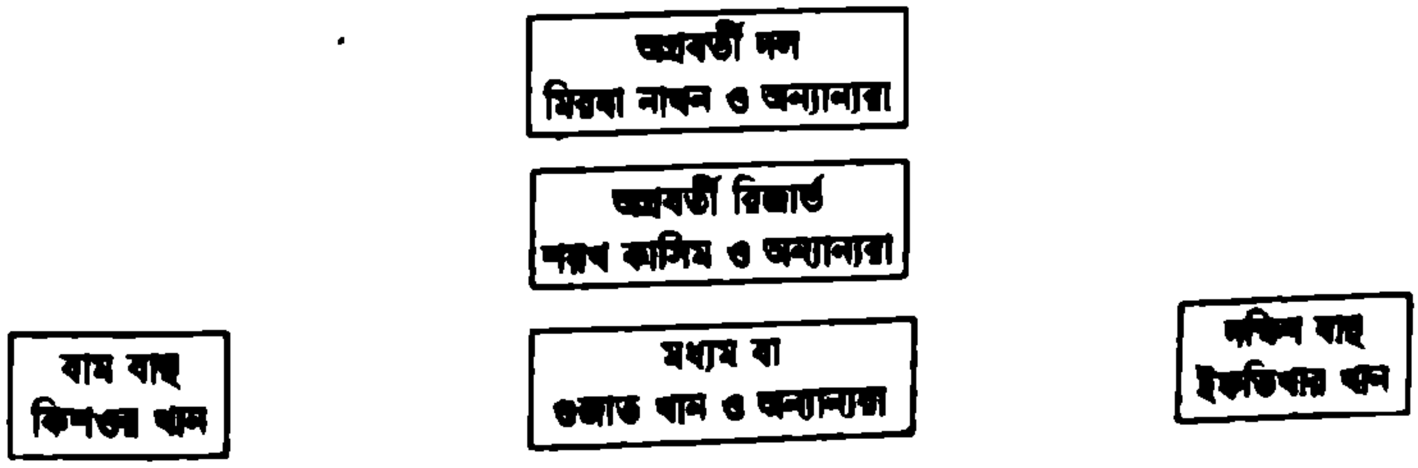

Edited by Ripon Sarkar

আফগানদের সৈন্য সংখ্যা হিসেব করে বের করা যায়, তাঁদের পক্ষে ছিল পাঁচ হাজার দুশ অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং একশত চল্লিশটি হাতি। কিন্তু মোগল পক্ষে সৈন্য সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, কারণ মনসবদারেরা নিজ নিজ সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয় অথচ তাদের সৈন্য সংখ্যা সকল ক্ষেত্রে দেয়া হয়নি। শুধু বলা হয় যে সুজাত খান যাত্রার সময় ইসলাম খান তাঁর বাহিনীতে নিজের পাঁচশ বাছাই করা অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুকধারী, ইহতিমাম খানের হাতি বাহিনী এবং রাজকীয় হাতিশালার বিশটি হাতি দেয়া হয়। মোগলদের বিরাট নৌ-বাহিনীও ছিল কিন্তু নৌ-বাহিনী এই যুদ্ধে কাজে আসেনি। সৈন্য সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও যে যুদ্ধে অনেক মনসবদার অংশ গ্রহণ করে তাতে সৈন্য সংখ্যাও যে অনেক ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং নির্দ্বিধায় বলা যায় যে মোগলদের পক্ষে সৈন্যের সংখ্যা খাজা উসমানের সৈন্যের চেয়ে বেশি ছিল।

খাজা উসমান রাজধানী উহর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং উপরোক্ত মতে সৈন্য বিন্যাস করেন। তিনি দুই মঞ্জিলে চৌয়াল্লিশ পরগণার[৪১] দৌলম্বপুর গ্রামে এসে পৌছেন এবং শিবির স্থাপন করেন। দৌলম্বপুর উহর থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল, কারণ দুই মঞ্জিলে উসমান এখানে এসে পৌছেন। এই গ্রামটি হাইল হাওরের এক দেড় মাইল উত্তরে, মৌলবী বাজারের চার পাঁচ মাইল দক্ষিণে এবং ভুপিয়া (পুটিয়াজুরী) থেকে ছয় সাত মাইল পূর্বে অবস্থিত ছিল।[৪২] আফগান এবং মোগল বাহিনীর কুচ করার দিকে লক্ষ্য রেখে এই অনুমান করা যায়। সামরিক বিবেচনায় দৌলম্বপুর ছিল একটি আদর্শ স্থান, বিশেষ করে উসমানের জন্য এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উসমানের শিবির মোগল শিবির থেকে এক দেড় মাইল ব্যবধানে থাকে, কিন্তু উভয় শিবিরের মধ্যস্থলে ছিল একটি বিরাট জলা এবং জলার প্রান্তে উসমানের শিবিরের দিকে ছিল ঘন সুপারির বন। উসমান সুপারি গাছে তক্তা বেঁধে দমদমা বা মাচান তৈরি করেন এবং মাচানের উপরে ভারী কামান স্থাপন করেন।[৪৩]

মোগল বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে উসমানের সামনাসামনি অবস্থান নেয়, উভয় শিবিরের দূরত্ব আধা ক্রোশ বা এক দেড় মাইল, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, উভয় শিবিরের সামনে ছিল একটি বিশাল জলা। সুজাত খান এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং বুঝতে পারেন যে উসমান একটি দুর্ভেদ্য স্থানে নিজের শিবির স্থাপন করেছেন এবং জলার এপার থেকে যুদ্ধ করতে হলে মোগল বাহিনীকে ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করতে হবে। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত এমন সময় ইফতিখার খানের পরামর্শে সুজাত খান খাজা উসমানকে আনুগত্য প্রদর্শনের আহবান করে দূত মারফত প্রস্তাব পাঠান। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে এখনও যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় আছে, উসমানের নিজের শান্তি এবং সাধারণ লোকের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে এই প্রস্তাবে সাড়া দেয়া উচিত। প্রস্তাবে নিম্নরূপ শর্তগুলি আরোপ করা হয়:[৪৪]

(১) উসমান আত্মসমর্পণ করবেন,

(২) উসমান তাঁর এক ছেলে বা এক ভাইকে যিম্মিস্বরূপ মোগল শিবিরে পাঠাবেন,

Edited by Ripon Sarkar

(৩) উসমান তাঁর সমুদয় হাতি মোগলদের নিকট হস্তান্তর করবেন,

(৪) উসমানের রাজ্য মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং প্রাদেশিক দিওয়ান রাজস্ব নির্ধারণ করবেন এবং নথিভুক্ত করবেন,

(৫) বিনিময়ে সম্রাটের আদেশে উসমানকে পাঁচ হাজারের মনসব দেয়া হবে, এবং

(৬) উসমানের সকল অপরাধ ক্ষমা করা হবে এবং মোগল বাহিনী ফিরে যাবে।

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতেও উসমানের নিকট শুজাত খানের দূত পাঠাবার কথা বলা হয়েছে।[৪৫] যদিও মিরযা নাথন বলেন যে ইফতিখার খানের পরামর্শে শুজাত খান এই প্রস্তাব পাঠান, প্রস্তাবের শর্ত দেখে মনে হয় যে সম্রাটের অনুমোদনক্রমেই এই প্রস্তাব দেয়া হয়। উসমানকে পাঁচ হাজারের মনসব দেয়ার কথা বলে বলা হয় যে সম্রাটই এই মনসব নির্ধারণ করেছেন। শর্তগুলি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এতে উসমানকে সরাসরি আত্মসমর্পণের আহবান জানান হয়েছে, শর্তগুলিতে উসমানের পক্ষে সম্মানের কিছু ছিল না, উসমান রাজ্য ছেড়ে দেবেন এবং সরাসরি মোগল সরকারে চাকরি গ্রহণ করবেন। উপরন্তু তাঁর ছেলে বা ভাইকে মোগল শিবিরে বন্দি করে পাঠাতে হবে এবং তাঁর সমুদয় হাতি মোগলদের হাতে তুলে দিতে হবে। উসমানের রাজ্যটি তাঁকে জায়গীর রূপে ছেড়ে দিলেও অন্তত তাঁকে কিছু সম্মান দেখান হত। উসমান কি সারা জীবন এ রূপ অপমানকর শর্ত মেনে নেয়ার জন্য যুদ্ধ করেছেন?

শুজাত খান শিহাব খান লোদী নামক একজন কর্মকর্তাকে উসমানের নিকট দূত পাঠান, শিহাব খান লোদী ছিলেন ইফতিখার খানের একজন আফগান কর্মকর্তা। এই দূতের মাধ্যমেই উপরোক্ত শর্তগুলি প্রস্তাবাকারে পাঠান হয়। উসমান দূতের মারফত উক্ত শর্তসমূহ পেয়ে সাপের মত গর্জে উঠেন, স্বাভাবিকভাবেই উসমান এরূপ অপমানকর প্রস্তাবে রাজি হতে পারেন না, কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই উত্তর দিতে দেরী করেন। মিরযা নাথন বলেন[৪৬] যে পরের দিন ছিল রবিবার এবং ওহাবীরা রবিবারকে অপয়া দিন বলে মনে করে, তাই উসমান উত্তর দিতে দেরী করেন। এতে মনে হয় নাথনের মতে উসমান ছিলেন 'ওহাবী' কিন্তু 'ওহাবী' দ্বারা তিনি কি বুঝান তা বোধগম্য নয়। আরবের নজদের আবদুল ওহাবের সংস্কারবাদী আন্দোলনকে ওহাবী আন্দোলন বলা হয়, কিন্তু আবদুল ওহাবের তখন জন্মই হয়নি, তাঁর জন্ম হয় ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দে। সুতরাং নাথন উসমানকে ওহাবী বলে বোধ হয় কুসংস্কারবাদীরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৪৭] যা হোক শুজাত খানের দূত বুঝতে পারেন যে শুজাত খানের প্রস্তাবের প্রতি উসমানের সদিচ্ছা ছিল না, তাই তিনি দেরী না করে উসমানের উত্তর না নিয়েই ফিরে আসেন। তিনি তাঁর দৌত্যকার্যের ফলাফল প্রধান সেনাপতি শুজাত খান ও অন্যান্য মনসবদারদের জানান এবং বলেনঃ 'উসমান মাথা নত করতে প্রস্তুত নন এবং তিনি যুদ্ধের কথা ছাড়া আর কিছু বলেন না।' তবে শিহাব খান লোদীকে দৌত্য কাজে পাঠাবার একটা খুব ভাল ফল হল। তিনি উসমানের শিবিরে যাতায়াতের সময় জলার মধ্যে একটি উঁচু পথের সন্ধান নিয়ে আসেন, এই উঁচু পথটি মোগল সৈন্যদের আক্রমণের সময় কাজে আসে।[৪৮]

Edited by Ripon Sarkar

দৌলম্বপুরের যুদ্ধ

মুগল বাহিনী এখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেনাপতি স্থির করেন যে পরের দিন সকাল বেলায় যুদ্ধ শুরু হবে। তিনি পরের দিন সকালে শত্রুদের আক্রমণ করার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। পরের দিন রবিবার ১০২০ হিজরীর শেষ দিন, ২৯শে জিলহজ্জ ৩রা মার্চ ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দ,[৪৯] সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বাদ্য বাজতে থাকে এবং সেনানায়কেরা স্ব স্ব বাহিনী, গোলাবারুদ, কামান, তীর, বল্লম এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রসহ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করে নিজ নিজ নির্ধারিত স্থানে অবস্থান নেয়। এমন সময় মিরযা বেগ আয়মক একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেন এবং বলেন যে শত্রুদের ব্যূহ আরও দক্ষিণ দিকে; ফলে অগ্রবর্তী দল এবং বাম বাহু আরও বাম দিকে (উসমানের বাহিনীর ডান দিকে) সরে গিয়ে শত্রুর দিকে ধাবিত হয়, অন্যান্যরা ডান দিকে গিয়ে সুপারীবনের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আফগান বাহিনী ডান দিকে ছিল না, ফলে জলাকে কেন্দ্র করেই যুদ্ধ শুরু হয়। উসমানের যোদ্ধারা জলা অতিক্রম করে মোগলদের প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করে। অগ্রবর্তী দলের শয়খ আছাই, সাবিত খান এবং মুস্তফা আফগানদের বাধা দেন। মিরযা নাথন মাল্লাদের কাঁধের উপর থেকে কামান নামিয়ে মাটিতে রেখে গোলা বর্ষণের চেষ্টা করেন, কিন্তু এতে অসুবিধা দেখা দেয়। মিরযা বেগ আয়মকের ভুল তথ্যের ভিত্তিতে ভুল পথে অগ্রসর হওয়ায় এবং পরে আবার যথাস্থানে ফিরে আসায় মোগল বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে এবং আফগান সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে শত্রু মিত্র পৃথক করতে না পারায় মিরযা নাথন কামান দাগাতে সাহস পেলেন না। কিন্তু বিপদ আসে অন্য দিক থেকে, রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনী প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থান নিয়েছিল, তারা এই পরিস্থিতির কথা না জেনে সমানে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। ফলে শয়খ আছাই ও তাঁর সঙ্গীদের সৈন্যের মধ্যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শয়খ আছাইর পিঠে গোলার আঘাত লাগে এবং তিনি রণক্ষেত্রে আঘাতেই নিহত হন। সাবিত খান এবং মুস্তফা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন।[৫০] ফলে অগ্রবর্তী দল যুদ্ধে সুবিধা করতে পারে না, বরং বলা যায় এই দল পরাজিত হয়। মিরযা নাথন বলেন যে মিরযা বেগ আয়মক ভুল সংবাদ না দিলে যুদ্ধের প্রথম চোটেই শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করা যেত; শত্রুদের গতিবিধির সঠিক খবর রাখা যে যুদ্ধের জন্য কত প্রয়োজনীয়, এই যুদ্ধেই তা প্রমাণিত হয়। অবশ্য তাঁর নিজের অধীনস্থ অগ্রবর্তী দলের পরাজয়ের গ্লানি ঢাকার জন্য নাথন এই অজুহাত দেন কিনা বলা যায় না।

মোগল ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন ইফতিখার খান। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে যুদ্ধে তিনি নিজের বিভাগকে (ডান বাহুকে) কিছুতেই অগ্রগামী দলের পেছনে থাকতে দেবেন না, বরং সকলের আগে থাকবেন। তিনি যখন দেখেন যে অগ্রবর্তী দলের শয়খ আছাই ও অন্যান্যরা সম্মুখে অগ্রসর হয়েছেন এবং তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তিনি নিজ ব্যূহের বাইরে চলে আসেন এবং বেয়াল্লিশ জন অশ্বারোহী ও চৌদ্দজন পদাতিক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক বিপদ ঘটে যায়; ঘটনাচক্রে রাজকীয় হাতি রূপ সিঙ্গার (রূপ শৃঙ্গার) তখন কামোত্তেজনায় ছিল; এই হাতি ইফতিখার খানের বিভাগেই ছিল কিন্তু হঠাৎ করে এই হাতি ইফতিখার খানের আর এক হাতিকে আক্রমণ করে। ইফতিখার খানের সৈন্যরা হাতি দুটির বিবাদ মিটাতে এবং হাতি দুটিকে পৃথক করতে ব্যস্ত হয় এবং এই অজুহাতে ইফতিখার খানকে অনুসরণ

Edited by Ripon Sarkar

করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ইফতিখার খান কিছু ভ্রূক্ষেপ না করে শিহাব খান প্রদর্শিত উঁচু পথ ধরে দ্রুত জলা অতিক্রম করেন এবং আফগান বাম বাহুর নেতা খাজা ওয়ালীকে আক্রমণ করেন। খাজা ওয়ালী প্রায় কাবু হয়ে পড়েন এবং বিতাড়িত হওয়ার উপক্রম হয়, এমন সময় খাজা উসমান নিজে ভাই-এর সাহায্যার্থে অগ্রসর হন।[৫১] আগে বলা হয়েছে যে মোগল অগ্রবর্তী দল বিশৃঙ্খলা হয়ে পড়ে, এখন দেখা যায় যে ইফতিখার খানের মত একজন প্রবীণ সেনানায়ক নিজেও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেন। মাত্র কয়েকজন (৪২+১৪=৫৬ জন) সৈন্য নিয়ে ব্যূহ থেকে তাঁর বেরিয়ে আসা উচিত হয়নি; পরে নিজের বিভাগের দুটি হাতির যুদ্ধেও তাঁর বাহিনীতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ইফতিখার খান কর্তৃক এই শৃঙ্খলা ভঙ্গের মূল্য নিজ জীবন দিয়ে তাঁকে দিতে হয়। খাজা উসমান ছিলেন অতিশয় মোটা এবং বিরাট বপুর লোক, তাঁর বয়স ছিল তখন একচল্লিশ বছর। কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে তিনি যুদ্ধ করতে পারতেন না, তাই হাতির পিঠে থেকেই যুদ্ধ করতেন। তিনি যখন দেখেন যে ইফতিখার খান কর্তৃক তাঁর ভাই ওয়ালী প্রায় কাবু হয়ে পড়েছেন, তিনি মধ্যম বাহু থেকে সকল সৈন্য নিয়ে আফগান যুদ্ধের ধ্বনি 'হু' 'হু' করে অগ্রসর হন এবং ওয়ালীকে শিশু বলে গালাগালি করতে থাকেন। উসমানের বাহিনী ইফতিখার খান ও তাঁর মুষ্টিমেয় সৈন্যকে আক্রমণ করে, প্রত্যেক মোগল সৈন্য দশ পনর জন আফগান সৈন্যকে মুকাবিলা করতে বাধ্য হয়। ইফতিখার খান নিজে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন এবং তাঁর সৈন্যদের উৎসাহ দিতে থাকেন। ইতোমধ্যে রণ সিঙ্গার এর মাহুত হাতিটিকে নিয়ে জলা পার হয়ে ইফতিখার খানের সাহায্যে আসে এবং উসমানের হাতিগুলি আক্রমণ করে। ইফতিখার খানের সঙ্গে সৈন্য ছিল খুবই কম, মাত্র ছাপ্পান্ন জন, যুদ্ধে তাদের কেহ নিহত এবং কেউ আহত হয়ে তাদের মধ্যে অল্প সৈন্যই অবশিষ্ট ছিল, ফলে মোগল হাতি রণসিঙ্গার কোন দিক থেকে সাহায্য পায় না। উসমানের সৈন্যরা চারদিক থেকে হাতিকে ঘিরে ফেলে, তারা মাহুতকে হত্যা করে এবং হাতিটিকে কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে। হাতিকে কেটে উসমানের সৈন্য ইফতিখার খানকে ঘিরে ফেলে এবং মোগল সৈন্যদের ঘোড়ার পা কেটে কেটে তাদের ধরাশায়ী করে। তখন ইফতিখার খানের সঙ্গে একজন আফগান সৈন্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়, ইফতিখার শত্রুকে সজোরে আঘাত করলে সৈন্যটি ঘোড়া থেকে পড়ে ধরাশায়ী হয়। ধরাশায়ী সৈন্যের ভাই এসে ইফতিখার খানকে তরবারির আঘাত করে, ইফতিখার খান বাম হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু বর্মসহ তাঁর হাতের কব্জা কেটে যায়। ইফতিখার খানের একজন সৈন্য ছিন্ন কব্জাখানি তুলে নিয়ে বগলের নিচে রেখে শত্রুদের আক্রমণ করে এবং চারজন শত্রুকে হত্যা করে নিজে নিহত হয়।[৫২]

শয়খ আবদুল জলীল নামক একজন সৈন্য ইফতিখার খানের এই অবস্থা দেখে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে উসমানের সামনে চলে যায়। উসমান তখন একটি মাদী হাতির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। আবদুল জলীল সম্মুখ থেকে তার প্রতি তীর ছুঁড়ে, তীরটি উসমানের বাম চোখের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে উসমানও শয়খ আবদুল জলীলের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করেন, বর্শা বুকে বিদ্ধ হয়ে শয়খ পড়ে যায় এবং তাঁর জখম দেখতে না পায়, সেজন্য এত মারাত্মক আঘাত পেয়েও উসমান উচ্চবাচ্য না করে নিজের উভয় হাতে সজোরে তীরটি বের করে নেন, কিন্তু তীরের সঙ্গে তাঁর ডান চোখও বেরিয়ে আসে, কারণ দুই চোখের রগ একত্রে জড়িত থাকে। উসমান রুমাল

Edited by Ripon Sarkar

দিয়ে চোখ ঢেকে রাখেন এবং হাতির মাহুত উমরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ "শুজাত খানের সৈন্যদল কোন দিকে?" মাহুত উসমানের ক্ষতের কথা জানত না, সে উত্তর দিলঃ "মহুয়া গাছের নিচে পতাকা দেখা যাচ্ছে, শুজাত খানের সৈন্যদল অবশ্যই সেখানে থাকবে।" উসমান তখন কথা বলতে পারছিলেন না, তিনি মাহুতের পিঠে হাত দিয়ে সেখানে হাতি নিতে ইঙ্গিত দেন।[৫৩]

এ সময় মোগল অগ্রবর্তী দল জলার নিকট উপস্থিত হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তারা কি করবে, বুঝে উঠতে পারছিল না। ঠিক তাদের সম্মুখে জলার অপর পারে খাজা মালহী ও খাজা ইবরাহীমের নেতৃত্বে আফগান অগ্রবর্তী দলও অপেক্ষা করছিল। ইতোমধ্যে আফগান দক্ষিণ বাহুর নেতা শের ময়দান হাতি সম্মুখে দিয়ে হাতির আড়ালে কিশওর খানকে আক্রমণ করে, কিশওর ছিলেন মোগল বাম বাহুর নেতৃত্বে। সৈয়দ আদম, সৈয়দ হোসেনী এবং সোনাগাজী মোগল অগ্রবর্তী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিশওর খানের দলে ভিড়ে যান। তাঁরা বাম বাহুর সম্মুখে গিয়ে শের ময়দানকে বাধা দেন। যদিও সৈয়দ আদম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, তিনি দুটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। প্রথমত, তিনি ছিলেন অত্যন্ত মোটা এবং এক মহা ওজনের বর্শা বহন করতেন, তাই যে কোন ঘোড়া তাঁকে বহন করতে পারত না। দ্বিতীয়ত, সৈয়দ হোসেনের অধীনে রাজকীয় হাতি নূরীসহ অনেক দক্ষ সৈন্য থাকলেও তিনি যুদ্ধে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকেন। তিনি ছিলেন লোহানী আফগানদের পীরের ছেলে, তাই তিনি আফগানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং যুদ্ধে অংশ না নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। ফলে সৈয়দ আদম যুদ্ধে সুবিধা করতে পারলেন না, শত্রুরা তাঁর ঘোড়ার পা কেটে ফেলে এবং তিনি নিজেও মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুসারী, একজন সৈয়দ, একজন শয়খ এবং একজন কায়স্থ নিহত হন। এ অবস্থা দেখে সোনা গাজী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান। এবার শের ময়দান কিশওয়র খানকে আক্রমণ করেন; মোগল সৈন্যরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পরে কিশওর খান, তাঁর এক ভগ্নিপতি এবং একজন নাপিতসহ নিহত হন। কিশওরের পতাকা তখনও উন্নত ছিল, শের ময়দান মনে করেন যে কিশওর খান পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তিনি সেদিকে অগ্রসর হন এবং মোগল বাম বাহুর বাহিনীকে তাড়া করে একেবারে দুর্গের নিকটে চলে আসেন। কিন্তু দুর্গের সৈন্যরা কামান দাগাতে থাকে, শের ময়দান টিকতে না পেরে মোগল অগ্রবর্তী দলের পেছনে চলে আসেন। তখন অগ্রবর্তী দলে আবার গোলমাল শুরু হয়, আবার নতুন সৈন্য এসেছে বলে তারা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিন্তু মিরযা নাথন সাহস করে হাতি নিয়ে শের ময়দানকে আক্রমণ করেন। শের ময়দান পালিয়ে খাজা উসমানের ছেলে খাজা মুমরিজের নিকট চলে যান।[৫৪]

এদিকে খাজা মুমরিজ পিতার মৃতদেহ নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসেন এবং শের ময়দান যে পথে যুদ্ধ করেন, অর্থাৎ মোগল বাম বাহুর বিরুদ্ধে গমন করেন। আফগানদের "বাজ" এবং "বখতা" নামক দুটি হাতি আড়ালে রাখা হয়েছিল। মুমরিজ মাহুতদের নির্দেশ দিয়ে যান যে যুদ্ধ যখন চরম উত্তেজনায় পৌঁছবে, তখন যেন এই দুটি হাতিকে মোগল সৈন্যদের মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়, যাতে মোগল বাহিনীতে ভয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয় বখতা নামক হাতিটি দেখতে পর্বতের মত ছিল, কিন্তু একে এমনভাবে শিক্ষা দেয়া হয় যে মাহুতের আদেশ ছাড়া সে এক পাও নড়ত না। মুমরিজের বাহিনী আক্রমণ করতে এলে মোগল বাহিনীতে আবার সাড়া পড়ে যায়।

Edited by Ripon Sarkar

মিরযা নাথন তাঁর অগ্রবর্তী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের সৈন্য নিয়ে এক স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি মুমরিজকে ফিরে আসতে দেখে অন্য কারও সাহায্যের তোয়াক্কা না করে সেই দলের মধ্যে বাঘের মত ছুটে গিয়ে আফগানদের আক্রমণ করলেন। মোগল অগ্রবর্তী দলের কেউ তাঁর সাহায্যে এল না, কিন্তু মোগল আফগান সৈন্যরা মিশে গিয়ে আবার বিশৃঙ্খল হয়ে গেল এবং এই অবস্থায় যুদ্ধ চলতে থাকে।

মিরযা নাথন আগেই মাহুতদের সতর্ক করে দেন যেন রাস্তা ছেড়ে দূরে গিয়ে আক্রমণ না করে (অর্থাৎ যেন সৈন্যদের কাছাকাছি থাকে)। তিনি মাহমুদ খান লোদীকে বলেন, খোলা হাতের আঘাতের চেয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাতে আঘাত বেশি কার্যকর (অর্থাৎ সকলের সম্মিলিত আক্রমণ ব্যক্তিগত কারও আক্রমণের চেয়ে বেশি কার্যকর)। কিন্তু নাথনের প্রধান হাতি "বাঘ-দলন" সর্বাগ্রে থাকায় শত্রুদের তীরবিদ্ধ হতে থাকে। তার মাহুত 'ফতা' তার বড় ভাই 'বাজা'কে চেঁচিয়ে বলে, 'আমার হাতি তীরবিদ্ধ হয়ে আহত, সুতরাং ইহাকে শত্রুদের মাঝে ছেড়ে দিচ্ছি (যা পারে শত্রু নিধন করার জন্য)। বাজা তোমার জয় হোক বলে তার দন্তহীন হাতি 'বল সুন্দরকে' নিয়ে শত্রু ব্যূহের দিকে ছুটে গেল। মুমরিজ উপবিষ্ট মাদী হাতির সামনে উসমানের 'অনুপা' নামে একটি হাতি ছিল, 'বাঘ দলন' তাকে আক্রমণ করে এবং 'বল সুন্দর' ও 'সিংহলী' নামক একটি হাতিকে আক্রমণ করে। এই দুটি হাতির গমনের ফলে যে পথ পরিষ্কার হয় তার ভিতর দিয়ে মিরযা নাথনের অধীনস্থ চারজন সেনানায়ক শত্রু ব্যূহে ঢুকে পড়ে। তাঁরা হলেন, মাহমুদ খান লোদী, মস্ত আলী বেগ, ইয়াদগার বাহাদুর এবং পীর মুহাম্মদ। মাহমুদ খান লোদী এবং পীর মুহাম্মদ ছিলেন আফগান, তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করলেন এবং সুযোগ পেয়েও যুদ্ধ না করে মুমরিজের বাহিনীকে পাশ কাটিয়ে আফগান ব্যূহের পেছনে চলে গেলেন। মস্ত আলী বেগ একজন আফগানকে আক্রমণ করেন, প্রত্যেকে একে অপরের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করে, আফগানের বর্শাটি মস্ত আলী বেগের বুকের হাড় ভেদ করে এবং মস্ত আলী বেগের বর্শা আফগান সৈন্যের ঘোড়ার কপাল ভেদ করে এবং চার আঙ্গুলের মত ক্ষত করে। ইতোমধ্যে মিরযা নাথন হাতির পিঠে কামান বসিয়ে দাগতে থাকেন।[৫৫]

হাতির যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। এমন সময় আফগানরা মুমরিজের পূর্বের আদেশ মত আড়ালে রাখা দুটি হাতির মধ্যে 'বখতা'কে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসে। 'বখতা'কে মিরযা নাথনের 'বাঘ দলনের' দিকে ছুটান হয় এবং 'অনুপা'ও থাকে। এমন সময় ফতার ভগ্নিপতি তার একদন্তা হাতি 'চঞ্চল'কে মাঠে নিয়ে আসে এবং 'চঞ্চল' 'বখতা'কে আক্রমণ করে। 'চঞ্চল' 'বখতা'র কোমরে আঘাত করে 'বাঘ দলন'কে প্রায় মুক্ত করে ফেলেছে, এমন সময় উসমানের হাতির উপর থেকে একজন সৈন্য হাতনলের গুলী দিয়ে 'চঞ্চল'-এর কোমরে এমনভাবে আঘাত করে যে 'চঞ্চল' প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু 'চঞ্চল' স্থির হয়ে আঘাত সহ্য করে পালিয়ে যায়। 'বল সুন্দর' তখন 'সিংহলীর' সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, এখন উভয় হাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাই হাতিটি কিছুক্ষণ ছুটাছুটির ফলে আফগান সৈন্যরা সুযোগ পায়, একটিকে ঘায়েল করে যেই অন্যটির দিকে ফিরছে, এমন সময় আফগান সৈন্যরা 'বল সুন্দরের' পা কেটে ফেলে। ওজাত খানের হাতি 'ফতুহা' তখন অগ্রবর্তী রিজার্ভ দলে ছিল, এর মাহুত তখন এই হাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসে। হাতিটি এসে 'সিংহলী'কে আক্রমণ করে। সিংহলী এতক্ষণ যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়েছে, এখন নতুনভাবে আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

Edited by Ripon Sarkar

এখন আড়াল থেকে উসমানের দ্বিতীয় হাতি 'বাজ'কে যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয় এবং মিরযা নাথনের সৈন্যদের দিকে পাঠান হয়। মিরযা নাথন তাঁর পিতা ইহতিমাম খানের মাহুত মারুফকে আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন তার হাতি 'গোপাল'কে যেন প্রথমে যুদ্ধক্ষেত্রে না আনা হয়, ঐ হাতি যেন বিপদের সময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। উসমানের কোন হাতি মোগল হাতি আক্রমণ না করে যদি মোগল সৈন্যদের তাড়াবার চেষ্টা করে তাহলে 'গোপাল' এসে শত্রুর হাতিকে রোধ করতে পারবে। এখন মিরযা নাথন চেঁচিয়ে বলেনঃ "মারুফ, তুমি কেমন নিমক খেয়েছো, তা প্রমাণ করবার এই সময়। দেখাও, তুমি 'বাজ'কে কি করতে পার।" কিন্তু মারুফ বিশ্বাসঘাতকতা করে, হাতি পাগল হয়েছে, তার কথা শুনছে না, এই অজুহাত দেখিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে 'বাজ' এসে মিরযা নাথনের সৈন্যদের তাড়িয়ে দেয়। মিরযা নাথন একা থেকে যায়, সঙ্গে সৈয়দ আলী নামক একজন অনুচর ছিল, তাঁরা মহুয়া গাছের নিচে আশ্রয় নেন। সৈয়দ আলী অনেক চেষ্টা করেও নাথনের জন্য এর চেয়ে ভাল আশ্রয় খুঁজে পেল না।[৫৬]

একদল আফগান সৈন্য একটি ছড়ার নিকটে অবস্থান করছিল, তাদের কাজ কোন আফগান হাতি তাদের নিকটে এলে তারা হাতিটি মোগল বাহিনীর দিকে ধাবিত করবে। মোগল অগ্রবর্তী এবং অগ্রবর্তী রিজার্ভ দলের যারা এখনও মাঠে অবস্থান করছিল, তাদের হটিয়ে দেয়াই তাদের উদ্দেশ্য। এমন সময় আফগান হাতি 'বখতা'র চালক হাতিটিকে মোগল অগ্রবর্তী দলের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, মিরযা নাথন মনে করেন যে ঐ হাতিটি মোগল সেনানায়ক খাজা বখশের। তাই তিনি ডেকে বলেন, 'খাজা বখশ, শত্রুরা এদিকেই আছে, তুমি ঐদিকে যাচ্ছ কোথায়? নাথনের এরূপ ভুল করার কারণ, আফগানরা মোগলদের বিভ্রান্ত করার জন্য সৈন্য এবং হাতির পতাকার রং মোগলদের অনুকরণে এক রকম করেছিল।[৫৭] আফগান হাতিতে দুজন চালক ছাড়াও দুজন বর্শা নিক্ষেপকারী সৈন্য রাখা হত, চালকরা বুঝতে পারে যে একজন মোগল ওখানে রয়েছে এবং তারা নাথনকে একজন সরদার বা সেনানায়ক রূপে সনাক্ত করতে পারে। ফলে তারা মিরযা নাথনকে আক্রমণ করার জন্য হাতিটিকে নির্দেশ দেয়। ইতোমধ্যে বাহলুল খান নামক একজন সৈন্য মিরযা নাথনের নিকট এসেছিল, হাতি প্রথমে শুঁড় দিয়ে ঐ সৈন্যকে ঘোড়াসহ উপরে উঠিয়ে এমনভাবে আছাড় দেয় যে মানুষটি একদিকে এবং ঘোড়াটি অন্যদিকে পড়ে যায়। লোকটি জ্ঞান হারিয়ে সেখানে পড়ে থাকে। অতঃপর হাতি মিরযা নাথনের দিকে ছুটে যায় এবং শুঁড় দ্বারা ঘোড়ার জিন ধরে ঘোড়াসহ নাথনকে উঠাতে চায়, নাথনও তরবারি দিয়ে হাতিকে আঘাত করে। কিন্তু হাতিটি ভ্রূক্ষেপ না করে মিরযা নাথনকে ঘোড়াসহ উঠিয়ে নেয় এবং কিছু দূর নিয়ে আছাড় দেয়। ঘোড়ার দুটি হাঁটু মাটির সঙ্গে লেগে আহত হয়, কিন্তু তবুও ঘোড়াটি উঠে দাঁড়ায়, নাথন ছিটকে পড়ে, কিন্তু তাঁর পা রেকাবে আটকে যায়। এ সময় একজন শত্রুসৈন্য বর্শা দিয়ে ঘোড়াকে আঘাত করে, ফলে ঘোড়াটি আরোহীসমেত শুজাত খানের ব্যূহের দিকে যাত্রা করে। 'বখতা' বেশ কিছু দূর পর্যন্ত তাকে তাড়া করে কিন্তু ধরতে পারেনি। কিছু দূর গিয়ে একটি পরিখার নিকটে ঢালু স্থান পার হওয়ার সময় মিরযা নাথনের পা রেকাব থেকে খুলে যায় এবং তিনি চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যান।[৫৮]

Edited by Ripon Sarkar

'বখতা' যখন ঘোড়াসমেত মিরযা নাথনকে উঠিয়ে ফেলে তখন শয়খ ফরীদ দানা এটা দেখতে পান এবং শুজাত খানকে বলেন, 'নাথনের দফা শেষ'। ঐ সময় মোগল অগ্রবর্তী ও সকল বাহুর সৈন্য মধ্যম বাহুর সঙ্গে মিশে যায় এবং এক স্থানে অবস্থান করে। এদিকে মিরযা নাথন মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালে একদল শত্রুসৈন্য তাঁর সামনে এসে পড়ে, পদাতিক বাহিনীর ত্রিশ-চল্লিশ জনের এই দলটি নাথনকে আক্রমণ করে। চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে নাথনের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম, কিন্তু তিনি কোনক্রমে ঢাল দিয়ে আত্মরক্ষা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ শত্রুরা নাথনকে ছেড়ে দিয়ে শুজাত খানের দিকে ধাবিত হন। যদিও মিরযা নাথন আহত হননি, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং মাঠেই থেকে যান। এমন সময় একজন আফগান অশ্বারোহী মিরযা নাথনের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করে, কিন্তু এতে তাঁর কোন আঘাত হল না। নাথন তরবারি দ্বারা শত্রুর ঘোড়ার সামনের পা দুটি কেটে দেন। ঘোড়াটি আরোহীসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। নাথন সৈন্যটির মাথা কাটার উদ্যোগ নিচ্ছেন, এমন সময় অন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য এসে মিরযা নাথনকে আক্রমণ করে। মিরযা নাথন পালাতে থাকলে একটি হাতি এসে পেছনের পা দিয়ে তাঁকে আঘাত করে, ফলে তাঁর একটি হাড় ভেঙ্গে যায়। নাথন জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকেন। হাতিটি তখন শয়খ আশরাফ হাঁসিওয়ালকে আক্রমণ করে এবং ঘোড়াসমেত তাঁকে মাটিতে ফেলে দিতে চায়, এমন সময় তাতার খান মেওয়াতী এসে হাতির মুখে এমন সজোরে বর্শা নিক্ষেপ করে যে হাতিটি অন্যদিকে চলে যায়। শয়খ আশরাফ বেঁচে যান। অন্য একটি হাতি এসে কাবিম বেগকে ঘোড়াসমেত উঠিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে এবং ঘোড়াসহ তাঁকে চূর্ণ করে দেয়। একজন আফগান সৈন্য শয়খ মাসুমের দিকে তীর ছুঁড়ে তাঁকে ঘোড়া থেকে নিচে ফেলে দেয় এবং তাঁর পা কুচি কুচি করে দেয়। পাহার খান লোহানী নামক একজন আফগান সৈন্য শুজাত খানের ভাইপো শয়খ ঈসার সঙ্গে একক যুদ্ধে লিপ্ত হয়, পাহার খানের তরবারির আঘাতে শয়খ ঈসার বাম হাতের তালু শেষ দুটি আঙ্গুলসহ কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শয়খ ঈসা শত্রুকে তরবারির আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত করে। শুজাত খানের ভাই শয়খ আম্বিয়ার ছেলে শয়খ মুমিন সৈয়দ খান সুর আফগানের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করেন, শয়খ মুমিন মারাত্মকভাবে আহত হন। শয়খ ইদ্রিসও একজন আফগানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন, শয়খ ইদ্রিস প্রথমে আফগানকে আঘাত করে, কিন্তু এটা মারাত্মক ছিল না। অন্য পক্ষে আফগান সৈন্যটি শয়খ ইদ্রিসকে হাঁটু কাঁধ এবং পায়ের গোড়ালিতে তিনটি আঘাত করে এবং তাঁকে ধরাশায়ী করে। শুজাত খানের বড় ভাই শয়খ বায়েজীদ খাজা দাউদের (খাজা উসমানের বড় ভাই খাজা সোলায়মানের পুত্র) সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাঁরা একে অন্যের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করেন। উভয়ে আহত হন, কিন্তু শয়খ বায়েজীদের আঘাত ছিল মারাত্মক; দাউদের বর্শা শয়খ বায়েজীদের চিবুক-এর ভিতর দিয়ে ঘাড়ের মধ্যে বিদ্ধ হয়।

এভাবে বিচ্ছিন্ন এবং সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ চলছিল। মোগল বাহিনী প্রায় সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত, মোগল পক্ষে অনেক সেনানায়ক নিহত, অনেক আহত, বাকি আছেন, শুধু প্রধান সেনাপতি শুজাত খান এবং তাঁর মধ্যম বাহু। এমন সময় হাতি 'বখতা'র চালক 'বখতা'কে শুজাত খানের নিকটে নিয়ে আসে। শুজাত খান ঘুরে ঘুরে সৈন্যদের প্রাণপণে যুদ্ধ করার উৎসাহ দিচ্ছেন। তিনি হাতিকে বাধা দেয়ার জন্য ঘোড়া নিয়ে প্রস্তুত হওয়ার আগেই হাতিটি তাঁকে কাবু করে ফেলে; একটি দাঁত জিনের ভিতর এবং

অন্যটি লৌহ বর্মের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে ঘোড়াকে লেজ এবং মলদ্বারের দিকে টানতে থাকে। শুজাত খানের সৈন্যরা তাঁর সাহায্যে এসে তাঁর বাহু ও কোমর ধরে পাঁজাকোলা করে রাখে যাতে তিনি পড়ে না যান। শুজাত খান ঐ অবস্থাতেই বর্শা দ্বারা হাতির মুখে এমন প্রচণ্ড আঘাত করে যে বর্শা হাতির মুখে কিছু দূর ঢুকে যায়। বর্শা টেনে বের করে দ্বিতীয়বার আঘাত করলে হাতির দাঁত এবং শুঁড়ের সঙ্গে লেগে ভেঙে দু টুকরা হয়ে যায়। তারপর শুজাত খান তরবারি দ্বারা হাতির মুখে আঘাত করেন, কিন্তু হাতি শুঁড় নাড়লে তরবারি দাঁতের সঙ্গে লেগে ভেঙে যায় এবং তরবারির গোড়ার দিকটা তাঁর হাতে থেকে যায়। ঐ ভাঙা অংশ দিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করেন, কিন্তু তাও ভেঙে যায়। অতঃপর শুজাত খান ছোরা বের করেন। ঐ সময়ে মোগল অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় কেউ শুজাত খানের সাহায্যার্থে আসতে পারল না। শুজাত খানের অনুচরেরা হাতিটির চারখানি পা কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে এবং তীরন্দাজরা হাতির চালকদের হত্যা করে। শুজাত খান রক্ষা পান।[৫৯]

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা অব্যাহত গতিতে যুদ্ধ চলে। অগ্রবর্তী, ডান, বাম, মধ্যম প্রত্যেকটি বিভাগের সৈন্যরা যুদ্ধ করে, অশ্বারোহী, পদাতিক, হাতি সকলেই যুদ্ধে অংশ নেয়; কামান, তীর, বর্শা, তরবারি সকল অস্ত্র ব্যবহার করা হয় এবং দ্বন্দ্ব যুদ্ধও চলে, কেউ কারও খোঁজ নেয়ার অবসর ছিল না। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে (৩রা মার্চ) সূর্য বেশি তেঁতে না উঠলেও হাজার হাজার মানুষ, ঘোড়া, শত শত হাতি, অস্ত্রের ঝনঝনানি, মানুষ এবং পশুর হুংকার, ঘোড়ার খুরের আঘাতে ধূলোবালি উড়ে পরিবেশ বেশ তপ্ত হয়ে উঠে। বাতাস এমন গরম হয়ে উঠে যে মানুষ এবং ঘোড়ার দম যেন বন্ধ হয়ে যায়। দুই পক্ষই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ঘোড়া আর চলতে পারে না, অশ্বারোহী জিনে বসে থাকতে পারে না, লাগামে হাত আলগা হয়ে যায়। মোগল বাহিনীতে সেনানায়ক ও সৈন্যসহ অনেক হতাহত, কিন্তু এত বিপর্যয়ের মধ্যেও মোগলেরা পিছনে হটে না যাওয়ায় আফগানেরা হতাশ হয়ে পালাতে আরম্ভ করে। তারা জলা অতিক্রম করে শত্রুদের দিকে চলে আসছিল, আবার জলা পার হয়েই শিবিরের দিকে যাত্রা করে, কিন্তু তাড়াতাড়িতে জলার মধ্যে উঁচু পথটি তারা হারিয়ে ফেলে। মোগল বাহিনী তাদের পশ্চাদধাবন করে। আফগানদের পতাকাবাহী ইলাহদাদ প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু আফগানরা তাঁর চুল ধরে টেনে তাঁকে ওপারে নিয়ে গেল এবং মোগলরা ঘোড়ার লেজ ধরে টেনে ঘোড়াটি রেখে দিল। চুল টানা বা লেজ টানা, যুদ্ধে এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, কিন্তু এতে বুঝা যায় যে ক্লান্ত শ্রান্ত সৈন্যদের যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি এবং টানাটানিতে পরিণত হয়। আফগানদের পলায়নের পরে মোগল বাহিনী বাদ্য বাজিয়ে তাদের বিজয় ঘোষণা করে। মোগল সেনাপতির জয়ডংকা বিজয় নিনাদ করে বেজে উঠে, তুরী ভেরী আনন্দের সুর গায়, কাছে দূরে সকলেই জানতে পারে যে মোগল পক্ষের জয় হয়েছে।[৬০]

উপরে দৌলম্বপুরের মোগল-আফগান যুদ্ধের যে বিবরণ দেয়া হল, তা সম্পূর্ণ মির্জা নাথনের বাহারিস্তান-ই-গায়বী থেকে নেয়া। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, মাসির-উল-উমারা এবং রিয়াজ-উস-সলাতীনেও এই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়। সুবাদার ইসলাম খান চিশতী বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপনের জন্য বার-ভূঁঞা, প্রতাপাদিত্য এবং অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করলেও এই যুদ্ধগুলি এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলিতে স্থান পায়নি। জাহাংগীর ২৯শে মহরম ১০২১ হিজরী ১লা এপ্রিল,

Edited by Ripon Sarkar

১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খানের থেকে যুদ্ধের বিজয় সংবাদ পান। ইসলাম খানের বিবরণের ভিত্তিতেই জাহাঙ্গীর তুজুকে এই যুদ্ধের কাহিনী লিখেন;[৬১] অন্যান্য পুস্তকে এই বিবরণ মোটামুটিভাবে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীকে অনুসরণ করে লিখিত হয়েছে। তুজুকে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে খাজা উসমানের নিকট শান্তির প্রস্তাব দিয়ে দূত পাঠাবার কথা বলা হয়েছে এবং আরও বলা হয়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্র ছিল একটি নালার ধারে জলা জায়গায়। এই দুটি বক্তব্য বাহরিস্তানেও পাওয়া যায়। তুজুকে তারিখ ৯ই মহরম, ১০২১ হিজরী, রবিবার কিন্তু বাহরিস্তানের আভ্যন্তরীণ তথ্যের ভিত্তিতে রবিবার, মাস এবং তারিখ নির্ধারণ করা যায়, যা তুজুকের তারিখের সঙ্গে মিলে না। উসমান ঐদিন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এই কথাটি তুজুক এবং বাহরিস্তান উভয় সূত্রেই পাওয়া যায়। তুজুকে মোগল অগ্রবর্তী বা ডান বাহুর বিশৃঙ্খলার কথা নেই, বলা হয়েছে যে উসমান তাঁর নিজস্ব ক্ষিপ্ত হাতি মোগল বাহিনীর দিকে ধাবিত করে এবং অগ্রবর্তী দলের সৈয়দ আদম এবং শয়খ আছাই যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। মোগল বাহিনীর বিশৃঙ্খলার কথা অবশ্যই সম্রাটকে জানান হয়নি, বাহরিস্তানে দেখা যায় স্বপক্ষের গোলার আঘাতে শয়খ আছাই মৃত্যুবরণ করেন, সৈয়দ আদম অগ্রবর্তী দলের লোক হলেও বাম বাহুতে এসে যুদ্ধ করে প্রাণ হারান। তুজুকে ইফতিখার খানের বীরত্বের প্রশংসা করা হয়েছে, তার বাহিনীর (ডান বাহুর) বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ হারাবার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বাহরিস্তানে দেখা যায়, ইফতিখার খান মাত্র কয়েকজন (৫৬জন) সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শেষ রক্ষা করতে পারেনি, তাঁর বাকি সৈন্যরা তাঁকে সাহায্য করেনি। তুজুকে কিশওর খানের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে, যা বাহরিস্তানেও আছে। তুজুকে বলা হয়েছে যে উসমান হাতি নিয়ে শুজাত খানকে আক্রমণ করেন, কিন্তু বাহরিস্তানে কথাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সূত্র মতে ইফতিখার খানের মৃত্যুর পরে তাঁর এক সৈন্য উসমানকে তীরবিদ্ধ করে, উসমান মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁর মৃতদেহ সরিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে তাঁর ছেলে মুমরিজ যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। মুমরিজের আদেশেই 'বখতা' এবং 'বাজ' হাতি দুটি মাঠে আনা হয়। শুজাত খানকে 'বখতা'ই আক্রমণ করে; তুজুকে এর নাম গজপত। হাতির সঙ্গে শুজাত খানের যুদ্ধে তুজুক এবং বাহরিস্তানে সামান্য গরমিল আছে। তুজুকে বলা হয়েছে যে হাতিটি শুজাত খানকে ঘোড়াসহ ফেলে দেয়, শুজাত খান ঘোড়া থেকে বিযুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান এবং শুজাতের অনুচর হাতির দুটি সামনের পা কেটে দেয়। এই অনুচরটি হাতির চালককে হাতির নিচে ফেলে দেয় এবং শুজাত খান হাতির শুঁড় এবং মুখে এমন জোরে আঘাত করেন যে হাতি পালিয়ে যায়। অতঃপর শত্রুরা শুজাত খানের পতাকাবাহীর দিকে আর একটি হাতি ধাবিত করে এবং হাতিটি পতাকাসহ তার ঘোড়াটি ফেলে দেয়, শুজাত খান চিৎকার করে বলেনঃ 'উঠ আমি জীবিত আছি'। শুজাতের সৈন্যরা তীর, ছোরা এবং তরবারি দ্বারা ঐ হাতিকেও কেটে ফেলে। পতাকাবাহী পতাকা তুলে ধরে এবং স্বস্থানে থেকে যায়। বাহরিস্তানের বিবরণে শুজাত খান ঘোড়া থেকে পড়ে যাননি, তাঁর সৈন্যরা তাঁকে ঘোড়ায় স্থির থাকতে সাহায্য করে। শুজাত খান বারবার চেষ্টা করেও হাতিকে ঘায়েল করতে পারেননি, তাঁর অনুচরেরাই হাতির পা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে, হাতির চালক এবং অন্য একজন আফগানকেও হত্যা করে। বাহরিস্তানে শুজাত খানের পতাকাবাহীর আক্রান্ত হওয়ার কথা নেই। উসমানের আহত হওয়া সম্পর্কে তুজুকে বলা হয় যে হাতির সঙ্গে শুজাত খানের যুদ্ধের সময় হঠাৎ একটি গোলা উসমানের কপালে

Edited by Ripon Sarkar

আঘাত করে; গোলা কে ছোঁড়েন, অনেক খুঁজাখুজি করেও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাহরিস্তানে এই সম্বন্ধে অন্য কথা আছে। এই সূত্রে ইফতিখার খান আহত হলে (প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়।) ইফতিখার খানের এক ভক্ত সৈন্য উসমানের প্রতি তীর ছুঁড়েন, সৈন্যের নাম শয়খ আবদুল জলীল; তীরটি উসমানের বাম চোখ ভেদ করে মস্তিষ্কে ঢুকে যায়। উসমান দুই হাতে সজোরে তীর বের করে আনলে তাঁর ডান চোখও বেরিয়ে আসে, তিনি অন্ধ হয়ে যান, তাঁর সৈন্যরা যাতে দেখতে না পায় সেজন্য তিনি রুমাল দিয়ে চোখ ঢেকে রাখেন। তিনি তাঁর মাহুতকে ইঙ্গিত আদেশ দেন তাঁর হাতি যেন শুজাত খানের দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে উসমানের ছেলে মুমরিজ পিতার মৃতদেহ নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যুদ্ধ করেন, মুমরিজের আদেশেই 'বখতা' হাতিটিকে মাঠে আনা হয় এবং 'বখতা' শুজাত খানকে আক্রমণ করে। উসমানের হাতিই শুজাত খানকে আক্রমণ করে এই কথাটা ঠিক, তবে উসমান তখন হাতির উপরে ছিলেন না, হাতিটিতে ছিলেন উসমানের ছেলে মুমরিজ। উসমানকে যে আগেই সরিয়ে রাখা হয় তা মোগলরা জানত না। উসমানের ঘাতককে খুঁজে পাওয়া যায় না কথাটা সত্য হতে পারে এই কারণে যে শয়খ আবদুল জলীল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন। তুজুকে আরও বলা হয় যে উসমান আহত হওয়ার পরেও দুই ঘন্টা যুদ্ধ করেন এবং পরে আফগানরা পালিয়ে যায়, কিন্তু বাহরিস্তানের বিবরণে তীরবিদ্ধ হওয়ার পরে উসমানের কোন ভূমিকা দেখা যায় না। তীর মস্তিষ্কে ঢুকে গেলে অবশ্য তাঁর বেশিক্ষণ বাঁচার কথা নয়। তুজুকের বিবরণে মনে হয় উসমান যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাননি, পরে শিবিরে গিয়ে মারা যান, বাহরিস্তান পাঠে মনে হয় উসমান প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মারা যান। অবশ্য একথা সত্য যে উসমান ঠিক কখন মারা যান, মোগলরা তা জানত না, যুদ্ধক্ষেত্রেই যে মারা যান সে খবর অবশ্যই তখন তারা জানতে পারেনি, পরে জানতে পেরেছে।

মাসির-উল-উমারায়[৬২]ও যুদ্ধের বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত, এটা তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে নেয়া, এই সূত্রে শুধু একটি নতুন কথা পাওয়া যায় এবং তা এই যে উসমান ছিলেন অত্যন্ত মোটা এবং তাঁর ভুঁড়ি ছিল বেশ বড়। রিয়াজ-উস-সলাতীনের[৬৩] বিবরণও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী থেকে নেয়া। রিয়াজে যুদ্ধের তারিখ দেয়া হয়েছে ১০২০ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে, রিয়াজে এই তারিখ তুজুক থেকে ভিন্ন, যদিও প্রকৃত তারিখ বা দিনের নাম নেই। তাছাড়া এই পুস্তকে শুজাত খানকে আক্রমণকারী হাতির নাম 'বাছা'। 'বাজা' নামে একটি হাতিও ছিল, 'বাজাকেই' 'বাছা বলা হয়েছে, অবশ্য 'বাজা' শুজাত খানকে আক্রমণ করেনি, আক্রমণ করেছিল 'বখতা'। রিয়াজে মোগল ডান বাহুর নেতার নাম কিশওর খান এবং বাম বাহুর নেতার নাম ইফতিখার খান কিন্তু তুজুক এবং বাহরিস্তানে ঠিক উল্টো। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরীতে শুজাত খানকে আক্রমণকারী হাতির নাম 'বখতা', অর্থাৎ এই কথাটি বাহরিস্তানের সঙ্গে মিলে যায়[৬৪]।

তুজুক-ই-জাহাংগীরী এবং বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণে কিছু গরমিল থাকলেও মোটামুটি বিবরণ একই। কিছু গরমিল থাকা স্বাভাবিক, কারণ প্রদেশ থেকে পাওয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তুজুকের বিবরণ লিখিত, হয়ত কিছু সংক্ষিপ্ত করেও লেখা হয়েছে। কিন্তু বাহরিস্তান এমন একজন লোক লিখেছেন, যিনি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন না, বরং যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নেন এবং মোগল অগ্রবর্তী দলের নেতা ছিলেন। বাহরিস্তান মৌলিক সূত্র, এই বিবরণ চাক্ষুষ, তুজুকের বিবরণ সুবাদারের মাধ্যমে

Edited by Ripon Sarkar

পাওয়া। মিরযা নাথন একজন মোগল সৈনিক হলেও তাঁর বিবরণ দেখে মনে হয় তিনি সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন, মোগলদের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে মনে হয় না, মোগল সৈনিকদের অহেতুক প্রশংসা বা নিজের প্রশংসা বা নিজের বীরত্বের কথা এই বিবরণে নেই। তিনি নিজে যে পর্যুদস্ত হয়েছেন সেকথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। মিরযা নাথনের বিবরণেই দেখা যায় যে আফগানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেও প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধে আফগানদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। মোগল বাহিনীর অগ্রবর্তী, অগ্রবর্তী রিজার্ভ, ডান, বাম সকল বাহুই পর্যুদস্ত হয়েছে। অগ্রবর্তী দল যুদ্ধের সূচনাতেই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে, এই বিভাগে শেষ পর্যন্তও শৃঙ্খলা ফিরে আসেনি। মিরযা নাথনের মতে মিরযা বেগ আয়মাকের ভুল সংবাদই বিশৃঙ্খলার কারণ, কিন্তু যা হোক সূচনাকালের এই বিশৃঙ্খলা শেষ পর্যন্ত থেকে যায় এবং অন্যান্য বাহুতেও সংক্রমিত হয়। অগ্রবর্তী দলের নেতা মিরযা নাথন অনেক বিপদের মাঝে একটি হাড় ভেঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকেন, কিন্তু প্রাণে রক্ষা পান। কিন্তু তাঁর দলের কয়েকজন সেনানায়ক নিহত ও আহত হন, একজন শয়খ আছাই স্বপক্ষের গোলার আঘাতে নিহত হন, অন্য দুজন সাবিত খান এবং মুস্তফা স্বপক্ষের গোলার ভয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। মাহমুদ খান লোদী, সৈয়দ হোসেনী এবং পীর মুহাম্মদ বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশ নেননি, সোনাগাজী যুদ্ধ না করে পলায়ন করেন। এই অগ্রবর্তী দলের অন্তত একজন, শয়খ ফরীদ দানা মধ্যম বাহুর সঙ্গে মিশে গিয়ে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করেন। মোগল ডান বাহুর নেতা ইফতিখার খান নিজে মৃত্যুবরণ করেন, তিনি নিজেই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে অগ্রসর হন, কিন্তু শত্রুর আঘাতে ঐ সকল সৈন্যসহ প্রাণ হারান। মোগল বাম বাহুর নেতা কিশওর খানও মৃত্যুবরণ করেন। তাছাড়া আরও কয়েকজন সেনানায়ক যেমন, শয়খ মাসুম, ঈসা, শয়খ মুমিন, শয়খ ইদ্রিস এবং শয়খ বায়েজীদ (এঁদের কেউ কেউ ইসলাম খানের এবং কেউ কেউ ওজাত খানের আত্মীয়) আহত বা নিহত হন। মোগল হাতিও আফগান হাতির সঙ্গে পেরে উঠেনি। অন্য পক্ষে আফগানদের মধ্যে কোন বাহুর নেতা নিহত হননি। আফগান ডান বাহুর নেতা শের ময়দান, বাম বাহুর নেতা খাজা ওয়ালী, অগ্রবর্তী দলের নেতা খাজা মালহী ও খাজা ইয়াকুব সকলেই অক্ষত থাকেন। অগ্রবর্তী দলের খাজা দাউদ (উসমানের ভাইপো) শয়খ বায়েজীদের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হলেও তাঁর আঘাত গুরুতর ছিল না, বরং বায়েজীদের আঘাত মারাত্মক হয়। আফগান বাহুর নেতাদের মধ্যে একমাত্র খাজা ওয়ালীর দুর্বলতা প্রকাশ পায় কিন্তু উসমান নিজে তাঁকে সাহায্য করায় তিনি অক্ষত থাকেন। আফগান ডান বাহুর নেতা শের ময়দান যেভাবে পুরো যুদ্ধক্ষেত্রে চষে বেড়ান এবং মোগল সেনানায়কদের হত্যা করেন তাতে তাঁকে প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি প্রশংসা করতে হয় খাজা উসমানের ছেলে মুমরিজকে, অল্প বয়স্ক (পরে দেখা যাবে তাঁকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয়েছে, তবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হোক বা না হোক বয়স বিশ বছরের বেশি হবে না) এই ছেলেটি যেভাবে পিতার মৃতদেহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে অবিচল চিত্তে যুদ্ধ করেন তার তুলনা পাওয়া যায় না। তিনি পিতার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন এবং হাতি নিয়ে যুদ্ধ করে শত্রুদের অনেক সৈন্য ও হাতিকে ধরাশায়ী করেন। আরও লক্ষণীয় যে যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় আফগানরাই সারা যুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয়, মোগলরা আত্মরক্ষা করতেই ব্যস্ত থাকে। আফগানরা মোগল পক্ষকে আক্রমণ করার কোন সুযোগই দেয়নি। মোগলদের কৃতিত্ব এই যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও তারা টিকে থাকে এবং পলায়ন করেনি। চতুর্দিকে জয়লাভ করেও আফগানদের পলায়নের কারণ উসমানের মৃত্যু।

Edited by Ripon Sarkar

আফগানরা যেভাবে যুদ্ধ করে সকল বাহুতে মোগলদের পর্যুদস্ত করে এবং নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে, তাতে তাদের পালাবার কথা নয়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস, তাদের নেতাকে তারা রক্ষা করতে পারেনি। মিরযা নাথন বলেন যে মোগলরা পর্যুদস্ত হয়েও রণে ভঙ্গ না দেয়াতে আফগানরা পলায়ন করে। এটা কোন কথা নয়। মনে হয় উসমানের মৃত্যু সংবাদ জানতে পেরে আফগানরা রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করে। উসমানের মৃত্যু সংবাদ অনেকক্ষণ গোপন রাখা হয়েছিল, কিন্তু কতক্ষণ আর গোপন রাখা যায়? মিরযা নাথন বলেন যে দু হাতে সজোরে তীর বের করার পরেই উসমান বাক—শক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং হাতির চালককে হাতের ইশারা করে হাতিকে শুজাত খানের বাহিনীর দিকে নিয়ে যেতে বলেন, অর্থাৎ ঐ সময়েই উসমানের দফা শেষ হয়ে যায়। জাহাঙ্গীর বলেন যে উসমান আহত হওয়ার পরেও দু ঘণ্টা তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। এর অর্থ এই হতে পারে যে উসমানের মৃত্যুর পরেও তাঁর সেনাপতিরা দু ঘণ্টা যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন, কিন্তু উসমানের মৃত্যু সংবাদ মোগল বা আফগান সৈন্যরা কেউ জানতে পারেনি। কিন্তু অনেকক্ষণ উসমানকে হাতির উপরে বা পতাকার নিচে না দেখে আফগান সৈন্যরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারে যে তাদের নেতার মৃত্যু হয়েছে। নেতার মৃত্যুতে তারা আর যুদ্ধ করার সাহস করেনি, পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ[৬৫] "এই যুদ্ধের সাক্ষী মির্জা সহনের (স্যার যদুনাথ নাথনের নামটি সঠিক পড়তে না পেরে সহন লিখেছেন) বিবরণ উপরে দেয়া গেল। তাহা হইতে স্পষ্টত দেখা যায় যে, অধিকাংশ মোগল সৈন্য অত্যন্ত কাপুরুষতা এবং তাহাদের সেনাপতিগণ অস্থিরতা, দূরদর্শিতা ও নেতৃত্ব শক্তির অভাব দেখাইয়াছিল। ফলত বাংলার বিখ্যাত হাতিগুলির সামনে কেহই দাঁড়াইতেই পারিল না। উসমান প্রথমে প্রকৃতই জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি এত শীঘ্র মারা না গেলে এখানে মুঘলদের এমন ভয়ঙ্কর পরাজয়, হত্যা ও লুণ্ঠন হইত যে আকবরের সময়ে মুঘলমারির যুদ্ধ[৬৬] ভিন্ন আর কাহারও সহিত তাহার তুলনা হইত না। কিন্তু নেতার অভাবে সব পন্ড হইল। মুঘলেরা টিকিয়া রহিল, আফগানেরা প্রথমে লব্ধ সুবিধাটি বাড়াইয়া তাহাদের বিতাড়িত করিতে পারিল না, এবং অবশেষে প্রভুর মৃত্যু জানিতে পারিয়া পলায়ন করিল। জাহাঙ্গীর আত্মচরিতে নিজ সৈন্য ও কর্মচারীদের দোষ স্বীকার করিয়াছেন।[৬৭] উসমান ৪০ বছর বয়সে রণক্ষেত্রে অতুল বীরত্বের সহিত প্রাণ বিসর্জন করেন—মরণাহত হইয়া ও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ করেন এবং নিজ দশা সৈন্যদিগের নিকট হইতে গোপন রাখেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও অনেকক্ষণ তাঁহার শব লইয়া হাতি রণ ব্যূহে দণ্ডায়মান থাকে।"[৬৮]

দৌলম্বপুর যুদ্ধের তারিখ

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে দৌলম্বপুর যুদ্ধের তারিখ ৯ই মহরম, ১০২১ হিজরী, ১২ই মার্চ, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ[৬৯] রবিবার। রিয়াজ-উস-সলাতীনে সঠিক তারিখ দেয়া হয়নি, তবে বলা হয়েছে যে ১০২০ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষদিকে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৭০] স্যার যদুনাথ সরকার এক স্থানে বলেছেন ২রা মার্চ, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে এবং অন্যস্থানে বলেছেন, ৯ই মহরম।[৭১] ৯ই মহরম যেহেতু ঠিক আছে, ২রা মার্চ হয় তাঁর হিসাবের ভুল বা ছাপার ভুলে ১২ই মার্চের স্থলে ২রা মার্চ হয়েছে। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য[৭২] বলেছেন ১২ই মার্চ, ১৬১২ রবিবার অর্থাৎ এঁরা উভয়েই তুজুকের তারিখ গ্রহণ করেছেন। বাহরিস্তানে কোন তারিখ নেই, কিন্তু যুদ্ধের বিবরণে এমন কিছু তথ্য আছে যাদ্বারা সঠিক তারিখ

Edited by Ripon Sarkar

নিরূপণ করা যায় এবং এই তারিখ তুজুকের তারিখ থেকে ভিন্ন। প্রথমত, যুদ্ধ শেষে যখন মোগল শ্রান্ত ক্লান্ত সৈন্যরা শিবিরে ফিরে গেছে এবং আফগানরাও তাদের শিবিরে গেছে, তখন বাকি সারাদিন উভয়পক্ষ নিজ নিজ শিবির থেকে গোলা নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে। এই কথা উল্লেখ করে মিরযা নাথন বলেনঃ "সূর্য অস্ত গেলে পৃথিবীর লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই মহররমের চাঁদ দেখে এবং (মোগল সৈন্যরা) একে অন্যকে অভিবাদন জানায়।"[৭৩] এই চাঁদ মহররমের নতুন চাঁদ, মহরম আশুরার মাস এবং পবিত্র মাস। পবিত্র মাসগুলির নতুন চাঁদ দেখলে একে অন্যকে অভিবাদন জানায়। ধর্মপরায়ণ মুসলমানেরা প্রতি মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং মাসের তারিখের হিসেব রাখে, কারণ প্রায় প্রত্যেক মাসে কিছু অতিরিক্ত করণীয় ধর্মীয় কাজ থাকে। এগুলি অবশ্য করণীয় নয়, তবে পূণ্য লাভের আশায় কেউ কেউ করে থাকেন। কিছু কিছু উৎসব, যেমন, ঈদ-উল-আযহা, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী এবং শবেবরাত যথাক্রমে মাসের দশ, বার এবং চৌদ্দ তারিখে উদযাপিত হয়। কিন্তু মুসলমানেরা সঠিক তারিখ নির্ধারণের জন্য এই সকল মাসের নতুন চাঁদ দেখার চেষ্টা করে, কারণ নতুন চাঁদ দেখার হিসেবেই এই উৎসবগুলি পালন করা হয়। মহরম মাসের প্রথম দশ দিনই পবিত্র কিন্তু দশই মহরম, আশুরা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং মহরমের চাঁদ দেখার কথা বলে মিরযা নাথন নতুন চাঁদ দেখার কথা বলেছেন। স্যার যদুনাথ একে নবমীর চাঁদ বলেছেন, তিনি অবশ্য তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীর তারিখ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ খাজা উসমানের মন্ত্রী ওয়ালী মণ্ডু খেল যুদ্ধের পরে উসমানের ছোট ছেলে খাজা ইয়াকুবকে সঙ্গে নিয়ে এসে শুজাত খানের নিকট আত্মসমর্পণের প্রস্তাব করে বলেনঃ[৭৪] "শোকের সময় না হলে আমি খাজা ইয়াকুবকে নিয়ে প্রথম দিনেই আপনার নিকট আসতাম। দশই মহরম এবং উসমানের শোক দিবস সামনে, চারদিন ইতোমধ্যেই গত হয়েছে ছয়দিন বাকি আছে। সুতরাং (আজ থেকে) সপ্তম দিনে শোক দিবস পালন শেষে (আফগানদের) উচ্চ নিচ সকলেই আত্মসমর্পণের জন্য উপস্থিত হবে।" তৃতীয়ত শুজাত খান আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেলে আফগানদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়, এবং আরও পরে আফগানদের সমর্পণকৃত হাতি নিয়ে মোগল ফৌজদার শুজাত খানের নিকট আসেন, ঐদিনই যুদ্ধের কথা, উসমানের মৃত্যু এবং আফগানদের আত্মসমর্পণের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শুজাত খান সুবাদার ইসলাম খানের নিকট রিপোর্ট পাঠান। এ কথা উল্লেখ করে মিরযা নাথন বলেনঃ "যদিও এই দিনটি ছিল মহরমের দশ তারিখ, বিজয় উৎসব পালন এবং সম্রাটের শুভ কামনা করে অনেক আমোদ-প্রমোদ করা হয়।" চতুর্থত উসমানের ভাই এবং ছেলেদের আত্মসর্মপণের কথা বলে নাথন বলেন, ঐদিন ছিল মহরম মাসের এগার তারিখ।[৭৫] এখানে কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়, ১ম, উসমানের শোক দিবস (মৃত্যুর দশম দিন) এবং আশুরা (১০ই মহরম) একই দিন।[৭৬] ২য়, উসমানের মৃত্যুর এবং মহরম মাসের চারদিন গত হয়েছে আরও ছয় দিন বাকি আছে। যুদ্ধের তারিখ যদি ৯ই মহরম হয়, চারদিন গত হলে ১৩ই মহরম হয়, অথচ ওয়ালী মণ্ডু খেল বলেছেন যে দশই মহরমের আরও ছয় দিন বাকি। ৩য়, যুদ্ধের পরে, আফগানদের আত্মসমর্পণের পরে, আফগান হাতিগুলি সেনাপতি শুজাত খানের হস্তগত হওয়ার পরে, শুজাত খান কর্তৃক ইসলাম খানের নিকট বার্তা পাঠাবার দিনটি ছিল ১০ই মহরম। ৪র্থ, উসমানের ভাই, ছেলে এবং অন্যান্য সেনানায়কেরা এগারই মহরম আত্মসমর্পণ করেন। অতএব

Edited by Ripon Sarkar

নিশ্চয় বলা যায় যে যুদ্ধের শেষে সন্ধ্যায় যেহেতু মহররমের নতুন চাঁদ দেখা গেছে, যুদ্ধের দিন ছিল পূর্ববর্তী অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের শেষ দিন এবং বছর ১০২০ হিজরী। রিয়াজ-উস-সলাতীনে যুদ্ধের তারিখ "১০২০ হিজরীর জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকে" বলা হয়েছে, যদিও সঠিক তারিখের উল্লেখ নেই। রিয়াজ অনেক পরবর্তীকালে লিখিত, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রিয়াজের লেখক সঠিক বছর এবং মাস দিতে সমর্থ হন। এতে বুঝা যায় যে রিয়াজের লেখক তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী ছাড়াও আর একটি সূত্র ব্যবহার করেছেন, দুর্ভাগ্যবশত এই সূত্রটি এখন হারিয়ে গেছে। যা হোক হিসেব করে দেখা গেছে যে ১০২০ হিজরীর জিলহজ্জ মাস ছিল উনত্রিশ দিনের এবং ঐ দিনটি ছিল রবিবার, অন্যদিকে ১০২১ হিজরীর ৯ই মহররম ছিল মঙ্গলবার। তুজুকে যুদ্ধের দিন বলা হয়েছে রবিবার, বাহরিস্তানে যুদ্ধের দিনের স্পষ্ট উল্লেখ নেই, তবে বাহরিস্তানের বিবরণ পরীক্ষা করলে রবিবার পাওয়া যায়। বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে যুদ্ধের আগে শুজাত খানের দূত শিহাব খান লোদী উসমানের নিকট গেলে পরের দিন রবিবার হওয়ায় উসমান উত্তর দিতে বিরত থাকেন। দূত ফিরে এসে শুজাত খানকে বলেন যে উসমান মাথা নত করতে প্রস্তুত নন, যুদ্ধই তাঁর কাম্য। শুজাত খান সঙ্গে সঙ্গে সকলকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আদেশ দেন এবং পরের দিন, অর্থাৎ রবিবার ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। অতএব, দৌলম্বপুর যুদ্ধের তারিখ ২৯শে জিলহজ্জ ১০২০ হিজরী মুতাবেক ৩রা মার্চ ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ রবিবার।

দৌলম্বপুর যুদ্ধ, খাজা উসমানের মৃত্যু, খাজা ওয়ালীর আত্মসমর্পণ এবং উসমানের হাতিগুলি মোগল সেনাপতি শুজাত খানের নিকট হস্তান্তর সম্পর্কিত সুবাদার ইসলাম খানের রিপোর্ট ২৯শে মহররম তারিখে সম্রাটের হস্তগত হয়।[৭৭] বাহরিস্তানে দেখা যায় যে যুদ্ধের দশ দিন পরে শুজাত খান ইসলাম খানের নিকট রিপোর্ট পাঠান এবং ইসলাম খান ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতেই সম্রাটের নিকট তাঁর নিজস্ব রিপোর্ট পাঠান। তুজুকে যেহেতু ওয়ালীর আত্মসমর্পণ এবং হাতি হস্তান্তরসহ সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, সেহেতু যুদ্ধের পরে সন্ধি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার এবং শত্রুদের আত্মসমর্পণের পরেই ঐ রিপোর্ট প্রেরিত হয় এবং যুদ্ধের দিন থেকে রিপোর্ট পাঠান পর্যন্ত অবশ্যই দশ দিন সময় লাগার কথা। যুদ্ধের তারিখ যদি ৯ই মহররম হয়, তাহলে এই হিসেবে শুজাত খানের রিপোর্ট পাঠাবার তারিখ ১৯শে মহররম এবং ইসলাম খান কর্তৃক সম্রাটের নিকট রিপোর্ট পাঠানো আরও দু তিন দিন পিছিয়ে যায়। দৌলম্বপুরের কয়েক মাইল (প্রায় ত্রিশ মাইল) দূরত্বে অবস্থিত শুজাত খানের শিবির থেকে ঢাকার দূরত্বও কম নয়। তাই ইসলাম খান একুশ বাইশ তারিখের পূর্বে সম্রাটের নিকট তাঁর রিপোর্ট পাঠাতে পারেননি। মাত্র সাত দিনের মধ্যে ঢাকা থেকে আগ্রায় রিপোর্ট পৌঁছান কি সম্ভব? তখন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মাধ্যমে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; যুদ্ধের মত বিশেষ সংবাদ দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। তা সত্ত্বেও মাত্র সাত দিনের মধ্যে ঢাকা থেকে আগ্রায় সংবাদ পাওয়া অসম্ভব না হলেও সম্ভাবনা কম। অপর পক্ষে মির্জা নাথনের সাক্ষ্য মতে শুজাত খান দশই মহররম ইসলাম খানের নিকট রিপোর্ট পাঠান এবং ইসলাম খান বার তের তারিখের মধ্যে সম্রাটের নিকট রিপোর্ট পাঠালে পক্ষকালের মধ্যে রিপোর্ট সম্রাটের হস্তগত হওয়া অসম্ভব নয়। তুজুকে যুদ্ধের তারিখ ৯ই মহররম হওয়ার কারণ অনুমান করা চলে। মির্জা নাথনের মতে দশই মহররম শুজাত খান সুবাদারের নিকট রিপোর্ট পাঠান এবং সুবাদার অবশ্যই ঐ তারিখের রিপোর্টের বরাত দিয়ে নিজের প্রেরিত রিপোর্ট লিখেন। সম্রাট দশই মহররমের রিপোর্টের

Edited by Ripon Sarkar

বরাত দেখে হয়ত মনে করেন যে তার আগের দিন, ৯ই মহররমে যুদ্ধ হয়, অথবা সুবাদারের রিপোর্ট সংকলন করে লেখার সময় সম্রাটের ভুল হয়ে যায়। মিরযা নাথন যুদ্ধের তারিখ দিলে তাঁর ভুল হওয়ার কথা চিন্তা করা যেত, সন তারিখ লিখতে ভুল হতে পারে। কিন্তু মিরযা নাথন তারিখ দেননি, বরং তাঁর বিবরণ ব্যাখ্যা করে ২৯শে জিলহজ্জ তারিখটি পাওয়া যায়। মহররম মাসের চাঁদ দেখা, ওয়ালী মন্ডু খেল কর্তৃক আশুরার ছয় দিন বাকি থাকা বলার কথা, এবং দশই মহররম হওয়া সত্ত্বেও আমোদ-প্রমোদ করার কথা, ইত্যাদি সত্য না হওয়ার কোন কারণ নেই। মিরযা নাথন ছিলেন শিয়া, তাঁর কাছে দশই মহররম শোকের দিন, তাই তিনি আমোদ-প্রমোদের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে স্পষ্ট তারিখ পেয়ে তাঁরা নাথনের বক্তব্যগুলির দিকে নজর দেননি।

আফগানদের আত্মসমর্পণ

আগেই বলা হয়েছে যে উভয় পক্ষের সৈন্যরা শিবিরে ফিরে গিয়েও গোলাগুলি অব্যাহত রাখে। মোগল পক্ষে ইহতিমাম খানের কামানের গোলা এত সুন্দরভাবে লক্ষ্যভেদ করে যে শত্রুদের দুটি হাতি গোলার আঘাতে মারা যায়। গোলা বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহ, বিশেষ করে সেনানায়কদের (সরদার) মৃতদেহ তালাশ করা হয়। মিরযা নাথন স্পষ্টভাবে বলেন যে কত লোক যুদ্ধে মারা পড়েছে, এবং কত হাতির পায়ের নিচে নিহত হয়েছে তার হিসেব পাওয়া যায় না। ইফতিখার খানের লাশ পাওয়া যায়। কিন্তু মোগলরা তখনও জানে না যে উসমানের মৃত্যু হয়েছে। সন্ধ্যার সময় দিওয়ান মুতাকিদ খান প্রস্তাব করেন যে শত্রুদের সম্ভাব্য নৈশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশে শিবিরের চতুর্দিকে দুর্গ প্রাকার নির্মাণ করা হোক এবং পরিখা খনন করা হোক। তিনি বিশেষ করে মীর বহর ইহতিমাম খান ও জমিদার সোনাগাজীকে এই দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব দেন। শুজাত খান বলেন, অবস্থা এমন হয়েছে যে অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যদের একত্র করা যাচ্ছে না, এই অবস্থায় মাল্লা বা শ্রমিক কোথায় পাওয়া যাবে যে দুর্গ নির্মাণ বা পরিখা খনন করা হবে? (শুজাত খানের এই কথায় মোগল বাহিনীর দুরবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, যুদ্ধে যে প্রকৃতপক্ষে তাদেরই পরাজয় হয়েছে, এতে তারও সমর্থন মিলে।) এখন অদৃষ্ট এবং সৈন্যদের সাহস আমাদের শ্রেষ্ঠ নিরাপত্তা। তিনি সৈন্যদের চতুর্দিকে অবস্থান নিয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন। সৈন্যবাহিনীর বখশী মিরযা কাসিম এর তদারক করেন। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি আড়াই প্রহর পর্যন্ত সৈন্যরা প্রহরায় থাকে, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত উভয় পক্ষে গোলাগুলীও চলে। রাত্রি দেড় প্রহর বাকি থাকতে আফগান শিবিরে গোলমাল শুনা যায়। খাজা মুমরিজ, খাজা মালহী, খাজা ইবরাহীম, খাজা দাউদ এবং উসমানের মন্ত্রী ওয়ালী মণ্ডু খেল পরামর্শ করে স্থির করেন যে উসমানের মৃতদেহ উহর-এ নিয়ে যাওয়া হবে, উসমানের স্ত্রী-কন্যাদের হত্যা করা হবে এবং উসমানের ছেলে খাজা মুমরিজের নেতৃত্বে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করবেন। আফগানরা তাদের সকল আহত ঘোড়া এবং হাতি অন্যত্র সরিয়ে ফেলে, সকল মৃত হাতি এবং মোগল হাতি রূপ সিঙ্গারের দাঁত কেটে নেয় এবং সকল সৈন্য নিয়ে উহর-এর দিকে যাত্রা করে। উসমানের মৃতদেহও উহর-এ নিয়ে যাওয়া হয়।[৮]

Edited by Ripon Sarkar

মোগল শিবিরে যারা শত্রুদের প্রতি গোলা বর্ষণে নিযুক্ত ছিল, তারা রাত এক ঘণ্টা বাকি থাকতে সংবাদ সংগ্রহের জন্য শত্রু শিবিরে যায় কিন্তু দেখে যে শিবির শূন্য। তারা কিছু শিরস্ত্রাণ ও পতাকার ছিন্ন অংশ, মৃত ঘোড়ার জিন, এবং মৃত সৈন্যের তরবারি এনে সেনাপতিকে এই সংবাদ দেয়। উসমানের পলায়নের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়, কিন্তু উসমান কি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, তা তখনও মোগল শিবিরে কেউ জানত না। মোগল শিবিরে জয় বাদ্য বেজে উঠে, সকলে সেনাপতি শুজাত খানকে অভিনন্দন জানায় এবং বিনিময়ে শুজাত খানও সকলকে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য ধন্যবাদ জানান। কিন্তু যেহেতু শুজাত খান, মুতাকিদ খান ও ইহতিমাম খান ছাড়া কোন বড় সেনানায়ক (সরদার) জীবিত ছিলেন না, সকল দায়িত্ব এই তিনজনের উপর বর্তায়। (এতেও মোগল সৈন্যবাহিনীর পরাজয় ও দুরবস্থার কথা বুঝা যায়।) সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এ সময় ইসলাম খান কর্তৃক প্রেরিত অতিরিক্ত এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য শয়খ আবদুস সালামের নেতৃত্বে এসে পৌঁছে। ফলে মোগল বাহিনীর উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং শুজাত খান সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের শত্রুদের পেছনে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। পাঁচ ক্রোশ যাওয়ার পরে রাত্রি হলে তারা যাত্রা বিরতি করে, দুর্গ তৈরি করা হয় এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়। এভাবে তিন মঞ্জিল অতিক্রম করার পরে (প্রায় ত্রিশ মাইল যাওয়ার পরে) উসমানের ছেলে খাজা ইয়াকুবসহ উসমানের মন্ত্রী ওয়ালী মণ্ডু খেল আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে শুজাত খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ওয়ালী মণ্ডু খেল উসমানের মৃত্যু সংবাদ দেন এবং এই প্রথম (যুদ্ধের পরে চতুর্থ দিনে) মোগলরা উসমানের মৃত্যু সংবাদ পান।[৭৯]

আফগান শিবিরে তখন অন্তর্বিরোধ চলছে। উসমানের ছেলে, ভাই এবং আফগান সৈন্যরা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উহর পৌঁছে। উসমানের এক কন্যা তাঁর ভাইপো দাউদের বাগদত্তা ছিল, তাকে দাউদের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। উসমানের বাকি সকল কন্যা এবং স্ত্রীদের হত্যা করা হয়। উসমানের বাংলো ঘরের আঙ্গিনায় উসমানের একটি নকল কবর তৈরি করা হয় এবং ঐ কবরের চতুর্দিকে নিহত মহিলাদের লাশ কবরস্থ করা হয়। উসমানের মৃতদেহ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে অতি গোপনে দাফন করা হয়, যাতে কেউ এর ঠিকানা না জানতে পারে এবং মোগলরা কবর থেকে লাশ তুলে উসমানের মাথা কেটে সম্রাটের নিকট না পাঠাতে পারে। অতঃপর উসমানের পাগড়ী এবং তরবারি উসমানের ছেলে মুমরিজকে দিয়ে সকলে তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখায় এবং আবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা করে। উসমানের ভাই ওয়ালী ছিলেন মন্ত্রী ওয়ালী মণ্ডু খেলের জামাতা। ওয়ালী মণ্ডু খেল চিন্তা করে যে মুমরিজের মত একটি শিশুকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া উচিত নয়। উসমানের ভাই খাজা ওয়ালী মুমরিজের নিকট নিম্নরূপ সংবাদ পাঠান : 'তুমি এখনও অপ্রাপ্ত বয়স্ক, মোগলরা আমাদের পরাজিত করেছে, আফগান বাহিনীতে হতাশা, এমতাবস্থায় তোমার বাবার পাগড়ী ও তরবারি আমার কাছে পাঠাও (অর্থাৎ নেতৃত্ব আমার হাতে ছেড়ে দাও), কয়েকদিনের মধ্যে তুমি এর ফল দেখতে পাবে। তুমি আমার ছেলের মত, তোমার পিতা তোমার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, আমি তার দশগুণ যত্ন নেব।' খাজা মুমরিজ মনে মনে চিন্তা করেনঃ 'আমি যদি বাধা দেই, গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং আমাদের বংশে বিনাশ হবে। আমি কেন শত্রুদের বলার সুযোগ দিব যে খাজা মুমরিজই আফগানদের পতনের জন্য দায়ী এবং আমি কেন দুর্নামের ভাগী হব।' এই চিন্তা করে খাজা মুমরিজ খাজা ওয়ালীর নিকট উত্তর পাঠানঃ

Edited by Ripon Sarkar

'খাজা উসমান যেদিন শহীদ হন, সেদিনই আমি বুঝেছি যে এই রাজ্য এবং রাজত্ব শেষ হয়েছে। এর প্রতি আমার লোভ ছিল না, কিন্তু আপনারাই আমাকে পাগড়ী এবং তরবারি নিতে বাধ্য করেছেন। এখন যিনি পাগড়ী এবং তরবারি নিতে চান, তিনি এগুলি নিয়ে খুশি হতে পারেন।' খাজা ওয়ালী পাগড়ী এবং তরবারি নিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে খাজা মালহী এই সংবাদ শুনে ফকিরের বেশ নেন এবং তরবারি ফেলে দেন। খাজা ওয়ালী তাঁকে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা না করে খাজা মালহীকে শৃঙ্খলিত করে স্বীয় ঘরে বন্দী করে রাখেন। আফগান সেনানায়কদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া শুভ হয়নি। তারা বলাবলি করতে থাকেন যে খাজা ওয়ালীর স্বেচ্ছাচারিতা আফগানদের ধ্বংস করবে এবং তারা সাফ জবাব দেয় যে এই পরিবর্তনে (মুমরিজের বদলে ওয়ালীর নেতা হওয়া) তাদের সম্মতি ছিল না।[৮০]

উপরে খাজা মুমরিজকে একবার শিশু এবং একবার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলা হয়েছে। কিন্তু উসমান আহত হওয়ার পরে (বা নিহত হলে) উসমানের দেহ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে মুমরিজ যেভাবে যুদ্ধ করেন, কিংবা খাজা ওয়ালীকে উত্তর দিতে গিয়ে মুমরিজ যেরূপ বিবেচকের এবং বুদ্ধিমানের পরিচয় দেন, তাতে তাঁকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন বলে মনে হয় না, শিশুত নয়ই। ক্ষমতার লোভে মন্ত্রী ওয়ালী মণ্ডু খেল মুমরিজকে শিশু এবং খাজা ওয়ালী তাঁকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলেছেন। অবশ্য অপ্রাপ্ত বয়স্ক না হলেও মুমরিজ অল্প বয়স্ক ছিলেন, খাজা উসমান একচল্লিশ বছর বয়ঃক্রম কালে নিহত হন, মুমরিজ তাঁর জ্যেষ্ঠ ছেলে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ সন্তান কিনা বলা যায় না, যে কোনভাবে বিচার করলে মুমরিজের বয়স বিশ বছরের বেশি ছিল বলে মনে হয় না।

খাজা ওয়ালীর নেতৃত্বের মোহ এবং তাঁর শ্বশুর ওয়ালী মণ্ডু খেলের দুর্বুদ্ধি আফগানদের পতন ত্বরান্বিত করে। নেতৃত্বের প্রতি লোভ থাকলেও খাজা ওয়ালীর সৈনিক হিসেবে সুখ্যাতি ছিল না; অন্তত গত যুদ্ধে তিনি তেমন কোন প্রমাণ দিতে পারেননি। কিন্তু যুদ্ধে তুপিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করে এসে তিনি মোগলদের জয়ের পথ সুগম করে দেন। তিনি সাহসের সঙ্গে বাধা দিলে মোগলরা শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের উপরস্থ তুপিয়া দুর্গ জয় করতে সক্ষম হলেও তাদের বেশ বেগ পেতে হত। তিনি দু একদিন মোগলদের ঠেকাতে পারলে আফগানদের প্রধান বাহিনী এসে হয়ত মোগলদের হটিয়েও দিতে পারত। এখানে মোগলদের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যুদ্ধ করতে হত, কারণ আফগান অবস্থান ছিল পাহাড়ের উপরে এবং মোগল অবস্থান ছিল পাহাড়ের পাদদেশে। দৌলম্বপুরের যুদ্ধেও খাজা ওয়ালী প্রায় হেরে যাচ্ছিলেন; খাজা উসমান সময়মত তাঁর সাহায্যার্থে অগ্রসর না হলে তিনি পিছু হটতেন এবং আফগানদের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতেন। খাজা ওয়ালীর দূরদর্শিতারও অভাব ছিল, তিনি আফগান সেনানায়কদের অসন্তোষ দূর করে পুনঃ একত্রিত হয়ে যুদ্ধের চেষ্টা না করে মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তিনি হয়ত ভাবেন যে আত্মসমর্পণ করলে মোগলরা তাঁর প্রতি উদার ব্যবহার করবে। যা হোক, খাজা ওয়ালী তাঁর শ্বশুর ওয়ালী মণ্ডু খেলকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে শুজাত খানের নিকট পাঠান। ওয়ালী মণ্ডু উসমানের কনিষ্ঠ পুত্র খাজা ইয়াকুবকে সঙ্গে নিয়ে শুজাত খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ঐদিন ছিল মহরম মাসের চার তারিখ এবং মোগল বাহিনী ইতোমধ্যে তিন মঞ্জিল পথ (প্রায় ত্রিশ মাইল) অতিক্রম করেছে। ওয়ালী মণ্ডু খেল উসমানের মৃত্যু সংবাদ দেন এবং বলেন যে তিনি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব নিয়ে প্রথম দিনেই আসতেন কিন্তু উসমানের শোক এবং মহররমের শোকের জন্য আসতে পারেননি। তিনি

Edited by Ripon Sarkar

আরও বলেন যে দশই মহররমের পরে, অর্থাৎ মহররমের শোক ও উসমানের শোক পালন হলে (সাক্ষাতের দিন থেকে সপ্তম দিনে, অর্থাৎ এগারই মহররম) আফগানদের উচ্চ নীচ সকলে আত্মসমর্পণ করতে আসবে। শুজাত খান তাদের এক সপ্তাহ সময় দিতে এই শর্তে রাজি হন যে আফগানরা তাদের সকল হাতি দু দিনের মধ্যে হস্তান্তর করবে। তুজুক, মাসির উল-উমারা এবং রিয়াজ-উস-সলাতীনে বলা হয়েছে যে খাজা ওয়ালী-উনপঞ্চাশটি হাতি হস্তান্তর করেন। স্টুয়ার্ট বলেন যে ৪৯টি হাতি এবং মণিমুক্তা খাজা ওয়ালী শুজাত খানকে দেন। এই সংখ্যা কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলা যায় না। কারণ আমরা আগে দেখেছি যে যুদ্ধের সময় উসমানের একশ চল্লিশটি হাতি ছিল। যুদ্ধে কয়েকটি মারা যায় এবং শুজাত খান খাজা ওয়ালীকে পঁচিশটি রাখার অনুমতি দেন। তাই মনে হয় হস্তান্তরকৃত হাতির সংখ্যা আরও বেশি হবে। ওয়ালী মণ্ডু খেল এই শর্তে রাজি হলে শুজাত খান খাজা ওয়ালীকে পঁচিশটি মাদী হাতি তাঁর নিজের এবং তাঁর ভাই, ভাইপো এবং পরিবারের ব্যবহারের জন্য রাখার অনুমতি দেন। শুজাত খান খাজা ইয়াকুবকে সম্মানসূচক পোশাক এবং ওয়ালী মণ্ডুকে একখানি শাল উপহার দেন। শর্ত গ্রহণ করে ওয়ালী মণ্ডু ও ইয়াকুব ফিরে যান, শুজাত খান একজন ফৌজদারকে শর্তমত হাতিগুলি নিয়ে আসার জন্য তাঁদের সঙ্গে পাঠান। পরের দিন সকালে মোগল বাহিনী আবার যাত্রা করে আইনিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন।[৮১]

ইতোমধ্যে খাজা শিরো নামক একজন আফগান সেনানায়ক খাজা ওয়ালীর প্রতি বিরক্ত হয়ে নিজে এসে শুজাত খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি সম্রাটের জন্য একটি হাতির বাচ্চা উপহার দেন। শুজাত খান খাজা শিরোকে মোগল বাহিনীতে ভর্তি করেন। খাজা শিরো অবশ্যই চালাক লোক, আগে এসে হাতির বাচ্চা উপহার দিয়ে নিজের জন্য এই সুবিধাটুকু আদায় করে নেন; খাজা ওয়ালী এবং অন্যান্যদের সঙ্গে এলে তাঁর অবস্থাও অন্যদের মত হত। ঐ একই দিনে উসমানের হাতি হস্তান্তর করা হয়। অতঃপর শুজাত খান খাজা শিরোর উপস্থিতি, উসমানের মৃত্যু, খাজা ওয়ালীর আত্মসমর্পণের প্রস্তাব এবং হাতি হস্তান্তর সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে ইসলাম খানের নিকট পাঠান। ঐ দিন ছিল দশই মহররম, মোগল বাহিনী বিজয় উল্লাস করে এবং সম্রাটের শুভ কামনা করে আমোদ প্রমোদ করে। পরের দিন, অর্থাৎ এগারই মহররম খাজা ওয়ালী, খাজা মুমরিজ, খাজা মালহী, খাজা ইবরাহীম, খাজা ইয়াকুব, খাজা দাউদ (অর্থাৎ উসমানের ভাই ও ছেলেরা) এবং সেনানায়কেরা মিলে মোট চারশ জন আফগান তাঁদের মর্যাদা মত এসে শুজাত খান ও অন্যান্য মোগল কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। আফগান বিখ্যাত সেনানায়কদের যাদের নাম পাওয়া যায় তারা হচ্ছেন, ওয়ালী মণ্ডু খেল, আসদ খান, মান বখত, ঈসা খান উসতরানী, পাহার খান লোহানী, সৈয়দ খান সূর, শাহবাজ খান বুরা খেল, জালাল খান শিরওয়ানী, নাসির খান, দরিয়া খান পতনী, মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ইলাহাদাদ ভগওয়ান এবং বাজু-ই-ঝিলাম। শের ময়দান যিনি দৌলম্বপুরের যুদ্ধে আফগান ডান বাহুর নেতৃত্বে ছিলেন এবং যিনি অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাঁর নাম এ তালিকায় নেই; অবশ্য তিনিও বন্দী হয়ে ঢাকায় নীত হন (পরে দ্রষ্টব্য)। আফগানরা শুজাত খানকে অভিবাদন করেন এবং শুজাত খান তাদের প্রত্যেককে সান্ত্বনা দেন এবং পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দেন। খাজা উসমানের ছেলে, ভাই এবং ভাইপোর প্রত্যেককে সম্মানসূচক পোশাক, উচ্চ মর্যাদার

Edited by Ripon Sarkar

সেনানায়কদের প্রত্যেককে এক জোড়া শাল এবং অন্যান্যদের একখানি করে শাল উপহার দেয়া হয়।[৮২]

শুজাত খান এখন ঢাকার দিকে ফিরতি যাত্রা শুরু করেন। যাওয়ার আগে আফগানদের জন্য ভোজের এবং নাচ গানের ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর শুজাত খান আফগানদের নিয়ে যাত্রা শুরু করেন এবং প্রত্যেক দিনের গমনের খবরাখবর ইসলাম খানকে জানাতে থাকেন। যাওয়ার আগে উসমানের রাজ্য শাসনেরও ব্যবস্থা নিতে হয়; মিরযা আবদুল করিমকে (তিনি শয়খ আবদুস সালামের সঙ্গে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে দৌলম্বপুর যুদ্ধের পরের দিন মোগল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন) পাঁচশ অশ্বারোহী এবং এক হাজার বন্দুকধারী বাহিনীসহ উহর-এ থেকে শাসন পরিচালনার নির্দেশ দেয়া হয়। মোগল বাহিনী সরাইলে পৌঁছে নৌবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয় (স্মরণ থাকতে পারে নৌ-বাহিনীকে সরাইলে রেখে যাওয়া হয়)। সরাইলে মীর বহর ইহতিমাম খানের মৃত্যু হয়।[৮৩] শুজাত খান এবং অন্যান্যরা পিতার মৃত্যুতে মিরযা নাথনকে সান্ত্বনা দেন। মেঘনা নদীর তীরে পৌঁছলে শুজাত খান উসমানের ভাই, ছেলে, ভাইপো এবং বাছা বাছা কয়েকজন আফগান সেনানায়ক সঙ্গে নিয়ে স্থলপথে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন, এবং মিরযা নাথনকে অন্যান্য আফগানদের সঙ্গে নিয়ে জলপথে আসার আদেশ দেন। শুজাত খান মেঘনা থেকে চারদিনে ঢাকা পৌঁছেন এবং ৭ই সফর ১০২১ হিজরী বা ৯ই এপ্রিল ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে রাত্রি পাঁচ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলে তিনি ইসলাম খানের বাসভবনে আসেন।[৮৪] ইসলাম খান তৈরি ছিলেন, তিনি এই উপলক্ষে ঝারোকার[৮৫] চতুর্দিকে সাজাবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সাড়ম্বরে ঝারোকায় আসন গ্রহণ করেন। আসনটি এমনভাবে তৈরি হয় যাতে উসমানের ভাই এবং ছেলেরা তাঁকে দেখতে না পায়। শুজাত খান এতে বিরক্ত হয়ে স্বীয় বাসভবনে ফিরে যেতে উদ্যত হন কিন্তু ইসলাম খানের দিওয়ান শয়খ ভীকন তাঁকে ঝারোকার আঙ্গিনায় নিয়ে আসেন। ইসলাম খান শুজাত খানকে দেখে তাঁর অর্ধেক শরীর ঝুঁকিয়ে তাঁকে (শুজাত খানকে) অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁকে মঞ্চে আসবার অনুরোধ করেন। শুজাত খান এবং মুতাকিদ খান (দিওয়ান) মঞ্চের উপরে আসন নেন, অন্যান্য মোগল সেনানায়কেরা এবং আফগানরা নিচে দাঁড়িয়ে থাকে। উসমানের ভাই মালহী অবসন্ন হয়ে মূর্ছা যান। ইসলাম খান প্রথমে মোগলদের এবং পরে আফগানদের মর্যাদা অনুসারে বাগানে আসার অনুমতি দেন। সকলে বাগানে গেলে, ইসলাম খান, শুজাত খান এবং মুতাকিদ খানও বাগানে আসেন। যারা এতক্ষণ দাঁড়ান ছিল তাদের বসার অনুমতি দেয়া হয়। উসমানের ভাই এবং ছেলেদের সম্মানসূচক পোশাক দেয়া হয় এবং অন্যান্য আফগানদের এক জোড়া করে শাল দেয়া হয়। অতঃপর ইসলাম খান খাজা ওয়ালী, খাজা মুমরিজ এবং অন্যান্যদের বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের অধীনে ন্যস্ত করার (নজরবন্দী করার) আদেশ দেন কিন্তু শুজাত খান তাদের সম্রাটের দরবারে পাঠান পর্যন্ত নিজ দায়িত্বে রাখতে চান। ইসলাম খান আপত্তি না করে তাদের শুজাত খানের দায়িত্বে থাকতে দেন এবং মুতাকিদ খানের সাক্ষাতে শুজাত খানের নিকট থেকে এই মর্মে মুচলেকা নেন। বাহিরিস্তান-ই-ঘায়বীতে ভিন্ন কথা আছে। বলা হয়েছে যে শুজাত খান উসমানের উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে যে চুক্তি করেন, ইসলাম খান তা অনুমোদন না করে তাদের সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেন, এতে শুজাত খান দুঃখিত ও বিরক্ত হয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। এ সময় শুজাত খানকে বিহারে সুবাদার নিযুক্তির আদেশ পেলে

Edited by Ripon Sarkar

তিনি বিহারে যান।[৮৬] এই বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করা সম্ভব নয়। খাজা ওয়ালীর দূত ওয়ালী মণ্ডু খেলের আত্মসমর্পণের শর্ত আলোচনার সময় শুজাত খান উসমানের ভাই ও ছেলেদের সম্রাটের দরবারে পাঠাবেন না এরূপ কোন কথা দিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই; পরে দেখা যাবে যে সম্রাট নিজে উসমানের ভাই ও ছেলেদের দরবারে পাঠাবার আদেশ দেন; ইসলাম খান বা শুজাত খানের এ ব্যাপারে কিছু করার ছিল না। এ ব্যাপারে ইসলাম খানের সঙ্গে শুজাত খানের মতবিরোধ হয়েছে এমন কোন কথাও বাহরিস্তানে নেই। ইসলাম খান ঝারোকায় বসাতে শুজাত খান বিরক্ত হয়ে ছিলেন, কিন্তু এটা ভিন্ন ব্যাপার; শুজাত খান জানতেন যে ঝারোকায় বসা শুধু সম্রাটের জন্যই সংরক্ষিত। ইসলাম খান অবশ্য শুজাত খানকেও ঝারোকায় নিজের পাশে বসতে দেন। এদিকে মিরযা নাথন যে সকল আফগানকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে শের ময়দানও ছিলেন, কতরাবোর নিকটে পৌঁছলে শের ময়দান পরিবারসহ পালাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অবশেষে মিরযা নাথন সকলকে নিয়ে ঢাকা পৌঁছেন এবং সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতোমধ্যে সিলেট বিজয়ও সম্পন্ন হয় (নিচে আলোচিত হচ্ছে) এবং সিলেটের বায়েজীদ কররানী এবং তাঁর পরিবারবর্গসহ মোগল সেনাপতি শয়খ কামালও ঢাকায় এসে ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন।[৮৭]

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে সম্রাটের ফরমান ঢাকায় এসে পৌঁছে। ফরমানে মুতাকিদ খানের স্থলে মিরযা হোসেন বেগকে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। উসমানের ছেলে ও ভাই এবং বায়েজীদ কররানী ও তাঁর আত্মীয়বর্গকে সম্রাটের দরবারে নিয়ে যা য়া জন্য মুতাকিদ খানকে নির্দেশ দেয়া হয়। ইসলাম খান মুতাকিদ খানকে সম্রাটের দরবারে পাঠাবার প্রস্তুতি নেন এবং ফরমানে উল্লেখিত সকল আফগানকে সঙ্গে দিয়ে মুতাকিদ খানকে বিদায় দেন। মুতাকিদ খানের সঙ্গে পরলোকগত মীর বহর ইহতিমাম খানের ধন-সম্পদ এবং হাতিগুলিও সম্রাটের দরবারে পাঠান হয়।[৮৮] সম্রাট আফগানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ইসলাম খান ও শুজাত খান উভয়কে পুরস্কৃত করেন। ইসলাম খানের মনসব ছয় হাজারে বৃদ্ধি করা হয়, শুজাত খানকে রুস্তম-ই-জামান উপাধি দেয়া হয় এবং তাঁর মনসবও এক হাজার বৃদ্ধি করা হয়। অন্যান্য সেনানায়কদেরও উপযুক্ততা মত মনসব বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্যভাবে সম্মানিত করা হয়।[৮৯] মুতাকিদ খান ১০২১ হিজরীর ১৭ই রজব ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৬১২ তারিখে উসমানের ছেলে ও ভাইদের এবং ইসলাম খান কর্তৃক প্রেরিত অন্যান্য আফগানদের সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করেন। তাদের প্রত্যেককে এক একজন দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তার অধীনে ন্যস্ত করা হয়।[৯০] আগেই বলা হয়েছে যে তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে বাংলায় ইসলাম খানের সুবাদারীর আমলে একমাত্র উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধের কথা নেই, বায়েজীদ কররানীর কথাও নেই। তাই মুতাকিদ খান কর্তৃক বায়েজীদ কররানী ও তাঁর আত্মীয়দের সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করার কথা তুজুকে নেই, কিন্তু বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে মুতাকিদ খান বায়েজীদ কররানী ও তাঁর আত্মীয়দেরও সঙ্গে নিয়ে যান। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী বা বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে সম্রাট আফগানদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেন, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। তবে মাসির-উল-উমারায় বলা হয়েছে যে খাজা ওয়ালী এবং মুমরিজকে আহমদাবাদের কালী তলওয়ারীতে হত্যা করা হয় এবং উসমানের আয়াজ গোলাম নামে এক পালক পুত্রকে অনেকদিন কূয়ায় বন্দী রাখা হয়।[৯১] উসমানের পতনের পরে উসমানের রাজ্য মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একাদশ অধ্যায়ে দেখা যাবে যে

Edited by Ripon Sarkar

উসমানের ভাই ইবরাহীম ও ভাইপো দাউদ বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের সৈন্যদলে যোগ দেন। উসমানের সৈন্য এবং অফিসারেরা মোগল বাহিনীতে যোগ দেয়, বাহরিস্তানে এই অফিসারদের উসমানী মনসবদার রূপে অভিহিত করা হয়।

বায়েজীদ কররানীর আত্মসমর্পণ

সিলেটে যে বায়েজীদ কররানী স্বাধীন আফগান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এই সংবাদ কোন সূত্রে পাওয়া যায় না। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে শুধু বায়েজীদ কররানীর সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ এবং বায়েজীদ কররানীর আত্মসমর্পণের কথা আছে, বায়েজীদ কখন কিভাবে সিলেটে রাজ্য স্থাপন করেন বা বায়েজীদের পরিচিতি কি সে বিষয়ে বাহরিস্তানে কোন আলোচনা নেই। শুধু কররানী নামেই বুঝা যায় যে তিনি আফগানদের কররানী গোত্রের লোক ছিলেন এবং হয়ত বাংলার কররানী সুলতানদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল। বাহরিস্তান-ই-গায়বী আবিষ্কৃত না হলে বায়জীদ কররানীর নাম বিস্মৃত হয়ে থাকত।

আগেই বলা হয়েছে শুজাত খান যে দিন খাজা উসমানের বিরুদ্ধে গমন করেন, সেই একই দিনে শয়খ কামাল সিলেটের বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধে গমন করেন। শয়খ কামালের নেতৃত্বে মুবারিজ খান, তুকমক খান, মীরক বাহাদুর জালাইর, মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজী প্রমুখ সেনানায়কেরা অগ্রসর হন। তাছাড়া শয়খ কামালের অধীনে মনসবদারদের অনেক পদাতিক সৈন্য, ইসলাম খানের বাছাই করা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, চার হাজার বন্দুকধারী, রাজকীয় নৌবহরের একশ নৌকা এবং বার-ভূঁঞার নৌকাগুলি দেয়া হয়। মীর আলী বেগকে সৈন্যবাহিনীর বখশী নিযুক্ত করা হয়। শয়খ কামাল সারা পথ অতিক্রম করে সিলেটের নিকটে পৌছেন; পথে তিনি গ্রাম লুট করে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেন এবং অবশেষে সুরমা নদীর তীরে পৌছেন। সিলেটের নিকট দিয়েই এই নদী প্রবাহিত। বায়েজীদ কররানী এবং তাঁর ভাই ইয়াকুব অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন এবং সুরমা নদীর তীরে এসে ঘাঁটি স্থাপন করেন। সুরমা নদীই হয় তাঁদের আক্রমণের ভিত্তি, অর্থাৎ সুরমা নদীকে সামনে রেখে তাঁরা আক্রমণ পরিচালনা করেন। শয়খ কামাল কদমতলা[১২] পর্যন্ত পৌছে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের এবং চারদিকে পরিখা খননের জন্য ভূষণার রাজা শত্রুজিত এবং জমিদারদের নির্দেশ দেন। দুর্গ নির্মাণ এবং পরিখা খননের সময়ে আফগানরা প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। কিন্তু মোগল গোলন্দাজ বাহিনীর গোলার ছত্রছায়ায় থেকে শত্রুজিত কোনক্রমে দুর্গ নির্মাণ করতে এবং পরিখা খনন করতে সক্ষম হন।

এই কাজ সমাধা করতে তাঁর এক সপ্তাহ সময় লাগে। এর পর শত্রুজিত সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ইয়াকুবের দুর্গ অধিকার করেন, ইয়াকুব পশ্চাদপসরণ করে বায়েজীদের সঙ্গে মিলিত হন। রাজা শত্রুজিত এখানে অপূর্ব বীরত্বের পরিচয় দেন, তিনি সুরমা নদী অতিক্রম করে নদীর অপর তীরে ইয়াকুবের দুর্গ অধিকার করেন। শত্রুদের আক্রমণের মুখে নদী অতিক্রম করা কম বীরত্বের কাজ নয়। মিরযা নাথন বলেন যে এ সময় আফগানদের দুর্বলতার দুটি কারণ ছিল। প্রথমত তারা জানতে পারে যে খাজা ওয়ালী তুপিয়া দুর্গ পরিত্যাগ করে উহর-এ গিয়ে খাজা উসমানের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, এবং দ্বিতীয়ত তারা আরও শুনতে পায় যে খাজা উসমান মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকতে পারেননি। সুতরাং সিলেটের আফগানরা আত্মসমর্পণ করবে কিনা ঠিক করতে পারছিল না

Edited by Ripon Sarkar

এবং এ কারণে নদীর উভয় তীর তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। অবশেষে আফগানরা যখন জানতে পারে যে উসমানের পরাজয়ের সংবাদ সত্য নয় এবং কাছাড়ের রাজা তাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হচ্ছেন, তখন তারা আবার বীর বিক্রমে শত্রুজিতকে আক্রমণ করেন। আফগানরা এক সঙ্গে দুর্গ এবং নদীর তীর আক্রমণ করে, উভয় পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হয় এবং শত্রুজিত নদীর তীর ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ঠিক এই সময়ে ইসলাম খানের প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্য অনেক গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদ নিয়ে মোগল শিবিরে এসে পৌছে। মোগল বাহিনী আবার সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এ সময়ে আফগানরা সংবাদ পায় যে শুজাত খান খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। ফলে তারা দলে দলে, দিনে রাতে, জলে স্থলে, পঙ্গপাল ও পিঁপড়ার মত এসে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে। ইসলাম খানও যুদ্ধের খবরাখবর রাখেন এবং প্রয়োজন মত অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে শয়খ কামালকে সাহায্য করেন এবং উৎসাহ দেন। কিন্তু পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে শয়খ কামালের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে যায়; শত্রুরা মোগল বাহিনীকে চতুর্দিকে ঘিরে ফেলে এবং মোগল বাহিনীর চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়। আফগানরা শয়খ কামালের নিকট বারবার সংবাদ পাঠায়ঃ 'তুমি এবং তোমার অনুগামীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা দিচ্ছি, যদি তোমাদের ভাল চাও, দুর্গ থেকে বেরিয়ে আস এবং হেঁটে খালি পায়ে হাতি এবং অস্ত্রশস্ত্র রেখে ইসলাম খানের নিকট চলে যাও'।[৯৩] শয়খ কামাল আফগানের ঔদ্ধত্য হজম করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে উসমানের পরাজয় এবং মৃত্যু হয়েছে। এই সংবাদ সিলেটের আফগানদের নিকট পৌছলে তারা হতাশ হয়ে পড়ে। বায়েজীদ কররানী আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিয়ে তাঁর ভাই ইয়াকুবকে শয়খ কামালের নিকট পাঠান। শয়খ কামাল সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁদের সম্মতি নিয়ে ইয়াকুবকে সান্ত্বনা দেন। তিনি রাজা রঘুনাথকে (সুসঙ্গ-এর রাজা) সঙ্গে দিয়ে ইয়াকুবকে স্বীয় শিবিরে পাঠিয়ে দেন। বায়েজীদ কররানী মোগল শিবিরে এসে শয়খ কামালের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শয়খ কামাল বায়েজীদকে এবং তাঁর অন্যান্য ভাইকে সম্মানসূচক পোশাক উপহার দেন। প্রত্যেক সেনানায়ককে একখানি করে শাল উপহার দেয়া হয় এবং সকলকে সম্রাটের অনুগ্রহের আশ্বাস দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। ঐদিনই বায়েজীদ তাঁর সকল হাতি শয়খ কামালের নিকট হস্তান্তর করেন এবং এক সপ্তাহ পরে, পরিবার পরিজন নিয়ে আসার অঙ্গীকার করে স্বীয় শিবিরে ফিরে যান। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বায়েজীদের আত্মসমর্পণের তারিখ নেই, তবে অনুমান করা যায় যে ১০২১ হিজরীর মহরম মাসের প্রথম সপ্তাহে (১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম দিকে) তিনি আত্মসমর্পণ করেন। অঙ্গীকার মত বায়েজীদ এক সপ্তাহ পরে মোগল শিবিরে ফিরে আসেন। শয়খ কামাল বায়েজীদ কররানী, ইয়াকুব, দাতু এবং ঐরূপ অন্যান্যদের (অর্থাৎ বায়েজীদের পরিবারের লোকজনদের) নিয়ে নৌকায় করে ঢাকা যাত্রা করেন। বায়েজীদের উবর নামক হাতি এবং অন্যান্য বিখ্যাত হাতিগুলি মাও[৯৪] কোষায় করে শয়খ কামাল সঙ্গে নিয়ে যান। যাত্রার পূর্বে শয়খ কামাল সিলেটের শাসনভার তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মকর্তার হাতে ন্যস্ত করেন এবং মুবারিজ খানের নেতৃত্বে অন্যান্য মনসবদারদের সিলেটে রেখে আসেন।[৯৫]

সিলেট থেকে যাত্রা করার পঁচিশতম দিনে শয়খ কামাল বায়েজীদ কররানী ও অন্যান্যদের নিয়ে ঢাকা পৌছেন এবং ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন (শয়খ

Edited by Ripon Sarkar

কামাল গুজাত খানের পরে ঢাকা পৌছেন, তবে শয়খ কামালের ঢাকা পৌছার তারিখ উল্লেখ নেই) গুজাত খানকে যেরূপ অভ্যর্থনা জানান হয়েছিল, ইসলাম খান শয়খ কামালকেও সেনরূপ অভ্যর্থনা জানা। সুবাদার ঝারোকায় বসেন, ঝারোকার আঙ্গিনাকে নানাভাবে সজ্জিত করা হয়, সকল উচ্চপদস্থ অফিসার দাঁড়িয়ে থাকেন। অতঃপর বাগানে খানাপিনার ব্যবস্থা করা হয়। বায়েজীদ ও তাঁর ভাইদের সম্মানসূচক উপহার দেয় হয়। শেষে বায়েজীদ ও তাঁর ভাইদের নজরবন্দী করে রাখার জন্য বিশ্বস্ত কর্মকর্তাদের হাতে ন্যস্ত করা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে সম্রাট খাজা উসমানের ছেলে ও ভাইদের সঙ্গে বায়েজীদ কররানীকেও সম্রাটের দরবারে পাঠাবার আদেশ দেন। যদিও কোন সূত্রে বায়েজীদ কররানী সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না, মনে হয় ঐ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বায়েজীদকেও উসমানের ছেলে ও ভাইদের সঙ্গে মুতাকিদ খান আগ্রায় সম্রাটের দরবারে নিয়ে যান।

অবশেষে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান হয়; বাংলার শেষ আফগান বীর খাজা উসমান এবং বায়েজীদ কররানী; তাঁরাও প্রাণ দিয়ে বা বন্দী হয়ে স্বাধীনতার মূল্য দেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রতি এরূপ গুরুত্ব দেন যে তুজুকে তিনি বাংলার অন্য কোন যুদ্ধ, এমনকি বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধেরও কোন উল্লেখ করেননি, কিন্তু শুধু উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনী কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী আলোচনা করেন। উসমানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি লিখেনঃ "এই শুভ সংবাদ আগ্রায় আল্লার এই প্রার্থনাকারী বান্দার নিকট পৌছলে তিনি (এই বান্দা অর্থাৎ জাহাঙ্গীর নিজে) কৃতজ্ঞতায় আল্লার প্রতি সিজদা করেন এবং বুঝতে পারেন যে এরূপ শত্রুর পরাজয় শুধু মহান আল্লার অকৃত্রিম অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে।[৬]

১। আধুনিক মানচিত্রেও বুকাইনগর চিহ্নিত আছে, এটা কিশোরগঞ্জের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে বুকাইনগর ব্রহ্মপুত্রের পূর্বে মোমিনশাহী পরগণায় চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৩২৮ বাংলায় স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ "বোকাইনগর অত্যন্ত প্রাচীন বিধায়, বর্তমান সময়ে উহার ভগ্ন মৃৎপ্রাচীর এবং কয়েকটি বুরুজ মাত্র দণ্ডায়মান আছে। এতদ্ব্যতীত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দর্গা, একটি গুম্বজহীন ভগ্ন মসজিদ, চাঁদের মন্দির নামে একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দির এবং নাগারপুল নামক একটি প্রাচীন পাকা সেতু অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে। বোকাইনগরের একটি বুরুজের পাদদেশ চাষের জন্য খনন করাতে কয়েকটি গোলা পাওয়া গিয়াছিলঃ... একটি সীসক নির্মিত অপরটি .... উপরভাগ দেখিতে অনেকটা প্রস্তরের ন্যায়। উভয় গোলারই ব্যাস ১.৭৫ ইঞ্চি এবং পরিধি ৫ ইঞ্চি।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৭, টীকা)। বুকাইনগর বর্তমানে গৌরীপুর উপজেলায় অবস্থিত, এখানে এখনও দুটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আছে।

২। এইচ. বি. ২য়, পৃঃ ১৪১।

৩। ঐ।

৪। বাহারিস্তান, ১ম, ৯।

আবদুল লতীফের ডায়রী। সতীশ চন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলকাতা, ১৩২৯ বাংলা, ৯০৮-১২।

৫। মোগল আমলের শেষ দিকে বাংলা বিহারে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের জন্য চারটি বন্দরের নাম পাওয়া যায়, ঢাকার শাহ বন্দর, মুর্শিদাবাদের পাচোত্রাবন্দর, হুগলীর আবহা বন্দর এবং পাটনার বুজরেকা বন্দর (বুজর্গ বন্দর)। প্রধানত আঠার শতকে এই বন্দরগুলির উল্লেখ আছে। (আবদুল

Eidited by Ripon Sarkar

কাসিম: মুর্শিদকুলী খান এ্যাণ্ড হিজ টাইমস, ঢাকা ১৯৬৩, ২১২) ইসলাম খানের সময়ে শাহ
বন্দর ছাড়া অন্যগুলির অস্তিত্ব বোধ হয় ছিল না, শাহ বন্দরের প্রধান কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত
হলেও এর শাখা বোধ হয় বিভিন্ন এলাকায় ছড়ান ছিল। বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে যুদ্ধের
আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় এই শাহ বন্দর এগার সিন্দুরের নিকটে নদীর মোহনায়
অবস্থিত ছিল। মিরযা নাথন পরিষ্কার ভাষায় বলেন : "Ghias Khan made his camp
on the bank of the Brahmaputra where the fleet was stationed and
kept himself informed of news from all sides through spies so that
the enemy might not play any deceitful trick.(বাহারিস্তান, ১ম, ১০৫)।
"হসনপুর (রেনেলের ৬নং প্লেট) ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পারে, বর্তমান হাইবতনগর, কিশোরগঞ্জ
৬। হইতে ৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং গফরগাঁও রেল স্টেশন হইতে ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।
বোকাইনগর এখান হইতে ২৩ মাইল উত্তরে, অর্থাৎ নেত্রকোনা হইতে কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত এক
লাইন টানিলে তাহার মধ্যস্থলের কিছু পশ্চিমে এবং ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার চারি
মাইল দক্ষিণে। এগারসিন্দুর এই হসনপুর হইতে দশ মাইল দক্ষিণে; কিশোরগঞ্জ সব-
ডিভিসনের ঠিক দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে ব্রহ্মপুত্রের ত্রি-শাখার উত্তর-পূর্বে এবং ইহার অপর পারে
টোক-বা টোক নগর।" (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা, পৃঃ ১৪৬ টীকা।)
এগার সিন্দুরের বিপরীতে বানার ও ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলে টোক অবস্থিত। উপরে ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য।
৭। বাহারিস্তান, ১ম, পৃঃ ১০০-১০৪।
৮। সিলেট শহরের পনর মাইল উত্তরে তাজপুর নামক একটি গ্রাম আছে, কিন্তু এই গ্রাম আমাদের
৯। আলোচিত তাজপুরের সঙ্গে এক নয়, কারণ আমাদের এই তাজপুর বুকাইনগর থেকে খুব দূরে
হবে না। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে বুকাইনগরের ছয় মাইল উত্তর-পূর্বে তাজপুর নামক
একটি স্থান আছে, এর নাম কেল্লা তাজপুর। এখানে একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা
যায়, এই দুর্গ মাটির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং এর ভিতরে কয়েকটি প্রাচীন বুরুজ এবং প্রাচীন
দীঘি-পুষ্করিনী দেখা যায়। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা, পৃঃ ১৪৭ টীকা)।
সিলেটের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে লাউড় পর্বত, সুনামগঞ্জ শহরের ঠিক ১৪ মাইল পশ্চিমে
১০। অবস্থিত। রেনেলের ৬নং মানচিত্রের বুকাইনগর থেকে লাউড় পর্যন্ত একটি রাস্তা চিহ্নিত
আছে। সুলতানী আমলেও লাউড়ের সামরিক গুরুত্ব ছিল। সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ
শাহের সোনারগাঁ শিলালিপিতে জানা যায় যে লাউড়ে একটি সামরিক ঘাঁটি (থানা) স্থাপিত হয়
এবং মুকাররব-উদ-দৌলা নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ঐ থানার সর-ই-লস্কর বা
সেনাপতি ছিলেন। শিলালিপির তারিখ ৮৮৯ হিজরী/১৪৮৪ খ্রিঃ। (শামস-উদ-দীন আহমদ:
ইনস্ক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, রাজশাহী, ১৯৬০, ১২১-১২২)। আইন-ই-আকবরীতে
লাউড় সিলহেট সরকারের একটি মহাল। (আইন, ২য়, ১৫২)।
উসমানের এই রাজধানীর নাম উহার এবং আদ-হার, অর্থাৎ বিভিন্নভাবে পড়া যায়। স্যার যদুনাথ
১১। সরকার বলেন: "ফার্সী গ্রন্থে এই স্থানটির নাম লেখা হইয়াছে আলিফ + দাল (অথবা ও) + হে
আলিফ (একস্থলে বে আলিফ) + রে, অর্থাৎ আদহার, আদবার, উবার অথবা উহার। যদি হে-
আলিফকে তে এবং রে-কে আলিফের লিপিকর-ভ্রম ধরা হয় তবে নামটিকে সহজেই এতা বা ইটা
পড়া যাইতে পারে। চৌয়ালিশ পরগণা প্রাচীন ইটা বিভাগের মধ্যে হয়ত পড়িত; এখন কয়েক
মাইল ব্যবধানে আছে। এই পরগণা বর্তমান মৌলবীবাজার থানার এলাকার অন্তর্গত।
"শ্রী সূর্য-হাইল হাউয়ের উত্তর-পূর্ব কোণের ঠিক ১৬ মাইল পূর্বে। ইহার ২ মাইল পূর্বে
লালবাগ নামক শহর (আসাম-বেঙ্গল রেলের ঠিক দক্ষিণে), এবং চারি মাইল পূর্বে ঐ রেলের
টিলাগাঁও স্টেশন।"
"উসমানের রাজধানী কমলগঞ্জ শহরের ৫ মাইল দক্ষিণে এবং শ্রীমঙ্গল নামক রেলস্টেশনের ৮
মাইল পূর্বে উসমানপুর গ্রাম আছে, কিন্তু ইহা বোধ হয় আমাদের উসমানের বাসস্থান ছিল না।
আমার বিশ্বাস যে শ্রী সূর্যের এক মাইল উত্তর পশ্চিমে উদার নামক যে গ্রাম আছে তাহা
উসমানের রাজধানী ছিল; "উদার" ঢাকাই গলায় "উহার" উচ্চারিত এবং বাহারিস্তানের
পারসিক লেখক তাহা শুনিয়া আলিফ + ও + হে আলিফ + রে দ্বারা ঐ শব্দ সূচিত করিয়াছে।

Eidited by Ripon Sarkar

উশারের ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে এবং ২ মাইল দক্ষিণে পর্যন্ত আছে।" (প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা, পৃষ্ঠা, ১৪৮ টীকা)।

১২। বাহরিস্তান, ১ম, ১০৯-১১০।

১৩। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বর মাসের শেষ দিকে বুকাইনগর দুর্গ অধিকৃত হয় (এইচ.বি. ২য় ২৬৪); স্যার যদুনাথও বলেন যে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর থেকে ২৬শে নবেম্বর পর্যন্ত রমযান মাস ছিল (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা,১৪৬)। কিন্তু ঈদের দিন ছিল ৭ই ডিসেম্বর, এবং মির্যা নাথন বলেন যে ঈদের নামায পড়ে মোগল বাহিনী বুকাইনগরে যায় এবং অধিকার করে।

১৪। সুধীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেন যে শয়খ কামাল ও আবদুল ওয়াহিদ বুকাইনগর দুর্গ দখল করে সেখানে অবস্থান করেন (এইচ. বি. ২য়, ২৬৩) এবং স্যার যদুনাথ বলেন যে মোগলেরা তাজপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৭)। মোগল বাহিনী তাজপুর পর্যন্ত যায়, কিন্তু সেনাপতিদ্বয়, শয়খ কামাল ও শয়খ আব্দুল ওয়াহিদ যাননি; শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদ বুকাইনগরেও থাকেননি, তাঁরা দুজন কোন অজুহাত দেখিয়ে সেখান থেকে ফিরে আসেন। (বাহরিস্তান, ১ম, ১১০)।

১৫। বাহরিস্তান, ১ম, ১১৫।

১৬। ঐ, ১৬৬।

১৭। তরফ বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইলের একটানা ৩৪ মাইল উত্তর-পূর্বে হবিগঞ্জ থেকে ৮/১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং সিলেটের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ মাইল উত্তরে। রেনেলের ৬নং মানচিত্রে তরফের দুর্গ দেয়া আছে এবং সরাইল থেকে তরফ পর্যন্ত রাস্তা চিহ্নিত আছে।

১৮। বাহরিস্তান, ১ম, ১৫৭-৫৮। কাসিম খান বাংলায় আসেননি, এবং এজন্য তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হন। (ঐ, ১৫৮)।

১৯। তুযুক ১ম, ১৯২।

২০। বেণী প্রসাদঃ হিস্টরী অব জাহাঙ্গীর, ৫ম সংস্করণ, এলাহাবাদ ১৯৬২, ১৯২, টীকা ২০।

২১। মাসির-উল উমারা, ১ম, ৫২৩-২৪।

২২। ঐ, ২য়, ৮৬৪।

২৩। বাহরিস্তান, ২য়, ৮২৪ টীকা নং ২৬; এইচ. বি. ২য়, ২৭৩।

২৪। বাহরিস্তান, ১ম, ২১১।

২৫। ঐ, ১৬০

২৬। ঐ।

২৭। ঐ, ১৬৬।

২৮। অল্প দিন পরে যশোরে গিয়াস খানের মৃত্যু হয় (বাহরিস্তান, ১ম, ২১১), তাই মনে হয় গিয়াস খান তখন অসুস্থ ছিলেন বা সাহস হারিয়ে ফেলেন। এম. আই. বোরাহ বলেন যে গিয়াস খান ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মৃত্যুবরণ করেন (ঐ, ২য়, পৃঃ, ৭৯৬, টীকা ৭), কিন্তু বাহরিস্তানেই বলা হয়েছে ইসলাম খানের সুবাদারীকালে গিয়াস খান যশোরে মারা গেলে ইসলাম খান তাঁর চাচা শয়খ মওদুদকে যশোরে নিযুক্ত করেন। (ঐ, ১ম, ২১১) ইসলাম খানের মৃত্যু হয় ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে, সুতরাং গিয়াস খান ১৬১৮ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারেন না।

২৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১৬৬।

৩০। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে জেলার নাম নেই, নদীর নাম দেয়া হয়েছে পানকিয়া। স্যার যদুনাথ সরকার এবং এম. আই. বোরাহ উভয়ে বলেন যে সূতা বদলিয়ে "পানকিয়া"কে সহজে

Edited by Ripon Sarkar

"মেঘনা" পড়া যায়। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৭, টীকা, বাহরিস্তান, ২য় ৮২৫ টীকা নং ৩০)। পরে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে সুবাদার যখন ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে যান, এখানেও নাথন পানকিয়া নদী অতিক্রম করার কথা বলেছেন। তখন বর্ষায় নদী প্লাবিত হলে নাথন তাঁর সঙ্গের হাতিগুলি নদী পার করতে না পেরে নদীর মধ্যে একটি চরে (বা দ্বীপে) রেখে যেতে বাধ্য হন। (বাহরিস্তান, ২য়, ১৬৮) পানকিয়া নামে কোন নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই মনে হয় লিপিকরের ভুলেই মেঘনা পানকিয়া হয়েছে।

৩১। স্যার যদুনাথ সরকার বলেন যে স্থল ও নৌবাহিনী একসঙ্গে ভৈরব বাজারের নিকট দিয়ে মেঘনা নদীতে পৌঁছে দু ভাগে বিভক্ত হয়, শুজাত খান স্থলবাহিনী নিয়ে স্থলপথে যাত্রা করেন। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ ১৪৭)। কিন্তু বাহরিস্তানে এর সমর্থন নেই। বাহরিস্তানে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে শুজাত খান স্থলবাহিনীসহ মেঘনা পার হয়ে নৌ-বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, নৌ-বাহিনী পরে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। (বাহরিস্তান, ১ম, ১৬৭)।

৩২। সরাইল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৭ মাইল উত্তরে। রেনেলের ৬নং মানচিত্রে এখানে নদী দেখা যায়, বর্তমানে নদী শুকিয়ে খালে পরিণত হয়েছে। মোগল নৌবহর এই নদীতে অপেক্ষা করতে থাকে।

৩৩। ইন্ডিয়ান এটলাসের মানচিত্র নং ১২৫ এ কসবা টুক্কেহ নামক একটি স্থান চিহ্নিত আছে, এটা হবিগঞ্জের সাত মাইল পূর্বে এবং এর কিছু দূরে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত সাতগাঁও পর্বত আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু যদুনাথ সরকার মনে করেন যে পুটিয়া শব্দ ভুলে তোপিয়া হয়েছে। পুটিয়া বা পুটিয়াজুরী দিয়ে রেনেলের সময়ে এবং এখনও পর্বত পার হওয়ার পথ আছে। এটা কসবা টুক্কের তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৭, টীকা)।

৩৪। বাহরিস্তান, ১ম, ১৬৯-৭০।

৩৫। ঐ, ১৬৯।

৩৬। বাহরিস্তান, ১ম, ১৭০-১৭১। এই কাজের জন্য ঢাকা থেকে বিশেষভাবে লোক পাঠাবার কারণ বুঝা যায় না। এটা প্রাথমিকভাবে সেনাপতির দায়িত্ব। তবে এতে বুঝা যায় যে ইসলাম খান রাজধানীতে থাকলেও তিনি যুদ্ধের খুঁটিনাটি ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকতেন এবং সেনাবাহিনীর গতিবিধির ব্যাপারে রাজধানী থেকে নির্দেশ দিতেন। ইতোপূর্বেও আমরা দেখেছি যে তিনি সৈন্য গণনা ও পরিদর্শনের জন্য মাঝে মাঝে বখশী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের পাঠাতেন।

৩৭। ঐ, ১৭১।

৩৮। সরহঙ্গরাও আফগান সৈন্য, তারা একাও দেহের অধিকারী ছিল। সেনানায়কদের সরহঙ্গ বলা হত।

৩৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১৭৩।

৪০। Bpp. XXXVI. part I, 1928, 5, 17.

৪১। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ডঃ এম. আই. বোরাহ চৌয়ালিশ পরগণাকে চুয়াল্লিশ পরগণা বলেছেন (এইচ. বি. ২য়, ২৭৫; বাহরিস্তান, ১ম, ১৭৩)। তবে মনে হয় চৌয়াল্লিশ (৪৪) বুঝান হয়নি, বরং এটা একটি পরগণার নাম।

৪২। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৮, টীকা। দৌলতপুরের বর্তমান নাম দলোদরপুর। বাংলাদেশ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, সিলেট, ৬৩।

৪৩। বাহরিস্তান, ১ম, পৃঃ ১৭৩-১৭৪।

৪৪। ঐ, ১৭৪।

৪৫। তুযুক ১ম, ২০৯।

৪৬। বাহরিস্তান, ১ম, ১৭৫।

৪৭। মোগলরাও কুসংস্কারবাদী ছিল, তারা গণকদের কথা ছাড়া যুদ্ধ শুরু করত না।

Edited by Ripon Sarkar

৪৮। বাহারিস্তান, ১ম, ১৭৫।

৪৯। বাহারিস্তানে কোন তারিখ পাওয়া যায় না, তবে বাহারিস্তানের আভ্যন্তরীণ তথ্য দ্বারা এই তারিখ নির্ধারণ করা যায়, পরে দ্রষ্টব্য।

৫০। বাহারিস্তান, ১ম, ১৭৫-১৭৬।

৫১। ঐ, ১৭৬-৭৭।

৫২। ঐ, ১৭৭-৭৮।

৫৩। ঐ, ১৭৮।

৫৪। ঐ, ১৭৯-৮০।

৫৫। ঐ, ১৮০-৮১।

৫৬। ঐ, ১৮১-১৮৩।

৫৭। কথাটা বোধগম্য নয়, পতাকার রং একরূপ হলে মোগলরা যেমন বিভ্রান্ত হতে পারে, আফগানরাও বিভ্রান্ত হতে পারে।

৫৮। বাহারিস্তান, ১ম, ১৮৩-৮৪।

৫৯। ঐ, ১৮৬-৮৭।

৬০। ঐ, ১৮৮।

৬১। তুযুক, ১ম, ২০৯-২১২।

৬২। মাসির, ২য়, ৮৬৫।

৬৩। রিয়াজ, ১৭৬-৭৯।

৬৪। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ৬২।

৬৫। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৫৩।

৬৬। আকবরের সেনাপতি মুনিম খান ও দাউদ কররানীর মধ্যে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চের যুদ্ধ, একে তুকারয়ের যুদ্ধও বলা হয়।

৬৭। তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে আমি এই বক্তব্যের সমর্থনে কিছু পাইনি।

৬৮। স্যার যদুনাথ অন্যত্র বলেছেন যে উসমানের বয়স তখন ৪১ বৎসর ছিল। (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮, ১৪৮)। মির্জা নাথন বলেন যে মুমরিজ তাঁর পিতার মৃতদেহ কবরে নিয়ে যান (carried away) তাই স্যার যদুনাথের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

৬৯। তুযুক ১ম, ২১০।

৭০। রিয়াজ, ১৭৬।

৭১। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা, ১৪৮, ১৫২।

৭২। এইচ. বি. ২য়, ২৭৫।

৭৩। বাহারিস্তান, ১ম, ১৯০।

৭৪। ঐ, ১৯৪-৯৫।

৭৫। ঐ, ১৯৬-৯৭।

৭৬। যদিও উসমানের মৃত্যু তারিখ জিলহজ্জ মাসের শেষ তারিখ, মহররমের ১লা তারিখ থেকে শোক দিবস গণনা করা হয়েছে।

Eidited by Ripon Sarkar

৭৭। তুজুক, ১ম, পৃঃ ২১০। রিয়াজে এই তারিখ ১৬ই মহরম (রিয়াজ, ১৭৯)।

৭৮। বাহারিস্তান, ১ম, ১৯১।

৭৯। ঐ, ১৯২।

৮০। ঐ, ১৯৩-৯৪।

৮১। ঐ, ১৯৪-৯৫। তুজুক, ১ম, ২১৫ মাসির ২য়, রিয়াজ, ১৭৯; ষ্টুয়ার্টঃ হিস্টরি অব বেঙ্গল, ১৩৫। আইনিয়া এখন চিহ্নিত করা যায় না, তবে বিবরণে মনে হয় ইহা দৌলতপুর থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে চৌয়াল্লিশ পরগণায় অবস্থিত ছিল। (বাহরিস্তান, ২য়, পৃঃ ৮২৬, টীকা নং ৪৪)।

৮২। বাহরিস্তান, ১ম, ১৯৭।

৮৩। ঐ, ১৯৯-২০৪।

৮৪। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এই তারিখ ৬ই সফর, তুজুক, ১ম, ২১৪।

৮৫। ঝারোকার অর্থ অভিবাদন গ্রহণের জন্য তৈরি করা উঁচু মঞ্চ। আকবরের সময় থেকে দুর্গের একটি অংশে সম্রাটেরা ঝারোকায় বসে দর্শন দিতেন এবং জনেরা দুর্গের বাহিরে থেকে তাঁদের দেখে যেতেন। সুবাদারদের জন্য ঝারোকা দর্শন নিষিদ্ধ ছিল, এটা ছিল সম্রাটের প্রেরোগেটিভ বা বিশেষ ক্ষমতা। ইসলাম খান কিন্তু ঝারোকার ব্যবস্থা করেন, পরে সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৮৬। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ৮৬৬।

৮৭। বাহরিস্তান, ১ম, ২০৫-২০৭।

৮৮। ঐ, ২০৭, ২০৯, ২১০।

৮৯। তুজুক, ১ম, ২১৪।

৯০। ঐ, ২৩৪।

৯১। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ৮৬৬।

৯২। এম.আই. বোরাহ কদমতলাকে হবিগঞ্জের তরূপ গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (বাহরিস্তান, ২য়, ৮২৫, টীকা ৩২), কিন্তু বাহরিস্তানের বিবরণে মনে হয় মোগলরা ঐ সময়ে সিলেটের নিকটে পৌঁছে যায় এবং সিলেট দ্বারা এখানে সিলেট শহর বুঝায়। তাই কদমতলা সিলেটের নিকটে সুরমা নদীর তীরের অধুনালুপ্ত কোন স্থান হবে।

৯৩। বাহরিস্তান, ১ম, ১৯৫।

৯৪। কয়েকটি বড় নৌকা একত্র করে তার উপর মঞ্চ তৈরি করে হাতি পারাপারের ব্যবস্থা করা হত, এই নৌকাগুলিকে মাঙ বলা হত।

৯৫। বাহরিস্তান, ১ম, ১৯৫-৯৬; ১৯৮-৯৯।

৯৬। তুজুক, ১ম, ২১৪।

Edited by Ripon Sarkar

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুবাদার ইসলাম খান চিশতী
যশোহর বাকলা কাছাড় ও কামরূপ বিজয়

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা খাজা উসমান আফগান ও সিলেটের বায়েজীদ কররানীর পতনের কথা আলোচনা করেছি। প্রকৃতপক্ষে এই দুই রাজ্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুবাদার ইসলাম খান সারা বাংলায় মোগল শাসন বিস্তার সম্পূর্ণ করেন। উসমানের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধের আগেই যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য এবং বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠান হয় এবং উভয় রাজ্য বিজিত হয়। কিন্তু খাজা উসমানের সঙ্গে যুদ্ধের ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে যশোহর ও বাকলার পতন কাহিনী পূর্বে আলোচনা করিনি।

প্রতাপাদিত্যের পতন

যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ কররানীর মন্ত্রী শ্রীহরি বিক্রমাদিত্য এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। দাউদ কররানীর পতন আসন্ন দেখে শ্রীহরি মোগল সেনাপতি খান জাহান ও তোডর মল্লের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং দাউদের সরকারের দলিলপত্র মোগলদের নিকট হস্তান্তর করে যশোর জায়গীর লাভের নিশ্চয়তা লাভ করেন। দাউদের মৃত্যুর পরে মোগল সরকার শ্রীহরিকে নির্বিবাদে যশোর রাজ্যে থাকতে দেয়। দাউদ কররানীর ধন-সম্পদও শ্রীহরির নিকট গচ্ছিত ছিল, এই ধন-সম্পদ এবং তাঁর নিজস্ব ধন-সম্পদ নিয়ে শ্রীহরি যশোরে এসে এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরের সময়ে পরবর্তী সেনাপতিরাও যশোর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেনি, জাহাঙ্গীরের আমলের প্রথম কয়েক বছরেও মোগলদের সঙ্গে যশোরের কোন বিবাদের কথা শুনা যায়নি। শ্রীহরির ছেলে প্রতাপাদিত্য ইসলাম খানের সমসাময়িক। প্রতাপাদিত্যের রাজ্য যশোর, খুলনা এবং বাকেরগঞ্জের অংশসহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ধন-সম্পদে যুদ্ধের নৌকায় এবং অস্ত্রশস্ত্রে তাঁর সমকক্ষ তখন বাংলায় আর কেউ ছিল না। আবদুল লতীফের মতে, "এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থ বাংলার আর কারও ছিল না। তাঁর ছিল যুদ্ধ সামগ্রীতে পূর্ণ সাতশ নৌকা এবং বিশ হাজার পাইক এবং তাঁর রাজ্যের আয় ছিল পনর লক্ষ টাকা।"[১] পিতার বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে গড়া এই রাজ্যে তাঁর পিতা যেমন মোগলদের অনুগত ছিলেন, প্রতাপাদিত্যও তেমনি অনুগত ছিলেন। ইসলাম খানের সুবাদারী আমলের প্রথম দিকেও প্রতাপাদিত্য মোগলদের প্রতি অনুগত ছিলেন কিন্তু পরে ইসলাম খানের আদেশ অমান্য করায় সুবাদারের বিরাগভাজন হন।

ইসলাম খান রাজমহলে পৌঁছার পরে প্রতাপাদিত্য তাঁর দূত শয়খ বদীকে বহু উপহারসহ সুবাদারের নিকট পাঠান, দূতের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কনিষ্ঠ ছেলে সংগ্রামাদিত্যও ছিলেন। ইসলাম খান যেদিন ভাটির উদ্দেশে রাজমহল ত্যাগ করেন, অর্থাৎ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে[২] প্রতাপাদিত্যের দূত এবং ছেলে সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং কয়েকটি হাতিসহ উপহার প্রদান করেন। ইসলাম

Edited by Ripon Sarkar

খান তাঁদের স্বদেশে ফেরত পাঠান এবং তাঁদের মারফত সংবাদ পাঠান যে সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ সত্রাজিৎ যেন যুদ্ধের প্রস্তুত সরঞ্জাম নিয়ে নিজে এসে আলাইপুরে সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৩] দূত এবং সত্রাজিতের ছেলে সংগ্রামসিংহ দেশে ফিরে আসেন।

তার পরে ইসলাম খান যোগাদিয়া থেকে আলাইপুরে যাওয়ার পথে নদী অতিক্রম করার সময় সত্রাজিতের দূত আবার সুবাদারের সঙ্গে দেখা করে একখানি দরখাস্ত পেশ করেন. দরখাস্তে সত্রাজিৎ নিজে এসে দেখা করা প্রয়োজন কিনা জানতে চান।[৪] ইসলাম খান কি উত্তর দেন জানা যায় না তবে পরবর্তী ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইসলাম খান সত্রাজিৎকে অবশ্যই আসতে বলেন। অতঃপর সত্রাজিৎ নিজে এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন। আবদুল লতিফ বলেন যে ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখে বজ্রপুরে[৫] সত্রাজিৎ সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ৬টি হাতি, নানা মূল্যবান দ্রব্য, যেমন কর্পূর, অগুরু, এবং নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা নজরানা দেন।[৬] সত্রাজিৎ কিছুদিন সুবাদারের সঙ্গে থাকেন। মির্জা নাথন বলেন যে বাংলার জমিদারদের মধ্যে সত্রাজিতের উচ্চ মর্যাদার কথা চিন্তা করে এবং অন্যান্য জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশে ইসলাম খান সত্রাজিৎকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান। প্রথম দিন তাঁকে একটি ঘোড়া, সম্মানসূচক পোশাক, একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারির খাপ উপহার দেওয়া হয়। পরে সত্রাজিতের প্রতি নিম্নরূপ শর্ত আরোপ করা হয়:

(১) দেশে ফিরে সত্রাজিৎ তাঁর ছেলে সংগ্রামসিংহের অধীনে চারশ যুদ্ধ নৌকা পাঠাবেন, নৌকাগুলি ইহতিমাম খানের অধীনে বাদশাহী নওয়ারায় যুক্ত হবে।

(২) বর্ষার শেষে সুবাদার যখন ভাটির অভিযানে রওনা হবেন, সত্রাজিৎ নিজে তখন মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য একশ যুদ্ধ নৌকা (তাদের সঙ্গে যে চারশ পাঠাবেন, সেগুলিসহ একুনে পাঁচশ) তিন হাজার পদাতিক সেনা এবং এক হাজার জল বাহন[৭] নিয়ে আমল খাঁ নদীর (ফরিদপুরের খালহাল খাঁ নদী) পথে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করবেন।

সত্রাজিৎ এই শর্তগুলি মানতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, বিনিময়ে ইসলাম খান সত্রাজিতের পূর্ব সম্মান বহাল রাখেন এবং শ্রীপুর ও বিক্রমপুরের রাজ্য তাঁকে জায়গির হিসেবে দান করেন। (অবশ্য শ্রীপুর ও বিক্রমপুর তখনও জয় হয়নি।) এই চুক্তির পর ইসলাম খান সত্রাজিৎকে বিদায় দেন। বিদায়ের সময় সত্রাজিৎকে একটি পোশাক, একখানি তরবারি, একটি মণিমুক্তাখচিত তরবারির খাপ, একটি মণিমুক্তা খচিত কর্পূর দান, পাঁচটি ভাল জাতের ইরানি ও তুর্কি ঘোড়া, একটি নর হাতি এবং দুটি মাদী হাতি এবং একটি রাজকীয় নাকাড়া উপহার দেন।[৮] সত্রাজিৎকে মুসা খানের বিরুদ্ধে গমন করার আদেশ দেওয়ায় স্যার যদুনাথ বলেন বার-ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে সত্রাজিতের যুদ্ধ বাধাবার এটা একটি বড় সুযোগ ("ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল")।[৯] কথাটা অবশ্যই ঠিক, ইসলাম খানের নীতিই ছিল অনুগত অথবা পরাজিত জমিদারদের যোগান সেনা বিভাগে নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা, রাজা পরাজিত, মজলিস কুতুব এবং এমনকি মুসা খান ও তাঁর ভাইদেরও একই যুদ্ধে নিয়োগ করা হয়। ইসলাম খানের এই নীতি অত্যন্ত সফল হয়।

Edited by Ripon Sarkar

প্রতাপাদিত্য যশোর ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি, তিনি নৌকাও পাঠাননি, সেনা বা বারুদও পাঠাননি, নিজেও যুদ্ধে অংশ নেননি বা অন্য কোনভাবে মোগলদের সাহায্য করেননি। সামন্ত হিসেবে এটা তাঁর অপরাধ এবং তিনিও বিদ্রোহী দলে পরিগণিত হন। স্যার যদুনাথ বলেন:[১০] "তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে বার ভূঞা ও উসমানকে জয় করিবার পর মুঘল সেনা তাঁহার উপর পড়িবে, সুতরাং উহাদের ধ্বংসে সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে।" প্রতাপাদিত্য হয়ত এও চিন্তা করেন যে বার ভূঞা বা উসমানের সঙ্গে যুদ্ধে মোগলরা সুবিধা করতে পারবে না এবং অতীতের মত পূর্ব বাংলা জয় না করেই তাদের ফিরে যেতে হবে। সে ক্ষেত্রে তিনি শুধু আনুগত্য প্রদর্শন করেই নির্বিবাদে রাজ্য ভোগ করতে পারবেন। "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" সম্পর্কে প্রতাপাদিত্য সচেতন ছিলেন কিনা, বা বার-ভূঞা ও উসমানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল কিনা জানা যায় না। তবে বাহারিস্তান-ই গায়বীতে ইসলাম খানের বাংলা বিজয়ের যে চিত্র আমরা পাই, তাতে দেখা যায় যে ভূঞা জমিদারদের বা সামন্ত প্রধানদের মধ্যে কোন যোগাযোগ ছিল না, একজন জমিদার আক্রান্ত হলে অন্যরা তাঁর সাহায্যে আসেনি, একমাত্র বার ভূঞারা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা এবং মজলিশ কুতুবকে মূসা খানের সাহায্য করা ছাড়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বার-ভূঞার সঙ্গে উসমানের যোগাযোগ, বা এই উভয়ের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যোগাযোগেরও কোন প্রমাণ নেই। সমসাময়িক বাংলার তিন প্রধান শক্তি বার-ভূঞা, উসমান এবং প্রতাপাদিত্য এই তিন শক্তির মধ্যে যোগাযোগ এবং সম্প্রীতি থাকলে, তিন শক্তি একযোগে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করলে বা এক শক্তি আক্রান্ত হলে অন্য দুই শক্তি যুগপৎভাবে মোগলদের বিরুদ্ধে শক্ত আক্রমণ চালালে হয়ত বাংলার ইতিহাস অন্য রকম মোড় নিত। বার-ভূঞা, মজলিশ কুতুব, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য পরাজিত হল, প্রতাপাদিত্য ও উসমান নির্বিকার (অন্তত বাহারিস্তান পাঠে তাই বুঝা যায়), উসমান পরাজিত হয়ে বুকাইনগর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়, প্রতাপাদিত্য নির্বিকার। তাই মনে হয় "ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল" বা বার-ভূঞার ধ্বংস সম্পর্কে প্রতাপাদিত্য সজাগ ছিলেন না। বাংলার ভূঞা জমিদারদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম খানের নিকট রাজমহলে নিজের দূত এবং ছেলেকে পাঠান। এভাবে আনুগত্য দেখিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত তাঁর জমিদারী রক্ষা পেত। কিন্তু শেষে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ভুল করেন এবং নিজের জমিদারী এবং জীবন উভয় দিয়ে তাঁকে ভুলের মাশুল দিতে হয়। তাঁর ক্রিয়াকাণ্ডে তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

বার-ভূঞার আত্মসমর্পণ, মোগলদের কত্রাবো ও ভুলুয়া বিজয় এবং উসমানের বুকাইনগর পরিত্যাগ করার পরে প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হয়। তিনি বুঝতে পারেন যে ইসলাম খান অন্য ধাতুতে তৈরি, পূর্ববর্তী মোগল সেনাপতিদের মত তিনি ফিরে যাওয়ার লোক নন এবং বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নিয়েই তিনি বাংলায় আসেন। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে ইসলাম খান অবশ্যই তাঁর রাজ্য যশোর আক্রমণ করবেন। তাই তিনি অনুতপ্ত হয়ে সংগ্রামাদিত্যকে দিয়ে আশিখানি যুদ্ধের নৌকা ইসলাম খানের নিকটে পাঠান এবং পূর্বের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ইসলাম খান আগে থেকেই রেগে ছিলেন, তিনি প্রতাপাদিত্যের নৌকাগুলি ইমারত বিভাগের অধ্যক্ষকে দেন এবং নির্দেশ দেন ইট, পাথর, কাঠ, খড় ইত্যাদি বহন করে যেন নৌকাগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়।[১১] ইসলাম খান প্রতাপাদিত্যকে

Edited by Ripon Sarkar

শাস্তি দেয়ার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন, উসমান বুকাইনগর পরিত্যাগ করার পরে, যখন একে একে সকল জমিদার পরাভূত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে, তখন এই সুযোগ এসে যায়। উসমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আগে কিছু সময় ছিল, ইতোমধ্যে ইসলাম খান শুজাত খানকে পাঠাবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান, শুজাত খান এসে পৌঁছলে উসমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযান প্রেরণ করা হবে। এই অবসরে ইসলাম খান যশোরের প্রতাপাদিত্য এবং বাকলার রামচন্দ্রের (এ দুটি রাজ্য জয় করাই শুধু বাকি ছিল) বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

আগেই বলা হয়েছে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর বুকাইনগর অধিকৃত হয়। ইসলাম খান তখন টোক-এ অবস্থান করছিলেন। তিনি মোগল সেনানায়কদের মধ্যে মতানৈক্যের সংবাদ পেয়ে তাঁদের ডেকে পাঠান। ঐ সময়েই ইসলাম খান যশোর ও বাকলা অভিযানের আদেশ দেন, অর্থাৎ মনে করা যেতে পারে যে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই আদেশ দেয়া হয়। আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খান বুকাইনগর, হাসানপুর এবং এগার সিন্দুর রক্ষার সুব্যবস্থা করেন এবং নিজে টোকে ফিরে আসেন। যশোর অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয় ইসলাম খানের ভাই শয়খ গিয়াস-উদ-দীনের (গিয়াস খান এনায়েত খান) উপর, তাঁর সঙ্গে অন্য যে সেনানায়কদের দেয়া হয়, তাঁরা হলেন, ইফতিখার খানের ছেলে মিরযা মক্কী, মিরযা নাথন, সৈয়দ আবু সায়ীদ, সৈয়দ আহমদ, বাহাদুর বেগ, বুজাহ খুর (দুজনেই মুবারিজ খানের ভাই), মিরযা সাইফ-উদ-দীন, শাহ বেগ, খাকছার, শয়খ মুমিন, এবং তাঁর ভাই আরদশির (দুজনেই শয়খ আমিরার ছেলে) বাহাদুর খান হিজলী ওয়াল[১২] এবং শয়খ ইসমাইল ফতেহপুরী। তাঁদের সঙ্গে ইসলাম খান ও লছমী রাজপুতের বাছাই করা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, মনসবদার এবং অফিসারদের অনেক সৈন্য, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য, ইহতিমাম খানের অধীনস্থ রাজকীয় তিনশ কামান ও অস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধে নৌকা এবং মুসা খান ও অন্যান্য জমিদারদের যুদ্ধের নৌকাসমূহ দেয়া হয়। মীর বহর ইহতিমাম খানকে এগার সিন্দুরে থাকতে হওয়ায় এই যুদ্ধে নৌ-বাহিনীর নেতৃত্ব মিরযা নাথনকে দেয়া হয়। ইসলাম খান জানতেন যে প্রতাপাদিত্যের রণ সম্ভার, নৌকা এবং সৈন্য সংখ্যা প্রচুর, তাঁর জমিদারীর আয়ের পরিমাণও বেশি, তাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। প্রতাপাদিত্যের সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল বাকলার রাজা রামচন্দ্রের নিকট থেকে, রামচন্দ্র ছিলেন প্রতাপাদিত্যের জামাতা, তাই এই সাহায্যের পথ বন্ধের জন্য একই সঙ্গে বাকলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হয়। এই অভিযানের নেতাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে বাকলা আগে বিজিত হলে তারা যেন যশোরে মোগল বাহিনীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়।[১৩]

গিয়াস খান ছিলেন এগার সিন্দুরের নিকটে শাহবন্দরে, তিনি সেখান থেকে অগ্রসর হন এবং আলাইপুরের নিকটে পদ্মা নদী পার হয়ে, জলঙ্গী ও তার শাখা ভৈরব নদীর তীর ধরে যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং মাহাদপুর-ভাগয়ানে[১৪] গিয়ে অন্যান্য সেনানায়কদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। এখান থেকে তিনি তাঁর ভাইপো শয়খ মুমিনের নেতৃত্বে শয়খ ইসমাইল ফতেহপুরী ও মিরযা সাইফ-উদ-দীন নামক দুজন সেনানায়ক সহ পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্য ও দু হাজার পদাতিক সৈন্য বাঘা[১৫] গ্রাম লুট করতে পাঠান, উদ্দেশ্য চতুর্দিকে ভীতির সঞ্চার করা। সৈন্যরা গ্রামটি পুড়িয়ে দেয় এবং

Edited by Ripon Sarkar

চারদিকে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। মিরযা সাইফ-উদ-দীন সেখান থেকে অনেক সুন্দরী স্ত্রীলোক ধরে আনে। অতঃপর সেখানে একটা দুর্গ নির্মাণ করে গিয়াস খানকে সংবাদ দেয়া হয়। গিয়াস খান আদেশ দেন যে সেখানে একটা থানা স্থাপন করা হউক এবং মাসূদ ইসলাম খানী বা মিরযা জাফরকে থানার অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হোক। থানায় চারশ অশ্বারোহী সৈন্য রেখে অন্যান্যরা সেনাপতির নিকট ফিরে আসে।

এদিকে মিরযা নাথন চিলাজোয়ারের পিতাম্বর ও অনন্ত এবং আলাইপুরের ইলাহ বখশকে পরাজিত করে (পরে দ্রষ্টব্য) এসে গিয়াস খানের সঙ্গে মিলিত হন, অন্যান্য সেনানায়কেরাও এসে পৌঁছে। তারা সকলে শিকার করতে করতে অগ্রসর হয় এবং ভৈরব থেকে ইছামতি নদীতে পৌঁছে এবং বনগাঁও ধরে যমুনা এবং ইছামতির সংযোগ স্থল পর্যন্ত পৌঁছায়। এখানে সালকা[১৬] নামক স্থানে প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ছেলে উদয়াদিত্য একটি উচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন। দুর্গের একদিকে নদী, দু দিকে জলা এবং অন্য একদিকে একটি অত্যন্ত গভীর পরিখা খনন করা হয়, পরিখাটি প্রস্থে নদীর মত এবং নদীর সঙ্গে সংযোগ করে এটা পানিতে পূর্ণ করে রাখা হয়। নদী, জলা এবং পরিখা মিলে দুর্গটি অত্যন্ত সুরক্ষিত হয়। উদয়াদিত্য পাঁচশ যুদ্ধের নৌকা, এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং চল্লিশটি মত্ত হাতি নিয়ে দুর্গে অবস্থান নেন। তিনি খাজা কামালকে[১৭] নৌ-বাহিনীর এবং জামাল খানকে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। নৌকাগুলি নদীতে রেখে সৈন্যদের দুর্গে নিয়ে তিনি মোগলদের অপেক্ষা করতে থাকেন।

শত্রুদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে গিয়াস খান মিরযা নাথনের সঙ্গে পরামর্শ করে উদয়াদিত্যের সালকা দুর্গ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় যে মোগল সৈন্যরা নদীর দু তীর দিয়ে দুর্গের দিকে অগ্রসর হবে, প্রথম দলের নেতৃত্বে থাকবেন সেনাপতি গিয়াস খান এবং দ্বিতীয় দলের নেতৃত্বে থাকবেন মিরযা নাথন, মধ্য নদীতে নৌকা দু সারি হয়ে প্রত্যেক তীর ঘেঁষে অগ্রসর হবে। নৌকাগুলি দু তীরের সৈন্যদের বন্দুক ও তোপের সাহায্য পাবে। পরিকল্পনা মতে মিরযা নাথন রাত্রে নদী পার হয়ে অপর তীরে অর্থাৎ উদয়াদিত্যের দুর্গ যে দিকে অবস্থিত সেদিকে চলে যান। আরও স্থির হয় যে যদি উদয়াদিত্যের সৈন্যরা দুর্গ থেকে বের হয়ে আসে, ভাল, নতুবা মোগলরা শত্রুর দুর্গের সম্মুখে একটি দুর্গ তৈরি করবে এবং কামানের সাহায্যে শত্রুর নৌকা তাড়িয়ে দিয়ে সহজে দুর্গ জয় করে নেবে। লছমী রাজপুতকে রণপোতের নেতৃত্ব দিয়ে গিয়াস খান ও মিরযা নাথন অগ্রসর হবেন।

পরিকল্পনা মোতাবেক মোগল বাহিনী অগ্রসর হয়, কিন্তু উদয়াদিত্য যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন না, তিনি রণপোতও ছাড়লেন না, সৈন্যরাও দুর্গের বাইরে আসল না। অতএব গিয়াস খান ও মিরযা নাথন দশখানি করে বিশখানি নৌকা সম্মুখে নিয়ে আসেন এবং বাকি নৌকার মাল্লাদের আদেশ দেন তারা যেন নদীর দু তীরে শত্রুর দুর্গের মুখোমুখি দুটি দুর্গ নির্মাণ করে। মাল্লারা দুর্গ তৈরির কাজে লেগে যায়, এখন উদয়াদিত্য তাঁর ভুল বুঝতে পারেন কারণ তিনি দেখেন যে মোগলরা তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে। তাই মোগলদের দুর্গ প্রায় অর্ধেক শেষ হলে উদয়াদিত্য হঠাৎ রণপোত নিয়ে আক্রমণ শুরু করেন। তিনি খাজা কামালকে অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দেন এবং নিজে কেন্দ্রীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। খাজা কামালের সঙ্গে পিয়ারা, কোষা, বলিয়া, পাল, গুরব (কামান সজ্জিত বড় নৌকা), মাচুয়া, পশতা ও জালিয়া জাতীয় নৌকা ছিল এবং

Edited by Ripon Sarkar

উদয়াদিত্যের অধীনে ছিল অন্যান্য নৌকাগুলি। জামাল খানকে দুর্গের ভিতরে সৈন্য ও হাতির নেতৃত্ব দেয়া হয়। তাঁকে আদেশ দেয়া হয়, তিনি যেন দুর্গ রক্ষা করেন এবং প্রয়োজনমত মোগলদের প্রতি তীর ও গোলা নিক্ষেপ করে স্বপক্ষের নৌকাগুলির সাহায্য করেন। যুদ্ধ শুরু হয়, মোগল রণতরিগুলি আসতে দেরী হয় (কারণ মাল্লারা দুর্গ নির্মাণে নিয়োজিত ছিল), তাই শত্রুর আক্রমণের প্রথম চাপ পড়ে সম্মুখে আনীত বিশখানি নৌকার উপর। কিন্তু ঐ বিশখানি নৌকার সৈন্যরা জীবন তুচ্ছ করে যুদ্ধ করে, পশ্চাদপসরণ করল না। খাজা কামালের গুরবগুলি এবং দুখানি পিয়ারা নৌকা গিয়াস খানের দিকের দশখানি মোগল নৌকা আক্রমণ করে এবং গিয়াস খানের দিকে যে দুর্গ তৈরি হচ্ছিল তার নিচের তীরে নিয়ে গেল। তীরেই ছিলেন মিরযা মক্কী, আবু সায়ীদ ও শয়খ ইসমাইল, তাঁরা তাঁদের সৈন্যসহ ঘোড়া থেকে নেমে শত্রুদের প্রতি প্রচণ্ডভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকেন; শত্রুর একখানি গুরব ও একখানি পিয়ারা নৌকা মোগলদের হস্তগত হয়। উদয়াদিত্যের অধীনস্থ গুরবগুলি নোঙ্গর করেছিল, তাই পালাতে পারল না। মোগল তীরন্দাজগণ তাদেরও আক্রমণ করে; মাল্লারা এই ভীষণ আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বাঁচাতে থাকে।

নদীর অপর তীরে মিরযা নাথনের অগ্রগামী দশখানি নৌকাও শত্রুরা ঘিরে ফেলে, এখানেও নদীর পাড় থেকে মিরযা নাথন, লছমী রাজপুত, শাহ বেগ এবং অন্যান্যরা নিজ নিজ সৈন্যসহ শত্রুর মাল্লাদের প্রতি তীর ছুঁড়তে থাকেন, ফলে মাল্লারা এখানেও পালাতে থাকে এবং মোগলরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে মিরযা নাথন এমন স্থানে এসে পৌঁছেন যে খাজা কামালের নৌ-বাহিনী তাঁর পেছনে এবং উদয়াদিত্যের রণপোত তাঁর সামনে এবং পাশে থাকে, কিন্তু মিরযা এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করেন যে যশোরের রণপোতগুলি বিশৃঙ্খল হয়ে পরাজিত হয় এবং মাল্লারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় আক্রমণ করা দূরে থাক, তাদের আত্মরক্ষা করার শক্তি রইল না। এ অবস্থায় মোগলদের বন্দুকের গুলীতে খাজা কামাল নিহত হন। তাঁর মৃত্যুতে উদয়াদিত্যের বাহিনী আরও হতাশ হয়ে পড়ে। জামাল খান দুর্গ থেকে তীর ও কামান চালাতে থাকে, কিন্তু উদয়াদিত্য পলায়ন করেন।

খাজা কামালের মৃত্যুর পরে উদয়াদিত্যও হতাশ হয়ে যান এবং পলায়ন করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। মোগল নৌকাগুলি শত্রুদের নৌকা লুট করতে লেগে যায়, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সেনানায়কদের কথাও শুনে না। কিন্তু মিরযা নাথনের চারখানি রাজকীয় কোশা এবং মুসা খান ও বাহাদুর গাজীর দুইখানি কোশা নৌকা উদয়াদিত্যের পিছনে তাড়া করে, মিরযা নাথনও নদীর তীর বেয়ে উদয়াদিত্যের পিছনে পিছনে ছুটেন। উদয়াদিত্য প্রায় ধরা পড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পলায়নরত একখানি পিয়ারা, চারখানি গুরব এবং ফিরিঙ্গীদের একখানি মাছুয়া নৌকা নোঙ্গর করে যাতে মোগল নৌকাগুলির অগ্রযাত্রা বন্ধ হয়ে যায় এবং উদয়াদিত্যকে ধরতে না পারে। মোগল নৌকার পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং উদয়াদিত্য কিছু সময় পেয়ে যান। কিন্তু মিরযা নাথন এবং লছমী রাজপুত নদীর তীর থেকে আক্রমণ করে শত্রুর নোংগর করা নৌকাগুলি পরাস্ত করেন, মোগল পশ্চাদ্ধাবনকারী নৌকার মধ্যে চারখানি সেইগুলি লুট করতে লেগে যায়। মাহমুদ খান পনী এবং পীর মুহাম্মদ লোদীর অধীনে মিরযা নাথনের দুইখানি নিজস্ব কোশা নৌকা মিরযা নাথনকে দেখে লজ্জার খাতিরে লুট না করে উদয়াদিত্যের নৌকার পিছু পিছু চলতে থাকে।

Edited by Ripon Sarkar

মিরযা নাথন এবং লছমী রাজপুত নদীর পাড় থেকে তীর ছুঁড়তে ছুঁড়তে অগ্রসর হয়ে স্বপক্ষের নৌকার সাহায্য করেন এবং উদয়কে তাড়া করেন। যশোরের নৌকা পেছন দিকে গুলী করতে করতে পালাতে থাকে। এভাবে তাড়া খেতে খেতে উদয়াদিত্যের মহালগিরি নৌকা (বড় নৌকা যেখানে রাণীরাও থাকেন) নদীর সঙ্কীর্ণ স্থানে এসে পৌঁছে বাধাগ্রস্ত হয়। সামনে নৌকার ভীড়ে পথ বন্ধ। মোগল দুখানি নৌকা উদয়াদিত্যের মহালগিরি নৌকার অতি নিকটে এসে যায় এবং উদয়াদিত্য প্রায় ধরা পড়ার উপক্রম হয়। এ সময় উদয়াদিত্যের পলায়নরত অগ্রবর্তী কোশা নৌকার মাল্লারা তাদের মনিবের এই দুর্দশা দেখে তাদের দার ফেলে বৈঠা বেয়ে দ্রুত গতিতে এসে তাদের নৌকার পেছনের দিক মহালগিরির সামনের দিকে নিয়ে আসে। ঠিক এই সময় মোগল নৌকা মহালগিরির পেছন দিকে ছুঁই ছুঁই করছে এবং মাল্লারা মহালগিরিতে উঠার চেষ্টা করছে; মহালগিরির মাল্লারা ভয়ে কেউ কেউ তীরে উঠে যায়, আবার কেউ কেউ নদীতে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু উদয়াদিত্য ত্বরিত গতিতে দুই রাণীর হাত ধরে কোশায় ঝাঁপ দিয়ে উঠে, মাল্লরাও কোশাখানি সঙ্গে সঙ্গে চালিয়ে অন্যান্য নৌকার আগে চলে যায়। যুবরাজের সম্পদ ভরা মহালগিরি নৌকা লুট করার লোভ কেউ সংবরণ করতে পারল না, মোগল কোশা থেমে যায় এবং উদয়াদিত্যও রক্ষা পায়। মিরযা নাথন হাত চাপড়াতে চাপড়াতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে নৌকা না থাকাতে কোন ফল হল না। যশোরের নৌকার মধ্যে মাত্র বিয়াল্লিশ খানি পালাতে সমর্থ হয়, বাকি সব তোপসহ মোগল সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। এদিকে খাজা কামালের মৃত্যু, এবং উদয়াদিত্যের পলায়ন দেখে জামাল খানও হাতি নিয়ে দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করেন। মিরযা নাথন পরিখা পার হয়ে দুর্গে ঢুকেন এবং বিজয় বাদ্য বাজান। সালকা যুদ্ধে মোগলরা জয় লাভ করে।[১৮]

উদয়াদিত্যের পরাজয়ের কারণ প্রথমত তাঁর নৌবহরের সংখ্যাধিক্য, একেত নদী ছোট, তার উপর ডিসেম্বর মাসের শুষ্ক মৌসুম, নদীর পানি নিচে নেমে গেছে, এমতাবস্থায় এতগুলি নৌকার সমাবেশ হওয়ায় নৌকার স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়, প্রয়োজনমত সামনে, পেছনে বা পাশে দিয়ে আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক চলাচল করার কোন উপায় ছিল না, এমনকি পালাবার সময় অত্যধিক নৌকার ভীড়ে তাদের পালাবার পথও বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, নদী ছোট হওয়ায় তীরবর্তী মোগল সৈন্যদের তীর ও গুলীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় মাল্লাদের ছিল না, নিকট থেকে তীর ও গুলী নিক্ষেপ করায় মোগল সৈন্যদের লক্ষ্য হয় অব্যর্থ। তাছাড়া নদীর তীর ছিল উঁচু। উঁচু থেকে নিচে আক্রমণ করা যেমন সহজ, নিচে থেকে উপরে আক্রমণ করা তেমন সহজ নয়। উপর থেকে নিক্ষিপ্ত তীর ও গুলীর মুখে মাল্লারা আত্ম-রক্ষাও করতে পারে না, পালাতেও পারে না। তৃতীয়ত যদিও উভয় পক্ষ রণপোতের সমাবেশ করে, প্রকৃত যুদ্ধ করে তীরের, অর্থাৎ স্থলের সৈন্যরা; জল যুদ্ধ হয় নামমাত্র, স্থল সৈন্যরাই যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারণ করে। উদয়াদিত্য সৈন্যদের দুর্গে না রেখে বাইরে নিয়ে এলে তারা মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত; সৈন্যে সৈন্যে এবং নৌকায় নৌকায় যুদ্ধ হলে হয়ত উদয়াদিত্যের শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হত না। তিনি দুর্গে হাতিও রাখেন, কিন্তু ব্যবহার করেননি, মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে হাতি ব্যবহার করলেও হয়ত তাঁর রণপোতগুলি সৈন্যদের গোলাগুলী থেকে কিছুটা রেহাই পেত। এই হিসেবে মোগল সেনাপতির পরিকল্পনা ছিল নিখুঁত; তাদের অনেক হাতি থাকলেও এই যুদ্ধে হাতির ব্যবহার দেখা যায় না। তিনি কিন্তু অত্যন্ত

Edited by Ripon Sarkar

সফলভাবে স্থল সৈন্যের ব্যবহার করেন। সালকার যুদ্ধ প্রতাপাদিত্যকে চঞ্চল করে দেয়, তাঁর নৌবাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি মোগলদের হাতে পড়ে। অন্যদিকে সালকার যুদ্ধে জয়লাভ করে মোগল বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পায়।

মোগল বাহিনী সালকায় এক রাত অবস্থান করে। পরের দিন সকালে গিয়াস খান বুড়ন[19] দুর্গের দিকে যাত্রা করেন। মির্জা নাথন যুদ্ধে ক্লান্ত হয়ে নৌকায় বিশ্রাম নেন এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদ মুরাদের সৈন্যসহ তাঁর নিজের সৈন্য পাঠিয়ে দেন। এই সৈন্যদল বুড়নের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি লুট করে চার হাজার যুবা-বৃদ্ধ স্ত্রীলোক ধরে নিয়ে আসে এবং তাদের বিবস্ত্র করে। মির্জা নাথন সেখানে পৌঁছে এটা জানতে পেরে তাদের খুঁজে বের করে মুক্তি দেন এবং অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য দিয়ে তাদের নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দেন। ইতোমধ্যে সৈয়দ হাকিম ও অন্যান্য সেনানায়কেরা বাক্লা জয় করে (পরে আলোচিত) যশোর আক্রমণ করেন। এখন প্রতাপাদিত্য মহা বিপদে পড়েন, মোগল বাহিনী দু দিক থেকে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেছে, জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্য পরাজিত হয়ে সালকা দুর্গ ত্যাগ করেছেন, তাঁর নৌবাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি মোগলদের হস্তগত, এমতাবস্থায় তিনি চারদিক অন্ধকার দেখতে থাকেন। তিনি আর একটি দুর্গ তৈরির পরিকল্পনা করেন, কিন্তু এই দুর্গের কথা যাতে শত্রুরা না জানতে পারে এবং নির্বিঘ্নে যাতে দুর্গ তৈরি হয়; এ উদ্দেশে মোগলদের সঙ্গে মিথ্যা সন্ধির কথাবার্তা বলে সময় কাটাবার মনস্থ করেন। তিনি যশোর থেকে নদীপথে[20] বুড়ন-এ যান এবং মির্জা নাথনের নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন: "আপনার পিতা (ইহতিমাম খান) আমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেন, সে হিসেবে আপনি আমার ভাই। সুতরাং আমাকে গিয়াস খানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করি।" মির্জা নাথন গিয়াস খানের নিকট এই সংবাদ দেন। গিয়াস খান একজন দূত পাঠিয়ে প্রতাপাদিত্যকে বলেন: "আমি উক্তভাবে রাজি হতে পারি না, আপনার যদি সত্য সত্যই এরূপ মনের ইচ্ছা থাকে তবে কালই আপনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন, নতুবা আমি পরদিন যশোরের দিকে যাত্রা করব এবং সেখানে আপনার অতিথি হব, সেখানে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে।" পরের দিন গিয়াস খানের দূত ফিরে এসে জানান যে প্রতাপাদিত্যের কথা মিথ্যা, তাঁর উদ্দেশ্য শুধু সময় কাটান এবং নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা। সুতরাং তৃতীয় দিনে গিয়াস খান যাত্রা করেন এবং খড়গুর ঘাটে[21] পৌঁছেন।[22]

প্রতাপাদিত্য যমুনা এবং কাগরঘাটা[23] খালের মধ্যবর্তী স্থানে সালকা দুর্গের মত একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন, অর্থাৎ তাঁর দুর্গের একদিকে যমুনা নদী এবং অপর দিকে কাগরঘাট খাল; দুদিকে যেহেতু খাল, অন্য দুদিকে অবশ্যই পরিখা খনন করা হয় এবং খালের বা নদীর সঙ্গে সংযোগ করে দেয়া হয়। নদীতে অসংখ্য নৌকা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়, প্রতাপাদিত্য নিজে অনেক সৈন্য, হাতি এবং কামান নিয়ে দুর্গের ভিতরে অবস্থান করেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের এই দুর্গটিও ছিল অত্যন্ত সুদৃঢ়।

গিয়াস খান সালকা দুর্গের যুদ্ধের মত একই পরিকল্পনায় যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজে নদীর বাম তীর দিয়ে সৈন্যবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং মির্জা নাথনকে নদীর ডান তীর ধরে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। মির্জা নাথন প্রচণ্ড বৃষ্টি উপেক্ষা করে রাত্রে নদী পার হয়ে ডান তীরে যান এবং পরদিন প্রাতে নদীর উভয় তীর দিয়ে উভয় বাহিনী

Eidited by Ripon Sarkar

সাহায্য করে; বাধা ছিল নৌ-বাহিনী, নদীর পাড় থেকে সৈন্যদের অগ্রগতির সাথে সাথে যোগে অগ্রসর হতে পারে। কাগরঘাটার যে খালটি দু'পাশের পাশ দিয়ে প্রবাহিত, তার মোহনায় প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী অবস্থান নিয়েছিল কিন্তু তারা মোগল রণতরী এবং নদীর তীরের সৈন্যদের গোলাগুলী সহ্য করতে না পেরে পিছিয়ে গিয়ে (প্রতাপাদিত্যের) দুর্গের নিকটে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মোগলদের নৌকাও অগ্রসর হয়, কিন্তু মোগল পদাতিক দলে থেকে যেতে বাধ্য হয়, তারা দুর্গের নিকট যেতে অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়, কারণ দুর্গের উপর থেকে অনবরত গোলা বর্ষিত হচ্ছিল। বাম দিকে গিয়াস খানের অগ্রসরও বন্ধ হয়, কারণ সম্মুখে নদী পড়ায় তিনি নদী পার হতে পারলেন না। এই অবস্থায় মির্জা নাথন এবং তাঁর সহযোগী রাজপুত তাঁদের সৈন্যদের নিয়ে অসম সাহসে অগ্রসর হন এবং কাগরঘাটা খালের নিকটে গিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন। যদিও তাঁদের দুশ সৈন্য এবং দশটি হাতি জলার কাদায় আটকে যায় এবং যদিও দুর্গের ভিতর থেকে শিলাবৃষ্টির মত গোলাগুলী বর্ষিত হচ্ছিল, তবুও সব কিছু উপেক্ষা করে তাঁরা অগ্রসর হতে থাকেন। মির্জা নাথন নৌ-বাহিনীকে নির্দেশ দেন যে তিনি যখন সৌভাগ্য অর্জিত হাতি নিয়ে খাল অতিক্রম করবেন, তারা যেন নৌকা নিয়ে খালে প্রবেশ করে। তিনি আরও বলেন যে হাতি খাল অতিক্রম করার সময় শত্রুরা হাতির দিকে গুলী চালাবে, এই অবসরে নৌকা খালে প্রবেশ করবে এবং তারা নৌকার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ফলে মির্জা নাথন যখন কয়েকজন বিশ্বস্ত সহযোগী নিয়ে হাতিসহ শত্রুর দুর্গের সম্মুখস্থ খালে প্রবেশ করে, তখন মোগল নৌবাহিনী দ্রুতবেগে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনীর উপর পতিত হয়। দুর্গের সৈন্যদের সকলের দৃষ্টি তখন মির্জা নাথনের দিকে নিবদ্ধ, তারা সেদিকেই গোলাগুলী ছুঁড়ছিল, তারা স্বপক্ষের রণপোতের কোন সাহায্য করতে পারল না। ফলে প্রতাপাদিত্যের নৌ-বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়, মির্জা নাথন খাল পার হয়ে হাতি নিয়ে দ্রুত দুর্গের দরজার দিকে গেলেন। মোগল নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র বাহুও সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের নিকট পৌছল। অনেক যুদ্ধ চলে, হতাহত সৈন্যের স্তূপ পড়ে যায়, কিন্তু প্রতাপাদিত্য মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারলেন না, তিনি রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করেন, মির্জা নাথন দুর্গ জয় করে বাদ্য বাজালেন। গিয়াস খান এবং অন্যান্য সকলে নদী পার হয়ে দুর্গে প্রবেশ করেন এবং বিজয় সংবাদ ইসলাম খানের নিকট প্রেরণ করেন।[২৯]

প্রতাপাদিত্য হতাশ হয়ে যশোরে পলায়ন করেন এবং উদয়াদিত্যের সঙ্গে মিলিত হন। এদিকে তাঁর সেনাপতি জামাল খান আর যশোরে ফিরে গেলেন না, তাঁর পরিবার পরিজন কাগরঘাটায় ছিল, তিনি সেখানেই থেকে গেলেন। তিনি বুঝতে পারেন যে প্রতাপাদিত্যের পতন আসন্ন, তাই তিনি এই সুযোগে মোগল বাহিনীতে যোগ দেন। অন্যদিকে বাকলা থেকে সৈয়দ হাকিমের বাহিনীও এসে পৌছেছে। তাই প্রতাপাদিত্য তাঁর ছেলে উদয়াদিত্যের সঙ্গে পরামর্শ করে নিম্নরূপ স্থির করেন: "উভয় দিক থেকে আমরা মোগল বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত, তারা আমাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ফিরিঙ্গীরাও সাহস পাবে। এমনিতে ফিরিঙ্গীরা আমাদের রাজ্য লুট করে ধ্বংস করে দেয়, এখন তারা আরও বেশি ধ্বংস ও লুণ্ঠন চালাবে। এতে আমাদের কোন উপকার হবে না। তার চাইতে যদি আমি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করি, তাহলে দেখতে পারি আমার ভাগ্যে কি আছে। যদি আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়, আমরা আবার আমাদের রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করতে পারব।" এরূপ স্থির করে রাজা ঐ দিনই একটি ছোট নৌকায় করে

Edited by Ripon Sarkar

দুজন সহকারী নিয়ে কাগরঘাটায় যান এবং গিয়াস খানের শিবিরে এসে সাক্ষাত প্রার্থনা করেন। গিয়াস খান শয়খ মুমিন এবং সৈয়দ মাসুমকে পাঠান; তাঁরা বাইরে গিয়ে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে করমর্দন করেন এবং তাঁকে সসম্মানে গিয়াস খানের নিকট নিয়ে আসেন। গিয়াস খানও প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন এবং সসম্মানে বসান এবং ঘোড়া ও খিলাত উপহার দেন। স্থির হয় যে প্রতাপাদিত্য তাঁর সকল সৈন্য ও অফিসারকে উদয়াদিত্যের অধীনে যশোরে রাখবেন এবং মোগল বাহিনী কাগরঘাটায় থাকবে। গিয়াস খান প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে ঢাকায় সুবাদারের নিকট যাবেন, সুবাদার যা স্থির করেন, তাই করা হবে। কথাবার্তা ঠিক করে গিয়াস খান প্রতাপাদিত্যকে স্বীয় শিবিরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। প্রতাপাদিত্য মিরযা মক্কী এবং মিরযা নাথনের শিবিরে গিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তাঁরা তাঁকে সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং ঘোড়া ও খিলাত দিয়ে বিদায় দেন। এই কথা অনুসারে গিয়াস খান চতুর্থ দিনে রাজা প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে ঢাকায় রওয়ানা হন; নিরাপত্তার খাতিরে তিনি মিরযা নাথনের অধীনস্থ চল্লিশখানি রাজকীয় নৌবহরের নৌকা সঙ্গে নেন। বাকি সকল সৈন্য, নৌকা এবং হাতি কাগরঘাটায় থেকে যায়; গিয়াস খান যাত্রার সময় মিরযা নাথনকে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।[২৫] মোগলরা সেখানে সস্তায় বাংলা ঘর তৈরি করে থাকার ব্যবস্থা করে। মিরযা নাথন পনরশ টাকায় একখানি তিনতলা দালান তৈরি করেন। মিরযা নাথন এখানকার বাঁকুড়া মন্দিরের বিশেষ প্রশংসা করেন, এই মন্দির প্রতাপাদিত্য তাঁর গুরু কটকী ব্রাহ্মণের জন্য নির্মাণ করেন। সেখানে মোগল সৈন্যদের কাজ ছিল নাচ গান উপভোগ করা, হাফেজ নিযুক্ত করে কোরান পাঠের ব্যবস্থা করা এবং ধন রত্ন লাভের উদ্দেশে আশে পাশের গ্রামগুলি লুট করা। মিরযা মক্কী লুট করত বলে উদয়াদিত্য তাঁকে সোনাদানা দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতেন কিন্তু মিরযা নাথন কিছু না পাওয়ায় তিনি রেগে যান এবং তিনিও একদিন লুট করেন।[২৬] পরে হয়ত তাঁকেও সোনাদানা দিয়ে সন্তুষ্ট করা হয়, যার উল্লেখ বাহরিস্তানে নেই। বিজিত এলাকায় লুটপাট করা মোগল সৈন্যদের একটি গর্হিত কাজ, মনে হয় সেনাপতির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সৈন্যরা যথেচ্ছ ব্যবহার করে এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়।

এদিকে গিয়াস খানের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য ঢাকা গেলে ইসলাম খান তাঁকে বন্দী করেন এবং গিয়াস খানকে যশোরের শাসনভার দেন। খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশীকে যশোর রাজ্যের রাজস্ব নির্ধারণের জন্য পাঠান হয়, অর্থাৎ যশোরকে মোগল শাসনভুক্ত করে নেয়া হয়।[২৭] রাজা প্রতাপাদিত্যের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটে সে বিষয়ে বাহরিস্তান বা অন্য সমসাময়িক সূত্রে কোন উল্লেখ নেই। স্যার যদুনাথ সরকার বলেনঃ[২৮] "প্রতাপকে কি লোহার খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল? অসম্ভব নয়, কারণ ঠিক এই সময় ঢাকা দুর্গের দুইজন বন্দী পাঠান জমিদার রক্ষীকে ধুতুরা মিশ্রিত রুটি ও হালুয়া খাওয়াইয়া অজ্ঞান করিয়া, কারাগার খুলিয়া রাত্রে বাহির হইয়া, নদীতে প্রস্তুত নৌকায় চড়িয়া পলাইয়া যায়। তাহার পর ইসলাম খাঁ নিশ্চয়ই কারাগারের বন্ধন কঠিনতর করেন। এই সব ঘটনার বছর (বোধ হয় এক বৎসর বলতে চেয়েছেন, কিন্তু "এক" শব্দটি ছাপা হয়নি) পরে ইসলাম খাঁর পুত্র হুশঙ্গ পরাজিত আফগান (ওসমান খাঁ) বঙ্গীয় জমিদারগণ ও মগরাজা হইতে গৃহীত মূল্যবান লুটের সামগ্রী হাতি এবং কয়েকজন মগ সঙ্গে লইয়া আগ্রা গিয়া (১৬১৩ মার্চ মাসে) পিতার এই সব বিজয় উপঢৌকন বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সম্মুখে স্থাপন করেন। প্রতাপ তাহাদের মধ্যে ছিলেন না...। সুতরাং তিনি

Edited by Ripon Sarkar

কাশীতে যে মারা যান, এ প্রবাদ সত্য হইতে পারে। বাংলায় তাঁহার স্থান ছিল না।" স্যার যদুনাথ এখানে কয়েকটি ঘটনা একত্র করে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেননি। ১ম, প্রতাপাদিত্যকে খাঁচায় বন্দী করার কথা সমর্থন করে তিনি দুজন বন্দী জমিদার কর্তৃক প্রহরীকে ধুতুরা খেতে দিয়ে অজ্ঞান করে পালিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এটা বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার খানের ভাই হোসেন খানের কথা। হোসেন খান এর পরে আবার ধরা পড়লে তাঁকে কঠোরভাবে বন্দী করেন (put into strict confinement),[২৯] এর দ্বারা সম্ভবত পিঞ্জরায় আবদ্ধ করার কথা বুঝায় না। আনোয়ার খান বার-ভূঁঞার একজন ছিলেন; তিনি এবং তাঁর ভাই হোসেন খান বার-ভূঁঞার সঙ্গে মিলিত হয়ে এবং এককভাবে মোগলদের বিরুদ্ধে যেরূপ যুদ্ধ করেন তার সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের তুলনা হয় না। মোগলদের বিরুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে প্রতাপাদিত্য বড় যোদ্ধা ছিলেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। পিতার রাজ্যের তিনি মালিক হন, পিতৃ সম্পদ নিয়ে ধন বলে অস্ত্র বলে বলীয়ান হন, কিন্তু নিজে যোদ্ধা ছিলেন না। যে প্রবাদে প্রতাপাদিত্যকে খাঁচায় করে দিল্লী নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে প্রবাদে প্রতাপাদিত্যকে আকবরের সময়ে রাজা মানসিংহ কর্তৃক খাঁচায় বন্দী করে পাঠাবার কথা বলা হয়েছে। এই প্রবাদের কোন ভিত্তি নেই, বাহরিস্তান আবিষ্কৃত হওয়ার পরে এই প্রবাদ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং প্রবাদের কিছু অংশ সত্য মনে করার কোন কারণ নেই। প্রতাপাদিত্যকে বীর বানাবার জন্য প্রবাদে খাঁচায় বেঁধে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রতাপাদিত্য যে বীর ছিলেন না, তা যুদ্ধের বিবরণেই প্রমাণিত হয়। তাঁর রেকর্ড কি? তিনি তিনবার আনুগত্য প্রদর্শন করেন, সুবাদারের নিকট উপহার পাঠান, নিজে গিয়ে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন, আবার ক্ষমা ভিক্ষা করেন, তাঁকে ক্ষমা না করে যুদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়, দায়সারা যুদ্ধ করে পরাজিত হন এবং জামানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ করেন। ২য়, স্যার যদুনাথ হুগলি কর্তৃক পরাজিত আফগান, বঙ্গীয় জমিদার এবং ধৃত মগদের সম্রাটের দরবারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে শুধু পরাজিত আফগানদের সম্রাটের দরবারে নেয়া হয় এবং দিওয়ান মুতাকিদ খান তাঁদের আগ্রায় নিয়ে যান। হুগলি শুধু মগদের দরবারে নেন, কিন্তু এটা আরও পরের ঘটনা। (পরে আলোচিত)। প্রতাপাদিত্যের ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা না গেলেও তাঁর ছেলেদের যে সম্রাটের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয় তার প্রমাণ বাহরিস্তানে আছে। সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহ জঙ্গ (নবেম্বর ১৬১৭—এপ্রিল ১৬২৪) কোচ বিহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে মুক্তি দিয়ে আগ্রা থেকে স্বদেশে পাঠাবার জন্য সম্রাটের নিকট যে আবেদন করেন তাতে প্রতাপাদিত্যের ছেলেদেরও মুক্তি দিয়ে আগ্রা থেকে যশোরে পাঠাবার কথা আছে।[৩০] কিন্তু এই আবেদনে প্রতাপাদিত্যকে মুক্তি দেয়ার কথা নেই। হয় ঢাকায় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয় এবং তাঁকে আগ্রায় পাঠাবার প্রয়োজন হয়নি, অথবা প্রতাপাদিত্যকে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে আগ্রায় পাঠানো হয় কিন্তু ইতোমধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেয়ার আবেদন করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু আগ্রায়ও হতে পারে, আগ্রায় যাওয়ার পথেও হতে পারে। কোন তথ্য যখন নেই প্রবাদের কথাই মেনে নেওয়া যেতে পারে যে কাশীতে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হয়, কিন্তু খাঁচায় বন্দী করার কথা সত্য বলে মনে হয় না। সুবাদার ইবরাহীম খানের আবেদনে

Eidited by Ripon Sarkar

সাড়া দিয়ে সম্রাট কামতার রাজাকে মুক্তি দেন, রাজা লক্ষীনারায়ণ কামতায় ফিরে আসেন; কামরূপের রাজা পরীক্ষিতকে মুক্তি দেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি স্বদেশে ফিরে যেতে পারেননি (দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ছেলেদের মুক্তি দেয়া হয় কিনা সে বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে প্রতাপাদিত্যের ছেলেদেরও মুক্তি দেয়া হয়[৩১] এবং বাহারিস্তানকে তাঁর সূত্র রূপে উল্লেখ করেন, কিন্তু বাহারিস্তানে এরূপ কোন কথা নেই। অতএব, ডঃ ভট্টাচার্যের এই বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

মোগলদের যশোর জয় করতে প্রায় মাসখানেক সময় লাগে। আমরা দেখেছি যে ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মোগল বাহিনী যুদ্ধ যাত্রা করে, সুতরাং ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই এই যুদ্ধ শেষ হয়। এর পরেই খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়, এই যুদ্ধে মিরযা নাথন এবং অন্যান্য সেনানায়কেরা অংশ নেন। গিয়াস খানকে সিলেটের বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, তিনি অপারগতা প্রকাশ করলে শয়খ কামালকে ঐ যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়া হয়। গিয়াস খান যশোরে ফিরে গিয়ে শাসন কাজ পরিচালনা করছিলেন। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দিকে যশোরে গিয়াস খান মৃত্যুবরণ করেন, ইসলাম খান তাঁর চাচা শয়খ মউদুদকে গিয়াস খানের স্থলে যশোরের শাসক নিযুক্ত করেন। সম্রাট শয়খ মউদুদকে চিশতী খান উপাধি দেন এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে তাঁকে সম্মানিত করেন।[৩২] আগেই বলা হয়েছে, যশোর বিজিত হওয়ার পরে খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশীকে রাজস্ব নির্ধারণের জন্য পাঠানো হয়। এতে মনে হয় যে যশোরের জমিদারী প্রতাপাদিত্যের উত্তরাধিকারীদের ফেরত দেয়া হয়নি বরং প্রত্যক্ষ শাসনের অধীনে রাখা হয়।

বাকলা বিজয়

আকবরের সময় বাকলার রাজা ছিলেন কন্দর্প নারায়ণ; প্রতাপাদিত্যের যশোরের পূর্বে বাকেরগঞ্জের অধিকাংশ এলাকা নিয়ে এই রাজ্য গঠিত ছিল। ইসলাম খানের সময়ে বাকলার রাজা ছিলেন কন্দর্প-নারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র। তিনি প্রতাপাদিত্যের জামাতা ছিলেন, তাঁর বয়সও ছিল অল্প। ইসলাম খান যশোরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় বাকলার বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয় সৈয়দ হাকিমকে, তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাই সৈয়দ কাসু, মিরযা নূর-উদ-দীন, রাজা শত্রুজিত এবং ইসলাম কুলীকে অনেক যুদ্ধের নৌকা, তিন হাজার বন্দুকধারী সৈন্য, বিশটি হাতি এবং প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রসহ দেয়া হয়। মোগল বাহিনী বাকলায় পৌছলে রামচন্দ্র তাদের বাধা দেয়ার জন্য একটি দুর্গ তৈরি করে প্রস্তুত হন। রাজমাতা যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করার জন্য ছেলেকে উপদেশ দেন কিন্তু ছেলে তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের পরামর্শে মায়ের উপদেশ না শুনে যুদ্ধ করেন। মোগল বাহিনীর সঙ্গে ক্ষুদ্র রাজ্য বাকলার যুদ্ধ করে পেরে উঠার কথা নয়, কিন্তু অল্প বয়স্ক রাজা বীরত্বের সঙ্গে সাতদিন যুদ্ধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। মোগলরা সম্মুখে অগ্রসর হলে রাজমাতা বলেন যে রাজা আবার যুদ্ধ করলে তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করবেন। ফলে রাজা আর যুদ্ধ না করে আত্মসমর্পণ করেন। রাজমাতা অবশ্যই বিদুষী ছিলেন বলতে হবে, আবারও যুদ্ধ করে পরাজিত হলে গোটা রাজ্যটি লুটতরাজের কবলে পড়ত এবং মহিলাদের ইজ্জত আব্রুও নষ্ট হতে পারত। যা হোক রাজার আত্মসমর্পণের সংবাদ

Edited by Ripon Sarkar

ইসলাম খানের নিকট পাঠানো হয়। সুবাদার আদেশ দেন যে রাজা রামচন্দ্রকে শত্রুজিতের অধীনে ঢাকা পাঠান হোক এবং অন্যান্য সেনানায়কদের যশোর আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা রামচন্দ্র ঢাকা এলে ইসলাম খান তাঁকে নজরবন্দী করে রাখেন। রাজার নৌবহর পরিচালনার জন্য যতটুকু ভূ-সম্পত্তি দরকার ঐ পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি তাঁকে দেয়া হয়, বাকি সম্পূর্ণ এলাকা মোগল শাসনের অধীনে আনা হয় এবং সেখানে জায়গীরদার এবং করোরী নিযুক্ত করা হয়। ইসলাম খান এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সকল সেনানায়ককে পুরস্কৃত করেন এবং রাজা শত্রুজিতকে যশোরের যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দেন।[৩৩] মনে হয় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বাকলা বিজয় সম্পন্ন হয়।

চিলা জোয়ার ও আলাইপুরের জমিদারদের দমন

মিরযা নাথন গিয়াস খানের নেতৃত্বে যশোর অভিযানে যাওয়ার পথে তাঁর পিতার জায়গীর ভাতুরিয়াবাজুর চিলাজোয়ারে যান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দু একদিন বিশ্রাম নেয়া এবং পিতার জায়গীর সরেজমিনে তদারক করা। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁর বিশ্রাম নেয়া হল না। তিনি দেখেন যে চিলাজোয়ারের জমিদার পিতাম্বর এবং অনন্ত খাজনা দেয়া বন্ধ করেছেন। নাথনের যাওয়ার সংবাদ পেয়ে তাঁরা পালিয়ে যান এবং আলাইপুরের জমিদার বরখুরদারের পুত্র ইলাহ বখশের আশ্রয় নেন। এ কথা বর্ণনা করে মিরযা নাথন বলেন যে বরখুরদার শাহবাজ খান কর্তৃক বন্দী হয়েছিলেন। মিরযা নাথন ইলাহ বখশকে সদুপদেশ দেন। কিন্তু ইলাহ বখশ মিরযা নাথনের উপদেশ না শুনে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ফলে মিরযা নাথন তাঁকে আক্রমণ করেন এবং ইলাহ বখশের একটি দুর্গ অধিকার করেন। ইলাহ বখশের অনেক সৈন্য হতাহত হয়। অতঃপর মিরযা নাথন দ্বিতীয় দুর্গটি আক্রমণ করেন। তিনি চুহরীকল নামক এক হাতি সম্মুখে দিয়ে সৈন্যসহ অগ্রসর হন। কিন্তু জমিদারের সৈন্যরা দুর্গের ভিতর থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে এবং হাতির চালক ও হাতিটিকে মারাত্মক ভাবে জখম করে। হাতিটি পিছনে চলে আসতে বাধ্য হয়। ইহা দেখে হাতির দ্বিতীয় বা পেছনের চালক সম্মুখে গিয়ে হাতিটিকে আবার প্রচণ্ড বেগে দুর্গের প্রধান ফটকের দিকে নিয়ে যায়; দুর্গের উপর থেকে প্রচণ্ড গুলী ও তীর বর্ষিত হলেও সে ভ্রুক্ষেপ না করে অগ্রসর হয়ে দুর্গের সদর দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে মিরযা নাথনের সৈন্যরাও দুর্গে ঢুকে পড়ে এবং জয় বাদ্য বাজায়।[৩৪]

পিতাম্বর রাজশাহীর পুটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পুটিয়া এবং আলাইপুরের জমিদারী সম্পর্কে আঞ্চলিক ইতিহাসে যা পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ[৩৫]

"ষোড়শ শতকে সরকার বারবকাবাদের অন্তর্গত পরগণে লস্করপুর অবস্থিত। পদ্মার উত্তর তীরে মুর্শিদাবাদ ও রাজশাহী জেলায় ইহার ভূমি বিস্তৃত ছিল। বর্তমান পুটিয়া গ্রামে এই পরগণার সদর এবং চারঘাট থানার আলাইপুর গ্রামে ইহার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। তখন এই পরগণার বার্ষিক রাজস্ব ছিল ২৫৫০৯০ দাম। এই লস্করপুর পরগণা পুটিয়া রাজবংশের প্রথম জমিদারী। বৎসরাচার্য নামক জনৈক ঠাকুর এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।...লস্করী খান একজন পাঠান জায়গীরদার। নিজ নামে পরগণে লস্করপুরের জায়গীরদারী করিতেন। একদা লস্করী খান বিদ্রোহী হইয়া মোগল

Edited by Ripon Sarkar

সরকারকে রাজস্ব প্রদানে বিরত থাকেন। বাদশা আকবর কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে সেনাপতি মানসিংহকে প্রেরণ করিলে লস্করী খান উৎখাত হইয়া স্বীয় জমিদারী হইতে বেদখল হন। অতঃপর এই লস্করপুর পরগণা বৎসরাচার্য মতান্তরে তৎপুত্র পিতাম্বরের নামে বন্দোবস্ত হয়। এই পিতাম্বর হইতে পুটিয়া রাজ্যের উৎপত্তি।"

"উক্ত লস্কর খান পরে আলাইপুরে কিছুদিন অতিবাহিত করিবার পর পরলোক-গমন করেন। তাঁর অধঃস্তন বংশের দাবিদারগণ এখনও আলাইপুরে জীবিত আছেন। তাঁহারা এই আলাইপুরের খাঁ নামে পরিচিত।"

আলাইপুরের নিকটে বাঘা নামক একটি গ্রামে মৌলানা শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ-এর দরগাহ আছে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর জে. এস. কার্সটেইনস বাঘা সম্পর্কে প্রবাদ যোগাড় করেন।[৩৬] এই প্রবাদে বলা হয় যে গৌড়ের কোন এক রাজা কোথাও যাওয়ার সময় একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে (যে স্থান পরে বাঘা নামে পরিচিতি লাভ করে) একজন ফকীরের সাক্ষাত পান। ফকীরের অতিলৌকিক কাজে মুগ্ধ হয়ে রাজা ফকীরকে ভূমি দান করতে চান, কিন্তু ফকীর গ্রহণ না করায় ফকীরের ছেলেকে বাইশটি মৌজা লাখেরাজ দান করেন। ফকীরের নাম শাহ মুহাম্মদ দৌলা বা শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ। তিনি মখদুমপুরের আলা বখশ বরখুরদার লস্করী নামক জমিদারের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তাঁর ছেলের নাম মৌলানা দানিশমন্দ। ইসলাম খান যখন ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাটের পথে আলাইপুরে শিবির স্থাপন করেন, তখন সুবাদারের সহগামী আবদুল লতীফ বাঘায় হাওয়াদা মিয়াকে দেখেন, এই হাওয়াদা মিয়ার পুত্র আবদুল ওয়াহাব শাহজাহানের নিকট থেকে বিয়াল্লিশটি গ্রাম লাভ করেন। বাঘার মসজিদটি ৯৩০ হিজরী বা ১৫২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ের সুলতান নসরত শাহ নির্মাণ করেন।[৩৭]

তথ্যের অভাবে মিরযা নাথন কর্তৃক পরাজিত আলাইপুরের জমিদারের পরিচিতি নির্ভুলভাবে দেয়া সম্ভব নয়, তবে উপরে যে কাহিনীগুলি দেয়া হল তার সাহায্যে কিছু অনুমান করা যায়। মনে হয় আলা বখশ বরখুরদার লস্করী আলাইপুর-লস্করপুর-মখদুমপুরের জমিদার ছিলেন। তিনি সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহের সমসাময়িক ছিলেন, তাঁর নামেই লস্করপুরের নামকরণ হয়, আইন-ই-আকবরীতে লস্করপুর পরগণার নাম আছে। মখদুমপুর হয়ত শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দের নামানুসারে হয়, সুফীদের মখদুম বলে সম্মান করা হত; বাংলার সুলতানী আমলের শিলালিপিতে সুফীদের নামের সঙ্গে মখদুম শব্দটি ব্যবহৃত হত। আলা বখশ বরখুরদার লস্করীর আলা শব্দ থেকে বোধ হয় আলাইপুর নাম হয়। ইসলাম খানের সুবাদারী আমলে আলাইপুরই ছিল বিখ্যাত। এই আলা বখশ বরখুরদার লস্করীর অধস্তন পুরুষ বরখুরদার আকবরের সমসাময়িক, যাঁকে শাহবাজ খান পরাজিত করেন বলে বাহারিস্তানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই বরখুরদারের পুত্র ইলাহ বখশ, যাঁকে মিরযা নাথন পরাস্ত করেন। পিতাম্বর পুটিয়া জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা, এই জমিদারী পাকিস্তান আমলে জমিদারী উচ্ছেদ করা পর্যন্ত টিকে থাকে। কিন্তু আলাইপুরের জমিদারের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আলাইপুরও পুটিয়া রাজের অধীনস্থ হয়। পুটিয়া রাজের পুণ্যাহের দিনে আলাইপুরের প্রাচীন জমিদারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আলাইপুরের বারভূঁদের খাজনা সকলের আগে

Edited by Ripon Sarkar

নেওয়া হত।[৩৮] মনে হয় পিতাম্বর ও অনন্ত পরে মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজেদের জমিদারী ফেরত পান এবং সঙ্গে আলাইপুরের জমিদারীও লাভ করেন। আলাইপুর জমিদারের ভাগ্যে কি ঘটে তা জানা নেই।

সারা বাংলা বিজয় সমাপ্ত

শত্রুজিতের ভূষণা, বার-ভূঁঞার ভাটি, মজলিশ কুতুবের ফতেহাবাদ, অনন্ত মাণিক্যের ভুলুয়া, প্রতাপাদিত্যের যশোর, রামচন্দ্রের বাকলা, খাজা উসমানের বুকাইনগর ও উহর এবং বায়েজীদ কররানীর সিলেট জয় করার পরে সারা বাংলা মোগল অধিকারে আসে এবং সারা বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট ও হিজলী আগেই বশ্যতা স্বীকার করে। উত্তরে ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, পাচেট ও হিজলী, পশ্চিমে রাজমহল থেকে উত্তর-পূর্বে সিলেট এবং দক্ষিণ-পূর্বে ফেনী নদী পর্যন্ত সম্পূর্ণ এলাকা মোগল শাসনাধীন আসে। আবুল ফজল চিহ্নিত সুবা বাঙ্গালার শুধু চট্টগ্রাম বিজয় বাকি থাকে এবং ইহা বিজিত হয় আরও প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে। ইসলাম খান অবশ্যই এ সকল বিজয়ে এবং সারা বাংলায় মোগল শাসন কর্তৃত্ব স্থাপনের কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তিনি সুবা বাংলার শাসনের ব্যবস্থা করেন, কোন কোন এলাকা বশ্যতা স্বীকারকারী জমিদারদের জায়গীর দেয়া হয়, কিন্তু বাকি সম্পূর্ণ এলাকা সরাসরি মোগল সরকারের অধীনে আনয়ন করা হয়। কিছু কিছু এলাকা মনসবদারদের জায়গীর দেয়া হয়, বাকি এলাকা খালিসা রূপে দিওয়ানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আনা হয়। ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ বিজয় সমাপ্ত হয় এবং সারা বাংলায় যুদ্ধকালীন অশান্তি বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসে। এর অর্থ এই নয় যে ইসলাম খানের সময় এবং পরে আর কোন অশান্তি হয়নি; যেমন আরাকানের মগরা একবার তিনশ নৌকা নিয়ে এসে শ্রীপুর বিক্রমপুর লুট করে;[৩৯] সেখানকার থানাদার শয়খ ইউসুফ কিছু করার আগেই মগরা পালিয়ে যায়। ইসলাম খান শয়খ আশরাফ, এবং মির্যা নূর-উদ-দীনকে শয়খ ইউসুফের সাহায্যার্থে পাঠান। অতঃপর ইসলাম খান সংবাদ পান যে মগরা ভুলুয়া আক্রমণ করেছে এবং সেখানে শয়খ আবদুল ওয়াহিদ মগদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছেন না। কিন্তু এই সম্বন্ধে পরে কিছু জানা যায় না। মনে হয় শয়খ আবদুল ওয়াহিদ মগদের বিতাড়ন করেন। তুযুকে দেখা যায় যে ইসলাম খান কয়েকজন মগ ধরে সম্রাটের নিকট তাঁর পুত্র হুশাং খানের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেন।[৪০] মনে হয় এ দু মগ আক্রমণের কোন একটির সময় এই মগরা ধরা পড়ে। হিজলীর নিকটে চন্দ্রকোনা, এবং বরদা ও বরদার জমিদারেরা শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করলে মির্যা মক্কী তাদের দমন করেন।[৪১] কিন্তু এইগুলি সামান্য ব্যাপার এবং মোগল সম্রাজ্যের বা সুবাদার ইসলাম খানের জন্য অতি তুচ্ছ ব্যাপার। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ইসলাম খান সারা বাংলা জয় করেন এবং শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এখন তিনি সীমান্তবর্তী দুটি রাজ্য, কাছাড় এবং কামরূপ জয়ের দিকে মনোযোগ দেন।

Eidited by Ripon Sarkar

কাছাড় বিজয়

সিলেট সীমান্তে কাছাড় রাজ্য অবস্থিত ছিল। এখানে রাজা শত্রুদমন রাজত্ব করতেন; তাঁর রাজত্বকাল ১৬০৫ থেকে ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ তিনি জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক এবং একই সময়ে রাজত্ব করেন। তিনি বেশ ক্ষমতাবান হয়ে উঠেন এবং তাঁর উচ্চাভিলাষও ছিল। তিনি প্রথমে জয়ন্তিয়া জয় করেন এবং পরে অহোম রাজাকেও পরাজিত করেন। এই বিজয়ের পরে তিনি রাজধানীর মেবুঙ নাম পরিবর্তন করে কীর্তিপুর রাখেন এবং নিজে প্রতাপ নারায়ণ উপাধি গ্রহণ করেন। মোগল বাহিনী সিলেটের বায়েজীদ কররানীকে আক্রমণ করলে তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন এবং বায়েজীদ কররানীর সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠান। বায়েজীদ কররানীর আত্মসমর্পণের পরে ইসলাম খান কাছাড় আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

শয়খ কামাল বায়েজীদ কররানীকে নিয়ে ঢাকায় এলে ইসলাম খান শয়খ কামালকে কাছাড় আক্রমণের নির্দেশ দিয়ে আবার সিলেট পাঠিয়ে দেন। শয়খ কামাল সিলেট থেকে সেনানায়ক ও সৈন্যদের নিয়ে কাছাড় অভিযানে যাত্রা করেন। কাছাড়ের রাজাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অসুরিয়ানগর[৪২] দুর্গ ও পাহাড় পেছনে রেখে সৈন্যদের আরও সম্মুখে নিয়ে যান এবং সেখানে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। মোগল বাহিনী দুর্গের নিকটে পৌঁছে যুদ্ধ আরম্ভ করে। কাছাড় বাহিনী দিনে যুদ্ধ করত না; তারা দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত, কিন্তু রাত হলেই গোপন স্থান থেকে এসে সারা রাত যুদ্ধ করে মোগল সৈন্যদের ব্যতিব্যস্ত করে রাখত। প্রায় এক মাস যুদ্ধ করার পরে মোগল বাহিনী কাছাড়ীদের পরাস্ত করে দুর্গ অধিকার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু কাছাড়ীরা হাল ছাড়ল না, তারা অসুরিয়ানগর দুর্গকে কেন্দ্র করে পাহাড়ে যুদ্ধ করতে থাকে। এখানেও তারা নৈশ আক্রমণ চালাতে থাকে এবং মোগলদের অগ্রযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম খানের নীতি ছিল যে তিনি যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে মোগল বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতেন এবং সৈন্যদের মনোবল অক্ষুণ্ন রাখতেন। এখানেও অতিরিক্ত সৈন্য এসে পৌঁছলে শয়খ কামাল নতুন উদ্যমে শত্রুদের আক্রমণ করেন। তিনি দুর্গের বাম দিকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান, এবার শত্রুরা আর দাঁড়াতে পারল না, পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। পাহাড় এবং দুর্গ মোগলদের হস্তগত হয়। মুবারিজ খান এবং অন্যান্য সেনানায়কেরা সেনাপতি শয়খ কামালকে শত্রুদের তাড়া করার পরামর্শ দেন কিন্তু শয়খ কামাল দূত পাঠিয়ে রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। শয়খ কামাল ইসলাম খানকে অবহিত করেন, ইসলাম খান তখন কামরূপ অভিযানের পরিকল্পনা করছিলেন, তাই শয়খ কামালের শান্তি প্রস্তাবে সম্মত হন।

কিন্তু উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারেরা শয়খ কামালের শান্তি স্থাপনে সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা সম্রাটের নিকট অভিযোগ পাঠিয়ে বলেন যে এই পর্যন্ত যত বিজয় হয়েছে, ইসলাম খান সকল বিজয়ের কৃতিত্ব তাঁর নিজের লোকদের দিয়েছেন। তিনি সর্বদা মনসবদারদের (যাঁরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত) তাঁর নিজের অফিসারদের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠান, যাতে যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব তাঁর নিজের অফিসারদের হয়। আমরা সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের খাতিরে কোন উচ্চবাচ্য না করে সুবাদারের নিজের লোকদের অধীনে যুদ্ধ করেছি। আমরা এই জন্য কাছাড়ের রাজাকে পরাজিত করেছি যে হয় তিনি আত্মসমর্পণ করবেন, বা তাঁকে বন্দী করে তাঁর রাজ্য মোগল শাসনের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

Edited by Ripon Sarkar

কিন্তু ইসলাম খানের ব্যক্তিগত অফিসার শয়খ কামাল কাছাড়ের রাজার সঙ্গে চুক্তি করেছেন। ফলে যুদ্ধ যে কারণে শুরু হয় সেই কারণটি থেকে যায়। যদি যুদ্ধের নেতৃত্ব আমাদের হাতে দেয়া হয়, আমরা অল্প সময়ে কাছাড় জয় করব এবং কাছাড়ের রাজাকে বন্দী করে সম্রাটের দরবারে পাঠাব। সম্রাট এই অভিযোগ পেয়ে ফরমান জারি করে ইসলাম খানকে নির্দেশ দেন যে মুবারিজ খানকে যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়া হোক, শয়খ কামালকে প্রত্যাহার করা হোক এবং ভবিষ্যতে যেন সম্রাটের নিযুক্ত কোন মনসবদারকে সুবাদারের ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনস্থ করা না হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে বুকাইনগর অভিযানেও স্থলবাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়েছিল শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে; সেখানেও সেনানায়কদের মধ্যে মতানৈক্য হয়, এবং ইসলাম খান সেনানায়কদের নিকট থেকে খাজা উসমানকে তাড়া না করার কৈফিয়ৎ দাবি করলে ইহতিমাম খান ইসলাম খানের মুখের উপর নেতৃত্বের দুর্বলতার কথা বলেন। এই কারণেই বোধ হয় উসমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য শুজাত খানকে পাঠাবার জন্য ইসলাম খান সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। যা হোক, সম্রাটের আদেশ পেয়ে ইসলাম খান শয়খ কামালকে প্রত্যাহার করেন এবং মুবারিজ খানকে কাছাড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। মুবারিজ খান আবার কাছাড় আক্রমণ করেন, তিনি অসুরিয়ানগর দুর্গ অধিকার করে সেখানে একটি থানা স্থাপন করেন। মোগল বাহিনী আরও অগ্রসর হলে কাছাড়ের রাজা দূত পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।[৪৩] কিন্তু কাছাড়ের রাজাকে তাঁর রাজত্বে বহাল রাখা হয়, পরে দেখা যাবে যে সুবাদার কাসিম খানের সময় কাছাড়ের রাজার সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয়।

কামরূপ[৪৪] বিজয়

আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থাকাকালে কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণের বিরুদ্ধে শয়খ আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে এক অভিযান প্রেরণ করেন, কিন্তু শয়খ আবদুল ওয়াহিদ যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পালিয়ে আসেন। ঐ সময়ে ইসলাম খানের দৃষ্টি ভাটির দিকে নিবদ্ধ; ভাটির বার-ভূঁঞাকে দমন করার জন্য তিনি সকল প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাই তিনি শয়খ আবদুল ওয়াহিদের পরাজয় হজম করে নিয়ে কামরূপের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযান পাঠাননি। সুসঙ্গ এর জমিদার রাজা রঘুনাথ আগেই ইসলাম খানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। পরীক্ষিত সুসঙ্গ আক্রমণ করেন এবং রাজার পরিবার পরিজন লুট করে নিয়ে যান। রাজা রঘুনাথ ইসলাম খানের নিকট পালিয়ে আসেন, ইসলাম খান রাজাকে আশ্বাস দেন যে তিনি পরীক্ষিতের এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেন। রাজা রঘুনাথ সর্বদা ইসলাম খানের সঙ্গে থাকেন এবং বিভিন্ন সময়ে ইসলাম খানকে পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধে সাহায্য করেন, বিশেষ করে বিভিন্ন স্থানে নদী-নালা এবং পথ ঘাট সম্পর্কে রাজার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ইসলাম খানের যুদ্ধে বিশেষভাবে সহায়তা করে।[৪৫] সারা বাংলা জয় করার পরে ইসলাম খান কামরূপ জয়ের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে মুকাররম খানকে প্রধান সেনাপতি এবং শয়খ কামালকে তাঁর অধীনে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজা রঘুনাথকে সঙ্গে দেয়া হয়। ইসলাম খান এই যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন; প্রথমত তিনি জানতেন যে পরীক্ষিত একজন অতি শক্তিশালী রাজা, দ্বিতীয়ত সারা বাংলা

Edited by Ripon Sarkar

জয় হওয়ার পরে অন্য কোন দিকে যুদ্ধের কোন প্রয়োজনও ছিল না। তাই তিনি এই যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি মুকাররম খানের অধীনে অনেক সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। তাঁরা হলেন, আবদুস সালাম, শয়খ মুহীউদ্দীন (উভয়ে মুকাররম খানের ভাই), শয়খ কামাল, মিরযা ইমামকুলী বেগ শামলু, মিরযা নাথন, মিরযা মীরক নজফী, মীর মাসুম খাফী, মিরযা কাযিম বেগ তুসী, শয়খ হাবীব-উল্লাহ ফতেহপুরী (ইসলাম খানের ভাই), শয়খ আশরাফ হানসিওয়াল (হানসির অধিবাসী), তাতার খান মেওয়াতী, মিরযা সাইফ-উদ-দীন, শয়খ মহীউদ্দীন, মিরযা হাসান মাশহাদী (তাঁকে সৈন্যদলের বখশী নিযুক্ত করা হয়), জামাল খান মংলী, সৈয়দ নিযাম-উদ-দীন এবং রুকন-উদ-দীন (উভয়ে মীরান এর ছেলে), মিরযা নূর উল্লাহ, মিরযা আজলী এবং বিহার থেকে আনীত বাইশ জন অফিসার (খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় এঁদের আনা হয়), এবং পথ দেখাবার জন্য রাজা রঘুনাথ। এঁদের মধ্যে শয়খ হাবীব-উল্লাহ, ইমামকুলী শামলু ও বিহারের বাইশ জন অফিসার এবং মিরযা মিরক নজফীকে অতিরিক্ত সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়ে পরে পাঠানো হয়। তাছাড়া এই অভিযানে সিলেটের সকল আফগান সেনানায়ক, খাজা উসমানের সকল সেনানায়ক এবং জমিদারদের মধ্যে রাজা শত্রুজিত, বাহাদুর গাজী, সোনাগাজী, ইসলাম কুলী ও মজলিশ বায়েজীদকে (খান আলমের ছেলে) তাঁদের সমস্ত যুদ্ধের নৌকা এবং গোলন্দাজ বাহিনী, মুসা খানের এডমিরাল আবদাল খানের অধীনে মুসা খান ও তাঁর ভাইদের একশ যুদ্ধের নৌকাও সঙ্গে দেয়া হয়। শয়খ ইসমাইলের নেতৃত্বে ইসলাম খান নিজের এক হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্যও সঙ্গে দেন। উপরে উল্লেখিত সেনানায়কদের সকল সৈন্যসহ কামান সজ্জিত চারশ শাহী রণপোতও এই অভিযানে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া শাহী তিনশ হাতি, মনসবদারদের সকল হাতি এবং পাঁচ হাজার তীরন্দাজ সৈন্য অভিযানে অংশ নেয়। যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য সাত লক্ষ টাকা দেয়া হয়।[৪৬] উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় ইসলাম খান এই যুদ্ধের উপর কতখানি গুরুত্ব দেন এবং কি পরিমাণ প্রস্তুতি নেন। প্রকৃতপক্ষে এটা ইসলাম খানের শেষ যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের সাফল্যের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান হন। মুকাররম খান ছিলেন তখন ভাওয়াল থানার সেনাপতি, তিনি ভাওয়াল থেকে যাত্রা করেন; এদিকে তাঁর ভাই আবদুস সালাম অন্যান্য সকলকে নিয়ে ঢাকা থেকে যাত্রা করেন এবং সকলে টোক-এ মিলিত হয়। অফিসারদের উৎসাহিত করার জন্য ইসলাম খান প্রত্যেকের জন্য খেলাত পাঠান এবং তিনি নিজে টোক পর্যন্ত গিয়ে সৈন্যদের উৎসাহিত করেন, সেনাপতি মুকাররম খানকে উপদেশ দেন এবং অভিযানের শুভ উদ্বোধন করেন।[৪৭]

মিরযা নাথনের একটি বক্তব্যে এই অভিযানের তারিখ নির্ণয় করা যায়। তিনি বলেন টোক থেকে যাত্রার চার মঞ্জিল পরে (অর্থাৎ চার দিন পরে) তাঁরা যেখানে অবস্থান করেন, সেখানে দিনটি ছিল রমজান মাসের শেষ তারিখ। সেনাপতি মুকাররম খান বলেন যে সন্ধ্যায় ইফতারের পরে তারা যাত্রা করবেন। অতএব ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের রমজান মাসে এই অভিযান প্রেরিত হয়। রমজান মাসের শেষ তারিখ হয় ২৪শে নবেম্বর, ১৬১২ (হিসেব করে দেখা গেছে যে ঐ বছর রমজান মাস ত্রিশ দিনে হয়) অতএব মোগল বাহিনী ২০শে নবেম্বর ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে টোকের নিকটস্থ স্থান থেকে কামরূপ অভিযানে যাত্রা করেন।[৪৮] আরও দেখা যায় যে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দের বর্ষাকাল শেষ হলে শুষ্ক মৌসুম আসার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান এই অভিযান প্রেরণ করেন।

Edited by Ripon Sarkar

নৌ-বাহ·[৭] থাকায় যদিও ইসলাম খান বর্ষা মৌসুমেও যুদ্ধ করেছেন (উদাহরণস্বরূপ মুসা খান ও বার-ভুঁঞার সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ), তবু মোগল বাহিনী শুষ্ক মৌসুমে যুদ্ধ করাই উপযুক্ত মনে করত, কারণ শুষ্ক মৌসুমে ঘোড়া চলাচলের সুবিধা ছিল। এই কারণে দেখা যায় একমাত্র মুসা খানের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ ছাড়া, যা প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধের পরিণতি মাত্র, অন্য সকল যুদ্ধ ইসলাম খান এমনভাবে পরিকল্পনা করেন যেন যুদ্ধগুলি শুষ্ক মৌসুমে সংঘটিত হয়। খাজা উসমান এবং বায়েজীদ কররানীর সঙ্গে যুদ্ধ মার্চ মাসে শেষ হয়। এর পরে কাছাড়ের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ মে মাসের মধ্যেই শেষ হয় সুতরাং এই যুদ্ধগুলির পরে ইসলাম খান বর্ষাকালে কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা না করে শুষ্ক মৌসুমে করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এদিকে সারা বর্ষাকাল সৈন্যরাও বিশ্রামের সুযোগ পায়।

মোগল বাহিনী ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে অগ্রসর হয়ে বজ্রপুর[৪৯] ও পটলদহ[৫০] অতিক্রম করে সালকোনা[৫১] গিয়ে পৌঁছে, এখানে রাজা পরীক্ষিত তিনশ রণপোতসহ এক বিরাট বাহিনী নিয়োগ করেন। মোগল বাহিনী সেখানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা আক্রমণ করে কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। শত্রু সেনাপতি যে নৌকায় করে পালিয়ে যান, সেটি ছাড়া বাকি সকল নৌকা মোগলদের হস্তগত হয়। এর পরে মোগল বাহিনী আবার যাত্রা করে, নদীতে নৌকা এবং নদীর তীরে সৈন্য বাহিনী অগ্রসর হয়। কিন্তু এখান থেকে সারা পথ জঙ্গলাকীর্ণ, তাই নৌকার মাল্লারা নদীতীরের জঙ্গল পরিষ্কার করে এবং সৈন্যরা পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খান যুদ্ধের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খবরাখবর রাখতেন এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতেন। সালকোনা যুদ্ধের বিজয় সংবাদ পেয়ে তিনি তাঁর ভাই শয়খ হাবীব-উল্লাহর নেতৃত্বে এক হাজার অশ্বারোহী এবং এক হাজার তীরন্দাজ বাহিনী পাঠান এবং সঙ্গে ইমামকুলী শামলুর নেতৃত্বে বিহার থেকে আনীত বাইশ জন অফিসার তাঁদের সৈন্যসহ পাঠান এবং সিলেট থেকে প্রত্যাহার করে মিরযা মীরক নজফীকেও প্রেরণ করেন।[৫১] (ক) শুধু তাই নয় তিনি যুদ্ধের সময় মোগল বাহিনীর ব্যূহ রচনার পরিকল্পনাও মুকাররম খানের নিকট পাঠান। যুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ সংক্রান্ত তাঁর পরিকল্পনাটি নিম্নরূপঃ[৫২]

মধ্যম বাহু বা কেন্দ্রীয় বাহু	ঃ	মুকাররম খান নেতা; সঙ্গে তাঁর সকল সৈন্য;
অগ্রবর্তী দল	ঃ	মিরযা ইমামকুলী, মিরযা মীরক নজফী, মাসুম খাকী, আবদুল রাজ্জাক শিরাজী ও তাঁদের সৈন্যরা এবং খাজা উসমানের সকল আফগান সৈন্য;
ইলতমিশ বা অগ্রবর্তী রিজার্ভ	ঃ	শয়খ হাবীব উল্লাহর নেতৃত্বে সদ্য আগত সকল সৈন্য;
দক্ষিণ বাহু	ঃ	শয়খ কামাল এবং জামাল খান মনলীর নেতৃত্বে ইসলাম খানের বাছাই করা এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য;
বাম বাহু	ঃ	মিরযা মাখন, মিরযা সাইফ-উদ-দীন, এবং শয়খ আশরাফ হানসিওয়ালের নেতৃত্বে সকল তুর্কির মনসবদার এবং খাজা উসমান আফগানের সকল মনসবদার।

Edited by Ripon Sarkar

উক্ত পরিকল্পনামত মোগল বাহিনী সৈন্যদের সাজিয়ে নেয় এবং সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। এক মঞ্জিল অতিক্রম করে কোন স্থানে পৌঁছলে তারা সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করত এবং গোপন চর পাঠিয়ে সম্মুখের পরবর্তী মঞ্জিল পর্যন্ত স্থানের খোঁজ খবর নিত এবং ঐ মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হত। যেখানেই তারা রাত্রি যাপন করত সেখানে সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ তৈরি করত এবং দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে নিত। এরূপ দুর্গ তৈরি করা মোটেই কঠিন ছিলনা, কারণ মাটি এবং বাঁশের ফলা দিয়েই এই অস্থায়ী দুর্গগুলি তৈরি করা হত।[৫৩] এরূপ সর্তকতা অবলম্বনের দরুন তারা শত্রুর নৈশ আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এভাবে অগ্রসর হয়ে মোগল বাহিনী ধুবড়ি দুর্গের নিকটে গিয়ে পৌঁছে, ধুবড়ি দুর্গই ছিল কামরূপের শ্রেষ্ঠ দুর্গ, কিন্তু দুর্গের দুই ক্রোশ নিকটে পৌঁছে তারা সেখানে শত্রুদের সাড়া শব্দ পেল না। তাই তারা মনে করে যে রাজা পরীক্ষিতের রাজধানী গিলায় না পৌঁছা পর্যন্ত কোন যুদ্ধ হবে না। তখন মুকাররম খান মিরযা নাথনকে ভিতরবন্দ ও বাহিরবন্ধ আক্রমণ করতে পাঠান। ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরে ভিতরবন্দ ও বাহিরবন্দ দুটি পরগণা, এই পরগণাগুলি কামতা সীমান্তে অবস্থিত এবং এটা কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের অধীনে ছিল। কিন্তু রাজা পরীক্ষিত লক্ষ্মী নারায়ণের দুর্বলতার সুযোগে এই পরগণাগুলি অধিকার করে নেন। প্রকৃতপক্ষে মিরযা নাথনের এখানে যুদ্ধ করার কিছু ছিল না, শুধু গ্রামবাসীদের ধরে আনা এবং সারা এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করা। মোগল বাহিনী সেখানে এরূপ অত্যাচার করে যে নিরীহ গ্রামবাসীরা চার দিন চার রাত পানিও পান করতে পারেনি। মিরযা নাথন অনেক লোককে বন্দী করেন এবং তাঁর সঙ্গীরা অনেক গবাদি ও ভারবাহী পশু হস্তগত করে। স্থানীয় জমিদারেরা এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে দলে দলে এসে মোগল সেনানায়কদের নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং প্রতিজ্ঞা করে তারা শান্তিতে বসবাস করবে (অর্থাৎ রাজার যুদ্ধে সাহায্য করবে না) সেখানে একদল সৈন্য রেখে মোগল বাহিনী ফিরে এসে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।[৫৪]

তখন মোগল বাহিনী ধুবড়ি দুর্গের দুই ক্রোশ দূরত্বে পৌঁছেছিল। তারা ঐ স্থানের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে পরবর্তী মঞ্জিলে যাত্রা করে এবং সে স্থানে দুর্গ নির্মাণ করার সময় মিরযা ইমামকুলী শামলু কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজে তাঁর অন্য কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে নদীর দিক থেকে ধুবড়ি দুর্গ আক্রমণ করেন। মুকাররম খান সংবাদ পেয়ে তাঁদের ডেকে পাঠান। অনেক কষ্টে তাঁদের বুঝান হয় যে দুর্গ আক্রমণের সময় এখনও আসেনি এবং তাঁরা ফিরে আসেন। এখন মোগল বাহিনী পরামর্শ করে স্থির করে যে যেহেতু ধুবড়ি দুর্গের চতুর্দিকে জঙ্গল, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার না করা পর্যন্ত দুর্গ আক্রমণ করা ঠিক হবে না। অতএব জঙ্গল কাটা শুরু হয় এবং শয়খ কামালকে এই কাজ করতে দেয়া হয়। একদিন শয়খ কামাল যখন ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গল কাটা তদারক করছিলেন, এমন সময় রাজা রঘুনাথ এসে তাঁকে বলেনঃ 'আমি একটি সুযোগ খুঁজে পেয়েছি, এখনই আক্রমণ করলে দুর্গ এক চোটেই জয় করা যাবে।' শয়খ কামাল অবশ্যই জানতেন যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া দুর্গ জয় করা সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও তিনি রাজা রঘুনাথের কথায় পরিণামের কথা চিন্তা না করে সৈন্যদের দুর্গ আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে হাতিতে চড়ে দুর্গের দিকে যান এবং অন্যান্য অফিসারদের আসার জন্য চিৎকার করতে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের জন্য তখন কেউ প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু তবুও শয়খ কামালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা ঘোড়া ছেড়ে হাতিতে চড়ে দুর্গের দিকে ধাওয়া করে। শত্রুরা দুর্গের ভিতর থেকে বন্দুক এবং কামানের গোলা ছুঁড়তে

Edited by Ripon Sarkar

থাকে। মিরযা নাথন এবং শয়খ আশরাফ হাতির উপর ছিলেন, তারা হাতি থেকে নেমে লৌহবর্মে মাথা আবৃত করে বর্শা হাতে করে দুর্গের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু তাঁরা দেখেন যে শয়খ কামাল পরাজিত হয়ে তাঁরা অনুচরদের নিয়ে ফিরে আসছেন। এদিকে শত্রুরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে তাদের তাড়া করছে। মিরযা নাথন এবং শয়খ আশরাফ ফিরে আসলেন না, তাঁরা বাম বাহুর সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। শত্রুদের কিছু সৈন্য নিহত হলে শত্রুরা আবার দুর্গে প্রবেশ করে এবং দুর্গের উপর থেকে গোলাগুলী চালাতে থাকে। তখন সেনাপতির উচিত ছিল পেছন থেকে মিরযা নাথন ও অন্যান্যদের সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরণ করা, কিন্তু শয়খ কামাল তা না করে মিরযা নাথনকে ফিরে আসার জন্য ডেকে পাঠান। মিরযা নাথন বলে যে শয়খ কামাল তখন চিন্তা করেন যে যদি মিরযা নাথন যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহলে সকল কৃতিত্ব নাথনের হবে। তাই শয়খ কামাল বার বার লোক পাঠিয়ে মিরযা নাথনকে ফেরত আনেন। মিরযা নাথন এবং শয়খ আশরাফ ফিরে এসে শয়খ কামালকে এই দায়িত্বহীন তার জন্য অনেক গালাগাল করেন। ইসলাম খানের কোতোয়াল নিযাম তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি ফিরে এসে ইসলাম খানকে এই ঘটনা জানালে তিনি বিরক্ত হন এবং শয়খ কামালকে উপদেশ দেন যে মিরযা নাথন এবং শয়খ আশরাফের সঙ্গে তিনি যেন বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন।[৫৫]

শয়খ কামালের[৫৬] ভীরুতার জন্য ধুবড়ী দুর্গে মোগল বাহিনী দুবার পরাজিত হলে শত্রুরা সাহস পেয়ে যায়। এর পরে মোগল বাহিনী কয়েকদিন দুর্গের চতুর্দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করতে লেগে যায় এবং তারা বুঝতে পারে যে তাদের কামান গুলী উপরে (অর্থাৎ কোন উচ্চ স্থানে) উঠাতে না পারলে শত্রুর দুর্গ অধিকার করা সম্ভব হবে না। প্রকৃতপক্ষে ধুবড়ি দুর্গ জয় করা সহজ ছিল না, পাহাড়ী এলাকায় এটা এমন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে অবস্থিত ছিল যে সাধারণ আক্রমণে একে জয় করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে শয়খ কামালের পরিকল্পনা বিহীন আক্রমণে তিনি শত্রুদের কোন ক্ষতি করতে পারলেন না, বরং তাঁকেই পরাজিত হয়ে ফিরে আসতে হয়। এখন মোগলরা বুঝতে পারে যে ধুবড়ি দুর্গ জয় করতে হলে তাদের আরও প্রস্তুতি নিতে হবে। জঙ্গল পরিষ্কার করার সঙ্গে তারা সাবাত[৫৭] নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। সাবাতের সাধারণ অর্থ—দু ঘরের সংযোগকারী আবৃত সরুগলি বা বারান্দা, কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাবাত দুর্গ জয়ের জন্য নিরাপদ গলি, এটা আঁকাবাঁকা, সর্পিল, দু দিকে দেয়াল ঘেরা এবং উপরে মাটি ভর্তি বাঁশের ঝুড়ি, ঝুড়িগুলি আবার চামড়া দিয়ে আবৃত। এ গলির ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারী নিরাপদে দুর্গের দেয়ালের নিচে পর্যন্ত পৌছতে পারে। শয়খ কামাল তবীব নামক একজন অফিসারের তত্ত্বাবধানে শত্রুর দুর্গের পশ্চিম দিকে একটি সাবাত নির্মাণ করেন। সাবাত এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যাতে সিবা দুর্গের প্রাচীরের সমান উঁচু হয়, অর্থাৎ সাবাতের এবং সিবার উচ্চতা ধুবড়ি দুর্গের উচ্চতার সমান হয়। অতঃপর মোগলরা খাকরিজ বা ঢালু প্রাচীর নির্মাণ করে, যাতে প্রাচীরের আড়াল থেকে দুর্গে সরাসরি আক্রমণ চালাতে পারে। একটি খাকরিজ নির্মিত হলে তার আড়ালে থেকে আর একটি খাকরিজ নির্মিত হয় এবং এভাবে একটির পর একটি মোট সাতটি খাকরিজ নির্মিত হয় এবং সপ্তমটি দুর্গের একেবারে নিকটে গিয়ে পৌছে। মোগলদের এই ক্রিয়াকাণ্ডের সময় শত্রুরা দুর্গ থেকে গুলী করে প্রবল বেগে বাধা দিতে থাকে। এদিকে মোগল বাহিনীও নিচ থেকে গুলী চালিয়ে কর্মরত মাল্লাদের সমর্থন দিতে থাকে। সুতরাং অনেক ঝুঁকির মধ্যে সাবাত, সিবা

Edited by Ripon Sarkar

এবং খাকরিজগুলি নির্মিত হয়। সপ্তম খাকরিজ শত্রুর দুর্গকে মোগল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এবং মিরযা নাথন বলেন যে এখন সৈন্য দূরে থাক একটি পাখি শত্রুর দুর্গের ভিতর নড়াচড়া করতে পারবে না। ইতোমধ্যে শত্রুরাও তাদের দুর্গে বসে থাকেনি; তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আত্মরক্ষার জন্য সম্মুখে ছোট ছোট দেয়াল নির্মাণ করে, ফলে দুর্গের ভিতরে তাদের ঘোড়া চলাচলে ব্যাহত হয়। কামরূপ বাহিনী তাদের হাতিগুলি দুর্গের বাইরে দুর্গ প্রাকার এবং নদীতীরের মধ্যবর্তী স্থানে সরিয়ে নেয়, এই স্থানটি মোগলদের কামানের গোলার লক্ষ্যের বাইরে ছিল। রাত্রে মোগলরা স্থির করে যে সেনানায়কেরা পালা করে দুর্গ, সাবাত, সিবা এবং খাকরিজ পাহারা দেবে, কারণ শত্রুরা নৈশ আক্রমণে পারদর্শী ছিল এবং তারা যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে। ইতোমধ্যে মোগল পক্ষের একজন দক্ষ বন্দুকধারী সৈনিক স্বপক্ষ ত্যাগ করে শত্রুদের সঙ্গে যোগ দেন এবং গুলী করে অনেক মোগল সৈন্য হতাহত করে, পরে শাহ মুহাম্মদ নামক একজন মোগল সৈন্য তাকে হত্যা করে।[৫৮]

এদিকে ধুবড়ি দুর্গ জয়ে অনেক দেরী হওয়ায় ইসলাম খান ব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং প্রায় প্রত্যেক দিন উপদেশ পাঠাতে থাকেন। সাবাত, সিবা এবং খাকরিজ নির্মিত হলে তিনি আরও তিনটি ছোট দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন। তিনি আদেশ দেন এই দুর্গগুলি যেন শত্রুর দুর্গ থেকে দেড় তীরের লক্ষ্যের মধ্যে হয় এবং উচ্চতা যেন খাকরিজগুলির সমান হয়। জমিদারেরা চার দিনের মধ্যে এই দুর্গগুলি তৈরি করে সেখানে কামান বন্দুক স্থাপন করে। অতঃপর মোগল বাহিনীর সকল সেনানায়ককে মুকাররম খানের শিবিরে ডাকা হয় এবং সেখানে শয়খ কামাল তাঁদের উদ্দেশে বলেনঃ 'দুবার শত্রুর দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ হয়েছে, প্রথম বারে ব্যর্থতার জন্য শয়খ হাবীব উল্লাহ এবং তাঁর অগ্রবর্তী দল দায়ী এবং দ্বিতীয় ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমি (শয়খ কামাল) এবং রাজা রঘুনাথ। প্রত্যেকেই বলে যে আত্মরক্ষার প্রাচীর বা ঢিবি নির্মাণ না করে অগ্রসর হওয়াতে এই দুটি আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এখন সাবাত, সিবা এবং খাকরিজ নির্মিত হয়েছে এবং আমরা শত্রুদের তুলনায় সুবিধাজনক অবস্থায় আছি। শত্রুদের অবস্থা এখন খুবই খারাপ। আরও তিনটি দুর্গ আমরা নির্মাণ করেছি, এখন আপনাদের মতামত নিয়ে আমরা অগ্রসর হব।' অনেকেই অনেক কথা বলেন, শেষে ইমামকুলী বেগ এবং মিরযা নাথন বলেনঃ 'প্রকৃতপক্ষে প্রথম দিনেই দুর্গ জয় করা যেত এবং এই সাড়ে তিন মাস সময় অপেক্ষা করতে হত না। এখন আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকা মোটেই উচিত নয়। প্রত্যেক সাবাত, সিবা, খাকরিজ এবং দুর্গ এক একজন সেনানায়কের দায়িত্বে দেয়া হোক, এবং আমরা সকলে মিলে হয় জয় লাভ করব না হয় মৃত্যুবরণ করব, যাতে কেউ না বলতে পারে যে মোগল বাহিনী মহিষের মত কাদায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।' এটাই স্থির হয় যে প্রত্যেক বাহুর সেনানায়কেরা নিজ নিজ অবস্থান নিয়ে দুর্গ জয়ের প্রত্যয় নিয়ে যুদ্ধ করবে। প্রত্যেকের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়, প্রত্যেক বাহিনীকে এক সঙ্গে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং বিলদার বা খননকারীদের নির্দেশ দেয়া হয় তারা যেন শত্রুর দুর্গের দেওয়ালের ভিত খনন করে ভিত নষ্ট করে দেয়ালে ফাটল সৃষ্টি করে, যাতে হাতি দুর্গের ভিতরে ঢুকতে পারে। রাত্রেই সকলে দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়ে বিশ্রাম করে এবং ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে মাঠে নেমে আসে। হাতিগুলিকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়। মোগলরা শত্রুর দুর্গের চতুর্দিকে বেষ্টিত তাদের নিজেদের দুর্গের চূড়া থেকে শত্রুর প্রতি কামান

Edited by Ripon Sarkar

দাগাতে থাকে এবং এই সুযোগ খননকারীরা অগ্রসর হয়ে শত্রুর দুর্গের ভিত খনন করতে থাকে। খননকারীরা অনেকক্ষণ পরিশ্রম করে দুর্গে ফাটল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়, সঙ্গে সঙ্গে মোগল বাহিনী হাতি সামনে দিয়ে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। শত্রুসেনারা ফতেহ খান সালকা[৫৯] নামক একজন সেনানায়কের অধীনে পলায়ন করে। কিন্তু রণভোনওয়ার নামক একটি হাতি মোগল বাহিনীর দিকে ছুটে আসে। মোগলদের পক্ষে বায়েজীদ কররানীর হস্তিলা নামক হাতিটি প্রথমে দুর্গে প্রবেশ করে, এই হাতিটি শত্রুর রণভোনওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, হাতির চালকেরাও তাদের বর্শা দ্বারা একে অন্যকে আক্রমণ করে। রণভোনওয়ারের চালক কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বর্শা হস্তিলার চালকের বর্ম আঘাত করে, কিন্তু হস্তিলার চালকের বর্শা তার প্রতিপক্ষকে এমন সজোরে আঘাত করে যে সে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু রণভোনওয়ার হস্তিলাকে ধরাশায়ী করে। এই সময় মিরযা নাথন জয়মঙ্গল নামক হাতিটি সামনে দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে দুর্গে প্রবেশ করে। আবার দু হাতির মধ্যে (জয়মঙ্গল ও রণভোনওয়ার) যুদ্ধ শুরু হয়, কিন্তু মোগল সৈন্যরা তীর ছুঁড়ে রণভোনওয়ারের দ্বিতীয় চালককেও ধরাশায়ী করে। কিন্তু রণভোনওয়ার আঘাত পেলে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, যেদিকে যায় সেদিকে সব কিছু চুরমার করে দেয়। জয়মঙ্গলকে পরাভূত করে হাতিটি অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীকে আক্রমণ করে। হাতিটি একটু শান্ত হয়ে এলে মোগলরা একে একটি মোগল হাতির নিকটে আনতে চেষ্টা করে যাতে মোগল হাতির একজন চালক ঐ হাতির পিঠে উঠতে পারে। কিন্তু তার মত্ততা দেখে কোন হাতিই তার নিকটে যেতে চাইল না, অবশেষে অনেক কষ্টে একটি হাতিকে নিকটে নিয়ে গেলে হাতির একজন চালক রণভোনওয়ারের পিঠে উঠে তাকে কোন রকমে বাগে আনতে সমর্থ হয়। এদিকে ফতেহ খান কামরূপের বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও মোগল সৈন্যরা তাঁকে এমনভাবে তাড়া করে যে তিনি পালাবার পথ না পেয়ে নদীতে ডুবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর ছেলে ধরা পড়লে তিনি নদী থেকে উঠে আসেন। মিরযা নাথনের এক ভৃত্য তাঁকে ধরে ফেলে, কিন্তু ভৃত্যটি তাঁর ঘোড়া এবং জামা-কাপড় নিয়ে তাকে ছেড়ে দেয়। পরে মিরযা ইমামকুলী বেগ শামলুর সৈন্যরা তাঁকে ধরে ফেলে। অতএব ধুবড়ি দুর্গ মোগলদের অধিকৃত হয় এবং এই যুদ্ধে মোগলরা জয়লাভ করে।[৬০]

ধুবড়ি দুর্গ অধিকারের তারিখ নির্ধারণ করার মত তথ্য পাওয়া যায় না। আমরা দেখেছি যে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বরের ২০ তারিখে মোগল বাহিনী টোকের নিকটস্থ একটি স্থান থেকে যাত্রা করে এবং কিছুদূর এসে নদীর দুই তীরের জঙ্গল পরিষ্কার করে করে অগ্রসর হয়। অবশেষে তারা সালকোনা দুর্গ জয় করে এবং ভিতরবন্দ, বাহিরবন্দ লুট করে। এই কাজ করে ধুবড়ি দুর্গ পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের আনুমানিক দুই তিন মাস সময় লাগার কথা। আবার এদিকে মিরযা নাথন বলেছেন যে ধুবড়ি দুর্গ জয় করার আগে তাদের সাড়ে তিন মাস সময় অপেক্ষা করতে হয়। পরে ধুবড়ি দুর্গ জয় করে শয়খ কামাল ঢাকা যাওয়ার সময় বলেন যে তিনি ফিরে আসতে আসতে নদী প্লাবিত হবে, অর্থাৎ বর্ষাকাল এসে যাবে। সুতরাং অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিকে ধুবড়ি দুর্গ জয় হয়।

দুর্গ জয় করার পরে মোগল অফিসারেরা মত প্রকাশ করেন যে বিশ্রাম না নিয়ে তাদের রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাদের যুক্তি ছিল যে শক্তিশালী বাহিনীর পরাজয় এবং এরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ জয় করার পরে পরীক্ষিতকে আবার যুদ্ধের জন্য

Edited by Ripon Sarkar

প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ না দিয়ে তাঁকে ধাওয়া করা উচিত এবং হয় তাঁকে হত্যা করা হোক বা বন্দী করা হোক এবং যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান করা হউক। আর যদি রাজাকে হত্যা করা বা বন্দী করা না যায়, তাহলে অন্ততঃ গিলা শহর দখল করে নেওয়া হোক। কিন্তু শয়খ কামাল তাদের কথায় কান দিলেন না, তিনি ধুবড়ি দুর্গে অবস্থান নিয়ে রাজা পরীক্ষিতের নিকট দূত পাঠিয়ে নিম্নরূপ প্রস্তাব দেনঃ 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে হয় আপনাকে বন্দী করা হবে, নতুবা আপনার গিলা দুর্গ জয় করা হবে এবং আপনাকে আশ্রয়ের জন্য ঘুরাঘুরি করতে হবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি আপনাকে এই অনুগ্রহ দেখাচ্ছি যে আপনি যদি এখনও সদাচরণ করেন (আত্মসমর্পণ করেন) তাহলে ভাল, তা না হলে আপনার ভাগ্যে কি আছে আপনি জানেন না।' রাজা পরীক্ষিত এই প্রস্তাবে রাজি হন এবং দুটি হাতি, কিছু উপহার এবং শয়খ কামালের জন্য আশী হাজার টাকা দিয়ে তাঁর দূতকে শয়খ কামালের নিকট পাঠান। রাজা পরীক্ষিত শয়খ কামালের দূতকেও সন্তুষ্ট করেন। পরীক্ষিত দূতের মারফত আরও জানান যে তিনি সুবাদার ইসলাম খানকে এক লক্ষ টাকা, একশ হাতি, একশ টাঙ্গন ঘোড়া দেবেন এবং তাঁর বোনকে ইসলাম খানের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। তিনি আরও বলেন যে তিনি সম্রাটের জন্যও তিন লক্ষ টাকা, তিনশ হাতি, তিনশ ভাল জাতের টাঙ্গন ঘোড়া দেবেন এবং তাঁর মেয়েকে সম্রাটের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। বিনিময়ে তিনি চান যে তাঁকে সম্রাটের দরবারে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হবে এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফেরত দেয়া হবে।[৬১]

পরীক্ষিতের দূতের মারফত শয়খ কামাল এটা জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হন। তিনি পরীক্ষিতের দূত রামদাসকে আবার পরীক্ষিতের নিকট পাঠিয়ে বলেন যে তিনি যেন মুকাররম খানের নিকট পত্র লিখেন যাতে শুধু তাঁর খেসারত দেয়ার কথা থাকবে, আর কিছুই থাকবে না, অর্থাৎ তাঁকে দরবারে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া এবং তাঁর রাজ্য তাঁকে ফেরত দেয়ার কথা যেন না থাকে। ফলে পরীক্ষিত অত্যন্ত বিনীতভাবে একখানি পত্র লিখে মুকাররম খানের নিকট পাঠান। শয়খ কামাল পত্রসহ পরীক্ষিতের দূতকে মুকাররম খানের নিকট নিয়ে যান এবং নিজে পরীক্ষিতের পক্ষে ওকালতি করেন। যদিও মোগল মনসবদারেরা এতে রাজি ছিলেন না, শয়খ কামাল এটা নিজ দায়িত্বে করেন। শয়খ কামালের অনুরোধে মুকাররম খান রাজার নিকট লিখেনঃ 'তুমি নবাবের (ইসলাম খানের) জন্য যা দিতে বলেছ তা প্রথমে পাঠিয়ে দাও, যাতে শয়খ কামাল সেগুলি নিয়ে ঢাকায় গিয়ে তোমার ইচ্ছামত কাজ সমাধা করতে পারে (ইসলাম খানের অনুমোদন নিয়ে আসতে পারে)।' রাজার দূত রামদাস এই চিঠি নিয়ে রাজার নিকটে চলে যান, তিন দিন পরে রাজা পরীক্ষিত শয়খ কামালের অফিসারের নিকট একশ হাতি, একশ টাঙ্গন ঘোড়া এবং এক লক্ষ টাকা হস্তান্তর করেন। শয়খ কামাল তখন মনসবদারদের বলেন ঃ 'আমি ঢাকা গিয়ে সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করব, কিন্তু আদেশ এখানে পৌঁছতে যে সময় লাগবে ততদিন নদী প্লাবিত হবে এবং রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের হাতি এবং ঘোড়াগুলি ঘোড়াঘাটে পাঠিয়ে দাও।' মুকাররম খান এবং তাঁর ভাইয়েরা, জামাল খান মঙ্গলী এবং লছমী রাজপুত ছাড়া আর সকলেই তাদের সৈন্য, ঘোড়া এবং হাতি ঘোড়াঘাটে পাঠায়, শুধু দু একটি ঘোড়া তাদের দৈনন্দিন কাজের জন্য রেখে দেয়।[৬২]

এদিকে শয়খ কামাল সৈন্যবাহিনীর বখশী মিরযা হাসান মাশহাদী, রাজা রঘুনাথ এবং রাজা পরীক্ষিতের দূতকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় করে ঢাকা যান। নদীর স্রোত অনুকূলে

Edited by Ripon Sarkar

থাকায় তাঁরা অল্পদিনের মধ্যে ঢাকা পৌছেন। ইসলাম খান মির্যা হাসান এবং রাজা রঘুনাথের নিকট থেকে সব শুনে এবং মনসবদারদের পাঠানো চিঠি পড়ে এত রেগে যান যে তিনি নিজের আসন ছেড়ে শয়খ কামালের দিকে ছুটে যান, শয়খ কামাল কিছু উচ্চবাচ্য করলে একটা অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটে যাওয়ার সম্ভবনা ছিল, (অর্থাৎ ইসলাম খান শয়খ কামালকে মারতেন)। ইসলাম খানের দিওয়ান শয়খ ঈকন শয়খ কামালকে অনেক তিরস্কার করেন এবং রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে শান্তির কথা না বলে তাঁকে বন্দী করে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসতে বলেন। রাজা পরীক্ষিতের দেয়া বেসারতসমূহ বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং শয়খ কামাল অপমানিত হয়ে ধুবড়ি ফিরে যান।

শয়খ কামাল শিবিরে ফিরে আসেন কিন্তু সৈন্যদের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করেন। তিনি রাজা পরীক্ষিতকে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে বলেন। অন্যদিকে গোলন্দাজ ও বন্দুকধারীদের নিকট থেকে বারুদ ও গুলী নিয়ে জমা করে রাখেন এবং বলেন যে এখন যুদ্ধ নেই, সুতরাং এগুলির প্রয়োজনও নেই। কামানগুলি সব নিয়ে এক কোণে জমা করে রাখেন। কিন্তু অন্যান্য মনসবদারেরা শয়খ কামালের সঙ্গে যোগ না দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। শয়খ কামাল মনে করেন যে যদি মোগলদের কোন বিপর্যয় উপস্থিত হয়, তাহলে ইসলাম খান কামরূপ বিজয়ের আশা ছেড়ে দেবেন।[৬৩]

ঠিক সে সময় কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ খুনতাঘাট[৬৪] আক্রমণ করেন। স্মরণীয় যে ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থাকতেই মোগলদের কামরূপ আক্রমণের সময় লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলদের সহায়তা করার প্রতিজ্ঞা করেন। এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্যই তিনি পরীক্ষিতের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা পরীক্ষিত দ্রুত সেখানে যান এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। সাত দিন অবরুদ্ধ থেকে কামতার রাজা মোগল সেনাপতির নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। রাজা শত্রুজিতকে দুশ রণতরীসহ পাঠান হয় এবং খরবোজাঘাটে[৬৫] দুর্গ তৈরি করে পিছন দিক থেকে পরীক্ষিতকে আক্রমণ করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা পরীক্ষিত রাত্রে শত্রুজিতের খরবোজাঘাট দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু সুবিধা করতে না পেরে ফিরে যান। রাজা শত্রুজিত এখন পরীক্ষিতকে আক্রমণ করেন, পরীক্ষিত দু দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে যান এবং গিলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। এদিকে মোগল সেনাপতি ভাটির জমিদারদের তাদের রণতরী নিয়ে পাঠান, তারা গদাধর[৬৬] নদীর মুখে দুর্গ তৈরি করে গিলা শহরে আসা যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে গিলা শহরে রসদ যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষিত শোচনীয় অবস্থায় পড়ে যান। উপায় না দেখে রাজা পরীক্ষিত নৈশ আক্রমণের পরিকল্পনা করেন, তিনি তাঁর জামাতা ডুমুরিয়ার[৬৭] নেতৃত্বে তাঁর সকল নৌকা ও পঞ্চাশটি হাতিসহ গদাধর নদীর মুখে শত্রুদের দুর্গ আক্রমণ করতে পাঠান, রাজা নিজে তাঁর সকল সৈন্য নিয়ে ধুবড়ি দুর্গ আক্রমণ করার প্রস্তুতি নেন।

পরিকল্পনা মত ডুমুরিয়া রাত্রে যাত্রা করেন এবং রাত্রি চার ঘণ্টা বাকি থাকতে গদাধর নদীর মুখে জমিদারদের দুর্গ আক্রমণ করেন। জমিদারেরা এই অভিযান সম্পর্কে কিছুই জানত না। রাত্রিকালীন প্রহরার দায়িত্বে ছিল সোনারমান সরদিওয়ান এবং তাঁর দলে ছিল পঞ্চাশটি রণতরী। কিন্তু কামরূপের সাপ বাচারী রণতরীর আক্রমণের মুখে এই পঞ্চাশটি রণতরী দাঁড়াতে পারল না। ফলে এই পঞ্চাশটি নৌকার কেউই বাঁচতে পারল

Edited by Ripon Sarkar

না, তারা সকলেই নিহত হয়। অতঃপর শত্রুরা দুর্গের দিকে ধাওয়া করে, বাহাদুর গাজী এবং অন্যান্য জমিদারেরা দুশ নৌকা নিয়ে দুর্গের নিচে ছিল এবং চারশ বন্দুকধারী সৈন্য ছিল দুর্গের ভিতরে কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে তারা শত্রুদের বাধা দেয়ার কোন সুযোগ পেল না। তারা সকলে হয় মৃত্যুবরণ করে বা বন্দী হয়। বাহাদুর গাজী এবং সোনাগাজী কোন রকমে অর্ধমৃত অবস্থায় মোগল শিবিরে ফিরে আসেন, দুশ পঞ্চাশটি নৌকার মধ্যে তেতাল্লিশটি নৌকা তাঁরা সঙ্গে নিয়ে আসতে পারেনে।[৬৮]

রাজা পরীক্ষিতও পরিকল্পনামত ধুবড়ি দুর্গের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে তিনি বাধার সম্মুখীন হন। প্রথমত, পথে একটি নদী পার হওয়ার সময় কাঠের টুকরা দিয়ে নদীতে পুল তৈরি করা হয়, কিন্তু অর্ধেক সৈন্য অপর তীরে উঠে গেলে পুলটি ভেঙে যায়। পরে পুলটি আবার তৈরি করা হয়, কিন্তু এতে অনেক সময় লাগে। দ্বিতীয়ত, পথে তাঁর একটি হাতি পাগল হয়ে যায় এবং হঠাৎ হাতিটি তার চালককে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, হাতিটি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে সৈন্যদের যাতায়াতে বাধার সৃষ্টি করে। হাতিটি ধরতে অনেক সময় ব্যয় হয় এবং এ সকল বিপদ কাটিয়ে রাজার ধুবড়ি দুর্গে পৌঁছতে রাত শেষ হয়ে দিনের চার পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। এই সময়ে মোগল শিবিরে গদাধর নদীর মুখের দুর্গ পুনরাধিকার করার বিষয়ে চিন্তা করা হচ্ছিল, সকলেই মত দেয় যে, মিরযা নাথন যেহেতু নৌ-বাহিনী চালনায় দক্ষ, তাঁকে সেখানে পাঠানো উচিত। এমন সময় খবর পৌঁছল যে রাজা পরীক্ষিত সৈন্য নিয়ে ধুবড়ি দুর্গের দিকে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দেয়া হয়। আগে বলা হয়েছে যে জামাল খান মঙ্গলী এবং লছমী রাজপুত তাদের বাহিনী ঘোড়াঘাটে না পাঠিয়ে সেখানেই রেখে দেন। সুতরাং তাঁদের দুর্গের বাইরে এসে পরীক্ষিতকে বাধা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। জামাল খান মঙ্গলী এবং লছমী রাজপুত দুর্গের বাইরে গিয়ে একটি ছোট ছড়ার ধারে অবস্থান নেন, কিন্তু শত্রুদের আক্রমণে তাঁরা টিকতে পারলেন না। তাদের অর্ধেক সৈন্য আহত হয় এবং তাঁরা পরাজিত হন।

এ সময়ে মুকাররম খান তাঁদের কর্মসূচি সম্পর্কে পরামর্শের জন্য সকল অফিসারদের এক সভায় আহবান করেন। তাঁরা গিয়ে দেখেন যে শয়খ কামাল একটি দমদমা বা উঁচু দেয়ালে দাঁড়িয়ে আছেন এবং পলায়নের জন্য দুর্গের নিচে কয়েকটি নৌকা প্রস্তুত রাখেন। সেনানায়কেরা সকলে যুদ্ধ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং সকলে একযোগে বেরিয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করেন। উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, শেষ পর্যন্ত রাজা পরীক্ষিত পিছু হটে গিয়ে ছড়ার অপর পারে চলে যান। ছড়ার উভয় তীর থেকে আরও অনেকক্ষণ যুদ্ধ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দিন যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে যায়। মোগলরা স্থির করে যে তারা সে দিন ফিরে এসে পরের দিন নতুন পরিকল্পনা নিয়ে যুদ্ধ করবে। তারা ফিরে আসায় পরীক্ষিতের সৈন্যরা উল্লসিত হয়ে সামান্য অগ্রসর হয় কিন্তু বেশি দূর না এসে সেখানেই থেমে যায়।[৬৯] কিন্তু ডুমুরিয়ার অধীনে কামরূপের নৌ-বাহিনী আক্রমণ অব্যাহত রাখে, মোগলরা এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। মিরযা নাথন একটি কামান এবং মাত্র চৌদ্দটি গোলা যোগাড় করতে সক্ষম হন। তাঁর গোলন্দাজ এই গোলাগুলি এমন অব্যর্থ লক্ষ্য ভেদ করে যে ডুমুরিয়া নিজে এবং আরও কয়েকজন নিহত হয়। নৌ-অধ্যক্ষের মৃত্যুতে শত্রুর নৌ-বাহিনী হতবল হয়ে পিছু হটে যায়। রাত্রে মোগল বাহিনী দুর্গে অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায় থাকে; রাজা পরীক্ষিত বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্গের অদূরে অবস্থান করছেন, এদিকে মোগল সৈন্যবাহিনী ঘোড়াঘাটে। সুতরাং মোগল বাহিনীর প্রায় অসহায় অবস্থা, শুধু মনোবল নিয়ে

Edited by Ripon Sarkar

তারা পরের দিন যুদ্ধের জন্য তৈরি হচ্ছে। এদিকে রাজা পরীক্ষিত মোগলদের সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা অবগত না হওয়ায় এবং তাঁর নৌ-বাহিনী অধ্যক্ষ ও জামাতার মৃত্যুতে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং রাত্রেই ধুবড়ি থেকে পলায়ন করে রাজধানী গিলার দিকে যাত্রা করেন এবং পরের দিন দুপুরে গিলা পৌছেন। সকালে মোগলরা জানতে পারে যে রাজা পরীক্ষিত পালিয়ে গেছেন। মিরযা নাথন বলেন যে রাজা পরীক্ষিত সাহস করে যুদ্ধ করলে তিনি যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি করে পালাতে গিয়ে তিনি অনেক যুদ্ধের সরঞ্জাম ফেলে যান।[৭০] এভাবে ধৈর্য ধরে খবরাখবর না নেওয়ায় নিশ্চিত জয় রাজা পরীক্ষিতের হাতছাড়া হয়ে যায়; মোগলরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এবং মিরযা নাথন বলেন যে পরম করুণাময় আল্লাহই হয়ত রাজা পরীক্ষিতের বিজয় চায়নি।

এখন ঘোড়াঘাট থেকে সৈন্য, ঘোড়া, হাতি অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম এসে পৌছে, শুধু মিরযা নাথনের সৈন্যরা পেছনে পড়ে যায়।[৭১] মোগল সৈন্যরা রাজা পরীক্ষিতের পেছনে গিলা যায়, কিন্তু পথে তারা জানতে পারে যে রাজা কামরূপে চলে গেছেন।[৭২] মোগল সৈন্যরা গিলায় পৌছে দেখে যে শহর জনশূন্য, তারা সেখানে শিবির স্থাপন করে। সৈন্যরা এখানে মূল্যবান ধন-সম্পদ হস্তগত করে। নাথন বলেন যে মোগলরা সেখানে একদিন অবস্থান করলে প্রচুর ধন রত্ন লাভ করতে পারত। কিন্তু পরের দিন সকালবেলা মোগল বাহিনী আবার যাত্রা করে এবং সন্ধ্যায় পানিয়াশিলা পৌছে। সেখান থেকে পরের দিন আবার যাত্রা করলে পথে শনকোস নদীর[৭৩] নিকটে কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এসে সেনাপতি মুকাররম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। মুকাররম খান রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে খেলাত এবং ঘোড়া উপহার দেন এবং মোগল বাহিনীর এক মঞ্জিল পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে বলেন। মোগলরা এভাবে দিনের পর দিন যাত্রা করে অবশেষে দিলাই বা ঘরা ডাঙ্গা[৭৪] নদীর তীরে এসে পৌছে।

এই স্থানে মোগল বাহিনী সংবাদ পায় যে রাজা পরীক্ষিত নৈশ আক্রমণ করবে। মোগল শিবিরে একটি পরামর্শ সভা ডাকা হয় এবং স্থির হয় যে প্রত্যেক সৈন্য এবং সেনানায়ক যে যেখানে আছে সেখানে থাকবে, আক্রান্ত হলে প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে, একে অন্যের সাহায্য করতে যাবে না। একে অন্যের সাহায্য করতে গেলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এ আশংকায় এ আদেশ দেয়া হয়। প্রত্যেককে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেয়া হয় যে, যে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে তাঁকে শত্রু বলে গণ্য করা হবে। কিন্তু যার জন্য এত তোড়জোড় তা শেষ পর্যন্ত হল না, অর্থাৎ পরীক্ষিত নৈশ আক্রমণ করল না। ইতোপূর্বে মিরযা কাসিম খাজাঞ্চী এবং রাজা শত্রুজিতের অধীনে রণতরীসমূহ রাজা পরীক্ষিতের পলায়নে বাধা দেয়ার জন্য মনাস নদীতে পাঠান হয়।[৭৫] কিন্তু রণতরীগুলি সময়মত পৌছতে না পারায় রাজার পলায়নে বাধা দিতে পারল না। রণতরীসমূহ মনাসে না থেমে পাণ্ডুর[৭৬] দিকে যাত্রা করে। নৌকা না থাকায় মোগল বাহিনীর মনাস নদী অতিক্রম করা অসুবিধা হয়। তখন মোগল সৈন্যরা গ্রামাঞ্চল থেকে কাঁধে করে কয়েকখানি গণ্ডোলা (ছোট নৌকা) যোগাড় করে আনে, তিন দিনে তারা নদী অতিক্রম করে মনাস নদীর তীর থেকে আধা ক্রোশ দূরত্বে একটি স্থানে গিয়ে শিবির স্থাপন করে।[৭৭]

পরীক্ষিত যখন জানতে পারেন যে মোগল রণতরী পাণ্ডু পৌছে গেছে, তিনি বুঝতে পারেন এটা বরনদী পর্যন্ত গিয়ে তাঁর গতি রোধ করবে।[৭৮] এদিকে মোগল স্থলবাহিনীও

Edited by Ripon Sarkar

মনাস নদী অতিক্রম করে এলে, নৌ এবং স্থলবাহিনীর মিলিত আক্রমণ তিনি ঠেকাতে পারবেন না এবং তাঁর নিজের জীবন এবং মান-সম্মান সব কিছুই হারাতে হতে পারে। তাই তিনি আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর দূত রামদাসের মাধ্যমে মুকাররম খান ও শয়খ কামালের নিকট নিম্নরূপ প্রস্তাব দেনঃ "আমার জীবন এবং মান রক্ষার নিশ্চয়তা দিলে আমি আত্মসমর্পণ করব এবং আমার সকল ধন-সম্পদ এবং রাজ্য সম্রাটের নিকট ছেড়ে দেব।" মুকাররম খান উত্তর দেন যে রাজাকে তৃতীয় দিনে মনাস তীরে আত্মসমর্পণ করতে হবে, ঐদিনই তিনি (মুকাররম খান) তাঁর নিরাপত্তার আশ্বাস দেবেন এবং একা একটি নৌকায় ঢাকায় ইসলাম খানের নিকট পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে অর্থাৎ এই দু দিনের মধ্যে শান্তি স্থাপনের প্রমাণস্বরূপ পরীক্ষিত তাঁর সকল হাতি মোগল বাহিনীর নিকট হস্তান্তর করবেন। সঙ্গে সঙ্গে মুকাররম খান দূতের মারফত রাজা পরীক্ষিতকে অনেক উৎসাহ দেন। দূত রামদাস সন্তুষ্টচিত্তে মুকাররম খানের সংবাদ নিয়ে রাজার নিকট চলে যান। কথামত রাজা তার সকল হাতি বনাস নদীর তীরে মোগল হাতিশালার ফৌজদারের হাতে সমর্পণ করেন। পরে রামদাস রাজাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে আসেন। মুকাররম খান এবং শয়খ কামাল পবিত্র কোরানে হাত রেখে রাজার হাত ধরে তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেন। অতঃপর তাঁরা রাজাকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। যাওয়ার পূর্বে মুকাররম খান কামরূপ শাসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর ভাই আবদুস সালামকে সকল মোগল সৈন্যসহ বনাস নদীর তীরে শিবিরে রেখে যান, মিরযা কাসিমকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন পাণ্ডুর সকল থানা দখল করে পরে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। রণতরীগুলি পাণ্ডুতে রাখা হয় এবং রাজা শত্রুজিতকে এর নেতৃত্ব দেয়া হয়।[৭৯]

রাজা পরীক্ষিত যখন আত্মসমর্পণ করেন তখন ইসলাম খান টোক-এ ছিলেন। ইসলাম খান যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে সর্বদা খোঁজ-খবর নিতেন এবং কামরূপ বিজয়ে দীর্ঘ সময় ব্যয় হওয়ায় তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। তাই তিনি ঢাকা থেকে টোক-এ চলে যান। স্মরণীয় যে শয়খ কামাল রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে সন্ধি করে যখন ইস' ‌ ‌খানের অনুমোদন নিতে আসেন, তখন ইসলাম খান ঢাকায় ছিলেন। ইসলাম খান তিন মাস টোক-এ থাকেন, ইতোমধ্যে তিনি রাজা পরীক্ষিতের পলায়নের সংবাদ পান কিন্তু শেষে বিরক্ত হয়ে তিনি ঢাকায় ফিরে যাওয়ার উদ্দেশে ভাওয়াল যান। সেখানেই তিনি সংবাদ পান যে রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মুকাররম খান ও শয়খ কামালের নিকট সংবাদ পাঠান যেন রাজাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হয়। ইসলাম খান এত খুশি হন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ লেখককে (ওয়াকিয়া নবিশ) ডেকে বলেনঃ 'তোমার বইতে লেখ কিভাবে কোচ রাজা, যিনি তাঁর বংশের জন্য একশ বছরের সার্বভৌমত্ব দাবি করেন, তাঁকে নিমিষে কাবু করা হয়েছে এবং কিভাবে আমি তাঁকে সম্রাটের সামন্তে পরিণত করেছি।' ইসলাম খানের ইচ্ছা ছিল অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি রাজা পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেন এবং বখশী খাজা তাহির মুহাম্মদকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু ইসলাম খান অসুস্থ হয়ে পড়েন, মুকাররম খান এবং শয়খ কামাল রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে টোক-এ পৌঁছার সংবাদ পেয়ে তিনি লোক পাঠান যাতে তাদের ঐ রাতের মধ্যেই ইসলাম খানের নিকট নিয়ে আসা

Edited by Ripon Sarkar

হয়। কিন্তু মুকাররম খান রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে ভাওয়াল পৌঁছে দেখেন যে ইসলাম খানের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ইসলাম খানের মৃত্যু গোপন রাখা হয়, রাজা পরীক্ষিত এসে ইসলাম খানের মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

ইসলাম খানের মৃত্যু হওয়ায় রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। সকলেই মত প্রকাশ করেন যে তাঁকে বন্দী করা হোক, কারণ ইসলাম খান বেঁচে থাকলে তাই করতেন। কিন্তু মুকাররম খান তাঁর দায়িত্ব নেন।[৮০] কামরূপ রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একজন শক্তিশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ লোকের জীবন অবসান হয়। তিনি যেভাবে সারা বাংলাকে মোগল শাসনের অধীনে আনয়ন করেন এবং সারা বাংলায় মোগল শাসন স্থাপন করেন, তা তাঁর অপূর্ব কর্মক্ষমতার স্বাক্ষর। আকবরের আমলে খ্যাতনামা মোগল সেনাপতিরা প্রায় ত্রিশ বছরে যা করতে পারেননি, ইসলাম খান মাত্র সাড়ে চার বছরের মধ্যে তা সম্পন্ন করেন। তিনি ভাটির বার-ভূঁঞাকে পরাজিত করেন, অথচ ভাটি জয়ই ছিল আকবরের সবচেয়ে বড় বাধা। তিনি উসমান আফগান এবং সিলেটের আফগান বায়েজীদ কররানীকে পরাজিত করেন এবং তাঁদের সম্পূর্ণ এলাকায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে একমাত্র চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলার জমিদারদের তিনি মোগল সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তাছাড়া সীমান্তের তিনটি রাজ্য, কামতা, কামরূপ এবং কাছাড়ও মোগলদের বশ্যতা স্বীকার করে। কামতার রাজা প্রথমেই মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হয়, কামরূপের রাজা আত্মসমর্পণ করেন ও বন্দী হন এবং কাছাড়ের রাজা আত্ম-সমর্পণ করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ইসলাম খান তাঁর এই বিরাট সাফল্য দেখে স্বস্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরও তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে ইসলাম খানের এই বিরাট সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১। আবদুল লতীফের ডায়রী, দেখুন, সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২৯ বাংলা, ২০৯।

২। ঐ।

৩। বাহরিস্তান, ১ম, ১৪।

৪। সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২০৯।

৫। নাটোর শহর থেকে পনর মাইল উত্তরে অবস্থিত।

৬। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ২।

৭। স্যার যদুনাথ সরকার এক হাজার মণ বারুদের স্থলে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য বলেছেন (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ২)। কিন্তু বাহরিস্তানে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের কথা নেই, বর্ষা মৌসুমে বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধে অশ্বারোহী সৈন্যের প্রয়োজনও ছিল না।

৮। বাহরিস্তান, ১ম, ২৭-২৯।

৯। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ২।

১০। ঐ।

১১। বাহরিস্তান, ১ম, ১২১।

১২। তিনি হিজলীর জমিদার সলীম খানের ভাইপো। তাঁকে মোগল সৈন্যদলে নেয়া হয়।

১৩। বাহরিস্তান, ১ম, ১৩১।

Edited by Ripon Sarkar

১৪। কৃষ্ণনগর শহরের বিশ মাইল উত্তরে ভৈরব নদীর তীরে ভগওয়ান নামে একটি স্থান আছে, কৃষ্ণনগরের ছয় মাইল উত্তরে মহৎপুর বা মাহামদপুর নামে একটি স্থান আছে। রেনেলের ১নং মানচিত্রে এটা চিহ্নিত আছে।

১৫। স্যার যদুনাথ সরকার এই বাঘা গ্রামকে আলাইপুরের নিকটবর্তী বাঘার সঙ্গে পরিচিতি দেন। (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৩)। রাজশাহী জেলার সরদহের (সারদার) বিপরীতে আলাইপুর, আলাইপুরের মাত্র কয়েক মাইলের মধ্যে বাঘা গ্রাম। কিন্তু এখানে যে বাঘার কথা বলা হয়েছে, তা রাজশাহীর বাঘা হতে পারে না, কারণ গিয়াস খান আলাইপুর থেকে অনেক দক্ষিণে চলে এসেছেন। এম. আই. বোরাহ এই বাঘাকে সরকার শরীফাবাদের বাঘা নামের মহালের সঙ্গে চিহ্নিত করেছেন।

(আইন, ২য়, ১৫৩)। এটা হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটস্থ বাঘা হতে পারে। (বাহরিস্তান, ২য়, ৮২১, টীকা ৭)।

১৬। বনগাঁও ভগওয়ানের প্রায় ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং সালকা বনগাঁও-এর প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। রেনেলের ১নং মানচিত্রে বুরানহাটির ২২ মাইল উত্তরে ইছামতি থেকে সালকা খাল নির্গত হয়েছে বলে চিহ্নিত আছে। সতীশচন্দ্র মিত্রের মতে এই খালের মুখেই সালকা থানা, রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্রেও এই সালকার যুদ্ধের কথা উল্লেখিত আছে। (সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ৩৭৩-৭৪)।

১৭। কামাল খোজা নামে পরিচিত খাজা কামাল প্রতাপাদিত্যের একজন আফগান সৈন্য; তিনি প্রথমে প্রতাপাদিত্যের দেহরক্ষীদের নেতা ছিলেন। পরে তিনি পদোন্নতি পেয়ে সেনাপতি নিযুক্ত হন এবং একটি প্রধান দুর্গের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর নামানুসারে গড় কামালপুর দুর্গের নামকরণ করা হয়। সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১২৭-২৮।

১৮। বাহরিস্তান, ১ম, ১২৮-১৩০।

১৯। এটা 'বুড়ান' হবে, সাতক্ষীরা শহরের উত্তর-পশ্চিম অংশে যমুনা ও ইছামতি থেকে কপোতাক্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত বুড়ান একটি পরগণা। বুড়ান দুর্গ সাতক্ষীরার পশ্চিম প্রান্তে ইছামতি নদীর তীরে ছিল। রেনেলের ১নং মানচিত্রে 'বুরান হোটি' আছে, এটা ফোর্ট উইলিয়ামের আটত্রিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত, এর পূর্ব দিকে ইছামতি প্রবাহিত। বুড়ানহাটির একটু দক্ষিণে ইছামতি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত, সুতরাং এই স্থানটি যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সতীশচন্দ্র মিত্রঃ যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৩৬; প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৫ টীকা) আইন-ই আকবরীতে বুড়ন সরকার সাতগাঁও-এর একটি মহাল। (আইন ২য়, ১৫৪।)

২০। এটা ভৈরব নদী, রেনেলের ১নং মানচিত্র।

২১। এটা ইছামতি নদীতে এক খেয়া পারাপারের বা নদী থেকে উঠা-নামার ঘাট হবে, এটা যশোরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং এটা ২৩নং টীকায় উল্লেখিত কাগরাঘাটের নিকটেই হবে।

২২। বাহরিস্তান, ১ম, ১৩৪।

২৩। রেনেলের ১নং মানচিত্রে কগরেগেট এবং ২০নং মানচিত্রে কগরিঘাট, যশোরের মির্জানগর থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে। এর নিকটে নদী তিন শাখায় বিভক্ত হয়েছে, একটি দিয়ে উত্তর-পূর্বে প্রতাপনগর এবং গড় কমলপুরে যাওয়া যায়, অন্যটি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধুমঘাট অতি নিকটে অবস্থিত। মধ্যে কদমতলীর প্রবাহ। যশোরের পূর্ব দিকে ইছামতি নদীর অপর পারে খাগড়াঘাট নামে একটি স্থান আছে, সম্ভবত এখানে এসে মোগল সৈন্য নদী পার হয়ে পূর্ব দিক থেকে দুর্গ আক্রমণ করে। প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৬ টীকা।

২৪। বাহরিস্তান, ১ম, ১৩৫-১৩৬।

২৫। ঐ, ১৩৭-৩৮।

২৬। ঐ, ১৩৮-৩৯, ১৪২।

Edited by Ripon Sarkar

২৭। ঐ, ১৪৩-৪৪। রাজস্ব নির্ধারণের কাজ দিওয়ানের, বখশীর নয়, কিন্তু দিওয়ান মুতাকিদ খান ঢাকায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও বখশীকে এই দায়িত্ব দেয়া হয়। এর কারণ বোধ হয় এই যে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের অব্যবহিত পূর্বে ইসলাম খান করোকার দর্শনের ব্যবস্থা করেন। "মুতাকিদ খান এর প্রতিবাদ করায় তাঁকে পরে অনুতাপ করতে হয়।" (বাহরিস্তান, ১ম, ১২০; এটা পরের অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে) মনে হয় এ সময় দিওয়ান মুতাকিদ খান সুবাদারের বিরাগভাজন হওয়ায় বখশীকে দিওয়ানের কাজে নিযুক্ত করা হয়।

২৮। প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৭, ৭।

২৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১৪০-১৪৩।

৩০। ঐ, ২য়, ৫২১।

৩১। এইচ. বি. ২য়, ২৬৯।

৩২। বাহরিস্তান, ১ম, ২১৯।

৩৩। ঐ, ১৩১-৩২।

৩৪। ঐ, ১২৩-২৪।

৩৫। কে. এম. মেহেরঃ রাজশাহীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বগুড়া ১৯৬৫, ২৬৯।

৩৬। জে. এ. এস. বি. ১৯০৪, ১০৮-১৩।

৩৭। শামস-উদ-দীন আহমদঃ ইনস্ক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল, ভল্যুম ৪, রাজশাহী ১৯৬০, ২১৩-১৪।

৩৮। BPP. XXXV, 1928, 37.

৩৯। বাহরিস্তান, ১ম, ১৪৬।

৪০। তুযুক, ১ম, ২৩৬। তুযুকে সম্রাট জাহাঙ্গীর মগদের সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেনঃ "Hushang, son of Islam Khan, who was in Bengal with his father, came at this time and paid his respects. He brought with him some Maghs whose country is near Pegu and Arracan, and the country is still in their possession. I made some enquiries as to their customs and religion. Briefly they are animals in the form of men. They eat everything there is either on land or in the sea, and nothing is forbidden by their religion. They eat with anyone. They take into their possession (marry) their sisters by another mother. In face they are like the Qara Qalmaqs, but their language is that of Tibet and quite unlike Turki. There is a range of mountains, one end of which touches the province of Kashghar and the other the country of Pegu. They have no proper religion or any customs that can be interpreted as religion. They are far from the Musalman faith separated from that of the Hindus.

৪১। বাহরিস্তান, ১ম, ১৩৯-৪০।

৪২। কাছাড়ের প্রধান দুর্গের নাম অসুরিরাদলপুর। বাহরিস্তানে একে অসুরাবতপড় লেখা হয়েছে।

৪৩। বাহরিস্তান, ১ম, ২১৯-২২১।

৪৪। মির্যা নাথন পরীক্ষিতকে সর্বদা কোচ রাজা বলেছেন, এর কারণ তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। কোচ বিহার রাজ্য দু ভাগে বিভক্ত হয়ে পশ্চিম অংশ কামতা নামে লক্ষ্মী-নারায়ণের অধীনস্থ হয়। তৃতীয় অধ্যায়ে আরও বলা হয়েছে কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ প্রথম

Edited by Ripon Sarkar

প্রকৃতই মোগলদের মিত্র ছিলেন, কারণ তিনি তাঁর জ্ঞাতি (চাচাত ভাই-এর ছেলে, অর্থাৎ ভাইপো) এবং তাঁর চেয়ে শক্তিশালী রাজা পরীক্ষিতের আগ্রাসনের ভয়ে ভীত ছিলেন।

৪৫। মুসা খানের ডাকছড়া দুর্গ জয় করার আগে বালিয়ে বড় খালের মুখ কাটার পরামর্শ এবং দুর্গ নির্মাণ করে করে অগ্রসর হওয়ার জন্য রাজা রঘুনাথের পরামর্শ বিশেষ ফলপ্রসূ হয়।

৪৬। আবদুল হামীদ লাহোরী বলেন যে এই যুদ্ধে ছয় হাজার অশ্বারোহী, দশ থেকে বার হাজার পদাতিক সৈনা এবং পাঁচশ রণপোত অংশ নেয় (বাদশাহনামা, ২য়, ৬৫।) মির্‌যা নাথন মনসবদারদের সৈন্য সংখ্যা দেননি, তাই নাথনের বিবরণে সৈন্য নির্ধারণ করা যায় না, কিন্তু মনে হয় এই সংখ্যা আবদুল হামীদ লাহোরী প্রদত্ত সংখ্যার চেয়ে কমত হবেই না, বরং বেশি হবে।

৪৭। বাহরিস্তান, ১ম, ২২২-২২৩। প্রকৃতপক্ষে মুকাররম খান টোক-এর বাইরে অনতিদূরে শিবির স্থাপন করেন। ইসলাম খান টোক থেকে শিবিরে এসে সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হন।

৪৮। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তারিখে মোগল বাহিনী ঢাকা থেকে যাত্রা করে (এইচ. বি. ২য়, ২৮৫), তিনি এই তারিখ কোথায় পান জানি না। তবে মির্‌যা নাথনের টোক থেকে যাত্রার চার মঞ্জিল পরে রমজানের শেষ তারিখের কথা থেকে স্পষ্টই জানা যায় যে ২০শে নবেম্বর তারিখ মোগলরা টোকের নিকটস্থ স্থান থেকে যাত্রা করে। এ হিসেবে মোগল বাহিনী নবেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকা থেকে যাত্রা করে। ডিসেম্বরের ৮ তারিখে কোনমতেই নয়।

৪৯। বক্তপুর ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরে, করিবারী পাহাড়ের বিপরীতে অবস্থিত। (রেনেলের ৫নং মানচিত্রে চিহ্নিত)।

৫০। পটলদহ ব্রহ্মপুত্রের ডান তীরে করিবারী পাহাড়ের বিপরীত দিকে অবস্থিত। (রেনেলের ৫নং মানচিত্রে চিহ্নিত) পটলদহ একটি প্রসিদ্ধ স্থান, আইন-ই-আকবরীতে এটা সরকার ঘোড়াঘাটের একটি মহাল। (আইন, ২য়, ১৪৮)।

৫১। সালকোনা ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে পটলদহ এবং করিবারীর মধ্যবর্তী স্থান। রেনেলের ৫নং মানচিত্রে এটা 'তালকনৌ' রূপে চিহ্নিত।

৫১ (ক) অভিযান পাঠাবার কথা বলে মির্‌যা নাথন যে সকল অফিসারের নাম দেন তাদের মধ্যে এদের নামও আছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে এরা পরে যোগদান করে। মির্‌যা নাথন প্রথম তালিকাতেই সকলের নাম যোগ করে দিয়েছে।

৫২। বাহরিস্তান, ১ম, ২২৯-৩০।

৫৩। আবদুল হামীদ লাহোরীঃ বাদশাহনামা, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৫।

বাংলা এবং আসামের দুর্গের জন্য বাঁশের ব্যবহার দেখা যায়। কামতা, কামরূপে এর প্রচুর ব্যবহার ছিল, মুসা খানও ডাকছড়া দুর্গের বাইরে বাঁশের কলা পুঁতে রেখেছিলেন।

৫৪। বাহরিস্তান, ১ম, ২৩০-৩১।

৫৫। ঐ, ২৩১-২৩৩।

৫৬। মির্‌যা নাথন বিরক্ত হয়ে শয়খ কামালকে এখানে (বাহরিস্তান, ১ম, ২৩৩) "শয়খ-ই-পীরপেশা" বা পেশাদার পীর বলেছেন।

৫৭। আকবরের সময়ে চিতোর দুর্গের বিরুদ্ধে এরূপ সাবাত নির্মাণ করা হয়। আকবরনামা, ১ম, ১১৪, ২য়, ২৪৩।

৫৮। বাহরিস্তান, ১ম, ২৩৩-৩৫।

৫৯। মনে হয় রাজা পরীক্ষিত তাঁর বাহিনীতে মুসলিম সৈন্যও নিয়োগ করেন।

৬০। বাহরিস্তান, ১ম, ২৩৭-২৩৯।

৬১। ঐ, ২৪০।

Edited by Ripon Sarkar

৬২। ঐ, ২৪০-৪১।

৬৩। ঐ, ২৪১-৪২।

৬৪। খুনতাঘাট ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে এবং বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত।

৬৫। খরবোজাঘাট গোয়ালপাড়া জেলার মেচপাড়া মৌজায় অবস্থিত।

৬৬। গদাধর নদী ধুবড়ির নিকটে ব্রহ্মপুত্রের নিকটে মিলিত হয়েছে।

৬৭। ডঃ এম. আই. বোরাহ বলেনঃ "ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ তীরে কামরূপ জেলার পারো পাহাড়ের দিকে ডিমারুয়া নামে একটি স্থান আছে, কিন্তু এখানে উল্লেখিত সেনানায়ক (ডুমুরিয়া) এই স্থানের লোক বলে মনে হয় না। মির্‌যা নাথন তাঁর পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেন যে রাজা পরীক্ষিতের এক আত্মীয় ডুমুরিয়ার ছেলেরা করিবারীতে বাস করত। সুতরাং মনে হয় ডুমুরিয়া এই এলাকার লোক ছিলেন।" (বাহরিস্তান, ২য়, ৮৩২, টীকা ২৩)।

৬৮। বাহরিস্তান, ১ম, ২৪৩। পুরানা আসাম বুরঞ্জী (পৃঃ ১৯৯) এবং কামরূপের বুরঞ্জীতে (পৃঃ ৯) পরীক্ষিতের নৌ-অধ্যক্ষের নাম পুরন্দর লস্কর, এটা ডুমুরিয়ার উপাধি হতে পারে। উক্ত সূত্রে মোগল পক্ষের নৌ-সেনাপতিকে কুবের খানের ছেলে বলা হয়েছে। মির্‌যা নাথন বলেছেন যে ভাটির জমিদারদের পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু নেতৃত্ব কাকে দেয়া হয়েছিল উল্লেখ নেই। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে চারশ বন্দুকধারীদের বন্দী করা হয় (মোগল নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি, ১৪২) কিন্তু বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে তাদের হত্যা ও বন্দী করা হয়। আরও দেখুন, বাহরিস্তান, ২য়, ৮৩৯, টীকা নং ২৩, ২৫।

৬৯। বাহরিস্তান, ১ম, ২৪৩-৪৭।

৭০। ঐ, ২৪৭-৪৮।

৭১। ঐ, ২৪৯।

৭২। পরীক্ষিত কামরূপের কোথায় পালিয়ে যান বাহরিস্তানে তার উল্লেখ নেই। পরীক্ষিতের রাজ্যের নাম কামরূপ। বাদশাহনামায় স্থানটির নাম বারনগর (বাদশাহনামা, ২য়, ৬৭)।

৭৩। শনকোস নদীর দুটি ধারা আছে। একটি ভূটান পাহাড় থেকে নির্গত হয়ে তিস্তরবন্দ পরগণার একটু পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, অন্যটিও ভূটান থেকে নির্গত হয়ে গদাধর-ব্রহ্মপুত্রের সংযোগ স্থলের কয়েক মাইল উপরে গদাধর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। একে ছোট শনকোস বলা হয় এবং ডঃ এম. আই. বোরাহ মনে করেন যে এখানে শনকোস দ্বারা ছোট শনকোস বুঝান হয়েছে।

৭৪। এই নদী বনাস বা মনাস নদীর একটি শাখা।

৭৫। মনাস বা বনাস নদী ভূটান পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে গোয়ালপাড়ার বিপরীতে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৭৬। পাণ্ডু বর্তমান গৌহাটির পাঁচ মাইল দূরে ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে অবস্থিত।

৭৭। বাহরিস্তান, ১ম, ২৫০-২৫২।

৭৮। বরনদীও পর্বত থেকে নির্গত হয়ে গৌহাটির পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৭৯। বাহরিস্তান, ১ম, ২৫২-৫৩।

৮০। ঐ, ২৫৬-৫৭।

Edited by Ripon Sarkar

সপ্তম অধ্যায়
সুবাদার ইসলাম খান চিশতীঃ চরিত্র কৃতিত্ব এবং মৃত্যু

ইসলাম খান চিশতী আগ্রার চব্বিশ মাইল দূরে অবস্থিত ফতেহপুরের (ফতেহপুর সিক্রি নামে অধিকতর পরিচিত) এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ শয়খ সলীম চিশতী সমসাময়িককালে. একজন অতি প্রসিদ্ধ সূফী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শয়খ বদর-উদ-দীন। ইসলাম খানের বাল্যনাম শয়খ আলা-উদ-দীন চিশতী, বয়সে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরের চেয়ে বছর খানেকের ছোট ছিলেন।[১] সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং ইসলাম খানের জন্ম ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে; ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল আটত্রিশ বছর এবং ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল তেতাল্লিশ বছর। তিনি বাল্যকাল থেকে সম্রাটের সাথী ছিলেন এবং উভয়ে এক সঙ্গে বড় হন। সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা ছিল এবং তিনি সম্রাটের একজন ভক্ত ছিলেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসার পরে শয়খ আলা-উদ-দীনকে ইসলাম খান উপাধি দেন এবং দু হাজারের মনসব দেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট তাঁকে ফরজন্দ বা ছেলে উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।[২] জাহাঙ্গীর কুলী খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলে ইসলাম খান তাঁর স্থলে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হন। বিহারে থাকাকালে সম্রাট তাঁকে একখানি মণিমুক্তা খচিত তরবারি উপহার দেন।[৩] আবার জাহাঙ্গীর কুলী খানের মৃত্যু হলে ইসলাম খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন এবং তাঁর মনসব ৪০০০/৩০০০ এ বৃদ্ধি করা হয়।[৪] আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার সময় রাজধানীর উচ্চপদস্থ অফিসারেরা তাঁর অল্প বয়স .বং অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন, কিন্তু ইসলাম খানের প্রতি সম্রাটের অকুণ্ঠ বিশ্বাস এবং ইসলাম খানের দক্ষতার প্রতি সম্রাটের পূর্ণ আস্থা থাকায় সম্রাট নিজ দায়িত্বে তাঁকে নিযুক্তি দেন। ইসলাম খান সারা বাংলা জয় করে এবং সারা বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করে তাঁর প্রতি সম্রাটের বিশ্বাস ও আস্থার মূল্য দেন; সম্রাটও ইহা বিনা দ্বিধায় স্বীকার করেন।[৫] বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধ চলার সময় ইসলাম খানের মনসব ৫০০০/৫০০০ এ বৃদ্ধি করা হয়।[৬] খাজা উসমান এবং আফগানদের পরাজয়ের পর ইসলাম খানের মনসব ছয় হাজারে বৃদ্ধি করা হয়।[৭] মাঝে মাঝে সম্রাট ইসলাম খানের জন্য খেলাত, তরবারী ইত্যাদি উপহার পাঠিয়ে সম্মানিত করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। বাংলা বিজয়ের সুবিধার জন্য সম্রাট বাংলার সকল ব্যাপারে ইসলাম খানের সুপারিশ গ্রহণ করেন, যখনই ইসলাম খানের প্রয়োজন হয়েছে সম্রাট বাংলার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য, যুদ্ধ সরঞ্জাম পাঠাতে দ্বিধা করেননি। বাংলায় অন্যান্য অফিসারদের নিযুক্তিও ইসলাম খানের সুপারিশে করা হয়, উদাহরণস্বরূপ ইসলাম খানের সুপারিশে রাজা কল্যাণ (তোডর মল্লের পুত্র) উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন, আবার রাজা কল্যাণের পরে ইসলাম খানের সুপারিশে শুজাত খান উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। ইসলাম খানের ভাই শয়খ গিয়াস-উদ-দীনকে গিয়াস খান (বা এনায়েত খান) উপাধি দেয়া হয় এবং অন্যান্য অফিসারদের পদোন্নতি বা মনসব বৃদ্ধিও ইসলাম খানের সুপারিশে করা হয়। ইসলাম খানকে আরও উৎসাহিত করার জন্য সম্রাট তাঁকে একবার এক লাখ টাকা দান করেন। ঐ টাকা ছিল খালিসা রাজস্ব, সম্রাট বলেন[৮] "যেহেতু তিনি (ইসলাম খান)

Edited by Ripon Sarkar

সামরিক বাহিনী এবং শাসন-যন্ত্রের প্রধান, সেহেতু আমি তাঁকে ঐ টাকা দান করলাম।" ইসলাম খানও সম্রাটের নিকট হাতিসহ নানা উপহার পাঠাতেন। খাজা উসমানের পতনের পরে ইসলাম খান ১৬০টি হাতি পাঠান; আবার তাঁর ছেলে হুশঙ্গ এর মারফত কয়েকজন মগ ধরে পাঠান; আর একবার ২৮টি হাতি, ৪০টি টাঙ্গন ঘোড়া, ৫০জন খোজা (দাস) এবং ৫০০ পরগালা নফিস সিতারকানী সম্রাটের নিকট পাঠান।[৯] অতএব ইসলাম খানের প্রতি সম্রাটের যেমন পূর্ণ আস্থা ছিল, ইসলাম খানও তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব, অর্থাৎ বাংলো বিজয় নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন।

ইসলাম খানের সাধারণ শিক্ষা বা সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না, তবে অভিজাত পরিবারে জন্ম হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে তিনি প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। মিরযা নাথন একস্থানে বলেন যে মিরযা মুহাম্মদ নামক একজন হস্তলিপিবিশারদ ইসলাম খানের জন্য একখানি বই লিখছিলেন (নকল করছিলেন?)। এতে মনে হয় ইসলাম খানের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল এবং তাঁর বই পড়ার অভ্যাস ছিল। সেকালে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সামরিক শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এ কারণে এবং যুবরাজের সঙ্গে বড় হওয়াতে মনে হয় তিনি সামরিক শিক্ষাও লাভ করেন। শিক্ষিত না হলে এবং সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলে তিনি সুবাদারের মত উচ্চ পদ লাভ করতেন না। বাংলায় তিনি প্রমাণ করেন যে তিনি শুধু শিক্ষিতই ছিলেন না, রণ কৌশলেও পারদর্শী ছিলেন। মাসির-উল-উমারায় তাঁর চরিত্র সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে।[১০] ইহাতে বলা হয় যে তাঁর অনেক সৎ গুণ ছিল, তিনি বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে মর্যাদাবান ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের বোন বিয়ে করেন, ঐ স্ত্রীর গর্ভে তাঁর ছেলে হুশঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। হুশঙ্গ জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ইকরাম খান উপাধি লাভ করেন। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে হুশঙ্গের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা বলা হয়েছে। হুশঙ্গের আত্মহত্যার চেষ্টার কথা শুনে ইসলাম খান যখন তাঁকে প্রহার করছিলেন তখন গিয়াস ও অন্যান্যরা ইসলাম খানকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। তখন ইসলাম খান রেগে তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে তাঁরা হুশঙ্গের মৃত্যু চান যাতে ইসলাম খানের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে। এতে মনে হয় হুশঙ্গ ছিলেন ইসলাম খানের একমাত্র পুত্র, কিন্তু মাসির-উল-উমারায় বলা হয়েছে যে ইসলাম খানের আর এক ছেলে ছিল, তাঁর নাম শয়খ মুয়াজ্জম, তিনি হুশঙ্গ-এর সৎভাই ছিলেন। অতএব, ইসলাম খানের অন্ততঃপক্ষে আরও একজন স্ত্রী ছিলেন। শয়খ মুয়াজ্জম ফতেহপুরের ফৌজদারী লাভ করেন, ফতেহপুর মাযারের (শয়খ সলীম চিশতীর মাযারের) তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন এবং পরে সামুগড়ের যুদ্ধে দারাশিকোহর পক্ষে যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন।[১১] ইসলাম খানের এক মেয়ে মুকাররম খানের সঙ্গে বিয়ে হয়। শয়খ হুশঙ্গ (ইকরাম খান) জাহাঙ্গীরের সময়ে আসির দুর্গের ফৌজদার নিযুক্ত হন, তিনি মনসব এবং জায়গীর লাভ করেন। তিনি শের খান তনভীরের মেয়ে বিয়ে করেন, কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। শাহজাহানের রাজত্বকালে কোন কারণে তাঁকে পদচ্যুত করা হয়। তিনি ফতেহপুরে শয়খ সলীমের মাযারে দরবেশের জীবন যাপন করেন এবং মাযারের দায়িত্ব পালন করেন। শাহজাহানের রাজত্বের ২৪ বছরে (১৬৫১ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু হয়। ইসলাম খান মদ পান করতেন না, এটা তুজুক এবং মাসির-উল-উমারায় সমর্থিত।[১২] কিন্তু তিনি নৃত্য উপভোগ করতেন, মাসির-উল-উমারায় বলা হয়েছে যে তিনি বিভিন্ন ধরনের (যেমন, লুলী, সুরকনী, কাঞ্চনী এবং ডোমনী) অনেক নর্তকী পুষতেন এবং তাদের জন্য মাসিক আশি হাজার টাকা ব্যয়

Edited by Ripon Sarkar

করতেন। তিনি হাতির যুদ্ধ উপভোগ করতেন। তিনি শিকার করতেন। বর্তমান নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার নাজিরপুরে খেদা করে হাতি ধরার কাহিনী বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়।[১৩] ইসলাম খান নিজে খেদায় এবং হাতি শিকারে অংশ নেন। মধ্যযুগে সুলতানেরা এবং মোগল সম্রাটেরা প্রায়ই শিকারে যেতেন, শিকার ছাড়াও এতে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, মহড়া এবং শরীর চর্চা হত। ইসলাম খানও সৈন্যদের শরীর চর্চা এবং হাতি শিকার উভয় উদ্দেশেই এই খেদার ব্যবস্থা করেন। ইসলাম খান মৃত্যুর দিনেও ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকার করেন। পোশাকের প্রতি তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না এবং ভোজনবিলাসীও ছিলেন না। তিনি সাধারণ জামা এবং পাগড়ী পরতেন এবং পাগড়ীর নিচে পাতলা টুপী (তইকা) পরতেন, আহারের সময় তিনি রুটি এবং শাক বেশি পছন্দ করতেন। তবে প্রত্যেক দিন প্রায় এক হাজার গরিব দুঃস্থ তাঁর নিকট থেকে খাবার পেতেন। অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য মিলে তাঁর অধীনে প্রায় বিশ হাজার লোক ছিল। তিনি শয়খজাদাদের অর্থাৎ শয়খ পরিবারের লোকদের (তাঁর আত্মীয় স্বজনদের) বেশি করে নিযুক্ত করতেন। ইসলাম খান তাঁর পদমর্যাদার প্রতি সজাগ থাকতেন; তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং মেজাজী ছিলেন। তিনি অতিথি বৎসল ছিলেন এবং নিজেও অন্যদের আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। তিনি ঝারোকায় বসতেন (পরে আলোচিত) এবং পরাজিত শত্রুদের তাঁর নিকট আনার সময় আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন; তাঁর মধ্যে ছিল রাজকীয় স্বভাব।

বাংলার কোন যুদ্ধে ইসলাম খান সরাসরি নেতৃত্ব দেননি, সুতরাং সামরিক শিক্ষায় বা সৈন্য বা সেনাপতি হিসেবে তাঁর কতটুকু দক্ষতা ছিল তা পরিমাপ করা যায় না। তবে বাংলায় তাঁর যুদ্ধ, যুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা, পরিচালনা ইত্যাদি ক্রিয়াকাণ্ড পরীক্ষা করলে তাঁর মধ্যে দুটি গুণের সমাবেশ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়, ১ম, পরিকল্পনা এবং ২য় সংগঠন শক্তি। ইসলাম খান রাজমহলে এসেই বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, নদ-নদীর গতি প্রকৃতি, বাংলার আবহাওয়া এবং বিভিন্ন স্থানের সামরিক গুরুত্ব সম্পর্কে পরিচিতি লাভ করেন; বাংলার সামরিক ভূগোল সম্পর্কে তিনি নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করেন। বার-ভূঁঞা, আফগান শক্তি এবং অন্যান্য জমিদারদের অবস্থান এবং সামরিক শক্তি সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত হন। আকবরের সময়ে অনেক নাম করা সেনাপতি এসেছিলেন এবং যুদ্ধ করেন; তাঁরা নিজেরা সৈন্য ছিলেন এবং যুদ্ধে অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ইসলাম খানের মত এত নির্ভুল এবং নিখুঁত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন বলে মনে হয় না। ইসলাম খান রাজমহলে এসেই বুঝতে পারেন যে বাংলায় মোগল অধিকারের দুটি প্রধান প্রতিবন্ধক শক্তি বার-ভূঁঞা এবং তাদের নেতা মুসা খান মসনদ-ই-আলা ও বুকাইনগরের খাজা উসমান আফগান। উভয় শক্তির কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব-বাংলায়। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলা জয় করতে হলে অশ্বারোহী বাহিনীর চেয়ে নৌ-বাহিনীর গুরুত্ব অনেক বেশি। তিনি পূর্ব-বাংলার আবহাওয়া এবং নদ-নদী সম্পর্কেও জ্ঞান লাভ করেন এবং বুঝতে পারেন যে সেখানে বর্ষাকালে যুদ্ধ করার জন্য রণতরী এবং কামানের ব্যবহার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও অনুধাবন করেন যে পূর্ব-বাংলার মাটিতে অবস্থান নিয়েই পূর্ব-বাংলা জয় করতে হবে; রাজমহল থেকে এসে যুদ্ধ করলে হয়ত সাময়িকভাবে জয়লাভ করা যাবে, কিন্তু সেই জয় স্থায়ী হবে না, যেমনটি হয়েছে সম্রাট আকবরের সময়ে। তাই তিনি রাজমহলে

Edited by Ripon Sarkar

পৌঁছে দুটি সিদ্ধান্ত নেন ১ম, নৌ-বাহিনী শক্তিশালী করা এবং ২য়, পূর্ব বাংলায় রাজধানী স্থানান্তর এবং সুবাদারের পূর্ব-বাংলায় অবস্থান। দুটি বিষয়েই তিনি পদক্ষেপ নেন, যার ফলশ্রুতি ইহতিমাম খানের অধীনে নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন এবং নৌ-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা এবং পরে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন। আকবরের সময়ে সেনাপতিরা তাঁড়া বা রাজমহল থেকে গঙ্গা নদী ধরে সরাসরি পূর্ব-বাংলায় যান, কিন্তু ইসলাম খান তা না করে রাজমহল থেকে ঘোড়াঘাটে যান এবং সেখানে একটি বর্ষাকাল কাটিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আসল শত্রুর বিরুদ্ধে গমন করেন। ইতোমধ্যে কিছু ছোট খাট যুদ্ধ হয়, ফলে মোগল বাহিনী শত্রুদের যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। ইসলাম খানের পরিকল্পনার আর একটি দিক হল, তিনি পেছনে কোন শত্রু রেখে যাননি, ঘোড়াঘাটের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তিনি পেছনে ফেলে আসা জমিদারদের মনোভাব এবং আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হন। প্রথমে কোন কোন জমিদার (যেমন, পাচেটের শামস খান ও ভূষণার রাজা শত্রুজিত) যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁরাও আত্মসমর্পণ করেন, উপহারাদি এবং হাতি ঘোড়া দিয়ে আনুগত্য প্রদর্শন করেন; প্রতাপাদিত্যের মত বিরাট অঞ্চলের ধনী জমিদারও নিজে সাক্ষাত করে আনুগত্য দেখান এবং রাজা শত্রুজিত নিজে মোগল বাহিনীতে যোগদান করেন। এমনকি সীমান্ত রাজ্য কামতার রাজার মিত্রতা সম্পর্কেও ইসলাম খান নিঃসন্দেহ হন। পেছনে কোন শত্রু না থাকা ইসলাম খানের পরিকল্পনার এক বিরাট সাফল্য।

ইসলাম খানের যুদ্ধের পরিকল্পনাও ছিল নির্ভুল। তিনি শত্রুদের একে একে পরাজিত করেন, শত্রুদের মধ্যে ঐক্যের সুযোগ দেননি। অবশ্য শত্রুরা ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের চেষ্টা করেন কিনা তাও জানা যায়নি। কিন্তু শত্রুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রচেষ্টা থাকলেও ইসলাম খান তাদের সেই সুযোগ দেননি। বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধের সময় তিনি খাজা উসমানকে তিনদিকে ঘিরে রাখেন, আলপসিংহ পরগণায় তাঁর ভাই গিয়াস খানকে, শেরপুর মুর্চায় ইফতিখার খানকে এবং ঘোড়াঘাটে তাঁর আর এক ভাই হাবীব-উল্লাহকে মোতায়েন রেখে তিনি খাজা উসমান ও অন্যান্যদের গতিবিধির উপর নজর রাখতে বলেন। সুতরাং বার–ভূঁঞার উপর থেকে মোগলদের চাপ কমাবার ইচ্ছা খাজা উসমানের থাকলেও তিনি কোন দিকে সুবিধা করতে পারেননি। আবার বার–ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধের সময় মোগলরা এক সঙ্গে ফতহাবাদের মজলিস কুতুবকেও আক্রমণ করেন, যাতে মসলিস কুতুব বার-ভূঁঞার সাহায্য না আসতে পারে; বরং বার-ভূঁঞাকেই মজলিশ কুতুবের সাহায্য করতে হয়। আবার বার-ভূঁঞা পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার আগে অনন্ত মাণিক্যের ভুলুয়া জয় করা হয়; এখানেও ইসলাম খানের নীতি ছিল পেছনে শত্রু না রাখা। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে সিলেটের বায়েজীদ কররানীর বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করা হয়, যাতে- বায়েজীদ কররানী উসমানকে সাহায্য করতে না পারে, প্রায় একই সময়ে উসমান ও বায়েজীদ পরাজিত হয় এবং বাংলায় আফগান শক্তির সম্পূর্ণ বিলোপ হয়। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার সময় একই সঙ্গে বাকলার রাজা রামচন্দ্রের বিরুদ্ধেও সৈন্য পাঠানো হয়, যাতে রামচন্দ্র তাঁর শ্বশুরের সাহায্য করতে না পারে। রামচন্দ্র পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে বাকলায় প্রেরিত বাহিনীকে যশোর আক্রমণ করার নির্দেশ দেয়া হয়। উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় প্রতাপাদিত্যের পতন ত্বরান্বিত হয়।

Edited by Ripon Sarkar

ইসলাম খানের এক নীতি ছিল কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, যাকে স্যার যদুনাথ 'ডিভাইড এ্যাণ্ড রুল' বা বিভেদ-নীতি বলেছেন। ইসলাম খান এই নীতি অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করেন। তিনি পরাজিত জমিদারদের স্বরাজ্যে ফেরত যেতে দেননি, তাদের কারও কারও জমিদারী ফেরত দেয়া হলেও তাদের নিজেদের মোগল সৈন্যদলে রেখে দেয়া হয় এবং তাদের রণতরীগুলি রাজকীয় নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তারা মোগল সেনাপতির অধীনে মোগলদের পক্ষ হয়ে অন্যান্য বাঙ্গালিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। রাজা শত্রুজিত, মজলিশ কুতুব, মুসা খানের ভাইয়েরা (মুসা খান নিজে নযরবন্দী ছিলেন) এবং অন্যান্য জমিদারদের, যেমন বাহাদুর গাজী, সোনা গাজী, বিনোদ রায়, আনোয়ার খান ইত্যাদি সকলে মোগল বাহিনীতে যোগ দেন। একবার ভূঁঞারা আনোয়ার খান ও মাহমুদ খানের নেতৃত্বে ষড়যন্ত্র করেন এবং ইসলাম খানকেও বন্দী করার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় এবং ইসলাম খান তাদের কঠোর শাস্তি দেন, আনোয়ার খান ও আলাওল খানকে অন্ধ করে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর জমিদারেরা আর কোন ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করেননি। অতঃপর জমিদারদের রণতরীগুলি প্রত্যেক যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে; রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জমিদারদের রণতরী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইসলাম খানের পরিকল্পনার আর একটি দিক হল, তিনি জানতেন, কখন, কাকে, কিভাবে আক্রমণ করতে হয়। তিনি প্রথমে বার-ভূঁঞার ভাটি আক্রমণ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে মোগল বাহিনীর জন্য ভাটিই ছিল সর্বাপেক্ষা সবল বা প্রবল স্থান। ভাটি এমন একটি এলাকা, যেখানে বছরের বেশির ভাগ সময় প্লাবিত থাকে। এই ভাটিতে আকবরের সেনাপতিদের ভরাডুবি হয়েছে। দায়ে পড়ে বার-ভূঁঞা আত্মসমর্পণ করলেও এটা ছিল সাময়িক, সুযোগ পেলেই তারা আবার বিদ্রোহ করে বসত। সুতরাং অন্যান্য এলাকা জয় হলেও ভাটি বিজয় না হওয়া পর্যন্ত বাংলা বিজয় বলা চলে না। তাই ইসলাম খান তাঁর সর্ব-শক্তি ভাটির বিরুদ্ধে নিয়োগ করেন। ভাটি বিজিত হলে, বার-ভূঁঞা আত্মসমর্পণ করলে তার পরে ইসলাম খান অন্যদিকে মনোযোগ দেন। তিনি বার-ভূঁঞাদের এমনভাবে পরাজিত করেন যে তারা আর মাথা তুলতে পারেনি। ইসলাম খানের লক্ষ্য স্থির থাকায় তিনি পরাজয়ের গ্লানি এবং জমিদার কর্তৃক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথাও সাময়িকভাবে হজম করেন। ঘোড়াঘাটে থাকাকালে ইসলাম খান কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের নিকট দূত পাঠান; পরীক্ষিত আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানালে তিনি আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে কামরূপে সৈন্য প্রেরণ করেন কিন্তু এই বাহিনী ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে এবং আবদুল ওয়াহিদ পালিয়ে যান। ইসলাম খান তখন আর সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর প্রধান লক্ষ্য বাংলা জয় করা, কামরূপে শক্তি ক্ষয় হলে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ব্যাহত হতে পারে। তাই তিনি পরীক্ষিতের ব্যাপারটা স্থগিত রেখে ভাটির দিকে গমন করেন। পরে পরীক্ষিতের সঙ্গে যুদ্ধে দেখা গেছে যে তিনিও একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন; যুদ্ধে মোগল বাহিনী শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও তাদের অনেক প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের অনেক সৈন্য ও নৌকা হারাতে হয়। ইসলাম খান তখনই পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে সত্যিই তাঁর পক্ষে সারা বাংলা জয় করা কঠিন হয়ে পড়ত। যা হোক, শেষ পর্যন্ত রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন এবং বন্দী হন। রাজা প্রতাপাদিত্য নিজ সৈন্য-সামন্ত,

Edited by Ripon Sarkar

রণতরী, অর্থইত্যাদি নিয়ে বার-ভূঁএ্রাকে আক্রমণ করার অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর অঙ্গীকার ভংগ করেন। ইসলাম খান ঐ সময় নিশ্চুপ থাকেন, কারণ তখন বার-ভূঁএ্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছিল। ঐ অবস্থায় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে তাঁর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু খাজা উসমান বুকাইনগর থেকে পালিয়ে গেলে উসমানের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ শেষ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের আগে কিছু সময় হাতে থাকে। ঐ সময়ে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করা হয়; প্রতাপাদিত্য আত্মসমর্পণ করে বন্দী হন। সিলেটের বায়েজীদ কররানী মোগল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হলে কাছাড়ের রাজা বায়েজীদকে সাহায্য করেন। ফলে বায়েজীদ কররানী আত্মসমর্পণ করলে ইসলাম খান কাছাড়ের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন; কাছাড়ের রাজা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

ইসলাম খান এমনভাবে যুদ্ধের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যে বেশির ভাগ যুদ্ধ শুষ্ক মৌসুমে সংঘটিত হয়। যদিও মোগল নৌ-বাহিনী শক্তিশালী ছিল, তিনি জানতেন যে যুদ্ধ জয়ে অশ্বারোহী বাহিনী সর্বাপেক্ষা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। মাত্র দুটি যুদ্ধ বর্ষাকাল পর্যন্ত চলে, বার-ভূঁএ্রার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ এবং রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ। উভয় যুদ্ধই শুষ্ক মৌসুমে শুরু হয় কিন্তু বিলম্বিত হয়ে বর্ষাকাল পর্যন্ত গড়িয়ে চলে। মোগল বাহিনী শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেও উভয় যুদ্ধেই মোগল নৌ-বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। কদমরসুলের যুদ্ধে মুসা খান পালিয়ে গেলেও মোগল নৌ-সেনাদের ফিরে আসাই দায় হয়ে পড়ে। কামরূপের যুদ্ধে গদাধর নদীর মুখে মোগল নৌ-বাহিনী (জমিদারদের নৌ-বাহিনী) এমনভাবে পরাজিত হয় যে দুশ পঞ্চাশখানি রণতরীর মধ্যে মাত্র তেতাল্লিশ খানি ফিরে আসতে সমর্থ হয় এবং প্রায় সকল সৈন্যই হয় নিহত বা আহত হয় এবং দুজন জমিদার, বাহাদুর গাজী এবং সোনাগাজী অর্ধমৃত অবস্থায় ফিরে আসতে সমর্থ হন। মিরযা নাথন বর্ষাকালে কদমরসূল থানার শিবিরের বিবরণ দিয়ে বলেনঃ[১৪]

> "..... When he (Mirza Husain, a special messenger from the imperial Court) came to the Thana of Mirza Nathan at Qadam Rasul he inspected with attention the strong current of the flood water and the system of protecting the fort against such a deep river. The fort had practically no wall; but a large number of logs of wood called Kuda in Bengalee were arranged in the form of a wall of the fort, and the towers and ramparts were also strengthened with those logs. Even the horses, men and elepheants were staying on the machan i. e. raised plat-form of logs of wood arranged in proper order. It was not possible for any person to go from one place to another without a boat. He then met Mirza Nathan who one day took him round the fort from trench to trench riding on an elephant and showed him the hard labour of every one of his comrades. On account of the scarcity of food stuff and the increase of starvation, not a day passed without the death of fifty to sixty persons in the fort of Mirza Nathan."

Edited by Ripon Sarkar

এরূপ অবস্থায় বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করতে হলেও এটা কারও কাম্য নয়, তাই ইসলাম খান যতদূর সম্ভব বর্ষাকালে যুদ্ধ বন্ধ রাখার চেষ্টা করেন।

ইসলাম খান কোন শত্রুকে ছোট করে দেখেননি। প্রত্যেক অভিযান পাঠাবার আগে তিনি সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী, হাতি, ঘোড়া, রসদ এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করে সেভাবে প্রস্তুতি নিতেন। বার-ভূঁঞা, খাজা উসমান এবং রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। সেনাপতির অভাব অনুভব করে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানের আগে তিনি শুজাত খানকে আনিয়ে নেন। উসমানের বিরুদ্ধে তিনি এত সৈন্য পাঠান যে রাজধানী রক্ষার জন্য তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং পরে সম্রাটের নিকট আবেদন জানিয়ে বিহার থেকে সৈন্য আনেন। এ সৈন্যও পরে উসমানের বিপক্ষে পাঠানো হয়। তিনি যদিও মেজাজী এবং স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির লোক ছিলেন, যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি সকলের মতামত নিতেন এবং যাচাই করতেন, অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই দিতেন। যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি স্থানীয় লোকের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মূল্য দিতেন। এ কারণে সুসঙ্গ-এর রাজা রঘুনাথকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাখতেন। রাজা রঘুনাথের পরামর্শে বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে তিনি বিশেষভাবে লাভবান হন। রাজা রঘুনাথ একটি ভরাট খালের মুখ কেটে দিতে না বললে মুসা খানের ডাকছড়া দুর্গ জয় অসম্ভব না হলেও বিলম্বিত হত। পরীক্ষিতের সঙ্গে যুদ্ধে রাজা রঘুনাথের কথা শুনে মোগল বাহিনী প্রায় পরাজিত হতে যাচ্ছিল, রঘুনাথ অবশ্য ইচ্ছা করে ভুল তথ্য দেননি, আগ্রহের আতিশয্যেই তিনি এই ভুল করেন। কিন্তু রাজা রঘুনাথের পরামর্শ শুনে ইসলাম খান অনেক স্থানে, বিশেষ করে বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধে বিশেষভাবে উপকৃত হন।

ইসলাম খান যেমন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেন, তেমনি তাঁর সাংগঠনিক শক্তিও প্রশংসনীয়। তিনি এমনভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করেন যা তাঁর বিচক্ষণ রণ কৌশলের পরিচায়ক। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি নিজে তেমন কোন যুদ্ধে নেতৃত্ব দেননি; একমাত্র মুসা খানের যাত্রাপুর দুর্গ দখলের সময় তিনি নৈশ আক্রমণের নেতৃত্ব দেন বলে মনে হয়, কিন্তু তাও খুব স্পষ্টভাবে বুঝা যায় না। সেখানেও তিনি যুদ্ধ করেননি, শত্রুরা পালিয়ে গেলে তিনি সকালে দুর্গে প্রবেশ করেন। কিন্তু যুদ্ধে অংশ না নিলেও তিনি খুঁটিনাটি পরীক্ষা করতেন এবং প্রয়োজনীয় আদেশ দিতেন। বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম খান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। তিনি কখন কিভাবে শত্রুদের আক্রমণ করা হবে সে নির্দেশ দিতেন। সৈন্য ও নৌ-সেনাদের প্রত্যেকটি কাজ যেমন দুর্গ নির্মাণ, পরিখা খনন, ব্লক হাউজ বা প্রতিরক্ষা দুর্গ বা প্রাচীর নির্মাণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা তা নিজে তদারক করতেন, প্রত্যেক পরিখা এবং ব্লক হাউজে গিয়ে সকলকে উৎসাহ দিতেন, প্রত্যেক সকালে এ সব কাজ তদারক করা তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কার্যক্রমে পরিণত হয়। সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার প্রতি তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন; তিনি জানতেন যে সৈন্য ও নৌ-বাহিনী একযোগে অগ্রসর না হলে এবং একে অন্যের সমর্থন না পেলে বিপর্যয় ঘটতে পারে। ইসলাম খান ঘোড়াঘাট থেকে ভাটি যাওয়ার পথে মীর বহর ইহতিমাম খানকে নৌ-বাহিনী নিয়ে সিয়ালগড়ে যাওয়ার আদেশ দেন। নৌ-বহর ছিল বর্তমান রাজশাহী জেলার আমরুল পরগণার যমুনা ও আত্রাই নদীর সংযোগ স্থলে। কিন্তু নদীর পানি কমে যাওয়ায় ইহতিমাম খানের নৌবহর করতোয়া নদীতে নেয়া সম্ভবপর হয়ে উঠে না। ইসলাম খান অসন্তোষ প্রকাশ করে ইহতিমাম

Edited by Ripon Sarkar

খানকে সত্বর আসার তাগাদা দেন। ফলে ইহতিমাম খান এবং মিরযা নাথনকে খাল কেটে নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি করে অনেক কষ্টে নৌ-বাহিনী নিয়ে আসতে হয়। সুবাদার আদেশ দিয়ে উদাসীন থাকলে কয়েক মাসেও নৌ-বাহিনী আসা সম্ভব হত না এবং বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধের সময়কালও বদলে যেত। ঢাকা আসার পরে ইসলাম খান আর সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকতেন না, তিনি থাকতেন ঢাকায়, কিন্তু মাঝে মাঝে খিজিরপুর, কতরাব, কদমরসুল ইত্যাদি স্থানে গিয়ে শিবির পরিদর্শন করতেন এবং দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছে কিনা, কামান ঠিকমত বসান হয়েছে কিনা, সৈন্যরা যুদ্ধাবস্থায় (War-trim) তৈরি আছে কিনা, শত্রুদের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি তদারক করে আসতেন। শত্রুদের কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করা হবে, কোন সেনাপতি কোন দুর্গে বা কোন থানায় অবস্থান নেবে এ সকল বিষয়েও ইসলাম খান নিজে নির্দেশ দিতেন। তিনি মাঝে মাঝে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ এবং নৌবাহিনীর মহড়া পরিদর্শন করতেন; অভিযানে যাওয়ার আগে তিনি অবশ্যই কুচকাওয়াজ এবং মহড়া পরিদর্শন করতেন। ফলে সেনাপতিরা সর্বদা নিজ নিজ কাজে সতর্ক থাকতেন এবং উৎসাহও পেতেন। কোন যুদ্ধ জয় হলে বা অভিযানে যাওয়ার সময়ে তিনি সেনাপতি এবং সেনানায়কদের খেলাত এবং উপহারাদি দিয়ে উৎসাহিত করতেন; বিজয়ী সেনাপতি, সেনানায়ক এবং সৈন্যদের বীরত্বের কথা সম্রাটকে জানাতেন এবং উপযুক্ততা মত পুরস্কৃত করার জন্য সুপারিশ পাঠাতেন। ফলে সৈন্যদের মধ্যে বীরত্বের জন্য পুরস্কারের লোভ এবং অবহেলার জন্য তিরস্কারের ভয় থাকত, এবং সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করত।

বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি যাননি। সম্রাটের নির্দেশ ছিল যে সুবাদারকে যুদ্ধক্ষেত্রের ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ইসলাম খান এই নিয়ম পালন করেননি। বার-ভূঁঞার পতনের পরে তিনি বোধ হয় আত্মতৃপ্তি লাভ করেন এবং ফলে আর যুদ্ধক্ষেত্রে যাননি। এর পরে তাঁর যাতায়াত শুধু ঢাকা থেকে টোক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; মাঝে মাঝে টোক পর্যন্ত যেতেন, কয়েকদিন অবস্থান করে আবার ঢাকা ফিরে আসতেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার সময় তিনি খিজিরপুর পর্যন্ত গিয়ে কুচকাওয়াজ ও মহড়া পরিদর্শন করেন এবং সৈন্যদের শুভ কামনা করে বিদায় দেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলেও তিনি নিয়মিত সৈন্যদের এবং যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাখবর নিতেন। তিনি মাঝে মাঝে বখশী পাঠিয়ে সৈন্য এবং নৌকা গণনা করাতেন এবং সৈন্য, রসদ, সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রের খবর নিতেন। মিরযা নাথন কয়েকবার বলেছেন যে, ইসলাম খান যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের খবরাখবর নিতেন, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সৈন্য এবং রসদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাঠাতেন। কোন কোন যুদ্ধে তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়। দৌলম্বপুরের যুদ্ধে প্রকৃতপক্ষে মোগল বাহিনী পর্যুদস্ত হয়, উসমানের মৃতদেহ নিয়ে আফগানরা পলায়ন করলেও তাদের তাড়া করার ক্ষমতা মোগল বাহিনীর ছিল না। ঠিক এ সময় ইসলাম খান কর্তৃক প্রেরিত অতিরিক্ত সৈন্য পৌঁছলে শুজাত খান আফগানদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং শত্রুদের আত্মসমর্পণ ত্বরান্বিত হয়। বায়েজীদ কররানীর সঙ্গে যুদ্ধেও মোগল বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে ভয়ানক দুরবস্থায় পড়ে যায়, ঠিক এ সময় অতিরিক্ত সৈন্য যাওয়ায় মোগল বাহিনী রক্ষা পায় এবং অবরুদ্ধ অবস্থা কাটিয়ে উঠে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়। খাজা উসমানের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে ইসলাম খান প্রথমে নির্দেশ দেন যে নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে বুকাইনগর পর্যন্ত প্লাবিত

Edited by Ripon Sarkar

করতে, কিন্তু নদীর পানি কমে যাওয়ায় তিনি আবার নির্দেশ দেন যেন হাসানপুর থেকে বুকাইনগর পর্যন্ত দুর্গ তৈরি করে মোগল বাহিনী অগ্রসর হয়। এ সব এলাকা ইসলাম খান কোনদিন দেখেননি; অন্তত যুদ্ধের বিবরণে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। উসমানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইসলাম খান ঢাকা থেকেই যুদ্ধে সৈন্যদের ব্যূহ রচনার পরিকল্পনা করে পাঠিয়ে দেন। অগ্রবর্তী, অগ্রবর্তী রিজার্ভ, কেন্দ্র বা মধ্যম বাহু, ডান এবং বাম বাহু তিনি এমনভাবে সাজিয়ে দেন যে তিনি যেন সৈন্যবাহিনীতেই উপস্থিত ছিলেন। যাতায়াত এবং সংবাদ আদান প্রদানের আধুনিক উন্নত ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ইসলাম খান যে এরূপ দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। ইসলাম খানের এ সকল কার্যক্রম তাঁর দূরদর্শিতা ও পারদর্শিতার পরিচয় বহন করে।

ইসলাম খান আত্মকেন্দ্রিক লোক ছিলেন। এত গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি আত্ম-গৌরবের লোভ সংবরণ করতে পারেননি। সুবাদার হিসেবে সকল বিজয়ের কৃতিত্ব অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সকল বিজয়ের কৃতিত্ব নিজ আত্মীয় বা নিজের অফিসারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপতি নিয়োগের প্রয়োজন ছিল না, কারণ সুবাদার নিজেই সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, বলা যায়, তিনি নিজেই সেনাপতি ছিলেন। অন্যান্য যুদ্ধে সেনাপতিদের নাম নিচে দেয়া হলঃ

	যুদ্ধ		সেনাপতি
১।	খাজা উসমানের সঙ্গে আলপসিংহ থানার যুদ্ধ	১।	শয়খ গিয়াস-উদ-দীন। তিনি ইসলাম খানের ভাই ছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করলে ইসলাম খানের সুপারিশে তাঁকে মনসব দেয়া হয় এবং এনায়েত খান উপাধি দেয়া হয়। তিনি গিয়াস খান নামেও পরিচিত ছিলেন।
২।	বীরভূম, পাচেট ও হিজলী	২।	শয়খ কামাল। তিনি ইসলাম খানের ব্যক্তিগত সৈন্যবাহিনীর অফিসার ছিলেন, তিনি রাজকীয় বা মনসব প্রাপ্ত অফিসার ছিলেন না। মনে হয় তিনি ইসলাম খানের আত্মীয় ছিলেন, কিন্তু আত্মীয়তা-সূত্র জানা যায় না।
৩।	ভূষণার শত্রুজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৩।	ইফতিখার খান। তিনি মনসবদার ছিলেন, ইসলাম খানের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল বলে মনে হয় না।
৪।	কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৪।	শয়খ আবদুল ওয়াহিদ। তিনি ইসলাম খানের ব্যক্তিগত সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন, মনে হয় তিনিও ইসলাম খানের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। পরে তিনি সরহদ খান উপাধি পান এবং শাহী অফিসারে পরিণত হন।

Edited by Ripon Sarkar

যুদ্ধ	সেনাপতি
৫। ফতাহাবাদের মজলিশ কুতুবের সঙ্গে যুদ্ধ	৫। ইসলাম খানের ভাই শয়খ হাবীব উল্লাহ।
৬। ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ	৬। শয়খ আবদুল ওয়াহিদ।
৭। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধ	৭। প্রধান সেনাপতি গিয়াস খান। তাঁকে এগার সিন্দুরের নিকটে অবস্থান করতে বলে সেনাপতির প্রকৃত দায়িত্ব দেয়া হয় শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে।
৮। যশোরের প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ	৮। গিয়াস খান।
৯। বাকলার রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ	৯। সৈয়দ হাকিম। তিনি রাজকীয় মনসবদার ছিলেন বলে মনে হয় না, ইসলাম খানের সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল কিনা তাও জানা যায় না।
১০। উসমানের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ	১০। শুজাত খান। তিনি ইসলাম খানের আত্মীয় হলেও তিনি উচ্চপদস্থ মনসবদার ছিলেন এবং ইসলাম খানের সুপারিশে সম্রাট তাঁকে নিযুক্ত করেন।
১১। সিলেটে বায়েজীদ কররানীর সঙ্গে যুদ্ধ	১১। শয়খ কামাল।
১২। কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধ	১২। মুকাররম খান সেনাপতি। দ্বিতীয় সেনাপতি শয়খ কামাল। মুকাররম খান মনসবদার হলেও তিনি ইসলাম খানের ভাইপো এবং জামাতা ছিলেন। তিনি অল্প বয়স্ক এবং সম্ভবত অনভিজ্ঞও ছিলেন, তাই প্রকৃতপক্ষে শয়খ কামালই সেনাপতি ছিলেন।
১৩। কাছাড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ	১৩। শয়খ কামাল। পরে মুবারিজ খান। শাহী অফিসারেরা শয়খ কামালের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করলে, সম্রাট আদেশ দেন যেন শাহী অফিসারকে সুবাদারের ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনে নিযুক্ত করা না হয়। তাই শয়খ কামালকে প্রত্যাহার করে মুবারিজ খানকে নিয়োগ করা হয়।

Edited by Ripon Sarkar

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে একমাত্র তিন নম্বরে ও নয় নম্বরে উল্লেখিত যুদ্ধ ছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে ইসলাম খান তাঁর আত্মীয় বা ব্যক্তিগত অফিসারকে সেনাপতির দায়িত্ব দেন। দশ নম্বর যুদ্ধও বাদ যেতে পারে কারণ শুজাত খান ইসলাম খানের আত্মীয় হলেও তাঁকে সম্রাট স্বয়ং সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ইসলাম খানের এই নীতির বিরুদ্ধে মনসবদারদের মধ্যে বরাবর অসন্তোষ ছিল, তাই খাজা উসমানের সঙ্গে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে গিয়াস খানকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। কারণ তিনি সুবাদারের ভাই হলেও একজন মনসবদার ছিলেন এবং খান উপাধি প্রাপ্ত ছিলেন। কিন্তু গিয়াস খানকে এগার সিন্দুরের নিকটে রেখে শয়খ কামাল এবং শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে প্রকৃত যুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়ায় সেনাবাহিনীতে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং মতানৈক্যের ফলে মোগল বাহিনী খাজা উসমানকে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেনি। এই বিষয়ে ইসলাম খানকে ইহতিমাম খানের প্রদত্ত উত্তরে পরিষ্কার ধারণা করা যায়। ইসলাম খানকে ইহতিমাম খান বলেনঃ[১৫]

"If you blame us for not pursuing Usman on his flight, then I may point out that according to the orders of his Majesty, the subahdar ought to have remained behind at a distance of thirty kos from the field of battle where the imperialists were engaged against the enemy. Praise be to God. The officers (the subahdar and his staff) remained at Jahangirnagar, and these devoted servants were required to bring a foe like Usman captive from Bukainagar, a distance of a hundred kos and then the officers would come and bind his hands, and neck. If you ask the reason of our not pursuing him, then I say, we showed our weakness due to the lack of a sardar. The sardars are responsible for this affair."

ইহতিমাম খান এখানে ইসলাম খান কর্তৃক নিযুক্ত সেনাপতি শয়খ কামাল এবং শয়খ আবদুল ওয়াহিদের দুর্বলতা বা অযোগ্যতাকে দায়ী করেন। অতঃপর ইসলাম খান এবং ইহতিমাম খানের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় কিন্তু ইসলাম খানকে এই অপমান হজম করে নিতে হয়। ১৩নং যুদ্ধে অর্থাৎ কাছাড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপতি শয়খ কামাল যখন পরাজিত রাজাকে তাড়া করে বন্দী না করে সন্ধি চুক্তি করেন, তখন মনসবদারেরা সুযোগ পান। তাঁরা সরাসরি সম্রাটের নিকট সেনাপতি নিয়োগের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। এই অভিযোগে তাঁরা বলেনঃ[১৬]

"Upto this time every victory achieved by the Mughals has been attributed by Islam Khan to his own people; He has not yet given up the practice of sending the imperial officers in the company of his own men. We in consideration of the welfare of the Emperor, have agreed to accompany his (Islam Khan) officers and have not deviated by a hair-breadth from our devotion. Through the benign influence of the Emperor we have somehow defeated the Raja of Kachar with the purpose that either he should voluntarily surrender or he should be made a prisoner and his dominion brought under the rule of the

Edited by Ripon Sarkar

imperial officers. Shaykh Kamal, an officer of Islam Khan, made peace with him (Raja) to suit his own purpose and left this expedition where it was. If this work is entrusted to us,, then, with the favour of the furtune of the Emperor, we shall conquer the territory of Kachar within a short time and send the Raja to the imperial Court".

সম্রাট এই অভিযোগ পেয়ে ফরমান পাঠিয়ে ইসলাম খানকে আদেশ দেন যেন (১) শয়খ কামালকে প্রত্যাহার করা হয়, (২) মুবারিজ খানকে (মনসবদার) সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং (৩) ভবিষ্যতে কোন মনসবদারকে (অর্থাৎ সম্রাটের নিযুক্ত অফিসারকে) ইসলাম খানের ব্যক্তিগত অফিসারদের অধীনে ন্যস্ত না করা হয়।[১৭]

ইসলাম খান বুঝতে পারেন যে শয়খ কামাল এবং শয়খ কামাল আবদুল ওয়াহিদের দুর্বলতার কারণে খাজা উসমানকে বুকাইনগর থেকে পালাবার সময় তাড়া করা হয়নি। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে রাজকীয় অফিসারদের তাঁর ব্যক্তিগত অফিসারের (শয়খ কামাল ও শয়খ আবদুল ওয়াহিদ) অধীনস্থ করায় রাজকীয় অফিসারেরা অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের অসন্তুষ্টিই মোগল বাহিনীতে অনৈক্যের মূল কারণ। তা সত্ত্বেও তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অফিসারদের প্রতি ইসলাম খানের দুর্বলতা কমেনি, বা সকল বিজয়ের কৃতিত্ব নিজে লাভ করার প্রবণতা তাঁর কমেনি। সিলেটের বায়েজীদ কররানী এবং কাছাড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধেও তিনি শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কাছাড়ের যুদ্ধের সময় অবশেষে মনসবদারেরা তাঁর বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করলে তিনি সতর্ক হন, কিন্তু ততদিনে যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে গেছে, একমাত্র কামরূপের পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাকি থাকে। তিনি এই যুদ্ধে মুকাররম খানকে প্রধান সেনাপতি এবং শয়খ কামালকে দ্বিতীয় সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এতে সম্রাটের আদেশ পালিত হয় সত্য, কিন্তু সেনাপতিত্ব নিজের হাতেই থেকে যায়। মুকাররম খান রাজকীয় অফিসার হলেও তিনি ইসলাম খানের ভাইপো এবং জামাতা ছিলেন;[১৮] তাছাড়া মুকাররম খান অল্প বয়স্ক থাকায় শয়খ কামালই ছিলেন তাঁর অভিভাবক স্বরূপ। পরীক্ষিতের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে শয়খ কামাল যা সিদ্ধান্ত নিতেন, মুকাররম খান শুধু তার অনুমোদন দিতেন।

শয়খ কামাল ইসলাম খানের ব্যক্তিগত অফিসার হলেও তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন বলে মনে হয় না; বাহরিস্তান পাঠ করলে তাঁর সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা জন্মায় না। অবশ্য মিরযা নাথন শয়খ কামালকে সুনজরে দেখতেন না, এবং পেশাধারী পীর বলে গালমন্দ করেছেন। তবুও শেষ দিকে শয়খ কামালের কার্যকলাপ সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রথমত, বুকাইনগর থেকে খাজা উসমানকে তাড়া না করার দায়িত্ব সম্পূর্ণ শয়খ কামালের, সৈন্যরা তাড়া করতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু শয়খ কামাল বুকাইনগর থেকে ফিরে আসায় তারা অগ্রসর হওয়ার সাহস পায়নি। দ্বিতীয়ত, কাছাড়ের যুদ্ধে মধ্য পথে রাজার সঙ্গে চুক্তি করে তিনি অফিসারদের বিরাগভাজন হন; অফিসারেরা কাছাড়ের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন, কিন্তু তিনি কারও পরামর্শ না শুনে নিজ দায়িত্বে চুক্তি করেন। সম্রাটের নিকট অভিযোগে অফিসাররা শয়খ কামাল "স্বীয় স্বার্থে" এই চুক্তি করেন বলে জানান। "স্বীয় স্বার্থ" অর্থ উৎকোচ হতে পারে, যদিও এটা পরিষ্কারভাবে

Edited by Ripon Sarkar

উল্লেখ করা হয়নি। রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে গমনের সময় শয়খ কামালের চক্রান্তে সেনাপতি মুকাররম খান এবং মিরযা নাথনের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। রমজান মাসে একদিন মুকাররম খান বাদ্য বাজান এবং ঘোষণা করেন যে তিনি ইফতার করে সন্ধ্যার পরে যাত্রা করবেন। মিরযা নাথন এর পরে বাদ্য বাজিয়ে মুকাররম খানের আগে যাত্রা করেন। শয়খ কামাল ইহাতে আপত্তি জানিয়ে মিরযা নাথনের নিকট লোক পাঠিয়ে এর কারণ জানতে চান। মিরযা নাথন রেগে উত্তর দেন যে তাঁর বাদ্য সম্রাটের নিকট থেকে পুরস্কার হিসেবে প্রাপ্ত এবং তিনি একজন রাজকীয় অফিসার (শয়খ কামাল যে রাজকীয় অফিসার নন, তার প্রতি ইঙ্গিত)। তিনি আরও বলেন যে সেনাপতির বাদ্য বাজাবার পরে অফিসারদের বাদ্য বাজান নীতির খেলাপ নয়, এতে সেনাপতির প্রতি অশ্রদ্ধাও প্রকাশ পায় না। তিনি প্রয়োজন হলে এই প্রশ্নে মুকাররম খানের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত বলে জানান।[১৯] মুকাররম খান এ বিষয়ে কিছু না বলে বিষয়টি ইসলাম খানকে অবহিত করেন। ইসলাম খান উত্তরে বলেনঃ (মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে) এই অভিযোগ যদি শয়খ কামালের উপদেশে করে থাক, আমি তোমাকে প্রথম দিনেই বলেছি যে শয়খ কামাল অবশ্যই বাহুর নিচের একটি সাপ; তার সম্বন্ধে সতর্ক থাক এবং তার উপদেশে কোন সময় ঝগড়া করো না। মিরযা নাথনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, নিজের কাজে সচেতন থাকবে এবং সকলের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে রাজকীয় অফিসারদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব বজায় থাকে।[২০] রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে যুদ্ধের মাঝ পথে শয়খ কামাল সন্ধি-চুক্তি করতে সম্মত হন; এই সময় পরীক্ষিত সম্রাট, এবং সুবাদারকে নযরানা ও উপহার দেয়ার অঙ্গীকার করে শয়খ কামালের নিকট আশি হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন।[২১] আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খান এই চুক্তি অনুমোদন না করে শয়খ কামালকে আবার যুদ্ধ করার এবং রাজা পরীক্ষিতকে বন্দী করার আদেশ দিয়ে ফেরত পাঠান। এই চুক্তি করায় ইসলাম খান শয়খ কামালকে মারতেও উদ্যত হন।[২২] অতঃপর শয়খ কামাল শত্রুতা আরম্ভ করেন এবং যুদ্ধে যাতে মোগল বাহিনী পরাজিত হয় সে চেষ্টা করেন।[২৩] শয়খ কামালের কার্যকলাপ ইসলাম খানকে অবহিত করা হয় কিনা জানা যায় না; ইসলাম খান যেভাবে যুদ্ধের খবরাখবর রাখতেন তাতে মনে হয় যে তিনি নিশ্চয়ই শয়খ কামালের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শয়খ কামালের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। যুদ্ধ যখন জয় হয় এবং শয়খ কামাল যখন ফিরে আসেন তখন ইসলাম খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।[২৪]

ইসলাম খানের উচ্চাভিলাষ, আত্মম্ভরিতা এবং উগ্র স্বভাবঃ

বার-ভুঁঞার পতনের পরে এবং খাজা উসমানের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধে জয়লাভ করে ইসলাম খান আত্ম-তৃপ্তি লাভ করেন; তিনি উচ্চাভিলাষী, অতিমাত্রায় দাম্ভিক এবং স্বভাবে উগ্র হয়ে উঠেন। মিরযা নাথন বলেন[২৫] যে ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে অভিযান, বুকাইনগরের উসমানের বিরুদ্ধে, মাতঙ্গ এবং তরফের অভিযান সন্তোষজনকভাবে শেষ হলে ইসলাম খান সৈন্যদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। তিনি একটি মঞ্চ তৈরি করেন যার উচ্চতা ছিল দু মাথা উঁচু এবং মঞ্চের উপরে একটি ছোট ঘর তৈরি করেন। এর নাম দেয়া হয় ঝারোকা। যে সকল উচ্চপদস্থ অফিসার চৌকিতে উপস্থিত হয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে অসমর্থ হন, তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয় যেন তাঁদের ছেলে বা নিকট আত্মীয়কে

Edited by Ripon Sarkar

রাজকীয় গার্ড-হাউজ বা প্রহরা ঘরে রাত্রিতে উপস্থিত থাকতে বলেন। অন্যান্য অফিসারদের কুর বা পতাকা স্তম্ভের নিচে এসে অভিবাদন জানাবার নির্দেশ দেয়া[২৬] হয়। দিওয়ান মুতাকিদ খান এর প্রতিবাদ করেন এবং ফলে তাঁকে অনুতাপ করতে হয়। মিরযা সাইফ-উদ-দীন নামক একজন অফিসারকে পতাকা স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে পশ্চিম- মুখী হয়ে অভিবাদন জানাতে আদেশ দেয়া হয়, কিন্তু তিনি সরাসরি অস্বীকার করেন। তাঁকে বন্দী করা হয়। এই কারণে বুদ্ধিমান লোকেরা কোন উচ্চবাচ্য করেনি। মিরযা সাইফ-উদ-দীন কিছুদিন বন্দী থেকে গিয়াস খানের সুপারিশে মুক্তি পান।

এ সময় (আনুমানিক ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর বা ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) শয়খ হোসেন উড়িষ্যার অফিসারদের জন্য সম্রাটের উপহার নিয়ে কটকে আসেন এবং কটক থেকে ফিরে যাওয়ার পথে রাজমহলে পৌঁছেন। ইসলাম খান রাজমহলের শাসক (ফৌজদার) শয়খ আহমদকে নির্দেশ দেন যে ইসলাম খানের অনুমতি ছাড়া কেউ যেন বাংলা থেকে উত্তর ভারতে না যেতে পারে বা উত্তর ভারত থেকে বাংলায় প্রবেশ করতে না পারে। তাই শয়খ আহমদ শয়খ হোসেনের রাজমহল উপস্থিতির কথা ইসলাম খানকে জানান। ইসলাম খান শয়খ হোসেনকে চিঠি লিখে বলেনঃ 'ইহা আশ্চর্য যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা না করে সম্রাটের দরবারে ফিরে যাচ্ছেন। আপনার উচিত ঢাকায় এসে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং সম্রাটের নিকট আমাদের আবেদন নিয়ে যাওয়া।' তিনি শয়খ আহমদকে নির্দেশ দেন যেন শয়খ হোসেন রাজি না হলেও তাঁকে জোর করে ঢাকায় পাঠানো হয়। শয়খ হোসেন ঢাকায় এসে ইসলাম খানের সঙ্গে দেখা করতে যান। ইসলাম খান তাঁর খাস কামরায় ছিলেন, তিনি তাঁর বখশী ও অন্যান্যদের শয়খ হোসেনকে আপ্যায়ন করার আদেশ দেন। কিন্তু শয়খ হোসেন বিরক্ত হন, তিনি বুঝতে পারেন না তাঁর বাল্যবন্ধু কিভাবে তাঁর সঙ্গে এরূপ উদ্ধত ব্যবহার করতে পারেন। তিনি ডাকাডাকি করতে থাকেন 'মিয়া শয়খ আলা-উদ-দীন কোথায়? আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দরবারে ফিরে যেতে চাই।' ইসলাম খান বিরক্ত হন। তিনি মিরযা মকসুদকে বলেনঃ 'শয়খ হোসেন এরূপ চীৎকার করার কারণ তাঁর মাথার উপর সম্রাটের ছবি রয়েছে, তুমি ছবিটি খুলে আমার নিকট নিয়ে এস।'[২৭] মিরযা মকসুদ ছবিটি নিয়ে আসেন। অতঃপর ইসলাম খান শয়খ হোসেনকে ভিতরে আসতে বলেন। কেউ কেউ শয়খ হোসেনকে পরামর্শ দিলেও শয়খ হোসেন ইসলাম খানকে কুর্ণিশ করলেন না। কিন্তু ইসলাম খানের অনুচরেরা তাঁকে মাথা নত করতে বাধ্য করেন। ইসলাম খান শয়খ হোসেনের দাড়ি ধরে তাঁকে তাঁর (ইসলাম খানের) পায়ের উপর ফেলে দেন; তিনি শয়খ হোসেনের দাড়ি তাঁর পায়ের নিচে দেন এবং প্রহার করে তাঁকে (শয়খ হোসেনকে) বন্দী করে রাখেন। ইসলাম খান শয়খ হোসেনের উদ্ধত ব্যবহারের কথা সম্রাটকে অবহিত করেন এবং শয়খ হোসেন বন্দী থাকেন।[২৮]

একবার মিরযা নাথনের সঙ্গে ব্যবহারেও ইসলাম খানের উগ্র স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মিরযা নাথন সবেমাত্র যশোর অভিযান থেকে ফিরে এসেছেন, এমন সময় তাঁকে মগ আক্রমণের বিরুদ্ধে শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে সাহায্য করার জন্য ভুলুয়ায় যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। মিরযা নাথন বলেন যে যশোর যাওয়ার সময় বলা হয় যে তাঁকে এক মাসের মধ্যে তাঁর পিতার নিকট ফেরত পাঠানো হবে। তাঁর পিতা তাঁকে শুধু এক মাসের জন্য সাজ-সরঞ্জাম, এবং খরচের অর্থ দেন। কিন্তু অবস্থার চাপে তাঁকে

Edited by Ripon Sarkar

সেখানে ছয় মাস থাকতে হয়। এখন যদি তাঁকে আবার ভুলুয়ায় যেতে হয় তাহলে সুবাদারকে তাঁর তিনটি অনুরোধের যে কোন একটি রক্ষা করতে হবে। এই তিনটি অনুরোধ হল--১ম, তাঁকে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য তাঁর পিতার নিকট যেতে অনুমতি দেয়া হোক, তিনি ফিরে এসে ভুলুয়ায় যাবেন; ২য়, তাঁকে পনর দিনের সময় দেয়া হোক, যাতে তিনি ঢাকায় ঋণ নেয়ার ব্যবস্থা করে প্রস্তুত হতে পারেন এবং ৩য়, তাঁকে যদি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করতে হয়, তাঁকে রাজকীয় কোষাগার থেকে বিশ হাজার টাকা দেয়া হোক। ইসলাম খান কোন কথা না শুনে বলেনঃ 'আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তোমাকে যেতে হবে।' মিরযা নাথনও রেগে উত্তর দিলেন 'আমি যাব না, আমাকে কে বাধ্য করতে পারে দেখে নেব।' ইসলাম খান রেগে তাঁর খাস কামরায় চলে যান, এবং মিরযা নাথন তাঁর শিবিরে গিয়ে অনুচরদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। অনুচরেরা কেউ কেউ মিরযা নাথনকে ভুলুয়ায় যাওয়া এড়াবার জন্য তাঁর পিত ইহতিমাম খানের নিকট যেতে বলেন (ইহতিমাম খান তখন নৌবাহিনী নিয়ে এগার সিন্দুরে ছিলেন)। আবার কেউ কেউ বলেন সম্রাটের দরবারে চলে যাওয়ার জন্য (অর্থাৎ দরবারে গিয়ে ইসলাম খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য), আবার অন্যরা উপদেশ দেন বিদ্রোহ করার জন্য। মিরযা নাথন কারও কথা শুনলেন না, তিনি বললেন, তাঁর পিতার নিকট চলে গেলে বা সম্রাটের দরবারে গেলে ইসলাম খান তাঁর পিতার উপর চাপ প্রয়োগ করবেন। (এই বিষয়ে আলোচনার সময় মিরযা নাথন বলেন যে ইফতিখার খানের ছেলে ইলাহ-ইয়ারও সম্রাটের দরবারে চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু ইসলাম খানের বিরুদ্ধে ইলাহ-ইয়ারের কি অভিযোগ ছিল, সে বিষয়ে বিশদ কোন আলোচনা নেই)। বিদ্রোহ করার কথা মিরযা নাথন সরাসরি নাকচ করে দেন। তিনি বলেন যে তাঁরা তিন পুরুষ ধরে এই সাম্রাজ্যের নিমক খাচ্ছেন, সুতরাং তাঁদের পক্ষে বিদ্রোহ করা গুরুতর অন্যায় হবে। মিরযা নাথন মাথা মুড়িয়ে ফকীর সেজে যান, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অধীনস্থ চার হাজার সাতশত মাল্লা, সৈন্য ও শিবির পন্থীরা ফকীর ও কলন্দর সেজে যায়। মিরযা নাথন তাঁর পা দুটি শৃঙ্খলিত করে বলেন যে তাঁর যদি গোলযোগ করার ইচ্ছা থাকত, তিনি নিজেকে শৃঙ্খলিত করতেন না। মিরযা নাথনের অনুচরদের একদল তাঁকে অনুসরণ করেন এই ভেবে যে তাদের মনিবের এই ফকীরী সাময়িক ব্যাপার, সুতরাং কয়েকদিন তামাসা করা যাক, অন্যদল ভাবে যে মনিবকে অনুসরণ না করলে রেশন বন্ধ হয়ে যাবে, আবার অন্য একদল সত্য সত্যই মিরযা নাথনের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিল। মিরযা নাথন তাদের নিষেধ করে বলেন যে এতগুলি লোক একসঙ্গে ফকীর ও কলন্দর হলে ইসলাম খান একে মিরযা নাথনের বিদ্রোহ রূপে চিহ্নিত করে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন।[২৯] সকালে বাজারে এবং রাস্তায় এই ফকীর ও কলন্দরদের দেখে সকলেই অবাক। ইসলাম খান নিজেও অবাক হয়ে যান। তিনি গিয়াস খানের মারফত মিরযা নাথনের নিকট সংবাদ পাঠানঃ 'মিরযা নাথন যদি এটা পরিত্যাগ করে এবং আমার উপদেশ মত চলে, আমি আমার ছেলে শয়খ হুশঙ্গকে পাঠিয়ে ক্ষমা চাইব। তাঁর প্রতি সকল অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করব, ভুলুয়ায় যাওয়ার আদেশ প্রত্যাহার করব এবং তাকে তার পিতা ইহতিমাম খানের নিকট যাওয়ার অনুমতি দেব।' কিন্তু মিরযা নাথন শুনলেন না, বরং তাঁর প্রতি ইসলাম খানের অন্যায়ের দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে থাকেন। অতঃপর ইসলাম খান মিরযা নাথনের নিকট সংবাদ পাঠানঃ 'তুমি যেহেতু ফকীরী জীবন বেছে নিয়েছ, এ বিষয়ে কিছু বলার নেই, যে কেউ যে কোন

Edited by Ripon Sarkar

জীবন বেছে নিতে পারে। কিন্তু তুমি যেহেতু ফকীর হয়েছ এবং ফকীরী যেহেতু আমার পূর্ব পুরুষের পেশা, তাই আশীর্বাদ নেয়ার জন্য আমার নিকট আসা উচিত।' যা হোক ইসলাম খান শেষ পর্যন্ত মিরযা নাথনকে বন্দী করে রাখেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় ইসলাম খান মনে করেন যে মিরযা নাথনের মত একজন সাহসী যোদ্ধাকেও ঐ অভিযানে পাঠানো উচিত। তিনি মিরযা নাথনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন, মিরযা নাথনকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে পিঠ চাপড়িয়ে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।[৩০]

ইসলাম খানের উগ্র মেজাজের কারণে একবার তাঁর ছেলে শয়খ হুশঙ্গ আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। একদিন শয়খ হুশঙ্গ মসজিদ থেকে হাতির পিঠে করে ফিরে আসার সময় প্রাসাদের সম্মুখে ঝারোকার নিচে অবতরণ করেন। ইসলাম খান হাতির গর্জন শুনে বিরক্ত হন এবং শয়খ হুশঙ্গকে হাতিতে চড়ে আসতে দেয়ার জন্য দারোয়ান এবং হাতিশালার রক্ষকদের প্রত্যেককে দশটি করে বেত মারার আদেশ দেন। শয়খ হুশঙ্গ এতে অপমানিত বোধ করেন। ইসলাম খান তাঁর ছেলেকে সকল প্রকার অস্ত্র থেকে দূরে রাখতেন। একদিন যখন মিরযা মুহাম্মদ, যিনি ইসলাম খানের জন্য একখানি বই লিখছিলেন, বসে বসে লিখছিলেন, তখন শয়খ হুশঙ্গ বই লেখা দেখার অজুহাতে সেখানে আসেন এবং গোপনে পকেটে একখানি কলমকাটা ছুরি নেন। তারপরে তিনি তাঁর পেটে ঐ ছুরি বসিয়ে দেন। কিন্তু ছুরিখানি ছোট হওয়ায় বেশি কাটা যায়নি, শুধু চামড়ার উপরে কেটে যায় এবং রক্তপাত হয়। মিরযা মুহাম্মদ তার কাপড়ে রক্ত দেখে কারণ জিজ্ঞাসা করলে হুশঙ্গ বলেন যে তাঁর কোঁড়া কেটে রক্ত বেরিয়েছে। কিন্তু রক্ত বেশি দেখে আরও জিজ্ঞাসা করায় শয়খ হুশঙ্গ তাঁকে সত্য কথা বলেন। মিরযা মুহাম্মদ ইসলাম খানকে সংবাদ দেন। ইসলাম খান তখন ঝারোকা থেকে ফিরছিলেন, তিনি এসে হুশঙ্গের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে তাঁকে বেদম মারতে থাকেন। গিয়াস খান এবং শয়খ তীরুন (ইসলাম খানের দিওয়ান) শয়খ হুশঙ্গকে মুক্ত করার চেষ্টা করে কয়েকটি আঘাত পান। ইসলাম খান তাঁদের প্রতি চিৎকার করে বলেনঃ 'ইসলাম খান যেহেতু কুতব-উদ-দীন খানের মত তাঁর ছেলেকে কাছে কাছে রাখেন, তোমরা তাকে যে কোন প্রকারে মেরে ফেলতে চাও, যাতে ইসলাম খানের কোন উত্তরাধিকারী না থাকে।' তারপর ইসলাম খান চিকিৎসকদের বলেনঃ 'যদি তোমরা শয়খ হুশঙ্গকে এই সপ্তাহের মধ্যে পলো খেলার, স্কুলে এবং মসজিদে যাওয়ার উপযুক্ত করতে না পার, আমি তোমাদের এক আঘাতে হত্যা করব।' শয়খ হুশঙ্গের ক্ষত শীঘ্রই সেরে যায়।[৩১]

ইসলাম খানের কার্যকলাপে সম্রাটের অসন্তোষ

অবশেষে ইসলাম খানের কার্যকলাপ সম্রাটের দৃষ্টিতে আসে। ইতোমধ্যে কাছাড়ে যুদ্ধরত মনসবদারদের অভিযোগ (এই অধ্যায়ে উপরে আলোচিত) সম্রাটের নিকট পৌঁছে; শয়খ হোসেনও মুক্তি পেয়ে সম্রাটের দরবারে চলে যান এবং ইসলাম খানের কার্যকলাপ, বিশেষ করে ইসলাম খান কর্তৃক তাঁকে অপমান ও বন্দী করার কথা সম্রাটের গোচরে আনেন। সম্রাট পর্যায়ক্রমে ইসলাম খানের বিরুদ্ধে কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

Edited by Ripon Sarkar

প্রথমে সম্রাট ইয়াগমা ইসফাহানী নামক একজন ওয়াকিয়া নবিশ সুবা বাংলায় পাঠান।[৩২] তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন প্রদেশের ঘটনাবলীর পূর্ণ বিবরণ সুবাদারকে না দেখিয়ে সম্রাটের দরবারে সরাসরি পাঠিয়ে দেন।[৩৩]

এর পরে সম্রাট একখানি ফরমান জারি করে সুবাদারদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, বিশেষ করে ঝারোকা দর্শনের মত সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতা (প্রেরোগেটিভ) যেন কোন সুবাদার গ্রহণ না করেন তার জন্য তাগিদ দেয়া হয়। মিরযা নাথন বলেনঃ 'ইসলাম খান তাঁর পূর্বের অভ্যাসমত কর্তব্য পালন করতে থাকেন। কিন্তু শয়খ হোসেন সম্রাটের দরবারে গিয়ে তিনি ঢাকায় যা দেখেন তা সম্রাটের গোচরে আনলে সম্রাট ইসলাম খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তাই সম্রাট সতর দফা সম্বলিত একখানি ফরমান সকল সুবাদার এবং বিশেষ করে ইসলাম খানের প্রতি জারি করেন এবং কোন রকম বরখেলাপ না করে সম্পূর্ণ মেনে চলার নির্দেশ দেন।

সতর দফা নিম্নরূপঃ[৩৪]

১। কোন রাজকীয় অফিসার তাঁর খাদ্য এবং পানীয় ব্যবহারে সঠিক নীতির খেলাপ করবেন না এবং জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাঁদের (মৃত্যুর) পরে যা (সম্পদ) থাকবে, তার মালিক তাঁরা নন;[৩৫] তাঁরা কেন জনগণের ন্যায্য অধিকার না দিয়ে তাঁদের কাঁধে বোঝা রাখবেন এবং কেয়ামতের দিনে তাঁদের বোঝা আরও ভারী করবেন?

২। তাঁরা (রাজকীয় অফিসারেরা) রাজকীয় মহড়া পরদর্শন করবেন না। তাঁদের নিজেদের মর্যাদার অনুরূপ বসবাস করবেন। কথিত আছে "যদিও রাজা অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, ভৃত্যকে তাঁর সীমা খেয়াল রাখা উচিত।"[৩৬] তবে তারা কেন ঝারোকায় বসবে এবং এরূপ অন্যান্য কাজ করবে?

৩। কোন সুবাদার মাটি থেকে একজন মানুষের উচ্চতার অর্ধেকের চেয়ে উচ্চ কোন স্থানে বসবেন না।

৪। উচ্চ নীচ কোন রাজকীয় অফিসারকে সালাম এবং তসলিম[৩৭] করতে বাধ্য করা হবে না।

৫। কোন রাজকীয় অফিসারকে পায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করা হবে না।

৬। কোন অপরাধের জন্য কাউকে চামড়া খুলে জীবন্ত মারা হবে না।

৭। কোন লোকের চোখ উপড়ানো হবে না।

৮। সুবাদার তাঁর কুর[৩৮] স্থাপন করবে না এবং অফিসারদের কুর-এর নিচে মাথা নত করতে দেয়া হবে না।

৯। সুবাদারেরা ভ্রমণে যাওয়ার সময় বাদ্য বাজাবেন না।

১০। সুবাদারেরা ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার সময় সম্রাটের অনুকরণে বাদ্য বাজাবেন না।

১১। সম্রাটের কল্যাণের স্বার্থে তাঁদের (সুবাদারদের) শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করা উচিত এবং ব্যক্তিগত হিংসা-দ্বেষ পরিহার করা উচিত।

Edited by Ripon Sarkar

১২। অনুগত অফিসারদের সৎ কাজ গোপন রাখা হবে না, এ সকল সৎ কাজ সম্রাটের নিকট সঠিকভাবে জানাতে হবে।

১৩। সম্রাটের অনুমতি ছাড়া কোন চুক্তিতে উপনীত হবে না।

১৪। কোন অফিসারকে ঘোড়া দান করা হলে তাঁকে ঘোড়ার জিন ঘাড়ের উপর রেখে সুবাদারকে তসলিম করতে বাধ্য করা হবে না।

১৫। কোন রাজকীয় অফিসারকে সুবাদারের ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনে নিযুক্ত করা হবে না।

১৬। যদি কোন অফিসারের প্রশংসনীয় বিষয়ে রিপোর্ট করার ইচ্ছা হয়, তাহলে রাজকীয় অফিসারকে একদিকে এবং (সুবাদারের) ব্যক্তিগত অফিসারকে অন্যদিকে পাঠাতে হবে। (এর অর্থ এই হতে পারে যে রাজকীয় অফিসার এবং সুবাদারের অফিসারকে ভিন্ন ভিন্ন অভিযানে পাঠালে প্রত্যেকের প্রশংসীয় কাজ সঠিকভাবে মূল্যায়ন হতে পারে।)

১৭। সুবায় নিযুক্ত প্রত্যেক অফিসার যেন সৎ এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে এবং সম্রাটের প্রবর্তিত আইন সঠিকভাবে পালন করে তা দেখার দায়িত্ব সুবাদারের।

উপরোক্ত সতর দফা সম্বলিত ফরমান বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এই ফরমানের উল্লেখ আছে। এতে বলা হয়েছে যে সীমান্ত প্রদেশের আমীরেরা যে সব বিষয় তাদের ক্ষমতার বাইরে তাতে হস্তক্ষেপ করে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়। সম্রাট এটা অবগত হয়ে সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করার জন্য বখশীর মাধ্যমে সীমান্তের আমীরদের প্রতি নির্দেশ দেন। এই নির্দেশে বলা হয় ঃ (১) কেউ যেন ঝারোকায় না বসেন, (২) অফিসারদের যেন চৌকিতে থাকার এবং কুর্ণিশ করার আদেশ না দেয়া হয়, (৩) হাতির যুদ্ধ না দেখেন, (৪) অপরাধীকে অন্ধ না করেন, (৫) অপরাধীদের নাক কান না কাটেন, (৬) কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য না করেন, (৭) রাজকীয় অফিসারকে কুর্ণিশ বা সিজদা করতে বাধ্য না করেন, (৮) গায়করা সম্রাটের দরবারে যেমন কর্তব্যরত থাকেন, গায়কদের সেরূপ কর্তব্যরত না রাখা, (৯) আমীরেরা যখন বাইরে যান তখন যেন বাদ্য না বাজান, (১০) আমীরেরা ঘোড়া বা হাতি কাউকে দান করলে দান গ্রহীতাকে ঘোড়ার জিন বা হাতির অঙ্কুশ পিঠে নিয়ে সালাম করতে না দেয়া, (১১) আমীরেরা ঘোড়ায় চড়ে মিছিল করে (মিছিল করা অর্থ সৈন্যবাহিনীসহ যাওয়া) কোথাও যাওয়ার সময় রাজকীয় অনুচরদের পায়ে হেঁটে যেতে বাধ্য না করা, (১২) এবং আমীরেরা রাজকীয় অফিসারদের নিকট চিঠি বা অন্য কিছু লিখবার সময় চিঠির উপরে যেন নিজের সীল মোহর না দেন।[৩৯]

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে এই ফরমান জারির কোন তারিখ নেই, তুজুকেও তারিখ নির্দিষ্ট নেই, তবে এই পুস্তকে সম্রাটের সিংহসনারোহণের ষষ্ঠ বর্ষের একেবারে শেষে ফরমানটি উল্লেখিত হয়েছে, অর্থাৎ যদিও সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা যায় না তবুও বলা যায় ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসের প্রথম দিকে এই ফরমান জারি হয়। বাহরিস্তান-ই-গায়বী পরীক্ষা করলেও মনে হয় ফরমান খানি ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের শেষ দিকে ঢাকায় পৌছে, কারণ খাজা উসমানের বিরুদ্ধে জয়লাভের পরে বাহরিস্তানে ফরমান

Edited by Ripon Sarkar

খানি উল্লেখিত হয়েছে। মিরযা নাথনের মতে ফরমান খানি সকল সুবাদারের জন্য জারি করা হলেও বিশেষভাবে ইসলাম খানকে লক্ষ্য করেই এটা জারি হয়। তুজুকে সীমান্তের প্রদেশের আমীর বা সুবাদারের কথা বলা হয়েছে, যদিও ইসলাম খান বা বাংলার সুবাদারের কথা নির্দিষ্ট নেই। মনে হয় ইসলাম খানের ক্ষমতার অপব্যবহারের সংবাদ পেয়ে সম্রাট এই ফরমান জারি করেন, কিন্তু সম্রাট তাঁর বাল্যবন্ধু ইসলাম খানের মান রক্ষার জন্য ফরমানখানি শুধু তাঁর নিকট না পাঠিয়ে সকল সীমান্তবর্তী প্রদেশের সুবাদারের নিকট পাঠান।

ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়াও সম্রাট ইসলাম খানের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ পান। সম্রাট জানতে পারেন যে ইসলাম খান নিজে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে গমন করেননি। আগেই বলা হয়েছে যে সম্রাটের নির্দেশ ছিল সুবাদারকে যুদ্ধ ক্ষেত্রের ত্রিশ ক্রোশের মধ্যে থাকতে হবে। ইসলাম খান একমাত্র বার-ভুঁঞাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ত্রিশ ক্রোশের দূরত্বে যাননি। তাছাড়া খাজা উসমানের সঙ্গে দৌলম্বপুরের যুদ্ধে কিশওয়ার খান নিহত হওয়ায় সম্রাট ভীষণ রেগে যান। কিশওয়ার খান ছিলেন সম্রাটের বাল্যবন্ধু এবং সুহৃদ কুতুব-উদ-দীন খান কোকার ছেলে। কুতুব-উদ-দীন খান বাংলার সুবাদার হয়ে এসে বর্ধমানে শের আফগনের হাতে নিহত হন। বন্ধুর মৃত্যুর পরে সম্রাট বন্ধুর ছেলেকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কিশওয়ার খান ইসলাম খানের ফুফাত ভাই-এর ছেলে। তাঁকে বাংলায় পাঠাবার সময় সম্রাট ইসলাম খানকে নির্দেশ দেন যেন কিশওয়ার খানকে নিজের ছেলের মত দেখেন এবং তাঁর নিরাপত্তার প্রতি নজর রাখেন। তা সত্ত্বেও কিশওয়ার খানকে খাজা উসমানের মত একজন দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করায় সম্রাট ইসলাম খানের প্রতি ভয়ানক রেগে যান। স্মরণ থাকতে পারে যে কিশওয়ার খানকে বাম বাহুর নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং ইসলাম খান নিজে সৈন্যের ব্যূহ রচনার পরিকল্পনা করে দেন। এ দু অপরাধে সম্রাট ইসলাম খানের মনসব জাত এবং সওয়ার উভয় খাতে দু হাজার করে কমিয়ে দেন। মিরযা নাথন বলেন যে ইসলাম খান সম্রাটের ফরমান এবং মনসব কমিয়ে দেয়ার আদেশ পেয়েও বিচলিত না হয়ে অত্যন্ত সংযমের পরিচয় দেন, কারণ তাঁর আত্ম-প্রত্যয় এবং মনোবল ছিল অত্যন্ত প্রখর, তিনি তাঁর অভ্যাস কিছুই পরিবর্তন না করে পূর্বের মত ঝারোকায় বসতে থাকেন এবং উচ্চ নীচ সকল অফিসারকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। তিনি রাত্রে ঝারোকায় আসতেন এবং দরবারে বসে কার্য পরিচালনা করতেন। কিন্তু তিনি বাইরে শক্ত থাকলেও তাঁর মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।[৪০]

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে ইসলাম খানকে অপসারণ করে শুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির কথাও পাওয়া যায়। আগ্রা থেকে ইসলাম খানের সংবাদবাহকরা তাঁকে জানায় যে সম্রাট শুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে রুস্তম যামান উপাধি দিয়ে ছয় হাজার জাত ও সওয়ার মনসব দিয়েছেন। তাছাড়া সম্রাট শুজাত খানের জন্য একটি খেলাত, একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারি, একটি কোমরবন্দ, এবং মণিমুক্ত খচিত জিন এবং গদীসহ একটি ইরাকি ঘোড়া উপহার হিসেবে পাঠাচ্ছেন। সম্রাট এটাও আদেশ করেছেন যে ইসলাম খান হয় দরবারে ফিরে যেতে পারেন অথবা শুজাত খানের তত্ত্বাবধানে থেকে যেতে পারেন। ইসলাম খান শুজাত খানের নিকট নিম্নরূপ সংবাদ পাঠান ঃ 'সম্রাটের উপহার এবং (সম্রাট প্রদত্ত) মর্যাদা নিয়ে আপনি সুখী হোন। কিন্তু যেহেতু আপনি এবং আপনার পূর্বপুরুষেরা আমাদের পরিবারের শিষ্য ছিলেন, আমি

Edited by Ripon Sarkar

আশা করব যে আপনি কোন অজুহাতে উড়িষ্যার দিকে যাত্রা করবেন এবং রাজমহলে এসে বাংলার সুবাদারের সম্মানিত পোশাক পরিধান করে নৌকায় করে (ঢাকার দিকে) যাত্রা করবেন। আমি দ্রুত স্থলপথে সম্রাটের দরবারের দিকে যাত্রা করব, এবং পথে আমাদের দেখা হবে। আমার এটুকু মর্যাদা আপনি রক্ষা করবেন, যাতে আপনার উপস্থিতিতে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা) ত্যাগ করা থেকে আমি বেঁচে যাই।' শুজাত খান উড়িষ্যা যাত্রা করেন। ইসলাম খান তাঁর অভ্যাস মত দিন কাটাতে থাকেন।[৪১]

কিন্তু শুজাত খান অল্প দিনের মধ্যে মারা যান। ঢাকা ত্যাগ করে তিনি কলাবারী[৪২] পরগণায় যান এবং সেখান থেকে শেষ রাত্রে আবার যাত্রা করেন। এ সময় শুজাত খানের শার্দুল নামক হাতিটি পাগল হয়ে শৃঙ্খল ভেঙ্গে দৌড়াতে থাকে। শুজাত খান হাতির উপর শুয়েছিলেন। তিনি ভয় পান যে হাতিটি একটি মাদী হাতির সাক্ষাত পেতে পারে। তাই শুজাত খান হাতির উপর থেকে লাফ দেন এবং নিচে পড়ে তাঁর ডান পা ভেঙ্গে যায় এবং ইহার ক্ষত মারাত্মক হয়ে উঠে। তাঁকে সুখপালে করে রাজমহলে নিয়ে যাওয়া হয়। পরের দিন তাঁর রাজকীয় খেলাত এবং উপহারসমূহ পাওয়ার কথা, সম্রাটের দূত রাজমহলের নিকটেও এসে গেছেন, কিন্তু শুজাত খান মৃত্যুবরণ করেন। সম্রাটের দূত এসে শুজাত খানকে দেখেন, মৃত্যু সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠান এবং সম্রাটের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। মিরযা নাথন বলেন যে ইসলাম খান শুজাত খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হন।[৪৩] দূতের নিকট থেকে শুজাত খানের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সম্রাট ইসলাম খানকে বাংলায় সুবাদার পদে বহাল রেখে আদেশ জারি করেন শুজাত খানের জন্য প্রেরিত ঘোড়াটি সাধারণ জিন এবং গদীসহ ইসলাম খানকে দিতে বলেন। শুজাত খানের জন্য প্রেরিত খেলাত তাঁর ছেলে কুতুব খানকে দিতে বলেন এবং মণিমুক্তা খচিত তরবারি, কোমরবন্দ এবং জিন ও গদী দরবারে ফেরত নিতে আদেশ দেন।[৪৪]

তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে শুজাত খানের মৃত্যুর কথা নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে[৪৫]ঃ শুজাত খানের মৃত্যু কাহিনী বড় অদ্ভুত। তাঁর প্রশংসনীয় কাজের পরে (উসমানের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ইঙ্গিত) ইসলাম খান তাঁকে উড়িষ্যা যাওয়ার অনুমতি দেন। এক রাত্রে তিনি একটি মাদী হাতির পিঠে চতুষ্কোণ হাওদায় শুয়েছিলেন এবং একজন ভৃত্যকে তাঁর পাশে রাখেন। যাত্রা করার পরে তাঁর অনুচরেরা একটি মত্ত হাতি বেঁধে রাখেন, কিন্তু অশ্বারোহীদের চলাচল এবং ঘোড়ার খুরের শব্দে মত্ত হাতিটি শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করে, ফলে অনেক শোরগোল হয়। ভৃত্যটি এই গোলমাল শুনে ভয়ে শুজাত খানকে জাগিয়ে ফেলেন, শুজাত খান মদের নেশায় ছিলেন। ভৃত্যটি বলে যে হাতি শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে এদিকে আসছে। শুজাত খান বিহ্বল হয়ে হাতির পিঠের উপর থেকে লাফ দেন, ফলে মাটিতে পড়ে তাঁর পায়ের আঙ্গুল পাথরের সঙ্গে লেগে ভেঙ্গে যায়। তিনি ঐ আঘাতে দু তিন দিনের মধ্যে মারা যান। (শুজাত খানের মত) একজন সাহসী লোক শুধু চিৎকার শুনে একটি শিশুর (ভৃত্যকে শিশু বলা হয়েছে) কথায় এত বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন বা নিজেকে না সামলিয়ে হাতির উপর থেকে লাফ দেবেন, এটা আশ্চর্যের কথা।

মাসির-উল-উমারায়ও শুজাত খানের মৃত্যুর কথা আছে।[৪৬] এই পুস্তকে বলা হয়েছে যে শুজাত খান বিহারের সুবাদারী লাভ করে বিহারে যাচ্ছিলেন, পাটনায়

Edited by Ripon Sarkar

পৌঁছার একটু আগে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে মারা যান। দুর্ঘটনার কথা অবশ্য সকল সূত্রেই আছে, অর্থাৎ শুজাত খান হাতি থেকে লাফ দিয়ে পা ভেঙ্গে ফেলেন।

ইসলাম খানের অপসারণ এবং শুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার কথা এবং ইসলাম খানের মনসব কমিয়ে দেয়ার কথা একমাত্র বাহরিস্তানে পাওয়া যায়, তুজুক বা অন্য কোন সূত্রে পাওয়া যায় না, তবে ইসলাম খানের মনসব কমিয়ে দেয়ার কথা সত্য বলে মনে হয়, কারণ তুজুকে ইসলাম খানকে ছয় হাজার মনসবে উন্নীত করার কথা দুবার বলা হয়েছে।[৪৭] প্রথমবার বলা হয়েছে খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের পরে, সম্রাট জয়লাভের সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম খান এবং শুজাত খান উভয়ের মনসব বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন। পরে ইসলাম খানের মৃত্যুর কিছুদিন আগে আবার ইসলাম খানের মনসব বৃদ্ধির কথা বলেছেন। মধ্যবর্তী সময়ে ইসলাম খানের মনসব না কমালে আবার বৃদ্ধি করার কথা বলা হত না। তুজুক এবং বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে শুজাত খান উড়িষ্যায় যাচ্ছিলেন কিন্তু মাসির-উল-উমারায় বলা হয়েছে যে, শুজাত খানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করায় তিনি পাটনা যাচ্ছিলেন। এখানে তুজুক এবং বাহরিস্তানের কথা সত্য বলে মনে হয়, কারণ খাজা উসমানের সঙ্গে যুদ্ধের আগে শুজাত খান উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মাসির-উল-উমারায় বলা হয়েছে যে শুজাত খান পাটনায় পৌঁছার আগে মারা যান, বাহরিস্তানে তিনি রাজমহলের পথে মারা যান, কিন্তু তুজুকে মৃত্যুর স্থান বলা হয়নি।

আগে বলা হয়েছে যে ইসলাম খানের অপসারণ এবং শুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির কথাও বাহরিস্তান-ই-গায়বী ছাড়া অন্য কোন সূত্রে নেই। স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গলেও এ বিষয়ে এবং ইসলাম খানের মনসব কমানোর ব্যাপারে কোন কথা নেই। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে কোন উল্লেখ না থাকায় বোধ হয় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কথাটার উপর গুরুত্ব দেননি, বা বাহরিস্তানের এই বক্তব্য তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু মিরযা নাথনের বক্তব্য সত্য বলে মনে হয়; তিনি বাংলায় ছিলেন, এবং ঢাকায় ছিলেন। সুতরাং তিনি বাংলা সম্পর্কে যতটুকু অবগত ছিলেন, আর কারও পক্ষে ততটুকু জানা সম্ভব ছিল না। সম্রাটও অবশ্যই অবগত ছিলেন, কিন্তু তুজুকে সারা মোগল সাম্রাজ্যের কথা আছে, তাই সম্রাট বাংলা সম্পর্কে অনেক কথাই বাদ দেন। তা সত্ত্বেও ইসলাম খানের ক্ষমতার অপব্যবহার ফরমান জারি করে নিষিদ্ধ করার কথা তুজুকেও স্বীকৃত এবং ইসলাম খানের মনসব হ্রাস করার কথাও পরোক্ষভাবে সমর্থিত। আরও একটি পরোক্ষ প্রমাণ আছে। শুজাত খানকে উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলায় পাঠানো হয়, কিন্তু তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি বাংলায় থেকে যান। সম্রাটের নির্দেশে প্রত্যাহৃত দিওয়ান মুতাকিদ খান আফগান বন্দীদের আগ্রায় নিয়ে যান, কিন্তু শুজাত খানকে দরবারে ডেকে পাঠান হয়নি। শুজাত খান উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁকে উড়িষ্যা যাওয়ারও আদেশ দেয়া হয়নি। এতে মনে হয়, শুজাত খানকে বাংলার সুবাদারী দেয়ার জন্যই সম্রাট তাঁকে বাংলায় রেখে দেন।[৪৮] ইতোমধ্যে ইসলাম খানের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ (বিশেষ করে স্বেচ্ছাচারিতা এবং সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ) সম্রাটের নিকট পৌঁছে। কিন্তু শুজাত খানের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় সব কিছু

Edited by Ripon Sarkar

গোলমাল হয়ে যায়; সম্রাটও ইসলাম খানকে বাংলার সুবাদারীতে বহাল রাখেন তাই তুজুকে এই বিষয়ে কিছু লেখা হয়নি।

ইসলাম খানের মৃত্যু

ইসলাম খানের মৃত্যু সম্পর্কে মির্‌যা নাথন নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন। কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের সময় ইসলাম খান তাঁর ছেলে শয়খ হুশংকে উপহার ও হাতিসহ সম্রাটের নিকট পাঠান। শয়খ হুশং শয়খ ইবনে ইয়ামীনের সঙ্গে সম্রাটের দরবার থেকে এসে পিতার সঙ্গে দেখা করেন। সম্রাট শয়খ হুশং বিশেষ করে শয়খ ইবনে ইয়ামীনের মারফত ইসলাম খানের নিকট কিছু মৌখিক আদেশ পাঠান। আদেশগুলি অবশ্যই ইসলাম খানের ক্ষমতার অপব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কারণ মির্‌যা নাথন বলেন যে সম্রাটের অসন্তুষ্টির কথা শুনে ইসলাম খান কাউকে কিছু না বলে অবিচল থাকেন। তিনি শয়খ ইবনে ইয়ামীনকে বন্দী করেন এবং বিশ্বস্ত অফিসারের হাতে সোপর্দ করেন। তিনি কামরূপ অভিযান সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে থাকেন এবং শয়খ হুশংকে বিভিন্ন ওছিলায় তাঁর সংগৃহীত মণিমুক্তা, অর্থ-সম্পদ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র দেখাতে থাকেন এবং শয়খ হুশংকে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত করেন। তিন মাস অতিবাহিত হলে এবং রাজা পরীক্ষিতের পলায়নের সংবাদ পেয়ে ইসলাম খান টোক থেকে ভাওয়াল হয়ে ঢাকা যাওয়ার মনস্থ করেন। শয়খ হুশং ও তাঁর দিওয়ান শয়খ ভীকনকে ঢাকা যাওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি নিজে শিকার করে করে চার দিনে ভাওয়াল পৌঁছেন। ভাওয়াল পৌঁছেই তিনি সংবাদ পান যে রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেছেন। ওয়াকিয়া নবিশকে ডেকে তিনি এই সংবাদ লিপিবদ্ধ করতে বলেন এবং নিজে গর্ব করে বলেন, 'দেখ একশ বছরের প্রাচীন এক রাজ পরিবারকে আমি কিভাবে নিমেষে ধ্বংস করে দিলাম।' অতঃপর ইসলাম খান খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশী এবং অন্যান্য অফিসারদের আগের মত 'চৌকিতে' উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন এবং মুকাররম খান ও শয়খ কামালকে রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে দ্রুত চলে আসার নির্দেশ দিয়ে সংবাদ পাঠান। তাঁর ইচ্ছা ছিল ঝারোকায় বসে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজা পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণ পর্ব সমাধা করা। দিনের শিকার শেষে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে ইসলাম খান যখন হাতিতে চড়ে শিবিরের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি শয়খ ইবনে ইয়ামীনকে মুক্তি দিয়ে হাতির পিঠে নিজের পাশে বসান। একটু পরেই তিনি অসুস্থ বোধ করেন, এমন সময় সংবাদ আসে যে মুকাররম খান এবং অন্যান্যরা রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে টোক পৌঁছেছেন। তিনি হানসু নামক একজন লোককে দ্রুত গতিসম্পন্ন একটি ঘোড়া নিয়ে টোক গিয়ে মুকাররম খান এবং অন্যান্যদের রাতের মধ্যেই তাঁর নিকট নিয়ে আসতে বলেন। তিনি নিজে সন্ধ্যায় দু ঘণ্টা পরে শিবিরে পৌঁছেন। একটু পরেই ইসলাম খান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৪৯] রাজা পরীক্ষিতকে নিয়ে মুকাররম খান ভাওয়ালে পৌঁছুতে দেরী হওয়ায় ইসলাম খানের মৃত্যু সংবাদ রাত্রে গোপন রাখা হয়। আগেই বলা হয়েছে যে রাজা পরীক্ষিত ইসলাম খানের মৃতদেহকে অভিবাদন জানান।

অতঃপর ইসলাম খানের মৃতদেহ ঢাকায় নেয়া হয়, পথে হুশং এসে পিতার মৃতদেহ দেখেন। মির্‌যা নাথন পরিষ্কার বলেন যে, মৃতদেহ ঢাকায় নিয়ে বাদশাহী বাগানে সমাহিত করা হয়।[৫০] জাহাঙ্গীরও পরিষ্কার বলেন যে ফতেহপুর সিক্রিতে শয়খ সলীম চিশতীর

Edited by Ripon Sarkar

মাযারের পাশে ইসলাম খান চিশতী সমাহিত রয়েছেন।[৫১] মাসির-উল-উমারায় একই কথা পাওয়া যায়।[৫২] সমসাময়িক দুজন লেখক, মিরযা নাথন এবং জাহাঙ্গীরের মধ্যে এই মতানৈক্যের ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন ইসলাম খানকে প্রথমে ঢাকায় সমাহিত করা হয় কিন্তু পরে তাঁর কফিন ফতেহপুর সিক্রিতে নিয়ে আবার সমাহিত করা হয়।[৫৩] অতঃপর অফিসারেরা ইসলাম খানের মৃত্যু সংবাদ এবং কামরূপ বিজয় ও রাজা পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণের সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করেন। সম্রাটের সাধারণ নির্দেশ ছিল যে বাংলার সুবাদারী খালি হলে মুঙ্গেরে অবস্থানরত প্রবীণতম রাজকীয় অফিসার বাংলার দায়িত্ব নেবেন। মুঙ্গেরে ঐ রকম কোন অফিসার না থাকলে বিহারের সুবাদার বাংলায় গিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। ঐ সময়ে ইসলাম খানের ভাই কাসিম খান মুঙ্গেরে ছিলেন, কিন্তু তিনি সম্রাটের স্পষ্ট আদেশ ছাড়া বাংলায় যেতে সাহস করলেন না। বিহারের সুবাদার যফর খান তখন হীরক খনি অধিকারের জন্য কোকরা দেশ[৫৪] আক্রমণ করেছিলেন, তিনি ঐ অভিযান শেষ না করে দ্রুত ঢাকায় যান এবং তাঁর যাত্রার বিষয়ে সম্রাটের নিকট সংবাদ পাঠান। এদিকে যফর খান ঢাকায় এলে শয়খ হুশঙ্গ তাঁকে দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে সম্রাটের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে সুবাদারীর দায়িত্ব নিতে দেয়া হবে না। যফর খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার ইচ্ছা সম্রাটের ছিল, কিন্তু তিনি ইতোমধ্যে বিহারের দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়া নবিশের নিকট থেকে সংবাদ পান যে, কোকরা দেশের রাজার আত্মসমর্পণ করার উপক্রম হয়েছিল, যফর খান আর এক সপ্তাহ দেরী করলে তিনি অনেক মূল্যবান হীরা সম্রাটের জন্য নযরানা দিতেন। এই সংবাদ পেয়ে সম্রাট যফর খানের প্রতি অসন্তুষ্ট হন; তিনি যফর খানকে ঢাকা থেকে এসে কোকরা দেশ জয় করে মহামূল্যবান হীরক নিয়ে সম্রাটের দরবারে চলে আসার নির্দেশ দেন। সম্রাট কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।[৫৫]

ইসলাম খানের মৃত্যু-তারিখ

ইসলাম খানের মৃত্যুর তারিখ শুধু তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর বলেন যে ৩রা ইসফনদারমুজ/১২ই মহরম, ১০২৩ হিজরী/২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সংবাদ পান যে ৫ই রজব, ১০২২ হিজরী /২১শে আগস্ট ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম খান মৃত্যুবরণ করেন। স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিস্টরি অব বেঙ্গল দ্বিতীয় খণ্ডে এই তারিখ গৃহীত হয়েছে।[৫৬] ইসলাম খানের মৃত্যুর এই তারিখ সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমত, ইসলাম খানের মৃত্যুর সংবাদ সম্রাট ৬ মাসেরও বেশি সময় পরে পাবেন কেন? এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সম্রাটের এক মাসের মধ্যে পাওয়ার কথা; খাজা উসমানের মৃত্যু এবং আফগানদের পরাজয়ের সংবাদ এক মাসের মধ্যে এবং কুতুব-উদ-দীন খানের নিহত হওয়ার সংবাদ দু মাসেরও কম সময়ের মধ্যে সম্রাট অবগত হন।[৫৭] দ্বিতীয়ত মিরযা নাথনের মতে পরবর্তী সুবাদার কাসিম খান ১০২৩ হিজরীর রবিউল-আওয়াল মাসের ২৭ তারিখে (১৭ই মে, ১৬১৪) ঢাকা পৌঁছেন।[৫৮] কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির তারিখ তুজুকে নেই; ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরীতে এই তারিখ শাবান ১০২২ হিজরী/সেপ্টেম্বর ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দ।[৫৯] ৫ই রজব, ১০২২ হিজরী ইসলাম খানের মৃত্যু হলে শাবান মাসে কাসিম খানের নিযুক্তি অযৌক্তিক নয়, কিন্তু তাহলে বলতে হয় সম্রাট ইসলাম খানের মৃত্যু সংবাদ এক মাসের মধ্যেই পান,

Edited by Ripon Sarkar

যদিও ভূজুকের সাক্ষ্য এর বিপরীত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কাসিম খান শাবান মাসে নিযুক্তি পেলে পরের বছর রবিউল-আওয়াল মাসের শেষে, অর্থাৎ প্রায় আট মাস পরে সুবাদার হিসেবে যোগদান করেন কেন? যোগদান করতে তাঁর অবশ্যই এত সময় লাগার কথা নয়। তৃতীয়ত আগস্ট মাসে (শ্রাবণ মাস) বাংলাদেশে ভরা বর্ষা মৌসুম, পূর্ব বাংলা বিশেষ করে ভাটি অঞ্চল জলে মগ্ন থাকে। বর্ষাকালে ভাওয়াল থেকে টোক-এ নৌকা ছাড়া যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না, অথচ ইসলাম খান মৃত্যুর দিনে হানসুকে ঘোড়ায় চড়ে টোকে যেতে বলেন। হানসু সূর্যাস্তের ছয় ঘণ্টা আগে ভাওয়াল থেকে যাত্রা করে রাত্রি দেড় প্রহরের মধ্যে, অর্থাৎ প্রায় আট নয় ঘণ্টার মধ্যে টোক পৌঁছেন।[৬০] একেবারে সোজা পথে ভাওয়াল থেকে টোকের দূরত্ব ত্রিশ মাইল, কিন্তু ভাওয়ালের জঙ্গলাকীর্ণ পথে হাঁসুকে যেতে হয়, তাছাড়া পথে একটি বড় নদী ছাড়াও বেশ কয়েকটি ছোট নদী এবং খাল পার হতে হয়। তাই শুষ্ক মৌসুম ছাড়া এত দ্রুত গতিতে ভাওয়াল থেকে টোক যাওয়া সম্ভব ছিল না। চতুর্থত, বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে রাজা পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে অভিযানের কাহিনীর অনুসরণ করলেও মনে হয় যে পরীক্ষিতের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের সময়ে বর্ষাকাল শেষ হয়ে শরৎ হেমন্ত কাল এসে যায়। বাহরিস্তানে মিরযা নাথনের বক্তব্যগুলি সংক্ষেপ নিম্নরূপ। শয়খ কামাল পরীক্ষিতের সঙ্গে সন্ধি করে ইসলাম খানের অনুমোদন নিতে আসার সময় মোগল সৈন্যদের বলেন যে ইসলাম খানের অনুমোদন পাওয়া যাবে, কিন্তু ইসলাম খানের আদেশ (সৈন্যবাহিনীর কাছে) পৌঁছার আগে বর্ষাকাল এসে যেতে পারে, এবং বর্ষার চারদিক প্লাবিত হলে ঘোড়া এবং হাতি ফিরিয়ে নিতে অসুবিধা হবে, তাই ঘোড়া, হাতি এবং অন্যান্য ভারী সরঞ্জাম যেন ঘোড়াঘাট পাঠান হয়। এই হিসেবে তখন জুন মাস শেষ, জুলাই মাস (আষাঢ়-শ্রাবণ) শুরু হতে যাচ্ছে।[৬১] ইসলাম খান শয়খ কামালের চুক্তি অনুমোদন না করায় শয়খ কামাল বিফল হয়ে ফিরে যান এবং আবার যুদ্ধ শুরু হয়। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের সময় মিরযা নাথন রমজান মাস এবং ঐ মাস শেষ হওয়ার কথা বলেন।[৬২] সুতরাং দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ রমজান মাসের পরেও চলে। ঐ বৎসরে (১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে) রমজান মাস ১৫ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় এবং নবেম্বরের ১৩ তারিখ পর্যন্ত স্থায়ী হয় (যদি ৩০ দিনে রমজান মাস হয়)। অতএব যুদ্ধ অন্ততপক্ষে ১৩ই নবেম্বর পর্যন্ত চলে। এর পরে ইসলাম খানের মৃত্যুর অল্প আগে মিরযা নাথন বলেন যে ইসলাম খান টোক-এ গিয়ে যুদ্ধের অগ্রগতির খবরাখবর নেন। এ কথা বলে মিরযা নাথন আরও বলেন, 'তিন মাস পার হয়েছে এবং পরীক্ষিতের পলায়ন এবং তাঁকে মোগল সৈন্যদের তাড়া করার সংবাদ তাঁর (ইসলাম খানের) নিকট (টোক-এ) পৌঁছে।[৬৩] এই তিন মাস শয়খ কামাল কর্তৃক পরীক্ষিতের সঙ্গে প্রথম চুক্তির পরবর্তীকালের তিন মাস। এই হিসেবে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাস পরে ইসলাম খান রাজা পরীক্ষিতের পলায়নের এবং তাঁকে তাড়া করার সংবাদ পান। অতএব সেপ্টেম্বর মাসেও পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁকে তাড়া করা হচ্ছে। মিরযা নাথনের এই বক্তব্যগুলির দ্বারা মনে হয় রমজান মাসের পরে রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেন। এটা রমজান মাসে হবে না, কারণ ইসলাম খানের মৃত্যুর দিনে তিনি শিকার করেন এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। (তিনি অসুস্থতার কারণে রোজা রাখেননি এমন যুক্তি দেয়া যাবে না, কারণ তিনি সুস্থ ছিলেন, শিকার করেন কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে হাতির পিঠে করে শিবিরে যাওয়ার পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন।) উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয় ১০২২ হিজরীর

Edited by Ripon Sarkar

৬। ঐ, ১৫৯-৬০, ১৭১-১৭২। তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এটা দুবার উল্লেখ করা হয়। ৪ঠা শাওয়াল ১০১৮ হিজরী/৩১শে ডিসেম্বর ১৬০৯ সালে বলা হয় যে ইসলাম খানের মনসব বৃদ্ধি করা হয় এবং ২১শে মহরম, ১০১৯ হিজরী/১৫ই এপ্রিল, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের আদেশ শয়খ হোসেন দরশনীর মারফত ফরমানসহ পাঠিয়ে দেন।

৭। ঐ, ২১৪। এখানে শুধু ছয় হাজার জাত বলা হয়েছে, অতএব, সওয়ার মনসব পাঁচ হাজারেই থাকে।

৮। তুযুক, ১ম, ১৮০।

৯। ঐ, ২২৭। কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে ২৮টি হাতির স্থলে ৬৮টি হাতি লিখিত। পরগালা নকিস সিতারকানীর অর্থ বুঝা দুষ্কর, তবে এটা বাংলার বিখ্যাত সূতী কাপড় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রোজার্স এবং বেভেরীজ সিতারকানীকে সোনারগামী মনে করেন, অর্থাৎ এগুলি সোনারগাঁয়ের বিখ্যাত সূতী কাপড় বা মসলিন। (ঐ, টীকা)। মগদের সম্পর্কে সম্রাটের মন্তব্যের জন্য দেখুন, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, টীকা নং-৪০।

১০। মাসির-উল-উমারা, ১ম, ৬৯২-৯৩।

১১। ঐ, ৬৯৩।

১২। তুযুক, ১ম, মাসির-উল-উমারা ১ম, ৬৯৩।

১৩। বাহরিস্তান, ১ম, ২২-২৭ নাজিরপুরের পরিচিতি দেখুন, "A Fresh Examination of Abdul Litif's Diary (North Bengal in 1609 A.D.)" in Journal of the Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, vol XIII. 1990.

১৪। বাহরিস্তান, ১ম, ৯৯।

১৫। ঐ, ১১৬।

১৬। ঐ, ২২০-২১।

১৭। ঐ, ২২১।

১৮। মুকাররম খান ছিলেন ইসলাম খানের চাচাত ভাই শয়খ বায়েজীদের (মুয়াজ্জম খান উপাধি প্রাপ্ত) ছেলে।

১৯। বাহরিস্তান, ১ম, ২২৪-২২৭।

২০। ঐ, ২২৭-২২৮।

২১। ঐ, ২৪০।

২২। ঐ, ২৪১।

২৩। ঐ, ২৪১-৪২।

২৪। ঐ, ২৫৫।

২৫। ঐ, ১২০।

২৬। কারোকা বা কারোকা দর্শন, চৌকি, কুর এগুলি সম্রাটের বিশেষ ক্ষমতার (প্রেরোগেটিভ) প্রতীক বা চিহ্ন। কারোকা সম্রাট আকবর প্রবর্তন করেন। জনগণ যাতে সম্রাটকে দেখতে পান সেজন্য সম্রাট প্রাসাদের জানালায় বসতেন এবং জনগণকে দর্শন দিতেন। চৌকি বলা হত প্রাসাদের প্রহরার ব্যবস্থা এবং প্রাসাদে অভিবাদনের ব্যবস্থা। সৈন্যদের পালা করে ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ প্রহরা দিতে হত এবং তার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রচলিত ছিল। প্রহরীদের সেনাপতি এবং মীর-ই-আরয নামক উচ্চপদস্থ অফিসারের মাধ্যমে সম্রাটের আদেশ নির্দেশ প্রচার করা হত। চৌকির দ্বারা সম্রাটও সৈন্যদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতেন। সম্রাট বা সম্রাটের অনুপস্থিতিতে যুবরাজ বা অন্য কোন রাজপুত্র চৌকির গার্ড পরিদর্শন করতেন। কুর হল পতাকা, অস্ত্র এবং রাজকীয় প্রতীকের সমষ্টি, সম্রাট যেখানেই যেতেন, কুর তাঁকে অনুসরণ করত। কুর-এর ভাল প্রতিশব্দ না পাওয়ায় আমরা পতাকা শব্দ বলেছি। আইন-ই-আকবরীতে কারোকা, চৌকি। এবং কুর-এর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়।

Eidited by Ripon Sarkar

২৭। সম্রাটের দূতেরা বোধ হয় চিহ্নিত হওয়ার জন্য সম্রাটের ছবি বহন করতেন।

২৮। বাহারিস্তান, ১ম, ১৩২-৩৩।

২৯। মধ্যযুগে প্রতিবাদের স্বরূপ হিসেবে এর বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলকের সময় দোয়াবে অতিরিক্ত কর প্রবর্তিত হলে এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য রায়তদের উপর অত্যাচার করা হলে রায়তরা শস্য পুড়িয়ে দিয়ে পাহাড়-পর্বতে পলায়ন করে। সুলতান ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন না, তিনি জানতেন রায়তদের কাজ শস্য উৎপাদন করা এবং রাজস্ব দেয়া কিন্তু তারা যে শস্য পুড়িয়ে দিয়ে পলায়ন করবে, সুলতান তা কল্পনাও করতে পারেননি। (আগা মাহদী হোসেনঃ তুঘলক ডাইনাস্টি)। সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর প্রবর্তন করলে ব্রাহ্মণরা অনশন করেন। (আবদুল করিমঃ সুলতান ফীরুজ শাহ তুঘলক বিরচিত ফুতুহাত-ই-ফীরুজ শাহী, বাংলা অনুবাদ, ঢাকা, ১৯৮৯।

৩০। বাহারিস্তান, ১ম, ১৪৭-১৫৪; ১৬১-৬২; ১৬৩-১৬৫।

৩১। ঐ, ১৫৪-১৫৬। এখানে ইসলাম খানের উক্তিতে মনে হয় যে শয়খ হুশম ছাড়া তাঁর আর কোন ছেলে ছিল না, কিন্তু আমরা উপরে দেখেছি যে মাসির-উল-উমারার মতে শয়খ মুয়াজ্জম নামে ইসলাম খানের আরও একজন ছেলে ছিল। উপরে আলোচিত হয়েছে।

৩২। ওয়াকিয়া নবিশের পদ সম্রাট আকবরের সময় সৃষ্টি হয়। আকবর সাম্রাজ্যকে সুবায় বিভক্ত করে সুবার শাসন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করার সময়েই সুবাদার, দিওয়ান, বখশী, কোতোয়াল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকিয়া নবিশের পদ সৃষ্টি করেন এবং তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন। সে হিসেবে পূর্ব থেকে বাংলায় ওয়াকিয়া নবিশ থাকার কথা, কিন্তু নতুন করে ওয়াকিয়া নবিশ নিযুক্তির কথা বলায় মনে হয়, ওয়াকিয়া নবিশের পদ কিছুদিন খালি থাকে, এবং জাহাঙ্গীর এখন এই পদে লোক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

৩৩। বাহারিস্তান, ১ম, ২০৯।

৩৪। ঐ, ২১৩-১৪।

৩৫। এখানে Law of Escheat এর প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। এই আইনে কোন অফিসার মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পরিত্যক্ত সম্পদের মালিক হতেন সম্রাট স্বয়ং।

৩৬। এই কথাটা ইসলাম খানের প্রতি প্রযোজ্য।

৩৭। সালাম, তসলিম এবং কুর্নিশের বিশেষ অর্থ আছে। সালাম তসলিম-ডান হাতের পিঠ মাটিতে রেখে ধীরে ধীরে উঠাতে থাকবে, যে, পর্যন্ত না লোকটা সোজা হয়ে যাবে। সোজা হয়ে লোকটি হাতের তালু মাথার উপরে রাখবে। এই ধরনের সালাম তসলিম দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যিনি তসলিম করবেন তিনি সম্রাটের জন্য সকল কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত।

কুর্নিশঃ ডান হাতের তালু কপালে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নিচু করা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সালামকারী তাঁর জীবন সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। (বাহারিস্তান, ২য়, ৮২৮, টীকা, ৫২। আইন ১ম, ১৫৮।)

৩৮। টীকা নং ২৬ দ্রষ্টব্য।

৩৯। তুযুক, ১ম, ২০৫। অফিসারেরা কে কিসের কোন জায়গায় শীল বা মোহর দেবে তার জন্য আলাদা নিয়ম ছিল। (আইন, ১ম, ২৬৩)।

৪০। বাহারিস্তান, ১ম, ২১৪-১৫।

৪১। ঐ, ২১১।

৪২। কলাবাড়ি ছিল প্রথমে ইহতিমাম খানের এবং এ সময় মির্জা নাথনের জায়গীর। রাজশাহীর আমরুল পরগণায় এটা অবস্থিত ছিল। আত্রাই নদীর তীরে বর্তমান বখাইখরার নিকটে কলাবাড়ি অবস্থিত। (বাহারিস্তান, ২য়, ৮০৫, টীকা নং ৭-৮।)

Eidited by Ripon Sarkar

৪৩। বাহারিস্তান, ১ম, ২১৭-১৮।

৪৪। ঐ, ২১৮ - ১৯।

৪৫। তুজুক, ১ম, ২২৬-২৭।

৪৬। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ৮৬৬।

৪৭। তুজুক, ১ম, ২১৪, ২৫৬।

৪৮। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে (১ম, ১৯২) এক স্থানে শুজাত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্তির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এটা ৬ই মহরম, ১০২০ হিজরী/২১শে মার্চ ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের কথা, অর্থাৎ অনেক আগের কথা। তাই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে তুজুকের এই বক্তব্যটি লিপিকরের ভুল।

৪৯। বাহারিস্তান, ১ম, ২৫৪-২৫৬।

৫০। ঐ, ২৫৭।

৫১। তুজুক, ২য়, ৭৩।

৫২। মাসির-উল-উমারা, ১ম, ৬৯৩।

৫৩। এ. এইচ. দানীঃ ঢাকা, ২য় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৬২, ৬৪, ৭৬। কথিত আছে যে বর্তমানে যেখানে হাইকোর্ট মাযার বা যে মাযারটি চিশতী বেহেশতীর মাযার নামে পরিচিত, সেখানেই ইসলাম খানকে সমাহিত করা হয় কিন্তু পরে মৃতদেহ উঠিয়ে ফতেহপুর সিক্রিতে শয়খ সলীম চিশতীর কবরের পাশে আবার সমাহিত করা হয়।

৫৪। কোকরা দেশ বা খুখারা বিহারের জঙ্গলে অবস্থিত, এখানে নদীর তলদেশে প্রচুর হীরা পাওয়া যেত। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ বিহারের সুবাদার থাকাকালে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে কোকরা দেশ জয় করেন।

৫৫। বাহারিস্তান, ১ম, ২৫৭-৫৮। বাহারিস্তানে বলা হয় যে দিয়ানত খানের ডেপুটি বা প্রতিনিধিরূপে কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু সুবাদার রূপে কাসিম খানের কার্যকলাপে তা মনে হয় না। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে কাসিম খানের নিযুক্তির কথা নেই, কিন্তু মনসব বৃদ্ধি করার কথা বলে সম্রাট কাসিম খানকে সুবাদার রূপে উল্লেখ করেন, অন্য কারও প্রতিনিধি রূপে নয়। তুজুক ১ম, ৩০৬।

৫৬। তুজুক, ১ম, ২৫৭, এইচ. বি. ২য়, ২৮৮।

৫৭। উপরে ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে আলোচিত।

৫৮। বাহারিস্তান, ১ম, ২৭০।

৫৯। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ৭২।

৬০। বাহারিস্তান, ১ম, ২৫৫।

৬১। ঐ, ২৪১।

৬২। ঐ, ২৪২, ২৪৯।

৬৩। ঐ, ২৫৪।

৬৪। তুজুক, ২য়, ১৩০।

৬৫। শয়খ আকব ইসলাম খানের ব্যক্তিগত দিওয়ান ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় শয়খ আকব ইসলাম খানের নিকটে ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঢাকায়।

৬৬। তুজুক, ১ম, ২৫৩, ২৫৬।

৬৭। এই তারিখগুলি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৬৮। এইচ. বি. ২য়, ২৮৮।

৬৯। তুজুক, ১ম, ২৫৭।

Edited by Ripon Sarkar

অষ্টম অধ্যায়

সুবাদার কাসিম খান চিশতী

শয়খ কাসিম চিশতী শয়খ সলীম চিশতীর পৌত্র শয়খ বদর-উদ-দীনের পুত্র এবং বাংলার পরলোকগত সুবাদার ইসলাম খানের ছোট ভাই ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে তিনি ১০০০/৫০০ মনসব লাভ করেন,[১] ঐ একই সময় বোধ হয় তিনি কাসিম খান উপাধিও লাভ করেন। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে তাঁর নাম শুধু কাসিম খান কিন্তু মাসির-উল-উমারায় এটা মুহতাশাম খান শয়খ কাসিম ফতেহপুরী। তিনি জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ষোড়শ বৎসরে মুহতাশাম খান উপাধি পান।[২] ইসলাম খানের সঙ্গে কাসিম খানের মতৈক্য না হওয়ায় সম্রাট কাসিম খানকে দরবারে ডেকে পাঠান; কাসিম খান ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে দরবারে উপস্থিত হন।[৩] এটা ইসলাম খান বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত হওয়ার পরের ঘটনা, কিন্তু মনে হয় ইসলাম খান বিহারের সুবাদার থাকাকালে সম্রাট কাসিম খানকে ডেকে পাঠান, কারণ কাসিম খান ইসলাম খানের সঙ্গে বাংলায় আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মে তারিখে তুজুকে লিখিত হয় যে কাসিম খানের মনসব জাত এবং সওয়ারে পাঁচশ বৃদ্ধি করা হয় যেন তিনি তাঁর বড় ভাই ইসলাম খানের সাহায্যার্থে যেতে পারেন।[৪] ইসলাম খান তখন বার-ভূঁঞার সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু এর পরেও কাসিম খানের বাংলায় আসার কোন প্রমাণ নেই; ইসলাম খানের সঙ্গে বাংলায় তাঁর অন্য পাঁচ ভাই ছিলেন, শয়খ গিয়াস-উদ-দীন (গিয়াস বা এনায়েত খান), শয়খ হাবীব উল্লাহ, শয়খ ফরীদ, শয়খ জামাল এবং শয়খ ইউসুফ মক্কী। গিয়াস খান ইসলাম খানের পূর্বে যশোরে প্রাণ ত্যাগ করেন। পূর্বের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ইসলাম খানের মৃত্যুর পরে তাঁর ভাই কাসিম খান বাংলায় সুবাদার নিযুক্ত হন।

কাসিম খান মুঙ্গের থেকে যাত্রা করে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে ঢাকা পৌঁছেন। ঢাকায় তখন প্রাদেশিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন দিওয়ান মির্যা হোসেন বেগ, বখশী খাজা তাহির মুহাম্মদ এবং ওয়াকিয়া নবিশ ইয়াগমা ইসফাহানী। কাসিম খানের নৌকা পথে কালবৈশাখীর কবলে পড়ে, অনেক কষ্টে তাঁরা চাঁদনীঘাটে উপস্থিত হন। ঢাকাস্থ সকল কর্মকর্তারা নতুন সুবাদারকে অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু ইসলাম খানের ছেলে শয়খ হুশঙ্গ নতুন সুবাদারের আগমনের সংবাদ পেয়ে সম্রাটের দরবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি প্রথমে ইসলাম খানের সকল খোজা ভৃত্যদের শয়খ ইবনে ইয়ামীনের তত্ত্বাবধানে দরবারে পাঠান; ইসলাম খান সম্রাটকে উপহার দেয়ার জন্য এই খোজাদের সংগ্রহ করেছিলেন। মুকাররম খান তাঁর ছোট ভাই শয়খ মুহীউদ-দীনের তত্ত্বাবধানে কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের দেয়া হাতিগুলি সম্রাটের নিকট পাঠান, এবং উভয় দল এক সঙ্গে যাত্রা করে। শয়খ হুশঙ্গ খালসা সংক্রান্ত সকল হিসাব নিকাশ দিওয়ান ও বখশীর নিকট বুঝিয়ে দিয়ে রশিদ নেন। তিনি জানতেন যে তাঁর বাবা এবং চাচার মধ্যে মতানৈক্য ছিল, এবং তাঁর সঙ্গেও চাচার মতের মিল হবে না, তাই তিনি কাসিম খানের আগমনের সংবাদ পেয়ে আগেভাগে ঢাকা ত্যাগ করেন। কাসিম খাননদী পথে আসায় হুশঙ্গ স্থলপথে ঘোড়াঘাট হয়ে যাত্রা করেন। কাসিম খান

Edited by Ripon Sarkar

হুসঙ্গকে তিনি আসা পর্যন্ত ঢাকায় থাকতে অনুরোধ জানাবার জন্য তাঁর (কাসিম খানের) পুত্র শয়খ ফরীদকে পাঠান। কিন্তু শয়খ ফরীদের অনুরোধও শয়খ হুসঙ্গ রাখেননি। ফলে কাসিম খান শয়খ হুসঙ্গের অফিসারদের শাস্তি দিয়ে হুসঙ্গকে কাবু করার চেষ্টা করেন। রাজমহলের শয়খ কৈজুর কাছে রক্ষিত ইসলাম খানের দুই লক্ষ টাকার সম্পদ কাসিম খান হস্তগত করেন; তিনি ইসলাম খানের ব্যক্তিগত হাতিগুলিও হস্তগত করেন এবং ইসলাম খানের অফিসারদের অত্যাচার ও বন্দী করেন। শয়খ হুসঙ্গ একে অজুহাত হিসেবে খাড়া করে তাড়াতাড়ি সম্রাটের দরবারে গিয়ে পৌঁছেন।[৫]

কাসিম খান তাঁর বড় ভাই থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁর সামর্থ্য, উৎসাহ, সততা ও অধ্যবসায় ছিল না, বিচার-বিবেচনা শক্তিরও অভাব ছিল। কিন্তু এই সকল গুণ না থাকলেও লোভ, স্বেচ্ছাচারিতা, ঔদ্ধত্য, বদমেজাজ এবং স্বজনপ্রীতি তাঁর মধ্যে পুরাপুরি ছিল। তাঁর মধ্যে রুচি, মর্যাদা বা কূট-কৌশল জ্ঞানেরও অভাব ছিল। তদুপরি তিনি ছিলেন ঝগড়াটে, ফলে তিনি তাঁর অধীনস্থ অফিসার বা সহকর্মীদের উপদেশ, সমর্থন, সহযোগিতা ও সাহায্য লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর ব্যক্তিগত অফিসারদের উপর আস্থা রাখতেন; কিন্তু তারা ছিল অযোগ্য এবং অনভিজ্ঞ। এই কারণে ইসলাম খানের তুলনায় কাসিম খানের সুবাদারী আমল ছিল নিষ্প্রভ, নিষ্ফল। অফিসারদের মধ্যে মতানৈক্য এবং গোলযোগ এবং বিজিত এলাকায় বিদ্রোহই ছিল তাঁর সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁর অপরিণামদর্শিতার ফলে কামরূপ-কামতায় বিদ্রোহ দেখা দেয়, এবং মোগল বাহিনী বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তাঁর সঙ্গে অফিসারদের বিবাদ প্রায় সর্বদা লেগে থাকত এবং সম্রাট তদন্তের জন্য বা উপদেশাদি দিয়ে কয়েকবার বাংলায় উচ্চপদস্থ অফিসার পাঠাতে বাধ্য হন। সীমান্ত রাজ্যে কাসিম খান যে দু একটি অভিযান পাঠান তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সুবাদার ও অন্যান্য অফিসারদের মধ্যে বিরোধ

দিওয়ানের অপমান

কাসিম খান প্রথমেই দিওয়ান মিরযা হোসেন বেগের সঙ্গে এক বিরোধে লিপ্ত হন। শয়খ হুসঙ্গ দরবারে চলে যাবার পরে এবং সুবাদারের পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় বাজারের কর্তৃত্ব দিওয়ানের তত্ত্বাবধানে আসে এবং তিনি কোতওয়াল নিযুক্ত করে এগুলি পরিচালনা করেন। কিন্তু কাসিম খানের কোতওয়াল এখন বাজারের কর্তৃত্ব নিতে চাইলে দিওয়ানের কোতওয়াল বাধা দেন। উভয় পক্ষে বিবাদ শুরু হয় এবং এই বিবাদে দিওয়ানের ছেলেরাও জড়িয়ে পড়ে। উভয় পক্ষে হাতাহাতি, গুলী বিনিময় এবং হতাহত হলে কাসিম খান দিওয়ানের ঘর লুট করার আদেশ দেন; দিওয়ানের দুই ছেলেকে ধরে এনে বাজারে নিয়ে হত্যা করারও আদেশ দেয়া হয়। শয়খ কামাল এবং মিরযা কাসিম খাজাঞ্চীও (কোষাধ্যক্ষ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শয়খ কামাল নিষ্ক্রিয় থাকেন কিন্তু মিরযা কাসিম সুবাদারের দলে যোগ দেন। হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে দিওয়ানের সঙ্গে খাজাঞ্চীর বিরোধ ছিল, কারণ খাজাঞ্চীর হিসাব পরীক্ষা করে দিওয়ান ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করেন। (হয়ত খাজাঞ্চীর হিসেবে গোজামিল ছিল)। খাজাঞ্চী এখন সুযোগ পেয়ে সুবাদারের দলে যোগ দেন; দিওয়ানের ঘর লুট করার সময় তিনি তাঁর অনুচরদের নির্দেশ দেন যেন দিওয়ানের হিসেবের বইগুলি কূয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। ফলে খাজাঞ্চীর

Edited by Ripon Sarkar

হিসাব এবং অন্যান্য সকল হিসাব নষ্ট হয়ে যায়। পরলোকগত ওজাহ খানের ছেলেরা দিওয়ানের ঘর রক্ষা করার চেষ্টা করে বিফল হন। মুবারিজ খান এবং মীরক বাহাদুর জালাইর[৬] এর অনুরোধে কাসিম খান দিওয়ানের ছেলেদের হত্যা করা থেকে বিরত থাকেন, কিন্তু দিওয়ানসহ তাঁর ছেলেদের বন্দী করেন এবং দিওয়ানের সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। ওয়াকিয়া নবিশ খাজা আগা উয়াগবা অনেক অসুবিধা কাটিয়ে এই সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠান। তিনি মনে করেন যে ন্যায়ের খাতিরে তাঁর এই সংবাদ পাঠানো উচিত, আবার তিনি এটাও জানতেন যে কাসিম খান তাঁকে এই সংবাদ পাঠাতে দেবেন না। তাই তিনি তাঁর দুজন অনুচরকে যোগীর পোশাক দিয়ে তাদের মারফত অতি গোপনে সংবাদটি সম্রাটের নিকট পাঠান এবং তাদের নির্দেশ দেন যে তারা যেন আগ্রায় গিয়ে অনিরায় সিংহ-দলন[৭] নামক একজন মনসবদারের মাধ্যমে সংবাদটি সম্রাটের গোচরে আনে। যোগীদ্বয় রাজধানীতে গিয়ে অনিরায় সিংহ দলনের মাধ্যমে ঝারোকা দর্শনের সময় সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং খাজা উয়াগবার চিঠি সম্রাটের হাতে দেন। সম্রাট সাদাত খানকে এই ব্যাপারে তদন্ত করার দায়িত্ব দেন এবং কাসিম খানের নিকট ফরমান জারি করে বলেন যে যদি ঘটনা সত্য হয় তাহলে তিনি যেন দিওয়ান মির্যা হোসেন বেগ ও তাঁর ছেলেদের সন্তুষ্ট করেন এবং ভবিষ্যতে যেন সীমা অতিক্রম করে এরূপ কাজ না করেন। সম্রাট আরও বলেন যে শুধু চিশতী পরিবারের অবদান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি তাঁকে (কাসিম খানকে) অনুরূপ শাস্তি দেয়া হত। ফরমান পেয়ে কাসিম খান মির্যা হোসেন বেগের সকল সম্পদ ফেরত দেন, কাসিম খানের নিজের জায়গীর মাহমুদপুর ভাওয়াল[৮] মির্যা হোসেন বেগকে দেন এবং নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে মির্যা হোসেন এবং তাঁর ছেলেদের সন্তুষ্ট করেন। সাদাত খান উভয় পক্ষের সম্মতিপত্র নিয়ে দরবারে চলে যান।[৯]

মুকাররম খানের সঙ্গে মতবিরোধ

আগে বলা হয়েছে যে কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ মুকাররম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। রাজাকে নিয়ে মুকাররম খান ইসলাম খানের নিকট পৌঁছার অব্যবহিত পূর্বে ইসলাম খান মারা যান। দিওয়ান বখশী প্রমুখ অফিসারেরা তখন বলেন যে ইসলাম খান জীবিত থাকলে রাজা পরীক্ষিতকে বন্দী করতেন, সুতরাং এখনও তাঁকে বন্দী করা হোক। মুকাররম খান রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণের সময় তাঁকে জীবনের এবং সম্মানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, তাই তিনি রাজা পরীক্ষিতকে বন্দী করতে না দিয়ে নিজের তত্ত্বাবধানে রাখেন এবং নিজে রাজা পরীক্ষিতের দায়িত্ব নেন। ইতোমধ্যে কাসিম খান কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে ঢাকায় এনে নজরবন্দী করেন (পরে আলোচিত) এবং রাজা পরীক্ষিতকেও তাঁর নিকট হস্তান্তর করার জন্য মুকাররম খানকে আদেশ দেন। মুকাররম খান বলেন যে সুবাদার তাঁর চাচা, তাই সুবাদার যদি রাজা পরীক্ষিতকে অন্য কোন অফিসারের তত্ত্বাবধানে রাখতে পারেন, তাহলে তাঁর (মুকাররম খানের) তত্ত্বাবধানে রাখতে পারবেন না কেন? সুবাদার তাঁর নিজের লোককে (মুকাররম খানকে) এই কাজের দায়িত্ব না দিয়ে পর বা অন্য লোককে এই দায়িত্ব দেবেন কেন? কাসিম খান এতে বিরক্ত হয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেন। তখন মুকাররম খান বলেন: আমি অন্যান্য অফিসারদের

Edited by Ripon Sarkar

সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিতের কোচবিহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইসলাম খানের নিকট নিয়ে আসি- কিন্তু তবুও তিনি ঘটনা এখন বেঁচে নেই। (কারণ ইসলাম খানের মৃত্যু হয়েছে এবং কাসিম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়েছেন)। এখন কাসিম খান এই রাজার প্রতিশ্রুতির প্রতি সম্মান দেখান, তিনি সম্রাটের অনুমতি ছাড়াই কাজ করবেন এবং তাদের সাক্ষী মত কাজ করবেন। কিন্তু কাসিম খান পরীক্ষিতের রাজ্য নিজে দখল করে নিতে চান। রাজার সাধ্যমত চেষ্টা করে দেখে কাসিম খান তাঁকে বন্দী করতে না পারেন। ঐ অবস্থায় রাজা কাসিমকে টাকা দিয়ে রাজী হন। কাসিম খান তাতেও বিরত হন কিন্তু কিছু করলেন না। পরের দিন কাসিম খানের নির্দেশে তাঁর দেওয়ান মুকাররম খাঁকে রাজা পরীক্ষিতকে মুকাররম খানের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। মুকাররম খান বাধা দিতে চেষ্টা করেন কিন্তু দেখেন যে তাঁর সৈন্যরা প্রতিপক্ষের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই তিনি বিক্ষুব্ধ চিত্তে ঘরে ফিরে যান। পরে তিনি স্থির করেন যে যুদ্ধ করলে তিনি সফল হবেন না, বা সফল হলেও তাতে সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মুকাররম খান অনেক ভেবে চিন্তে সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিহার করার চেষ্টা এবং সম্রাটের বিরাগভাজন হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মুখ বন্ধ করে থাকেন।[১০] তিনি সম্রাটের নিকট অভিযোগ পাঠিয়ে[১১] এগারসিন্দুর চলে যান এবং তাঁর ভাই মকসুদ সকলকেও কামরূপ থেকে সেখানে ডেকে পাঠান। অতঃপর সুবাদার কাসিম খান মুকাররম খানকে ঢাকায় ডেকে পাঠান, তাঁকে সান্ত্বনা দেন এবং তাঁকে সিলেটের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান।[১২] এর পর মুকাররম খানকে আবার সিলেট থেকে প্রত্যাহার করা হয়, মুকাররম খান এগারসিন্দুর চলে আসেন এবং সম্রাটের নিকট অভিযোগ করে মকসুদ সকলকে সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয়।[১৩] কাসিম খান কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ উভয়কে বন্দী অবস্থায় সম্রাটের নিকট পাঠান।[১৪] একটু পরে আমরা দেখব যে পূর্ববর্তী সুবাদারের প্রতিশ্রুতি না রেখে তাঁদের দরবারে পাঠাবার ফলে এই দু রাজ্যে অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত হয় এবং মোগল বাহিনী প্রবল বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়। এটা অবশ্যই সুবাদার কাসিম খানের অদূরদর্শিতা, অবিবেচনা এবং উগ্র মেজাজের ফল।

মির্যা নাথনের ঘর জবরদখল

মির্যা নাথন কামরূপে যুদ্ধে রত ছিলেন, সেখানে কাসিম খানের ব্যক্তিগত অফিসার আবদুল বাকীর সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়। আবদুল বাকী মির্যা নাথনের বিরুদ্ধে কাসিম খানের নিকট নালিশ করেন। ফলে কাসিম খান মির্যা নাথনের ঢাকার ঘরবাড়ি দখল করে নেন।[১৫] মির্যা নাথন অত্যন্ত মর্মাহত হলেও এ বিষয়ে কিছু উচ্চবাচ্য করলেন না, তিনি হয়তঃ বুঝতে পারেন যে অবস্থা তাঁর অনুকূল নয়।

কাসিম খানকে সম্রাটের তিরস্কার

এদিকে কাসিম খানের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ সম্রাটের দরবারে যেতে থাকে; এমনকি দিওয়ান এবং বখশীও সুবাদারের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে রিপোর্ট পাঠাতে থাকেন। ফলে সম্রাট ইবরাহীম কালালের (উপাধি ইহতিমাম খান) মারফত, সুবাদার, দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়া নবিশের জন্য পৃথক পৃথক উপদেশ দিয়ে পাঠান। ইসলাম খানের পরিত্যক্ত সম্পদ, যা কাসিম খান হস্তগত করেন এবং বাংলার খালসা

Eidited by Ripon Sarkar

হত্যা সহ বিদ্রোহ দমনের জন্যও ইসলাইর বন্দরে নির্দেশ দেয়া হয়।[১৬] ইসলাইর খান তখন এসে উপরোক্ত অফিসারদের একজন হিসেবে প্রত্যেকের পক্ষ থেকে সম্রাটের উপঢৌকন দেন।[১৭]

সুবাদার কাসিম খানের প্রতি সম্রাটের উপদেশ নিম্নরূপ
কাসিম খান আমার ছেলে, যেমন ইসলাম খানও আমার সন্তান ছিল। এই কারণে ইসলাম খানের মৃত্যুর পর কাসিম খানকে সুবাদার নিযুক্ত করেছি। বাংলার সুবাদারী যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা কাসিম খান জানেন। তিনি এবং অন্যান্য বড় বড় অফিসার (এখানে আকবরের সময় থেকে ইসলাম খান পর্যন্ত সকল সুবাদারের কথা বলা হয়েছে) এই সুবার দায়িত্বে ছিলেন এবং সুবার শান্তি স্থাপন করেন। ইসলাম খান রাজকীয় অফিসারদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করেন যে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ছোট বড় কোন অফিসারকে তিনি অসন্তুষ্ট করেননি। যেহেতু কাসিম খান ইসলাম খানের আপন ভাই, আমরা তাঁর নিকট আনুগত্য এবং বিশ্বস্ততা আশা করি। তাঁর উচিত রাজকীয় অফিসারদের সঙ্গে তাঁদের মর্যাদা অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করা এবং সমঝোতা স্থাপন করে থাকা। তাঁর নিজের স্বার্থে দেশের শাসনে কোন গোলযোগ সৃষ্টি করা উচিত নয়। আরাকানদের সঙ্গে যুদ্ধ সাফল্যের সঙ্গে শেষ করার জন্য তাঁর সাহসিকতা পূর্ণ প্রচেষ্টা নেয়া উচিত। আরাকানদের সাথে চুক্তি করে তিনি যেন দরবারে পাঠান যাতে আমার ছেলের (কাসিম খানের) কৃতিত্ব জাহাঙ্গীরের ইতিহাসে সন্নিবেশিত হতে পারে। তাঁর ব্যবহার হবে প্রশংসনীয়, অনুগত অফিসারদের সঙ্গে তিনি অবৈধ এবং প্রতিহিংসা পরিহার করবেন। সর্বদা আমাদের আদেশ মতে তাঁর মনে যেন কোন অবৈধের ভাব না থাকে; সম্রাটের শাস্তির ভয় এবং সৎ কাজের পুরস্কারের আশা যেন তাঁর মনে থাকে।

দিওয়ানের প্রতি সম্রাটের উপদেশ নিম্নরূপ

সুবাদার এবং অন্যান্য অফিসারদের প্রতি তিনি এমন ব্যবহার করবেন যেন প্রত্যেকে বাধ্য পাওনা তাঁর নিকট থেকে পায়। কাসিম খান তাঁর মত দুষ্ট কথায় তিনি মনে করবেন না যে কাসিম খান আমার ভৃত্য এবং তিনি আমার ভৃত্য নন। ভৃত্যদের প্রতি আমাদের দয়ার কারণে যদিও কাসিম খানকে ছেলে ডাকি, তবুও ঠিক তেমনি সকল রাজকীয় অফিসারের সম্মান রক্ষা করা তাঁর অবশ্য কর্তব্য। ভৃত্যদেরও এটা অবশ্য কর্তব্য যে নিজেদের সম্মান রক্ষার জন্য অসম্মানজনক কাজ করার চেয়ে মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়ঃ। যেন তারা তাদের কার্যকলাপে সীমা অতিক্রম করবে। কাসিম খানকে যেই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাতে তিনি সর্বেসর্বা। দিওয়ানেরও এটা অবশ্য কর্তব্য যে তিনি যেন শালীনতা বজায় রাখেন এবং সম্রাটের কল্যাণের জন্য কাসিম খানের সঙ্গে সমঝোতায় থাকেন। দিওয়ান তাঁর নিজের কর্তব্যে সর্বদা সজাগ থাকবেন।

বখশীর প্রতি সম্রাটের উপদেশ নিম্নরূপ

ইসলাম খানের সুবাদারী আমলে তিনি দু তিনবার অপরাধ করেন[১৮] কিন্তু আমরা দয়া করে তাঁকে ক্ষমা করেছি। আশা করেছিলাম যে তিনি আর কোন অপরাধ করবেন

Edited by Ripon Sarkar

না এবং সাম্রাজ্যের কাজে প্রকৃত মনযোগ দেবেন। কিন্তু দিওয়ানের প্রতি কাসিম খানের অত্যাচার অবিচার গোপন রেখে তিনি আবার অপরাধ করেন। তিনি আমার নিকট এই বিষয়ে রিপোর্ট করেননি। আমরা আবার তাঁকে ক্ষমা করেছি। তাঁর আগের চেয়ে অনেক বেশি কর্তব্য কাজে মনযোগ দেয়া উচিত। তিনি কাসিম খানের সমর্থন নিয়ে কাজ করবেন এবং নিজের বিবেক ও বিবেচনা মত কাজ করবেন।

ওয়াকিয়া নবিশের প্রতি সম্রাটের উপদেশ

তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং বিশ্বস্ত ভৃত্য হওয়ায় আমরা তাঁকে বাংলার ওয়াকিয়ানবিশ নিযুক্ত করেছি। এতদিন পর্যন্ত তিনি আমাদের সন্তুষ্টিমত কাজ করেছেন। এর পরে তাঁর আরও সতর্ক হওয়া উচিত, তাঁর জানা উচিত যে আমাদের সন্তুষ্টি তাঁর জন্য আশীর্বাদ। কর্তব্যে সতর্ক হয়ে তাঁর সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করা উচিত, সম্রাটের অনুগ্রহের প্রতি তিনি আস্থাবান হতে পারেন এবং দিন দিন উন্নতি লাভ করতে পারেন। তাঁর প্রতি আমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

অতঃপর ইবরাহীম কলাল কাসিম খানের নিকট ইসলাম খানের সম্পদ এবং খালসা রাজস্ব দাবি করেন। কাসিম খান তাঁকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তিনি নগদ এবং জিনিসপত্রে মোট দু লক্ষ টাকা দেন এবং বাকি টাকা পরে পাঠাবেন বলে অঙ্গীকার পত্র দেন। তিনি বলেন যে তাঁর নিজের লোকের মারফত বাকি অর্থ দরবারে পাঠিয়ে দেবেন। অতঃপর ইবরাহীম কলাল বিদায় নিয়ে সম্রাটের দরবারে চলে যান।

কামরূপ পরিস্থিতি

মুকাররম খান যুদ্ধ জয় করে রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম খানের নিকট আসার সময় তাঁর ভাই আবদুস সালামকে কামরূপের শাসনভার দেন এবং মিরযা হাসান মাশহাদীকে দিওয়ান এবং বখশী নিযুক্ত করে আসেন। তাঁরা কামরূপের রাজা পরীক্ষিতের রাজধানী গিরা বা গিলানৌ-এ অবস্থান নেন এবং গিলার নাম রাখা হয় জাহাঙ্গীরাবাদ। সেনাপতি আবদুস সালাম বিভিন্ন স্থানে সৈন্য নিযুক্ত করে শান্তি রক্ষার কাজে লিপ্ত হন এবং মিরযা হাসান মাশহাদী রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্গঠনের দিকে মনোযোগ দেন। তিনি কামরূপকে বিশটি বিভাগে ভাগ করেন এবং ফৌজদার ও করৌরী নিযুক্ত করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেন। কয়েকটি পরগণা মুস্তাজির[১৯]কে দেয়া হয় এবং তাঁরা নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব দিতে সম্মত হয়ে চুক্তি সম্পাদন করে। খুন্তাঘাট[২০] পরগণায় মুহাম্মদ জামান তবরেজী করৌরী নিযুক্ত হন। খুন্তাঘাট যাদুর জন্য বিখ্যাত ছিল; রাজস্ব আদায়কারীরা রায়তদের উপর অত্যাচার করলে তারা যাদুর শিকারে পরিণত হত। মিরযা নাথন বলেন যে মুহাম্মদ জামান তবরেজী যাদুর ফলে মারা যায়।[২১] যা হোক কামরূপে মোগল শাসন সুন্দরভাবে চলছিল; সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। রাজা পরীক্ষিতের আত্মসমর্পণের পরে রায়তরা নতুন পরিস্থিতিকে মেনে নেয় এবং কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে শাসিত হতে থাকে।

কাসিম খান কামরূপের শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন, অফিসারদের রদবদল করেন, কিন্তু তাঁর এই রদবদলের ফলাফল শুভ না হয়ে কামরূপের শান্ত পরিস্থিতিতে

Edited by Ripon Sarkar

অশান্তি ডেকে আনে। তিনি প্রথমে তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার আবদুল বাকীকে কামরূপে অবস্থানরত সৈন্যদের সম্পর্কে তদন্ত করে রিপোর্ট দেয়ার জন্য কামরূপ পাঠান; কয়েকজন রাজকীয় অফিসার যেমন, মিরযা নাথন, রাজা শত্রুজিত, জামাল খান মঙ্কলী, লছমী রাজপুত এবং মিরযা মাসুম খাকীকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। কামরূপের অফিসার রদবদল করে তিনি দিওয়ান ও বখশী মিরযা হাসান মাশহাদীর পরিবর্তে মীর সফীকে দিওয়ান ও বখশী নিযুক্ত করেন এবং এবং শয়খ বসুতনকে[২২] সেনাপতি আবদুল সালামের সহকারী নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি কোচবিহারের (কামতার) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে ঢাকায় ডেকে পাঠান।

মিরযা ইমামকুলী শামলু এবং মিরযা হাসান মাশহাদী ঢাকায় এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সুবাদার প্রথমে অস্বীকৃতি জানান, পরে আবদুন নবীর অনেক অনুরোধ তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে আবদুল বাকী, শয়খ বসুতন এবং মীর সফী কামরূপে পৌঁছেন। কামরূপে নবনিযুক্ত দিওয়ান ও বখশী মীর সফীর কার্যকলাপে রায়তদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। তিনি পাইকদের তাতার পরিমাণ অর্থ রাজস্ব বৃদ্ধি করে রায়তদের উপরে আরোপ করেন; ফলে রায়তরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, কিন্তু তিনি মনে করেন যে অতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহ করে তিনি সাম্রাজ্যের বিরাট উপকার করেছেন। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ঢাকা আসার সময় নিজস্ব অফিসার নিযুক্ত করে এসেছিলেন, কিন্তু মীর সফী তাদের পরিবর্তন করে অর্ধেক পরগণায় করৌরী নিযুক্ত করেন এবং বাকী অর্ধেক পরগণা মুস্তাজিরদের বা নিলামে দিয়ে দেন। মুস্তাজিররা স্বভাবতই রায়তদের উপর কর বৃদ্ধি করে, ফলে রায়তদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। আবদুল বাকী মীর সফীর এই অপরিণামদর্শী কার্যকলাপ সুবাদারকে অবহিত করেন; সুবাদার রায়তদের সন্তুষ্ট করার জন্য মীর সফীকে অপসারণ করে মীর আলী বেগকে দিওয়ান ও বখশীর পদে নিযুক্ত করেন। ফলে কামরূপের পরিস্থিতি শান্ত হয়।[২৩]

কামরূপে বিদ্রোহ

কাসিম খানের আর এক অপরিণামদর্শী কাজের ফলে কামরূপে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠে। তিনি রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে নযরবন্দী করেন।[২৪] রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে মুকাররম খানের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁকেও নযরবন্দী করা হয় (পূর্বে আলোচিত) এবং পরে উভয় রাজাকে সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে উভয় রাজাকে বন্দী করার সংবাদ কামরূপে ছড়িয়ে পড়লে, সেখানকার কোচ সেনানায়কেরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা প্রথমে খুন্তাঘাট অধিকার করে সেখানকার করৌরী ও মুস্তাজিরদের হত্যা করে এবং লুটতরাজে লিপ্ত হয়।[২৫]

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে মোগল সেনানায়কেরা, যেমন আবদুল বাকী, আবদুস সালাম পরামর্শ করে আল্লামা বেগকে বিদ্রোহ দমন করতে পাঠান। তাঁর সঙ্গে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈন্য এবং দুশ তীরন্দাজ সৈন্য দেয়া হয়। মিরযা নাথন পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রতিবাদ করে বলেন যে এত অল্প সৈন্য দিয়ে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে না। আবদুল বাকী তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন যে তাঁকে (মিরযা নাথনকে) ঢাকায় ডেকে পাঠান হয়েছে, সুতরাং তাঁর মতামত দেয়ার অধিকার নেই। মিরযা নাথন উত্তরে বলেন যে

Edited by Ripon Sarkar

তাঁকে ডেকে পাঠানো হলেও যেখানে সম্রাটের স্বার্থ সম্পৃক্ত সেখানে তাঁর মতামত দেয়ার অধিকার আছে। (হয়ত এখানে কটুবাক্যও উচ্চারিত হয়েছিল, যার ফলে আবদুল বাকী মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট রিপোর্ট করেন এবং সুবাদার ঢাকাস্থ নাথনের ঘর দখল করেন। এটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে)। মিরযা নাথনের মতামত গ্রাহ্য না করে আল্লামা বেগকে বিদ্রোহ দমনের জন্য খুন্তাঘাটে পাঠানো হয়।[২৬]

আল্লামা বেগ খুন্তাঘাটে গিয়ে জয়পুর নামক গ্রামে একদল বিদ্রোহীকে ছত্রভংগ করে দেন। এই বিজয়ে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি গরঙ্গ নদী[২৭] পার হয়ে একটি স্থানে যান এবং সেখানে হাঁটু উঁচু বেষ্টনী দেয়াল নির্মাণ করে রাত্রি যাপন করেন। এদিকে পলায়নরত কামরূপের সৈন্যরা তাদের স্বঘোষিত রাজার[২৮] নিকট গিয়ে ঘটনা অবহিত করে। রাত্রে রাজা আল্লামা বেগের বাহিনী সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয় এবং স্বল্প সংখ্যক সৈন্যের কথা শুনে রাত্রেই তাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করে এবং ভোরে মোগলদের আক্রমণ করে। মোগলরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে কিন্তু অনেকেই নিহত বা বন্দী হয়। আল্লামা বেগ এই সংবাদ গিলায় পাঠালে আবদুল বাকী আবার তাঁর অধীনস্থ একজন অফিসারের নেতৃত্বে অতিরিক্ত দুশ সৈন্য পাঠান। মিরযা নাথন আবারও আপত্তি করেন এবং বলেন যে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতির অধীনে বেশি সংখ্যক সৈন্য পাঠান দরকার। কিন্তু এবারও তাঁর মতামত গ্রাহ্য হল না। এই বাহিনী বাহারওয়াল গ্রামে পৌঁছে পূর্বে প্রেরিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে ফিরে আসতে চায়, কিন্তু বাহারওয়ালের গ্রামবাসীরা তাদের কাউকে ফিরে আসতে দেয়নি।[২৯]

এই সংবাদ জাহাঙ্গীরাবাদ ওরফে গিলায় পৌঁছলে মোগলরা গিলা এবং রাঙ্গামাটি[৩০] সুরক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। কিন্তু সেনাপতিরা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগেই শত্রুরা রাংগামাটি দুর্গ এবং গদাধর নদীর মোহনা দখল করে। গদাধর নদীর মোহনা ছিল সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নদীটি গিলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত; গিলা থেকে ঢাকায় আসা যাওয়ার, সংবাদ আদান প্রদানের এবং সৈন্যদের রসদ সরবরাহের একমাত্র পথ ছিল এই গদাধর নদীর মোহনা। বিদ্রোহীরা জানত যে মোগল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করার জন্য গদাধর নদীর মোহনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে মোগলরা মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজীকে পাঁচশ অশ্বারোহী, পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য এবং কয়েকজন প্রবীণ অফিসারসহ রাঙ্গামাটি পুনরুদ্ধারের জন্য পাঠান। মোগল বাহিনী এখন চতুর্দিক থেকে আক্রান্ত হয়। দক্ষিণকূল (ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীর) থেকে ইউসুফ বারলাস সংবাদ পাঠায় যে বিদ্রোহ প্রকট আকার ধারণ করেছে, বিদ্রোহীরা মোগল বাহিনীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়া করে জখম করছে এবং রসদ বন্ধ করে দিচ্ছে। ঘোড়ার জন্য ঘাসও পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করা না হলে সকলেই মারা পড়বে। সেনাপতি আবদুস সালাম এবং আবদুল বাকী মিরযা নাথনের সাহায্যে কয়েকখানি রণতরী যোগাড় করে তাদের উদ্ধার করে আনে। কিন্তু মোগলদের প্রধান বাহিনী গিলায় অবরুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়; বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে শহরের চতুর্দিকে আক্রমণ করতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই মোগল সৈন্যদের হত্যা করে। মোগলেরা স্থির করে যে তারাও কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে রাংগামাটি থেকে গিলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাস্তা পাহারা দেবে। এ সময় উভয়পক্ষে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়, কিন্তু এই যুদ্ধগুলি মারাত্মক রূপ ধারণ করেনি।[৩১]

Edited by Ripon Sarkar

এদিকে রাঙ্গামাটি দুর্গে প্রেরিত মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজী যুদ্ধে সুবিধা করতে পারল না, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়ায় তারা মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দেয়, মোগলদের অনেকে হতাহত হয়। তখন আবদুস সালাম মিরযা নাথনকে মীর আবদুর রাজ্জাকের সাহায্যার্থে পাঠান। কিন্তু এ ব্যাপারে আবদুল বাকীর সমর্থন ছিল না, তিনি গোপনে মীর আবদুর রাজ্জাকের সৈন্যদের মিরযা নাথনকে অনুসরণ না করার জন্য আদেশ দেন। মিরযা নাথনের মনসব মীর আবদুর রাজ্জাকের চেয়ে বেশি হওয়া সত্ত্বেও মীর আবদুর রাজ্জাক মিরযা নাথনকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকেন। স্পষ্টই বুঝা যায় যে আবদুস সালাম এবং আবদুল বাকীর মধ্যে যেমন মতানৈক্য ছিল, মীর আবদুর রাজ্জাক এবং মিরযা নাথনের মধ্যেও বনিবনা ছিল না। ফলে মোগল বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ চালাতে ব্যর্থ হয়। এই সংবাদ ঢাকায় পৌঁছুলে সুবাদার কাসিম খান মিরযা ইমাম কুলী বেগ শামলুকে কামরূপের প্রধান অফিসার নিযুক্ত করে পাঠান।[৩২]

মিরযা ইমাম কুলী, আবদুল বাকী এবং মিরযা নাথন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজীকে গদাধর নদীর মোহনা পাহারা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়, যেন শত্রুরা নদীর মোহনা অধিকার করতে না পারে এবং পিলা আক্রমণ করতে না পারে। আবদুস সালামকে পিলা রক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। মোগল বাহিনী দলগাঁও নামক গ্রামে উপস্থিত হয়ে দেখে যে বিদ্রোহীরা সেখানে অবস্থান করছে। মোগল বাহিনী সেখানে দুর্গ নির্মাণ করে। ইতোমধ্যে বিদ্রোহীরা লছমী রাজপুতের অধীনে মোগল অগ্রবর্তী দলকে আক্রমণ করে কিন্তু পরাজিত হয়। রাত্রে মোগলরা দুর্গে অত্যন্ত সতর্কভাবে অবস্থান করে কিন্তু সকালে দেখে যে শত্রুরা পালিয়ে গেছে। মিরযা নাথন এই যুদ্ধের তারিখ দিয়েছেন শওয়াল মাস, অর্থাৎ ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাস।[৩৩] এই যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে রাঙ্গামাটি দুর্গে অবস্থানরত বিদ্রোহীরাও সেখান থেকে পলায়ন করে। মীর আবদুর রাজ্জাক রাঙ্গামাটি দুর্গ দখল করে সেখানে অবস্থান নেন।[৩৪]

মোগল বাহিনী দলগাঁও থেকে জয়পুর বা জয়গড়ে[৩৫] যাত্রা করে; দু মঞ্জিল অতিক্রম করে তারা গুমা দুর্গে পৌঁছে। এখানে মিরযা ইউসুফ বারলাসকে দুশ অশ্বারোহী এবং পাঁচশ বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজ বাহিনী এবং কয়েকজন সেনানায়কসহ রেখে আবদুল বাকী এবং অন্যান্যরা জয়গড়ের দিকে যাত্রা করে এবং এক মঞ্জিলে সেখানে পৌঁছে। তারা জয়গড়ে অবস্থান নেয় এবং বিদ্রোহীদের তাড়া করে। বিদ্রোহীরা তাদের পরিবার পরিজন ফেলে পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নেয়। মোগল বাহিনী চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করে। এভাবে সাতদিন অবস্থান করার পর তারা জয়গড় থেকে সোনকোশ নদীর তীরে শিবির স্থাপন করে। এখানে তারা সংবাদ পায় যে আবদুল বাকীকে কামরূপ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে সুবাদার কাসিম খান মুকাররম খানের নিকট থেকে রাজা পরীক্ষিতকে ছিনিয়ে নেয়ায় মুকাররম খান এগার সিন্দুরে চলে আসেন। মুকাররম খান তাঁর ভাই আবদুস সালামকেও এগার সিন্দুরে আসতে সংবাদ দেন। ইতোমধ্যে আবদুল বাকীকে কামরূপের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করায় আবদুস সালামও এগার সিন্দুরে এসে তাঁর ভাই মুকাররম খানের সঙ্গে মিলিত হন।[৩৬] এ সময় মিরযা নাথন অসুস্থ হয়ে পিলায় চলে যান। আবদুল বাকী মনে করেন

Edited by Ripon Sarkar

যে শিলং সেনাপতির অনুপস্থিতিতে বিদ্রোহীরা শিলা আক্রমণ করতে পারে, তাই তিনি শিলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় খবর পাওয়া গেল যে খুন্তাঘাট পরগণায় বিদ্রোহীরা আবার তৎপর হয়েছে এবং মোগল সৈন্যদের রসদ সরবরাহকারীদের আক্রমণ করে হতাহত করেছে। অতএব আবদুল বাকী শিলার দিকে যাত্রা করে মিরযা সালেহকে দশ অশ্বারোহী, তিনশ তীরন্দাজ এবং তিনটি হাতিসহ বিদ্রোহ দমনের জন্য খুন্তাঘাটে পাঠান। মিরযা সালেহ সংবাদ দেন যে তাঁরা প্রথমে গুস্তামারী[৩৭] পৌঁছে এবং শত্রুদের একটি বাহিনীকে পরাজিত করে। শত্রুরা ধারণা করেছিল যে মোগল সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক, কিন্তু যখন তারা জানতে পারে যে মাত্র স্বল্প সংখ্যক সৈন্য এসেছে, তারা পুনরায় একত্র হয়ে মোগলদের আক্রমণ করে। সাতদিন যুদ্ধ করার পরও শত্রুদের হটান যায়নি। মোগলদের রসদ বন্ধ হয়ে গেছে, সুতরাং অতিরিক্ত সৈন্য, রসদ, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রয়োজন। এই সংবাদ পাওয়ার পরে শিলায় মোগল সেনাপতি ও সেনানায়কদের মধ্যে আবার মতানৈক্য দেখা দেয়। আবদুল বাকী মিরযা ইমাম কুলী বেগ, মিরযা মীর নাথকী এবং শয়খ বসুতনকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাঁরা সকলেই অস্বীকার করেন। এই অবস্থায় মিরযা নাথনকে মিরযা সালেহর সাহায্যে পাঠানো হয়। নাথন অল্পদিন আগে আরোগ্য লাভ করলেও তিনি যেতে সম্মত হন এবং ২৮শে মহরম (২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৬১৫ খ্রিঃ) যাত্রা করেন। নাথন প্রথমে রাঙ্গামাটি যান, সেখান থেকে সনকোশ নদীর তীরে যান। সেখানে তিনি খবর পান যে বেপারীরা যখন মীরযা সালেহর সৈন্যদের জন্য রসদ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন নতুন রাজার সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে হতাহত করে এবং রসদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মিরযা নাথন একদল সৈন্য পাঠালে বিদ্রোহীরা পালিয়ে কাওয়ার পাহাড়ে[৩৮] আশ্রয় নেয়। মিরযা নাথন সেখানে একদল সৈন্য রেখে বাধনতরায় গিয়ে মিরযা সালেহর সঙ্গে মিলিত হন। চরদের মারফত তিনি সংবাদ পান যে বিদ্রোহীরা রাজঘাটে অবস্থান করছে এবং তাদের সেনা গুস্তামারী দুর্গে গিয়েছেন। মিরযা নাথন এবং মিরযা সালেহ গুস্তামারী দুর্গ আক্রমণ করেন, শত্রুরা পালিয়ে যায়, শত্রুদের বন্দী সৈন্য এবং চর মারফত খবর পাওয়া যায় যে বিদ্রোহীরা পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ডাকুনিয়া নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টায় আছে।[৩৯] মিরযা নাথন মিরযা সালেহকে তিনশ বর্মপরিহিত অশ্বারোহী, পাঁচশ বন্দুকধারী এবং পঞ্চাশটি হাতিসহ ডাকুনিয়া দুর্গ জয় করতে পাঠান। প্রায় চার ঘণ্টা যুদ্ধের পরে দুর্গ অধিকৃত হয়। শত্রুরা রাজা লক্ষীনারায়ণের ভাই মানিকদেবের অধীনস্থ এলাকায় চলে যায়। মিরযা নাথন রাজা লক্ষীনারায়ণের ছেলের নিকট সংবাদ দেন তিনি যেন বিদ্রোহীদের নেতাকে ধরে দিতে মানিকদেবকে নির্দেশ দেন। রাজা লক্ষী নারায়ণ তখন মোগলদের হাতে বন্দী, সুতরাং রাজার ছেলে মিরযা নাথনের অনুরোধে রাজি হন। তাঁর নির্দেশে মানিকদেব বিদ্রোহীদের রাজাকে বন্দী করে পিঞ্জিরায় করে মোগলদের হাতে তুলে দেন। ফলে খুন্তাঘাটের বিদ্রোহের অবসান হয়।[৪০] মিরযা নাথন খুন্তাঘাটের শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনেন, তিনি মুহাম্মদ আমীন নামক একজন ভূমির মনসবদারকে করোরী এবং মাধব দাসকে কারকুন (রাজস্ব সংগ্রহের হিসাবরক্ষক) নিযুক্ত করেন এবং রানী বাড়ায়[৪১] একটি থানা স্থাপন করেন।

এদিকে কামরূপে সনাতন নামক একজন বিদ্রোহী সেনাপতি আবার গোলযোগ আরম্ভ করে এবং সেখানকার করোরী শয়খ ইবরাহিম সঙ্কটজনক অবস্থায় পড়ে যান। তিনি এই

Eidited by Ripon Sarkar

সবোম সুবাদারকে অর্পিত হওয়ায় কাসিম খান আবদুল বাকীকে ঢাকা থেকে কামরূপ যাওয়ার আদেশ দেন। ইতোমধ্যে হরা দর্পা শ্রীসূর্যে শুক্লাঘাটে আবার বিদ্রোহ দেখা দেয়। মির্জা নাথন তখন শুক্লাঘাটে অবস্থান করছিলেন। তিনি মালসুগদাসের নেতৃত্বে এক বাহিনী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে পাঠান, বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। অতঃপর মির্জা নাথন পিলায় গিয়ে আবদুল বাকীর সঙ্গে মিলিত হন। তারা উভয়ে কামরূপ বিদ্রোহ দমনের জন্য গমন করেন। মির্জা নাথন স্থলপথে এবং আবদুল বাকী নদীপথে নৌকায় যাত্রা করেন। মির্জা নাথন কিদুওরিতে পৌঁছে সংবাদ পান যে বিদ্রোহীরা কিদুওরি এবং খাধনচোয়ার মধ্যবর্তী পর্বতে অবস্থান নিয়েছে এবং গিরিপথে একটি শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। নাথন তাঁর শ্যালকের নেতৃত্বে দশ অশ্বারোহী এবং পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য সামনের দিকে পাঠিয়ে দেন এবং নিজে তাদের পেছনে অগ্রসর হন। গিরিপথে যেখানে দুর্গ তৈরি করে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেখানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়। মির্জা নাথন বিদ্রোহীদের দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর মির্জা নাথন খাধনচোয়া দুর্গ অধিকার করেন এবং আরও ছয় মঞ্জিল অগ্রসর হয়ে বনাস (বা বনাস) নদীর তীরে উপস্থিত হন। যদিও যাত্রা করার আগে কথা ছিল যে আবদুল বাকী ও মির্জা নাথন উভয়ে বনাস নদীতে এসে মিলিত হবেন এবং উভয়ে একযোগে বড়নগরে যাবেন, মির্জা নাথন বনাস নদীর তীরে এসে জানতে পারেন যে আবদুল বাকী আগেই বড়নগরে চলে গেছেন এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্য না থাকায় আবদুল বাকী যুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিলেন না, বরং বিদ্রোহীরা দিনে কয়েকবার তাঁর নৌকা আক্রমণ করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। মির্জা নাথনও বড়নগরে যাওয়ার মনস্থ করেন, কিন্তু নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা তাঁর সঙ্গে ছিল না। তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কয়েকখানি গজেলা নৌকা যোগাড় করে সৈন্য ও ঘোড়া নদী পার করেন। নদী পার হওয়ার সময় বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ করে, কিন্তু তাদের হটিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর মির্জা নাথন বড়নগরে গিয়ে আবদুল বাকীর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁরা উভয়েই মিলিতভাবে বিদ্রোহী সনাতনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে সরাইলের জমিদার সোনা গাজী আসাম অভিযানে সৈয়দ আবু বকরের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন, আবদুল বাকী তাঁকেও সনাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য রেখে দেন। সনাতন দকলবার দুর্গ নির্মাণ করে মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। মির্জা নাথন প্রথমে শান্তি স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে সনাতনের নিকট দূত পাঠান। দূত মারফত তিনি বলেন যে যদি শরাব ইব্রাহিম করোরী রায়তদের উপর অত্যাচার করে থাকে, তাঁকে অপসারণ করে নতুন করোরী নিয়োগ করা হবে। সনাতন উত্তরে জানান যে করোরীর অত্যাচারে রায়তেরা সর্বস্বান্ত হয়েছে, তাদের খাজনা দেবার সামর্থ্য নেই। সনাতন আরও বলেন: 'আমি কিভাবে শান্ত হব? আমাদের পূর্বজ মহান রাজা সম্রাটের অনুগত হয়ে সম্রাটকে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, কিন্তু বিনিময়ে আমরা কি সুবিধা পেয়েছি?' অতঃপর সনাতন শান্তির বিনিময়ে নিম্নরূপ প্রস্তাব করেন: ১ম, শরাব ইব্রাহিমকে শাস্তি দিতে হবে; ২য়, এক বছরের খাজনা মওকুফ করতে হবে; ৩য়, রাজকীয় বাহিনীকে পিলায় ফিরে যেতে হবে; ৪র্থ পাইকদের ভাতা সরাসরি দিতে হবে, এ জন্য রায়তদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করা যাবে না। এই প্রস্তাবগুলির উত্তরে মির্জা নাথন সনাতনকে জানান যে শরাব ইব্রাহিমকে অপসারণ করে তদস্থলে অন্য লোক নিয়োগ করা সম্ভব, কিন্তু এক বছরের

Eidited by Ripon Sarkar

খাজনা মওকুফ করা বা রাজকীয় বাহিনীকে গিলায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। ফলে শান্তি আলোচনা ভেঙ্গে যায় এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। শান্তি আলোচনায় সনাতনের প্রদত্ত উত্তরে দেখা যায় যে মোগলদের বিরুদ্ধে তাদের সত্যিই অভিযোগ ছিল। শয়খ ইবরাহীম করৌরী রায়তদের উপরে অত্যাচার করে, তাদের সুন্দরী মেয়ে এবং ছেলেদের ধরে নিয়ে যায়, এবং পাইকদের ভাতা মিটাবার নাম করে খাজনা বৃদ্ধি করে। সুতরাং কামরূপের লোকেরা বাধ্য হয়ে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মান-সম্মান রক্ষা করার জন্য অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধ চলতে থাকে, মোগলরা দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা খনন করে আক্রমণ চালায়, কিন্তু কয়েকদিন যুদ্ধ করেও বিদ্রোহীদের হটাতে সমর্থ হল না। একদিন হঠাৎ করে মোগলরা সনাতনের দুর্গের রসদ সরবরাহের পথ আবিষ্কার করে এবং পথটি বন্ধ করে দেয়। দুর্গের অবরোধ আগের মতই চলতে থাকে। ইতোমধ্যে মিরযা নাথন দুর্গের পেছনের গ্রামগুলি আক্রমণ করে লুটতরাজ করতে থাকে, ফলে শত্রুর দুর্গের রসদের উৎসও বন্ধ হয়ে যায়। সনাতনও কম চালাক ছিলেন না, তিনি যখন দেখেন যে মোগলরা তাঁর রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিচ্ছে, তিনি মোগল বাহিনীর আরও পেছনের দিকে তাড়াতাড়ি আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। সনাতন যখন দ্বিতীয় দুর্গ নির্মাণে ব্যস্ত মোগলরা আবদুল বাকীর নেতৃত্বে নতুন দুর্গ এমনভাবে আক্রমণ করে যে তাদের পক্ষে আর বাধা দেয়া সম্ভব হল না। শত্রুদের রসদ এবং গোলা বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় তারা পলায়ন করতে বাধ্য হয়। সনাতনের সৈন্যরা তাকে বলেঃ ছোট দুর্গটির পতন হয়েছে এবং আমাদের প্রায় এক হাজার লোক নিহত হয়েছে, প্রায় পাঁচশ সৈন্য আহত হয়ে পলায়ন করেছে, তাদের মৃত্যুও অনিবার্য। এই তিন দিন তিন রাত্রিতে দু হাজারের বেশি রসদ সরবরাহকারী হয় নিহত হয়েছে বা বন্দী হয়েছে; গ্রামের লোকেরা রসদ সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে এবং মোগল বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এমতাবস্থায় আমাদের এই দুর্গ ত্যাগ করে জুতিয়া[৪২] দুর্গে যাওয়া উচিত। জুতিয়া দুর্গ গভীর জংগলে অবস্থিত হওয়ায় অত্যন্ত সুরক্ষিত। অতএব সনাতন দুর্গ পরিত্যাগ করেন এবং মোগল বাহিনী দমদমা দুর্গ অধিকার করেন।[৪৩] মোগল বাহিনী জুতিয়া দুর্গে সনাতনের পশ্চাদ্ধাবন করে, কিন্তু দুর্গ জয়ের আগে শুনতে পায় যে আসাম অভিযানে সৈয়দ আবু বকর পরাজয় বরণ করেছেন। তাই আবদুল বাকী এবং মিরযা নাথন হাজো গমন করেন। আবু বকরের সাহায্য করাই ছিল তাদের হাজো গমনের কারণ। যাওয়ার আগে আবদুল বাকী কামরূপে কয়েকটি থানা স্থাপন করেন; ইউসুফ বারলাসকে একশ অশ্বারোহী ও দুশ বন্দুকধারীর নেতৃত্বে বড়নগর, মিরযা সালেহ আরঘুনকে দুশ পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী এবং চারশ বন্দুকধারীর নেতৃত্বে দমদমায় এবং মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজী ও শেঠ হৃদয়রামের নেতৃত্বে একশ অশ্বারোহী ও পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য পাণ্ডু থানায় নিযুক্ত করা হয়। শয়খ ইবরাহীম আগের মতই করৌরী পদে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে বহাল থাকেন।[৪৪]

কিন্তু কামরূপে শান্তি স্থাপন করা তখনও সম্ভব হয়নি। উপরে বলা হয়েছে যে সনাতন পার্বত্য জুতিয়া দুর্গে অবস্থান নেন। এদিকে রাজা পরীক্ষিতের ভাই বলদেব বা বলি নারায়ণ নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন এবং কংশ নারায়ণ নামক একজন ব্রাহ্মণের সাহায্যে ধরং জিলার সাহুরাবারি নামক স্থানে বিদ্রোহ করেন। প্রকৃতপক্ষে রাজা পরীক্ষিতের পরাজয়ের পরে বলদেব পালিয়ে অহোম রাজা প্রতাপ সিংহের নিকট আশ্রয় নেন। অহোম রাজ তাঁকে শুধু আশ্রয় দেননি, বরং তাঁকে ধর্ম নারায়ণ উপাধি দিয়ে এই

Edited by Ripon Sarkar

সময় (১৬১৫ খ্রিঃ) ধরং জেলায় করদ রাজা রূপে অভিষিক্ত করেন।[৪৫] আবদুল বাকী এবং মিরযা নাথন শয়খ ইবরাহীম করোরীর নিকট অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে তাঁকে বলদেবের বিদ্রোহ দমন করার আদেশ দেন। যুদ্ধে বলদেব এবং কংশ নারায়ণ পরাজিত হয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় পলায়ন করেন।[৪৬] এ সময় সনাতন বড়নগর আক্রমণ করেন, সেখানে ইউসুফ বারলাস থানার অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজা শত্রুজিতকে অতিরিক্ত সৈন্যসহ ইউসুফ বারলাসের সাহায্যার্থে পাঠান হয়। উভয় পক্ষে অনেক যুদ্ধ হয় কিন্তু সনাতনকে পরাজিত করা সম্ভব হল না। এই সংবাদ পেয়ে আবদুল বাকী সৈয়দ ইসমাইলকে বকশা দুয়ারের থানাদার নিযুক্ত করে পাঠান, বকশা দুয়ার, ধরং এবং সাহুরাবারির মধ্যবর্তী স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়। শয়খ ইবরাহীমকে নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন বড়নগরে মিরযা ইউসুফ বারলাস এবং রাজা শত্রুজিতের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। শয়খ ইবরাহীম সেখানে পৌছে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করেন, অন্যদিকে ইউসুফ বারলাস এবং রাজা শত্রুজিতও পেছন দিকে শত্রুদের আক্রমণ করেন। উভয় দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে শত্রুরা পরাজিত হয়, সনাতন তাঁর অনুগামীদের ফেলে দুর্গ ছেড়ে পলায়ন করেন।[৪৭] ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে মীর আবদুর রাজ্জাক শিরাজীকে পান্ডু থানার থানাদার নিযুক্ত করা হয়। পান্ডু থানার অবস্থিতি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এটা ব্রহ্মপুত্রের বাম তীরে বর্তমান গৌহাটি থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। পান্ডুর পরেই ধরং-এর পশ্চিম দিকে পার্বত্য অঞ্চলে আঠারটি পার্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল, এই রাজ্যগুলির ভিতর দিয়ে গিরিপথ ছিল বলে এগুলিকে দুয়ার (বা দরজা বা গিরিপথ) নামে অভিহিত করা হত। আঠার দুয়ারের মধ্যে এগারটি ছিল বাংলাদেশ এবং গোয়ালপাড়ার সীমান্তে, বাকি সাতটি ছিল কামরূপ এবং ধরং জিলার উত্তরে। এই রাজ্যগুলি অনেক দিন অহোম রাজ্যের অধীনে ছিল; বিভিন্ন সূত্রে এগুলির বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়।[৪৮] এই রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল রাণী রাজা বা রাণী দুয়ার। মীর আবদুর রাজ্জাক পান্ডু থানার নিকটবর্তী রাণী দুয়ার আক্রমণ করেন; প্রথমে তিনি সফলতা লাভ করলেও ফিরে আসার সময় সন্ধ্যার সময় শত্রুরা তাঁদের এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করে যে মোগল সৈন্যরা অনেক হতাহত হয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে, মীর আবদুর রাজ্জাক নিজে মারাত্মকভাবে জখম হন। এই সংবাদ পেয়ে মীর আবদুল বাকী মিরযা নাথনকে রাণী দুয়ারের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মিরযা নাথন প্রথমে পান্ডু থানায় যান এবং সেখান থেকে দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে রাণী দুয়ারের দিকে অগ্রসর হন এবং তিন মঞ্জিল পার হয়ে গরাল[৪৯] নামক স্থানে দুর্গ তৈরি করে অবস্থান নেন। এদিকে পার্বত্য রাজারাও নিষ্ক্রিয় ছিলেন না, তাঁরা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অগ্রসর হন। তাঁরা হাটরাণী[৫০] নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন, কিন্তু সেখানে অল্পসংখ্যক সৈন্য রেখে পান্ডু থানা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন। তাঁরা জানতে পারেন যে মিরযা নাথন পান্ডু থানা রক্ষার সুব্যবস্থা না করেই তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়েছেন, তাই তাঁরা মিরযা নাথনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পেছন দিক দিয়ে পান্ডু থানা অধিকার করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তাঁদের এ পরিকল্পনার কথা মিরযা নাথন সময়মত জানতে পারেন, তাই তিনি আবার পান্ডু থানায় ফিরে যান এবং পান্ডুতেই উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। অনেক রক্তক্ষয়ের পরে মোগল বাহিনী জয়লাভ করে এবং শত্রুরা পালিয়ে যায়।

অতঃপর মিরযা নাথন রাণীহাট দুর্গ অধিকার করার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে দেখতে পান যে আর সম্মুখে যাওয়া সম্ভব নয়। একে তো পার্বত্য

Edited by Ripon Sarkar

এলাকায় জঙ্গলাকীর্ণ পথ, তার উপরে বর্ষাকালে (এটা ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকাল) পথ ঘাট কর্দমাক্ত; এমতাবস্থায় ঘোড়া এবং রসদ নিয়ে অগ্রসর হওয়ায় বিপদের ঝুঁকিও রয়েছে। তাই মিরযা নাথন তাঁর হাতি ও সৈন্যবাহিনীকে পাণ্ডু থানায় ফেরত পাঠান; তিনি ব্রহ্মপুত্রের বাঁধ কেটে দিয়ে সম্পূর্ণ এলাকা জলমগ্ন করেন, যাতে তাঁর নৌকাগুলি স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারে। মিরযা নাথন নিজে নৌবহর নিয়ে রাণীহাটের দিকে যাত্রা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে রাণীহাট দুর্গে পৌঁছে তিনি সৈন্যদের চার ভাগে বিভক্ত করে ব্যূহ রচনা করেন এবং আক্রমণ পরিচালনা করেন। এই দুর্গটি একটি সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ছিল এবং তিন দিকে অন্য তিনটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। শত্রুরা পাহাড়ের উপর থেকে আক্রমণ করায় মোগল সৈন্যদের বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু মোগল সৈন্যরা নৌকা থেকে নেমে প্রচণ্ড আক্রমণ করে। এই পাহাড়ের নিকটে একটি ছোট পাহাড় ছিল, রাজা পরীক্ষিতের জামাতা ডুমুরিয়ার ছেলে ডাঙ্গর দেব একদল সৈন্য নিয়ে এখানে পাহারা দিচ্ছিল। সরাইলের জমিদার সোনাগাজী একদল বাছা সৈন্য নিয়ে সেই পাহাড় আক্রমণ করে। ডাঙ্গর দেব পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মোগলরা এই পাহাড় থেকে আক্রমণ চালালে দুর্গস্থ বিদ্রোহীরা টিকতে না পেরে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। মোগলরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অনেক গ্রাম লুট করে, রাণী রাজার রাজধানী লুট করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। অনেক ধনরত্ন হস্তগত করে মোগল বাহিনী পাণ্ডু থানায় ফিরে আসে।[৫১] কাসিম খানের সুবাদারী আমলে কামরূপের বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিদ্রোহ দমন শেষ হওয়ার আগেই অল্প কয়েক মাস পরে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট কাসিম খানকে অপসারণ করে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

স্মরণীয় যে সুবাদার কাসিম খানই কামরূপের অশান্তির মূল কারণ। ইসলাম খানের মৃত্যুর আগে কামরূপ বিজয় সম্পূর্ণ হয় এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ আত্মসমর্পণ করেন; তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। কামরূপ মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু কাসিম খান কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিতকে বন্দী করলে এবং সম্রাটের দরবারে পাঠালে কামরূপের জনগণ এই সংবাদ পেয়ে বিদ্রোহ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় কামরূপে মোগল শাসকদের অত্যাচার বিশেষ করে রাজস্ব সংগ্রহকারীরা রায়তদের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কাসিম খানের সারা সুবাদারী আমলে মোগলরা অনেক যুদ্ধ করেও কামরূপে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারেনি। অনেক যুদ্ধ হয়েছে, অনেক লোক ও সম্পদ ক্ষয় হয়েছে, শত্রুরা বার বার পরাজিত হয়েছে, কিন্তু শত্রুদের নির্মূল করা বা শান্তির পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধ ইবরাহীম খানের সময়েও চলে, সেই কাহিনী পরে আলোচনা করা হবে।

কাছাড় যুদ্ধ

আগেই বলা হয়েছে যে ইসলাম খানের সময় কাছাড়ের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সিলেটের বায়েজীদ কররানী পরাজিত হওয়ার পরে ইসলাম খান শয়খ কামালকে কাছাড় জয় করতে পাঠান। সে সময় কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সময়ে শয়খ কামালের সহযোগী সেনাপতি ছিলেন মুবারিজ খান; শয়খ কামাল কামরূপের পরীক্ষিত নারায়ণের বিরুদ্ধে গমন করলে মুবারিজ খান সিলেটে সেনাপতি নিযুক্ত হন, মীরক

Edited by Ripon Sarkar

বাহাদুর জালাইর তাঁর সহকর্মী নিযুক্ত হন। ইতোমধ্যে কাছাড়ের রাজা মোগলদের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাহারের কোন প্রমাণ নেই। কাসিম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এলে মুবারিজ খান মনে করেন যে নতুন সুবাদারকে তাঁর কিছু কৃতিত্ব প্রদর্শন করা উচিত এবং এই উদ্দেশেই তিনি কাছাড়ের অধীনস্থ প্রতাপগড় দুর্গ অধিকার করার মনস্থ করেন।[৫২]

কাছাড় এবং সিলেটের মধ্যে একটি পার্বত্য উপজাতি বাস করত, বাহারিস্তানে এদের খাত্তা বলা হলেও মনে হয় এরা খাসিয়া উপজাতি। তারা স্বাধীন ছিল এবং তাদের একজন রাজা বা সরদার ছিল। খাসিয়া এবং কাছাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আরও একদল লোক বাস করত, তারা নিজেদের মোগল নামে পরিচয় দিত। তারা দাবি করে যে আমীর তৈমুর এখানে এই লোকদের রেখে স্বদেশে চলে যান, সে সময় থেকে তারা সেখানে বাস করতে থাকে, তারা কাছাড়ী ভাষা ব্যবহার করত, মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করত এবং কানে আধপোয়া বা একপোয়া ওজনের আংটি পরত। তাদের খাওয়া দাওয়ায় বাছ-বিচার ছিল না, যা পাওয়া যেত তাই তারা খেত। মুবারিজ খান প্রথমে তাদের আক্রমণ করেন এবং পরাজিত করে সেই এলাকা দখল করেন। তিনি তাদের কয়েকজনকে ধরে সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেন। কাসিম খান ধৃত ব্যক্তিদের সম্রাটের দরবারে পাঠান, ফলে মুবারিজ খান ও মীরক বাহাদুরের বীরত্বের সংবাদ সম্রাটের গোচরীভূত হওয়ার সুযোগ হয়। কাসিম খান খুশি হয়ে মুবারিজ খান ও তাঁর সহকর্মী মীরক বাহাদুর জালাইরকে সম্মানিত করেন এবং বিজিত এলাকা তাঁদের জায়গীররূপে দেয়া হয়। তাছাড়া, সুবাদার মুবারিজ খানকে কাছাড় আক্রমণেরও আদেশ দেন। মুবারিজ খান কাছাড়ের প্রধান দুর্গ আসুরিয়ানগর আক্রমণ করেন। অনেক যুদ্ধ হয়, প্রথমে মোগলরা সুবিধা করতে না পারলেও পরে আসুরিয়ানগর দুর্গ জয় করতে সমর্থ হয় এবং কাছাড়ের রাজা সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। তিনি প্রস্তাব দেন যে তাঁকে সুবাদারের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাধ্য করা না হলে তিনি (১) আসুরিয়া নগরের অধিকার মোগলদের হাতে ছেড়ে দেবেন, (২) চল্লিশটি হাতি, এক লক্ষ টাকা নগদ এবং মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য জিনিসপত্র সম্রাটের জন্য পাঠাবেন, (৩) পাঁচটি হাতি এবং বিশ হাজার টাকা নগদ সুবাদারের জন্য এবং (৪) দুটি হাতি ও বিশ হাজার টাকা নগদ মুবারিজ খান ও মীরক বাহাদুর জালাইর-এর জন্য দেবেন। এ প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয় এবং মুবারিজ খান আসুরিয়ানগরে একটি থানা স্থাপন করে কাছাড়ের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী, নগদ অর্থ ও হাতি নিয়ে সিলেটে চলে আসেন। পরে তিনি সম্রাট এবং সুবাদারের জন্য প্রদত্ত হাতি, নগদ টাকা ঢাকায় পাঠিয়ে দেন, সুবাদার সম্রাটের জন্য প্রদত্ত হাতি ও নগদ টাকা সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেন। মুবারিজ খানের সাফল্যে সুবাদার কাসিম খান অত্যন্ত প্রীত হন। কিছুদিন পরে মুবারিজ খানের মৃত্যু হয়, কিন্তু মীরক বাহাদুর জালাইর ভয়ে কাছাড় হাতছাড়া করে সিলেটে ফিরে আসেন। কাসিম খান মুবারিজ খানের স্থলে মুকাররম খানকে সিলেটের সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[৫৩] অতএব কাসিম খানের সুবাদারী আমলে কাছাড় বিজিত হলেও মীরক বাহাদুরের ভীরুতার ফলে কাছাড় হাতছাড়া হয়ে যায়, কাছাড়ের রাজা তাঁর স্বাধীনতা ফিরে পান এবং আরও অনেক দিন রাজত্ব করেন।

Edited by Ripon Sarkar

বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদারদের আত্মসমর্পণ

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ইসলাম খান ভাটি যাওয়ার প্রাক্কালে রাজমহল থেকে শয়খ কামালের নেতৃত্বে বীরভূম, পাচেট ও হিজলীর জমিদারদের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রেরণ করেন। বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাচেটের শামস খান ও হিজলীর সলীম খান আত্ম-সমর্পণ করেন এবং আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ ইসলাম খানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং হাতিসহ উপহারাদি দেন। কিন্তু কাসিম খান সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসার পরে তাঁরা নতুন সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেননি। ইতোমধ্যে হিজলীর সলীম খান মৃত্যুবরণ করায় তাঁর ভাইপো বাহাদুর খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কাসিম খান শয়খ কামালকে বীর হাম্বীর ও শামস খানের বিরুদ্ধে পাঠান, কিন্তু শয়খ কামালকে প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও কোন অতিরিক্ত সৈন্য দেননি। কাসিম খান মনে করেন যে শয়খ কামাল নিজ সৈন্যবাহিনী ও সম্পদ খরচ করে কর্তব্য সম্পাদন করবেন, বা কর্তব্য সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে অযোগ্য বিবেচিত হবেন। শয়খ কামালের প্রতি কাসিম খান বিরক্ত ছিলেন, তাই কাসিম খান শয়খ কামালের পতন কামনা করেন। শয়খ কামাল ছিলেন ইসলাম খানের ব্যক্তিগত অফিসার। ইসলাম খানের সুবাদারী আমলে তিনি অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং প্রায় প্রত্যেকটি অভিযানে তিনি নেতৃত্ব দেন এবং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কাসিম খান সুবাদার হয়ে এসে শয়খ কামালকে তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার[৫৪] হওয়ার প্রস্তাব দেন, কিন্তু শয়খ কামাল তা অগ্রাহ্য করেন এবং উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। কাসিম খান মনে করেন যে শয়খ কামাল পূর্ববর্তী আমলে তাঁর পদমর্যাদার জন্য কাসিম খানের ব্যক্তিগত অফিসার হতে অস্বীকার করেন। তাই কাসিম খান শয়খ কামালের দম্ভ খর্ব করার চেষ্টা করেন। শয়খ কামাল অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাবার জন্য কাসিম খানকে বারংবার সংবাদ পাঠালে সুবাদার তাঁর সাহায্যের জন্য পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য পাঠান। ঐ সময় ইফতিখার খানের[৫৫] ছেলে মিরযা মক্কী ছিলেন বর্ধমানের ফৌজদার, কাসিম খান মিরযা মক্কীকে লিখেন যে শয়খ কামালের উপস্থিতিতে তিনি যেন চিন্তা না করেন। তাঁকে আরও বলা হয় যে হিজলীর বাহাদুর খান এবং চন্দ্রকোণার[৫৬] বীরভান জমিদার সুবাদারের দরবারে আসতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁদের যেন জোর করে পাঠান হয়। এদিকে শয়খ কামাল উপরোক্ত প্রত্যেক জমিদারের বিরুদ্ধে যান এবং যুদ্ধে পরাজিত করে বা সদুপদেশ দিয়ে তাঁদের সুবাদারের দরবারে নিয়ে আসেন।[৫৭]

আসাম অভিযান

আসাম অভিযান সুবাদার কাসিম খানের একটি নতুন পরিকল্পনা, দুর্ভাগ্যবশত এ অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় এবং সেনাপতি সৈয়দ আবু বকর সহ অনেক সৈন্য এ অভিযানে প্রাণ ত্যাগ করে। কাসিম খান সৈয়দ আবু বকর নামক তাঁর একজন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিগত অফিসারকে আসাম অভিযানের জন্য নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে কাসিম খানের নিজের তিনশ অশ্বারোহী সৈন্য, দু হাজার বন্দুকধারী সৈন্য এবং তিনশ রণতরী ন্যস্ত করা হয়। তাছাড়া যে সকল মনসবদার দেড় হাজারের বেশি সৈন্যের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদেরও তাঁর অধীনে দেয়া হয়; তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা তোড়র মল্লের পৌত্র জগদেব, আল্লাহদাদ খান দখিনী, জামাল খান মঙ্গলী, ভূষণার জমিদার শত্রুজিত এবং লছমী রাজপুত। যাত্রার পূর্বে কাসিম খান সৈয়দ আবু বকরকে অনেক সদুপদেশ দেন; তাঁকে

Edited by Ripon Sarkar

প্রথমে কোচ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কামরূপে যেতে বলা হয় এবং কামরূপে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করে আসাম অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। তাঁকে আরও নির্দেশ দেয়া হয় তিনি যেন একটির পর একটি থানা স্থাপন করে সম্মুখে অগ্রসর হন, যাতে পেছন দিকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকে এবং রসদ সরবরাহে বিঘ্ন না হয়।[৫৮]

কাসিম খান কর্তৃক আসাম অভিযানের পরিকল্পনার যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না, কারণ আমরা উপরে দেখেছি যে কামরূপে তখনও শান্তি স্থাপিত হয়নি, বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধ চলছিল, এবং মোগল বাহিনী একদিকে বিদ্রোহীদের দমন করলে অন্যদিকে বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে, কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা একসঙ্গে মোগলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কামরূপের যুদ্ধ অবসান না করে আসাম অভিযান সামরিক দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ। যা হোক, কাসিম খান সৈয়দ আবু বকরকে কামরূপ অধিকার করার পরে আসাম অভিযানে যাওয়ার আদেশ দেয়ায় মনে হয় তিনিও বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেন, যদিও শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে যে কাসিম খানের সম্পূর্ণ পরিকল্পনাই ছিল ভুল, পরিকল্পনা বা সংগঠন কোন দিকে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল না। সৈয়দ আবু বকর যখন কামরূপ পর্যন্ত পৌছে গেছেন এবং কোন কোন সৈন্যদল রাঙ্গামাটির[৫৯] নিকটে পৌছেছে, তখন কাসিম খান সৈয়দ আবু বকরকে তাঁর সকল সৈন্য ও নৌবাহিনীসহ ঢাকায় ডেকে পাঠান। কারণ ইতোমধ্যে আরাকানের মগ রাজা ভুলুয়া আক্রমণ করে এবং তাঁকে বাধা দেয়ার মত শক্তি কাসিম খানের ছিল না। সৈয়দ আবু বকরের নিকট লিখিত কাসিম খানের চিঠিতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেনঃ 'কোচ রাজ্যের যে রাজা বিশৃঙ্খলার মূল কারণ; আবদুল বাকী, মিরযা নাথন এবং অন্যান্য সৈন্যদের চেষ্টায় সে রাজার দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়েছে। বিদ্রোহীরা পালিয়ে গেছে এবং তারা এখন কোথায় অবস্থান করছে কেউ জানে না। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমরা সে রাজ্য (কামরূপ) সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়েছি। এদিকে অভিশপ্ত মগেরা ধ্বংসলীলা শুরু করেছে। এই এলাকার (ঢাকা এলাকার) প্রতিরক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা না করে এখন আসামে অভিযান করা যুক্তিযুক্ত নয়। অভিশপ্ত মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য নৌবাহিনী সর্বাগ্রে প্রয়োজন। জমিদারদের রণতরীগুলি তোমার সঙ্গে পাঠান হয়েছে, সেগুলিসহ সকল মনসবদারকে আমার নিকট চলে আসার নির্দেশ দেয়া উচিত।'[৬০] এ আদেশ পেয়ে সৈয়দ আবু বকর সকল সৈন্য ও নৌবাহিনী নিয়ে মগদের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে মগরা পরাজিত হয়ে ফিরে যায় এবং মাঝপথেই কাসিম খান আবার আবু বকরকে আসাম অভিযানে যেতে নির্দেশ দেন। আবু বকর আবার কামরূপে ফিরে যান এবং সেখান থেকে সুবাদারকে জানান যে বর্ষাকালে কামরূপ ছেড়ে আসাম অভিযানে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই তিনি বর্ষাকাল কামরূপে কাটাবেন এবং কামরূপে থানা স্থাপন করে রাজস্ব আদায়ের জন্য করোরী নিযুক্ত করবেন এবং বর্ষাকাল শেষে আসামে যাবেন। তিনি নিজে হাজো দুর্গে অবস্থান নেন।[৬১] কিন্তু কাসিম খান তাঁকে হাজোতে থাকার অনুমতি দিলেন না; তিনি সাজাওয়াল পাঠিয়ে বর্ষাকালেই হাজো থেকে আসামের দিকে যাওয়ার জন্য সৈয়দ আবু বকরকে নির্দেশ দেন। যদিও আবু বকর দেরী করতে চেয়েছিলেন, কাসিম খানের কড়া নির্দেশে তাঁকে হাজো ছাড়তে হয় এবং তিনি আসামের পথে কোহহাতা[৬২] নামক স্থানে যান। এ স্থানটি আসাম এবং কামরূপের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। এখানে এসে সৈয়দ আবু বকর তাঁর বাহিনী পরিদর্শন করেন এবং কাসিম খানের নিকট তাঁর সৈন্যের অপ্রতুলতায়

Edited by Ripon Sarkar

কথা জানান। কাসিম খান সৈয়দ হাকিম ও সৈয়দ কাশু নামক দুই ভাইকে তাঁর সাহায্যার্থে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে পাঠান।[৬৩] কোহহাতায় সৈয়দ আবু বকর কিছুদিন অবস্থান করতে চান কিন্তু কাসিম খানের কড়া নির্দেশে তাঁকে সম্মুখ দিকে অগ্রসর হতে হয়। কলঙ্গ নদীর তীরে একটি চৌকি অধিকার করে তিনি আসামের রাজার পাট বা আবাসস্থল আক্রমণের জন্য অগ্রসর হন।[৬৪]

এদিকে অহোম রাজাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। ভরালী এবং ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত সমধারা দুর্গটি তিনি সুরক্ষিত করেন এবং হাতি বড়ুয়া, রাজখোয়া, খারঘোকা পুকন নামে তাঁর কয়েকজন সেনাপতিকে অনেক সৈন্যসামন্তসহ তিনি সমধারা দুর্গ রক্ষার আদেশ দিয়ে পাঠান। অহোম রাজের এই অফিসারদের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব ছিল। হাতি বড়ুয়া ছিল হাতি বাহিনীর অধ্যক্ষ। রাজখোয়া ছিলো তিন হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ, অহোম রাজের অধীনে এ রকম কয়েকজন রাজখোয়া ছিল। খারঘোকা পুকন ছিল গোলাবারুদ নির্মাণ বিভাগের অধ্যক্ষ। সৈয়দ আবু বকরও ভরালী নদীর তীরে এসে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। প্রথমে একটি নৌযুদ্ধ হয় এবং তাতে আসামের নৌবাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। কিন্তু মোগল সেনাপতি ভরালী দুর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় না করে বিশেষ অযোগ্যতার পরিচয় দেন, তাঁর দুর্গটি ছিল বালির তৈরি, তাছাড়া তিনি চতুর্দিকস্থ জংগল পরিষ্কার না করায় শত্রুদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখতে অসমর্থ হন। সৈয়দ আবু বকর ভরালী নদীর উপর পুল তৈরি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মোগল বাহিনী সারা দিন পরিশ্রম করে যতটুকু পুল তৈরি করে, রাত্রের পানির তোড়ে তা নষ্ট হয়ে যায়, সকালে আবার পুল তৈরির কাজ নতুন করে শুরু করতে হয়। এভাবে কয়েকদিন চেষ্টা করেও পুল তৈরি করা সম্ভব হল না। শত্রুরা সংবাদ পায় যে মোগল দুর্গটি বালির তৈরি হওয়ায় অত্যন্ত অরক্ষিত, বাতাস এবং বৃষ্টিতে দুর্গটি প্রতিনিয়তই নষ্ট হয়, তারা আরও জানতে পারে যে মোগল সৈন্যরা সম্পূর্ণ অবহেলায় দিন কাটাচ্ছে। সেনাপতির দুর্ব্যবহারে সৈন্যরাও মনোযোগ ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কাসিম খান কর্তৃক প্রেরিত সৈয়দ হাকিম ও সৈয়দ কাশু অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে পৌছুলে সৈয়দ আবু বকর তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখান এবং তাঁরাও দুর্গের বাইরে তাঁবুতে অবস্থান করতে থাকেন। শত্রুরা মোগল শিবিরের এই অব্যবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে; তারা মোগল দুর্গের চতুর্দিকে জঙ্গল পরিষ্কার করে দুর্গের পরিখার নিকটে পর্যন্ত তাদের আক্রমণের পথ পরিষ্কার করে নেয় এবং হঠাৎ করে এক রাত্রে মোগল দুর্গ আক্রমণ করে। শত্রুদের আক্রমণ এত তীব্র ছিল যে মোগল বাহিনী প্রস্তুত হওয়ার আগেই এক সঙ্গে সাতশ হাতি এবং তিন হাজার সৈন্য ক্ষিপ্রগতিতে দুর্গের ভিতর প্রবেশ করে। শত্রুরা দুর্গের ভিতরের প্রত্যেকটি শিবির আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয়, সেনাপতি সৈয়দ আবু বকরের শিবির আক্রমণ করলে তিনি খালি পায়ে খালি মাথায় শিবিরের বাইরে আসেন এবং সেনাপতির পরিচয় দেয়ার আগেই নিহত হন। সৈয়দ হাকিম এবং সৈয়দ কাশুর নেতৃত্বে যে সকল সৈন্য বাইরে অবস্থান করছিল তারা এ সংবাদ জানতে পেরে দুর্গে আসে কিন্তু দুর্গের ভিতরের অবস্থা দেখে বাইরে থাকাই নিরাপদ মনে করে। দুর্গের ভিতরের আল্লা খান দখিনী, জামাল খান মঙ্গলী এবং লছমী

Edited by Ripon Sarkar

রাজপুত কিছু সৈন্য নিয়ে কোন ক্রমে দুর্গের বাইরে এসে সৈয়দ হাকিম ও সৈয়দ কাশুর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু ইতোমধ্যে দুর্গের সমস্ত গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়ে যায় এবং হাতিগুলি শত্রুদের হস্তগত হয়।

এদিকে নদীতে শত্রুর নৌবাহনী মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করে, মোগল নৌ-সেনারা প্রস্তুত ছিল এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করে। প্রথম চোটে শত্রুর নৌ-সেনারা পরাজিত হয় এবং কয়েকটি নৌকা দখল করা হয়, কিন্তু মোগল নৌ-সেনারা যখন জানতে পারে যে দুর্গে তাঁদের সেনাপতি নিহত হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ স্থলবাহিনী পরাজিত হয়েছে, তারা হতবল হয়ে পড়ে এবং কিংবর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। শত্রুদের দ্বিতীয় আক্রমণে তাই মোগল নৌবাহিনীও পরাজিত হয় এবং অনেকেই আহত হয়ে পলায়ন করে। মোগল নৌ-সেনাপতি মীরন সৈয়দ মাসুদ কোনক্রমে রক্ষা পান। দুর্গ জয় করে এবং নৌ-বাহিনীকে পরাজিত করে এখন অহোম বাহিনী দুর্গের বাইরে অবস্থানরত মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করে। মোগল বাহিনী প্রতিআক্রমণ করে কিন্তু শত্রুরা সংখ্যায় এত অধিক ছিল এবং জয়ের পর জয়লাভ করে এত বীরত্বের সঙ্গে মোগলদের আক্রমণ করে যে মোগলরা টিকে থাকতে পারল না। অনেকেই হতাহত হয় এবং শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। রাজা শত্রুজিত আহত হয়ে কোনক্রমে নৌকা নিয়ে পলায়ন করে, ইলাহাদাদ দখিনী ছাড়া বাকি সেনাপতিরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেন। অন্যান্য সৈন্যরা বন্দী হয়। ইলাহাদাদ দখিনী তার পাঁচটি আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকলেও তাঁর নড়বার ক্ষমতা ছিল না, হয়ত তিনি বন্দী হন।[৬৫]

কামরূপের বুরঞ্জীতেও এ যুদ্ধের নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। অহোম রাজা প্রতাপ সিংহ তাঁর পরাজিত বাহিনীর সাহায্যার্থে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী পাঠান। আখেক গোহাক্রি নামে একজন সৈন্য মোগল শিবির থেকে পালিয়ে অহোম বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়। তার সাহায্যে অহোমরা সৈয়দ আবু বকরকে জলে স্থলে এক নৈশ আক্রমণ করে; সৈয়দ আবু বকর, ভগবান বখশী, গোকুল চাঁদ, জহির বেগ, মিরযা মক্কী, জামাল খান, ইলাহদাদ দখিনী নিহত হয়। রাজা জগদেব, গন্ধর্ব রায়, রাজা রায়, কালা রাজা, হর প্রতাপ সিংহ, ইন্দ্রমণি, নরসিংহ রায়, ভগবান রায় এবং করম চাঁদ বন্দী হয়। অহোমদের পক্ষে হাতি বড়ুয়া, শ্রীপাল বুরা, নুমল বুরা, লেছম হাজিকো এবং অন্য কয়েকজন নিহত হয়। এ বিজয়ের সংবাদ শুনে অহোম রাজা তাঁর অফিসারদের নির্দেশ দেন যেন বন্দীদের তাঁর নিকট নিয়ে আসা হয়, যেন তিনি মোগল পক্ষের আমীরদের চিনতে পারেন। কিন্তু তাঁর আদেশ পাওয়ার আগেই অফিসারেরা বন্দীদের হত্যা করে। রাজা রাগান্বিত হয়ে তাঁর চাচা চাওলাই কুনওয়ার ও অন্যান্য দায়ী অফিসারদের হত্যার আদেশ দেন এবং তিনজন গোহাক্রিকে তিরস্কার করেন। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও অহোমরা বারটি হাতি, নয়শ ঘোড়া এবং দুশ রণতরী হস্তগত করে।[৬৬]

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে মোগল পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিম্নরূপ। বিজয় লাভের পরে অহোমরা গুণে দেখে যে সতরশ মোগল সৈন্য নিহত হয়েছে। যেই সকল সৈন্য দু তিনটি জখম নিয়ে এদিক ওদিক পলায়ন করেছে তাদের সংখ্যা এর দ্বিগুণ এবং নয় হাজার সৈন্য অহোমদের হাতে বন্দী হয়। তিন হাজার লোক অর্ধমৃত অবস্থায় জঙ্গলে

Edited by Ripon Sarkar

আত্মগোপন করে পলায়নের চেষ্টা করে। বাংলার জমিদারদের মধ্যে রাজা রায় এবং নরসিংহ রায় দু তিনটি ক্ষত নিয়ে শত্রুদের হাতে বন্দী হয়। বাহরিস্তান-ই-গায়বী এবং কামরূপের বুরঞ্জীর তথ্য মিলে যায়, কামরূপের বুরঞ্জিতে মোগল নিহত সৈনিকদের নামে কিছু ভুল থাকতে পারে: বিশেষ করে মিরযা মক্কীর নামটা ভুল বলেই মনে হয় কারণ মিরযা মক্কীর এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কোন প্রমাণ নেই। আবার কামরূপের বুরঞ্জীর মতে হাতি বড়ুয়া প্রাণত্যাগ করে অথচ মিরযা নাথনের মতে হাতি বড়ুয়া মোগল সৈন্যদের অস্ত্র ত্যাগ করার আদেশ দেন। যা হোক, সামান্য গরমিল থাকলেও উভয় সূত্রেই যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং মোগলদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অতএব কাসিম খানের আসাম অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, এই অভিযানে সৈন্য ও নৌবাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। আহত রাজা শত্রুজিত কোনক্রমে একা হাজো গিয়ে এ দুঃসংবাদ হাজোতে নিযুক্ত সেনাপতি মিরযা ইউসুফ বারলাসের নিকট পৌঁছান। মিরযা ইউসুফ বারলাস এ সংবাদ আবদুল বাকী ও মিরযা নাথনকে অবহিত করেন এবং হাজো রক্ষার জন্য অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পারেন যে বিজয়ী অহোম রাজা তাঁর বিজয় সম্প্রসারিত করে হাজো পর্যন্ত আসবেন। আবদুল বাকী এবং মিরযা নাথন অল্প সময়ের মধ্যে হাজো আসেন, কিন্তু তখন তাঁদের কিছু করার ছিল না। তাঁরা শুধু আহত ও আত্মগোপনকারী মোগল সৈন্যদের জঙ্গল থেকে খুঁজে বের করার কাজে লিপ্ত হন। মিরযা নাথন চল্লিশখানি নৌকা নিয়ে আহতদের খোঁজে বের হন; নৌকায় তিনি রিলিফ সামগ্রী যেমন রান্না করা খাদ্য, তুলা, কাপড়, ভাঙ এবং আফিম নিতে ভুললেন না। তিনি কালঙ্গ নদীর মোহনা পর্যন্ত গিয়ে কারও খোঁজ পেলেন না, কিন্তু সেখানে পৌঁছে বাদ্য বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে আহতরা হামাগুড়ি দিয়ে আসছে। এভাবে তিনি নয়শ পঁয়ষট্টি জন আহত সৈন্য উদ্ধার করেন। তাদের ক্ষতের ব্যান্ডেজ করা হয়, খাবার দেয়া হয়, যারা ভাঙ বা আফিমে আসক্ত, তাদের ঐ জিনিস দেয়া হয় এবং প্রত্যেক পুরুষকে পরিধানের জন্য পাঁচ হাত করে এবং প্রত্যেক মহিলাকে দশ হাত করে কাপড় দেয়া হয়। তাদের কাছে মিরযা নাথন জানতে পারেন যে সঙ্গরী নামক গ্রামে আরও অনেক আহত সৈন্য আত্মগোপন করে আছে। নাথন সেখানে যান এবং সেখান থেকে আরও সাতশ ত্রিশ জন আহতকে উদ্ধার করেন।[৬৭] এতে বুঝা যায় আসাম যুদ্ধে মোগল বাহিনী কিরূপ পর্যুদস্ত হয়।

অহোমদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধের তারিখ ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে নির্ধারণ করা যায়। কাসিম খান ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন,[৬৮] এবং ঐ বছরের শেষ দিকে তিনি সৈয়দ আবু বকরকে আসাম অভিযানে পাঠান। সৈয়দ আবু বকর পরের বছর, অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালেও কামরূপের হাজোতে ছিলেন এবং বর্ষাকালেই আসাম অভিযানে যান। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে দেখা যায় যে যুদ্ধে পরাজয় এবং সৈয়দ আবু বকরের নিহত হওয়ার সংবাদ যখন হাজো পৌঁছে তখন মহরম মাসের প্রথম কয়েক তারিখ এবং নিশ্চিতভাবে দশ তারিখের পূর্বে। কারণ হাজোর থানাদার ইউসুফ বারলাস আবদুল বাকী ও মিরযা নাথনকে দশ তারিখের পূর্বে হাজোতে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাবার অনুরোধ করেন।[৬৯] ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মহরম মাস ২০শে জানুয়ারি শুরু হয়, অতএব জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

Edited by Ripon Sarkar

কাসিম খান যে একেবারে বিনা করণে অভিযান করেন তা বলা যায় না। কামরূপ বিজয়ের পরে মোগলরা আসামের সীমান্তে উপনীত হয় এবং সাধারণ সীমান্তে সীমান্ত বিরোধও প্রায় লেগে থাকে। অহোম বুরঞ্জীতে দেখা যায় যে সীমান্ত বিরোধ ছাড়াও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিরোধও কম ছিল না। মোগলরা প্রায় সময় অহোম সীমান্তে ঢুকে পড়ত। আসামের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি মোগলদের লোভ ছিল; গজদন্ত, মৃগনাভি, অগুরু, রেশম ইত্যাদি মূল্যবান দ্রব্যের ব্যবসা জমজমাট ছিল, প্রায় সময় এগুলির চোরাচালান হত এবং ফলে উভয় পক্ষে বাদানুবাদ হত। কিন্তু কাসিম খানের আসাম অভিযানের প্রধান কারণ ছিল তাঁর আগ্রাসন নীতি, তিনি তাঁর ভাই পূর্ববর্তী সুবাদার ইসলাম খানের আগ্রাসন নীতি অনুসরণ করেই আসাম অভিযানের পরিকল্পনা করেন। একটা নতুন রাজ্য জয় করে মোগল সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করে সম্রাটের নিকট নিজের গৌরব ও মর্যাদা বাড়াবার উদ্দেশ্যই এখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ভাই-এর পরিকল্পনা বা সংগঠন ক্ষমতা কোনটিই তাঁর ছিল না, কামরূপে শান্তি স্থাপিত হওয়ার পূর্বে আসামে অভিযান পরিচালনা করা ছিল বোকামি। তাছাড়া সেনাপতি নির্বাচনেও তিনি ভুল করেন। বাংলা এবং কামরূপের ভৌগোলিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত কোন ইম্পেরিয়্যাল অফিসারকে এ অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া উচিত ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার সৈয়দ আবু বকর এর আগে কোন অভিযানে নেতৃত্ব দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই আসাম অভিযানের ব্যর্থতার জন্য কাসিম খানকে দায়ী করা যায়।

মগ আক্রমণ প্রতিরোধ

মগ রাজার প্রথম আক্রমণ

আগে বলা হয়েছে যে ইসলাম খানের সময় ভুলুয়া অধিকৃত হয় এবং শয়খ আবদুল ওয়াহিদ ভুলুয়ার থানাদার নিযুক্ত হন। কাসিম খান সুবাদার হয়ে এলে বিভিন্ন থানার সেনাপতিগণ যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় আসেন, আবদুল ওয়াহিদও মনে করেন যে তাঁর সুবাদারের সঙ্গে দেখা করা উচিত। তাই তিনি ঢাকায় আসেন। ইতোপূর্বে তিনি তাঁর ছেলেকে ত্রিপুরা অভিযানে পাঠান, ফলে ভুলুয়ার শাসন ভার তিনি একজন মুৎসুদ্দীর (মুতসদ্দী বা হিসাবরক্ষক) হাতে দিয়ে আসেন। আরাকানের মগ রাজা এ সংবাদ পান, অর্থাৎ তিনি জানতে পারেন যে ভুলুয়ায় আবদুল ওয়াহিদ বা তাঁর ছেলে বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক নেই। তিনি ভুলুয়া আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং রণপোত, হাতি, গোলন্দাজ, অশ্বারোহী এবং পদাতিক সহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আরাকান ত্যাগ করে ভুলুয়ার দিকে যাত্রা করেন। আবদুল ওয়াহিদের মুৎসুদ্দী মগ আক্রমণের সংবাদ ঢাকায় আবদুল ওয়াহিদের নিকট পাঠান। আবদুল ওয়াহিদ এটা কাসিম খানকে জানিয়ে ভুলুয়া ফিরে যাবার অনুমতি চাইলে কাসিম খান প্রথমে বিশ্বাস করলেন না বরং মনে করেন যে আবদুল ওয়াহিদ ভুলুয়া ফিরে যাওয়ার জন্য অজুহাত খাড়া করেছেন। কিন্তু শ্রীপুর এবং বিক্রমপুরের থানাদারেরাও এই একই বিষয়ে সংবাদ পাঠালে কাসিম খান আবদুল ওয়াহিদকে ভুলুয়া ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেন। সঙ্গে সঙ্গে কাসিম খানও মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে ঢাকা থেকে লক্ষ্যা নদীর মোহনা খিজিরপুরে যান এবং খিজিরপুর থেকে ভুলুয়া পর্যন্ত সকল নদীতে ভাদিয়া ও পাতেলা নামক বড় বড় নৌকার সাহায্যে পুল তৈরি করার আদেশ দেন। তাছাড়া তিনি মগদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য বিভিন্ন থানা থেকে সেনাপতিদের

Edited by Ripon Sarkar

ডেকে পাঠান। প্রথমে আসাম অভিযানে প্রেরিত সৈয়দ আবু বকরকে সকল সৈন্য ও রণপোতসহ ভুলুয়া যাত্রা করার আদেশ দেন। অতঃপর তিনি শয়খ কামাল এবং মিরযা মক্কীকে ঢাকায় ডেকে পাঠান। সৈয়দ আবু বকর আদেশ পেয়ে কামরূপ থেকে চলে আসেন, কিন্তু অনেক দূরে থাকায় তাঁর আসতে সময় লাগে। শয়খ কামালও সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় যাত্রা করেন। মিরযা মক্কী অনেক হাতি ধরেছিলেন, তিনি সেগুলি সম্রাটের নিকট পাঠাবার জন্য সময় নেন এবং কিছু পরে ঢাকায় এসে পৌছেন। ইতোমধ্যে কাসিম খান তার ছেলে শয়খ ফরীদ ও তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার আবদুন নবীর অধীনে দু হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার বন্দুকধারী সৈন্য ভুলুয়ায় পাঠিয়ে দেন; শয়খ ফরীদকে এ অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। শয়খ কামাল ঢাকায় এলে কাসিম খান তাঁকে শয়খ ফরীদ ও আবদুন নবীর অধীনস্থ করে ভুলুয়ায় পাঠান। মিরযা মক্কী ঢাকায় পৌছলে তাঁকে একইভাবে ভুলুয়ায় যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়, কিন্তু মিরযা মক্কী শয়খ ফরীদ বা আবদুন নবীর অধীনস্থ হতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কাসিম খান নিজে মিরযা মক্কীর নিকট গিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেন কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়, উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ হয় এবং উভয়ে উভয়কে গালিগালাজ করে। মিরযা মক্কী অবশ্য পরে মত পরিবর্তন করে ভুলুয়া যেতে সম্মত হন। অনুরূপভাবে কাসিম খান মুকাররম খানকেও তাঁর ভাইদের নিয়ে ভুলুয়া যাত্রা করার আদেশ দেন; মুকাররম খান তখন সিলেটের থানাদার ছিলেন, তাঁকে কাওয়ালিয়াগড় বা কৈলাগড়ের[৭০] পথে ভুলুয়া যাওয়ার আদেশ দেয়া হয়। অতএব কাসিম খান মগদের সঙ্গে যুদ্ধে সবিশেষ গুরুত্ব দেন।

এদিকে আবদুল ওয়াহিদ ভুলুয়ায় ফিরে গিয়ে ভুলুয়া থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি তাঁর ছেলেকে ত্রিপুরা অভিযান বন্ধ করে ভুলুয়ায় ফিরে আসতে বলেন এবং তাঁর ছেলেও তাড়াতাড়ি ভুলুয়ায় ফিরে আসেন। আবদুল ওয়াহিদের ছেলে তাঁকে ভুলুয়া ত্যাগ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে লোকে মনে করবে যে তাঁরা দুর্বল এবং ভীরু। কিন্তু আবদুল ওয়াহিদ বলেন যে সকলের মঙ্গল কামনা করা তাঁর উচিত এবং পরিবার পরিজনকে নিরাপদ স্থানে পাঠালে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারবেন, কিন্তু সাহসী ছেলের নিকট এ অজুহাত গ্রহণযোগ্য হল না। ইতোমধ্যে সংবাদ আসে যে আরাকানের রাজা বড় ও ছোট ফেনী নদীদ্বয় পার হয়ে তিন লক্ষ সৈন্য এবং অনেক হাতি ও বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে ভুলুয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এই অবস্থায় আবদুল ওয়াহিদ সেনানায়কদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেন যে এই বিরাট বাহিনীর বিরুদ্ধে ভুলুয়ায় থাকা নিরাপদ নয়, তাঁরা ভুলুয়া ত্যাগ করে আসার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা মনে করেন যে মগ রাজা ভুলুয়া অধিকার করে ভুলুয়া ও ইসলামাবাদ[৭১] লুণ্ঠন করে ফিরেও যেতে পারেন।

অতএব মোগল সৈন্যরা ভুলুয়া ত্যাগ করে চলে আসে; মগ রাজা ভুলুয়া অধিকার করে ভুলুয়া ও ইসলামাবাদ লুণ্ঠন করেন এবং চারদিকে জ্বালিয়ে দেন, মগ সৈন্যরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং লুটতরাজ চালাতে থাকে। মগ রাজা ভুলুয়া অধিকার করে সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি মোগল সৈন্যদের ডাকাতিয়া খাল পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেলেন। ডাকাতিয়া খালে পৌছে আবদুল ওয়াহিদ সুবাদারের চিঠি পেলেন, কাসিম খান তাঁকে জানান যে স্থল ও নৌ-বাহিনী তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে এবং চিঠি পাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মালিক শয়খ মুসা, মুহাম্মদ খান এবং আরও কিছু সৈন্য তাঁর

Edited by Ripon Sarkar

নিকট পৌঁছে যান। কিন্তু আবদুল ওয়াহিদ তাতেও আশ্বস্ত হলেন না। তিনি ডাকাতিয়া খাল ছেড়ে মাজওয়া খালে এসে আশ্রয় নেয়ার কথা চিন্তা করেন। তিনি মনে করেন যে মাজওয়া খাল ছোট, সুতরাং সে খালে মগ রাজার বড় বড় রণপোতগুলি ঢুকতে পারবে না। কিন্তু আবদুল ওয়াহিদের ছেলে এবার পিতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন তাঁর পিতা বৃদ্ধ বয়সে বাঁচার চিন্তায় অস্থির হলেও তিনি আর একটুও নড়বেন না এবং আর কোন মোগল এলাকা শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেবেন না।

এদিকে আরাকানের রাজার শিবিরে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে, যার ফলে যুদ্ধের পরিস্থিতিই সম্পূর্ণ বদলে যায়। আক্রমণের সময় মগ রাজার সঙ্গে পর্তুগীজদের রণতরীও ছিল এবং মগ-ফিরিঙ্গী একযোগে এই অভিযান পরিচালনা করে। আরাকানের রাজার সঙ্গে ফিরিঙ্গীদের সদ্ভাব খুব কমই থাকত, কারণ পর্তুগীজ ফিরিঙ্গীরা ছিল লুটেরা এবং দস্যু। এই অভিযানের আগে মগ রাজা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছেন এবং অনেক প্রলোভন দেখিয়ে স্বপক্ষে আনয়ন করেন। মোগল সৈন্যরা ভুলুয়া ছেড়ে ডাকাতিয়ায় চলে গেলে মগ রাজা মনে করেন যে ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার এটা উপযুক্ত সময়। ফিরিঙ্গীরাও নৌকা ছেড়ে রাজার সঙ্গে স্থলপথে যুদ্ধ করতে আসে, এ সুযোগে রাজা ফিরিঙ্গীদের কয়েকজনকে বন্দী করেন। বন্দীদের মধ্যে ছিল ফিরিঙ্গী ক্যাপ্টেন করভেলোর ভাগিনা এবং আরও কয়েকজন। মগ রাজা ভাবলেন যে করভেলো যেহেতু তাঁর ভাগিনাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, সেহেতু ভাগিনার বিপদ হবে ভেবে করভেলো তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। করভেলো এই ঘটনা জানতে পেরে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। মগ রাজা তখন ডাকাতিয়া খালের সম্মুখে দুর্গে অবস্থান করছিলেন, তাঁর রণতরীগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রয়েছে। এ সুযোগে করভেলো মগ রণতরীগুলি আক্রমণ করে দখল করে নেন, সম্পদ লুট করেন এবং নৌ-সেনাদের বন্দী করেন। মগ রাজার অনেক কামান, গোলাগুলীও নৌকায় ছিল, সে সব নিয়ে করভেলো সন্দীপে গিয়ে তাঁর ভাই গঞ্জালভেসের সঙ্গে মিলিত হন।

এই সংবাদ পেয়ে আবদুল ওয়াহিদ ডাকাতিয়া নদী পার হয়ে শত্রুদের দুর্গ আক্রমণ করেন। শত্রুরা মনে করেছিল যে মোগল সৈন্যরা ঢাকার দিকে ফিরে গেছে এবং তাই তারা বেখেয়ালে এবং অসতর্ক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে মগেরা মোগল সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধে টিকতে পারল না। মগ রাজা নিজে দুর্গের বাইরে আসেন এবং আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পরাজিত হয়ে দলবল নিয়ে পলায়ন করেন। আবদুল ওয়াহিদ পলায়নরত মগ সৈন্যদের দুই ক্রোশ নদী পার করে দিলেন, শত্রুদের অনেক হাতি মোগলদের হস্তগত হয়, শত্রুদের অনেক সৈন্য হত হয় এবং পাঁচশ মগ সৈন্য বন্দী হয়।[৭২]

উপরোক্ত বিবরণ মির্যা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীর অনুসরণে দেয়া, পর্তুগীজ ঐতিহাসিক বোকারোর[৭৩] বিবরণেও এ সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায় বোকারোর বিবরণের সারাংশ[৭৪] "মগরাজা ৮০,০০০ সৈন্য (তাহার অনেকেই বন্দুকধারী) এবং দশ হাজার ঢাল-তরবারীধারী পাইক, ৭০০ রণহস্তী (যাহার পিঠে ছোট দুর্গের মত হাওদার ভিতর হইতে সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত) লইয়া স্থল পথে রওনা হন এবং ১৫০ জালিয়া নৌকা এবং ৫০ খানা বড় নৌকা, চারি সহস্র (জাহাজী)

Edited by Ripon Sarkar

সৈন্যসহ গঞ্জালভেসের সহিত যোগ দিতে পাঠান। তাহারা সমস্ত ভালুয়া রাজ্য (অর্থাৎ চাঁদপুর হইতে বড় ফেনী নদী পর্যন্ত) দখল করিল।.....তাহার পর গঞ্জালভেস মহাবিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মগ নৌ-কাপ্তেনদের নিজের জাহাজে ডাকিয়া আনিয়া খুন করিল, এবং তাহার পর অতর্কিত আক্রমণে নৌবাহিনী দখল করিয়া সমস্ত সম্পত্তিসহ সোনদ্বীপে নিয়া গেল। যেসব মগ কাপ্তেন তখনই মারা যায় নাই তাহাদের সোনদ্বীপে লইয়া গিয়া প্রকাশ্য নিলামে দাসরূপে বিক্রয় করিল। তাহার পর মুঘলরা ভালুয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিল, মগ সৈন্যদের একবার নয় কয়েকবার হারাইল এবং এমন হার হারাইয়া দিল যে মগ রাজার সঙ্গে যে অগণিত সৈন্যদল দেশ হইতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে এক হাজারেরও কম বাঁচিল এবং এগুলি মহাকষ্টে ত্রিপুরার জঙ্গলে আশ্রয় লইল। কিন্তু ত্রিপুরা যখন বিদ্রোহী হইয়া মগ প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া মগদের অনেক প্রধান ও সম্ভ্রান্ত লোকদের হত্যা করিল, রাজা হস্তীপৃষ্ঠে অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পালাইলেন। তিনি আরাকান নগরে পৌঁছিয়া গঞ্জালভেসের ভাগিনেয়কে শূলে দিলেন এবং আর সব পর্তুগীজ জামিনদেরও বধ করিলেন।"

মিরযা নাথন এবং বোকারোর বিবরণের মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যায়। প্রথম গরমিল মগ রাজার সৈন্য সম্পর্কে, মিরযা নাথন বলেন যে মগ রাজার সঙ্গে তিন লক্ষ পদাতিক সৈন্য, অসংখ্য হাতি এবং বিশাল নৌবহর ছিল, অন্যদিকে বোকারোর মতে আশি হাজার বন্দুকধারী ও দশ হাজার পদাতিক, মোট নব্বই হাজার সৈন্য, সাতশ হাতি, দুশ রণতরী এবং চার হাজার নৌযোদ্ধা ছিল। এখানে বোকারোর সংখ্যা গ্রহণযোগ্য। কারণ প্রথমত প্রাচ্য ঐতিহাসিকেরা সংখ্যা দেয়ার সময় অত্যুক্তি করার রেওয়াজ দেখা যায়। সাতশ হাতিকে মিরযা নাথন অসংখ্য বলেছেন, হাতির বেলায় সাতশ মোটেই কম নয়, একে অস..., বলায় নাথনকে দোষ দেয়া যায় না। রাজা যেখানে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সেখানে সৈন্যদের সঙ্গে বেসামরিক অনেক লোকও যে এসেছিল তাও বিবেচনার যোগ্য, তাই নাথন সৈন্যদের সংখ্যা তিন লক্ষ বলেছেন, কিন্তু প্রকৃত সামরিক লোকের সংখ্যা বোকারোর বিবরণেও অত্যুক্তি বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত যেখানে দুটি সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে কম সংখ্যা গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। মিরযা নাথন এবং বোকারোর মধ্যে প্রধান গরমিল রয়েছে বিশ্বাসঘাতকের প্রশ্নে; নাথনের মতে মগ রাজা ফিরিঙ্গীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, অন্যপক্ষে বোকারোর মতে, ফিরিঙ্গীরাই বিশ্বাসঘাতকতা করে। এই প্রশ্নে বোধ হয় মিরযা নাথনের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য, কারণ বোকারো নিজেও বলেন যে মগ রাজা আরাকানে গিয়ে গঞ্জালভেসের ভাগিনাকে শূলে দেন। সুতরাং মগ রাজা বিশ্বাসঘাতকতা না করলে গঞ্জালভেসের ভাগিনাকে কোথায় পেলেন, গঞ্জালভেস বিশ্বাসঘাতকতা করে মগ রাজার নৌবাহিনী হস্তগত ও ধ্বংস করলে মগ রাজার পক্ষে গঞ্জালভেসের ভাগিনাকে পাওয়ার অবকাশ ছিল না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে গঞ্জালভেস বিশ্বাসঘাতকতা না করলে বোকারো তাঁর স্বদেশী একজন পর্তুগীজের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ দিতেন না। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে জলদস্যু গঞ্জালভেস পর্তুগীজদের কাছেও নিন্দনীয় ছিল। মিরযা নাথনের মতে পর্তুগীজ কাপ্তেন যিনি আরাকানের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন, তাঁর নাম ডুরমিশ কারবালো (এন্টনিও কারভালহো) কিন্তু বোকারোর মতে গঞ্জালভেস আরাকানী নৌ-কাপ্তেনদের হত্যা করেন। এখানেও উভয়ের সাক্ষ্যে গরমিল রয়েছে।

Edited by Ripon Sarkar

এই মগ অভিযানের তারিখ ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর বা পরের বছরের প্রথমদিকে নির্ধারণ করা যায়। ভুলুয়া আক্রমণকারী আরাকানের এ মগ রাজার নাম মিন খামাউং, তাঁর মুসলমানী নাম হোসেন শাহ।[৭৫] তিনি ১৬১২ থেকে ১৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানে রাজত্ব করেন। মোগলরা তখন পর্যন্ত আরাকানের রাজ্যে আগ্রাসন করেনি; তবে অনন্ত মাণিক্যকে পরাজিত করে ভুলুয়া অধিকার করায় মোগল সাম্রাজ্য আরাকান রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ইসলাম খানের সময়ও আরাকানের রাজা দুবার আক্রমণ করেন। পরে দেখব যে এবারের পরেও মগ রাজা কাসিম খানের সময় আর একবার এবং পরে আরও কয়েকবার ভুলুয়া আক্রমণ করেন। এর কারণ এই যে কামতা, কামরূপ, আসাম সীমান্তে মোগল আগ্রাসনের সংবাদ মগ রাজা নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন এবং সম্ভবত তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে মোগলরা হয়ত তাঁর রাজ্যেও আগ্রাসন করবেন; সুলতানী আমলে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে বাংলার সুলতানদের সঙ্গে আরাকানের রাজার দীর্ঘদিন বিরোধ ছিল, চট্টগ্রামে মুসলিম বসতিও ছিল। সুতরাং চট্টগ্রাম অধিকারের জন্য মোগলরা চেষ্টিত হবে এটা প্রায় অনিবার্য এবং আরাকানের রাজা এ সম্ভাবনা নষ্ট করার জন্য আগে ভাগেই মোগল এলাকা ভুলুয়া জয় করার মনস্থ করেন বা মোগল এলাকা আক্রমণ করে মোগলদের ব্যতিব্যস্ত রাখার প্রয়াস পান।

যা হোক, অভাবিত কারণে মগ রাজার পরাজয় হলেও আবদুল ওয়াহিদ তাঁর কৃতিত্বের খবর সগৌরবে সুবাদার কাসিম খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং কাসিম খান সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁর ছেলে শয়খ ফরীদকে দিয়ে সম্রাটের নিকট এ বিজয় সংবাদ প্রেরণ করেন।[৭৬] সম্রাট সংবাদ পেয়ে মন্তব্য করেন যে অভিজ্ঞ রাজকীয় মনসবদারেরা কিছুই করতে পারেনি, অথচ মগ রাজাকে পরাজিত করল কাসিম খানের অল্প বয়স্ক ছেলে শয়খ ফরীদ? সম্রাট এক ফরমান জারি করে কাসিম খানকে তিরস্কার করে বলেন তিনি যেন সম্রাটের নিকট এরূপ মিথ্যা সংবাদ পাঠানো থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সম্রাট শয়খ আবদুল ওয়াহিদকে সরহদ খান উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। স্মরণ থাকতে পারে যে, কাসিম খান মিরযা মক্কীকে তাঁর ছেলে শয়খ ফরীদের অধীনে মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে আদেশ দেন, মিরযা মক্কী প্রথমে অস্বীকৃতি জানিয়ে কাসিম খানের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হলেও পরে যুদ্ধে যেতে সম্মত হন। মিরযা মক্কী বোধহয় এই বিষয়ে সম্রাটের দরবারে অভিযোগ করেন। সম্রাট মিরযা মক্কীকে মুরওওত খান উপাধি দেন এবং কাসিম খানকে তিরস্কার করে বলেন তিনি কোন্ অধিকারে মিরযা মক্কীকে তাঁর মর্যাদার হানিকর কাজ করতে আদেশ দেন? সম্রাট কাসিম খানকে আবারও পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন যে তাঁকে এই তৃতীয়বারের মত (কাসিম খানকে আগেও সতর্ক করা হয়, এটা পূর্বে আলোচিত হয়েছে) সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে এর পরে তিনি আর কারও প্রতি অসদাচরণ করলে তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে।[৭৭]

মগ রাজার দ্বিতীয় আক্রমণ

আগে বলা হয়েছে যে, মগ রাজা প্রথম ভুলুয়া অভিযানে পরাজিত হয়ে স্বদেশে ফিরে যান। মগ রাজার এ পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। তিনি আরাকানে ফিরে গিয়েও ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত থাকেন। পর্তুগীজ গঞ্জালভেস মগ রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠেন, ১৬১৫

Edited by Ripon Sarkar

খ্রিস্টাব্দের [illegible] মাসে গঞ্জালভেসের অনুরোধে গোয়ার পর্তুগীজ রাজকীয় নৌ-বাহিনী এসে আরাকান আক্রমণ করে কিন্তু গঞ্জালভেস সময়মত পৌঁছুতে না পারায় পর্তুগীজ নৌ-সেনাদের পক্ষে আরাকান রাজাকে পরাজিত করা সম্ভব হল না, বরং পর্তুগীজ কাপ্তান এই যুদ্ধে নিহত হয়। পর্তুগীজ নৌ-বাহিনী গোয়ায় ফিরে যায় এবং গঞ্জালভেসও সন্দ্বীপে নিষ্ক্রিয় থাকে। (১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজা সন্দ্বীপ অধিকার করেন, এর পর থেকে গঞ্জালভেস সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। কিন্তু এটা পরের কথা, এবং আমাদের এ আলোচনায় এর প্রাসঙ্গিকতা নেই)। পর্তুগীজদের আক্রমণ প্রতিহত করলে মগ রাজার অন্য শত্রু থাকে বার্মার রাজা। বার্মারাজ মহাধর্মরাজার (অনকপেতলুন ১৬০৫-১৬২৮ খ্রিঃ) সঙ্গে আরাকানের রাজার দীর্ঘ দিনের বিরোধ ছিল। কিন্তু এ সময় মগ রাজা আবার ভুলুয়া আক্রমণ করে তাঁর পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হন। তাই তিনি বার্মা রাজের সঙ্গে তাঁর বিরোধ মিটিয়ে ফেলেন[৭৮] এবং সীমান্ত সংঘর্ষ বন্ধ করতে উভয়ে প্রতিশ্রুত হন। এর পরে মগ রাজা ভুলুয়া আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নেন।

মগ রাজা সংবাদ নিয়ে জানতে পারেন যে সরহদ খানকে (শয়খ আবদুল ওয়াহিদ) সাহায্যের জন্য আগত সৈন্যরা ফিরে গেছে, তারা ঢাকায়ও নেই বরং অন্যান্য থানায় চলে গেছে। এ সংবাদ পেয়ে রাজা উৎফুল্ল হন এবং পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ভুলুয়া আক্রমণ করেন। এদিকে ভুলুয়ার থানাদার সরহদ খান পূর্বের বিজয়ে আত্মতুষ্ট হয়ে অবহেলায় দিন কাটাতে থাকেন। তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে মগ রাজা আবার আক্রমণ করবেন এবং মগ বাহিনী ভুলুয়ার নিকটে পৌঁছার পরেই তিনি জানতে পারেন যে তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি তখন নিরুপায়, বরং অসহায় বলা যেতে পারে, তাঁর নিজের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করার সাহস তাঁর ছিল না, অন্যদিকে সুবাদারের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে অতিরিক্ত সৈন্য আনার সময়ও ছিল না। এমতাবস্থায় তিনি আগের মত ভুলুয়া ছেড়ে সৈন্য সামন্ত ও পরিবার পরিজন নিয়ে ডাকাতিয়া খালের দিকে চলে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সুবাদারের নিকটও সংবাদ পাঠান। কাসিম খান তৎক্ষণাৎ দু হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার বন্দুকধারী সৈন্য, সাতশ রণতরী এবং একশ হাতিসহ আবদুন নবীকে সরহদ খানের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। সুবাদার নিজে খিজিরপুরে আসেন এবং নদীতে পুল তৈরি করার নির্দেশ দেন। তিনি বিভিন্ন স্থানে অবস্থানরত থানাদারদের সহসা ভুলুয়া যুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ডেকে পাঠান।

এদিকে মগ রাজা কোন "বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতার" দিকে লক্ষ্য না করে মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করার জন্য সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। সরহদ খানের পুত্র এবং মিরযা নূর-উদ-দীন[৭৯] এবং আরও কয়েকজন সাহসী বীর যোদ্ধা পলায়ন পর সরহদ খানকে থামান কিন্তু শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য কোন সুবিধাজনক স্থান পাওয়া গেল না। সরহদ খান পেছন দিকে চলে গেলেন কিন্তু অন্যান্য যোদ্ধারা সরহদ খানের সঙ্গে পরামর্শ না করে এবং সরহদ খানের জন্য অপেক্ষা না করে শত্রুদের সঙ্গে মুকাবিলা করে। প্রথমে সুবিধা করতে না পারলেও পরে মোগল সৈন্যরা শত্রুদের প্রতি এমন প্রচণ্ড আঘাত হানে যে মগ সৈন্যরা ক্রমশ বিভ্রান্ত হয়ে দুর্দশায় পতিত হয়। মগ বাহিনী পরাজিত হয় এবং পলায়নের সময় উচ্চ-নিচ স্থান পার্থক্য করতে না পেরে হঠাৎ এক জলায় গিয়ে পড়ে, জলাটি বর্ষার পানিতে পূর্ণ হয়ে সমুদ্রের আকার ধারণ করেছিল। মগ রাজা হোসেন ও তাঁর ভাগিনা ভাবলেনঃ "আমরা যখন আমাদের ভাইদের ও

Edited by Ripon Sarkar

সেনাধ্যক্ষদের নিয়ে হাতিতে চড়ে যাচ্ছি, আমরা সহজেই জলা পার হতে পারব, মোগল শাহী সৈন্যরা ঘোড়ায় চড়ে আসছে, তাই তারা জলায় আমাদের অনুসরণ করতে পারবে না।" এই মনে করে মগ রাজা হাতিগুলি পানিতে নামিয়ে দেন, কিন্তু সঠিক পথ অনুসরণ করতে না পেরে তারা বৃহৎ কর্দমাক্ত জলায় পড়ে যান। রাজার অনুগামী সৈন্যরা সেনাপতির অধীনে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে সঠিক পথ ধরে জলা অতিক্রম করে আরাকানে চলে যায়। রাজা সেই কর্দমাক্ত জলা থেকে মুক্ত হওয়ার আগেই সরহদ খান সসৈন্যে সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজাকে ঘিরে ফেলেন। অনেক মগ সৈন্য নিহত হয় এবং অনেকেই বন্দী হয়। নিহতের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ, তার দ্বিগুণ সংখ্যক লোক আহত ও অর্ধমৃত অবস্থায় বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। মোগল পক্ষেও শতাধিক লোক নিহত হয়।

রাত্রে বিজয়ী মোগল সৈন্যরা জলা অবরোধ করে রাখে এবং সতর্ক থাকে যেন একটি লোকও পালাতে না পারে। সরহদ খান ও তাঁর পুত্র পরামর্শ করে মগ রাজার নিকট নিম্নরূপ সংবাদ পাঠান : "আপনার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ ছিল না। ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্যকে পরাজিত করে আমরা ভুলুয়া অধিকার করি এবং আমরা আপনার রাজ্যে জোর করে প্রবেশ করিনি। ইসলাম খানের শাসনকাল থেকে এ পর্যন্ত আপনি আমাদের চারবার আক্রমণ করেছেন[৮৩] এবং প্রতিবার আপনার কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করেছেন। আপনি আবার অধৈর্য হয়ে আক্রমণ করতে ভুল করেননি, অনুগ্রহদানকারী আল্লাহ আপনাকে সর্বদা পরাজিত করেছেন, এবার তিনি আপনাকে এমন বিপদে ফেলেছেন যাতে আপনি ভাল করেই বুঝতে পারেন সঠিক পথ কি?" মগ রাজা বিনীতভাবে আবেদন জানিয়ে নিম্নরূপ সংবাদ পাঠান : "আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়, আমি আপনাকে পিতৃতুল্য মনে করি। যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন আমি নিজেকে আপনার বদান্যতা এবং অনুগ্রহের দ্বারা কেনা লোক বলে মনে করব। আপনার পুত্র মনে করে আপনি আমাকে মুক্তি দিন, আমি আমার সমস্ত হাতি, অস্ত্রশস্ত্র, ভৃত্য এবং সকল দ্রব্য আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি। এ ছাড়া অন্য আরও যা কিছু চাইবেন আমি আরাকান থেকে আপনার নিকট পাঠিয়ে দেব এবং তা (দ্রব্য সামগ্রী পাঠানো) আমার সারা জীবনের জন্য বাধ্যতামূলক রূপে গণ্য করব। (অর্থাৎ আমি সারা জীবন আপনার নিকট দ্রব্য সামগ্রী পাঠানোকে আমার কর্তব্য মনে করব) আমার জীবন ভিক্ষাকে আল্লাহর দয়া এবং আপনার বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে করব।" মগ রাজা দূতকেও সন্তুষ্ট করে ফেরত পাঠান। সকাল থেকে মধ্যরাত্র পর্যন্ত রাজা হাতির উপর এমন অবস্থায় ছিলেন যে এমন স্থান ছিল না যেখানে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারেন। দূত অত্যন্ত বিনীতভাবে রাজার তোষামোদপূর্ণ কথা সরহদ খান ও তাঁর ছেলের নিকট জানান। সন্ধির শর্তগুলি স্থির হওয়ার পরে দূত আবার রাজা ও তাঁর ভাগিনার নিকট গিয়ে বলেন: "সরহদ খান ও তাঁর পুত্র প্রকৃতপক্ষে তাঁর (রাজার) প্রস্তাবে রাজি হননি, আমরা তাঁদের অনেক কষ্টে নিম্নরূপ শর্তে রাজি করেছি। কেবলমাত্র রাজা একটি মাদী হাতিতে চড়ে আমাদের একটি পরিখার পাশ দিয়ে চলে যেতে পারেন, অন্যান্য সকল সেনানায়কসহ আলী মানিক (রাজার ভাগিনা), এবং অন্যান্য নেতা ও হাতি রেখে তিনি তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারেন।" নিরুপায় রাজা এটা তাঁর বাঁচার একমাত্র পথ মনে করে রাতের শেষ প্রহরে জলা থেকে বিরিয়ে আসেন এবং একটা মাদী হাতিতে চড়ে আরাকান চলে যান। রাজাকে পালিয়ে যেতে দেয়ার জন্য সরহদ খান সারারাত সতর্কতার ভান করে কাটান।

Edited by Ripon Sarkar

সকালে সরহদ খান সকল রাজকীয় হাতি, নিজের এবং সহকর্মীদের হাতি একত্রে সমাবেশ করেন। তিনি প্রত্যেক হাতিতে দু তিনজন বীর সৈন্য চড়িয়ে হাতির পিঠে বহন উপযোগী কামান নিয়ে জলাতে নামেন। আবদ্ধ মগ সৈন্যরা নিরাপত্তার জন্য বারবার অনুরোধ করায় তিনি তাদের জীবিত বন্দী করে আশ্রয় দেন। রাজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে রাজার ভাগিনা আলী মানিক বলেনঃ "আমাদের বন্দী হওয়ার জন্য সম্রাটের সৈন্যদের দয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে (মগ) সৈন্যদের যে দুটি দল জলার পাশ ও কোণ দিয়ে অতিক্রম করেছিল তাদের নিয়ে রাজা পালিয়ে গেছেন।" মোগলদের বিজয় সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয় এবং এটা সুবাদার কাসিম খানের নিকটও প্রেরণ করা হয়। সরহদ খান ভুলুয়ায় ফিরে যান এবং পলায়নপর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন না করে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন।

মির্যা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীর অনুসরণে মগ রাজার দ্বিতীয় ব্যর্থ ভুলুয়া অভিযান কাহিনী লিখিত হল। প্রকৃতপক্ষে বাহরিস্তান ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এ বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, এমনকি আরাকানী বা পর্তুগীজ সূত্রেও নয়। বাহরিস্তান-ই-গায়বীর মূল কথা, অর্থাৎ মগ রাজার আক্রমণ এবং পরাজয়ের কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু পূর্বের অভিযানে মগ রাজার সৈন্য সামন্ত, রণতরী বা হাতির যে বিশদ বিবরণ ও সংখ্যা দেয়া হয়েছে, এ অভিযানের বিবরণে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। মগ রাজা ও সৈন্যদের জলায় আটকে পড়ার কথাও বিশ্বাসযোগ্য, কারণ ভুলুয়া অঞ্চলে দুই ফেনী নদী, ডাকাতিয়া খাল ইত্যাদির মধ্যবর্তী স্থানে নিচু অঞ্চল এবং জলা এখনও দেখা যায়। এ যুদ্ধের তারিখ ১৬১৫ এবং ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী শীত মৌসুমে নিরূপণ করা যায়, শীত মৌসুমে জলা শুকিয়ে গেলেও কাদা থেকে যায়। সরহদ খান কর্তৃক আরাকানের রাজাকে বন্দী না করে ছেড়ে দেয়ার মধ্যে কিছু রহস্য আছে বলে মনে হয় এবং মির্যা নাথন এ বিষয়ে স্পষ্ট বক্তব্য রেখেছেন এবং সরহদ খানকে এজন্য অভিযুক্ত করেছেন। নাথন বলেনঃ "আরাকানের মত একটি রাজ্যের বিরুদ্ধে আল্লাহ সহজভাবে বিজয় দিয়েছেন, শুধু ঘোড়া চালিয়ে এটা অধিকার করা যেত এবং রাজাকে জীবিত বন্দী করে সাদা হাতি[৮১] সহ সম্রাটের দরবারে পাঠান যেত। জনগণ জানতে পারত যে একজন রাজা যিনি পুরুষানুক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, সম্রাটের একজন কর্মচারী তাঁকে পরাজিত করেছে। কিন্তু সরহদ খান সব সময় ব্যবসায়ী মন নিয়ে এবং ভীরুর মত ব্যবহার করেছেন এবং নগদ লাভের চেষ্টা করতেন। তাঁর উচিত ছিল আরও অধিক সাহস দেখানো, ফলে এই অভিযানের আনন্দ ও মহত্ত্ব অর্জিত হতে পারত। তাঁর এভাবে চিন্তা করা উচিত ছিল, 'আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে এমন একটি বিজয় সম্ভব হয়েছে, যে বিজয় সকল বিজয়ের মধ্যে প্রধানতম রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যদি অশ্বারোহী সৈন্যের কৌশলে আরাকানের মত একটি রাজ্য সম্রাটের অফিসারদের দ্বারা বিজিত হয়, ঘটনাটি (ইতিহাসে) চমৎকার রূপে লিপিবদ্ধ হত এবং আমার নামও যুগ যুগ ধরে ইতিহাস ও কাহিনীতে স্মরণীয় হত।' তিনি (সরহদ খান) এভাবে কাজ করেননি, তাই তিনি অখ্যাত হয়ে থাকেন।"[৮২]

Edited by Ripon Sarkar

মুখলিস খানকে দিওয়ান, বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ নিয়োগ

আগে বলা হয়েছে যে সুবাদার কাসিম খান বিভিন্ন সময় সুবা বাংলার বিভিন্ন উচ্চপদস্থ মনসবদারদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, এমনকি দিওয়ানের মত পদস্থ অফিসারকেও অপমান ও পর্যুদস্ত করেন। (স্মরণীয় যে, দিওয়ান সুবাদারের নিকট জবাবদিহি ছিল না) আরও বলা হয়েছে যে সম্রাট বিভিন্ন সময় বিশেষ দূত পাঠিয়ে কাসিম খানকে সদুপদেশ দেন, অফিসারদের সঙ্গে সদব্যবহারের পরামর্শ দেন, কাসিম খানের দুর্নীতি এবং অসত্য ভাষণের জন্য তিরস্কার করেন এবং এমনকি শাস্তির ভয়ও দেখান। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাসিম খান শিক্ষা লাভ করেননি, বাংলার অফিসারদের নিকট থেকে তাঁর দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার এবং ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট আবেদন এবং অভিযোগ যাওয়া বন্ধ হয়নি। শেষ পর্যন্ত সম্রাট সিদ্ধান্ত নেন যে বাংলার দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশের পদে একজন অতি উচ্চপদস্থ মনসবদার নিযুক্ত করবেন, যাঁর পদমর্যাদা কাসিম খানের সমকক্ষ হবে, এবং যিনি কথাবার্তায়, যুক্তিতর্কে, পরামর্শে কাসিম খানকে পরাভূত করতে পারবেন। সম্রাট এ যুগ্ম দায়িত্বের জন্য মুখলিস খানকে নিযুক্ত করেন।[৮৩] তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে সম্রাট বলেনঃ "বাংলার দিওয়ান হোসেন বেগ এবং বখশী তাহির (তাহির মুহাম্মদ খান) অনুমোদন লাভের যোগ্য কাজ না করায় মুখলিস খানকে এ সকল পদে নিযুক্ত করা হল। তিনি দরবারের একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা, আমি তাঁকে ২০০০/৭০০ মনসব দান করলাম এবং পতাকা দিলাম।"[৮৪] সম্রাট দিওয়ান হোসেন বেগ এবং বখশী তাহির মুহাম্মদের সঙ্গে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন এ কারণে যে তাঁরা সুবাদারের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেননি, দিওয়ান সুবাদার কর্তৃক অপমানিত হয়েও নীরব ছিলেন। সম্রাট মির্যা হোসেন বেগকে তিরস্কার করে বলেছিলেন যে রাজকীয় অফিসারদের অপমানিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ[৮৫] সম্রাট মুখলিস খানকে বাংলায় নিযুক্তি দিয়ে নিম্নরূপ উপদেশ দেনঃ "সাম্রাজ্যের কল্যাণের জন্য তোমাকে কাসিম খানের বাড়াবাড়ি বাধা দিতে হবে এবং নিজের কাজে মনোযোগী হতে হবে। যদি তুমি দেখ যে সে (কাসিম খান) সুবাদারীর উপযুক্ত নয়, এবং সে যদি জেদী এবং আহাম্মক হয়, তাহলে আমার নিকট আবেদন পাঠাবে, আমি তাকে অপসারণ করব এবং তার স্থলে অন্য লোক পাঠাব যে সুবাদারীতে চমক আনতে পারবে।"[৮৬] বাংলায় মুখলিস খান নিযুক্তি লাভ করেন ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, কাসিম খানের চট্টগ্রাম অভিযানে মুখলিস খানও যোগদান করেন।

কাসিম খানের আরাকান অভিযান

আরাকানের মগ রাজা কর্তৃক দুবার ভুলুয়া আক্রমণের কথা উপরে বলা হয়েছে, দুবার রাজা পরাজিত হয়ে ফিরে যান। এখন কাসিম খান নিজে আরাকান আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। তিনি স্মরণ করেন যে, সম্রাট তাঁকে আরাকানের সাদা হাতি ধরে আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও মনে করেন যে আরাকানের রাজাকে তাঁর ভুলুয়া আক্রমণের জন্য শাস্তি দেয়া উচিত। তিনি এ উদ্দেশে একটি পরামর্শ সভা ডাকেন, এই সভায় মুখলিস খান বলেনঃ "আরাকান অভিযানের ফলাফল যদি আসাম অভিযানের মত হয় (অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়) তাহলে ঢাকার বাইরে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। যদি আপনি (সুবাদার) নিজে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হন, তাহলে এটা হবে উত্তম পন্থা।" কাসিম খান এবং অন্যরাও এটা অনুমোদন করেন।

কাসিম খান আরকান অভিযানের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। তিনি আবদুন নবীকে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রবর্তী দলে পাঠান, তাঁর অধীনে অনেক মনসবদার ও উচ্চপদস্থ অফিসারকে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সরহদ খান, শয়খ কামাল, মিরযা নূর-উদ-দীন, মিরযা ইসফনদিয়ার, তাতার খান মিওয়াতী, শয়খ কুতুব, শয়খ কাসিম, শয়খ আফজাল (শেষোক্ত তিনজন শুজাত খান রুস্তম-উজ-জামানের ছেলে), মিরযা সাকী, মিরযা বাকী, জামাল খান, দৌরান খান, মিরযা বেগ, ইমাকান, এবং তুফান বাহাদুর। তাঁদের অধীনে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী, দুশ হাতি এবং এক হাজার রণতরী দেয়া হয়। সুবাদার কাসিম খান নিজেও যাত্রা করেন, তিনি প্রথমে খিজিরপুরে যান এবং সেখানে সাতদিন অবস্থান করেন, যাতে বিভিন্ন থানার সৈন্যরা এসে মিলিত হতে পারে। খিজিরপুর থেকে তিনি বন্দরে[৮৭] গিয়ে দু দিন দেরী করেন। এ সময়ের মধ্যে রাজকীয় বাহিনী নদী পার হয়ে যায়। সেখান থেকে তিনি কুচ করে ভুলুয়ার দিকে যাত্রা করেন। আবদুন নবী সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যদের নিয়ে ফেনী নদী পার হয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কাসিম খান ফেনী নদীর তীরে অবস্থান নেন এবং সেখানে থেকে অগ্রবর্তী দলকে উৎসাহিত করতে থাকেন এবং যুদ্ধের খোঁজ খবর নিতে থাকেন।

মোগল আক্রমণের সংবাদ মগ রাজার নিকট পৌঁছলে তিনিও বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন। মগ রাজার অধীনে চট্টগ্রামে একটি দুর্গ ছিল এবং এ দুর্গ ছিল অত্যন্ত সুরক্ষিত। দুর্গে পর্যাপ্ত সৈন্য এবং সাজ-সরঞ্জাম ছিল। কিন্তু মগ রাজা শত্রুরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত আসার আগে তাঁর মন্ত্রী কোরামগিরির (কোরাঙ্গী অধীনে এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য, এক হাজার রণতরী এবং চারশ হাতি দিয়ে সম্মুখ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। এ বাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে কাঠগড়[৮৮] নামক স্থানে পৌঁছে এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করে মোগলদের বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। মগ রাজা মিন খামৌঙ্গ (হোসেন শাহ) নিজে রাজধানী ম্রোহং (রোসাঙ্গ বা রখঙ্গ) থেকে দশ হাজার অশ্বারোহী, তিন . . পদাতিক এবং অসংখ্য রণতরী ও হাতি নিয়ে চট্টগ্রাম আসেন এবং চট্টগ্রাম দুর্গের রক্ষা ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করেন।

মোগল সেনাপতি আবদুন নবী গুপ্তচর মারফত নিম্নরূপ সংবাদ সংগ্রহ করেন। তিনি জানতে পারেন যে মগ বাহিনী চট্টগ্রাম থেকে অগ্রসর হয়ে কাঠগড়ে পৌঁছে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। দুর্গ নির্মাণ এখনও শেষ হয়নি, এ সময় মোগল বাহিনী আক্রমণ করলে কাঠগড় দুর্গ সহজেই জয় করা যাবে। আরও সংবাদ পাওয়া যায় যে রাজা তখনও চট্টগ্রামে এসে পৌঁছেননি। এ সংবাদ পেয়ে আবদুন নবী বিলম্ব না করে কাঠগড়ের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু মোগল সেনানায়কদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং আবদুন নবীর সেনাপতি নিযুক্ত হওয়া এ অন্তর্বিরোধের মূল কারণ। আবদুন নবী ছিলেন সুবাদার কাসিম খানের ব্যক্তিগত অফিসার, রাজকীয় মনসবদারেরা তাঁর অধীনস্থ হওয়াকে সহজে মেনে নিতে পারল না। স্মরণ করা যেতে পারে যে ইসলাম খানের সময়েও রাজকীয় মনসবদারেরা সুবাদারের ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনে যুদ্ধ করতে চাইত না, বুকাইনগরের যুদ্ধের সময় এ নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয় এবং কাছাড়ের যুদ্ধের সময় মনসবদারেরা এ বিষয়ে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করেন। সম্রাট রাজকীয় মনসবদারদের সুবাদারের ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনস্থ না করার জন্য ইসলাম খানকে নির্দেশ দেন। এ অভিযানের সময়ও

Edited by Ripon Sarkar

মনসবদারেরা আবদুন নবীর অধীনস্থ হয়ে অসন্তুষ্ট হন। বিশেষ করে সরহদ খান এবং শয়খ কামাল সম্পূর্ণ অবিবেচকের কাজ করেন এবং তাঁরা চান যেন মোগল বাহিনী জয় লাভ করতে পারে। আবদুন নবী ছিলেন অনভিজ্ঞ, সরহদ খান এবং শয়খ কামাল শুধু অভিজ্ঞই ছিলেন না, এ এলাকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে তাঁদের জানা ছিল। তাঁরা সদর রাস্তা ছেড়ে একটি ছোট রাস্তা দিয়ে আবদুন নবীকে কাঠগড়ে নিয়ে আসেন। যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং মোগল সৈন্যরা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মগ সৈন্যরাও সাহস প্রদর্শন করে এবং বিভিন্ন রকম অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মোগল সৈন্যদের বাধা দিতে থাকে। উভয় পক্ষে অনেক সৈন্য হতাহত হয়; দিনের শেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সময় মোগলরা যখন জয়লাভের আশা করছে এমন সময় সরহদ খানের পরামর্শে কয়েকজন মনসবদার বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধ বন্ধের পরামর্শ দেয়। তারা বলে যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় রাত্রে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না, যুদ্ধ এখন বন্ধ করা হোক, পরের দিন সকালে সহজে শত্রুর দুর্গ অধিকার করা যাবে। অনভিজ্ঞ আবদুন নবী তাদের পরামর্শ গ্রহণ করে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেন। পরের দিন যুদ্ধ আবার আরম্ভ হল, কিন্তু মোগলরা দুর্গ অধিকার করা যত সহজ মনে করেছিল, আসলে তত সহজ হল না। মধ্যাহ্নের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ করে দেখা গেল যে সরাসরি যুদ্ধে দুর্গ জয় করা সম্ভব নয়, তাই মোগলরা দুর্গের চতুর্দিকে পরিখা কেটে দুর্গ ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করে। কিন্তু দেখা গেল দুর্গের একদিকে পাহাড়, সুতরাং দুর্গ ঘিরে ফেলা সম্ভব হল না এবং দুর্গের অবরোধ চলতে থাকে।

ইতোমধ্যে সরহদ খান ও শয়খ কামাল সৈন্যদের রসদ আনার জন্য পেছনের দিকে যান এবং এ সময় মগ সেনাপতি কোরামগিরি দশ হাজার সৈন্য পাঠিয়ে মোগল সৈন্যদের পেছন দিকে খুঁটি গেড়ে বাঁশের বেড়া তৈরি করে এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। ফলে সরহদ খান ও শয়খ কামালের পক্ষে রসদ নিয়ে আসা সম্ভব হল না। এ দশ হাজার মগ সৈন্য আবদুন নবী ও সরহদ খান এবং শয়খ কামালের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। যদিও মোগল সৈন্যরা দুর্গের সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পরিখার আড়ালে থেকে শত্রুদের ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে, তাদের রসদ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আবদুন নবী এবং মনসবদারেরা রসদ পাঠাবার জন্য সরহদ খান ও শয়খ কামালের নিকট সংবাদ পাঠাতে থাকে, কিন্তু তারা বাঁশের বেড়া ভেদ করে রসদ পাঠাতে পারছে না। তখন আবদুন নবী এবং অন্যান্য সেনানায়করা এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। আলোচনা হয় যে বর্ষাকাল এখনও আসেনি, ইতোমধ্যেই রসদ বন্ধ হয়েছে, বর্ষাকালে যখন সকল পথ ঘাট বন্ধ হবে, তখন রসদ পাওয়াই যাবে না। যা সামান্য রসদ এখনও মওজুদ আছে, তাও শেষ হয়ে গেলে খাদ্যাভাবে লোক মরতে থাকবে। তখন এখান থেকে ফিরে যাওয়াও সম্ভব হবে না। তাই কাঠগড় অবরোধ ছেড়ে দিয়ে কাসিম খানের নিকট ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তারা সত্যিই ফিরে আসে। ইতোমধ্যে নিজামপুরের জমিদার মোগলদের নিকট আত্ম-সমর্পণ করেছিল, নিজামপুরও এখন তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মগ বাহিনী মোগলরা ফিরে আসার সময় পেছন দিক থেকে কিছুদূর তাড়া করে এবং ফিরে যায়। তবুও কামান ইত্যাদি ভারী সরঞ্জাম আনতে মোগলদের খুব বেগ পেতে হয়। বারুদ যাতে মগদের হাতে না যায় সে জন্য পাঁচশ মণ বারুদ পুড়ে দেয়া হয়। কাসিম খানের এ অভিযানের তারিখ ১৬১৬ এবং ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী শীতকালে নির্ধারণ করা যায়।

Edited by Ripon Sarkar

মোগল বাহিনী ফিরে আসার পরে সুবাদার কাসিম খান এবং দিওয়ান বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ মুখলিস খানের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। মুখলিস খান বলেন: "এই অভিযানের যখন পরিকল্পনা করা হয়, তখনই আমি বলেছিলাম যে আপনি নিজে অভিযান পরিচালনা না করলে এটা সফল হবে না, এবং মনসবদারেরা এই কথাতেই অভিযানে অংশ নেয়। সাত লক্ষ টাকা খরচ হল এবং এর কি ফল হল? বার্ষিক ছয়শ টাকা রাজস্ব প্রদানকারী নিজামপুর গ্রাম অধিকৃত হলেও তা ছেড়ে দেয়া হল। এখন আবার বলা হচ্ছে যে আগামী বছর আবার এ অভিযান পরিচালনা করা হবে। সম্রাটের আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত আমি এর জন্য (আগামী বছরের অভিযানের জন্য) আধা দামও[৮৯] মঞ্জুর করব না।" এ কথায় কাসিম খানের মেজাজ বিগড়ে যায়, তিনি ভীষণ রাগ করে মুখলিস খানের দিকে ঘুরে দাঁড়ান এবং তাঁকে অপমান করতে উদ্যত হন। মুখলিস খানের সেখানে উপস্থিত একজন সৈন্য তরবারিতে হাত লাগান কিন্তু কাসিম খানের লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাকে ধরে মারধর করে এবং মুখলিস খানকে অপমান করে। কাসিম খান বর্ষাকাল আসার আগেই ঢাকা চলে আসেন, মুখলিস খান এ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে সম্রাটের অবগতির জন্য পাঠান এবং নিজ কাজকর্ম ত্যাগ করে সময় কাটান। কাসিম খান পরে ক্ষমা চান কিন্তু তাতে কাজ হল না।[৯০] ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে (জানুয়ারি মাসে) কাসিম খানের ব্যর্থ আরাকান অভিযান পরিচালিত হয় এবং ঐ সালের বর্ষার আগে, অর্থাৎ মার্চ মাসের দিকে কাসিম খান ও মোগল বাহিনী ঢাকা ফিরে আসে।

কাসিম খান এবং মুখলিস খান উভয়ে তাঁদের স্ব-স্ব রিপোর্ট সম্রাটের দরবারে পাঠান। মুখলিস খানের রিপোর্ট পেয়ে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে কাসিম খানকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর স্থলে বিহারের সুবাদার ইবরাহীম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। কাসিম খানকে তাঁর কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করার জন্য দরবারে ডেকে পাঠান হয়। মুখলিস খান সুবাদারের সমান মর্যাদার অফিসার হয়েও তাঁর ভীরুতার জন্য অপমানিত হওয়ায় তাঁর জায়গীর ও মনসব হ্রাস করা হয়।[৯১] জাহাঙ্গীর তুজুকে বলেন যে বাংলা থেকে অনেকদিন ধরে কোন সুসংবাদ না পাওয়ায় তিনি বিহারের সুবাদার ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তিনি কাসিম খানকে দরবারে ডেকে পাঠান। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে সম্রাট কাসিম খানের পদচ্যুতি এবং ইবরাহিম খান ফতেহজঙ্গের নিযুক্তির আদেশ দেন।[৯২]

কাসিম খানের চরিত্র

কাসিম খানের বংশ পরিচয় আগে দেয়া হয়েছে, এরূপ অভিজাত বংশের ছেলে হয়েও তিনি উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন না। ইসলাম খানের ভাই হলেও তিনি ছিলেন ইসলাম খানের বিপরীত। কাসিম খানের সুবাদারী পর্যালোচনা করলে তাঁর চরিত্রের যে দিকটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হল চিশতী পরিবারের লোকদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। ইসলাম খান তাঁর শাসনামলে তাঁর নিজের পরিবারের লোক, যেমন তাঁর আপন ভাই এবং তাঁর আত্মীয় বা বন্ধু শয়খদের প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু কাসিম খান ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম খানের সঙ্গে যে তাঁর সদ্ভাব ছিল না, তা জাহাঙ্গীর নিজেই তুজুকে বলেছেন। কিন্তু কাসিম খান বাংলায় পৌঁছার আগেই শয়খ হুশাঙ (ইসলাম খানের ছেলে) যেভাবে তড়িঘড়ি করে বাংলা থেকে চলে যান, তাতে মনে হয় শয়খ হুশাঙও কাসিম খানের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। ইসলাম খানের ভাই শয়খ হাবিব-উল্লাহ ইসলাম খানের সময়

Eidited by Ripon Sarkar

থানাদার ছিলেন, তাঁর নাম কাসিম খানের সময়ে পাওয়া যায় না। ইসলাম খানের অন্যান্য ভাইয়েরা, যেমন শয়খ ফরীদ, শয়খ জামাল, এবং শয়খ ইউসুফ মক্কী, যাঁরা ইসলাম খানের সময় বাংলায় ছিলেন, তাঁদের নামও কাসিম খানের সময় পাওয়া যায় না। মুকাররম খান ছিলেন কাসিম খানের চাচাত ভাই-এর ছেলে এবং ইসলাম খানের জামাতা, কাসিম খান তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন, মুকাররম খানের ভাইদেরও কোন প্রাধান্য দেওয়ার প্রমাণ নেই। ইসলাম খানের ব্যক্তিগত অফিসার শয়খ কামাল যিনি অনেক যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গেও কাসিম খান দুর্ব্যবহার করেন। কাসিম খানের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন আবদুন নবী ও তাঁর ভাই আবদুল বাকী, তাঁদের কার্যকলাপের বিবরণ যা বাহরিস্তানে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় না যে তাঁরা তেমন যোগ্য লোক ছিলেন।

কাসিম খানের চরিত্রে আরও দেখা যায় যে তিনি অত্যন্ত রাগী, বদমেজাজী এবং হঠকারী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ অফিসারদের অনেকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাদের অপমান করেন। তিনি দিওয়ান হোসেন বেগ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়োগ করে এবং বলপ্রয়োগ করে এক কলঙ্কজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। দিওয়ান হোসেন বেগও একইভাবে বাধা দিলে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যেত। তিনি মির্যা নাথনের ঢাকাস্থ ঘরখানি দখল করে নেন, কারণ কামরূপে কাসিম খানের ব্যক্তিগত অফিসার আবদুল বাকীর সঙ্গে নাথনের কথা কাটাকাটি হয় এবং এ বিষয়ে আবদুল বাকী কাসিম খানের নিকট রিপোর্ট করেন। কাসিম খান মির্যা মক্কীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন কারণ মির্যা মক্কী কাসিম খানের অল্প বয়স্ক ছেলের অধীনে যুদ্ধে যেতে অস্বীকৃতি জানান। মুকাররম খান তাঁর নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কাসিম খান তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। কারণ মুকাররম খান পরাজিত কামরূপের রাজা পরীক্ষিতকে তাঁর দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য কাসিম খানের হাতে ছেড়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। মুকাররম খান আত্মীয়তার দোহাই দিয়েই কাসিম খানকে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুরোধ করেন। তবুও কাসিম খান ষড়যন্ত্র করে রাজা পরীক্ষিতকে রাজার মুকাররম খানের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেন। সুবাদারের পক্ষে এটা একটি অত্যন্ত অশোভন এবং গর্হিত কাজ। রাজা পরীক্ষিতকে হস্তগত করা যদি এতই প্রয়োজন মনে করা হয়, কাসিম খান বিষয়টি সম্রাটের গোচরে এনে এর সুরাহা করতে পারতেন, একজন সহকর্মী ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে জনসমক্ষে জোর খাটাবার প্রয়োজন ছিল না। শয়খ কামালের প্রতি কাসিম খানের দুর্ব্যবহার আরও লজ্জাকর ও হাস্যকর। শয়খ কামাল তাঁর অধীনে সচিবের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানালে কাসিম খান তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হন। এটা নিতান্তই একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু শয়খ কামালকে তিনি নিজে যুদ্ধে পাঠান, অথচ শয়খ কামালকে অপদস্থ করার জন্য তিনি শয়খ কামালকে যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে বিরত থাকেন। যুদ্ধে শয়খ কামাল জয়লাভ করতে না পারলে শয়খ কামাল অপদস্থ হতেন ঠিকই, কিন্তু সুবাদার হিসেবে সকল দায়িত্ব কাসিম খানের নিজের। সুতরাং শয়খ কামাল অপদস্থ হলে কাসিম খানের নিজের মর্যাদা কি বৃদ্ধি পেত? সকলের শেষে কাসিম খান দিওয়ান, বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ পদে এক সঙ্গে নিযুক্ত মুখলিস খানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে অপমান করেন, অথচ মুখলিস খান তাঁকে যুক্তিপূর্ণ কথা বলেন।

Edited by Ripon Sarkar

ওপমহ খানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও ছিল। মিরযা নাথন বলেন যে মুখলিস খান সম্রাটের নিকট কাসিম খান কর্তৃক রাজকীয় রাজস্ব নষ্ট করার অভিযোগ করেন।[১৩] সম্রাট যে সকল অফিসারকে যেমন, সাদত খান, ইবরাহীম কলাল এবং লাচলা, কাসিম খানকে সতর্ক করে দেয়ার জন্য এবং সদুপদেশ দেয়ার জন্য বাংলায় পাঠান। তাঁরা সকলে কাসিম খানের দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার এবং হঠকারিতা সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করেন।[১৪] কাসিম খান ইসলাম খানের সম্পদ নিজে দখল করেন এবং রাজকীয় রাজস্ব সম্রাটের নিকট পাঠাতেও বিরত থাকেন। ইবরাহীম কলাল সম্রাটের আদেশ অনুসারে ইসলাম খানের সম্পদ এবং রাজস্ব কাসিম খানের নিকট দাবি করেন। কাসিম খান প্রথমে ইবরাহীম কলালকে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে ফল না হওয়ায় কাসিম খান তাঁকে দু লক্ষ টাকা নগদ দেন এবং বাকি অর্থ পরে পাঠাবেন বলে বন্ড দেন।[১৫]

কাসিম খান যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যর্থতার পরিচয় দেন। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর ভাই ইসলাম খানের মত পরিকল্পনা এবং সাংগঠনিক শক্তি কোনটাই তাঁর ছিল না। কাসিম খানের সময়ে কামরূপে বিদ্রোহ দমনে যুদ্ধ তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। ইসলাম খানের সময় কামরূপ বিজয় সম্পন্ন হয় এবং রাজা পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করে ঢাকায় চলে আসেন। কামতার লক্ষ্মীনারায়ণ সর্বদা মোগলদের অনুগত ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাসিম খান তাঁকে ঢাকায় ডেকে নিয়ে এসে বিনা কারণে বন্দী করেন এবং পরীক্ষিতকেও আত্মসমর্পণের সময় মুকাররম খান কর্তৃক দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বন্দী করেন এবং উভয়কে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। এটা অত্যন্ত অবিবেচকের কাজ এবং এতে প্রমাণ হয় যে কাসিম খানের দূরদর্শিতার অভাব ছিল, এর কোন প্রয়োজন ছিল না। এর ফলেই কামরূপে সর্বাত্মক বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিদ্রোহ দমনের জন্য যেরূপ দৃঢ় ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজন ছিল তা নিতে কাসিম খান ব্যর্থ হন। তিনি কামরূপে একজন উচ্চপদস্থ সেনাপতিও পাঠাননি বরং তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার আবদুন নবীর ভাই আবদুল বাকীকে পাঠিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। এরূপ যুদ্ধ পরিচালনার মত যোগ্যতা আবদুল বাকীর ছিল না। ফলে কামরূপে যুদ্ধরত সেনানায়কদের মধ্যে মতানৈক্য লেগে থাকত। মিরযা নাথন ও আবদুল বাকীর মধ্যে প্রথমে মতানৈক্য থাকলেও পরে উভয়ে একমত হয়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি করেন কিন্তু তাও পর্যাপ্ত ছিল না। ফলে কাসিম খানের সুবাদারীর শেষ পর্যন্তও কামরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আসাম অভিযানেও কাসিম খান সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। এ অভিযানের জন্য যেরূপ পরিকল্পনা, সৈন্য সামন্ত ও সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োজন ছিল তার কিছুই তিনি করেননি, সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েই তিনি মনে করেন যে যুদ্ধ জয় হবে। কিন্তু এ বাহিনী পাঠিয়েও তিনি তাদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করেন যার ফলে তারা একাগ্রচিত্তে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে পারেননি। প্রথমে এ যুদ্ধের সেনাপতিকে কামরূপে গিয়ে এর শাসন ব্যবস্থা সংহত করার আদেশ দেন, আবার কামরূপে পৌঁছা মাত্র তাঁকে সকল সৈন্য ও নৌবাহিনী নিয়ে ভুলুয়া যুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ডেকে পাঠান হয়। আবার ভুলুয়া পৌঁছার আগেই তাঁকে পুনরায় কামরূপের ভেতর দিয়ে আসাম অভিযানে যেতে বলা হয়। ফলে প্রায় পুরো একটি বছর এ বাহিনীকে আসা যাওয়ার মধ্যে থাকতে হয়। আবার তারা কামরূপের হাজো এলাকায় বর্ষাকাল কাটাতে চাইলে কাসিম খান তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন এবং বর্ষাকালেই তাদের আসাম অভিযানে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এরূপ অস্থিরতার মধ্যেই সেনাপতি সৈয়দ আবু বকরকে

Edited by Ripon Sarkar

অহোমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তিনি কালাঙ নদীর মোহনায় পৌঁছে পুল নির্মাণ করতে বা শক্ত দুর্গ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হন। এ অভিযানেও কাসিম খান কোন উচ্চপদস্থ মনসবদার এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধাকে সেনাপতি নির্বাচন করেননি। আসামের পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধের জন্য সৈয়দ আবু বকর কতখানি উপযুক্ত ছিলেন তা প্রশ্নাতীত নয়। সৈয়দ আবু বকর বালির দ্বারা দুর্গ তৈরি করে কোনরূপ সতর্কতার ব্যবস্থা না করে দুর্গে ঘুমিয়ে থাকেন এবং শত্রুরা আক্রমণ করে ঘুমন্ত অবস্থায় সৈন্যদের কচুকাটা করে। এ হল কাসিম খানের এবং তাঁর সেনাপতি সৈয়দ আবু বকরের যুদ্ধের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির নমুনা। অথচ ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যায় সৈয়দ আবু বকরের সঙ্গে সৈন্য বা নৌবাহিনী বা হাতির সংখ্যা কম ছিল না। যে কোন অভিজ্ঞ সেনাপতির পক্ষে এ সংখ্যক যোদ্ধা নিয়ে যুদ্ধ জয় করা সম্ভব ছিল। আসাম অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় সেনাপতি সৈয়দ আবু বকর যেমন দায়ী, কাসিম খানও এ ব্যর্থতার জন্য অনুরূপভাবে দায়ী। সেনাপতি তাঁর জীবন দিয়ে ব্যর্থতার মূল্য পরিশোধ করেন, সুবাদার রাজধানীতে থাকায় তাঁর কোন ক্ষতি হল না।

মগ রাজা কর্তৃক ভুলুয়া আক্রমণের সময় কাসিম খান প্রথমে তাঁর অল্প বয়স্ক ছেলে শয়খ ফরীদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী পাঠান; একজন মনসবদার মিরযা মক্কী তাঁর ছেলের অধীনে যুদ্ধ করতে কাসিম খানের মুখের উপর অস্বীকৃতি জানান। অন্যান্য মনসবদারেরাও যে স্বেচ্ছায় বা সানন্দে যুদ্ধক্ষেত্রে যান তাও বলা যায় না। মগ-পর্তুগীজ বিরোধের ফলেই প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে মোগলরা জয়লাভ করে, অথচ কাসিম খান জয়লাভের কৃতিত্ব তাঁর ছেলের নামে আরোপ করে সম্রাটের নিকট সংবাদ দেন। এটা হাস্যকর এবং সম্রাটের দরবারেও হাসির উদ্রেক করে। সম্রাট মিথ্যা সংবাদ দেয়ার জন্য কাসিম খানকে তিরস্কার করেন এবং মনসবদারদের তাঁর ছেলের অধীনে যুদ্ধ করতে যাওয়ার আদেশ দেয়ার জন্য তাঁকে শাস্তির ভয় দেখান। সুবাদারের মত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের জন্য এরূপ কাজ অশোভন এবং সম্রাটের তিরস্কার পাওয়া অকল্পনীয়।

আরাকান অভিযানের ব্যর্থতার জন্য কাসিম খানকে দায়ী করা যায়। তিনি ফেনী নদী পর্যন্ত যান কিন্তু ২০/২৫ মাইলের মধ্যে কি ঘটছে তার খবরই রাখেননি। তিনি সতর্ক থাকলে সরহদ খান ও শয়খ কামালের বিশ্বাসঘাতকতা টের পেতেন এবং ব্যবস্থা নিতে পারতেন। দশ হাজার সৈন্যের প্রহরায় নির্মিত বাঁশের বেড়া তিনি অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে ভেঙ্গে দিতে পারতেন এবং শত্রুদের অতিক্রম করে রসদ পাঠাতে পারতেন। শুষ্ক মৌসুমে ২০/২৫ মাইল রাস্তায় রসদ পাঠানো কোন সমস্যাই ছিল না। মনে হয় তিনি ফেনী নদী পর্যন্ত গেলেও যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর রাখেননি। ২০/২৫ মাইলের মধ্যে তিনি দিন দিন খবরাখবর রাখতে পারতেন। ইসলাম খানের সময় এরূপ পরিস্থিতি অকল্পনীয় ছিল। ইসলাম খান প্রত্যেক যুদ্ধের দৈনন্দিন খবরাখবর রাখতেন, মাঝে মাঝেই অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতেন, এতে যুদ্ধরত সৈন্যদের উৎসাহ এবং মনোবল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ইসলাম খান মাঝে মাঝে বখশী বা অন্যান্য অফিসার পাঠিয়ে সৈন্য গুনতেন এবং সকল অফিসার ঠিকমত কাজ করছেন কিনা খবর নিতেন। কাসিম খান এরূপ কোন ব্যবস্থা নেন কিনা প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাহারিস্তান-ই-গায়বীতে আরাকান অভিযানের বিবরণ পাঠে মনে হয় কাসিম খান সবকিছু আবদুন নবীর উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন, অথচ আবদুন নবী তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার হওয়ায় রাজকীয়

Eidited by Ripon Sarkar

মনসবদারেরা তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা করেন; সরহদ খান ও শয়খ কামালের বিশ্বাসঘাতকতার কথা বাহরিস্তানেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই মনে হয় সেনাপতি হিসেবে কাসিম খান অযোগ্য ছিলেন, যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না।

অধস্তন অফিসারদের প্রতি কাসিম খানের দুর্ব্যবহার, অফিসারদের মধ্যে সমঝোতার অভাব, কাসিম খানের হঠকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে সম্রাট বারবার কাসিম খানকে সতর্ক করেন। শয়খ সলীম চিশতীর বংশের প্রতি সম্রাটের দুর্বলতা ছিল, সম্রাট কাসিম খানকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন যে তাঁর দুর্বলতা তাঁকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করবে না এবং কাসিম খান শাস্তি থেকে রেহাই পাবেন না। সম্রাট কাসিম খানকে শোধরাবার অনেক সুযোগ দেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। অবশেষে কাসিম খানের অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, দুর্ব্যবহার এবং অযোগ্যতা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সম্রাট তাঁকে পদচ্যুত করেন। কাসিম খানের শেষ অযোগ্যতা প্রমাণিত হয় আরাকান অভিযানে এবং শেষ দুর্ব্যবহার প্রকাশ পায় মুখলিস খানকে অপমান করায়। কাসিম খানের অযোগ্যতা এবাং ব্যর্থতা পর্যালোচনা করলে মনে হয় ইসলাম খান বাংলার ভূঁঞা-জমিদারদের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস না করলে কাসিম খানের আমলে বাংলা আবার মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারত।

১। মাসির-উল-উমারা, ২য়, পৃঃ ২৩৬। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এ তথ্যটি নেই। কিন্তু তুজুকে বলা হয়েছে যে সম্রাটের রাজত্বের ৫ম বর্ষে কাসিম খানের মনসব ১০০০/৫০০ থেকে জাত এবং সওয়ার উভয় ক্ষেত্রে ৫০০ করে বৃদ্ধি করা হয়। (তুজুক, ১ম, ১৭৬)।

২। মাসির-উল-উমারা, ২য়, ২৩৬; তুজুক, ২য়, ২০২।

৩। তুজুক, ১ম, ১৪৭-৪৮।

৪। ঐ, ১৭৬-৭৭।

৫। বাহরিস্তান, ১ম, ২৬৮-৬৯।

৬। কাসিম খান সুবাদার হয়ে আসার পরে মুবারিজ খান সিলেট থেকে এবং মীরক বাহাদুর জালাইর শ্রীপুর থেকে বিনা অনুমতিতে ঢাকায় আসেন। জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁরা বলেন যে সুবাদার ইসলাম খান তাঁদের মনসব বৃদ্ধি করেন, কিন্তু তাঁরা এখনও সে পরিমাণ জায়গীর পাননি। কাসিম খান তাঁদের ব্যাপারে সম্রাটকে জানান। অনুমতি ছাড়া ঢাকা আসার জন্য সম্রাট তাঁদের খান ও বাহাদুর উপাধি প্রত্যাহার করেন এবং আদেশ দেন যে তাঁরা যদি স্ব-স্ব থানায় ফিরে না যান, তাহলে বখশী যেন তাঁদের জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাঁদের বন্দী করেন। অবশ্য তাঁরা ফিরে যান এবং সুবাদার ও বখশীর সুপারিশে তাঁদের উপাধিও বহাল রাখা হয়। (বাহরিস্তান, ১ম, ২৭১-৭২)। এই কারণেই সুবাদার এবং দিওয়ানের মধ্যে বিরোধের সময় তাঁরা ঢাকায় ছিলেন এবং দিওয়ানের অপদস্থ হওয়া দেখেই তাঁরা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ থানায় ফিরে যান।

৭। অনিরায় সিংহদলনের প্রকৃত নাম অনুপ রায়। একবার বাঘ শিকারের সময় একটি বাঘ সম্রাটকে আক্রমণ করলে অনুপ রায় নিজের জীবন বিপন্ন করে বাঘটিকে হত্যা করেন এবং সম্রাটের জীবন রক্ষা করেন। সম্রাট খুশি হয়ে তাঁকে মনসব দেন এবং অনিরায় সিংহদলন উপাধি দেন। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, তুজুক, ১ম, ১৮৫-৮৮।

৮। ষষ্ঠ অধ্যায়, ১৪ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

৯। বাহরিস্তান, ১ম, ২৯৮।

Edited by Ripon Sarkar

১০। ঐ, ২৯০-৯৩।

১১। ঐ, ৩২৭।

১২। ঐ।

১৩। ঐ, ৩৪৩।

১৪। সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁদের মুক্তি দেয়ার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন করলে সম্রাট তাঁদের মুক্তি দেন। বাহরিস্তান, ২য়, ৫২১।

১৫। বাহরিস্তান, ১ম, ২৯৫-৯৬।

১৬। ঐ, ২৯৮-৯৯।

১৭। ঐ, ৩০৮-৩১০।

১৮। এই অপরাধের কথা কোথাও উল্লেখ নেই। ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মুর্খলিস খানকে বাংলার দিওয়ান, বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ পদে নিযুক্ত করার সময় জাহাঙ্গীর বলেন যে হোসেন বেগ দিওয়ান এবং তাহির বখশী বাংলায় সন্তুষ্ট হওয়ার মত কাজ করেননি, (তুজুক, ১ম, ৩০৬) এবং পরে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে ২৪ বা ২৫শে মার্চ ত.রিখে সম্রাট বলেন যে বাংলায় বখশী তাহির, যিনি কয়েকটি অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, তিনি তাঁর (সম্রাটের) সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পান (ঐ, ৩৭১)।

১৯। মুস্তাজির অর্থ revenue farmer. যারা নিলামে সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে সম্মত হয় তাদের মুস্তাজির বলা হয়। তারা সরকারকে নির্দিষ্ট অংকের রাজস্ব দিত, রায়তদের নিকট থেকে অতিরিক্ত আদায় করে নিজে রেখে দিত। ফলে মুস্তাজিরদের বেশি পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহের প্রবণতা থাকত এবং এটা ছিল রায়তদের স্বার্থের পরিপন্থী।

২০। খুন্তাঘাট পরগণা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত।

২১। বাহরিস্তান, ১ম, ২৭৪।

২২। তিনি ঐতিহাসিক আবুল ফজলের পৌত্র এবং আফজাল খানের পুত্র।

২৩। বাহরিস্তান, ১ম, ২৮৭-৮৯।

২৪। ঐ, ২৯০।

২৫। ঐ, ২৯৩। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ এবং রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে দিল্লীতে পাঠাবার কথা বাহরিস্তানে নেই, কিন্তু এ পুস্তকে পরে বলা হয়েছে যে সুবাদার ইবরাহীম খান উভয় রাজাকে বাংলায় ফেরত পাঠাবার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান, এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট উভয় রাজাকে মুক্তি দেন (বাহরিস্তান, ২য়, ৫২১)। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে বলা হয়েছে যে রাজা পরীক্ষিতের দুই মেয়ে এবং এক ছেলেকে ৯৩টি হাতিসহ সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয় (তুজুক, ১ম, ২৬৮-৬৯)।

২৬। বাহরিস্তান, ১ম, ২৯৩-৯৬।

২৭। গরঙ্গ বা গৌরাঙ্গ নদী, এটা ভুটান পর্বতমালা থেকে নির্গত হয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বুকানন বলেন যে এটা একটি সুন্দর ছোট নদী, শুকনা মৌসুমে ছোট নৌকা এবং বর্ষা মৌসুমে বড় নৌকা যাতায়াত করতে পারে। (মার্টিনঃ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, ৩৮৫।)

২৮। বিদ্রোহীদের একজন নেতা নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু মিরযা নাথন তাঁর নাম, দেননি; বাহরিস্তানে পরে বলা হয়েছে যে রাজা পরীক্ষিতের ভাই বলদেব রাজা উপাধি নেন।

২৯। বাহরিস্তান, ১ম, ৩০০-৩০১।

৩০। রাঙ্গামাটি শহর ও দুর্গ গদাধর নদী এবং ব্রহ্মপুত্রের সংযোগস্থলে জিলা থেকে ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

Edited by Ripon Sarkar

৩১। বাহরিস্তান, ১ম, ৩০২-৩০৪

৩২। ঐ, ৩০৪-৩০৭।

৩৩। ঐ, ৩১৫-৩১৮। দলগাঁও গোয়ালপাড়ার ধুবড়ি থানার গোলা আলমগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

৩৪। ঐ, ৩১৮-১৯।

৩৫। জয়গড়, রেনেলের ৫নং মানচিত্রের জয়গঙ্গা, এটা বৈহার বা বিহার থেকে ২৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

৩৬। বাহরিস্তান, ১ম, ৩২০-৩২২।

৩৭। পুতামারী, রেনেলের ৫নং মানচিত্রের পুতিমারীর সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যায়। পুতিমারী ধুবড়ির সাত আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

৩৮। এই পাহাড় খুন্তাঘাট এলাকার একটি অখ্যাত পাহাড় হতে পারে।

৩৯। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৪৮-৩৫১। গোয়ালপাড়া জেলার হাবরাঘাট মৌজায় ডাকুয়া নামক একটি স্থান আছে, এখানেই বোধ হয় ডাকুনিয়া দুর্গ নির্মিত হয়।

৪০। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৫১-৫২।

৪১। রাঙ্গামাটি খাতা গোয়ালপাড়া জেলায় খুন্তাঘাটের নিকটে অবস্থিত।

৪২। কামরূপের নলবাড়ির প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পাটিয়া কুচির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে হয়। বাহরিস্তান, ২য়, ৮৪১।

৪৩। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৬৫-৮২।

৪৪। ঐ, ৪০৩।

৪৫। ই. এ. গেইটঃ হিস্টরি অব আসাম, ৬৭-৬৯; ১০৭, ১১০, ১১৮। সাহ্বাবারি বা সাহবান বারি ধরং জেলার একটি মৌজা, এটা বড় নদী থেকে ৪ মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

৪৬। বাহরিস্তান, ১ম, ৪০৯-১০।

৪৭। ঐ, ৪১০-১১।

৪৮। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ই. এ. গেইটঃ হিস্টরি অব আসাম, পৃঃ ২২৯, ২৯৮, ৩১১, ৩৩৪; কামরূপের বুরঞ্জী, ১৮; মার্টিনঃ ইস্টার্ণ ইন্ডিয়া, ৩য় খণ্ড, ৬১৯-২২। আরও দেখুন বাহরিস্তান, ২য়, ৮৪৩, টীকা ৬।

৪৯। পরান আধুনিক গৌহাটি থানার রানী মৌজা, এটা পাণ্ডু থানার চার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত ছিল।

৫০। হাটরানী বা রানী হাট রানী মৌজার চার মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত।

৫১। বাহরিস্তান, ১ম, ৪১৪-৪১৭।

৫২। বাহরিস্তান, ১ম, ৩২৪; আইন-ই-আকবরীতে সিলেটের একটি মহালের নাম প্রতাপগড় (আইন, ২য়, ১৫২) আবার কাছাড় ও করিমগঞ্জ সীমান্তে একটি মৌজার নাম প্রতাপগড়, এ প্রতাপগড় বোধ হয় শেষোক্ত স্থানেই অবস্থিত ছিল। করিমগঞ্জ বর্তমানে ভারতের অংশে।

৫৩। বাহরিস্তান, ১ম, ৩২৪-২৭।

৫৪। শব্দটি পেশ-দস্ত বা ব্যক্তিগত ভৃত্য, কিন্তু শয়খ কামালকে অবশ্যই ভৃত্য হতে বলা হয়নি, তাঁকে ব্যক্তিগত অফিসারের পদ বা বর্তমানকালে প্রাইভেট সেক্রেটারী বা একান্ত সচিবের পদ দেয়া হয়।

৫৫। ইফতিখার খান খাজা উসমান আফগানের বিরুদ্ধে দৌলম্বপুরের যুদ্ধে নিহত হন। ইসলাম খানের সময়েই মিরযা মক্কী বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন।

৫৬। চন্দ্রকোণা বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায়, মেদিনীপুর শহরের আটাশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।

Edited by Ripon Sarkar

৫৭। বাহরিস্তান, ১ম, ৩২৭-২৮। এখানে মিরযা নাথনের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। তিনি বলেন শয়খ কামালকে পাঠাবার পরে কাসিম খান মিরযা মক্কীকে লিখেন যে তিনি যেন শয়খ কামালের উপস্থিতিতে বিরক্ত না হন এবং পূর্ব শান্তিতে নিজের কাজ সম্পন্ন করেন। এর অর্থ বোধ হয় এই যে শয়খ কামালকে বীরভূম বা পাচেটে যেতে হলে বর্ধমানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, তাই বোধ হয় সুবাদার তাঁকে জানান যে শয়খ কামালের উপস্থিতিতে তাঁর বিরক্ত হওয়ার কারণ নেই এবং তিনি বর্ধমানের ফৌজদার পদে বহাল থাকবেন। দ্বিতীয়ত, যদিও মিরযা নাথনের বক্তব্যে দেখা যায় যে শয়খ কামালকে বীরভূম ও পাচেটের বিরুদ্ধে পাঠান হয় এবং মিরযা মক্কীকে হিজলীর বাহাদুর খান ও চন্দ্রকোণার বীরভানকে ধরে আনার আদেশ দেয়া হয়, মিরযা নাথনের শেষ বক্তব্যে মনে হয় যে শয়খ কামালই বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাচেটের শামস খান, হিজলীর বাহাদুর খান সকলকে সুবাদারের নিকট নিয়ে আসেন। পরে দেখা যাবে যে মিরযা মক্কী চন্দ্রকোণার বীরভানকে আক্রমণ করে তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করেন, কিন্তু এ সময়ে কাসিম খানের পদচ্যুতি হয়েছে এবং ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ সুবাদার নিযুক্ত হয়েছেন।

৫৮। বাহরিস্তান, ১ম, ৩১৯।

৫৯। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে গদাধর নদীর সংযোগ স্থলের নিকটে অবস্থিত রাঙ্গামাটি দুর্গ।

৬০। ঐ, ৩৩০।

৬১। ঐ, ৩৪১-৪২।

৬২। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কোহহাতা বড় নদীর তীরের কাহার গ্রামের সঙ্গে অভিন্ন মনে করেন (মোগল নর্থ-ইস্ট ফ্রনটিয়ার পলিসি, ১৮০, টীকা), কিন্তু বাদশাহনামায় (২য় খণ্ড, ৮৯) কোহহাতার পরিচিতি নিম্নরূপঃ 'কোহহাতা শ্রীঘাট ও কজলীর মধ্যে উত্তরকূলে অবস্থিত। প্রাচীনকালে উক্ত ভূমিতে এটা একটি জনবহুল শহর ছিল।' কামরূপ জেলার ছোঁচা পাহাড়ের নিকটে কুলহাতি নামক একটি গ্রাম আছে এবং এর নিকটে মনাহকুচি নামে আর একটি গ্রাম আছে, শেষোক্ত গ্রামটি কয়েকটি রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় মনে হয় এককালে এটা একটি শহর ছিল। মনে হয় এ কুলহাতি গ্রামটিই মিরযা নাথনের কোহহাতার সঙ্গে অভিন্ন। আলোচনার জন্য দেখুন, বাহরিস্তান ২য়, ৮৩৯-৪০, টীকা নং ১৭।

৬৩। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৫৩।

৬৪। ঐ, ৩৬৪।

৬৫। ঐ, ৩৯৫-৯৮।

৬৬। কামরূপের বুরুঞ্জী, ১৪-১৮, ১০৪, ১০৫।

৬৭। বাহরিস্তান, ১ম, ৪০০, ৪০২।

৬৮। আগেই বলা হয়েছে যে কাসিম খান ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই মে তারিখে ঢাকা পৌঁছেন।

৬৯। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৯২।

৭০। কৈলাগড় বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় কসবা নামে পরিচিত, কুমিল্লা-আখাউড়া রেলপথে এটা একটি রেল স্টেশন। কৈলাগড় বা আধুনিক কসবা মোগলদের অধীনে ছিল কিনা তার কোন প্রমাণ নেই, যদি এটা ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে থাকে তাহলে মুকাররম খানকে কৈলাগড়ের রাস্তায় আসতে বলার কি কারণ থাকতে পারে? মনে হয় এ আদেশ দ্বারা কাসিম খান মুকাররম খানকে মেঘনার পূর্ব তীর দিয়ে আসার কথা বলেন।

৭১। এই ইসলামাবাদ চট্টগ্রাম নয়, চট্টগ্রামের নাম ইসলামাবাদ হয় আরও অনেক পরে। ইসলামাবাদ আধুনিক লক্ষীপুরের নিকটস্থ কোন স্থান হবে।

৭২। বাহরিস্তান, ১ম, ৩২৯-৩৩৫।

৭৩। বোকারোর বিবরণের জন্য দেখুন, এ. পি. ফেয়ারঃ হিস্টরি অব বার্মা, ১৭৫; স্টুয়ার্টঃ হিস্টরি অব বেঙ্গল, ১৩৭-৩৮; ক্যাম্পসঃ হিস্টরি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, ৮৭; প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৯, ৬৬৬-৬৭।

Edited by Ripon Sarkar

৭৪। প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৯, পৃঃ ৬৬৬-৬৭।

৭৫। আরাকানের রাজাদের মুসলমানী নাম সম্পর্কে দেখুন, আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ১ম সংস্করণ, ৩০৭, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ভল্যুম ৩১, নং ১, জুন, ১৯৮৬, ১২-১৩, টীকা ৮।

৭৬। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৩৫।

৭৭। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৭৪-৭৭।

৭৮। এ. পি. ফেয়ারঃ হিস্টরি অব বার্মা, ১৭৬-৭৭; হার্ভেঃ হিস্টরি অব বার্মা, ১৮৯।

৭৯। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মিরযা নূর-উদ-দীনকে সরহদ খানের পুত্র মনে করেছেন (এইচ.বি. ২য়, ২৯৪) কিন্তু এটা সত্য নয়। সরহদ খানের পুত্র এবং মিরযা নূর-উদ-দীনের নাম লেখার মধ্যে একটি কমা আছে। (বাহরিস্তান, ১ম, ৩৮৪)। তাছাড়া সুধীন্দ্র বাবু লক্ষ্য করেননি যে সরহদ খানের পুত্র একজন শয়খ, কিন্তু নূর-উদ-দীন একজন মিরযা। এই মিরযা-নূর-উদ-দীন এবং পরবর্তী সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সময় ত্রিপুরা বিজেতা মিরযা নূর-উদ-দীন একই ব্যক্তি হবেন।

৮০। ইসলাম খানের সময় আক্রমণ করেছিলেন, মিন খামাউঙ বা হোসেন শাহের পিতা মিন রাজগী বা সলিম শাহ। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৮৩-৮৭।

৮১। সাদা হাতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দশম অধ্যায় ২২নং টীকা দেখুন।

৮২। বাহরিস্তান, ১ম, ৩৮৭।

৮৩। ঐ, ৩৭৭।

৮৪। তুযুক, ১ম, ৩০৬।

৮৫। বাহরিস্তান, ১ম, ৩০৯।

৮৬। ঐ, ৩৭৭।

৮৭। বর্তমান নারায়ণগঞ্জ শহরের অদূরে এবং বিপরীতে বন্দর অবস্থিত।

৮৮। স্যার যদুনাথ সরকার কাঠগড়কে কথের পড়েন (প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৯, ৬৬৮) কিন্তু নামটি কাঠগড় বা কাঠের নির্মিত গড় বা দুর্গ। এটা চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত, নামটি এখনও বর্তমান, এবং বর্তমান সীতাকুণ্ড ও বারবাকুণ্ড রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। চট্টগ্রামে কাঠগড় নাম আরও কয়েকটি স্থান আছে, এমনকি চট্টগ্রাম শহরেও কাঠগড় নামে একটি স্থান আছে (আব্দুল হক চৌধুরীঃ শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, ৮২, ১২০, ১৪৬)। চট্টগ্রামে পাথরের অভাব থাকায় কাঠের নির্মিত দুর্গের আধিক্য দেখা যায়।

৮৯। দাম মোগল আমলের তাম্র মুদ্রা, চল্লিশ দামে এক টাকা হত।

৯০। বাহরিস্তান, ১ম, ৪০৪-৪০৯।

৯১। ঐ, ৪১৯-২০।

৯২। তুযুক, ১ম, ৩৭৩। এখানে জাহাঙ্গীর কাসিম খানকে বরখাস্ত করার কথা বলেননি, কিন্তু পরে এক স্থানে কাসিম খানকে বাংলার সুবাদার পদ থেকে বরখাস্ত করার কথা বলেছেন। তুযুক, ২য়, ৫০।

৯৩। বাহরিস্তান, ১ম, ৪১৯।

৯৪। ঐ, ৩৭৭।

৯৫। ঐ, ৩১০।

Edited by Ripon Sarkar

নবম অধ্যায়

সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজংগ কামরূপের বিদ্রোহ দমন

ইবরাহীম খান ছিলেন মিরযা গিয়াস বেগ ইতমাদ-উদ-দৌলার পুত্র এবং সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের ভাই। প্রথমে তিনি আহমদাবাদের বখশী এবং ইতিহাসের দলীল সংরক্ষণ নিযুক্ত হন।[১] তাঁর মনসব ছিল ৭০০/৩০০, কিন্তু ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে ১৫০০/৬০০-তে উন্নীত করা হয় এবং তাঁকে খাজা আবুল হাসানের সঙ্গে যুগ্মভাবে প্রাসাদের বখশী নিযুক্ত করা হয়।[২] এর পর থেকে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকেন এবং পরের বছর অর্থাৎ ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে যফর খানের স্থলে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর মনসব ২৫০০/২০০০ এ উন্নীত করা হয়।[৩] ইবরাহীম খান বিহারের কোকরাদেশ[৪] জয় করে হীরক খনি হস্তগত করেন এবং বহু মূল্যের হীরক সম্রাটের নিকট পাঠান। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য সম্রাট তাঁকে ফতেহজঙ্গ উপাধি দেন এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে ৪০০০/৪০০০ এ উন্নীত করা হয়।[৫] ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাসিম খানকে পদচ্যুত করে সম্রাট ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইবরাহীম খানের বড় বোন মেহের-উন-নিসাকে বিয়ে করেন, পরে যাঁর উপাধি হয় প্রথমে নূর মহল ও পরে নূর জাহান। সম্রাট তাঁর প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে তিনি নূর জাহানকে জীবন সাথী করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে শাসন সাথীও করে নেন। দেশ শাসন ব্যাপারে নূর জাহানচক্র প্রাধান্য লাভ করে। এ সময়ই ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকেন, কিন্তু তাঁর উন্নতির প্রধান কারণ তাঁর দক্ষতা, সাহস এবং চারিত্রিক গুণাবলী। তিনি একদিকে যেমন সুদক্ষ শাসক ও সৈনিক ছিলেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মানবিক গুণের অধিকারীও ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন ব্যক্তিগত বা চারিত্রিক দোষের প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্রাটের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ও আনুগত্য ছিল। সম্রাট তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করেন।

ইবরাহীম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার সঙ্গে সঙ্গে কুলীজ খানকে কোচ রাজ্য বা কামতা-কামরূপের সেনাপতি ও জায়গীরদার নিযুক্ত করা হয়।[৬] ইবরাহীম খান এবং কুলীজ খান উভয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন এবং তেলিয়াগড় এসে পৌঁছেন। এদিকে কাসিম খান পদচ্যুতির আদেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছেড়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রথমে বাংলায় তাঁর সময়ে প্রাপ্ত সকল হাতি তাঁর শ্যালক জামাল খান, তাঁর বখশী মুসা খান এবং আর একজন সেনানায়ক বাহাদুর খানের অধীনে রাজমহলের দিকে পাঠিয়ে দেন। তাদের সঙ্গে ইসলাম খানের এবং তাঁর নিজের সময়ের সকল কামান, বন্দুকও দেয়া হয় এবং তাঁদের অধীনে তিন হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্যও দেয়া হয়। কাসিম খান তাঁদের ঘোড়াঘাট হয়ে অর্থাৎ স্থলপথে রাজমহল যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে রণতরীসহ ছোট বড় সকল

Edited by Ripon Sarkar

জমিদারকে সঙ্গে নেন এবং সকল বারুদ ও সীসাও নিয়ে যান; অনেক মনসবদারকেও তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য করা হয়। কাসিম খান নিজে নদীপথে রওয়ানা হন।[৭]

শুধু তাই নয়, কাসিম খান তাঁর ব্যক্তিগত অফিসার আবদুল বাকীকে কামরূপ থেকে চলে আসার নির্দেশ দেন। তিনি আবদুল বাকীকে নিম্নরূপ পত্র লিখেন। "কোচ বিহারে মিরযা নাথন রাজকীয় সর্বোচ্চ মর্যাদার অফিসার, তাঁর হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সকল হাতি, রণতরী এবং বন্দুক-কামান নিয়ে তুমি পতলদা এবং বড়বাজু দিয়ে আমার নিকট চলে এসো। মিরযা নাথনকে তাঁর ব্যবহারের জন্য শুধু দুটি মাদী এবং নর হাতি দিয়ে এসো।" আবদুল বাকী এ চিঠি পেয়ে মিরযা নাথনকে কিছু না জানিয়ে যাত্রার উদ্যোগ নেন এবং পাণ্ডু থানায় মিরযা নাথনের সঙ্গে অবস্থানরত জমিদারদের রণতরী নিয়ে মিরযা নাথনের অগোচরে চলে আসার নির্দেশ দেন।

আবদুল বাকী তাঁর সকল প্রস্তুতি সহকর্মী মনসবদারদের নিকট থেকে গোপন রাখেন। তিনি শুধু শয়খ ইবরাহীম করোরীর উপর আস্থা স্থাপন করে তাঁকেও সঙ্গে যেতে বলেন; তিনি মনে করেন সে শয়খ ইবরাহীম করোরীর নিকট তিন বছরের রাজস্ব জমা আছে, সুতরাং ইবরাহীম করোরীকে সঙ্গে নিলে এই সমুদয় অর্থ কাসিম খানের হস্তগত হবে। কিন্তু ইবরাহীম করোরী কম ধূর্ত ছিলেন না, তিনি সমুদয় অর্থ আত্মসাৎ করার মনস্থ করেন। তিনি মনে করেন যে এই সুযোগে হাতি, ঘোড়া, রণতরী, যুদ্ধের সরঞ্জাম ইত্যাদি আবদুল বাকীর নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে নিজে কামরূপে স্বাধীন হয়ে বসবেন। কামরূপ থেকে হাতি নিয়ে আসা সহজ ছিল না, আবদুল বাকী হাতি নিয়ে আসার জন্য মাও[৮] তৈরি করতে থাকেন, এবং মাও তৈরি করার জন্য লোক লস্করের দিনরাত পরিশ্রম দেখে মিরযা নাথন আবদুল বাকীর ষড়যন্ত্রের কথা টের পান এবং অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আবদুল বাকীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে চেষ্টিত হন। তাঁরা ঠিকই বুঝতে পারেন যে আবদুল বাকী হাতি, ঘোড়া, রণতরী ইত্যাদি নিয়ে গেলে কামরূপের মত বিদ্রোহী অঞ্চলে তাঁদের আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না এবং বিদ্রোহীরা তাদের আক্রমণ তীব্রতর করবে। তাঁদের আত্মরক্ষার যেমন উপায় থাকবে না, তেমনি মোগল অধিকৃত এলাকাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু মোগল মনসবদারদের সকলেই প্রায় সমমর্যাদার অফিসার হওয়ায় তাঁদের একযোগে আবদুল বাকীকে বাধা দেয়ার সম্ভাবনাও বিশেষ ছিল না। তাই মিরযা নাথন অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজটি সমাধা করেন। তিনি এবং মীর গিয়াস-উন মাহমুদ নামক একজন মনসবদার একমত হয়ে সুবদার ইবরাহীম খান এবং দিওয়ান মুখলিস খানের চিঠি জাল করেন। চিঠিতে মিরযা নাথনকে কামরূপের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং সকল অফিসারকে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়ার আদেশ দেয়া হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য অফিসারদের নিকট জাল চিঠি দেয়া হয়। চিঠির মর্মার্থ একই, সকলকে মিরযা নাথনের নেতৃত্ব মেনে সম্রাটের স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে আদেশ দেয়া হয়। অতঃপর মিরযা নাথন হাতিশালার রক্ষকদের ঘুষ দিয়ে স্বপক্ষে নিয়ে আসেন; এই লোকগুলির বিশ মাসের বেতন বাকি ছিল, তাই অর্থ পেয়ে তারা খুশি হয়েই আবদুল বাকীর পক্ষ ত্যাগ করে এবং হাতিগুলিকে পানি খাওয়াবার বাহানা করে নদীতে নিয়ে গিয়ে মিরযা নাথনের নিকট নিয়ে আসে। অনুরূপভাবে ঘুষ দিয়ে রণতরীগুলিও মিরযা নাথন অধিকার করে। আবদুল বাকী প্রথমে মিরযা নাথন এবং অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়, কিন্তু হাতিগুলি হাতছাড়া হওয়ায় তিনি আর যুদ্ধ করার সাহস করলেন না, এখন আবদুল

Edited by Ripon Sarkar

বাকীর নিরাপদে কামরূপ ত্যাগ করার সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, তাই তিনি মনসবদারদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং অনুনয় করে তাঁকে কাসিম খানের নিকট যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেন। মিরযা নাথন তাঁকে পাঁচটি হাতি, ত্রিশটি রণতরী, একশ পঞ্চাশটি পরিবহন নৌকা এবং তিনশ পঞ্চাশটি ঘোড়া দেন এবং কিছু দূর পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দেন। আবদুল বাকী এভাবে কামরূপ ত্যাগ করে যান।[৯]

কাসিম খান ও ইবরাহীম খানের মধ্যে যুদ্ধ

ইবরাহীম খান ঢাকার পথে আলাইপুরে পৌঁছেন এবং এদিকে কাসিম খান ঢাকা থেকে যাত্রা করে ত্রিমোহনী[১০] পৌছে একটি দুর্গ তৈরি করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ইবরাহীম খানও কাসিম খানের দুর্গের বিপরীতে এসে অবস্থান নেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে ছিল একটি নদী। ইবরাহীম খান প্রথমে মুরওওত খানকে (ইফতিখার খানের ছেলে মিরযা মক্কী) উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপনের মধ্যস্থ নিযুক্ত করে কাসিম খানের নিকট পাঠান। মুরওওত খান কাসিম খানের নিকট গিয়ে সমস্ত হাতি, রণতরী এবং জমিদারদের ইবরাহীম খানের নিকট হস্তান্তর করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু কাসিম খান রাজি না হলে তিনি বলেন যে তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হলে কাসিম খানকে তাঁর সুবাদারী আমলের হিসাব নিকাশ চুকিয়ে না দেয়া পর্যন্ত যেতে দেয়া হবে না। কাসিম খান রাগান্বিত হয়ে মুরওওত খানকে বন্দী করার উদ্যোগ নিলে মুরওওত খান অবস্থা বেগতিক দেখে সরে পড়েন। তিনি ইবরাহীম খানকে গিয়ে বলেন যে কাসিম খান নিজেকে সুসংহত করেছেন এবং স্থল বাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর স্থল এবং নৌ-বাহিনী একত্রিত হলে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, সুতরাং কাসিম খানের বিরুদ্ধে শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয়া উচিত। ইবরাহীম খান চতুর্দিক থেকে কাসিম খানের দুর্গ ঘিরে ফেলার আদেশ দেন এবং সেভাবে সৈন্য বিন্যাস করা হয়। অন্যদিকে তিনি চাঁদ বাহাদুর নামক একজন সেনাপতিকে কাসিম খানের স্থলবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন এবং তার অধীনে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং চার হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করেন। স্মরণীয় যে, কাসিম খান তাঁর শ্যালক[১১] ও অন্য দুজন সেনানায়কের অধীনে তাঁর স্থলবাহিনী এবং হাতিগুলি ঘোড়াঘাট হয়ে রাজমহলে যাওয়ার জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ইবরাহীম খান চাঁদ বাহাদুরকে আমরুলের[১২] পথে গিয়ে কাসিম খানের স্থলবাহিনীকে বাধা দেয়ার আদেশ দেন। চাঁদ বাহাদুর আমরুলে গিয়ে যমুনা নদীর তীরে অবস্থান নেন এবং কাসিম খানের স্থলবাহিনীকে বাধা দেন। নদীতীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, কাসিম খানের বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে মুসা খান আহত হয়ে বন্দী হন। কাসিম খানের হাতি, ঘোড়া, সাজ-সরঞ্জাম সবকিছু ইবরাহীম খানের সেনাপতি চাঁদ বাহাদুরের হস্তগত হয়। এদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে জমিদারসহ রণতরীগুলি কাসিম খান ইবরাহীম খানের নিকট ফেরত দেন। কামরূপ থেকে আবদুল বাকী শাহজাদপুরে এসে পৌঁছলে শাহজাদপুরের সিকদার তাঁর অগ্রগতি রোধ করে, আবদুল বাকীর অধীনে সৈন্য সংখ্যা বেশি থাকলেও তিনি যুদ্ধ না করে বন্দী হন। মনে হয় তিনি মনোবল হারিয়ে ফেলেন। আবদুল বাকীকে ইবরাহীম খানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১৩]

Edited by Ripon Sarkar

কাসিম খান দুর্গে অবরুদ্ধ থাকেন, ইবরাহীম খান দুর্গের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। বেপারীরা কোনক্রমে কিছু রসদ ভিতরে নিয়ে বিক্রি করার চেষ্টা করত। রসদ সরবরাহের পথ বিঘ্নিত হওয়ায় দুর্গের ভিতরে চাল টাকায় চার সের এবং লবণের সের দু টাকায় বিক্রি হতে থাকে। আনুপাতিক হারে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের দামও বেড়ে যায়। ফলে দুর্গে অবরুদ্ধ লোকদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। দুর্গের ভিতরের লোকজন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় চিৎকার করতে থাকে, কিন্তু তবুও কাসিম খান তাঁর হটকারিতায় আত্মসমর্পণ না করায় ইবরাহীম খানও ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্তদের কোন সাহায্য দেননি। অবশেষে রমজানের ঈদের দিনে (২রা অক্টোবর, ১৬১৭) সকালে ইবরাহীম খান দুর্গ জয়ের আদেশ দেন। মোগল অফিসারেরা ইবরাহীম খানকে বলে যে কাসিম খান জওহর ব্রত[১৪] অবলম্বন করবে, তখন এর দায়িত্ব কে নেবে? ইবরাহীম খান সকল দায়িত্ব নিজে নিয়ে তাদের নিকট একটি দলীল হস্তান্তর করেন। অতঃপর সৈন্যরা আক্রমণ করে, প্রথমে মিরযা আহমদ বেগ এবং মিরযা ইউসুফ বেগ (উভয়ে ইবরাহীম খানের ভাইপো) আক্রমণ পরিচালনা করেন। সৈন্যরা দুর্গের দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এবং উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবরুদ্ধ সৈন্যদের অনেকেই নিহত বা আহত হয়। এমন সময় জঙ্গী নামক কাসিম খানের একজন ভৃত্য তার স্ত্রীর গলা কেটে মাথা নিয়ে কাসিম খানের নিকট এসে বলেঃ 'আপনি কি করছেন, আপনি কি চান যে শয়খজাদীরা (কাসিম খানের পরিবারের মহিলারা) মোগলদের হাতে বন্দী হউন?' তখন কাসিম খান কোন চিন্তা না করে নিজের সকল বেগমের মাথা কেটে ফেলেন এবং তাঁর ভাই এবং আত্মীয়দেরও অনুরূপ করার আদেশ দেন। ইবরাহীম খান এ সংবাদ শুনে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ প্রত্যাহারের আদেশ দেন। ইবরাহীম খান ঢাকার দিকে যাত্রা করেন এবং কাসিম খান তাঁর পরিবার ও সম্পদ ধ্বংস করে বাংলা ত্যাগ করে সম্রাটের দরবারের দিকে চলে যান।[১৫]

এই অনভিপ্রেত ও অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধের কারণ অনুধাবন করা কঠিন নয়। কাসিম খান যেভাবে সকল হাতি, ঘোড়া, রণতরী, জমিদার, কামান, বন্দুক, গোলা, বারুদ এমনকি সীসাও নিয়ে ঢাকা থেকে চলে যাচ্ছিলেন, তাতে ইবরাহীম খানের পক্ষে তাঁকে বাধা দেয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু মিরযা নাথনের একটি বক্তব্য এখানে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে। ত্রিমোহনী বা যাত্রাপুরের যুদ্ধের বিবরণে প্রথমে মিরযা নাথন বলেনঃ[১৬] "এর আগে উভয়ের (ইবরাহীম খান ও কাসিম খান) পত্রালাপে কাসিম খান বুঝতে পারেন যে ইবরাহীম খান যুদ্ধ ও গোলযোগের জন্য প্রস্তুত, তাই তিনি (কাসিম খান) যুদ্ধের সকল সাজ সরঞ্জামসহ হাতি ও নৌকা নিজের সঙ্গে নিয়ে যান।" এই বক্তব্যে মনে হয়, যুদ্ধের জন্য কাসিম খানকে এককভাবে দোষারোপ করা যায় না। তাছাড়া যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় যে কাসিম খানের স্থলবাহিনী পরাজিত হওয়ার পরে এবং বিশেষ করে হাতি, ঘোড়া, সাজ সরঞ্জাম অধিকৃত হওয়ার পরে, এমনকি কাসিম খান জমিদার এবং রণতরীগুলি ইবরাহীম খানের নিকট হস্তান্তর করার পরেও ইবরাহীম খান কাসিম খানের দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এতে মনে হয় কাসিম খানের প্রতি ইবরাহীম খানের আক্রোশের অন্য কারণও ছিল। একটি কারণ এই হতে পারে যে কাসিম খানের সুবাদারী আমলের হিসাব নিকাশ নেয়া, কিন্তু সে উদ্দেশ্যও অর্জিত হয়নি। মোগল শাসন ব্যবস্থায় নূর জাহান চক্রের প্রাধান্যের ফলে শয়খরা ক্রমে ক্রমে প্রাধান্য হারাতে থাকে। জাহাংগীরের আমলের শুরু

Edited by Ripon Sarkar

থেকে সুবা বাংলায় শয়খ পরিবারের প্রাধান্য ছিল, মিরযা পরিবার আসার সাথে সাথে বাংলায়ও শয়খ পরিবারের প্রাধান্য লোপ পায়। শয়খ এবং মিরযা পরিবারের দ্বন্দ্বই ইবরাহীম খান ও কাসিম খানের এ যুদ্ধের ইন্ধন যোগাতে পারে। সন্দেহের কারণ এই যে কাসিম খান তাঁর বেগমদের হত্যা করার পরে ইবরাহীম খান তাঁকে ছেড়ে দেন। কিন্তু তিনি এই হত্যাকাণ্ডের আগেও কাসিম খানকে ছেড়ে দিতে পারতেন, কারণ এর আগেই কাসিম খানের স্থলবাহিনী পরিজিত হয় এবং কাসিম খান নিজে সকল রণতরী ইবরাহীম খানের নিকট হস্তান্তর করেন। বাহরিস্তান গভীরভাবে পাঠ করলে মনে হয় নতুন ও পুরাতন সুবাদারের মধ্যে যুদ্ধের জন্য কাসিম খান এককভাবে দায়ী ছিলেন না; পরস্পর দ্বন্দ্ব, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস উভয়কে যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

ইবরাহীম খানের ঢাকা আগমন

ইবরাহীম খানের ঢাকা পৌঁছার সঠিক তারিখ পাওয়া যায় না। তিনি ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিযুক্তি পান এবং এর পরে ঢাকা যাত্রা করেন। উপরে বলা হয়েছে যে পথে ইবরাহীম খানকে কাসিম খানের মুকাবিলা করতে হয়, সুতরাং পথে তাঁর বেশ কিছু সময় লাগে। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে ইবরাহীম খান ঐ বছরের অর্থাৎ ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকা এসে সুবাদারীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন[১৭] মিরযা নাথন বলেন যে রমজানের ঈদের দিনে ইবরাহীম খান যাত্রাপুর দুর্গে কাসিম খানকে আক্রমণ করেন। ঐ বছর রমজানের ঈদ হয় ২রা অক্টোবর তারিখে। সুতরাং ২রা অক্টোবরের দু একদিন পরেও ইবরাহীম খান যাত্রাপুর থেকে রওয়ানা হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা পৌঁছার কথা। যাত্রাপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব মাত্র ত্রিশ মাইল। ইবরাহীম খান রাজমহল থেকে নদী যাত্রাপুর আসেন। অক্টোবর মাসে যাত্রাপুর থেকে ঢাকায় নদী এবং স্থল উভয় পথে আসা সম্ভব। স্থল বা নৌ যে পথেই আসুন না কেন, সপ্তাহ খানিকের মধ্যে অর্থাৎ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ঢাকা পৌঁছেন।

অশান্ত কামরূপে যুদ্ধ

আমরা উপরে দেখেছি যে কাসিম খানের সময় থেকে কামরূপে অশান্তি বিরাজ করছিল; কামরূপের কয়েকজন বিদ্রোহী সেনানায়ক মোগলদের বিরুদ্ধে বার বার বিদ্রোহ করে এবং কাসিম খানের সারা সুবাদারী আমলে, অর্থাৎ প্রায় তিন বছর কামরূপে যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকে। ইবরাহীম খানের সময়েও এ যুদ্ধ চলে, কিন্তু তিনি দায়িত্ব নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়খ ইবরাহীম করোরী নামক একজন মোগল অফিসার বিদ্রোহ করে মোগলদের বিরুদ্ধে নতুনভাবে সংঘর্ষ শুরু করে। শুধু তাই নয়, তাঁর বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে কামরূপের বিদ্রোহীরাও নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে।

শয়খ ইবরাহীম তিন বছর ধরে কামরূপের করোরী ছিলেন এবং এ সময় সাত লক্ষ টাকা রাজকীয় রাজস্ব আত্মসাত করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে নতুন সুবাদার তাঁর নিকট থেকে রাজস্বের হিসাব দাবি করবেন এবং তাই তিনি বিদ্রোহ করাই শ্রেয় মনে করেন। তিনি ঐ অর্থ দিয়ে তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করেন। তিনি অহোম রাজার নিকট সংবাদ পাঠিয়ে বলেন যে মোগল বাহিনী তাঁকে আক্রমণ করে একবার হেরেছে ধ্বংস

Edited by Ripon Sarkar

হয়েছে, মোগলরা আবার তাঁকে (অহোম রাজাকে) আক্রমণ করবে। সুতরাং অহোম রাজা যদি তাকে (শয়খ ইবরাহীমকে) সৈন্য ও অর্থ দ্বারা সাহায্য করেন এবং কোচ রাজ্যের রাজা করেন, তিনি (শয়খ ইবরাহীম) যতদিন জীবিত থাকবেন, মোগল সৈন্যবাহিনীকে আসাম আক্রমণ করতে দেবেন না। অহোম রাজা এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন কিন্তু তিনিও চালাক কম ছিলেন না। তিনি বলেন যে যদি শয়খ ইবরাহীম প্রথমে মোগলদের আক্রমণ করেন এবং কয়েকজন মোগল সৈন্য জীবিত ধরে তাঁর নিকট পাঠান, তাহলেই তিনি সাহায্য করবেন, কারণ তিনি হঠাৎ করে শয়খ ইবরাহীমকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তিনি শয়খ ইবরাহীমকে বিপুল পরিমাণ অর্থ, হাতি, কামান এবং রণতরী দেয়ার অঙ্গীকার করেন এবং কামরূপ, এমনকি মনছাবাত[১৮] এর কর্তৃত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

শয়খ ইবরাহীম করৌরী অহোম রাজার সাহায্যের আশ্বাস পেয়ে উৎফুল্ল হন এবং একদল কোচ সৈন্যকে ধমধমা থানা আক্রমণ করার উৎসাহ দেন। তখন ধমধমা থানার নেতৃত্বে ছিলেন মোগল সেনানায়ক মিরযা সালেহ আরগুন। শয়খ ইবরাহীম কোচ বিদ্রোহী সেনাপতি সনাতনকে ধমধমা থানা অভিযানে কোচ সৈন্যদের নেতৃত্ব দেয়ার আহবান জানান। সনাতনও নেতৃত্ব দেন এবং থানা আক্রমণ করেন। মিরযা সালেহ আরগুন সতর্ক ছিলেন এবং শত্রুদের আক্রমণের সংবাদ পূর্বাহ্নে পেয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকেন। শত্রুরা অনেক চেষ্টা করে দুর্গ জয় করতে পারল না। মিরযা সালেহ কামরূপের তদানীন্তন প্রধান মোগল সেনাপতি মিরযা নাথনের নিকট এ সংবাদ পাঠান এবং জরুরি সাহায্য পাঠাবার অনুরোধ করেন। মিরযা নাথন অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে মীর আবদুর রাজ্জাককে মিরযা সালেহ আরগুনের সাহায্যার্থে ধমধমা দুর্গে এবং মিরযা ইউসুফ বারলাসকে পাণ্ডু দুর্গে পাঠিয়ে দেন। মিরযা নাথন বুঝতে পারেন যে শয়খ ইবরাহীমের ষড়যন্ত্রে শত্রুরা আক্রমণ করেছে, তাই তিনি মীর আবদুর রাজ্জাককে শয়খ ইবরাহীমের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য এবং সাবধানে ধমধমা থানার দিকে অগ্রসর হওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু শয়খ ইবরাহীমের সঙ্গে মীর আবদুর রাজ্জাকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় মীর আবদুর রাজ্জাক মিরযা নাথনের পরামর্শ পছন্দ করলেন না, বরং তিনি মনে করেন যে শয়খ ইবরাহীম তাঁকে সাহায্য করবেন। তিনি বুঝতে পারলেন না যে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে শয়খ ইবরাহীম তাঁর ক্ষতি করতে পারেন। কার্যত হলও তাই; শয়খ ইবরাহীম মীর আবদুর রাজ্জাকের ধমধমা দুর্গে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য একদল সৈন্য করিয়াঘাট[১৯] পাঠান। শয়খ ইবরাহীমের এ বাহিনী মীর আবদুর রাজ্জাকের আগে সেই স্থানে পৌঁছে ঘাট দখল করে। মীর এসে পৌঁছলে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় এবং মীর আবদুর রাজ্জাক নদী অতিক্রম করতে ব্যর্থ হন। এদিকে ধমধমা দুর্গে সনাতনের বারবার আক্রমণ চলতে থাকায় ঐ দুর্গস্থ মোগল সৈন্যদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। মীর আবদুর রাজ্জাক তাঁর শত্রুদের মধ্যে শয়খ ইবরাহীমের সৈন্যদের চিনতে পেরে মিরযা নাথনকে সংবাদ পাঠান। এদিকে মিরযা নাথন গোপনে ধমধমায় মিরযা সালেহর নিকট সীসা, বারুদ ইত্যাদি সরঞ্জাম পাঠিয়ে তাঁকে আরও কিছুদিন যুদ্ধ চালাতে বলেন এবং মীর আবদুর রাজ্জাককে হাজোতে ফিরিয়ে আনেন।[২০]

মিরযা নাথন সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ঢাকায় সুবাদারের নিকট লিখে জানান। সুবাদার মনে করেন যে মিরযা নাথন বা কামরূপে অবস্থানরত অন্যান্য মনসবদারদের পক্ষে

Edited by Ripon Sarkar

কামরূপের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হবে না, তাই তিনি চিশতী খানকে অনেক রণতরী এবং কামান নিয়ে কামরূপে পাঠান। তাঁর সঙ্গে মুসা মুজাফফর খান, শুজাত খান দাওলী, মুস্তফা খান, সরহদ খান (শায়খ আবদুল ওয়াহিদ) এবং শায়খ কামালের মত অভিজ্ঞ সেনানায়ককে পাঠানো হয়। চিশতী খানকে[১৭] প্রধান সেনাপতি এবং শায়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। শায়খ ইবরাহীম করোরীর বিদ্রোহের সংবাদ সম্রাটকে জানানো হলে তিনি শায়খ ইবরাহীমকে জীবিত ধরে দরবারে পাঠাবার নির্দেশ দেন। সুবাদার ইসলাম খান শায়খ ইবরাহীমকে জীবিত ধরার উদ্দেশে শায়খ ইবরাহীমের নিকট খিলাত পাঠান এবং তাঁকে করোরী পদে বহাল রেখে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করার জন্য ঢাকায় ডেকে পাঠান। সুবাদারের পরিকল্পনা ছিল, শায়খ ইবরাহীম সন্তুষ্ট হয়ে এবং নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে ঢাকা এলে তিনি তাঁকে বন্দী করবেন।

শায়খ ইবরাহীম সুবাদারের পাঠানো খিলাত গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি সুবাদারের ফাঁদে পা দিলেন না। এদিকে মির্যা নাথনও শায়খ ইবরাহীমের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তিনি শায়খ ইবরাহীমকে অনেক উৎসাহ দেন, পদোন্নতির আশ্বাস দেন এবং শেষে ভোজের নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু শায়খ ইবরাহীম কিছুতেই ধরা দিলেন না। ইতোমধ্যে রাজা পরীক্ষিতের ভাই বলদেব পাণ্ডু থানা আক্রমণ করেন। পাণ্ডু থানাদার মির্যা ইউসুফ বারলাস তাঁর সৈন্য নিয়ে বাধা দেন এবং বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউসুফ বারলাস মির্যা নাথনের নিকট সাহায্যের আবেদন করে সংবাদ পাঠান। মির্যা নাথন এ্যাডমিরাল ইসলাম কুলীকে রণতরীসহ পাণ্ডু যাওয়ার আদেশ দিলে ইসলাম কুলী অস্বীকার করেন, তখন নাথন জোর করে ইসলাম কুলীকে বন্দী করেন। ইসলাম কুলী পাণ্ডু থানায় যাওয়ার জন্য স্বীকৃত হলে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। পাণ্ডু থেকে মির্যা নাথন সংবাদ পান যে বলদেব অনেক পদাতিক সৈন্য, কামান ইত্যাদি নিয়ে পাণ্ডু থানা বারবার আক্রমণ করছে, এবং মোগল সৈন্যরা বারবার তাদের হটিয়ে দিচ্ছে। সুবাদার যে সেনাপতিদের কামরূপে পাঠিয়েছিলেন তাঁরা তাড়াতাড়ি আসার জন্য মির্যা নাথন তাঁদের নিকট সংবাদ পাঠান। ইতোমধ্যে বলদেব আবার পাণ্ডু দুর্গ আক্রমণ করে, এবার মির্যা ইউসুফ বারলাস, ইসলাম কুলী, সোনাগাজী (সরাইলের জমিদার) এবং মুসা খানের নৌ-সেনারা এমনভাবে শত্রুদের আক্রমণ করে যে বলদেব পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

শায়খ ইবরাহীম করোরীর পতন

শায়খ ইবরাহীম করোরীকে কোনক্রমে ফাঁদে ফেলতে না পেরে মির্যা নাথন এবং মীর গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ বুঝতে পারেন যে শায়খ ইবরাহীম কোনভাবে তাঁদের পরিকল্পনার কথা আগেভাগে জানতে পারেন। মির্যা নাথনও তাই শায়খ ইবরাহীমের গোপন পরিকল্পনা জানার চেষ্টা করেন। তিনি শায়খ ইবরাহীমের অধীনস্থ দুজন লোককে ধরে তাদের পদোন্নতি দেয়ার আশ্বাস দেন এবং শায়খ ইবরাহীমের গোপন কথা তাঁদের জানাতে বলেন। এ দুজন লোক সংবাদ দেয় যে শায়খ ইবরাহীম অহোম রাজার সাহায্য নিয়ে মির্যা নাথনকে আক্রমণ করার চক্রান্ত করছে। এ সংবাদ শুনে মির্যা নাথন লোক পাঠিয়ে শায়খ ইবরাহীমকে চরমপত্র পাঠিয়ে বলেনঃ আপনি হয় ঢাকায় সুবাদারের নিকট চলে যান, নতুবা আমরা আপনার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব। শায়খ ইবরাহীম উত্তর দেন যে তিনি সুবাদারের নিকট যাবেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভরালিয়া নদীর উপরে পুল

Edited by Ripon Sarkar

তৈরি করেন এবং পুল রক্ষার জন্য দুটি দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে কোচ সৈন্য নিয়োগ করেন। একই সময়ে তিনি সুবাদারের নিকট সংবাদ পাঠান যে তাঁর অর্থাভাব হওয়ায় তিনি ঢাকায় এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে পারছেন না, অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি এসে দেখা করবেন। তাঁর এই বিপরীতমুখী কাজ দেখে মোগল অফিসারদের বুঝতে বাকি থাকে না যে শয়খ ইবরাহীম সুবাদারকে ধোঁকা দিচ্ছেন। মিরযা নাথন এবং অন্যান্য মনসবদারেরা ফলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মিরযা নাথন নিজে এবং মীর গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ কেন্দ্রের বাহুর নেতৃত্বে থাকেন; মীর আবদুর রাজ্জাক এবং আরও কয়েকজন অফিসারকে অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দেন। রাজা শত্রুজিতকে বাম বাহুর নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং মিরযা ইউসুফ বারলাসকে দক্ষিণ বাহুর নেতৃত্ব দেয়া হয়। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে শয়খ ইবরাহীম পরাজিত হয়ে তাঁর দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু রাজকীয় মনসবদারেরা দুর্গ আক্রমণ করে দুর্গে প্রবেশ করে। সেখানেও শয়খ ইবরাহীম বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু একটি হাতি শয়খ ইবরাহীমকে দু দাঁতের মধ্যে চেপে ধরে দুর্গের দেয়ালের উপর দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করে। শয়খ ইবরাহীম দুর্গের বাইরে পরিখায় পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। মীর আবদুর রাজ্জাক ঐ অবস্থায় শয়খ ইবরাহীমের মাথা কেটে নেয়। শয়খ ইবরাহীমের মাথা ঘি দ্বারা সিদ্ধ করে খড় দ্বারা আবৃত করে ঢাকায় সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। সৈন্যদলের দিওয়ান ও বখশী মীর গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শয়খ ইবরাহীমের দুর্গের সকল সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করেন এবং তাঁর নিজের সেনাপতি মিরযা নাথনের এবং অন্যান্য মনসবদারদের মোহর ও দস্তখত নিয়ে রেখে দেন। সম্পদের তালিকা প্রস্তুত করার আগে মুসলমানেরা কুরআন এবং হিন্দুরা শালগ্রাম ছুঁয়ে শপথ করে যে তারা দুর্গের কোন কিছু নিজে গ্রহণ করবে না বা আত্মসাত করবে না। দুর্গে বিভিন্ন জাতের দুশ বিরানব্বইটি ঘোড়া, সাড়ে তেইশ আসার সোনা, এক মণ চৌদ্দ আসার রুপা, দশ হাজারেরও বেশি নগদ টাকা, বহু মূল্যবান পোশাক, বিভিন্ন প্রকারের পণ্ড, বিভিন্ন প্রকারের সৌখিন দ্রব্য এবং শয়খ ইবরাহীমের কোচ স্ত্রীরা সহ[২১] বেশ কিছু মহিলা পাওয়া যায়। ঘোড়ার দামসহ নগদ টাকার পরিমাণ হয় পঞ্চাশ হাজার কয়েকশ টাকা।[২২] সুবাদার এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক মনসবদারের মনসব বৃদ্ধি করে তাদের পুরস্কৃত করেন।[২৩]

অহোম রাজার হাজো আক্রমণ

শয়খ ইবরাহীমের মৃত্যু সংবাদ অহোম রাজার নিকট পৌঁছলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর সেনাপতিরা শয়খ ইবরাহীমকে সাহায্য না করায় তাঁদের তিরস্কার করেন। তিনি তাঁর সেনাপতিদের হাজো আক্রমণ করার নির্দেশ দেন। অহোম সেনাপতি বুড়া গোহাঞি[২৪] এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জঙ্গলাকীর্ণ তীর দিয়ে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আউলিয়ার[২৫] মাযারের পাহাড় ডানে রেখে এবং কেদার মন্দির[২৬] বাঁয়ে রেখে হাজোর দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। হাজো দুর্গে তখন মোগল সেনাপতি ছিলেন কুলীজ খান এবং মিরযা নাথন। অহোম অন্য সেনাপতিরা, যেমন হাতি বড়ুয়া, রাজা বলদেব (রাজা পরীক্ষিতের ভাই যিনি আগেই বিদ্রোহ করেন এবং এখন অহোম রাজার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন) এবং ওমারুদ কায়েত[২৭] দুলক্ষ পদাতিক সৈন্য, একশ আশিটি হাতি নিয়ে নদীর অপর পাড় দিয়ে শয়খ কামালকে আক্রমণ

Edited by Ripon Sarkar

করার জন্যে অগ্রসর হন। রাজখোয়া এবং খারঘোকা পুকন নৌবাহিনীর নেতৃত্ব দেন, তাঁদের সঙ্গে মণ্ড, বাচারি, কুশা এবং কুশ নামে পরিচিত চার হাজার রণতরী দেয়া হয় এবং তারা মোগল নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। আঠার জন পার্বত্য রাজাও অহোমরাজের সঙ্গে যোগ দেয়, তারা তাদের পার্বত্য সৈন্য নিয়ে নদীর বাম তীরে অবস্থান নেয় যাতে কোন মোগল সৈন্য পলায়ন করে দক্ষিণকূলের দিকে না যেতে পারে। তাছাড়া অহোম রাজা রওরোয়া[২৮] নদীর মুখে এক হাজার নৌকা পাঠান এবং মোগলদের রসদ সরবরাহ পথ বন্ধ করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব বুঝা যায় যে অহোম রাজা মোগল বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।[২৯]

মধ্যরাত্রে বুড়া গোহাত্রি সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আউলিয়ার মাযার আক্রমণ করে মাযারের খাদেমদের হত্যা করেন। একজন খাদেম অর্ধমৃত অবস্থায় পাহাড়ের নিচে চলে আসে, সেখানেই ছিল কুলীজ খানের ছেলে মিরযা কুলীজ-উল্লাহ এবং তাঁর কয়েকজন নিকট আত্মীয়ের আবাসস্থল। তাঁরা এ সংবাদ পান এবং মনে করেন যে শত্রুরা সংখ্যায় অল্প, তাই তাঁরা শত্রুদের আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে কুলীজ খানকেও সংবাদ দেয়া হয়। কিন্তু তাঁরা দেখতে পান যে শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি এবং কুলীজ খান যখন তাঁর ছেলের সাহায্যে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন শত্রুরা পাহাড়স্থ তাঁর দুর্গ আক্রমণ করে। তিনি তাঁর দিওয়ান রায় কাশীদাসকে তাঁর দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে নিজে তাঁর ছেলে ও আত্মীয়দের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। দোস্ত মুহাম্মদ নামক একজন সেনানায়ক বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগে হাজো পৌঁছে এবং রাস্তার ধারে অবস্থান করছিলেন, তিনিও কুলীজ খানের দুর্গ রক্ষার্থে অগ্রসর হন। শত্রুরা চারদিক থেকে এসে আক্রমণ করতে থাকে।

সকালে এ সংবাদ পেয়ে শয়খ কামাল যখন কুলীজ খানের সাহায্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তিনি দেখেন যে তিনি নিজেই আক্রান্ত হয়েছেন। হাতি বড়ুয়া, রাজা বলদেব এবং ভমারুদ কায়েত অনেক হাতি এবং এক বিশাল পদাতিক বাহিনী নিয়ে সৈন্য সমাবেশ করে শয়খ কামালের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। শয়খ কামাল ও তাঁর ভাইয়েরা, রাজা শত্রুজিত এবং আরও কয়েকজন মনসবদার শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্য সৈন্য সমাবেশ করেন। মিরযা নাথন হাজোর প্রধান দুর্গে ছিলেন, তিনি কুলীজ খানের সাহায্যে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় তিনি জানতে পারেন যে বুড়া গোহাত্রির উত্তর দিকে স্থলবাহিনীর সাহায্য পুষ্ট হয়ে শত্রুর নৌ-বাহিনী তাড়া খেয়ে দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত চলে আসে। মিরযা নাথন শয়খ কামালের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন, তিনি হাতি বড়ুয়া, রাজা বলদেব এবং সুমারুদ কায়েতের বাহিনীকে আক্রমণ করে পিছু হটিয়ে দেন, এবং শত্রুরা পালিয়ে যায়। কিন্তু শত্রুদের এ বাহিনী পরাজিত হলেও নৌ-বাহিনী মোগল নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে এবং কুলীজ খানকেও পিছু হটিয়ে দেয়। মিরযা নাথন, মীর গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ এবং শয়খ কামাল তখন কুলীজ খানের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। কিন্তু তারা সকলে মিলেও শত্রুদের পরাজিত করতে পারল না। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসায় মোগল সেনাপতিরা সকলে স্থির করে যে সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় না থেকে সকলের হাজো দুর্গে অবস্থান নেয়া উচিত এবং শত্রুদের নৈশ আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দুর্গকে আরও সুরক্ষিত করা প্রয়োজন। সৈন্যদের এরূপ আদেশ দিয়ে কুলীজ খান, শয়খ

Edited by Ripon Sarkar

কামান এবং মিরযা নাথন একযোগে দুর্গ পরিদর্শন করতে যান, যাতে দুর্গের প্রয়োজনীয় মেরামতের নির্দেশ দিতে পারেন। এমন সময় তারা একটি নাতি উচ্চ পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছে দেখেন যে শত্রুর নৌ-বাহিনী ঐ পাহাড়ের পাদদেশে প্রবাহিত নদীপথে অগ্রসর হচ্ছে। মোগল নৌ-বাহিনীকে পরাজিত করে অহোম নৌ-সেনারা অসতর্কভাবে অগ্রসর হচ্ছিল। ঐ পাহাড়ের উপরেই মোগলদের কামান বসান ছিল, মোগলরা শত্রুর নৌ-বাহিনী দেখে গোলা ছুঁড়তে থাকে। গোলা যদিও শত্রুদের নৌকা আঘাত করতে পারেনি, তবুও শত্রু নৌ-সেনারা মোগল পক্ষ থেকে ব্যাপক আক্রমণ শুরু হয়েছে মনে করে নৌকা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাচক্রে প্রথম নৌকাটিতে নৌ সেনাপতি নিজে ছিল, সেনাপতি সহ ঐ নৌকার সকলে নদীতে ঝাঁপ দেয়ায় অন্যান্য নৌকার সৈন্যরাও ভয়ে নদীতে লাফ দিতে থাকে এবং কেউ পরীক্ষা করার অবসর পেল না যে কে কোন স্থান থেকে আক্রমণ করেছে। শত্রুরা এমনভাবে পালিয়ে যায় যে মোগল বাহিনী শত্রুদের সকল নৌকা অধিকার করতে সমর্থ হয়, মোগলরা পলায়নরত শত্রুদের তাড়া করেও অনেককে হত্যা করে। এভাবে ঘটনাচক্রে মোগল বাহিনী পরাজিত হয়েও শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে।[৩০] এ যুদ্ধে বুড়া গোহাঞিও নিহত হন, একজন মোগল মনসবদার তাঁকে চিনতে না পেরে হত্যা করেন।[৩১]

পরের দিন মোগল সেনাপতিরা শত্রুদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করেন। শত্রুরা পরপর নয়টি দুর্গ নির্মাণ করেছিল, দুর্গগুলি বড় বড় কাঠের টুকরা দিয়ে তৈরি ছিল, সকল দুর্গই খালি করে শত্রুরা পালিয়ে যায়। শত্রুদের চার হাজার নৌকার মধ্যে মাত্র দুশ নৌকা ফিরে যেতে সমর্থ হয়, বাকি তিন হাজার আটশ নৌকা মোগলরা অধিকার করে। সাতটি হাতি মোগলদের হস্তগত হয় এবং শত্রুদের তিন হাজার সাতশ সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে মারা পড়ে, দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য পালিয়ে গিয়ে জংগলে মৃত্যুবরণ করে, এবং দশ হাজারের বেশি সৈন্য আহত ও অর্ধমৃত অবস্থায় পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। মোগল পক্ষে দুশ সৈন্য নিহত এবং দ্বিগুণ সংখ্যক সৈন্য আহত হয়।[৩২]

মধুসূদনের আত্মসমর্পণ

যুদ্ধ জয়ের পরে মোগল সেনাপতিদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শয়খ কামাল সুবাদারের নিকট রিপোর্ট দেন যে তিনিই যুদ্ধ জয় করেছেন। ফলে মিরযা নাথন বিরক্ত হয়ে ঢাকায় চলে আসেন, সুবাদার তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে তাঁকে দক্ষিণকূলের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। ইতোমধ্যে সংবাদ পাওয়া যায় যে রাজা লক্ষীনারায়ণের মধুসূদন[৩৩] নামক একজন আত্মীয় দক্ষিণকূল আক্রমণ করে করাইবারি অধিকার করে নিয়েছে এবং সেখানে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করছেন। মিরযা আহমদ বেগকে চাঁদ বাহাদুরের নেতৃত্বে সেখানে পাঠানো হয়। মুসা খানকেও তাঁর সকল নৌবাহিনী নিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেয়া হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে, মুসা খান মসনদ-ই-আলা ইসলাম খান ও কাসিম খানের সময়ে ঢাকায় নযরবন্দী ছিলেন। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁকে মুক্তি দিয়ে এ অভিযানে পাঠান। মিরযা নাথন দক্ষিণকূলে এবং চাঁদ বাহাদুর করাইবারিতে পৌঁছার আগে মুসা খান তাঁর মিত্র জমিদারদের নিয়ে করাইবারি পৌঁছেন এবং মধুসূদনকে খিজিরপুরে খান ফতেহজঙ্গের নিকট নিয়ে আসেন।[৩৪]

Edited by Ripon Sarkar

কামরূপে মিরযা নাথনের যুদ্ধ

মিরযা নাথন দক্ষিণকূল অধিকারের জন্য যাত্রা করেন এবং প্রথমে রাঙ্গামাটি পৌছেন। এদিকে বর্ষাকাল এসে পড়ায় তিনি রাঙ্গামাটিতে অবস্থান নেন এবং বর্ষা শেষে চাঁদ বাহাদুরের নিকট থেকে অতিরিক্ত সৈন্য পাওয়ার আশায় বসে থাকেন। সুবাদার এ সংবাদ পেয়ে মিরযা নাথনকে তাড়াতাড়ি দক্ষিণকূলে যাওয়ার আদেশ পাঠালে তিনি যাত্রা করেন এবং দক্ষিণকূল ও মেচপাড়া পরগণার মধ্যবর্তী স্থান মণিপুর গ্রামে গিয়ে পৌছেন। সুবাদার কামরূপে সংবাদ পাঠান যেন ইসলাম কুলীকে তাঁর নৌবাহিনী নিয়ে মিরযা নাথনের নিকট পাঠানো হয়। কিন্তু ইসলাম কুলী নিজে না এসে মাত্র চৌদ্দ খানা নৌকা মিরযা নাথনের নিকট পাঠিয়ে দেন।

এদিকে পরশুরাম নামক দক্ষিণকূলের একজন বিদ্রোহী আসাম এবং কামরূপের মোগল সৈন্যদের জন্য রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে লুটতরাজ শুরু করে। ফলে হাজোতে অবস্থানরত কুলীজ খান ও শয়খ কামালের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেখানে পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে যায় এবং মোগল সেনাপতিরা এ সংবাদ সুবাদারের নিকট পাঠান। সুবাদার মিরযা নাথনকে পরশুরামের বিরুদ্ধে গমনের আদেশ দেন। মিরযা নাথন অগ্রসর হলে পরশুরাম কাস্তবারি নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু নাথন তাঁর সৈন্যদের কয়েক ভাগে বিভক্ত করে অগ্রসর হন। শত্রুরা মোগল অগ্রবর্তী দলকে আক্রমণ করলে তাদের অজান্তে মোগলরা পেছন দিক থেকে তাদের আক্রমণ করে। শত্রুরা সংখ্যায় অধিক হলেও দুদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। মিরযা নাথন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন পরশুরাম কান্দারা নামক স্থানে আবার দুর্গ নির্মাণ করে মিরযা নাথনকে বাধা দেন। কিন্তু এখানেও পরশুরাম পরাজিত হন এবং মাকরী পর্বতের দিকে পলায়ন করেন। মিরযা নাথন সোলমারিতে একটি থানা স্থাপন করে কলতাকারি ও তাঁর ছেলে তহনের[৩৫] বিরুদ্ধে গমন করেন। এঁরা ছিলেন পার্বত্য নেতা এবং পরশুরামকে তাঁরা নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের সঙ্গে রাখেন এবং সাহায্য সহযোগিতা করেন। ইতোমধ্যে কুলীজ খানের অফিসার দোস্ত বেগের নেতৃত্বে দুশ অশ্বারোহী, এক হাজার কোচ পদাতিক সৈন্য এবং একশ বন্দুকধারী সৈন্য এসে মিরযা নাথনের সঙ্গে যোগ দেয়। মিরযা নাথনের হিন্দু অফিসার বলভদ্র দাসও এসে পৌছে। সুতরাং মিরযা নাথনের হাত শক্তিশালী হয় এবং তিনি বিনা দ্বিধায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সক্ষম হন। তিনি প্রথমে রংধন অঞ্চলে কালিজানা নামক স্থানে যান এবং পরে তাশপুর[৩৬] গ্রামে গিয়ে অবস্থান নেন এবং সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেন। ঐ এলাকাটি ছিল কুলীজ খানের জায়গীর। মিরযা নাথনের আগমনে কলতাকারি ও তহন ভয় পেয়ে কুলীজ খানের অফিসার ভসলিম খানের নিকট সংবাদ পাঠান যে ঘটনাক্রমে পরশুরাম তাঁদের নিকট গিয়েছে, তাঁরা পরশুরামকে আশ্রয় দিচ্ছেন না, বরং তাঁরা সকল রাজস্ব দিতে প্রস্তুত। তাঁরা আরও আবেদন করেন যে তাঁদের যেন মিরযা নাথনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয়। ভসলিম খানের নিকট থেকে এ সংবাদ পেয়ে মিরযা নাথন সেখানেই শিবির স্থাপন করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মিরযা নাথনের বাহিনীর কিছু অংশ সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল, তারা জানত না যে পেছনে কি ঘটেছে তারা বিদ্রোহীদের একটি চৌকি দেখে আক্রমণ শুরু করে, বিদ্রোহীরাও পাল্টা আক্রমণ করে।

Edited by Ripon Sarkar

মোগলরা সংখ্যায় অল্প হওয়ায় পর্যুদস্ত হয়ে পলায়ন করে। মির্যা নাথন এ সংবাদ পেয়ে অগ্রসর হন এবং পলাতকদেরও মোগল সৈন্যদের উদ্ধার করেন।৩৭

পরের দিন মির্যা নাথন আবার শত্রুদের বিরুদ্ধে গমন করেন; তিনি তাঁর খোজা সন্দল খান এবং অন্য একজন সেনানায়ক দোস্ত বেগকে অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব দেন এবং তাঁদের অধীনে কুলীজ খানের দুশ অশ্বারোহী, পাঁচশ বন্দুকধারী এবং চার হাজার কোচ পদাতিক বাহিনী দেন। তর্সলিম খানকে একশ অশ্বারোহী এবং বন্দুকধারী ও কোচ সৈন্যসহ এক হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে পশ্চাতের বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। দিনের প্রথম দিকেই তাঁরা উপরোল্লিখিত শত্রুর চৌকিতে পৌঁছে যান। তাঁদের দেখেই শত্রুরা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ শুরু করে। মোগলরা যখন যুদ্ধ করছিল তখন পেছন দিক থেকে আর একদল শত্রু সৈন্য এসে তর্সলিম খানকে আক্রমণ করে। যুদ্ধের সংবাদ শুনে মির্যা নাথন একদল অতিরিক্ত সৈন্য সাদত খানের সাহায্যে পাঠান এবং মুসাহিব খানের নেতৃত্বে আর একদল সৈন্য বাম দিক থেকে আগত শত্রুদের বিরুদ্ধে পাঠান। শত্রুদের অগ্রবর্তী দল প্রথমে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যায় এবং অন্যরা তাদের সেনাপতির পলায়নে পালাতে থাকে। মুসাহিব খান পলায়নরত সৈন্যদের তাড়া করতে থাকেন এবং ইতোমধ্যে তর্সলিম খানও যুদ্ধে জয়লাভ করেন। মোগল সৈন্যরা তখন পাহাড়ে উঠে রংথন এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেয়, ফলে আগুনের লেলিহান শিখায় অনেক শত্রু নিহত বা আহত হয়। অতঃপর মির্যা নাথন বালিজানায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে তাঁর অবস্থান সুদৃঢ় করেন এবং রসদ সরবরাহের পথ শত্রু মুক্ত করেন।

পরশুরাম তখনও অক্ষত থাকেন, তিনি মির্যা নাথনের পেছনের দিকে একটি গিরিপথে অবস্থান নেন এবং সেখান থেকে লুটতরাজ চালাতে থাকেন। মির্যা নাথনের একদল সৈন্য পেছনে পড়েছিল, তারা নাথনের দুর্গে আসার পথে পরশুরাম তাদের আক্রমণ করে। এ দলের একজন লোক কোনক্রমে পালিয়ে এসে প্রথমে বালিজানার থানাদার বরীদাস এবং পরে মির্যা নাথনকে এ সংবাদ দেন। মির্যা নাথন সসৈন্যে অগ্রসর হয়ে দেখেন যে শত্রুদের আক্রমণ করা খুবই বিপজ্জনক, কারণ পাহাড়ের নিচে শত্রুরা আত্মগোপন করেছিল। মোগল বাহিনীর পাহাড়ের উপর থেকে ঘোড়া নিয়ে নামার উপায় ছিল না, তারা ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার জিন ধরে নামার সময় শত্রুদের লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। এরূপ অসম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েও মোগলরা কোনক্রমে জয়লাভ করে এবং শত্রুরা পালিয়ে যায়। মির্যা নাথন বালিজানা দুর্গে ফিরে আসেন।৩৮

কামরূপে প্রশাসনিক পরিবর্তন

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে কামরূপে বিদ্রোহের মূল কারণ কাসিম খানের দূরদৃষ্টির অভাব। তিনি রাজা লক্ষীনারায়ণ এবং রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে বন্দী করে সম্রাটের দরবারে পাঠালে কামরূপে বিদ্রোহ শুরু হয়। রাজস্ব সংগ্রহের সময় রায়তদের উপর অত্যাচার এবং রায়তদের অসন্তোষও এ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। কাসিম খানের সুবাদারী আমলে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়নি, ইবরাহীম খানের সুবাদারী আমলেও এ বিদ্রোহ চলতে থাকে। ইবরাহীম খানের আমলে যুদ্ধের বিবরণ উপরে দেয়া হয়েছে। কামরূপের বিদ্রোহীদের সঙ্গে মোগল অফিসার শয়খ ইবরাহীম করোরীও

Edited by Ripon Sarkar

বিদ্রোহ করেন এবং শয়খ ইবরাহীমের আমন্ত্রণে অহোম রাজাও কোচদের এলাকা আক্রমণ করেন এবং পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করতে থাকে। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং তাদের পরাজয়ের বিবরণও উপরে দেয়া হয়েছে। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ একজন দক্ষ সৈনিক এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনীতিক ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেন যে বন্দী রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ ও পরীক্ষিত নারায়ণকে মুক্তি দিলে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। তাই তিনি রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ, রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ এবং যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পুত্রদের মুক্তি দিয়ে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। তিনি সম্রাটকে আরও জানান যে তাঁদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলে কোচ বিহারে (কামতা এবং কামরূপে) অবস্থার উন্নতি ঘটবে। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ সর্বদা সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিলেন, তাই সম্রাট তাঁকে তাঁর রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁকে খেলাত, একটি ইরাকি ঘোড়া, একটি হাতি, একটি মণিমুক্তা খচিত তরবারী-বন্ধ ও একটি মণিমুক্তা খচিত ছুরি-বন্ধ উপহার দিয়ে ইবরাহীম খানের নিকট পাঠিয়ে দেন। রাজা পরীক্ষিত সাত লক্ষ টাকা নযর দেয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন, এ অর্থ দেয়ার শর্তে তাঁকেও তাঁর রাজ্য কামরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দেয়া হয় এবং তাঁকেও মুক্তি দিয়ে ইবরাহীম খানের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ আগে এসে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করেন।[৩৯]

তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে ১০২৭ হিজরীর ২৩শে রবিউল আউওয়াল তারিখে (১০ই মার্চ, ১৬১৮ খ্রিঃ) রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে খেলাত এবং উপহার দিয়ে বাংলায় আসার অনুমতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে[৪০] কিন্তু রাজা পরীক্ষিত সম্পর্কে এরূপ কোন কথা নেই। কামরূপের বুরুঞ্জীতে এ বিষয়ে কিছু তথ্য রয়েছে এবং এটা নিম্নরূপঃ সম্রাট রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে নিজ নিজ দেশ শাসন করে উভয়কে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করার উপদেশ দেন। যেহেতু লক্ষ্মী নারায়ণ পরীক্ষিতের চাচা ছিলেন, সম্রাট পরীক্ষিতকে তাঁর চাচার পদ চুম্বন করার আদেশ দেন কিন্তু পরীক্ষিত অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তাঁর জীবন গেলেও তিনি ঐ কাজ করবেন না। সম্রাট এতে পরীক্ষিতের প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং পরীক্ষিতকে আরও কিছুদিন দরবারে থাকার আদেশ দেন। লক্ষ্মী নারায়ণকে তাঁর দেশে নেই এমন কিছু জিনিস সম্রাটের নিকট চাইতে বলেন। লক্ষ্মী নারায়ণ উত্তর দেন যে তাঁর দেশে পুরুদ কালি তরবারি এবং ইরাকি ঘোড়া ছাড়া সব কিছুই পাওয়া যায়। সম্রাট তাঁকে এ জিনিসগুলি উপহার দিয়ে তাঁকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পরে মুকাররম খানের সুপারিশে[৪১] রাজা পরীক্ষিত মুক্তি লাভ করেন। তিনি স্বদেশে আসার সময় সম্রাট তাঁর দেশে নেই এমন কিছু সম্রাটের নিকট চাইতে বলেন। রাজা পরীক্ষিত বলেন যে তাঁর দেশে সব কিছুই পাওয়া যায়, তাই তিনি সম্রাটের একটি ছবি দেয়ার অনুরোধ করেন। রাজা বলেন যে তিনি ঐ ছবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন। সম্রাট বলেন যে তিনি ছবি যে কোন কাউকে দেন না, তবে তিনি রাজাকে একখানি ছবি দেন এবং সম্রাটের বংশের প্রতি শত্রুতা না করার জন্য রাজাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে যদি রাজা সম্রাটের বংশের প্রতি শত্রুতা করেন তাহলে তিনি ধ্বংস হয়ে যাবেন। রাজা পরীক্ষিত সম্রাটকে সাত লক্ষ টাকা নযরানা দেন এবং তাঁর চার ছেলে ধীর নারায়ণ, দর্প নারায়ণ, সুর নারায়ণ এবং ভীম নারায়ণকে সম্রাটের নিকট জামিন স্বরূপ রেখে স্বদেশের দিকে যাত্রা করেন। রাজা পরীক্ষিতের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের

Edited by Ripon Sarkar

সংবাদ শুনে কামরূপের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা ঢাকায় সুবাদারের নিকট এক প্রতিবাদ পাঠিয়ে বলেন যে রাজা স্বদেশে এলে তাঁদের কামরূপে থাকা সম্ভব হবে না। সুবাদার এ প্রতিবাদ লিপিখানি সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে মন্তব্য করেনঃ "রাজা পরীক্ষিতের এ সকল দোষ আছে। জঙ্গলের বাঘ ধরা পড়েছিল, এখন তাঁকে আবার মুক্তি দেয়া হয়েছে। সে আবার জঙ্গলে ফিরে গেলে তাকে আবার ধরা অসম্ভব হবে।" সম্রাট তাই পরীক্ষিতকে আবার দরবারে পাঠাবার জন্য সুবাদারের প্রতি আদেশ দেন। কিন্তু রাজা পরীক্ষিত সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে ত্রিবেণীতে আত্মহত্যা করেন।[৪২]

বাহরিস্তান-ই-গায়বীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমরা অষ্টম অধ্যায়ে বলেছি যে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং রাজা পরীক্ষিত নারায়ণ বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়ে কামরূপের লোকেরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু কামরূপের বুরঞ্জীতে বলা হয়েছে যে পরীক্ষিতের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে কামরূপের প্রধান প্রধান লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করেন। উভয় তথ্যে সামঞ্জস্য নেই, একটির উপরে অন্যটির প্রাধান্য দেয়া যায় না এবং প্রকৃত অবস্থা জানবারও উপায় নেই। বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে রাজা পরীক্ষিতকে ঢাকায় পাঠিয়ে তাঁর নিকট থেকে সাত লক্ষ টাকা আদায় করে তাঁকে স্বদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্রাট সুবাদারকে নির্দেশ দেন, কিন্তু কামরূপের বুরঞ্জীর মতে পরীক্ষিত সম্রাটকে সাত লক্ষ টাকা দিয়ে সম্রাটের দরবার থেকে ঢাকায় আসেন। এক্ষেত্রে কামরূপের বুরঞ্জীর তথ্য সত্য হতে পারে না, কারণ পরীক্ষিত সম্রাটের দরবারে সাত লক্ষ টাকা পাবেন কোথায়? ডঃ এম. আই. বোরাহ মনে করেন যে রাজা পরীক্ষিত সাত লক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁকে তাঁর রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি বোরাহ সাহেবের এ অনুমানও সত্য হতে পারে। পরীক্ষিত বন্দী হওয়ার পরে, এমনকি কিছুদিন আগে থেকে কামরূপে বিদ্রোহ এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লেগে থাকে, এবং রায়তদের নিকট থেকে খাজনা যতটুকু আদায় করা সম্ভব হয়, তা মোগলরাই আদায় করে। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে মোগল অফিসার শয়খ ইবরাহীম করোরী একাই সাত লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে বিদ্রোহী হয়। তাই যুদ্ধ-বিধ্বস্ত কামরূপে হঠাৎ করে সাত লক্ষ টাকা যোগাড় করা সোজা ছিল না। তাই বোধ হয় কামরূপের প্রধান ব্যক্তিরা রাজা পরীক্ষিতের স্বদেশ ফিরে যাওয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কারণ তারা জানত যে পরীক্ষিত ফিরে যাওয়া মানে সাত লক্ষ টাকা যোগাড় করা এবং এ বিপুল পরিমাণ অর্থ যোগাড় করা মানে রায়ত ও প্রজাদের শোষণ করে সর্বস্বান্ত করা। রাজার প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে কামরূপের প্রধানদের অভিযোগের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে এ কারণেই তারা অভিযোগ করে। যা হোক, রাজা পরীক্ষিত যে কামরূপে ফিরে যান এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই তাঁকে মনে হয়, রাজা পরীক্ষিতের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরুদ্ধে কামরূপের প্রধান প্রধান লোকেরা অভিযোগ করেনি, অভিযোগ করেছিল কামরূপের মোগল অফিসারেরা। "সে আবার জঙ্গলে ফিরে গেলে তাঁকে ধরা অসম্ভব হবে" এ কথাতে এটাই প্রমাণিত হয়।

এ সময় শয়খ কামালকে কামরূপ যুদ্ধে মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। হাজোর যুদ্ধে অহোম রাজার বিরুদ্ধে জয়লাভের পর শয়খ কামাল ঢাকায় আসেন এবং সুবাদারকে আশি লক্ষ টাকা নযরানা দিয়ে তিনি এ নিয়োগ লাভ করেন

Edited by Ripon Sarkar

এবং নিজের মনসব বৃদ্ধি করে নেন। নিয়োগ প্রাপ্তির সময় শয়খ কামাল অঙ্গীকার করেন যে রাজা লক্ষী নারায়ণ যে এক লক্ষ টাকা নযরানা দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুত হয়েছেন তা তিনি আদায় করবেন এবং সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।[৪৩] শয়খ কামাল এবং রাজা লক্ষী নারায়ণ একই সঙ্গে ঢাকা ত্যাগ করেন।

বিদ্রোহীদের দমনে মিরযা নাথন

আগেই বলা হয়েছে যে মিরযা নাথন বিদ্রোহী পরশুরামকে দমনে ব্যস্ত ছিলেন। শয়খ কামালকে কামরূপের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করায় মিরযা নাথন অসন্তুষ্ট হন। প্রথমত শয়খ কামালের সঙ্গে মিরযা নাথনের মতবিরোধ বহুদিনের, ইসলাম খানের সময় তাঁদের মধ্যে প্রথম মতবিরোধ হয়[৪৪] এবং দ্বিতীয়ত, শয়খ কামালের পদোন্নতির সময় তাঁকে মিরযা নাথনের জায়গীরের কয়েকটি পরগণাও জায়গীররূপে দেয়া হয়। শয়খ কামাল সেনাপতি নিযুক্ত হয়ে কামরূপ যাওয়ার সময় উভয়ের এ মতবিরোধ প্রকট আকার ধারণ করে এবং উভয়ের মধ্যে অপ্রীতিকর সংবাদ আদান প্রদান হয়। কিন্তু এ অপ্রীতিকর অবস্থা চরম আকার ধারণ না করায় শয়খ কামাল হাজোতে গিয়ে অবস্থান নেন এবং মিরযা নাথন দক্ষিণকূলে বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকেন।

পরশুরামকে তাড়া করে মিরযা নাথন মাকরী পর্বত অতিক্রম করে একটি জলায় গিয়ে উপনীত হন। তিনি জলার তীর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পরশুরামের আবাসস্থলের নিকটে এসে পড়েন। শত্রুরা তাঁর আগমন সংবাদ জানতে পেরে তাঁকে আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে পলায়ন করে। তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ, দুশ সাত মণ অগুরু, একশ সত্তর মণ ওজনের নয়শ সাতষট্টিটি পিতলের জিনিশ এবং পঁয়ত্রিশ খানি নৌকা মিরযা নাথনের হস্তগত হয়।[৪৫] সেখানে তিনি সংবাদ পান যে ভমারুদ্দ কায়েত আমজোঙ্গা এবং রংজুলীতে[৪৬] দুটি দুর্গ নির্মাণ করেছে। নাথন মাকরী পর্বত থেকে সোলমারী যান এবং সেখানে দোস্ত বেগকে মোতায়েন করে নিজে জাখলী[৪৭] নামক একটি গ্রামে গিয়ে পৌছেন, সেখানে তিনি সংবাদ পান যে মামু গোবিন্দ[৪৮] এবং পরশুরাম নিকটেই এসে পৌছেছেন এবং আমজোঙ্গা দুর্গে যাওয়ার মনস্থ করেছেন। মিরযা নাথন সাদত খান ও মস্ত আলী বেগ নামক দুইজন সেনানায়কদের মামু গোবিন্দ ও পরশুরামকে ধরার জন্য পাঠান এবং নিজে আমজোঙ্গা দুর্গে যাওয়ার মনস্থ করেন। মোগলদের আক্রমণে মামু গোবিন্দ নিজে এবং পরশুরাম তার পরিবার পরিজনসহ পালিয়ে যায়। মামু গোবিন্দের পরিবার পরিজন মোগলদের হাতে ধরা পড়ে। পরের দিন সকালে মোগল বাহিনীর অনেক সৈন্য নিহত হয়। মিরযা নাথনের বাহিনীও তখন এসে পড়ে কিন্তু অনেক যুদ্ধ করেও দুর্গ অধিকার করা গেল না। মোগলরা তখন পেছন দিক থেকে আক্রমণ শুরু করে। এবার শত্রুরা ভয়ে পালিয়ে যায়, আমজোঙ্গা দুর্গ মোগলদের অধিকারে আসে। দুর্গ অধিকার করে মোগলরা গারো পাহাড়ে যায়। গারোদের নেতৃবৃন্দ মিরযা নাথনের সঙ্গে দেখা করেন এবং চার হাজার গারো সৈন্য দিয়ে তাঁকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি এ চার হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে রংজুলী দুর্গে যান। ঐ দুর্গে ভমারুদ্দ কায়েত অবস্থান করছিলেন। মিরযা নাথন দুর্গ আক্রমণ করলে ভমারুদ্দ কায়েত প্রবলভাবে বাধা দেন এবং সমানে সমানে যুদ্ধ চলতে থাকে। সারাদিন যুদ্ধ করেও কোন পক্ষ জয়লাভ করতে পারে না। সন্ধ্যা হয়ে এলে মিরযা নাথন একটি দুর্গ

Edited by Ripon Sarkar

নির্মাণের আদেশ দেন এবং সৈন্যরা রংজুলী দুর্গ পাহারা দিতে থাকে যাতে দুর্গের ভিতর থেকে কেউ বাইরে আসতে না পারে। পরের দিন সকালে মোগল সৈন্যরা পার্শ্ববর্তী তিনটি গ্রাম আক্রমণ করে লুটতরাজ করে এবং একজন বিদ্রোহী নেতাসহ পাঁচশ ব্যক্তি আটক করে। রাত্রে তারা রংজুলী দুর্গ আক্রমণ করে আবার ব্যর্থ হয়। কয়েকদিন পরে মোগলরা আবারও দুর্গ আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। এভাবে মোগলরা আরও কয়েকবার রংজুলী দুর্গ আক্রমণ করে ব্যর্থ হলে রাজা শত্রুজিত হাজো থেকে অতিরিক্ত সৈন্য নিয়ে এসে মিরযা নাথনের সঙ্গে মিলিত হন। মিরযা নাথন দুর্গ নির্মাণ করে রংজুলী দুর্গের দিকে অগ্রসর হন। এভাবে পঞ্চম দুর্গ নির্মাণ করার সময় শত্রুরা আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে তারা পরাজিত হয় এবং মামু গোবিন্দের জামাতা নিহত হয়। কিন্তু মোগলদের পক্ষে দুর্গ জয় করা সম্ভব হল না।[৪৯]

মিরযা নাথন তখন চতুর্দিকে গ্রামগুলি লুট করে শত্রুদের মনোবল ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেন। রায়তরা দূরবর্তী গ্রামে তাদের ধন-সম্পদ নিয়ে একত্রিত হয় এবং শত্রুদের দুর্গে রসদ সরবরাহের কাজে লিপ্ত থাকে। তাই তাদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশে মোগলরা প্রায় দু হাজার সৈন্যের একদল পাঠিয়ে প্রথমে বোহাল্তি পরগণার[৫০] বাহাধরী গ্রাম আক্রমণ করে। এদল প্রায় সতরশ লোককে বন্দী করে এবং তিন হাজার পশু জবাই করা হয়। অনুরূপভাবে আর একটি দল অন্য একটি দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে অনেক খাদ্য সম্ভার সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসে। এদিকে মিরযা নাথন রংজুলী দুর্গের নিকট পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শত্রুদের প্রায় নিকটে চলে আসে। দুর্গে অবরুদ্ধ ওমারুদ তখন সাহায্য চেয়ে পাঠালে রাজা বলদেব রাজখোয়ার অধীনে পার্বত্য আঠার রাজাদের প্রায় দশ হাজার সৈন্য ওমারুদ কায়েতের সাহায্যার্থে পাঠিয়ে দেন। মিরযা নাথন এ অতিরিক্ত শত্রুসৈন্যদের আগমনের সংবাদ পেয়ে হাজো থেকে এক হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। এদিকে মোগল সেনানায়ক সাদত খান আবার গ্রাম লুট করার উদ্দেশে বাহাধরী গ্রামে যান। সেখানে গোবিন্দ নামক একজন গ্রাম সরদার সংবাদ দেন যে রাজা বলদেব গোবিন্দ লস্কর এবং সোনাবারিয়া নামক সেনাপতিদ্বয়কে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে সাদত খানের বিরুদ্ধে পাঠাচ্ছেন। এ বাহিনী সারারাত অগ্রসর হয়ে রাত্রে পাঁচগিরিতে[৫১] অবস্থান করবে এবং দিন শেষে সাদত খানের দুর্গ আক্রমণ করবে। সাদত খান এ সংবাদ পেয়ে শত্রুদের আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে নিজেই শত্রুদের বিরুদ্ধে গমন করেন। তিনি দেখেন যে নদীর অপর পারে দুশ সৈন্য পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে এবং বাকিরা বিশ্রাম নিচ্ছে। নদীর তীরে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের ঐ দুশ লোক মোগলদের আক্রমণ করে। মোগলরা নদী পার হয়ে শত্রুদের মুকাবিলা করে, শত্রুরা টিকতে না পেরে পলায়ন করে। শত্রুসৈন্যের বিয়াল্লিশ জন নিহত হয় এবং সমান সংখ্যক লোক বন্দী হয়। মোগলরা নিহত শত্রুদের মাথা দুর্গের মিনারের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখে এবং বন্দী শত্রুদের গোবিন্দ সরদারের সামনে হত্যা করতে থাকে। পনরজনকে হত্যা করা হলে গোবিন্দ সরদার ভয় পেয়ে বলেন যে তাঁর এবং তাঁর জামাতার জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হলে তিনি মোগলদের জন্য নিম্নের দুটির যে কোন একটি কাজ করবেন। ১ম, রাজা বলদেব বোহাল্তি দুর্গে পরিবার এবং সৈন্য ও হাতি নিয়ে বাস করছেন। দুর্গটি এখান থেকে ছয় দিনের পথ, কিন্তু গোবিন্দ সরদার ছয় প্রহরের মধ্যে সোজা পথে তাদের নিয়ে যেতে পারবেন। সেখানে গিয়ে মোগল বাহিনী পরিবার পরিজন এবং হাতিসহ রাজা বলদেবকে বন্দী করতে পারবে। ২য়,

Edited by Ripon Sarkar

গোবিন্দ সরকারকে মিরযা নাথনের নিকট নিয়ে গেলে তিনি এমন এক উপায় বলে দিতে পারবেন, যার ফলে মোগলরা সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গুলী দুর্গ অধিকার করতে পারবে। এ কথা শুনে সাদত খান মিরযা নাথনের নিকট ফিরে আসার সিদ্ধান্ত করেন এবং মিরযা নাথনকে বিষয়টি লিখে জানান। মিরযা নাথন চিঠি পেয়ে বদরী দাসকে অতিরিক্ত সৈন্য, হাতি এবং রসদ দিয়ে পাঠান এবং সাদত খানকে রাজা বলদেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। সাদত খান যখন ফিরে আসছিলেন, পথে বদরী দাসের সঙ্গে দেখা হয়, কিন্তু সাদত খান অনেক দূর চলে আসায় আর ফিরে যাওয়া সমীচীন মনে করলেন না। তিনি বদরী দাস এবং অতিরিক্ত সৈন্যসহ মিরযা নাথনের নিকট ফিরে আসেন। মিরযা নাথন অসন্তুষ্ট হন কিন্তু তখন করার কিছুই ছিল না। পরের দিন গোবিন্দ সরদার মিরযা নাথনকে শত্রুর দুর্গের পেছনে এমন একটি স্থানে নিয়ে যান যেখানে একটি সরু পথে শত্রুদের জন্য রসদ সরবরাহ করা হত। মিরযা নাথন সে সরু পথে একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন এবং ঐ পথ ধরে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রসদ সরবরাহকারীদের বাধা দেয়ার জন্য একদল সৈন্য পাঠান। এ দল কিছুক্ষণ পরে একদল লোককে রসদ নিয়ে আসতে দেখে তাদের আক্রমণ করে রসদ কেড়ে নেয় এবং সরবরাহকারীদের তাড়িয়ে দেয়। ফলে শত্রুদের রসদ বন্ধ হয়ে যায় এবং মোগলরা অতিরিক্ত রসদ পেয়ে যায়। কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় সরু পথের সদ্য নির্মিত দুর্গের দেয়াল ভেঙ্গে যায়। তখন সেখানে একটি বাঁশের বেড়া নির্মাণ করা হয়, যাতে বেড়াকে ভিত্তি করে আবার দেয়াল নির্মাণ করা যায় বা বেড়ার আড়ালে থেকে সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পারে। অবশেষে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয় এবং সুলতান খান পন্নীকে একদল সৈন্যসহ সে দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব দেন। এভাবে আরও দুইটি সরু পথে দুর্গ নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তাতেও শত্রুদের মধ্যে কোন নড়চড় দেখা গেল না। তখন গোবিন্দ সরদার একটি উঁচু পাহাড় দেখিয়ে দেন এবং সেখানে দুর্গ নির্মাণ করতে বলেন। মিরযা নাথন সে পাহাড়ে পর্যবেক্ষণ করার জন্য তাঁর দুজন সেনাপতিকে পাঠান, তারা সেখানে পাহাড়ের উপরে উঠে দেখেন যে ঐ স্থান থেকে শত্রুদের দুর্গের ভিতরের সব কিছুই এমনকি মানুষ এবং পশুর পা পর্যন্ত দেখা যায়। শত্রুরা তাঁদের ঐ পাহাড়ের উপরে উঠতে দেখে ভয় পেয়ে যায়, তারা বুঝতে পারে ওখানে দুর্গ নির্মাণ করে আক্রমণ করলে আর মোগলদের বাধা দেয়া সম্ভব হবে না। শত্রুরা তখন দুর্গের দেয়াল ভেঙে বাহিরে পরিখায় আসতে থাকে, উদ্দেশ্য পরিখায় রাখা নৌকার সাহায্যে তারা পলায়ন করবে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় সে দিন পাহাড়ের উপর দুর্গ তৈরি করা হল না। মিরযা নাথন সকলকে নিজ নিজ স্থানে সতর্ক থাকবার আদেশ দেন। কিন্তু পরের দিন সকালে দেখা গেল যে দুর্গ শূন্য, শত্রুরা রাতের অন্ধকারেই সকলে পালিয়ে গেছে। মিরযা নাথন রঙ্গুলী দুর্গ অধিকার করেন।[৫২]

বিয়াল্লিশ দিন অবরোধের পর এ দুর্গ অধিকৃত হয়। সৈন্যরা সকলেই ক্লান্ত, এমনকি পর্যাপ্ত রসদের অভাবে তারা অনেক কষ্টে দিন কাটায়। তাই তারা আশা করেছিল যে দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পরে তারা বিশ্রাম নেবে। কিন্তু মিরযা নথান তাদের বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ না দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। দুজন সেনানায়ক, সুলতান খান পন্নী এবং মস্ত-আলী বেগ যাত্রা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং আর একজন, রাজা লক্ষী নারায়ণের চাচা সর্ব গোসাঞির ছেলে রতিকান্ত দল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সত্যি সত্যি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেন। রতিকান্তকে ভয় দেখিয়ে

Edited by Ripon Sarkar

এবং অন্যদের উপদেশ দিয়ে দলে রাখা হয় এবং সকলে ওমারুদকে তাড়া করার জন্য অগ্রসর হয়। তারা বাকু[৫৩] নামক স্থানে পৌছে এবং সেখানে খবর পায় যে অনতিদূরে ওমারুদ কালো ও দু পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করছেন, মোগল বাহিনী সেখানে গিয়ে ওমারুদকে আক্রমণ করে, ওমারুদ পালিয়ে যায়। রাজা বলদেব ওমারুদের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, তারাও পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়, তাদের তাড়া করে মোগল সৈন্যরা বলদেবের দুর্গ পর্যন্ত পৌছে, রাজা বলদেবও পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ নিয়ে পাহাড়ের দিকে পলায়ন করে। এ সময় আক্রা রাজা[৫৪] এসে মিরযা নাথনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, মিরযা নাথন তাঁকে নিজের পাগড়ী উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন। মিরযা নাথন রাজা বলদেবের সংবাদ পেয়ে বড়দুয়ার[৫৫] নামক স্থানে যান, সেখানে গিয়ে জানতে পারেন যে রাজা বলদেব বামুন রাজার নিকটে চলে গেছে। মোগলরা তখন বামুন রাজার নিকটে যান, বামুন রাজাকে রাজা বলদেব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তাঁর কোন দুর্গ নেই যে তিনি কাকেও লুকিয়ে রাখতে পারেন। বামুন রাজা সংবাদ দেন যে রাজা বলদেব কানওয়াল রাজা[৫৬] রাজ্যে চলে গেছেন। মোগলরা কানওয়াল রাজার দুর্গে পৌছলে কানওয়াল রাজা বলেন যে রাজা বলদেব তাঁর দুর্গে আছেন, কিন্তু তাঁর সৈন্য সামন্ত অধিক হওয়ায় কানওয়াল রাজা তাঁকে ধরে দিতে পারেন না, তবে তিনি রাজা বলদেবকে চলে যেতে বলবেন, এবং যাওয়ার সময় মোগলরা রাজা বলদেবকে ধরতে পারবে। সকালে সত্যিই রাজা বলদেব দুর্গের বাইরে আসেন, কিন্তু মোগলরা ধরবার আগেই তিনি পালিয়ে যান। শুধু তাঁর দুই স্ত্রী ধৃত হন। মোগল বাহিনী রাজা বলদেবের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং কিছু দূর গিয়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, রাজা বলদেব পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান, কিন্তু তাঁর পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদ মোগলদের হস্তগত হয়। নয়টি হাতি এবং চুরাশিটি ঘোড়াও মোগলদের অধিকারে আসে। মোগল বাহিনী জয় লাভ করে যখন শিবিরের দিকে ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ করে এক হাজার পদাতিক সৈন্যসহ ওমারুদ তাদের সামনে এসে পড়ে। দূর থেকে ওমারুদ মনে করেন যে রাজা বলদেব আসছেন, কিন্তু নিকটে এসে মিরযা নাথনের সৈন্যদের দেখে পালিয়ে যান।[৫৭]

অতঃপর মিরযা নাথন শিবিরে ফিরে আসেন এবং আঠার জন পার্বত্য রাজাকে আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়ে প্রত্যেকের নিকট সংবাদ পাঠান। বামুন রাজা এবং কানওয়াল রাজা উভয়ে এসে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁদের খেলাত দিয়ে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ভু-সিংহ এবং তাঁর ভাই মানসিংহ না আসায় মিরযা নাথন তাঁদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। মোগল সৈন্যরা তাঁদের রাজ্যে পৌছলে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন এবং মিরযা নাথন তাঁদের খেলাত দিয়ে পুরস্কৃত করেন। ঐ সময় হস্ত রাজা বিদ্রোহী মামু গোবিন্দকে বন্দী করে মিরযা নাথনের নিকট সংবাদ পাঠান। হস্ত রাজা মিরযা নাথনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন, তাই তিনি সৈন্য না পাঠিয়ে মামু গোবিন্দকে ধরে নিয়ে আসার জন্য হস্ত রাজাকে নির্দেশ দেন। এদিকে মামু গোবিন্দ হস্ত রাজার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে হস্ত রাজাকে বশ করেন এবং হস্ত রাজা তাঁকে মুক্ত করে দেন। হস্ত রাজা মিরযা নাথনকে জানান যে তাঁর লোকদের ফাঁকি দিয়ে মামু গোবিন্দ পলায়ন করেছেন। এ সময় পরশুরাম বন্দী হন। মিরযা নাথন আমজোদা এবং রাংজুলী দুর্গ জয় করতে যাওয়ার সময় বলভদ্র দাসকে পরশুরামের বিরুদ্ধে পাঠান। বলভদ্র দাস

Edited by Ripon Sarkar

গাম্বুর পরগণায় গিয়ে পরশুরামের গতিবিধি লক্ষ্য করতে থাকেন। মিরযা নাথন পরে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে বলভদ্রের শক্তি বৃদ্ধি করেন। পরশুরামের অবস্থান স্থলের সংবাদ পেয়ে বলভদ্র দাস আক্রমণ করেন, এবং পরশুরামের এক স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ-ছেলে এবং অন্য দুজন ছেলেকে বন্দী করতে সমর্থ হন। ফলে পরশুরাম অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েন এবং অর্থের বিনিময়ে তাঁর স্ত্রী ও ছেলেদের মুক্তি দেয়ার প্রস্তাব করেন। বলভদ্র দাস এতে সম্মত না হয়ে পাহাড়ে পরশুরামের অবস্থান স্থল আক্রমণের জন্য একদল সৈন্য পাঠান। এ সৈন্যরা পরশুরামকে জীবিত ধরে ফেলে। মিরযা নাথন সংবাদ পেয়ে পরশুরামকে নিয়ে আসার জন্য একজন সেনানায়ক পাঠান। এদিকে কুলীজ খান হাজো থেকে পরশুরামের বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়ে মিরযা নাথনের সৈন্যদের নিকট থেকে পরশুরামকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্য একদল সৈন্য পাঠান কিন্তু তারা আসার আগেই পরশুরামকে মিরযা নাথনের নিকট নিয়ে আসা হয়। এ একই সময় মোগল বাহিনী রাজা কুক এবং রাজা সঞ্জয়কে আক্রমণ করার জন্য হাজরা বাড়ি[৫৮] যায়, উভয় রাজা আত্মসমর্পণ করেন।[৫৯]

ইতোপূর্বে আক্রা রাজা মিরযা নাথনের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিলেন। রাজা বলদেবের অর্থ সম্পদ রাজা উমেদের নিকট গচ্ছিত ছিল। মিরযা নাথন রাজা উমেদের নিকট থেকে রাজা বলদেবের সম্পদ হস্তগত করার জন্য আক্রা রাজাকে পাঠান। কিন্তু আক্রা রাজা তাঁর ভাই রূপবরের অধীনে বাজে জিনিসে পূর্ণ কয়েকটি বাক্স মিরযা নাথনের নিকট পাঠান এবং বলেন যে রাজা উমেদের নিকট ঐগুলি পাওয়া গেছে। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে মিরযা নাথন দুশ অশ্বারোহী, পাঁচশ বন্দুকধারী এবং তিন হাজার স্থানীয় পাইকসহ বদরী দাসকে আক্রা রাজা ও উমেদ রাজার বিরুদ্ধে পাঠান। তিনি বদরী দাসকে নির্দেশ দেন যে উভয় রাজা আত্মসমর্পণ না করলে তাঁদের যেন ধরে আনা হয়। কিন্তু উমেদ রাজা পলায়ন করেন এবং আক্রা রাজা ও তাঁর ভাইকে শৃঙ্খলিত করে মিরযা নাথনের নিকট নিয়ে আসা হয়। এতে পার্বত্য রাজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং ফলে রাজা দল-দলপতি, রাজা তর্করিহ, লক্ষর এবং ডাখু নামক রাজারা এসে মোগলদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে সেনানায়কেরা মিরযা নাথনকে বলে যে শিবিরে অবস্থানরত পার্বত্য রাজারা পলায়নের চেষ্টা করছেন, সুতরাং তাদের বন্দী করে রাখা উচিত। মিরযা নাথন বলেন যে তিনি তাঁদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সুতরাং তাঁদের বন্দী করা উচিত হবে না। রাজারা সত্যিই পালিয়ে যায়, শুধু তাই নয় আঠার জন রাজা একতাবদ্ধ হয়ে রাণীহাটে একটি দুর্গ তৈরি করেন। মিরযা নাথন একদল সৈন্য পাঠিয়ে তাদের দুর্গ ধ্বংস করে দেন। কিন্তু রাজারা আবার দুর্গ তৈরি করেন, মোগলরা আবার দুর্গ ভেঙে ফেলে। এভাবে তিনবার রাজাদের দুর্গ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ সময় অনুগত হস্তরাজাও শত্রুদের দলে যোগদান করেন।

আঠার জন পার্বত্য রাজা অহোম রাজের নিকট এক আবেদন জানিয়ে বলেন যে যদি তিনি তাঁদের সাহায্য করেন, তাঁরা মিরযা নাথনকে বাধা দিতে সমর্থ হবেন, নতুবা মিরযা নাথন তাঁদের ধ্বংস করে আসামে অভিযান করবেন। এ কথা অহোম রাজের মনঃপূত হয়, তিনি হাতি বড়ুয়াকে সেনাপতি নিযুক্ত করে আশি হাজার সৈন্যসহ পার্বত্য রাজাদের সাহায্যার্থে পাঠান, সঙ্গে রাজখোয়া এবং খারঘোকা পুকনকেও দেয়া হয়। রাজা বলদেব এবং গুমারুদ কায়েতও মোগলদের নিকট বার বার পরাজিত হয়ে এবং

Edited by Ripon Sarkar

তাঁদের হাতি ও সৈন্য সামন্ত হারিয়ে অহোম রাজের নিকট গিয়ে সাহায্য চান। তাদেরও হাতি বড়ুয়ার সঙ্গে এ যুদ্ধে পাঠান হয়। অহোম রাজা তাঁর সেনাপতিকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেন যেন মিরযা নাথন এবং তাঁর কয়েকজন সেনানায়ককে জীবিত ধরা হয় এবং নৌকায় করে পরিবারসহ রাজার নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। হাতি বড়ুয়া রাণীহাটে পৌছে মিরযা নাথনের দুর্গের ডান দিকে একটি পাহাড়ে দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরপর আরও কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করে মোগল দুর্গ ঘিরে ফেলার কাজে লেগে যান।

মিরযা নাথন এতদিন পর্যন্ত ছোট ছোট পার্বত্য রাজাদের সঙ্গে এবং বিদ্রোহী কয়েকজন নেতার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, এখন তিনি অহোম রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। তিনি দিন রাত ঘোড়ার উপর থেকে পাইকদের জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজে লাগিয়ে দেন। ইতোমধ্যে গোবিন্দ সরদার সংবাদ পান যে শত্রুরা তাঁর স্বদেশ কামারগাঁও আক্রমণ করে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছে। তিনি নাথনের নিকট থেকে কিছু পাইক নিয়ে কামারগাঁও রক্ষার জন্য ছুটে যান কিন্তু শত্রুদের আক্রমণে তিনি নিহত হন। এদিকে নাথনের জঙ্গল পরিষ্কারের কাজ চলছিল। জঙ্গল পরিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মোগল সৈন্যরাও প্রস্তুত হয়ে শত্রুদের জন্য অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ শত্রুরা আক্রমণ শুরু করে এবং শত্রুপক্ষ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর আসতে থাকে। মোগল বাহিনীও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং অনেককে হতাহত করে। সারাদিন যুদ্ধের পরে উভয় পক্ষ নিজ নিজ শিবিরে চলে যায়। পরের দিন মিরযা নাথন কাঠ দিয়ে একটি নতুন দুর্গ তৈরি করেন এবং রাজা শত্রুজিতকে[৬০] কিছু অতিরিক্ত সৈন্য দিয়ে ঐ দুর্গের প্রহরায় নিযুক্ত করেন। শত্রুরা তখন আক্রমণের ধারা পরিবর্তন করে ঐ দুর্গের দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে আবার দুর্গের পর দুর্গ তৈরি করে মোগল দুর্গের পরিখা পর্যন্ত চলে আসে। মিরযা নাথন তখন তাঁর প্রধান দুর্গের সম্মুখে কাঠ এবং কাদা দিয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেন। ঐ দুর্গে মিরযা নাথন এবং অন্যান্য অফিসারদের পরিবার ছিল। এ প্রতিবন্ধক তৈরি করে তিনি পরিবারের মহিলাদের শত্রুর তীর এবং কামানের গোলা থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু শত্রুরা সে প্রতিবন্ধকের এক তীরের লক্ষ্য পর্যন্ত চলে আসে। এতদিন পর্যন্ত শত্রুরা রাত্রে দুর্গ তৈরির কাজে লিপ্ত থাকত, এখন তারা দিনের বেলায়ও দুর্গ তৈরি করতে থাকে। মোগল সৈন্যরা তখন শত্রুদের দুর্গগুলি আক্রমণ করে এবং একে একে সাতটি দুর্গ ধ্বংস করে দেয় এবং দুর্গের কাঠগুলি মোগল দুর্গে নিয়ে আসে। মোট বিশ হাজার কাঠের বড় বড় টুকরা নিয়ে আসা হয়।

শত্রুরা এখন মোগলদের দুর্গে পানি সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করে। পানির উৎস ছিল দুর্গের নিকটস্থ নদী, একই নদী থেকে উভয় পক্ষ পানি ব্যবহার করত। শত্রুদের দুর্গ নদীর একদিকে থাকায় মোগল সৈন্যরা পানি আনতে গেলে, বা নদীতে গোসল করতে গেলে বা হাতি ঘোড়াকে নদীতে পানি খাওয়াতে নিয়ে গেলে শত্রুরা দুর্গ থেকে তীর ছুঁড়ে মোগলদের এ সব কার্যকলাপে বাধা দিতে থাকে। তখন মোগলরা শত্রুর দুর্গকে আড়াল করে একটি প্রতিবন্ধক দেয়াল নির্মাণ করে এবং দুর্গের দুদিকে নদীর উপর পুল তৈরি করে এবং পুলের উপর ছাউনী নির্মাণ করে দেয়। ফলে মোগল সৈন্যদের পানি ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। শত্রুরা পানি সরবরাহে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়ে মোগল শিবিরে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করার প্রয়াস পায়। হাতি বড়ুয়া মামু গোবিন্দের অধীনে চার হাজার সৈন্য দিয়ে এ কাজে নিযুক্ত করেন। মামু গোবিন্দ চারদিকে লুটতরাজ করতে থাকে। কিন্তু মিরযা নাথনও মামু গোবিন্দকে বাধা দেয়ার

Edited by Ripon Sarkar

উদ্দেশে পাণ্ডু পরগণার হালিগাঁও গ্রামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সেখানে অশ্বারোহী, বন্দুকধারী এবং তীরন্দাজ সৈন্যের সমন্বয়ে এক বাহিনী নিয়োগ করেন। ফলে মোগল শিবিরে রসদ সরবরাহের পথ খোলা থাকে। মিরযা নাথন ব্রহ্মপুত্রের তীরে আরও একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং দুর্গের নিকটে নদীতে নৌবাহিনী পাঠান। তিনি নির্দেশ দেন যে নৌ-বাহিনীর সেনারা সেখান থেকে হালিগাঁও-এ রসদ পাঠাবে এবং হালিগাঁও থেকে দুর্গের সৈন্যেরা মিরযা নাথনের রাণীহাট দুর্গে ঐ রসদ পাঠিয়ে দেবে। মামু গোবিন্দ চেষ্টা করেও মোগলদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু কিছুদিন পরে প্রবল বর্ষণে ব্রহ্মপুত্রের তীরের গরাল দুর্গ ভেসে যায়, তখন নৌ-বাহিনীকে জলায় নিয়ে আসা হয় এবং কাছারী গ্রামে আবার দুর্গ নির্মাণ করা হয়। বর্ষাকালে কাছারী থেকে হালিগাঁও এবং হালিগাঁও থেকে রাণীহাট দুর্গে রসদ সরবরাহ অব্যাহত থাকে। বর্ষার প্লাবন বৃদ্ধি পেলে গরুর গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন হাতির সাহায্যে রসদ আনার ব্যবস্থা হয়।[৬১]

এই সময়ে মোগলরা সংবাদ পায় যে রাজা পরীক্ষিতের আত্মীয় বা অফিসার[৬২] পাঁচকল্লা ঝুলিয়া পরগণা ভুমরিয়ার[৬৩] একটি গ্রামে অবস্থান করছেন। লাল বাহাদুর নামক একজন মোগল সেনানায়ক নৌ-বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেন এবং তাঁর পরিবারসহ বন্দী করে নিয়ে আসেন। অহোম সেনাপতি হাতি বড়ুয়া মোগল সৈন্যদের রসদ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য আবার চেষ্টা করেন। তিনি মামু গোবিন্দকে দশ হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিয়ে হয় হালিগাঁও আক্রমণ করার জন্য বা হালিগাঁও-এর নিকটে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করে হালিগাঁও থেকে মোগলদের রাণীহাট দুর্গে রসদ সরবরাহ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। মিরযা নাথন নিজে হালিগাঁও যাত্রা করেন এবং শত্রুদের পরাজিত করে ছত্রভংগ করে দেন। ইতোমধ্যে মিরযা নাথনের অনুপস্থিতিতে অহোম বাহিনী রাণীহাট দুর্গ আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। পরশুরাম মিরযা নাথনকে বলেন যে তাঁকে পরিবার পরিজনসহ মুক্তি দিলে তিনি দশ হাজার টাকা দেবেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে কিছু না থাকায় তাঁকে কোন সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে মুক্তি দিলে তিনি তাঁর পুঁতে রাখা অর্থ এনে দেবেন। মিরযা নাথন তাঁর সেনানায়কের অধীনে তাঁকে দুই তিন বার মুক্তি দিলেও তিনি বিশেষ অর্থ সম্পদ আনতে পারলেন না। হয় তাঁর নিকট কিছু ছিল না, শুধু ছলছুতা করে মুক্তি লাভের চেষ্টা করছিলেন, নতুবা কোন স্থানে তাঁর অর্থ সম্পদ পুঁতে রাখা ছিল, মোগল সৈন্য তার হদিস জানতে পারবে ভয়ে তিনি সেই গুপ্ত স্থান চিহ্নিত করতে বিরত থাকেন। যাই হউক, পরশুরাম মুক্তি পেলেন না, বরং তাঁর প্রতি মিরযা নাথনের অবিশ্বাস বেড়ে যায়।

মিরযা নাথন এখন হাতি বড়ুয়ার অধীনে এক বিশাল অহোম বাহিনীর সম্মুখীন, অহোম বাহিনীর সঙ্গে কামরূপের সকল বিদ্রোহী এবং আঠার জন পার্বত্য রাজাও যোগ দিয়েছেন। নাথন দেখেন যে বিগত চার মাসের বিচ্ছিন্ন যুদ্ধে তাঁর বেশ কিছু সৈন্য নিহত হয়েছে, সুতরাং তিনি হাজোতে অবস্থানরত মোগল সেনাপতির নিকট অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে সংবাদ পাঠান। হাজোতে তখন শয়খ কামাল সেনাপতি, কুলীজ খান অতিরিক্ত মদ্য পানের অভিযোগে সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ কর্তৃক অপসারিত হয়ে প্রথমে ঢাকা এবং পরে সম্রাটের দরবারে চলে যান। শয়খ কামালের সঙ্গে মিরযা নাথনের মতানৈক্য ছিল, মিরযা নাথন শয়খ কামালের সেনাপতিত্ব সরাসরি অস্বীকার করেন,[৬৪] শয়খ কামাল প্রথমে সৈন্য পাঠাতে অস্বীকার করেন, কিন্তু পরে মিরযা নাথনের সংবাদ

Edited by Ripon Sarkar

নাহকেন পাণ্ডুপাণ্ডুতে তিনি মিরযা সালেহ আবদুল এবং মিরযা ইউসুফ বারলাসকে সকল জুনিয়র মনসবদার এবং তিনশ বন্দুকধারী সৈন্যসহ মিরযা নাথনের সাহায্যার্থে পাঠান। আসার সময় শয়খ কামাল সেনানায়কদের বলেন যে মিরযা নাথন অহোম রাজ্যের এক বিশাল সেনাবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত, সুতরাং তারা পৌঁছা পর্যন্ত মিরযা নাথন শত্রুদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ, তাই তারা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে অগ্রসর হয়। মিরযা নাথন মনে করেন যে শত্রুতাবশত শয়খ কামাল সেনানায়কদের প্রকারান্তরে মিরযা নাথনকে সাহায্য না করার কথা বলেন। কিন্তু সামরিক বিবেচনায় শয়খ কামাল বোধ হয় সেনানায়কদের সতর্ক করে ভুল করেননি। অবশ্য সকল সৈন্য ও নৌ-বাহিনী নিয়ে মিরযা নাথনের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া শয়খ কামালের উচিত ছিল। কিন্তু শয়খ কামালের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন সেনানায়কদের অনেকেই শয়খ কামালের কথার সুযোগ নিয়ে মিরযা নাথনের নিকট না গিয়ে ফিরে যায়, শুধু পাঁচজন সেনানায়ক তের জন সৈন্য নিয়ে মিরযা নাথনের সঙ্গে যোগ দেন। ইতোপূর্বে মিরযা নাথন তীর, ধনুক, বারুদ এবং সীসা সংগ্রহের জন্য মাদারী[৬৬] নামক একজন অফিসারকে ঢাকায় পাঠান। তিনি এ জিনিসগুলি নিয়ে হাজো আসেন। কিন্তু হাজো থেকে নদীপথে মিরযা নাথনের নিকট যাওয়ার সময় সকল জিনিষসহ নৌকা ডুবে যায়। কিন্তু রাজা মধুসূদনের ছেলে দামুদর (বা দামুদর) একশত অশ্বারোহী এবং চারশ পদাতিক সৈন্য নিয়ে মিরযা নাথনের সঙ্গে মিলিত হন।[৬৭]

মোগল এবং অহোম বাহিনী বেশকিছু দিন ধরে রাণীহাটে দুর্গ তৈরি করে মুখোমুখি অবস্থান করছিল। অহোমরাজ বিরক্ত হয়ে তাঁর বাহিনীর নিকট সংবাদ পাঠান যে এবার যুদ্ধে যে পশ্চাদপসরণ করবে তাঁকে কোমরে কেটে দু টুকরা করা হবে। এ সংবাদ পেয়ে হাতি বড়ুয়া, রাজখোয়া, খারঘোকা পুকন, রাজা বলদেব, ওমারুদ কায়েত, আঠার জন পার্বত্য রাজা, ডুমরিয়া রাজার[৬৮] ছেলে ভাস্করদেব, সকল দল এবং দলপতিসহ গোপাল দলপতি[৬৯] পরামর্শ করে স্থির করেন যে এবার তাঁদের যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। তাই তাঁরা দুর্গে একদল সৈন্য রেখে সকলে মিরযা নাথনের রাণীহাট দুর্গের বড় কামানের গোলার লক্ষ্যের মধ্যে এসে রাতারাতি একটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করেন, কামান সজ্জিত করেন এবং চতুর্দিকে পরিখা খনন করেন। রাত্রের শেষ দিকে যখন শত্রুদের একদল সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আসে, তখন মোগলরা এ সংবাদ পায়। সঙ্গে সঙ্গে মিরযা নাথনও তাঁর প্রধান দুর্গ এবং শত্রুদের নতুন দুর্গের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং পরিখা খনন করেন। এ দুর্গই শত্রুদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়, এবং প্রধান দুর্গ যেখানে মহিলারা ছিলেন, সেটি শত্রুদের লক্ষ্যের বাইরে রাখা হল। তখন ওমারুদ কায়েত প্রচার করেন যে তিনি মামু গোবিন্দকে মোগলদের হালিগাঁও দুর্গ অধিকার করে রসদ সরবরাহ বন্ধ করার জন্য পাঠিয়েছেন। মিরযা নাথন সাদত খানকে মামু গোবিন্দকে বাধা দেয়ার জন্য মিনারী দুর্গে পাঠান, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন যে শত্রুদের কোন সৈন্য সেখানে যায়নি। ঐ সময় মিনারিতে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ কর্তৃক মিরযা নাথনের নিকট পাঠানো একদল সৈন্য পৌঁছে। সাদত খান তাদের মিনারীতে রেখে রাণীহাটে মিরযা নাথনের নিকট চলে আসেন। মোগলদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাবার জন্য তখন শত্রুরা আর একবার চেষ্টা করে, তারা একদল সৈন্য পাঠিয়ে মোগলদের কয়েকটি মাদী হাতি ও ভারবাহী পশু চারণ-ক্ষেত্র থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। মোগল সৈন্যদের যারা সর্বক্ষণ ঘোড়ার পিঠে থেকে শত্রুদের

Edited by Ripon Sarkar

হঠাৎ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁদের সেকা চাঁই ও পত নিয়ে আসতে থাকে রাজা খোয়া বিশ হাজার পদাতিক সেনা নিয়ে মির্জা নাথনের নতুন দুর্গ আক্রমণ করে। প্রথমে মির্জা নাথন মাত্র তিনজন সৈন্য নিয়ে শত্রুদের আক্রমণ করেন এবং পরে অন্যান্য সৈন্যরাও যুদ্ধে যোগ দেয়। শত্রুরা পরাজিত হয়, কিন্তু অন্যদিকে তবকল আয়েত করে হাজার সৈন্য নিয়ে নদী পর্যন্ত যোগাযোগ রক্ষার জন্য মোগলরা যে দুটি দুর্গ তৈরি করেছিল, তার একটি আক্রমণ করেন। কিন্তু এখানেও শত্রুরা সুবিধা করতে পারল না কিন্তু যুদ্ধ যখন মোগলদের অনুকূলে, মোগল সৈন্যরা দুর্গে ফিরে এসেছে, এবং শত্রুরাও তাদের দুর্গে চলে গেছে, তখন দুজন সেনানায়ক বীরত্ব দেখাবার জন্য শত্রুর ব্যূহের মধ্যে চলে যায়। শত্রুরা দুজনকে একা পেয়ে তাদের আক্রমণ করে পেছনে হটিয়ে দেয়। তাদের পেছনে পেছনে শত্রুরাও দুর্গের ভিতরে চলে আসে এবং দুর্গের ঘরগুলি জ্বালিয়ে দেয়। মির্জা নাথন যুদ্ধে জয়লাভ করে দুর্গে চলে এসেছিলেন, তিনি জানতেই পারেননি যে তাঁর বিনা অনুমতিতে দুজন সৈন্য বীরত্ব দেখাতে যাবে। কিন্তু শত্রুরা দুর্গের ভিতরে চলে আসার পরে তিনি যখন ব্যাপারটি জানতে পারেন, তখন ঘটনা আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। তিনি বাইরে এসে সৈন্যদের উৎসাহিত করার বহু চেষ্টা করেন, কিন্তু তাতে ফল হল না। সাদত খান মির্জা নাথনের পেছন পেছন এসে আহত হন। মির্জা নাথন সাদত খানকে প্রধান দুর্গে পাঠিয়ে আদেশ দেন যে যদি তিনি মির্জা নাথনের মৃত্যুর খবর শোনেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে যেন দুর্গস্থ মহিলাদের হত্যা করে নিজেও আত্মহত্যা করেন। মির্জা নাথন তাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ করার জন্য অনেক উৎসাহিত করেন, কিন্তু সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে শুধু পালাতেই থাকে। অবশেষে মোগলদের দুর্গ ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোন উপায় রইল না। মোগলরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে সুয়ালকুচিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। শত্রুরা মোগলদের তাড়া করে অনেককে হতাহত করে।[৭০] সারা দক্ষিণকূল মোগলদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

মির্জা নাথন সুয়ালকুচি পৌছলে শরফ কামাল, রাজা মধুসূদন, রাজা শত্রুজিত, মির্জা সালেহ আরগুন, মির্জা ইউসুফ বারলাস এবং অন্যান্য মনসবদারেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা দেন। তাঁরা তাঁকে হাজো নিয়ে যেতে চান কিন্তু মির্জা নাথন তাতে রাজি হলেন না। তিনি শত্রুদের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন। শরফ কামাল তাঁকে প্রথমে সাহায্য দিতে রাজি হলেও পরে তাঁর কথা রক্ষা করলেন না। মির্জা নাথন নিজে পাঁচশ অশ্বারোহী এবং এক হাজার পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। সুবাদার ইবরাহীম খান মির্জা নাথনের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে মনে করেন যে কুলীজ খানকে অপসারণের ফলেই মোগলরা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি কুলীজ খানকে পুনরায় কামরূপের জায়গীরদার এবং সেনাপতি নিযুক্ত করেন। কুলীজ খান সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে বারাপুর পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে কামরূপে যাত্রা করেন। সুবাদার কুলীজ খানকে উপদেশ দেন যেন প্রয়োজন হলে মির্জা নাথনকে সাহায্য দেয়া হয়। সুবাদার মির্জা নাথনকেও উৎসাহিত করে চিঠি লিখেন। মির্জা নাথন গিলায় (গিলানী বা জাহাঙ্গীরাবাদ) গিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন, ফেরার পথে কুলীজ খানের সঙ্গে দেখা করেন এবং কুলীজ খান কর্তৃক সৈন্য পাঠাবার আশ্বাস পেয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দক্ষিণকূলের দিকে অগ্রসর হন। ইতোমধ্যে তিনি রাজা কমলেকের নিকট থেকে কেড়ে নেয়া চারটি হাতি সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেন।

Eidited by Ripon Sarkar

মির্জা নাথন শাহজাদপুরে[৬৬] এসে সংবাদ পান যে অল্প দূরে মধু নায়ক একটি দুর্গ নির্মাণ করেছেন। মোগল সৈন্যরা সেখানে গিয়ে শত্রুদের তাড়িয়ে দেয় এবং গ্রাম লুট করে এবং [illegible] করে। সেখান থেকে মির্জা নাথন সেনা সাহায্যের জন্য কুলীচ খানের নিকট সংবাদ পাঠান এবং নিজে সৈন্যবাহিনী নিয়ে মিরাটীতে[৬৮] যান। পথে শত্রুরা উপর কয়েকবার আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। মির্জা নাথন যখন দুর্গের দুই ক্রোশ পর্যন্ত এগিয়ে দুর্গের নিকটে এসে পৌঁছেন, মিরাটীতে মোগল সৈন্যরা দুর্গ নির্মাণ করে অবস্থান করে। [illegible] নিকটেই ছিলেন, তিনি মির্জা নাথনের আগমন সংবাদ পেয়ে মিরাটী এসে মির্জা নাথনের দুর্গের নিকটে পাহাড়ের পা ঘেঁষে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি পাহাড়ী নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে সমস্ত এলাকাটি প্লাবিত করেন। ফলে মোগলদের দুর্গটিও প্লাবিত হয়, শুধু মধ্যে একটি উঁচু স্থান প্লাবন থেকে রক্ষা পায়। [illegible] কুলীচ খানের নিকট থেকে অতিরিক্ত সৈন্য আসে। কুলীচ খান সর্ব [illegible] এবং রাজা মধুসূদনের ছেলে শত্রুজিৎকে তাদের সৈন্যসহ মির্জা নাথনের সাহায্যার্থে পাঠান, তারা এসে পৌঁছলে মির্জা নাথন শত্রুদের মিরাটী দুর্গ আক্রমণ করে তাদের তাড়িয়ে দেন। [illegible], আলি শাহ, পাহলোয়ান দুর্গম এবং আঠার জন পার্বত্য রাজা সবাই পালিয়ে যায়। শত্রুদের তাড়া করার জন্য মির্জা নাথন দুটি বাহিনী পাঠান। সব জায়গা থেকে সৈন্যরা [illegible] ও [illegible] বন্দী করে নিয়ে আসে। বালীপাড়া দুর্গে পরাজয়ের তিন মাস আঠার দিন পরে [illegible] মির্জা নাথনের হাতে বন্দী হন। [illegible] মির্জা নাথনের নিকট নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মির্জা নাথন নিজে তাঁর বাঁধন খুলে দেন এবং তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রতিশোধ নেওয়ার চেয়ে ক্ষমা করা মোগলরা শ্রেয় মনে করে। মির্জা নাথন আরও বলেন যে যদি [illegible] বশ্যতা স্বীকার করেন তাহলে তাঁকে যথেষ্ট অনুগ্রহ দেখানো হবে। [illegible] কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুগত থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিজের ছেলে ও আত্মীয়দের সংবাদ দিয়ে ডেকে আনেন এবং স্বয়ং মির্জা নাথনের সঙ্গে থাকেন।[৬৯]

অতঃপর মির্জা নাথন [illegible] রাজার রাজ্য আক্রমণ করেন। [illegible] রাজা পালিয়ে গিয়ে অন্যান্য রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মোগলদের নিকট সংবাদ দেন যে আঠার জন পার্বত্য রাজা একসাথে আত্মসমর্পণ না করলে তিনি একা আত্মসমর্পণ করবেন না। যদি মোগলরা চায় যে আমরা আত্মসমর্পণ করি, তাহলে প্রথমে বড় দুয়ার রাজাকে বশ করতে হবে। পশ্চিমকূলের সকল জমিদারেরাও একই সংবাদ দেন। অতএব মির্জা নাথন বড় দুয়ার রাজাকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি [illegible] দুয়ারে একদল সৈন্য নিযুক্ত করে নিজে [illegible] রাজার বিরুদ্ধে গমন করেন। [illegible] রাজার রাজ্য [illegible] ও বড় দুয়ার রাজ্যের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। তিনি সেখান থেকে বড় দুয়ার গিয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করে অবস্থান করেন। বড় দুয়ারে পৌঁছেই মোগল সৈন্যরা রাজাকে আক্রমণ করে এবং বড় দুয়ারের পাহাড়ের উপরস্থ দুর্গ আক্রমণের চেষ্টা করে। ফলে পার্বত্য লোকদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং বড় দুয়ারের রাজা পলায়ন করে উপরিস্থ[৭০] রাজা [illegible] নিকট চলে যান। পাহাড়টি ছিল অতি উচ্চ এবং দুর্গও ছিল দুর্ভেদ্য। রাজা পরীক্ষিতের পূর্বপুরুষেরা কোন সময় এ পাহাড়টি অধিকার করতে পারেননি, একবার কামরূপের রাজা রঘুদেবের

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] মিরজা সাহেব [illegible] মিরজা সাহেব তাঁদের সকলকে [illegible] করে রাখেন।

এর পর মিরজা সাহেব [illegible] যান এবং [illegible] দুর্গ [illegible]। মিরজা সাহেবের সাফল্যের সংবাদ পেয়ে সুবাদার [illegible] মিরজা সাহেবের জন্য খেলাত এবং ঘোড়া উপহার পাঠান। তিনি [illegible] রাজা [illegible], ও অন্যান্য [illegible] এবং [illegible] নির্দেশ দেন যে, তাঁরা মিরজা সাহেবকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন এবং মিরজা সাহেবের উপদেশের বাইরে না যান। এ সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা [illegible], রাজা মধুসূদন এবং [illegible] মিরজা সাহেবের নিকট যান এবং [illegible] ও [illegible] সৈন্য পাঠান। মিরজা সাহেবকে [illegible] দেবার জন্য [illegible] পাঠান হয়, [illegible] সেনাদের [illegible] দুর্গ এসে সৈন্য পরিদর্শন [illegible] সৈন্যদের পরিদর্শন করতে যান। [illegible] মিরজা সাহেবের অনুপস্থিতিতে [illegible] দুর্গ [illegible] জন্য [illegible]। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে [illegible] দুর্গ [illegible] করে [illegible]। গোপন পথের [illegible] সৈন্য ঢোকাতে হয়। মিরজা সাহেব [illegible] এ খবর পেয়ে দ্রুত চলে আসেন, পরে তিনি দেখেন যে [illegible] রাজা মধুসূদন এবং [illegible] কিছু সৈন্য ছাড়া বাকী সকল [illegible] সৈন্যদের [illegible]। মিরজা সাহেব এ সংবাদ সুবাদারের নিকট পাঠিয়ে দেন।[illegible]

ফিরে এসে মিরজা সাহেব [illegible] এক ষড়যন্ত্রের [illegible] জানতে পারেন। [illegible] সাহেব তাঁর এক বিশ্বস্ত দূতের মাধ্যমে [illegible] নিকট [illegible] চিঠি পাঠান: "মিরজা সাহেব [illegible] এবং [illegible] উপর নির্ভর করেন। [illegible] দিকে আক্রমণ করলে [illegible] এ দুর্গ দখল করতে পারবে।" ভাগ্যক্রমে এ চিঠি মিরজা সাহেবের একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে পড়ে। [illegible]

Edited by Ripon Sarkar

এ বিষয়ে কিছু বললেন না কিন্তু নিজে সতর্ক হয়ে গেলেন। বর্ষাকালে মিরযা নাথন ব্রহ্মপুত্রের তীরে সুয়ালকুচিতে চলে যান এবং সেখানে দুর্গ নির্মাণ করেন। রাজা মধুসূদনকে খেলাত দিয়ে বিদায় দেয়া হয়, শয়খ কামালও প্রয়োজন হওয়ায় সত্তর জন সৈন্য ফিরিয়ে নেন। এ সময় একদল অহোম সৈন্য দক্ষিণকূল আক্রমণ করলে মিরযা নাথন মিনারী দুর্গে সৈন্য পাঠিয়ে অহোমদের বাধা দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ইতোমধ্যে সুবাদার ইবরাহীম খান বন্দী রাজাদের তাঁর নিকট উপস্থিত করার জন্য বারবার তাগাদা দিতে থাকেন। তাই সুয়ালকুচি থেকে মিরযা নাথন বন্দীদের নিয়ে ঢাকা যাত্রা করেন। তিনি আঠার জন পার্বত্য রাজা, তমাকদ কায়েত এবং তাঁর পরিবার, পরশুরাম এবং তাঁর ছেলে, রাজা বলদেবের পুত্রগণ, মামু গোবিন্দের স্ত্রী ও মেয়ে, এ সকল বন্দীকে নিয়ে ঢাকা যান কিন্তু ঢাকায় গিয়ে শুনেন যে সুবাদার সদ্য বিজিত ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরের প্রাকৃতিক মনোরম শোভা উপভোগ করার উদ্দেশে উদয়পুর গিয়েছেন। মিরযা নাথনও বন্দীদের নিয়ে উদয়পুর যান এবং বন্দীদের সুবাদারের সম্মুখে উপস্থিত করেন। বন্দীরা সুবাদারের পদচুম্বন করে সম্মান দেখান।[৭৫] সুবাদার মিরযা নাথনের প্রশংসা করেন। নাথন সুবাদারকে হাতি এবং একশ নৌকাসহ অনেক উপহার দেন। সুবাদার মিরযা নাথনের পদোন্নতির জন্য দরবারে, বিশেষ করে সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের নিকট সুপারিশ করেন। তখন মিরযা নাথনও সম্রাট এবং বেগম প্রত্যেকের জন্য একটি করে হাতি, এবং ইতমাদ-উদ-দৌলাসহ সকলের জন্য বহু মূল্যবান উপহারাদি পাঠান। উপহারাদির সর্বসমেত মূল্য দাঁড়ায় বিয়াল্লিশ হাজার টাকা।[৭৬]

মিরযা নাথন যখন সুবাদারের নিকট আসেন, তখন সুবাদার বলেছিলেন যে যাওয়া আসাসহ তাঁর পঁচিশ দিন সময় লাগবে, কিন্তু দেড় বছর পর্যন্ত তাঁকে ঢাকায় থাকতে হয়। ইতোমধ্যে শয়খ কামালও ঢাকায় আসেন। তাঁরা ঢাকা থাকতেই সংবাদ পাওয়া যায় যে প্রথমে খুন্তাঘাটে বিদ্রোহ হয় এবং পরে বিদ্রোহীরা উত্তরকূলে গিয়ে পিলা বা জাহাঙ্গীরাবাদও দখল করে। তখন কুলীজ খানই ছিলেন কামরূপে অবস্থানরত মোগল সৈন্যদের সেনাপতি। তিনি বাকির নামক একজন সেনানায়ককে খেদা নির্মাণ করে হাতি ধরার জন্য খুন্তাঘাটে পাঠান। তাঁর সঙ্গে তিনশ অশ্বারোহী, পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য এবং চৌদ্দটি হাতি দেয়া হয়। বাকির খুন্তাঘাটে এসে রায়তদের সাহায্যে হাতি ধরায় অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করে খেদা তৈরি করেন। অনেক হাতি খেদায় আটকা পড়ে, কিন্তু বাকির হাতিগুলি ধরে শৃঙ্খলিত করার সময় হাতিগুলি খেদার একাংশে ভেঙ্গে পালিয়ে যায়। বাকির তখন হাতি ধরার কাজে নিয়োজিত লোকদের বন্দী করেন এবং দু একজনকে হত্যা করেন এবং তাদের বলেন যে পলায়নকারী প্রত্যেকটি হাতির জন্য তাদের এক হাজার টাকা করে জরিমানা দিতে হবে। ফলে খুন্তাঘাটে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এবং সকলে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা বাকিরকে সহ তাঁর অনেক সৈন্য হত্যা করে এবং অন্যদের বন্দী করে, বাকিরের অধীনস্থ হাতিগুলিও শত্রুদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহীরা তাদের একজনকে তাদের নেতা বা রাজা বলে ঘোষণা করে। কুলীজ খান বিদ্রোহ দমন করার জন্য তাঁর ছেলে কুলীজুল্লাহ সহ কয়েকজন সেনানায়ক অনেক সৈন্যসহ পাঠান, কিন্তু তাতে কোন ফল হল না, কুলীজ খান তখন ঢাকায় সুবাদারের নিকট সাহায্যের আবেদন করেন। বিদ্রোহীরা খুন্তাঘাট থেকে পিলায় (পিলানী বা জাহাঙ্গীরাবাদ) যায় এবং সেখানে দোস্ত বেগের অধীনস্থ সৈন্যদের হত্যা করে।

Edited by Ripon Sarkar

কুলীজ খানের ছেলে কুলীজুল্লাহ বাধা দিতে পরাজিত হয়ে পশ্চাতে আত্মসমর্পণ করে। কুলীজ খানের পরিবারবর্গ বন্দী হয় এবং পিলা শত্রুদের অধিকারে যায়।

সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ এ সংবাদ পেয়ে মিরযা নাথনকে কামরূপের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিয়ে কামরূপ পাঠান। মিরযা নাথন পথে দু একটি ছোট ছোট দুর্গ জয় করে শুয়াকাটে পৌঁছেন এবং গোয়ালপাড়ায় দুটি দুর্গ তৈরি করেন। ইতোমধ্যে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ সরহদ খান (শয়খ আবদুল ওয়াহিদ) এবং শয়খ কামালকে কামরূপে যথাক্রমে প্রধান সেনাপতি ও সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান কিন্তু মিরযা নাথন তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। ফলে কামরূপে মোগল সেনাপতিদের মধ্যে আবার মতবিরোধ দেখা দেয়। মিরযা নাথন পিলার নিকটে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে ভব সিংহ নিজেকে রাজা রূপে ঘোষণা করে পিলা দখল করে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।[৭৭] মোগল সৈন্যরা নদী পার হওয়ার সময় ভব সিংহ প্রায় দশ বার হাজার সৈন্য এবং পূর্বে মোগলদের নিকট থেকে অধিকৃত হাতিগুলিসহ আক্রমণ করেন এবং কিছু সৈন্য হতাহত করেন। কিন্তু মোগল বন্দুকধারীরা প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ চালালে ভব সিংহ পলায়ন করেন, হাতিগুলির মধ্যে পাঁচটি মোগলরা ধরে ফেলে। এ পরাজয়ের ফলে ভব সিংহ রাঙ্গামাটি ত্যাগ করেন। এ বিজয়ের সংবাদ শুনে সরহদ খান এবং শয়খ কামালও রাঙ্গামাটি আসেন এবং সকলে মিলে ভব সিংহকে তাড়া করার সিদ্ধান্ত নেন। মিরযা নাথন কামরূপ দুয়ার এবং সরহদ খান ও শয়খ কামাল কামাখ্যা দুয়ার দিয়ে ভব সিংহকে আক্রমণ করার জন্য যাত্রা করেন। শয়খ কামাল ঢাকুনিয়া দুর্গ জয় করে পঞ্চরতি চাদন কেল্লা হস্তগত করেন। ভব সিংহ মনে করেন যে মোগলদের নিকট থেকে অধিকৃত বাকী হাতিগুলি ছেড়ে না দেয়া পর্যন্ত মোগলরা তাঁকে তাড়া করতে থাকবে, তাই তিনি হাতিগুলি জঙ্গলে ছেড়ে দেন। ভব সিংহ তিনটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে অবস্থান করতে থাকেন। সে দুর্গম স্থানে ঘোড়া যাওয়া সম্ভব না হওয়ায় মিরযা নাথন একদল বন্দুকধারী সৈন্য পাঠিয়ে তাদের তাড়া করেন। অতঃপর মিরযা নাথন দক্ষিণকূলে চলে যান। অন্যদিকে শয়খ কামাল ভব সিংহকে সংবাদ দেন যে তিনি যদি মোগল বন্দীদের মুক্তি না দেন, তাহলে তাঁকে রেহাই দেয়া হবে না। ফলে ভব সিংহ কুলীজ খানের পরিবার পরিজনসহ সকল মোগল বন্দীকে মুক্তি দেন। শয়খ কামাল হাজো চলে যান।[৭৮]

মিরযা নাথন ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে নগরকোটার বালুকাময় স্থানে শিবির স্থাপন করেন এবং যদু নায়কের বিরুদ্ধে মুস্তফা কুলী বেগ ও হাবীব খান লোদীর নেতৃত্বে দু দিক থেকে দু দল সৈন্য প্রেরণ করেন। ইতোমধ্যে কুলীজ খান হাজো থেকে ঢাকায় চলে আসেন এবং ঢাকা থেকে সম্রাটের নিকট চলে যান। যদু নায়ক মিরযা নাথন কর্তৃক প্রেরিত সৈন্যবাহিনীর সংবাদ পান। তিনি মনে করেন যে দু বাহিনী দু দিক থেকে মিলিত হওয়ার আগে এক এক বাহিনীকে পৃথক পৃথকভাবে মুকাবিলা করা উচিত। তাই যদু নায়ক হাবিব খান লোদীকে প্রথম আক্রমণ করেন। প্রথমে হাবীব খান লোদী পরাজিত হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু হাবীব খান অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেন এবং যদু নায়ক পরাজিত হন। যদু নায়ক পলায়নের পথে বাকু দুর্গে সাইফ খান লোদীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু এখানেও পরাজিত হয়ে যদু নায়ক মুস্তফা কুলী বেগকে আক্রমণ করেন, মুস্তফা কুলী বেগ প্রায় পরাজিত হয়েছেন, এমন সময় হাবীব খান লোদী তাঁর

Edited by Ripon Sarkar

সাহায্যে আসায় যদু নায়ক পালিয়ে পর্বতে আশ্রয় নেন। যদু নায়ক আবার সৈন্য সংগ্রহ করেন, মোগলদের দুর্গের সম্মুখে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং মোগলদের রসদ এবং পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ফলে তিনি নিজে আহত হলে তাঁর সৈন্যরা পলায়ন করে। ইতোমধ্যে, বর্ষাকাল এসে পড়ায় মিরযা নাথন সুয়ালকুচি গমন করেন এবং সেখানে বর্ষাকালে থাকার মনস্থ করেন। বর্ষার সুযোগ নিয়ে ডাঙ্গর দেবের নেতৃত্বে খতরীভাগের[৭৯] রায়তরা খাজনা দেয়া বন্ধ করে দেয়। মিরযা নাথন সেখানে একদল সৈন্য পাঠান এবং ডাঙ্গর দেবকে খতরীভাগের নেতৃত্ব দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অনুগত করে নেন এবং রায়তরাও খাজনা আদায় করতে থাকে। এদিকে রাজা শত্রুজিত ডাঙ্গর দেবের এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাহায্য করে ডাঙ্গর দেবকে আক্রমণ করার জন্য প্ররোচিত করেন। উভয় প্রতিদ্বন্দ্বীর যুদ্ধে ডাঙ্গর দেব নিহত হন। ডাঙ্গর দেবের চারজন পত্নী আত্ম-হত্যা করেন, ডাঙ্গর দেবের ছেলেরা মিরযা নাথনের অনুগত হয়। এ সময় মিরযা নাথনের মনসব উন্নীত হয় এবং তিনি শিতাব খান উপাধি লাভ করেন।[৮০]

ইতোমধ্যে আবার হাজোতে শয়খ কামাল ও মীর সফীর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মীর সফী ছিলেন কামরূপের দিওয়ান, বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ। মীর সফী শয়খ কামালের নিকট থেকে কামরূপের সম্পূর্ণ হিসাব দাবি করলে শয়খ কামাল অস্বীকৃতি জানান এবং উভয়ে নিজ নিজ বক্তব্য লিখে সুবাদারের নিকট প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সুবাদার মীর শামস নামক এক ব্যক্তিকে এ অভিযোগ তদন্তের জন্য পাঠান। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে শয়খ কামালের মৃত্যু হয়। অতঃপর সুবাদার তাঁর বেগমের ভাই-এর ছেলে মিরযা বাহরামকে কামরূপের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। এ সময় মীর সফীর সঙ্গে মিরযা নাথনের বিরোধ বাধে এবং উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। অন্যান্য অফিসারদের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ না হলেও উভয়ে সুবাদারের নিকট অভিযোগ করেন, সুবাদার প্রাদেশিক খান সামান আকাতকী এবং রাজা রঘুনাথকে এ বিষয়ে তদন্তের ভার দিয়ে পাঠান কিন্তু তাঁরা আসার আগেই মীর সফী ঢাকায় চলে যান।[৮১]

এ সময় ঢাকায় মসনদ-ই-আলা মুসা খানের মৃত্যু হয়। সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। মুসা খানের মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে মিরযা নাথনের বিবরণ অনুসরণ করলে মনে হয় ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে বা ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে মুসা খানের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে সুবাদার মুসা খানের জ্যেষ্ঠ ছেলে মাসুম খানকে খেলাত প্রদান করে পুরস্কৃত করেন, তখন মাসুম খানের বয়স ছিল ১৮/১৯ বছর। সুবাদার মুসা খানের পেশওয়া বা মন্ত্রী এবং এ্যাডমিরাল, খাজা চাঁদ, রামাই লস্কর, আদিল খান এবং জানকী বল্লামকেও খেলাত দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তাঁদের মাসুম খানের পেশওয়া বা মন্ত্রী রূপে বহাল রাখেন। ইবরাহীম খান মাসুম খানকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।[৮২]

মীর সফী ঢাকায় গেলে মিরযা নাথন প্রথম খুন্তাঘাটে খেদা করে হাতি ধরেন এবং তারপর যদু নায়কের বিরুদ্ধে ভূজমালায় যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি নগরবেরায় গিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। যদু নায়ক তাঁকে বাধা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে যদু নায়ক আহত হয়ে পলায়ন করে পার্বত্য দুর্গে আশ্রয় নেন। মিরযা নাথন

Edited by Ripon Sarkar

তাঁকে তাড়া করেন, কিন্তু শত্রুরা কাঠের বড় বড় টুকরা দিয়ে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। মোগল সৈন্যরা সকল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে শত্রুর দুর্গ আক্রমণ করে এবং চার ঘণ্টা যুদ্ধের পর শত্রুরা জঙ্গলে পলায়ন করে। মোগল সৈন্যরা তখন দু ভাগে বিভক্ত হয়, নিক মুহাম্মদ বেগের অধীনে এক বিশাল বাহিনী পর্বতের উপরে যদু নায়ককে তাড়া করতে পাঠানো হয় এবং মিরযা নাথন নিজে আর এক বাহিনীর নেতৃত্বে পর্বতের পাদদেশ দিয়ে অগ্রসর হন। নিক মুহাম্মদের সঙ্গে পঞ্চাশটি ঢুলী দেয়া হয়; মোগল অফিসারদের মধ্যে যাঁরা পর্বতে আরোহণ করতে পারবে না তাঁরা যেন ঢুলীতে চড়ে যেতে পারে; ঢুলী বহন করার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কাহারও দেয়া হয়। নিক মুহাম্মদ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করে শত্রুদের গোপন অবস্থান স্থানে আগুন লাগিয়ে দেন। ফলে শত্রুরা সেখান থেকেও পালিয়ে যায়। যদু নায়ক তখন উচ্চ পার্বত্য এলাকায় রাজা নীল রঙ্গিলীর নিকট আশ্রয় নেন। রাজা নীল রঙ্গিলী যদু নায়ককে তাঁর পরিবারসহ আশ্রয় দেন, কিন্তু মোগলরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা যদু নায়ককে তাঁর পরিবারসহ আশ্রয় দেন, কিন্তু মোগলরা তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা যদু নায়ককে আটক করেন এবং নিজে মোগল সৈন্যদের যথাসম্ভব বাধা দেন। মোগল সৈন্যরা অনেক দূর থেকে হেঁটে যাওয়ায় প্রথম দিনের যুদ্ধে সুবিধা করতে পারল না, কিন্তু রাত্রে শত্রুরা মোগলদের প্রবলভাবে আক্রমণ করে। মোগল সৈন্যরা সতর্ক ছিল এবং মোগল পক্ষের কোচ সৈন্যরাও প্রাণপণে যুদ্ধ করে। ফলে শত্রুরা পরাজিত হয়ে দুর্গে ফিরে যায়। পরের দিন যুদ্ধ হওয়ার আগে নিক মুহাম্মদ রাজা নীল রঙ্গিলীর নিকট নিম্নরূপ সংবাদ দেনঃ 'আপনি আপনার পাহাড় ধ্বংস হতে দিচ্ছেন কেন? আমরা যদু নায়ককে ছেড়ে দেব না, তিনি এই শ শ পর্বত অতিক্রম করলেও আমরা তাঁকে তাড়া করব। আপনি যদি তাঁকে তাঁর স্ত্রী পুত্রসহ জীবিত আমাদের হাতে সমর্পণ করেন, আমাদের প্রভুর নিকট থেকে আপনি অনেক পুরস্কার পাবেন এবং আপনাকে উপরের পার্বত্য অঞ্চলের সকল রাজার সরদার বা নেতা নিযুক্ত করা হবে। গালিচা এবং টীকা (পবিত্র চিহ্ন) অর্থাৎ রাজকীয় চিহ্ন যা আপনি ভাগ্যের এবং খ্যাতির প্রতীক বলে মনে করেন, তা আমার ফিরে যাওয়ার আগেই আপনাকে দেয়া হবে।' রাজা উত্তরে বলেনঃ "যদি আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে সোনার পোশাক দেন, আমার আত্মীয়দের তিনশ টাকা পুরস্কার দেন এবং আমাকে সকল রাজার নেতা করে গালিচা এবং টীকা দেন, তাহলে আমি যদু নায়ককে তাঁর পরিবার ও অনুসারীদের সহ ধরিয়ে দেব।" নিক মুহাম্মদ এ শর্তে রাজি হন এবং রাজা ও রাণীকে খেলাত, নগদ অর্থ এবং গালিচা ও টীকা দেন। রাজার লোকেরা যদু নায়ককে বন্দী অবস্থায় নিক মুহাম্মদ বেগের হাতে সোপর্দ করে। নিক মুহাম্মদ বেগ যদু নায়ক এবং তাঁর পরিবারকে নিয়ে মিরযা নাথনের নিকট চলে আসেন। মিরযা নাথন সকল বন্দীকে সঙ্গে নিয়ে সুয়ালকুচি চলে যান। এর অল্পদিন পরে বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে সুবাদার ইবরাহী খান ফতেহজঙ্গ নিহত হন।[৮৩]

উপরে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে কামরূপে মোগলদের যুদ্ধের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ বিস্তারিত বিবরণটি পাওয়া যায় বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে; লেখক মিরযা নাথন নিজেই এ যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। কামরূপের আঞ্চলিক ইতিহাস কামরূপের বুরঞ্জীতে সংক্ষিপ্তভাবে এ বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ কাহিনী মর্মান্তিক ও বিরক্তিপূর্ণ, কারণ একই এলাকায় বারবার বিদ্রোহ, বিদ্রোহ দমন, এবং আবার বিদ্রোহ, উভয় পক্ষে লোক ক্ষয়, লুটতরাজ ইত্যাদি এ বিবরণের মূল কথা।

Edited by Ripon Sarkar

মোগলদের তুলনায় বিদ্রোহীরা ছিল অত্যন্ত তুচ্ছ, মিরযা নাথনের ভাষায় তিনি মাছুয়াদের (মাছ ব্যবসায়ী) সঙ্গে যুদ্ধ করেন।[৮৪] কিন্তু এ মাছুয়াদের সঙ্গে যুদ্ধেই মোগলদের প্রায় দশ বছর (কাসিম খানের সময় থেকে) কাটাতে হয় এবং অনেক সৈন্য ক্ষয় হয়। কামরূপের বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল রাজা পরীক্ষিতের আত্মীয়রা এবং কয়েকজন পার্বত্য রাজা, কিন্তু এঁরা রাজা নামে পরিচিত হলেও এঁদের বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না, কোন অর্থবল ছিল না এবং যুদ্ধের সরঞ্জামও ছিল অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু তবুও এত দীর্ঘ সময়ে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টিকে থাকার প্রধান কারণ ছিল তাঁদের স্বদেশ ও স্বাধীনতা প্রীতি। এ জন্য তারা বার বার পরাজিত হয়েও মোগলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। দ্বিতীয় কারণ মোগল সেনাপতিদের মধ্যে অনৈক্য ও মতবিরোধ; সেনাপতিদের মতানৈক্য কাসিম খানের সময় থেকে ইবরাহীম খানের সময় পর্যন্ত চলতে থাকে। ইবরাহীম খানের সময় প্রথমে কুলীজ খানকে সেনাপতি এবং কামরূপের জায়গীরদার নিযুক্ত করা হয়, নিযুক্তি সম্রাট নিজেই দেন। কিন্তু কামরূপের যুদ্ধে এ লোকটির কোন অবদান দেখা যায় না বরং অত্যধিক মদ্য পানের অভিযোগে তাঁকে একবার পদচ্যুত করে প্রত্যাহার করা হয়। ইবরাহীম খান চিশতী খানকে সেনাপতি নিযুক্ত করার কথা বাহরিস্তানে পাওয়া যায়, কিন্তু কামরূপে তাঁর ভূমিকার কোন কথা পাওয়া যায় না, তিনি শেষ পর্যন্ত কামরূপে যান কিনা তাও বলা মুশকিল। পরে সরহদ খান (শয়খ আবদুল ওয়াহিদ) এবং শয়খ কামালকে যথাক্রমে প্রধান সেনাপতি এবং সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়, সরহদ খানের কোন ভূমিকাই দেখা যায় না, শয়খ কামালের ভূমিকা শুধু এটুকু দেখা যায় যে তিনি পূর্ব শত্রুতাবশত মিরযা নাথনকে কোন সাহায্য দেননি, বরং সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে পরে প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। এ কাহিনী যেহেতু মিরযা নাথনের লেখা থেকেই পাওয়া যায়, তাঁর প্রতি শয়খ কামালের শত্রুতার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা না গেলেও এটা নিঃসন্দেহ যে কামরূপে মোগল সেনাপতি ও সেনানায়কদের মতানৈক্যের ফলে কামরূপের বিদ্রোহ দমনে অনেক বেগ পেতে হয়। কামরূপের রাজস্ব ব্যবস্থায়ও অনেক ত্রুটি ছিল। শয়খ ইবরাহীম করোরী সাত লক্ষ টাকা আত্মসাত করে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ করেন এবং তিনি অহোম রাজাকে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেন। ফলে মোগল বাহিনী অহোম রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরে কামরূপের দিওয়ান মীর সফীর সঙ্গেও সেনাপতি শয়খ কামালের মতবিরোধ হয় এবং একই কারণে মীর সফীর সঙ্গে মিরযা নাথনের যুদ্ধ বাধার উপক্রম হয়। সুতরাং মোগল সেনাপতিদের মধ্যে মতবিরোধও কামরূপের বিদ্রোহ দমন বিলম্বিত করে। মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বীর সাক্ষ্য যদি সত্য হয়, তাহলে বলতে হবে যে মিরযা নাথন সময় মত এবং প্রয়োজন মত সৈন্য ও সাহায্য পেলে এবং সকল সেনাপতি তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে অতি অল্প সময়েই কামরূপের বিদ্রোহের অবসান হত। এমনকি অহোম রাজা মিরযা নাথনের বিরুদ্ধে বিপুল বাহিনী প্রেরণ করলেও সেনাপতি শয়খ কামাল মিরযা নাথনকে কোনরূপ সাহায্য করেননি, ফলে মিরযা নাথন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন এবং সারা দক্ষিণকূল তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক কষ্টে মিরযা নাথন এ এলাকা পুনরুদ্ধার করেন।

সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গও কামরূপের এই পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। তিনি রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ এবং রাজা পরীক্ষিতকে মুক্তি দেয়ার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানিয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞতার পরিচয় দেন। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ স্বদেশে

Edited by Ripon Sarkar

ফিরে এসে বরাবর অনুগত থাকেন এবং বিদ্রোহ দমনে মোগলদের সহায়তা করেন রাজা পরীক্ষিতকে মুক্তি দেয়া হলেও তিনি শেষ পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক স্বদেশে ফিরে যাননি। কামরূপের বুরঞ্জীর মতে তিনি দ্বিতীয়বার সম্রাটের দরবারে যাওয়ার পথে আত্মহত্যা করেন। এটা সত্য হতে পারে। কিন্তু ইবরাহীম খান কামরূপে সেনাপতি নির্বাচনে বিজ্ঞতার পরিচয় দেননি। তিনি প্রথমে চিশতী খানকে প্রধান সেনাপতি এবং শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। চিশতী খানের কোন ভূমিকা দেখা যায় না, কিন্তু শয়খ কামালের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি কোন খোঁজ খবর রাখেন বলে মনে হয় না। পরে শয়খ কামালের নিকট থেকে আশি হাজার টাকা গ্রহণ করে তিনি শয়খ কামালকে কামরূপের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এবারও শয়খ কামালের ভূমিকা সন্দেহের উর্ধে ছিল না। আগে বলা হয়েছে যে শয়খ কামাল সহযোগিতা না করায় মিরযা নাথন অহোম বাহিনীর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং সমগ্র দক্ষিণকূল মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। তৃতীয়বার সেনাপতি নিযুক্তির সময় সুবাদার নিজে কপটতার আশ্রয় নেন। উত্তরকূলে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীরা পিলা (পিলানী বা জাহাঙ্গীরাবাদ) দখল করে কুলীজ খানের পরিবারসহ চৌদ্দটি হাতি ও অন্যান্য সম্পদ হস্তগত করার সংবাদ যখন ঢাকায় আসে, তখন শয়খ কামাল এবং মিরযা নাথন উভয়েই ঢাকায় ছিলেন। সুবাদার শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করে মিরযা নাথনকে তাঁর অধীনস্থ করে উভয়কে কামরূপে পাঠাবার প্রস্তাব করলে মিরযা নাথন সরাসরি অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তিনি কোন অবস্থাতেই শয়খ কামালের সেনাপতিত্ব মেনে নেবেন না।[৮৪] তখন শয়খ কামাল সুবাদারকে পরামর্শ দেনঃ "প্রথমে তাঁকে (মিরযা নাথনকে) এ অভিযানের সরদার (সেনাপতি) নিযুক্ত করা ভাল হবে; তিনি যখন বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবেন তখন আমাকে সরদার নিযুক্ত করা হলে তিনি যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসতে পারবেন না।"[৮৫] সুবাদার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং মিরযা নাথনকে সেনাপতি নিযুক্ত করে কামরূপে পাঠান। মিরযা কামরূপে গিয়ে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তখন সুবাদার ইবরাহীম খান শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। বোধ হয় মিরযা নাথনের ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য সুবাদার এবার সরহদ খানকে প্রধান সেনাপতি এবং শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন।[৮৬] মিরযা নাথন যদিও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন, তিনি শয়খ কামালের সেনাপতিত্ব মেনে নেননি। সুবাদারের মত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের পক্ষে এরূপ কপটতার আশ্রয় নেয়া শোভনীয় নয়। মোট কথা, সুবাদার ইবরাহীম খান কামরূপে সেনাপতি নিযুক্তির ব্যাপারে বিজ্ঞতার পরিচয় দেননি। শয়খ কামালের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি বারবার শয়খ কামালকে কেন সেনাপতি নিযুক্ত করেন তা বোধগম্য নয়। শয়খ কামালের সঙ্গে তাঁর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না, একবার মাত্র শয়খ কামাল সুবাদারকে আশি হাজার টাকা নযরানা দেয়ার সংবাদ পাওয়া যায়,[৮৭] অন্যান্য বারও কি শয়খ কামাল অর্থের বিনিময়ে তাঁর সেনাপতিত্ব বজায় রাখেন তা বলা যায় না; মিরযা নাথন সুবাদারের আদেশ অমান্য করে শয়খ কামালের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে সুবাদার তাঁকে শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু সুবাদার মিরযা নাথনের ক্ষমতার কথা জানতেন, তাই তিনি মিরযা নাথনের অবাধ্যতা সহ্য করেন কিন্তু যেভাবে তাঁকে শয়খ কামালের অধীনে কাজ করার জন্য কপটতার সাহায্য নেয়া হয়া তা

Edited by Ripon Sarkar

হাস্যকর। যা হোক, সুবাদার ইবরাহীম খানের কামরূপের পরিস্থিতি, কামরূপে মোগল সেনাপতি ও সেনানায়কদের মধ্যে মতবিরোধ অন্তর্দ্বন্দ্ব ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া উচিত ছিল। তিনি প্রথম থেকে একজন যোগ্য, দক্ষ এবং সৎ সেনাপতিকে কামরূপে পাঠালে কামরূপে বিদ্রোহ দমন মোটেই বিলম্বিত হত না। ইসলাম খানের সময় মুকাররম খান যেমন অন্যূন এক বছরের মধ্যে রাজা পরীক্ষিতকে পরাজিত ও বন্দী করে কামরূপ জয় করেন, ইবরাহীম খানও অন্যূন এক বৎসরের মধ্যে কামরূপে শান্তি স্থাপন করতে পারতেন। একথা মনে রাখা দরকার যে ইসলাম খানের সময় মোগলদের প্রতিপক্ষ ছিলেন একজন রাজা, অথচ ইবরাহীম খানের সময় প্রতিপক্ষ ছিলেন কিছু স্বঘোষিত এবং পার্বত্য রাজা এবং বিদ্রোহী সেনানায়ক। তাদের না ছিল রাজ্য, না ছিল সৈন্যবাহিনী, অর্থবল তাদের ছিল না বললেই চলে।

উপসংহারে বলতে হয় কামরূপে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বিদ্রোহ দমন না হওয়ার কারণ ছিল (১) কামরূপের বিদ্রোহীদের স্বদেশ প্রেম, (২) মোগল সেনাপতি ও সেনানায়কদেব মধ্যে মতানৈক্য এবং যুগপৎ যুদ্ধ পরিচালনার সংকল্পের অভাব এবং (৩) সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক শক্তির অভাব।

১। মাসির-উল-উমারা, ১ম, ৬৫৭।

২। তুযুক, ১ম, ২৬০।

৩। ঐ, ২৮৪।

৪। কোকনাদেশ বা কোখার বিহারের জঙ্গলে অবস্থিত ছিল।

৫। তুযুক, ১ম, ৩১৪-১৬।

৬। বাহারিস্তান, ১ম, ৪২১। বেণী প্রসাদ বাংলার সুবাদারদের তালিকায় কুলীজ খানের নামও উল্লেখ করেন, অর্থাৎ ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে কুলীজ খান এবং ইবরাহীম খান উভয়কে বাংলার সুবাদার রূপে দেখান এবং তথ্য নির্দেশে তুযুকের উল্লেখ করেন। (বেণি প্রসাদ হিস্টরী অব জাহাঙ্গীর, ৫ম সংস্করণ, ১৯৬২, ৯৬)। কিন্তু এটা ভুল। জাহাঙ্গীর তুযুকে বলেন, "কুলীজ খানের ভাইপো বালজুর জায়গীর ছিল অযোধ্যায় এবং তার মনসব ছিল ১০০০/৮৫০। আমি তাকে পদোন্নতি দিয়ে ২০০০/১২০০ মনসবে উন্নীত করি এবং তাকে কুলীজ খান উপাধি দিয়ে সুবা বাংলায় নিযুক্ত করি।" (তুযুক, ১ম, ৩৫২)। এখানে কুলীজ খানকে বাংলায় নিযুক্ত করে পাঠাবার কথা বলা হয়েছে, বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করার কথা বলা হয়নি। বাহারিস্তানে বিষয়টি পরিষ্কার, এখানে বলা হয়েছে যে কুলীজ খানকে কোচ এলাকায় নিযুক্ত করা হয় এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি কোচবিহারে ছিলেন। প্রথম কুলীজ খান, অর্থাৎ বালজুর চাচা একজন উচ্চপদস্থ মনসবদার ছিলেন, তিনি আগেই মৃত্যুবরণ করেন এবং জাহাঙ্গীর ১০২২ হিজরীর ১০ই রমযান তারিখে (২৪শে অক্টোবর, ১৬১৩ খ্রিঃ) তাঁর মৃত্যু সংবাদ পান। (তুযুক, ১ম, ২৫০)। তাঁর মৃত্যুর পরে চাচার উপাধি ভাইপো বালজুকে দেয়া হয়।

৭। বাহারিস্তান, ১ম, ৪২১-২২।

৮। কয়েকটি বড় নৌকা একত্র করে মাচান করে মাও তৈরি করা হত।

৯। বাহারিস্তান, ১ম, ৪২২-৪০৬।

১০। এই মিত্রোহনী যাত্রাপুরের মিত্রোহনী। কারণ মির্জা নাথন বাহারিস্তানে একটু পরে বলেছেন যে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ যাত্রাপুর থেকে রওয়ানা হয়ে ঢাকায় আসেন। যাত্রাপুর অর্থাৎ

Edited by Ripon Sarkar

এই ত্রিমোহনী ঢাকার ত্রিশ মাইল পশ্চিমে ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল, ইসলাম খান সেই দুর্গ অধিকার করেন। আরও দেখুন, বাহারিস্তান, ১ম, ৮৪৪-৪৫, টীকা নং ২।

১১। মির্জা নাথনে এক স্থানে কাসিম খানের শ্যালকের নাম শেখ জামাল খান এবং অন্য দুজন সেনানায়কের নাম (তাতার খান মিওয়াতীর ভাই) বাহাদুর খান এবং কাসিম খানের ব্যক্তিগত বখশী মুসা খান (বাহারিস্তান, ১ম, ৪২১) কিন্তু অন্য স্থানে কাসিম খানের শ্যালকের নাম বলেছেন বাহাদুর খান। (ঐ, ৪৩৮)

১২। আমরুল সরকার বারবকাবাদের একটি পরগণা, বর্তমানে রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।

১৩। বাহারিস্তান, ১ম, ৪৩৭-৩৮।

১৪। যুদ্ধে হেরে গেলে পরিবারের সকল মহিলাকে হত্যা করে নিজেও নিহত হওয়ার পণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। হিন্দুদের মধ্যে, বিশেষ করে রাজপুতদের মধ্যে এই জওহরবিধায়ক প্রথা প্রচলিত ছিল। কাসিম খান এটা করায় মনে হয় মুসলমানরাও কোন কোন সময় এটা অবলম্বন করত।

১৫। বাহারিস্তান, ১ম, ৪৩৮-৪৪০।

১৬। ঐ, ৪৩৬।

১৭। এইচ. বি. ২য়, ২৯৮।

১৮। মনহ্যাবাত-এর পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে মনে হয় কামরূপের উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে।

১৯। কাজিরাঘাট হাজো থেকে ধমধমা যাওয়ার পথে নদী অতিক্রম করার কোন ঘাট হবে, আধুনিক মানচিত্রে এটা চিহ্নিত নেই।

২০। বাহারিস্তান, ২য়, ৪৪৪-৪৪৬।

২১। (ক) তাঁর আসল নাম শায়খ মউদুদ চিশতী, তিনি ইসলাম খানের চাচা ছিলেন। ইসলাম খানের ভাই গিয়াস খানের মৃত্যুর পরে শায়খ মউদুদকে যশোরের ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে শায়খ মউদুদকে চিশতী খান উপাধি দেয়া হয়। তুযুক, ১ম, ৩৭৯।

২১। (খ) আসামের ওজন প্রায় এক সের। শায়খ ইবরাহিমের কোন স্ত্রীরাই এই দুর্গে ছিল, অন্য স্ত্রী, অর্থাৎ পরিত্যাগীদের তিনি আগেই সরিয়ে পাঠিয়ে দেন। বাহারিস্তান, ২য়, ৪৬০।

২২। বাহারিস্তান, ২য়, ৪৬৭-৪৭৭।

২৩। ঐ, ৪৭৮।

২৪। বুড়া গোহাঞি ছিলেন অহোম রাজার সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তা, রাজার পরেই তাঁর স্থান ছিল। সাধারণত এই পদটি একটি বিশেষ গোত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, এবং বংশানুক্রমিকভাবে ঐ গোত্রের লোক নিযুক্ত হত, অবশ্য গোত্রের মধ্যে কাকে নিযুক্ত করা হবে তা রাজাই নির্ধারণ করতেন। বড় গোহাঞি ও বড় পাত্র গোহাঞি নামে আরও দুজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিল, তারা প্রত্যেকেই দশ হাজার সৈন্যের নেতৃত্ব দিত। (ই. এ. গেইটঃ হিস্টরী অব আসাম, ২০৫-০৬।) কামরূপের বুরঞ্জীতে (পৃঃ ২০) বুড়া গোহাঞির নাম থাককক বুড়া গোহাঞি। আরও দেখুন, বাহারিস্তান, ২য়, ৮৪৬ টীকা, ১।

২৫। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আউলিয়া নামক একজন দরবেশের মাযার হাজোতে অবস্থিত। তাঁর জীবন কাহিনী জানা যায় না, কিন্তু স্থানীয় জনশ্রুতি মতে তিনি একজন বড় দরবেশ ছিলেন এবং কামরূপে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি হাজোতে একটি পাহাড়ের চূড়ায় একখানি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং এই মসজিদের নিকট তিনি সমাহিত। তাঁর মাযার পোয়া মক্কা বা মক্কার এক-চতুর্থাংশ নামে পরিচিত।

২৬। কেদার মন্দির এবং মাধব মন্দির দুটি হাজোতে অবস্থিত এবং হিন্দুদের নিকট অতি পবিত্র। কেদার মন্দিরের নিকটে একটি জলাশয় আছে, স্থানীয় লোকেরা এই জলাশয়কে পবিত্র মনে করে এবং জলাশয়ে স্নান করা পুণ্যের কাজ মনে করে। কামরূপের বুরঞ্জী, পৃঃ ১২১)

Edited by Ripon Sarkar

২৭ বাহারিস্তানে এই নামটি শমাকদেব, সুমাক এবং শমাকদ লেখা হয়েছে, নামটি প্রকৃতপক্ষে সমুদ্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

২৮। বড়গোরা নদী ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল থেকে নির্গত হয়ে কামরূপের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

২৯। বাহারিস্তান, ২য়, ৪৮৭-৮৮।

৩০। ঐ, ৪৯৪-৯৫।

৩১। ঐ, ৪৯৫-৯৬।

৩২। ঐ, ৪৯৬-৯৭।

৩৩। মধুসূদন ছিলেন রঘুদেবের আঠার ছেলের অন্যতম বৃষকেতুর ছেলে। কামরূপের বুরঞ্জী, ৭।

৩৪। বাহারিস্তান, ২য়, ৫০৪।

৩৫। তাঁরা ছিলেন পার্বত্য নেতৃবৃন্দ, মগুরোলী পর্বতের উত্তর দিকে তাঁদের ছোট পার্বত্য রাজ্য স্থাপিত ছিল।

৩৬। এই সকল স্থান বর্তমান গোয়ালপাড়ায় অবস্থিত।

৩৭। বাহারিস্তান, ২য়, ৫১১-১৪।

৩৮। ঐ, ৫১৫-৫২১।

৩৯। ঐ, ৫২১।

৪০। তুযুক, ২য়, ২।

৪১। স্মরণ করা যেতে পারে যে মুকাররম খান রাজা পরীক্ষিতকে তাঁর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিলে পরীক্ষিত আত্মসমর্পণ করেন। কাসিম খান মুকাররম খানের নিকট থেকে পরীক্ষিতকে ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করেন এবং সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেন। সুতরাং পরীক্ষিতের মুক্তির জন্য মুকাররম খান যে সুপারিশ করেন, তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা।

৪২। কামরূপের বুরঞ্জী, ১০-১৩।

৪৩। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ যে এক লক্ষ টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন, এটা নতুন সংবাদ, সম্রাট তাঁকে মুক্তি দেয়ার সময় এরূপ কোন শর্ত দেননি, অন্ততপক্ষে তুযুক বা বাহারিস্তানে এরূপ কোন কথা নেই। তাই মনে হয় সুবাদার ইব্রাহীম খান অর্থের লোভে এই শর্ত আরোপ করেন। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ প্রথম থেকে মোগলদের প্রতি অনুগত ছিলেন, তিনি কোন দিন মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। তাঁকে কাসিম খান ঢাকায় ডেকে এনে বিনা কারণে বন্দী করেন এবং সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেন। এটা ছিল একটি ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ কাজ। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের সম্রাটের দরবারে থাকাকালীন সময়ে রাজার ছেলেও যুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করেন। (বাহারিস্তান, ১ম, ৩৫২)। এরূপ অনুগত রাজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সময় আবার এক লক্ষ টাকা আদায় করাও অবশ্যই ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ।

৪৪। বাহারিস্তান, ১ম, ২২৪-২২৮।

৪৫। ঐ, ২য়, ৫২৪-২৫।

৪৬। দুটি স্থানই রাঙ্গজুলী পর্বতমালার নিকটে অবস্থিত, রাঙ্গজুলী পর্বত আবার গারো পর্বতমালার বর্ধিত অংশ। দুটি স্থানই ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে গোয়ালপাড়া জেলায় অবস্থিত। (বাহারিস্তান, ২য়, ৮৪৯ টীকা নং ৭)।

৪৭। গোয়ালপাড়া জেলার হাবড়াঘাট মৌজায় অবস্থিত।

৪৮। বালু গোবিন্দ কামরূপের কোনস্থলা স্থানের শাসক ছিলেন। বালু গোবিন্দের নাম কোন কোন স্থানে বালুন গোবিন্দ বা গোবিন্দ বালুন লেখা হয়েছে। আবার তাঁর নাম গোবিন্দ লক্ষরও

Edited by Ripon Sarkar

লেখা রয়েছে। এক স্থানে মিরজা নাথন গোবিন্দ মামুদকে রাজা পরীক্ষিতের ভাই এবং রাজা বলদেবের চাচা বলেছেন। বাহারিস্তান, ২য়, ৫৭৯।

৪৯। বাহারিস্তান ২য়, ৫১৮-৫৪০।

৫০। কামরূপ জেলায় সর্কাণ্ড নামে একটি পরগণা আছে, এটাই বোধ হয় মিরজা নাথনের যোহাতি।

৫১। পাণ্ড-গিরি বা পঞ্চরত্ন পাহাড় ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

৫২। বাহারিস্তান ২য়, ৫৪৬-৫৫০।

৫৩। বাদু কামরূপ জেলার বজালি থানার চণ্ডাতড়ি মৌজায় অবস্থিত।

৫৪। আক্রা রাজা ছিলেন পার্বত্য আঠার জন রাজার একজন।

৫৫। বড় দুয়ার গারো পাহাড়ের নিকটস্থ একটি পার্বত্য রাজ্য।

৫৬। বামুন রাজা এবং কানওয়াল রাজা উভয়ে বড় দুয়ারের নিকটবর্তী স্থানের পার্বত্য রাজা।

৫৭। বাহারিস্তান, ২য়, ৫৫৬-৫৬৬।

৫৮। হাবোবাড়ি কামরূপ জেলার গৌহাটি থানার বেলতলা মৌজায় অবস্থিত।

৫৯। বাহারিস্তান, ২য়, ৫৬৬-৬৯।

৬০। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে এই দুর্গে রাজা শত্রুজিত এবং রাজা চু-সিংহকে নিযুক্ত করা হয় (মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি) কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেননি যে রাজা চু-সিংহ আগেই বিদ্রোহ করে মিরজা নাথনের পক্ষ ত্যাগ করেছেন। এখানে লেখা হয়েছে ভূষণার রাজা শত্রুজিত, ডঃ ভট্টাচার্য ভূষণাকে চু-সিংহ মনে করেছেন।

৬১। বাহারিস্তান, ২য়, ৫৬৯-৫৭৯।

৬২। রাজা পরীক্ষিতের সঙ্গে সম্পর্ক বাহারিস্তানে উল্লেখ করা হয়নি (বাহারিস্তান ২য়, ৫৭৯)।

৬৩। কামরূপ জেলার সিংরা থানায় এই স্থান অবস্থিত।

৬৪। বাহারিস্তান ২য়, ৫৭৯-৫৮৪।

৬৫। ঐ, ৫২২-২৪।

৬৬। ইনি মিরজা নাথনের চাচা মিরজা মাদারী।

৬৭। বাহারিস্তান ২য়, ৫৮৩-৫৮৭।

৬৮। রাজা পরীক্ষিতের জামাতা যিনি পরীক্ষিতের সঙ্গে যুদ্ধে রাঙ্গামাটিতে নিহত হন।

৬৯। এরা সব ছোট ছোট দলপতি।

৭০। বাহারিস্তান, ২য়, ৫৯১-৬০৫।

৭১। ধাকানবুজী কামরূপ জেলার দুমুরিয়া থানার প্রায় বার মাইল পূর্বে অবস্থিত।

৭২। কামরূপ জেলার হালিগাঁও থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে বিলসী অবস্থিত।

৭৩। বাহারিস্তান, ২য়, ৬১০-৬১৭।

৭৪। ঐ, ৬২১-২৫।

৭৫। সুবাদার বন্দীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেন বা তাঁদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নেন তা বাহারিস্তানে উল্লেখ করা হয়নি।

৭৬। বাহারিস্তান, ২য়, ৬২৬-৬২৯।

৭৭। কামরূপের বুরঞ্জীর (পৃঃ ৭) মতে চন্দ্র সিংহ রাজা পরীক্ষিতের ভাই ছিলেন।

Edited by Ripon Sarkar

৭৮। বাহারিস্তান, ১ম, ৬৫৮-৬৬১।

৭৯। বর্তমান কামরূপ জেলার হুবিয়া মৌজায় অবস্থিত। মোগল আমলে এটা সরকার কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল (কামরূপের বুরঞ্জী, ১০১)।

৮০। বাহারিস্তান, ১ম, ৬৬১-৬৬৬।

৮১। ঐ, ৬৭৭-৭৮।

৮২। ঐ, ৬৭৯-৮০। মুসা খানের মৃত্যুর তারিখ কোথাও পাওয়া যায় না। মির্জা নাথনের বিবরণের ভিত্তিতে এখানে তারিখ অনুমান করা হলেও এই অনুমান মোটেই কল্পনার উপর নির্ভরশীল নয়। মির্জা নাথন ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে পাঁচটি বর্ষাকালের কথা বলেছেন, তৃতীয় বর্ষাকালের পরে মির্জা নাথন একটানা দেড় বছর ঢাকায় অনুপস্থিত থাকায় একটি বর্ষাকালের কথা বাদ পড়েছে। সেই বাদ যাওয়া বর্ষাকাল হিসাব করলে ষষ্ঠ বর্ষাকালের পরে মুসা খানের মৃত্যু হয়। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহীম খানের সুবাদারী আমলের প্রথম বর্ষাকাল, তাই ষষ্ঠ বর্ষাকাল হয় ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে। এ হিসাবে আমরা মুসা খানের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করেছি। ঢাকার কার্জন হল এবং শহীদুল্লাহ হলের মধ্যবর্তী স্থানে একখানি প্রাচীন মসজিদ আছে, এটা মুসা খানের মসজিদ নামে পরিচিত, স্থানটিও বাগ-ই-মুসা খান বা মুসা খানের বাগান নামে পরিচিত। এখানেই মুসা খান সমাহিত আছেন। (এ. এইচ. দানী: ঢাকা, ১৭৫)। এই মসজিদের চত্বরে প্রখ্যাত জ্ঞানতাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহও সমাহিত আছেন। মসজিদ এবং এ দুজন মহাপুরুষের কবর সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন।

৮৩। ঐ, ৬৮০-৬৮৬।

৮৪। ঐ, ৬৫১।

৮৫। ঐ, ৬৫৩।

৮৬। ঐ, ৬৫৭-৫৮।

৮৭। ঐ, ৫৫২।

Edited by Ripon Sarkar

দশম অধ্যায়

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ : ত্রিপুরা বিজয়

বাংলার পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্য; উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘ সাধারণ সীমান্ত রয়েছে। সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে বাংলার মুসলমান সুলতানদের কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে, যুদ্ধে জয় পরাজয় হয়েছে। উভয় পক্ষ উভয় পক্ষের সীমান্তবর্তী কিছু স্থান দখল করতে সমর্থ হলেও এতে সীমান্তের সাময়িক রদবদল হয়েছে মাত্র, স্থায়ীভাবে কোন পক্ষ অন্য প্রতিপক্ষকে গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি বা রাজ্যচ্যুত করতে পারেনি।[১] তবে এর ফলে ত্রিপুরার শাসনকার্যে কিছু কিছু মুসলমান প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[২] বাংলার একজন মুসলমান সুলতান ত্রিপুরার রত্ন-ফা নামক একজন বিতাড়িত যুবরাজকে ত্রিপুরার সিংহাসন পেতে সাহায্য করেন।[৩] সুতরাং ত্রিপুরায় যে শুধু মুসলমান শাসনের প্রভাব হয় তা নয়, এবং ত্রিপুরার রাজাদের মাণিক্য উপাধিও বাংলার সুলতান কর্তৃক প্রদত্ত।[৪] এতদসত্ত্বেও মুসলমান আমলে ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ছিল। সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরা রাজ্য জয় করেন। ত্রিপুরা কয়েক বছর মোগল অধিকারে থাকে এবং রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে সম্রাটের দরবারে যান।

ত্রিপুরা রাজ্যে মোগল অভিযান, এ অভিযানের সাফল্য এবং মোগল শাসনের প্রাচীনতম ও সমসাময়িক উপাদান মির্জা নাথনের বাহারিস্তান-ই-গায়বী। মির্জা নাথন নিজে ত্রিপুরায় মোগল অভিযানে অংশ নেননি, কিন্তু তিনি বাংলার সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া ত্রিপুরা রাজ্য বিজিত হওয়ার পরে মির্জা নাথন নিজে ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুরে গমন করেন। রাজমালা তৃতীয় লহরেও ত্রিপুরায় মোগল অভিযান এবং মোগল শাসন সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া যায়। রাজমালা তৃতীয় লহর ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দ মাণিক্য এবং তদানুজ রামদেব মাণিক্যের শাসনকালে, অর্থাৎ সপ্তদশ শতকের শেষপাদে রচিত হয়। সুতরাং রাজমালা সমসাময়িক নয়, কিন্তু সমসাময়িক না হলেও যেহেতু এটা ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্ত, এবং রাজাদের আদেশেই রচিত, রাজমালার বিবরণও মূল্যবান। তাছাড়া বিশেষ কয়েকটি ঘটনার কথা বাদ দিলে বাহারিস্তান-ই-গায়বী এবং রাজমালার সাক্ষ্য প্রায় অভিন্ন এবং উভয় সূত্রে বিশেষ মিল রয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে রাজমালার সম্পাদক কালী প্রসন্ন সেন এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন, বাহারিস্তান-ই-গায়বী তখনও প্রকাশিত না হওয়ায়, তিনি এ মূল্যবান সূত্রের ব্যবহার করতে পারেননি। নলিনী কান্ত ভট্টশালী[৫] বিষয়টি আলোচনা করে নতুন আলোকপাত করেছেন, তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কিছু কিছু মতানৈক্য রয়েছে। স্যার যদুনাথ সম্পাদিত হিস্টরি অব বেংগল দ্বিতীয় খণ্ডে সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, কিন্তু তাঁর আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত যে তিনি বিষয়টিকে কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না।

ত্রিপুরায় মোগল অভিযানের তারিখ বাহারিস্তান বা রাজমালা কোন সূত্রে সরাসরি উল্লেখ নেই। মোগল অভিযানের ফলে ত্রিপুরার রাজার ভাগ্যে কি ঘটে, সে বিষয়ে বাহারিস্তান এবং রাজামালার মধ্যে কিছুটা গরমিল দেখা যায়। কিভাবে, কেন এবং কখন

Edited by Ripon Sarkar

ত্রিপুরায় মোগল শাসনের অবসান হয়; তার কিছু ব্যাখ্যা রাজমালায় পাওয়া গেলেও বাহরিস্তানে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে কয়েক স্থানে ত্রিপুরা অভিযানের বিবরণ পাওয়া যায়, এ বিবরণগুলি নিম্নরূপঃ[৫]

(১) ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে স্থলপথে দুটি এবং জলপথে একটি বাহিনী পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। স্থলপথের একটিতে দু হাজার সাতশ অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুকধারী সৈন্য এবং বিশটি হাতি পাঠানো হয়। হাসান বেগ খান শয়খ উমারীর ছেলে মিরযা ইসফনদিয়ার এ বাহিনীর নেতৃত্ব লাভ করেন। দ্বিতীয় স্থলবাহিনীতে তিন হাজারের বেশি অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী এবং পাঁচটি হাতি ছিল। মিরযা নূর-উদ-দীন এবং মসনদ-ই-আলা মুসা খান জমিদারকে[৬] এ বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হয়। প্রচুর যুদ্ধের সরঞ্জামসহ তিনশ রণতরী খান ফতেহজঙ্গের (সুবাদারের) অধীনস্থ একজন অফিসার এডমিরাল বাহাদুর খানের নেতৃত্বে পাঠানো হয়। এক শুভ সময় এ সৈন্যবাহিনী যাত্রা করে এবং ব্রহ্মপুত্র নদের নিকট পৌঁছে নদী অতিক্রম করতে শুরু করে।[৭]

(২) মোগল স্থল ও নৌ-বাহিনী কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করে কৈলাগড়[৮] পৌঁছলে ত্রিপুরার রাজা মোগল বাহিনীকে রাত্রি বেলায় আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেন। তিনি এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং দুশ হাতিসহ মধ্য রাত্রে মিরযা ইসফনদিয়ারকে আক্রমণ করেন। মিরযা ইসফনদিয়ার তখন কৈলাগড় অতিক্রম করে উদয়পুরের[৯] নিকটে পৌঁছেছিলেন। দু পক্ষে ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হয়, অবশেষে মোগল পক্ষ জয়লাভ করে এবং ত্রিপুরার রাজা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাঁর সৈন্যদের পেছনে ফেলে রেখে পলায়ন করেন। মোগল সৈন্যরা ত্রিপুরার সত্তরটি হাতি হস্তগত করে।

পরাজিত ত্রিপুরার রাজা পলায়নের পথে মিরযা নূর-উদ-দীন এবং মসনদ-ই-আলা মুসা খানের সামনে পড়েন। মোগল সৈন্যরা তখন নিদ্রিত ছিল। এ সুযোগে ত্রিপুরার রাজা মোগল সৈন্যদের আক্রমণ করেন, কিন্তু প্রায় তিন ঘণ্টা যুদ্ধের পরে আবার পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন।[১০]

(৩) পরাজিত ত্রিপুরার রাজা উদয়পুরে পৌঁছে তাঁর নৌ এবং স্থলবাহিনী মোগলদের বিরুদ্ধে পাঠান; নদীতে পুল তৈরি এবং নদীর উভয় তীরে দুর্গ তৈরি করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। ত্রিপুরার সেনাপতিরা আদেশ পালন করেন। কিন্তু এ যুদ্ধেও ত্রিপুরার বাহিনী পরাজিত হয় এবং মোগল বাহিনী উদয়পুরের দিকে যাত্রা করে। এ সময় খবর পাওয়া গেল যে ত্রিপুরার রাজা পরিবার পরিজন নিয়ে উদয়পুর ত্যাগ করেছেন। মোগল বাহিনী তিন দিন তিন রাত্রি রাজার পশ্চাদ্ধাবন করে। যতদূর সম্ভব তারা ঘোড়ায় চড়ে যায়, জঙ্গলে ঘোড়ায় চড়া অসম্ভব হলে তারা হাতিতে চড়ে যায় এবং আরও গভীর জঙ্গলে গেলে পায়ে হেঁটে রাজার খোঁজে গমন করে।[১১]

(৪) পর্বতের নিকটে এসে রাজা তাঁর হাতিগুলি ছেড়ে দেন, কারণ প্রথমত, গভীর জঙ্গলে হাতি তাঁর কোন কাজে এলো না, এবং দ্বিতীয়ত, হাতি ছেড়ে রাজা তাঁর অনুসরণকারী মোগল সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। ঘটনাক্রমে মিরযা নূর-উদ-দীনের একজন

Edited by Ripon Sarkar

ভৃত্য এবং মিরযা ইসফনদিয়ারের একজন মোগল[12] একটি পর্বতের চূড়ায় উঠে দেখে যে কয়েকজন স্ত্রীলোক সারিবদ্ধভাবে হেঁটে যাচ্ছে। (মিরযা নূর-উদ-দীনের) ভৃত্যটি তাদের পেছনে ধাওয়া করে এবং একজনকে ধরে ফেলার চেষ্টা করে, স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে উঠে। রাজা নিকটেই গাছের নিচে আত্মগোপন করে ছিলেন, তিনি এই ঘটনা দেখেন। রাজা তাড়াতাড়ি এসে ভৃত্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করেন। ভৃত্যটি আঘাত পেলেও রাজাকে তরবারি দিয়ে আঘাত করে, ভৃত্য দ্বিতীয়বার আঘাত করার চেষ্টা করলে রাজা চিৎকার করে বলেন, 'আমি ত্রিপুরার রাজা'। এতে ভৃত্য তরবারি কোষবদ্ধ করে রাজার কোমর জড়িয়ে ধরে। কিন্তু রাজা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং ভৃত্যটিও রক্তপাতে কাতর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং রাজা পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ভৃত্য চেতনা হারাবার আগে মোগলকে চিৎকার করে বলেঃ 'আমি তাঁর কাজ শেষ করে দিয়েছি, তাঁকে যেতে দিও না' মোগল দৌড়ে গিয়ে রাজার কোমর ধরে ফেলে এবং রাজাকে মাটিতে ফেলে দেয়। সে যখন রাজাকে বাঁধার চেষ্টা করছিল, তখন মিরযা নূর-উদ-দীন, মিরযা ইসফনদিয়ার এবং মুসা খান একের পর এক এসে উপস্থিত হন এবং রাজাকে বন্দী করেন। রাণীরাও জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, তাঁদেরও মণি-মুক্তাখচিত অস্ত্র এবং বিপুল ধন-সম্পদসহ বন্দী করা হয়। তাঁরা সেখানে পাঁচ দিন থেকে রাজার ছেড়ে দেয়া হাতিগুলিও ধরে ফেলেন। অতঃপর বিজয়ী মোগল বাহিনী উদয়পুরে গমন করে এবং সুবাদার ফতেহজঙ্গের নিকট বিস্তারিত বিবরণ পাঠায়। সুবাদার উত্তরে মিরযা নূর-উদ-দীন, মিরযা ইসফনদিয়ার এবং মুসা খানকে আদেশ দেন যেন তাঁরা সমস্ত সৈন্যবাহিনী সেখানে (উদয়পুরে) রেখে রাজা, রাজ পরিবার এবং ধন-সম্পদসহ জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) চলে যান। খান ফতেহজঙ্গ বিজয় সংবাদ সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন।[১৩]

(৫) (এই অংশে লেখক মিরযা নাথন প্রথমে ত্রিপুরার রাজার বন্দী হওয়ার ঘটনাবলী পুনরুল্লেখ করেছেন; নতুন যা লেখা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ)

ত্রিপুরার রাজাকে জমিদারদের সরদার ঈসা খানের ছেলে মসনদ-ই-আলা মুসা খানের তত্ত্বাবধানে ঢাকায় খান ফতেহজঙ্গের নিকট পাঠানো হয়। খান ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরার সুন্দর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা শুনে সেখানে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। ত্রিপুরায় সুশাসনের ব্যবস্থা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

(খান ফতেহজঙ্গ যে পথে ত্রিপুরা গমন করেন) সেই একই পথে মিরযা নাথনও মাও[১৪] নৌকায় করে হাতি নিয়ে ঢাকা থেকে উদয়পুরে গমন করেন। মেঘনা[১৫] নদীতে পৌঁছুলে বর্ষাকালীন নদীর উত্তাল তরঙ্গের মুখে তিনি হাতিগুলি নিতে অক্ষম হয়ে হাতিগুলিকে নদীর চরে রেখে দেন এবং তাদের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। মুসা খানও মিরযা নাথনের সঙ্গে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঢেউ এর চোটে মুসা খানের দুটি নৌকা ডুবে যায়, কিন্তু মিরযা নাথনের নৌকার কোন ক্ষতি হয়নি। ফতেহজঙ্গ উদয়পুরে পৌঁছার দু দিন পরে মিরযা নাথন সেখানে পৌঁছেন এবং এক শুভ সময়ে ফতেহজঙ্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ দেখা করেন) এবং পার্বত্য রাজা শুমারুদ ও অন্যান্য জমিদারদের খানের সম্মুখে পেশ করেন। পার্বত্য রাজা এবং অন্যান্য জমিদারেরা খানের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর পদ-চুম্বন করেন।[১৬] খান ফতেহজঙ্গ মিরযা নাথনের আনুগত্য এবং

Edited by Ripon Sarkar

কর্তব্য-নিষ্ঠার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং তাঁকে অনেক উৎসাহ প্রদান করেন। খান ফতেহজঙ্গ আরও দু দিন উদয়পুরে অবস্থান করেন। মিরযা নূর-উদ-দীনকে উদয়পুরে জায়গীর দেয়া হয় এবং তাঁকে সেখানে সরদার বা সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ত্রিপুরার একাংশ যা মিরযা ইসফন্দিয়ারের জায়গীরের সন্নিহিত ছিল তাহাকে জায়গীর দেয়া হয়। তারপর খান ফতেহজঙ্গ ঢাকা যাত্রা করেন এবং তিন দিনে সেখানে পৌঁছেন। অন্যান্য অফিসারেরা পঞ্চম দিনে ঢাকা পৌঁছেন।[১৭]

রাজমালার বিবরণ নিম্নরূপঃ[১৮]

বিধাতার নিয়োজিত দৈবের ঘটন।
দিল্লীশ্বর সাহা সিলিম শুনিল তখন॥
ত্রিপুর রাজার হস্তী ঘোটক বহুতর।
দূতমুখে শুনি সাহা সিলিম সত্বর॥
ফতেহজঙ্গ নবাব যুদ্ধতে চলে রঙ্গে।
প্রধান উমরা দুই ছিল তার সঙ্গে॥
ইস্পিন্দর নুরুল্যা নামে যুদ্ধ সেনাপতি।
সৈন্য সঙ্গে চলে ফতেহজঙ্গের সংহতি॥
দিল্লী হতে সৈন্য সব ঢাকাতে আসিল।
দ্বাদশ বাংগোলা[১৯] সৈন্য সঙ্গেতে লইল॥
ফতেহজঙ্গ নবাব ঢাকাতে রহিলেক।
ইস্পিন্দার নুরুল্যা সৈন্য পাঠাইলেক॥
তার সঙ্গে বহু সৈন্য পাঠায় সেইক্ষণ।
উদয়পুরে আসি তারা করিবারে রণ॥
দুই ভাগ হৈয়া সৈন্য চলিল তখন।
ইস্পিন্দার সৈন্য সঙ্গে কৈলাতে গমন॥
বৃদ্ধা নুরুল্যা খাঁ চলে সৈন্যের সহিত।
মেহার কূলের পথে হৈয়া হরষিত॥
দুই পথে দুই সৈন্য থানা করি রহে।
যশ মাণিক্যে তত্ত্ব পাইলেক তাহে॥
আপনার সৈন্য রাজা আনিয়া সাক্ষাত।
দুই ভাগ করি সৈন্য পাঠায় পশ্চাত॥
চণ্ডীগড়ের কত সৈন্য ছকড়িয়া কত।
দুই ভাগে পাঠায় সৈন্য নৃপতির যত॥

সেনাপতি দুই ভাগ করে সেইক্ষণ।
দুই গড়ে রহিলেক সেনাপতিগণ॥
হেনমতে রাজ সৈন্য গড়ে রহে গিয়া।

Edited by Ripon Sarkar

সেইকালে নৃপ দূত দিল পাঠাইয়া।
পত্র লেখিল রাজা মগলের স্থান।
কি কার্য্যে আসিছ লিখ আমা বিদ্যমান।
রাজপত্র পাইয়া সে যে মগলে লিখিল।
দিল্লীশ্বরে তোমা স্থান আমা পাঠাইল।
যত হস্তী আছয়ে যে তোমা নিজ স্থান।
সকল পাঠাও মোকে হৈয়া ভজমান।
নহে রাজা আসিয়া মিলহ এই স্থান।
দিল্লীশ্বরে বলিয়াছে এসব বিধান।
দূতে আসি এ সকল রাজাতে কহিল।
যশ মাণিক্য শুনি তাহা বহু ক্রোধ হৈল।
হস্তী নাহি দিব আমি না যাব কখনে।
তোমরা চলিয়া যাও যথা ইচ্ছা মনে।
এইসব বলিয়া দূতে রাজায় পাঠায়।
দূত যাইয়া মগলতে সকল জানায়।
দূত কথা শুনি মগল ক্রোধ হয় অতি।
সৈন্য সমে যুদ্ধ তরে চলে শীঘ্রগতি।
দুই সৈন্য করে যুদ্ধ অতি ঘোরতর।
ত্রিপুর মগল সৈন্য পরে বহুতর।
ত্রিপুর মগল সৈন্য করে হানাহানি।
আত্তপর ভেদ নাহি দুই যে বাহিনী।
অপার মগল সৈন্য সংখ্যা নাহি তার।
ভঙ্গ দিল ত্রিপুর সৈন্য যুদ্ধের মাঝার।
যশ মাণিক্য রাজা ছিল উদয়পুরে।
ভঙ্গ দিয়া যায় সৈন্য রাজার গোচরে।
সৈন্য ভংগ দেখি হয় নৃপ চমকিত।
যুদ্ধ বার্ত্তা শুনি রাজা হইল ভাবিত।
ভঙ্গ দিয়া গেল রাজা গহন পর্ব্বতে।
সেকালে মগল আসে উদয়পুরেতে।
ছকড়িয়ার পথে ইন্দিখার সেনাপতি।
উদয়পুর আসিলেক অতি শীঘ্রগতি।
উদয়পুর সর্ব্ব প্রজা ভঙ্গ সেইকাল।
যার যেই স্থানে গেল ভাবিয়া বিশাল।
উদয়পুর আসি মগল কিছু না পাইয়া।
গ্রামে গ্রামে ফিরে মগল ধন বিচারিয়া।
ধন না পাইয়া মৃজা নুরুল্যায় তাতে।

Edited by Ripon Sarkar

রাজার উদ্দেশ্যে চর পাঠায় পর্ব্বতে॥
গহন কাননে চর রাজা উদ্দেশ তরে।
পর্ব্বত মাঝারে রাজা পাইল তৎপরে॥
রাজতত্ত্ব পাইয়া নুরুল্যা সেনাপতি।
রাজারে ধরিতে সৈন্য পাঠায় শীঘ্রগতি॥
গহন কাননে রাজা সৈন্য বিবর্জ্জিত।
মগলের সৈন্য গিয়া হৈল উপস্থিত॥
যুদ্ধ দিতে সৈন্য নাহি নৃপতি সহিত।
ভঙ্গ দিতে নাহি পারে রাণী সমুদিত॥
মগলের সৈন্যে রাজা ধরে সেই স্থান।
উদয়পুর আনিলেক করিয়া সন্ধান॥
নুরুল্যা মন্ত্রণা যে করে বহুতরে।
কতদিন রাজা রাখে সেই উদয়পুরে॥
যশ মাণিক্য লৈয়া চলিল ঢাকাতে।
ইস্পিন্দার নুরুল্যায় স্ব-সৈন্য সহিতে॥
মগলদের কত সৈন্য রহে সেই স্থান।
উদয়পুর রহিলেক করিতে সন্ধান॥
ঢাকাতে নৃপতি লৈয়া যখনেতে গেল।
ফতেজঙ্গ নবাবের দরশন হৈল॥
ফতেজঙ্গ নবাব সে যে অতি দুরাচার।
নরপতি পাঠাইল নিকটে বাদশার॥
বাদশাহা সিলিম নাম দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে সমাদর করে বহুতর॥
নৃপতিকে সম্বোধিয়া কহিলেন সাহা।
তোমার সমীপে হস্তী আছিলেক যাহা।
তোমার যে ধন-রত্ন সৈন্য বহুতর।
রাজ্যে যাইয়া আমা স্থানে পাঠাও সত্বর॥
বাদশার অনুমতি শুনি যশোধর।
প্রণামিয়া বাদশাকে দিলেন উত্তর॥
আমা ধন জন রত্ন সকল তোমার।
তোমার সৈন্যেতে রাজ্য লুঠিছে আমার॥
কিবা অপরাধ হয় আমা তোমা স্থান।
রাজ্যে না যাইব আমি পাইয়া অপমান॥
আমার শেষ কাল হইল এখন।
রাজ্যে যাইয়া কি করিব নাহি রত্ন ধন॥
তীর্থাশ্রমে যাই আমি দেহ অনুমতি।

Edited by Ripon Sarkar

তীর্থ-বাস করি আমি পাই অব্যাহতি॥
রাজার বচন শুনি দিল্লীর ঈশ্বর।
নৃপতিকে বিদায় দিলেন সত্বর॥
বাদশার অনুমতি পাইয়া রাজন।
কাশীবাসে গেল রাজা লৈয়া পরিজন॥
কাশীবাস করে রাজা হরষিত মন।
বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা করে দরশন॥
গঙ্গাস্নান করে রাজা মণিকর্ণিকাতে।
সর্ব্বদেব দরশন রাণীর সহিতে॥
কতকাল কাশীবাস করিয়া নৃপতি।
প্রয়াগ হইয়া চলে মথুরাতে গতি॥
মথুরা ধামেতে নৃপ গেল সেইক্ষণ।
বৃন্দাবন উপবন গিরি গোবর্দ্ধন॥
নানা তীর্থ ভ্রমে রাজা রাণীর সহিত।
বৃন্দাবন বাস করে হৈয়্যা আমোদিত॥
যশ মাণিক্য রাজা অতি পুণ্যবান।
বহুকাল বাস করে বৃন্দাবন স্থান॥
বৃদ্ধ হৈল নরপতি জরায়ে পীড়িত।
বাহাত্তর বর্ষ বয়স হৈল সমুদিত॥
রাত্রিদিন ভাবে রাজা শ্রীকৃষ্ণ চরণ।
শরীর ত্যাজিয়া চরণ পাইব কেমন॥
কালপূর্ণ নৃপতির হইল ঘটন।
শিরেতে বেদনা জ্বর রাজার তখন॥
তিন দিন ছিল জ্বর রাজার তখন।
বৃন্দাবন পাইল রাজা বৈকুণ্ঠে গমন॥
যশ মাণিক্য স্বর্গ হৈল মথুরাতে।
যথাবিধি সংস্কার হইলেক তাতে॥
শ্রাদ্ধাদি মহোৎসব করে যশ রাণী।
পৃথিবীতে ভাল খ্যাতি রহিল এখনি॥
যশ মাণিক্য রাজা হৈল সমাপন।
তার পরে যেবা হৈল ত্রিপুর ভুবন॥
যশ মাণিক্য রাজা যে কালে নিয়াছিল।
প্রধান ত্রিপুরগণ নানা স্থানে গেল॥
যার যে লক্ষালক্ষ যায় সেই স্থান।
পর্ব্বতে রহিল কেহ করিয়া সন্ধান॥
যতকিছু রহে প্রজা উদয়পুরেতে।

Edited by Ripon Sarkar

মগলের সৈন্য লুটে না পারে থাকিতে॥
পাপিষ্ঠ মগল জাতি দুষ্ট দুরাচার।
ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষেধিল নগরে রাজার॥
চতুর্দ্দশ দেব পূজা নিষেধে যবন।
কালিকা দেবীর পূজা করিল বারণ॥
অমর সাগর আদি যত সরোবর।
জান কাটিয়া সুখায় মগল বর্ব্বর॥
যত ধন আছিলেক উদয়পুর দেশ।
সরোবরে লুকাইছে জানিয়া বিশেষ॥
এই মত অত্যাচার করেন মগল।
উদয়পুর প্রজা যত হৈল বিকল॥
রাজা-শূন্য রাজ্যে হৈল অমঙ্গল যত।
ত্রিপুর রাজ্যের প্রজা ভাবে অবিরত॥
রাজ পাত্র মন্ত্রী সব নানা স্থানে রহে।
কিমতে হইবে রাজা চিন্তিত যে তাহে॥
এই মত অরাজক আড়াই বছর।
মগলে সাধয়ে রাজ্য রাজা দেশান্তর॥

দৈবের বিচিত্র গতি বুঝন ন যায়।
সেই কালে দেবচক্র হইল উপায়॥
উদয়পুর রাজ্যে যত মগলের সেনা।
দিনে দিনে মরে সৈন্য নাহিক গণনা॥
সেই কালে মগল সেনা চিন্তয়ে বিস্তর।
কি মতে বাঁচিব প্রাণে যাইয়া স্থানান্তর॥
উদয়পুর ছাড়িয়া মগল গেল সেইক্ষণ।
মেহার কূলেতে যাইয়া রহে সর্ব্বজন॥
মগলে ছাড়িয়া গেল তনে সর্ব্বজন।
তখনে আসিল প্রজা আনন্দিত মন॥
রাজপাত্র মন্ত্রী যত আর সেনাপতি।
যার সেই পুরী আইসে আনন্দিত অতি॥
রাজা শূন্য রাজ্য যেন থাকা নাহি যায়।
অরাজক পাব ভেন নানা দিকে যায়॥
যশ মাণিক্য রাজা মথুরা গমন।
রাজ্যে নাহি আসিবেক জানিল তখন॥
রাজপুত্র পৌত্র নাহি, নাহি রাজ ভ্রাতা।
কাহাকে কহিব রাজা জানিয়া সর্ব্ব থা॥

Edited by Ripon Sarkar

সেনাপতি মন্ত্রিগণ চিন্তিত তখন।
কাহাকে করিব রাজা না দেখে লক্ষণ॥
মহামাণিক্য বংশে কল্যাণ নাম খ্যাতি।
যশোধর কালে কৈলাগড়ে সেনাপতি॥
করিছে অনেক যুদ্ধ সেই-মতিমান।
সেই রাজ যোগ্য হয় দেখ বিদ্যমান॥

বাহরিস্তান-ই-গায়বী এবং রাজমালার উপরোক্ত বিবরণের ভিত্তিতে এখন নিম্নের কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

(ক) মোগলদের ত্রিপুরা আক্রমণের কারণ,

(খ) যুদ্ধের বিবরণ,

(গ) ত্রিপুরা রাজ বন্দী হওয়ার কাহিনী,

(ঘ) বন্দী হওয়ার পরে ত্রিপুরার রাজার অবস্থা,

(ঙ) ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ এবং ত্রিপুরায় মোগল শাসন,

(চ) কখন ত্রিপুরায় মোগল শাসনের অবসান হয়।

(ক) মোগলদের ত্রিপুরা আক্রমণের কারণ

বাহরিস্তান মোগলদের ত্রিপুরা আক্রমণের কোন কারণ দেয়া হয়নি, লেখক সরাসরি এই বলে শুরু করেন যে "ত্রিপুরার রাজার বিরুদ্ধে স্থলপথে দুইটি এবং জলপথে একটি বাহিনী পাঠাবার সিদ্ধান্ত দেয়া হয়।" বাংলার সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গই এই সিদ্ধান্ত দেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে "দিল্লীশ্বর সাহা সিলিম", অর্থাৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর দূতের মুখে ত্রিপুরার রাজার নিকট অনেক হাতি এবং ঘোড়া আছে শুনে ত্রিপুরায় অভিযান পাঠান। ফতেহজঙ্গ যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁর সঙ্গে দুজন প্রধান আমীর পাঠানো হয়। দিল্লী থেকে অনেক সৈন্যও ঢাকায় আসে; আমীরের নাম ইস্পিন্দার ও নূরুল্যা এবং তাঁদের সঙ্গে দ্বাদশ বাংলার অর্থাৎ বার-ভূঁঞার সৈন্যও দেয়া হয়। ফতেহজঙ্গ নবাব ঢাকায় থেকে যান, কিন্তু ইস্পিন্দার ও নূরুল্যা অভিযান পরিচালনা করেন। এ বিষয়ে বাহরিস্তান এবং রাজমালায় মিল রয়েছে, উভয় সূত্রে সেনাপতির নাম এক, রাজমালায় দ্বাদশ বাংলার কথা আছে, বাহরিস্তানে বার-ভূঁঞার নেতা মুসা খানের নাম আছে। তবে ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরা জয়ের জন্য দিল্লী থেকে আসেন, রাজমালার এ বক্তব্য সঠিক নয়, ফতেহজঙ্গ সুবাদার নিযুক্ত হয়ে আসেন এবং সুবাদারের দায়িত্ব পালনের এক পর্যায়ে ত্রিপুরায় অভিযান প্রেরণ করেন। তবে সম্রাট সুবাদারকে ত্রিপুরা জয়ের নির্দেশ দেন কিনা বলা যায় না। বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে সম্রাট ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গকে আরাকান জয়ের এবং মগ রাজার সাদা হাতি হস্তগত করার নির্দেশ দেন।[২০] স্মরণ করা যেতে পারে যে ইতোপূর্বে সম্রাট সুবাদার কাসিম খানকেও একই নির্দেশ দেন।[২১] কিন্তু বাহরিস্তানে ত্রিপুরা সম্পর্কে এমন কোন কথা নেই। দিল্লীর সুলতান বা মোগল সম্রাটের হাতির প্রতি লোভ সর্বদাই ছিল; যুদ্ধেও হাতির বহুল ব্যবহার ছিল, সুতরাং হাতি হস্তগত করতে পারলে তাঁরা খুশি হতেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের হাতির অভাব ছিল না; তাঁর সময়ে বাংলাতেই অনেক হাতি মোগল বাহিনীর

Edited by Ripon Sarkar

সঙ্গে ছিল, খেদায়ও হাতি ধরা হত, যুদ্ধেও অনেক হাতি অধিকার করত এবং মাঝে মাঝে অনেক হাতি দিল্লীর দরবারে পাঠানো হত। এ সকল সংবাদ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে এবং বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাদা হাতি সাধারণত কোথাও পাওয়া যায় না, বাংলা বা ভারতে ত নয়ই, আরাকান বার্মা বা শ্যামে কৃচিত সাদা হাতি পাওয়া যেত। হঠাৎ সাদা হাতি পাওয়া গেলে তা হস্তগত করার জন্য এ সকল দেশের রাজারা তৎপর হতেন, এমনকি যুদ্ধও করতেন। সাদা হাতি বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র, কারণ তারা মনে করে যে জন্মান্তরবাদে বুদ্ধদেব মানুষরূপে জন্ম নেয়ার পূর্বের জন্মে সাদা হাতি ছিলেন। তাই বৌদ্ধ রাজারা সাদা হাতি হস্তগত করাকে সার্বভৌমত্বের প্রতীক রূপে মনে করতেন। সাদা হাতি চিহ্নিত করা খুব সহজ নয়, এবং সাদা হাতির পরিচিতি বিষয়ে অনেক কিছু লেখালেখি হয়েছে। সাদা হাতি চেনার প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে, ১ম, সাদা হাতির পিছনের পায়ের আগায় চারটির স্থলে পাঁচটি নখ থাকে এবং ২য়, সাদা হাতির পায়ে পানি ঢেলে দিলে হাতির রং বদলে লাল হয়ে যায়।[২২] যা হোক, সাদা হাতি বিরল প্রজাতি বলে, এবং বিশেষ করে ভারত বা বাংলায় মোটেই পাওয়া যেত না বলে সাদা হাতির প্রতি জাহাঙ্গীরের লোভ ছিল। তাই দেখা যায় দুজন সুবাদার, কাসিম খান এবং ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গকে তিনি সাদা হাতি হস্তগত করার নির্দেশ দেন। সাদা হাতির প্রতি জাহাঙ্গীরের লোভ থাকা স্বাভাবিক, সুতরাং তাঁর পক্ষে আরাকান জয় করে সাদা হাতি হস্তগত করার আদেশ দেয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু ত্রিপুরার কথা ভিন্ন, এখানকার হাতি কাল, অর্থাৎ বাংলার হাতির মতই। মির্যা নাথন যেখানে পরিষ্কার বলেছেন যে জাহাঙ্গীর ফতেহজঙ্গকে আরাকান জয়ের আদেশ দেন, সেখানে ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছুই না বলাতে মনে হয় ত্রিপুরা জয়ের আদেশ জাহাঙ্গীরের দেয়া নয়। তাহলে ফতেহজঙ্গের ত্রিপুরা জয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি হতে পারে? মোগলদের রাজ্য-বিস্তার নীতি সুবিদিত; নিছক রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে ত্রিপুরা আক্রমণ করা সম্ভব। কিন্তু ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদারী গ্রহণ করার পূর্ব থেকে আসাম-কোচবিহার সীমান্তে মোগলরা ব্যাপক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল; যুদ্ধে মোগলরা সুবিধা করতে পারলেও ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণ জয় করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং নিছক রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশে ফতেহজঙ্গের মত একজন সেনানায়ক অন্য আর এক সীমান্তে যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে মনে হয় না। তাই মনে হয়, ফতেহজঙ্গ কর্তৃক ত্রিপুরা অভিযানের অন্য কিছু কারণ ছিল।

মির্যা নাথন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন যে আরাকান জয় করার জন্য ফতেহজঙ্গের প্রতি সম্রাটের নির্দেশ ছিল। আরাকান জয় করতে হলে চট্টগ্রাম জয় করতে হয়-এবং চট্টগ্রাম জয় করতে হলে ত্রিপুরার ভিতর না হলেও ত্রিপুরা সীমান্তের নিকট দিয়ে যেতে হত। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে সুলতানী আমল থেকে বাংলার সুলতান, ত্রিপুরার রাজা এবং আরাকানের রাজার মধ্যে ত্রিদলীয় যুদ্ধ প্রায় লেগে থাকত এবং চট্টগ্রাম বিভিন্ন সময়ে এ তিন দেশের মধ্যে হাত বদল হত। ফতেহজঙ্গের পূর্ববর্তী সুবাদার কাসিম খানও চট্টগ্রাম আক্রমণ করে ব্যর্থ হন। ফতেহজঙ্গের এ কথা না জানার কথা নয়। তাই মনে হয় ফতেহজঙ্গ বুঝতে পেরেছিলেন যে ত্রিপুরা জয় না করে বা ত্রিপুরাকে অন্ততপক্ষে দুর্বল না করে আরাকান বা চট্টগ্রাম জয় করা সম্ভব নয়। এ কারণেই মনে হয় সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ প্রথমে ত্রিপুরায় অভিযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন। বাহরিস্তানে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় অভিযান পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঢাকায় হয়, দিল্লীতে নয়,[২৩] এবং সত্যি সত্যি

Edited by Ripon Sarkar

ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরা জয়ের পরে আরাকানের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করেন।[২৪] অবশ্য ফতেহজঙ্গের আগেই ইসলাম খান চিশতীর সময় থেকে আরাকানের রাজা বাংলার সীমান্তে আক্রমণ চালায়। আরাকানের রাজা জানতেন যে মোগলরা অন্ততপক্ষে চট্টগ্রাম অধিকারের প্রচেষ্টা নেবে, তাই তিনি আগেভাগে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করেন। আরাকান অভিযানের প্রস্তুতি স্বরূপ যে ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরা আক্রমণ করেন এবং জয় করেন তার পরোক্ষ প্রমাণ বাহরিস্তানে পাওয়া যায়। মিরযা নাথন বলেন, 'মিরযা নূর-উল্লাহ ত্রিপুরার উদয়পুর থেকে (ফতেহজঙ্গের নিকট) লিখেন যে ত্রিপুরার লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোগল বাহিনীকে আরাকান যাওয়ার পথের নির্দেশ দিতে চান, যে পথে ত্রিপুরার রাজা আরাকান অভিযানে যাত্রা করেছিলেন।'[২৫]

(খ) যুদ্ধের বিবরণ

বাহরিস্তান-ই-গায়বী এবং রাজমালা উভয় সূত্রেই যুদ্ধের বিবরণ পাওয়া যায়, তবে রাজমালার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত। মিরযা নাথন নিজে একজন যোদ্ধা ছিলেন, তাই তাঁর বিবরণে অধিকতর তথ্য পাওয়া যায়, প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে লিখিত রাজমালায় খুঁটিনাটি আশা করা যায় না। রাজমালার বিবরণে ইস্পিন্দার ও নূরুল্ল্যা নামক দুজন সেনাপতির অধীনে এই অভিযান প্রেরিত হয়, দ্বাদশ বাংলার সৈন্যও তাঁদের সঙ্গে গমন করে। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে মিরযা ইসফনদিয়ার এবং মিরযা নূর-উদ-দীনের (বাহরিস্তানে এই লোকটি মিরযা নূর-উদ-দীন এবং নূর-উল্লাহ নামে উল্লেখিত) অধীনে দুটি বাহিনী পাঠানো হয়, কিন্তু মিরযা নূর-উদ-দীনের সঙ্গে মসনদ-ই-আলা মুসা খান ঐ বাহিনীর নেতৃত্ব দেন। রাজমালায় দেখা যায় যে মিরযা ইসফনদিয়ার কৈলাগড়ের (কসবা) পথে এবং মিরযা নূর-উদ-দীন মেহারকুলের (কুমিল্লা) পথে গমন করেন। বাহরিস্তানের বিবরণে কোন্ সেনাপতি কোন্ পথে গমন করেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু যুদ্ধের বিবরণে দেখা যায় যে এ বিষয়ে রাজমালার বিবরণ সত্য। বাহরিস্তানে দু স্থলবাহিনীর অশ্বারোহী এবং বন্দুকধারী সৈন্য এবং হাতির সংখ্যাও দেয়া আছে, যা রাজমালায় পাওয়ার আশা করা যায় না। তাছাড়া বাহরিস্তানে দেখা যায় যে এডমিরাল বাহাদুর খানের নেতৃত্বে তিনশ রণতরী নৌপথে গমন করে, কিন্তু মোগল নৌবাহিনীর কথা রাজমালায় পাওয়া যায় না। আরও জানা যায় যে ত্রিপুরা বিজিত হওয়ার পরে মিরযা নূর-উদ-দীনকে ত্রিপুরার জায়গীরদের নিযুক্ত করা হয়। আরাকান অভিযানের বিবরণ দেয়ার সময় মিরযা নাথন বলেন যে ত্রিপুরা থেকে নূর-উল্লাহ সুবাদারকে জানান যে ত্রিপুরার লোকেরা মোগল বাহিনীকে আরাকানের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এই মিরযা নূর-উল্লাহ অবশ্যই ত্রিপুরার জায়গীরদার মিরযা নূর-উদ-দীন হবেন। এতে মনে হয় মিরযা নূর-উদ-দীন নূর-উল্লাহ রূপেও পরিচিত ছিলেন। সুতরাং সেনাপতিদ্বয়ের নামের ব্যাপারেও দু সূত্রে কোন গরমিলটি নেই।

সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে ত্রিপুরা আক্রমণ করেন। মিরযা ইসফনদিয়ারের নেতৃত্বে দু হাজার সাতশ অশ্বারোহী, চার হাজার বন্দুকধারী সৈন্য এবং বিশটি হাতি দেয়া হয় এবং মিরযা নূর-উদ-দীন ও মুসা খানের নেতৃত্বে তিন হাজারেরও বেশি অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী সৈন্য ও পাঁচটি হাতি দেয়া হয় এবং বাহাদুর খানের নেতৃত্বে তিনশ রণতরী দেয়া হয়। প্রচুর যুদ্ধের সরঞ্জামও তাঁদের

Edited by Ripon Sarkar

যুদ্ধ দেয়া হয়। মিরযা ইসফন্দিয়ার কৈলাগড়ের পথে এবং মিরযা নূর-উদ-দীন ও মুসা খান মেহেরকুলের পথে এবং বাহাদুর খান গোমতী নদীপথে গমন করেন। নদীতে নৌ-বাহিনী এবং নদীর উভয় পাশে দুটি স্থলবাহিনী এমনভাবে পাঠানো হয় যাতে ত্রিপুরা বাহিনী কোন দিক দিয়ে পলায়ন করতে না পারে বা মোগল বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ না করতে পারে। সকল বাহিনীর লক্ষ্য ছিল রাজধানী উদয়পুর। এতে বুঝা যায় মুসলমানদের পরিকল্পনা ছিল ব্যাপক, এবং মনে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে মোগল শাসন চালু করাও তাদের উদ্দেশ্য ছিল।

এর পরের ঘটনার বিবরণ রাজমালা এবং বাহরিস্তানের মধ্যে কিছু গরমিল দেখা যায়। রাজমালার মতে ত্রিপুরার রাজা যশ মাণিক্য (যশোধর মাণিক্য) মোগল আক্রমণের সংবাদ পেয়ে তাঁর সেনাবাহিনী দু ভাগে ভাগ করেন, একটি বাহিনী চণ্ডীগড়ে[২৩] এবং অপর বাহিনী ছয়কড়িয়া[২৪] গড়ে প্রেরণ করেন। দু বাহিনী দু গড়ে অবস্থান করার সময় রাজা মোগল সেনাপতির নিকট দূত পাঠিয়ে তাঁদের আগমণের কারণ জানতে চান। উত্তরে মোগল সেনাপতি জানান যে দিল্লীশ্বর (জাহাঙ্গীর) তাঁদের পাঠিয়েছেন; হয় রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সমুদয় হাতি মোগল বাহিনীর নিকট পাঠাতে হবে, না হয় রাজা নিজে এসে মোগল সেনাপতির সঙ্গে মিলিত হবেন। রাজা কোন শর্ত মানবেন না বলে দূতকে দিয়ে আবার খবর পাঠান। অতএব উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয় এবং ত্রিপুরার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়। রাজা তখন রাজধানী উদয়পুরে ছিলেন। পরাজিত সৈন্যরা তাঁর নিকট গেলে রাজা পলায়ন করে পর্বতে আশ্রয় নেন। মোগল সেনাপতি মিরযা ইসফন্দিয়ার ছয়কড়িয়া গড় অধিকার করে উদয়পুর দখল করে নেন।

বাহরিস্তানে বিবরণটি ভিন্ন রকমের। এতে ত্রিপুরার রাজার দূত পাঠাবার কোন কথা নেই, বরং বলা হয়েছে যে মোগল বাহিনী কৈলাগড়ে পৌঁছলে রাজা রাতের আঁধারে মোগল বাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা নেন। তিনি এক হাজার অশ্বারোহী, ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য এবং দুশ হাতিসহ মিরযা ইসফন্দিয়ারের বাহিনীকে রাতে আক্রমণ করেন। কিন্তু এর আগেই মিরযা ইসফন্দিয়ার উদয়পুরের নিকটে পৌঁছে যান। স্পষ্টতই বুঝা যায় যে ত্রিপুরা বাহিনী সময়মত কোন পদক্ষেপ নিতে পারেনি; সামরিক দিক দিয়ে বিচার করলে, কৈলাগড় এবং মেহেরকুলেই মোগল বাহিনীকে বাধা দেয়া উচিত ছিল। রাজমালার বিবরণে দেখা যায় সেনাপতি কল্যাণ দেব (যশোধর মাণিক্যের পরবর্তী রাজা) কৈলাগড় দুর্গ রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু তিনি বোধ হয় আগেই পলায়ন করেন। রাজমালায় বলা হয়েছে যে রাজা সৈন্য পাঠিয়ে উদয়পুরেই অবস্থান করছিলেন, কিন্তু বাহরিস্তানের ভাষায় রাজা নিজেই দুটি যুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করেন। মিরযা ইসফন্দিয়ারের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা পলায়ন করেন, মোগলরা রাজার সত্তরটি হাতি হস্তগত করে। পলায়নের সময় রাজা মিরযা নূর-উদ-দীন ও মুসা খানের বাহিনীর সম্মুখে পড়েন। মোগলদের নিদ্রিত দেখে রাজা সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেন, কিন্তু এখানেও রাজা তিন ঘণ্টা যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। রাজা উদয়পুরে পৌঁছে আবার স্থল ও নৌবাহিনীকে পাঠান এবং আদেশ দেন তারা যেন নদীতে পুল তৈরি করে এবং নদীর উভয় তীরে দুর্গ তৈরি করে। রাজার আদেশ মত কাজ করেও ত্রিপুরা বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এবং মোগল বাহিনী উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হয়। রাজা খবর পেয়ে পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ নিয়ে পর্বতের দিকে পলায়ন

Edited by Ripon Sarkar

করেন। রাজমালায় যেখানে একবার মাত্র যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, বাহারিস্তানে সেখানে তিনবার যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, রাজা নিজে দুটিতে অংশ নেন এবং নেতৃত্ব দেন। রাজমালার বিবরণ পাঠে মনে হয় যেন রাজা ভীত ছিলেন এবং সেনাপতিদের উপর যুদ্ধের ভার ছেড়ে দিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু বাহারিস্তানে দেখা যায় যে রাজা মোটেই ভীত ছিলেন না বরং নিজে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন।

সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে রাজা বৈষ্ণব হওয়ায় যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন এবং তাই বিশেষ বাধা দেননি।[২৮] ভট্টশালী রাজার পরাজয়ের অন্য ব্যাখ্যা দেন, তিনি ঢাকা মিউজিয়ামে রক্ষিত ত্রিপুরা রাজ যশো মাণিক্যের ছয়টি মুদ্রা পরীক্ষা করে দেখেন, একই তারিখে নির্মিত মুদ্রাগুলিতে রাজার নামের সঙ্গে একেকবার একেকজন করে ভিন্ন রাণীর নাম মুদ্রিত হয়। প্রথম তিনটি মুদ্রায় রাণীর নাম লক্ষ্মী গৌরী, চতুর্থ মুদ্রায় গৌরী লক্ষ্মী এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ মুদ্রায় লক্ষ্মী গৌরী জয়া। তিনি বলেন:[২৯]

> "এইরূপে অতি সামান্য যুদ্ধের পরে মোগলকে রাজধানী অধিকার করিবার সুযোগ দিয়া, রাজধানী রক্ষার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া হতভাগ্য যশো মাণিক্য মহারাণীগণ ও ধনরত্নাদি সহ বনে পলাইয়া গেলেন এবং অবিলম্বে ধরা পড়িয়া নিজের রাজধানীতে বন্দী অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। মুদ্রায় প্রথমে দুই, অতঃপর পরে তিন মহারাণীর নাম দেখিয়াই তিনি যে কি পরিমাণ দুর্বল প্রকৃতির স্ত্রৈণচিত্ত মানুষ ছিলেন তাহা বুঝা যায়। মুদ্রায় সাধারণত শুধু পট্টমহাদেবী মহারাণীরই নাম থাকে, প্রথমে দুই মহাদেবীর নাম মুদ্রাতে ছাপিতে হইয়াছে। প্রকৃত মহাদেবী যিনি শুধু তাঁহারই নাম মুদ্রায় মুদ্রিত করিয়া অপরকে মহারাজের নিবৃত্ত করা উচিত ছিল। মহারাজ তাহা পারেন নাই। স্ত্রীকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা যাঁহার ছিল না তিনি যে রাজ্য কতদূর শাসনে রাখিতে এবং শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করা যায়। কতকগুলি মুদ্রায় তৃতীয় মহাদেবী জয়ার নাম দেখিয়া যশো মাণিক্যের দুর্বল প্রকৃতি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট ধারণা হয়।"

ত্রিপুরার রাজা যশো মাণিক্য ভীতু বা যুদ্ধের প্রতি বিতৃষ্ণ হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় না, কারণ তিনি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু অবশ্যই তাঁর দূরদর্শিতার অভাব ছিল। চতুর্দিকের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই পান, ভাটির বার-ভূঁঞা, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য, বুকাইনগরের খাজা উসমান, সিলেটের বায়েজীদ কররানী, কাছাড়, কামরূপ-কামতার রাজাদের পরাজয় এবং তাদের রাজ্য মোগল অধিকারভুক্ত হওয়ার সংবাদ তিনি নিশ্চয়ই পান। ভুলুয়া এবং সিলেটের সঙ্গে তাঁর রাজ্য সংলগ্ন, বার-ভূঁঞার ভাটিও তাঁর ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি সম্ভাব্য মোগল আক্রমণের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তুতি নেননি। মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করেন, তাঁর নৌবাহিনীও সতর্ক ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর ষাট হাজার পদাতিক সৈন্য (সংখ্যা সঠিক হলেও) মোগল অশ্বারোহী এবং বন্দুকধারীদের বাধা দেয়ার উপযুক্ত ছিল না। সময়মত প্রস্তুতি নিলে তিনি মেঘনা-গোমতীর সংযোগস্থলেই মোগলদের বাধা দিতে পারতেন এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হলেও মোগলদের অনেকদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন এবং তাঁকে শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হত না।

Edited by Ripon Sarkar

(গ) রাজা বন্দী হওয়ার কাহিনী

রাজা বন্দী হওয়ার ঘটনার বিবরণেও রাজমালা এবং বাহারিস্তানের মধ্যে গরমিল দেখা যায়, বিশেষ করে রাজমালার বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বাহারিস্তানে খুঁটিনাটি দেয়া হয়েছে। রাজমালায় বলা হয়েছে যে উদয়পুরে এসে মির্জা নূর-উদ-দীন রাজার সংবাদ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে চর পাঠান। যখন তিনি জানতে পারেন যে রাজা পর্বতে আশ্রয় নিয়েছেন, তিনি রাজাকে ধরার জন্য সৈন্য পাঠান। মোগল সৈন্যদের উপস্থিতিতে রাজা হতভম্ব হয়ে পড়েন, তাঁর সঙ্গে সৈন্য ছিল না, তাছাড়া পরিবার পরিজন ফেলে রেখে তিনি পালাতেও পারেন না। ফলে রাজা বন্দী হন এবং তাঁকে উদয়পুরে নিয়ে আসা হয়।

বাহারিস্তানের বিবরণ দীর্ঘ। উদয়পুরে এসে রাজাকে না পেয়ে মোগল বাহিনী তিন দিন তিন রাত্রি রাজার পশ্চাদ্ধাবন করে। যতদূর পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া সম্ভব ছিল ততদূর তারা ঘোড়ায় চড়ে যায়, তারপর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হাতি চড়ে যায়, কিন্তু গভীর জঙ্গলে হাতি চড়ে যাওয়া অসম্ভব হলে তারা পায়ে হেঁটেই রাজার খোঁজ করতে থাকে। ইতোমধ্যে হাতি চড়ে যাওয়ার উপায় না থাকায় এবং মোগল বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে রাজা নিজেও তাঁর হাতিগুলি ছেড়ে দেন। এ সময় মির্জা নূর-উদ-দীনের একজন সৈন্য হঠাৎ রাজার অনুগামী মহিলাদের দেখে ফেলেন, সৈন্যটি একজন মহিলাকে ধরতে চাইলে মহিলা চিৎকার করে উঠে এবং পাশে গাছের নিচে আত্মগোপনকারী রাজা বেরিয়ে আসেন। মোগল সৈন্য এবং রাজার মধ্যে তরবারির যুদ্ধ ও ধস্তাধস্তি হয়। সৈন্যটি রাজাকে হত্যা করার উদ্যোগ নিলে রাজা নিজের পরিচয় দেন। সৈন্য আহত হওয়ায় রাজাকে বন্দী করতে পারল না; রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন কিন্তু এমন সময় মোগল আহত সৈন্যের একজন সংগী এসে রাজাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং রাজাকে বন্দী করার উদ্যোগ নেয়। এমন সময় সেনাপতি মির্জা ইসফন্দিয়ার, মির্জা নূর-উদ-দীন এবং মুসা খানও এসে পড়েন। তাঁরা রাজাকে এবং রাজার অনুগামী মহিলাদের বন্দী করেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। রাজার ছেড়ে দেয়া হাতিগুলিকেও ধরা হয় এবং তাঁরা সকলে উদয়পুরে চলে আসেন।

(ঘ) বন্দী হওয়ার পরে ত্রিপুরার রাজার অবস্থা

এই বিষয়ে বাহারিস্তানের বিবরণ সংক্ষিপ্ত। রাজাকে বন্দী করে উদয়পুরে আনার পরে মোগল সেনাপতি সুবাদার ফতেহজঙ্গের নিকট যুদ্ধের একটি বিস্তারিত বিবরণ পাঠান। সুবাদার আদেশ দেন যে সৈন্য-সামন্ত ত্রিপুরায় রেখে মির্জা ইসফন্দিয়ার, মির্জা নূর-উদ-দীন এবং মুসা খান যেন রাজা, রাজ পরিবার এবং ধন-সম্পদ নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁরা আদেশ মত রাজাকে ঢাকায় নিয়া যান এবং সুবাদার এ সংবাদ দিল্লীতে সম্রাটের নিকট পাঠান। বাহারিস্তানে অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে যে শুধু মুসা খান ত্রিপুরার রাজাকে নিয়ে ঢাকা যান। এ কথাটিই বোধ হয় সত্য, কারণ রাজাকে নিয়ে সকল সেনাপতির ঢাকা যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, বরং সদ্য বিজিত রাজ্যে সেনাপতিদের উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল বেশি। পরে সুবাদার ফতেহজঙ্গ ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য উদয়পুরে যান। ত্রিপুরা রাজ্যের সুশাসনের ব্যবস্থা করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এর পরে ত্রিপুরা সম্পর্কে বাহারিস্তানে আর কোন কথা নেই।

Edited by Ripon Sarkar

রাজমালার বিবরণ অনেক দীর্ঘ। এ বিবরণে ত্রিপুরার রাজাকে উদয়পুরে এনে কয়েকদিন রাখার পরে মিরজা ইসফন্দিয়ার ও মিরজা নূর-উদ্দীন উভয়ে রাজাকে নিয়ে ঢাকা চলে যান এবং সুবাদারের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সুবাদার রাজাকে দিল্লীতে সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন। সম্রাট রাজাকে বলেন যে রাজ্য ফিরে দিব রাজা যেন সমুদয় হাতি এবং ধন-রত্ন দিল্লীতে পাঠান। এর অর্থ বোধ হয় যে সম্রাট ত্রিপুরার রাজাকে করদ রাজা হিসেবে নিজ রাজ্য ফেরত দেবার প্রস্তাব করেন। রাজা সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি অপরাধ করেছেন, যার জন্যে সম্রাটের সৈন্য তাঁর দেশ লুট করেছে। এই অপমানের পরে রাজা নিজ দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করেন এবং তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য সম্রাটের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাটের সঙ্গে কথোপকথনে রাজা নিজ আত্ম-সম্মানবোধের পরিচয় দেন। সম্রাটের কথায় রাজি হলে রাজা নিজ রাজ্য ফিরে পেতে পারতেন এবং মোগলদের অধীনস্থ হিসেবে রাজ্য শাসন করতে পারতেন। কিন্তু রাজা সেভাবে অধীনতা স্বীকার করতে রাজি হলেন না, বরং অপমানের সঙ্গে রাজ্য করার চাইতে তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করেন। সম্রাট রাজাকে তীর্থে যাওয়ার অনুমতি দেন। রাজা প্রথমে কাশী যান এবং পরে বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ ইত্যাদি তীর্থস্থানে গমন করেন। রাণীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। অবশেষে সাতাত্তর বছর বয়সে রাজা মথুরায় পরলোক গমন করেন।

বাহারিস্তানে রাজাকে দিল্লী পাঠাবার কথা নেই, কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজার মত একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্রাটের নিকট পাঠানোই যুক্তিপূর্ণ। মনে হয় রাজমালার এই কাহিনী সত্য এবং রাজা যে দেশে ফিরেন নি তাতেই বুঝা যায় যে তিনি তীর্থ স্থানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। রাজমালায় পরে বলা হয়েছে যে রাজার পুত্র বা ভাই ছিল না, তাই রাজার দেশে ফিরে আসার মত বিশেষ কোন আকর্ষণও ছিল না।

(ঙ) ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ এবং ত্রিপুরায় মোগল শাসন

(চ) কখন ত্রিপুরায় মোগল শাসন শেষ হয়

এ বিষয়গুলি একটির সঙ্গে আরেকটি সম্পৃক্ত তাই একত্রে আলোচনা করা হবে। বাহারিস্তানে ত্রিপুরা আক্রমণের তারিখ নেই। রাজমালায় বলা হয়েছে যে রাজা যশোধর মাণিক্যের একুশ বছর রাজত্ব গত হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটে:

"এমন মতে একবিংশ বৎসর বঞ্চিল।
যশ মাণিক্য রাজার রাজ্য ভোগ হৈল।"[৩০]

এটা বলার পরে মোগল আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রাজা যশোধর মাণিক্যের একুশ বছর স্থির করা সোজা নয়, কারণ রাজমালায় তাঁর সিংহাসন লাভ করার দুটি তারিখ পাওয়া যায়। রাজমালার এক স্থলে আছে:

'নৃপতির পুত্র যশোধর নারায়ণ
মন্ত্রী কহে তাকে রাজা করিব এখন।
পনরশ তের শক হইল যখন।
রাজধর রাজপুত্র হইল রাজন।"[৩১]

Eidited by Ripon Sarkar

অন্যত্রও আছে ঃ

"পঞ্চদশ চৌত্রিশ শাকে শশ রাজা হৈল।
যেন মত শাক রাজা সেই পাতি হৈল।"[৩১]

অতএব দেখা যায় যে রাজমালায় যশোধর মাণিক্যের সিংহাসন লাভের তারিখ একবার ১৫১০ শক/১৫৮৯ খ্রিঃ এবং পরে ১৫৩৪ শক/১৬১২ খ্রিঃ দেওয়া হয়েছে। প্রথম তারিখ গ্রহণ করলে রাজত্ব শেষ হয় ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয় তারিখে হয় ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে অর্থাৎ ১৬১৭-১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ত্রিপুরা বিজয় হয়। ফতেহজঙ্গ ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে ঢাকা এসে সুবাদারীর দায়িত্ব নেন এবং যুবরাজ খুররম শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধে ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের আনুমানিক ১০শে এপ্রিল তারিখে নিহত হন।[৩২] রাজমালার প্রথম তারিখ গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এটা ফতেহজঙ্গের সুবাদারী লাভের অনেক আগে হয়, দ্বিতীয় তারিখ ফতেহজঙ্গের সুবাদারীর মধ্যে হলেও শাহজাহানের বিদ্রোহের সময় তিনি ত্রিপুরায় অভিযান পরিচালনা করতে পারেন কিনা সন্দেহ। তাছাড়া বাহারিস্তানে ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলের আলোচনায় দেখা যায় যে ত্রিপুরা যুদ্ধের পরেও ফতেহজঙ্গ আরও কয়েকটি যুদ্ধ করেন।

রাজা যশোধর মাণিক্যের একই সকল মুদ্রার তারিখ ১৫২২ শক বা ১৬০০ খ্রিঃ।[৩৩] ত্রিপুরার রাজারা সাধারণত সিংহাসনে আরোহণ করলে স্মারক স্বরূপ মুদ্রা জারি করতেন। তবে কয়েকজন রাজার অন্যান্য তারিখের মুদ্রা পাওয়া গেছে, কিন্তু এ ধরনের সকল মুদ্রা স্মারক মুদ্রা, অর্থাৎ কোন বিশেষ ঘটনার স্মরণ করে উৎকীর্ণ। যেহেতু যশোধর মাণিক্যের শুধু এক তারিখের মুদ্রা পাওয়া গেছে, ঐ তারিখ অবশ্যই তাঁর সিংহাসনে আরোহণের তারিখ। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যশোধর মাণিক্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। আবার যশোধর মাণিক্যের পরবর্তী রাজা কল্যাণ মাণিক্যের শুধু ১৫৪৮ শক/১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে,[৩৪] অর্থাৎ কল্যাণ মাণিক্য ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। অতএব রাজমালা এবং মুদ্রার সাক্ষ্যে অনেক গরমিল দেখা যায় এবং এ কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মোগলদের ত্রিপুরা অভিযানের তারিখ নিয়ে মতভেদ দেখা যায়।

রাজমালার সম্পাদক কালী প্রসন্ন সেন মোগলদের ত্রিপুরা জয়ের তারিখ ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে নির্দেশ করেন। তিনি বলেন,[৩৫] "১৪০১ শকে মহারাজ যশোধরের জন্ম হয়, তাঁহার জন্ম—পত্রিকার বিবরণ দ্বারা ইহা জানা যাইতেছে। ১৫২২ শকে রাজ্য লাভ কালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর ছিল। ১৫৪৫ শকে (১৬২০ খ্রিঃ) তিনি মোগল কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া তীর্থভ্রমণ অবলম্বন করেন। ২৩ বৎসরকাল রাজ্য ভোগ করার পর ৪৪ বৎসর বয়সে মহারাজ তীর্থবাসী হইয়াছিলেন। ২৮ বৎসরকাল তীর্থক্ষেত্রে অবস্থানের পর, ১৫৭৩ শকে (১৬৫১ খ্রিঃ) তাঁহার শ্রী বৃন্দাবন প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্বারা জানা যাইতেছে, মহারাজ রাজ্যচ্যুতির অবস্থায় ২৮ বৎসর জীবিত ছিলেন...।"

১৪০১ শকে যশোধরের জন্মের তারিখ রাজমালায় পাওয়া যায় ঃ[৩৬]

"পঞ্চদশ এক শক সময় যখন।
রাজপুত্র পুত্র জন্ম লভিল তখন।"

Eidited by Ripon Sarkar

অতএব কালী প্রসন্ন সেন মহাশয়ের কথা তাঁহার উক্তির ওপর সন্দেহ প্রকাশের মাধ্যম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহার উক্তিকে কতটুকু মুদ্রার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন "মুদ্রা প্রমাণ সকল অকাট্য সত্য, এবং সমস্ত নির্ধারিত, নিঃসন্দেহ প্রমাণ বলে স্বীকার করে মুদ্রা প্রমাণই একমাত্র অবলম্বনীয়।" বাস্তবিকও মুদ্রার প্রমাণকে প্রামাণ্য এবং অকাট্য বলা যায়। কিন্তু কালী প্রসন্ন সেন কিভাবে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে মোগল বিজয় এবং যশোমাণিক্যের সিংহাসনচ্যুতির তারিখ নির্ণয় করেছেন তা বুঝা যাচ্ছে না; তিনি কোন প্রমাণ দেননি। এ তারিখ নির্ধারণের পক্ষে মুদ্রার প্রমাণ নেই; রাজমালার কথা থেকে প্রমাণ হয় যে অনন্ত শেষ হওয়ার পরে মোগল অভিযান হয়। মুদ্রা প্রমাণ মতে যশোমাণিক্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, রাজমালার মতে ১৬২১-২২ খ্রিস্টাব্দে মোগল বিজয় হওয়ার কথা। কেননা কালী প্রসন্ন সেন কোনটাই গ্রহণ না করে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ নির্ধারিত করেছেন। তাই তাঁর নির্ধারিত তারিখ নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যায় না।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন যে ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে মোগলেরা ত্রিপুরা বিজয় করে। তিনি মুদ্রার সাহায্যে যশোমাণিক্যের সিংহাসন লাভের তারিখ ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে স্থির করেন। রাজমালার সাক্ষ্য যে রাজার প্রথম বছর রাজত্বের পর মোগল আক্রমণ হয় সেটাও তিনি গ্রহণ করেন এবং উভয় তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে মোগল বিজয়ের তারিখ নির্ণয় করেছেন। অতএব ভট্টশালীর মতামত তথ্য-ভিত্তিক। কিন্তু পরে দেখা যাবে যে তাঁর এই তারিখও গ্রহণযোগ্য নয়।

ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা ত্রিপুরা বিজয় করেন। তিনি মুদ্রা বা রাজমালার তথ্য বিশ্লেষণ করেননি এবং এ তথ্যগুলির উপর কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি বলেন যে বাহারিস্তানে কোন তারিখ দেয়া না থাকলেও আগে পরে কোন তারিখ এবং ঘটনা পরম্পরা থেকে মনে হয় যে মোগলরা ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা বিজয় করেন। তিনি বলেন[২১] "The Baharistan does not give any date of this event, but from the sequence of events, some of which are dated, both before and after this episode, it seems clear that the Tipperah war took place in the winter of 1618 and not in 1621." উদ্ধৃত যে বাহারিস্তানে এ ঘটনার আগে বা পরেও কোন ঘটনার তারিখ নেই, অনুপক্ষে (বিষয় বস্তুর দিক) উল্লেখ করেছেন মীর-ই-বহর নিযুক্তির তারিখ, তাঁকে মহাবীর বিদায় দেওয়ার তারিখ, ইসলাম খান ও মোগল বাহিনীর শাহজাদপুর পৌঁছার তারিখ এবং মুসলমান শাহজাদাদের ও মহাবীর বাহিনীর মধ্যে উদয়-এর মুদ্রার তারিখ অথচ বাহারিস্তানে আর কোন তারিখ নেই এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখান হয়েছে যে এসব নির্দিষ্ট তারিখগুলি ভুল প্রমাণিত হয়। সুধীন্দ্র বাবু নিজেও ইসলাম খানের কার্যকলাপ আলোচনার সময় এ তারিখগুলি ভুল প্রমাণ করেছেন। সুতরাং সুধীন্দ্র বাবু যে বলেছেন যে ত্রিপুরা বিজয়ের আগে বা পরের ঘটনার তারিখ বাহারিস্তানে পাওয়া যায় তা ঠিক নয়। তবে বাহারিস্তানে তারিখ না থাকলেও কিছু ইঙ্গিত আছে যার ভিত্তিতে বোধ হয় সুধীন্দ্র বাবু ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে নির্ধারণ করেছেন। মির্জা নাথন বাহারিস্তানে মাঝে মাঝে রমজানের মাস, নিজের দিন বা কর্মকাণ্ডের কথা উল্লেখ করেন; ইসলামের বড় কর্মকাণ্ডের মুসলমানী আচরণের একটি বড় সমকালীন কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন, যেটি বড় পর্বের যে সময়

Eidited by Ripon Sarkar

মির্যা নাথন একটানা দেড় বছর ঢাকায় থাকায় একটি বর্ষাকালের উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি। এ হিসেবে প্রথম বর্ষাকালের পরে ত্রিপুরা অভিযান, ত্রিপুরা রাজার পরাজয় এবং বন্দী হওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং তৃতীয় বর্ষাকালে সুবাদারের ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর যাওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম বর্ষাকাল ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দের, কারণ ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দের বর্ষাকাল শেষ হওয়ার পরে ইবরাহীম খান নবেম্বর মাসে ঢাকায় পৌছেন, এবং তৃতীয় বর্ষাকাল ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের। অতএব এই সূত্রে ১৬১৮-১৯ খ্রিষ্টাব্দের শীত মৌসুমে (১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দের শেষে এবং ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমে) মোগলরা ত্রিপুরা বিজয় করে এবং এক বছর পরে সুবাদার উদয়পুরে সৌন্দর্য উপভোগ করতে যান। সুবাদারের মত একজন উচ্চপদস্থ এবং ব্যস্ত লোক ত্রিপুরা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগ করতে যেতে পারেন কিনা সন্দেহ, তাই এক বছর পরেই তিনি ত্রিপুরা যান, এরূপ মনে করাই সঙ্গত। সুতরাং বাহরিস্তানের ভিত্তিতে ১৬১৮ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ নির্ধারণ করে সুখীন্দ্র বাবু তাঁর সূত্রের সদ্ব্যবহার করেছেন।

ত্রিপুরা জয়ের তারিখ স্থির করার পূর্বে আরও দুটি প্রশ্নের মীমাংসা হওয়া দরকার। ১ম, ত্রিপুরায় মোগল শাসন কতদিন স্থায়ী হয় এবং ২য়, কখন কিভাবে মোগল শাসনের অবসান হয়? এ প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর বাহরিস্তানে পাওয়া যায় না, রাজমালায় কিছু তথ্য পাওয়া যায়। রাজমালায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় মোগল শাসন আড়াই বছর কাল স্থায়ী হয়ঃ

"এই মত অরাজক আড়াই বছর।
মগলে সাধয়ে রাজ্য রাজা দেশান্তর।"

আড়াই বছর মোগল শাসন সম্পর্কে রাজমালায় কিছু তথ্য দেয়া হয়েছে। মোগল বিজয়ের পরে ত্রিপুরার লোকজন রাজধানী থেকে পালিয়ে যায়, প্রধান প্রধান অমাত্যেরা এমনকি পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। মোগলরা রাজধানীর ধন-সম্পদ লুট করে, বড় বড় সরোবরগুলির পানি শুকিয়ে সরোবরের তলদেশ পর্যন্ত ধন-সম্পদের সন্ধান করে। (স্মরণীয় যে ইতোপূর্বে আরাকানের সৈন্যরাও ত্রিপুরার সরোবরের তলদেশে ধন-সম্পদের সন্ধান করেছিল।[৪২] এতে মনে হয় প্রাচীনকালে ত্রিপুরার সরোবরের তলদেশে ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখা হত।) তাছাড়া মোগলরা ত্রিপুরাবাসীদের ধর্ম-কর্মেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, তারা ত্রিপুরদের চতুর্দশ দেব পূজা এবং কালিকা দেবীর পূজায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। শেষে দৈবক্রমে এমন হল যে মোগল সৈন্যরা দলে দলে মৃত্যুবরণ করতে থাকে এবং সেই ভয়ে তারা উদয়পুর ত্যাগ করে মেহারকুল সেনা ছাউনীতে গিয়ে অবস্থান নেয়। ফলে ত্রিপুরার যে সকল মন্ত্রী ও অমাত্য উদয়পুর ত্যাগ করে অন্যত্র পালিয়ে গিয়েছিল তারা উদয়পুরে ফিরে আসে এবং নতুন রাজা নির্বাচনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে। রাজ্যচ্যুত রাজা যশোধর মাণিক্যের কোন পুত্র বা ভাই না থাকায়, এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে সেনাপতি কল্যাণ দেব, যিনি রাজবংশের লোক ছিলেন, তাঁকেই রাজা নির্বাচিত করা হয়।

পরে রাজমালার কল্যাণ মাণিক্য খণ্ডে জানা যায় যে ত্রিপুরায় মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে এবং রাজাকে বন্দী করে ঢাকায় নেয়া হলে সেনাপতি রণজিত নারায়ণ আচরঙ্গ[৪৩] নামক এক পার্বত্য প্রদেশে গিয়ে একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করেন এবং স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। মোগল সৈন্যরা ঐ দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে তাঁকে বিব্রত করেনি

Edited by Ripon Sarkar

বা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কল্যাণ মাণিক্য উদয়পুরে সিংহাসন লাভ করার সময় রাজা যশোধর নারায়ণ পরলোকগমন করেন এবং তৎপুত্র লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নতুন রাজা কল্যাণ মাণিক্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ পরাজিত ও বন্দী হয়ে উদয়পুরে আনীত হন। কল্যাণ মাণিক্য তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং উদয়পুরে সসম্মানে বসবাস করার সুযোগ দেন।[৪৪]

রাজমালার মতে ত্রিপুরায় মোগলদের আড়াই বছরকাল শাসনামলে তারা লুটতরাজ করে এবং ত্রিপুরাবাসীদের ধর্ম-কর্মে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কথাগুলি বিশ্বাসযোগ্য, কারণ ত্রিপুরায় এ অল্প সময়ে মোগল শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রবর্তিত হয়নি এবং বিজয়ী সৈন্যরা অর্থ-সম্পদের লোভে বাড়াবাড়ি করা অসম্ভব নয়। মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর পিতা আকবরের মত পরধর্মের প্রতি উদার ছিলেন, ত্রিপুরায় ত্রিপুরাবাসীদের ধর্ম-কর্মে বাধা দেয়ার জন্য সম্রাট দায়ী ছিলেন না, স্থানীয় মোগল সেনাপতিই এই অনুদার নীতির জন্য দায়ী। ত্রিপুরায় মোগল শাসনের কিছু নিদর্শন রয়েছে, উদয়পুরে একখানি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এ মসজিদ মোগল মসজিদ নামে এখনও মোগল শাসনের স্বাক্ষর বহন করছে। উদয়পুরেই একখানি ছোট্ট দোচালা পাকা দালান এখনও বর্তমান, এটা 'বদর মোকাম' নামে খ্যাত। কালী প্রসন্ন সেন 'মোগল মসজিদ' ও 'বদর মোকাম' সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন:[৪৫]

> "উদয়পুরে অবস্থানকালে মোগলগণ বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ এক মসজিদ নির্মাণ করিতেছিল, তাহার কার্য্য শেষ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই। গোমতী নদীর উত্তর তীরবর্তী পুরাতন রাজনিকেতনের সম্মুখে, সমভূমিতে ছাদ বিহীন মসজিদ অদ্যাপি মোগল বিজয়ের সাক্ষ্য স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই ইষ্টকালয় 'মোগল মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ।
>
> "মুসলমান আধিপত্যের সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরে আউলিয়া ও দরবেশ প্রভৃতি মুসলমান ধার্মিক পুরুষগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভবত এই সময়ই চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী আউলিয়া বদর সাহেব উদয়পুরে আগমন করিয়াছিলেন। এখানে রাজবাড়ির সন্নিহিত স্থানে দোচালা গৃহের আকার বিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত একটি গৃহ বিদ্যমান আছে, তাহা 'বদর মোকাম' নামে বিখ্যাত। কথিত আছে, আতারাম ও বুধিরাম নামক নরসুন্দর জাতীয় ভ্রাতৃযুগল বদর সাহেবের লোকাতীত বিভূতি দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়; বদর সাহেব স্বয়ং তাহাদের দীক্ষাগুরু ছিলেন। তদবধি তাহারা এই দরগার খাদিম (সেবাইত) নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্তমান খাদিমগণ উক্ত ভ্রাতৃযুগলের বংশধর বলিয়া জন প্রবাদে জানা যায়। এই দরগায় আলো প্রদানের ব্যয় নির্বাহার্থ রাজ সরকার হইতে 'চেরাগী মিনাহ',[৪৬] ভূমি প্রদান করা হইয়াছিল। সেই মিনাহের সনদ[৪৭] বিনষ্ট হওয়ায়, এবং জঙ্গলাকীর্ণ হইবার দরুন ভূমির পরিচয় বিলুপ্ত হওয়ায়, তাহা রহিত হইয়াছে।"

উল্লেখ্য যে দরগার জন্য ভূ-সম্পত্তি দানের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মসজিদের জন্য সম্পত্তি দান করার কথা বলা হয়নি। মসজিদের জন্যও অবশ্যই ভূ-সম্পত্তি দান করা হয়েছিল, তবে শেষ পর্যন্ত মসজিদের জন্য প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি কাজে আসেনি, কারণ, প্রথমত, মসজিদখানি অসমাপ্ত থেকে যায় এবং দ্বিতীয়ত, উদয়পুর থেকে মোগল সৈন্যরা চলে আসায় সেখানে কোন মুসলমান মসজিদ ব্যবহার করার জন্য অবশিষ্ট ছিল বলে মনে

Edited by Ripon Sarkar

হয় না। দরগার কথা ভিন্ন, কারণ মুসলমান অমুসলমান সকলেই বদর শাহ্‌র প্রতি শ্রদ্ধাশীল। পরে অবশ্য বদর মোকামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়, শুধু মসজিদ ও বদর মোকামের ধ্বংসাবশেষ এখনও টিকে আছে।

চট্টগ্রাম থেকে মালয় উপদ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রোপকূলে আরও অনেক বদর মোকামের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। কোন কোন লেখক এগুলিকে 'বুদ্ধের মোকাম'ও বলে থাকে কিন্তু আসলে এগুলি প্রসিদ্ধ মুসলিম সাধক বদর শাহ্‌র স্মৃতি-বিজড়িত। ত্রিপুরার বদর মোকাম ছাড়া অন্য সবগুলিই সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে টেকনাফ উপকূলেও একটি বদর মোকাম আছে।[৪৮]

আগেই বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা বিজয়ের পরে সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ রাজধানী উদয়পুরে গমন করেন এবং সেখানে কয়েকদিন (মনে হয় পাঁচ দিন[৪৯]) অবস্থান করেন। ফিরে আসার আগে তিনি ত্রিপুরার শাসনের ব্যবস্থা করেন। রাজধানী উদয়পুরস্থ ত্রিপুরার বেশির ভাগ তিনি ত্রিপুরা বিজেতা অন্যতম সেনাপতি মিরযা নূর-উদ-দীনকে জায়গীর প্রদান করেন এবং তাঁকে ত্রিপুরার সরদার বা সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম অংশ, যা বাংলার সীমান্তের সংলগ্ন ছিল এবং মিরযা ইসফনদিয়ারের জায়গীর সংলগ্ন ছিল, তার মিরযা ইসফনদিয়ারকে জায়গীর দেন। দেখা যায় যে মিরযা নূর-উদ-দীনই ত্রিপুরার শাসক নিযুক্ত হন, তাঁর শাসন কেন্দ্র ছিল উদয়পুর। আরও বুঝা যায় যে ত্রিপুরাকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হয়, কোন সময়ে মোগলরা উদয়পুর ত্যাগ করে? রাজমালায় বলা হয়েছে যে দৈবক্রমে মোগল সৈন্যরা মৃত্যুবরণ করতে থাকায় তারা ত্রিপুরাকে অস্বাস্থ্যকর মনে করে এবং অধিক সৈন্য ক্ষয় হওয়ার ভয়ে উদয়পুর ত্যাগ করে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম অংশ ছাড়া বাকি সমগ্র এলাকা তাদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। দলে দলে মোগল সৈন্যের মৃত্যুর কথা যদি সত্য হয় (অবশ্য সত্য হওয়ার সম্ভাবনা), তাহলে কোনরূপ মহামারীই তাদের মৃত্যুর কারণ। ত্রিপুরা রাজ্যে তখন বসন্ত রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি ছিল, এমনকি কয়েকজন ত্রিপুরার রাজাও বসন্ত রোগের আক্রমণে প্রাণত্যাগ করেন।[৫০] হয়ত, মোগল সৈন্যদের মধ্যেও বসন্ত রোগের ফলে সৈন্য-ক্ষয় হয়।

মহামারীর প্রকোপের ফলে মোগল সৈন্য ক্ষয় হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু মনে হয় মোগলদের উদয়পুর ত্যাগ করার অন্য কারণও ছিল এবং এ কারণ রাজনৈতিক। শাহজাদা শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলাদেশ দখল করেন এবং কিছুদিন বাংলাদেশ তাঁর অধিকারে ছিল। সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁকে বাধাদান করেন এবং রাজমহলে উভয় পক্ষে যুদ্ধে ফতেহজঙ্গ নিহত হন। এ যুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের মোগল সেনাপতি মিরযা নূর-উদ-দীন এবং ত্রিপুরা বিজয়ী অন্য সেনাপতি মিরযা ইসফনদিয়ার উভয়ে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন।[৫১] ফতেহজঙ্গ নিহত হওয়ার পরে উভয়ে ঢাকায় ফতেহজঙ্গের পরিবারের নিকট চলে আসেন।[৫২] মনে হয় তাঁরা উভয়ে ফতেহজঙ্গের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি ছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা উভয়েই শাহজাহানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং সম্রাটের (জাহাঙ্গীরের) বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।[৫৩] এর পরে মিরযা নূর-উদ-দীন ও মিরযা ইসফনদিয়ার সম্পর্কে বাহরিস্তানে আর কোন

Edited by Ripon Sarkar

সংবাদ পাওয়া যায় না। তাঁদের ত্রিপুরায় ফিরে যাওয়ারও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এদিকে শাহজাহান প্রথমে ঢাকায় কর্তৃত্ব স্থাপন করেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে যান এবং উত্তর ভারতে গিয়ে সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যান। ঢাকায় সম্রাটের কর্তৃত্ব শেষ বয়সে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে রাজ-দরবারে এত অস্থিরতা দেখা দেয় যে ত্রিপুরার দিকে কেউ নযর দিতে পারেন কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরায় অবস্থানরত মোগল সৈন্যরা স্বভাবতই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় বেশি দিন থাকা পছন্দ করেনি; সেনাপতি বিহীন সৈন্যরা আস্তে আস্তে ত্রিপুরা, বিশেষ করে উদয়পুর ছেড়ে মেহারকুল (কুমিল্লা) এবং কৈলাগড় (কসবা) ইত্যাদি এলাকায় চলে এসে ঐ এলাকায় মোগল কর্তৃত্ব বহাল রাখে। বসন্ত রোগ বা অন্য কোন মহামারীর ভয়ও তাদের উদয়পুর ছেড়ে আসার একটি কারণ হতে পারে।

এখন আমরা ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ আলোচনায় ফিরে আসতে পারি। উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা কয়েকটি তারিখ পাই, এ তারিখগুলি নিম্নরূপঃ

(ক) ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা যশোধর মাণিক্যের সিংহাসন আরোহণ (মুদ্রার সাক্ষ্য)।

(খ) যশোধর মাণিক্যের একুশ বছর রাজত্ব গত হওয়ার পরে ত্রিপুরায় মোগল অভিযান ও বিজয় (রাজমালার সাক্ষ্য)।

(গ) ত্রিপুরায় আড়াই বছর কাল মোগল শাসন (রাজমালার সাক্ষ্য)।

(ঘ) ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফতেহজঙ্গের মৃত্যু (বাহরিস্তান)।

(ঙ) ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিরযা নূর-উদ-দীন ও মিরযা ইসফনদিয়ারের রাজমহলে অবস্থান (বাহরিস্তান)।

(চ) ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে শাহজাহানের ঢাকা ত্যাগ (বাহরিস্তান)।

(ছ) ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে সম্রাটের অনুগত বাহিনীর ঢাকায় অবস্থান (এইচ. বি. ২য় এবং একাদশ অধ্যায়ে আলোচিত)।

(জ) ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় যশো মাণিক্যের পরবর্তী রাজা কল্যাণ মাণিক্যের সিংহাসন আরোহণ (মুদ্রার সাক্ষ্য)।

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের মৃত্যু পর্যন্ত মোগল সৈন্যরা নিশ্চয়ই উদয়পুর ত্যাগ করেনি; যুবরাজ শাহজাহানের ঢাকা অবস্থানের সময় পর্যন্তও তাদের উদয়পুর ত্যাগ করার কথা নয়। কারণ তখন পর্যন্ত তাদের সেনাপতি মিরযা নূর-উদ-দীন ও মিরযা ইসফনদিয়ার শাহজাহানের সাথে ছিলেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা বিদ্রোহী যুবরাজের পক্ষে সম্রাটের অনুগত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, সম্রাটের বাহিনী ঢাকায় আসার পরে তাঁরা আর ঢাকা বা বাংলায় থাকার কথা নয়, অর্থাৎ ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের আগে বা পরে তাঁরা ঢাকা ত্যাগ করেন। মাসির-উল-উমারায় জানা যায় যে মিরযা ইসফনদিয়ার শাহজাহানের রাজত্বকালে সম্রাটের [illegible] করেন এবং

শাহজাহানের বাহাদুর ষোড়শ বর্ষে পরলোক গমন করেন।[৫৪] এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসের পরে কোন এক সময়ে (মধ্যবর্তী সময়ে বা শেষ দিকে) মোগল সৈন্যরা উদয়পুর ত্যাগ করে। এ তারিখ যে নিছক কল্পনা প্রসূত নয়, তাহা ত্রিপুরার পরবর্তী নির্বাচিত রাজা কল্যাণ মাণিক্যের মুদ্রা দ্বারা সমর্থিত কল্যাণ মাণিক্যের শুধু ১৫৪৮ শক বা ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের মুদ্রা আবিষ্কার হয়েছে।[৫৫] রাজমালায় বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার যে সকল মন্ত্রী বা অমাত্য মোগল বিজয়ের পরে পলায়ন করে পর্বতে বা অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল, মোগল সৈন্যরা উদয়পুর ত্যাগ করার পরে তা ফিরে আসে এবং নতুন রাজা নির্বাচন করার চিন্তা ভাবনা করে। তারা জানতে পারে যে রাজা যশোধর মাণিক্য তীর্থে গমন করেছেন এবং তাঁর ত্রিপুরায় ফিরে আসার ইচ্ছা ছিল না। রাজার কোন পুত্র বা ভাইও ছিল না। তাই মন্ত্রী ও অমাত্যেরা রাজ্যচ্যুত রাজার ইচ্ছানুসারে রাজবংশের লোক এবং রাজা যশোধর মাণিক্যের আমলের সেনাপতি কল্যাণ দেবকে সিংহাসনে বসায়। তিনি কল্যাণ মাণিক্য উপাধি গ্রহণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার রাজারা সাধারণত সিংহাসনে বসার বছরের স্মারক রূপে মুদ্রা উৎকীর্ণ করতেন। তাই বলা যায় যে নতুন নির্বাচিত রাজা কল্যাণ মাণিক্য ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বা কিছু পরে মোগল সৈন্যরা উদয়পুর ত্যাগ করার পরে কিছুদিনের মধ্যে নতুন রাজা নির্বাচিত হয়; তিনি মুদ্রা জারি করার সময়ে ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ এসে পড়ে, তাই তাঁর মুদ্রার তারিখ ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দ বা ১৫৪৮ শক।

অতএব ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে যদি রাজমালার সাক্ষ্যমত মোগলরা আড়াই বছর থাকার পরে উদয়পুর ত্যাগ করে তাহলে ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা ত্রিপুরা জয় করে। আবার রাজমালার সাক্ষ্যমত যশো মাণিক্যের বাইশ বছর রাজত্বের সময় মোগল বিজয় হয়; মুদ্রার সাক্ষ্যমত যশো মাণিক্য ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসলে তাঁর রাজত্বের বাইশ বছর হয় ১৬২১। সুতরাং মুদ্রার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রাজমালার হয় প্রথম বা দ্বিতীয় বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়। অবশ্য রাজমালার রচয়িতাদের প্রতি সুবিচার করে বলতে হয়, রাজমালার তারিখগুলি আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন রাজমালার মতে যশো মাণিক্য ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন, তাঁর রাজত্বের একুশ বছরে বা ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে মোগল আক্রমণ হয় এবং আড়াই বছর পরে অর্থাৎ ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা উদয়পুর ত্যাগ করে। কিন্তু মুদ্রার সাক্ষ্যে রাজমালার প্রথম তারিখ ভুল প্রমাণিত হওয়ায় রাজমালার অন্য তারিখগুলিও ভুল প্রমাণিত হচ্ছে। অতএব রাজমালার তারিখগুলি গ্রহণ করা যায় না। ভট্টশালী যশো মাণিক্যের সিংহাসনে আরোহণের তারিখ মুদ্রার ভিত্তিতে এবং মোগলদের ত্রিপুরা বিজয়ের তারিখ রাজমালার ভিত্তিতে নির্ণয় করায় তাঁর নির্ধারিত তারিখও গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে বাহরিস্তানে তারিখ না থাকলেও এতে উল্লেখিত বর্ষাকালগুলি আগাগোড়া সঙ্গতিপূর্ণ, তাই আমরা সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে ১৬১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দের শুষ্ক মৌসুমে মোগলরা ত্রিপুরা জয় করে। অতএব প্রায় ছয় বছরেরও বেশি সময় ত্রিপুরা মোগলদের অধিকারে থাকে।

Edited by Ripon Sarkar

১। কালী প্রসন্ন সেন এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাত করেছেন। রাজমালা, ১ম, ১৬১, ১৯৪

২। ঐ, ৮৬-৮৭।

৩। ঐ, ৮৭।

৪। ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২, ৩২-৩৯।

৫। এখানে বাহরিস্তানের অনুবাদ আক্ষরিক নয়, তবে অনুবাদে মূল বক্তব্যের যাতে বিকৃতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

৬। মুসা খান মসনদ-ই-আলা ঈসা খান মসনদ-ই-আলার ছেলে। স্মরণ থাকতে পারে যে ইসলাম খান চিশতী অনেক যুদ্ধ করে তাঁকে পরাজিত করেন। মুসা খান আত্মসমর্পণ করলে তাঁকে নজরবন্দী করে রাখা হয়। ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৭। বাহরিস্তান, ২য়, ৫১১।

৮। বাহরিস্তানে এটা কাওয়ালিয়া গড়। কৈলাগড় কসবা নামক স্থানের পূর্ব নাম। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের কুমিল্লা-আখাউড়া সেকশানের মধ্যবর্তী স্থানে কসবা একটি রেল স্টেশন, পূর্বে এর নাম ছিল কমলা সাগর। ত্রিপুরা রাজ ধন্য মাণিক্যের রাণী কমলা দেবী এখানে দীঘি খনন করান এবং রাণীর নামানুসারে দীঘির নাম হয় কমলা সাগর। কৈলাগড়ে এক সময় ত্রিপুরার রাজধানী ছিল।

৯। উদয়পুর তখন রাজধানী ছিল। উদয়পুরের প্রাচীন নাম রাংগামাটি। ত্রিপুরার রাজা উদয় মাণিক্য ষোল শতকের শেষ পাদে এখানে রাজধানী স্থাপন করে এর নাম উদয়পুর রাখেন। মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য আঠার শতকের মাঝামাঝি সময়ে উদয়পুর থেকে রাজধানী আগরতলায় সরিয়ে নেন।

১০। বাহরিস্তান, ২য়, ৫০৭।

১১। ঐ, ৫০৭-০৮।

১২। বাহরিস্তানের ভাষায় "মোগল" দ্বারা একজনের নাম বুঝা যায়।

১৩। বাহরিস্তান, ২য়, ৫৫৪-৫৬।

১৪। হাতি পারাপারের জন্য দু বা ততোধিক কোষা বা বড় নৌকা সংযুক্ত করে তার উপর মঞ্চ তৈরি করা হত এবং এ মঞ্চে হাতি উঠানো হত। এরূপ সংযুক্ত নৌকাকে বাহরিস্তানে বিভিন্ন স্থানে মাও বলা হয়েছে। মনে হয় বাংলা মঞ্চ শব্দকে মির্যা নাথন ফার্সিতে মাও লিখেছেন।

১৫। মির্যা নাথন বাহরিস্তানে কোথাও মেঘনা নদী বলেননি, তিনি সর্বদা পানকিয়া বলেছেন। কিন্তু পানকিয়া অবশ্যই মেঘনা নদী। পঞ্চম অধ্যায়ের ৩০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১৬। এ পার্বত্য রাজা ও জমিদারেরা কামরূপ কোচবিহার সীমান্ত রাজ্যে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মির্যা নাথনের নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ সুবাদারের নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসেন। উপরে নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৭। বাহরিস্তান, ২য়, ৬২৭-২৮।

১৮। রাজমালা, তৃতীয় লহর, ৫৯-৬৫।

১৯। দ্বাদশ বাঙালা বা বার-ভূঁঞা।

২০। বাহরিস্তান, ১ম, ৪১৯-২০।

২১। অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আরও দেখুন, বাহরিস্তান, ১ম, ৩০৮-০৯।

২২। M. Robinson and L. A. Shaw: Coins and Banknotes of Burma. Manchester, England, 1980, pp. 46-47. আরাকানের রাজারা একই Lord of

Edited by Ripon Sarkar

the white elephant উপাধি নিতেন। ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ পরিব্রাজক রালফ ফিচ পেগুতে একটি সাদা হাতি দেখেন, এটা দেখার জন্য তাঁকে দর্শনী ফিস দিতে হয়। মানরিকও ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে আরাকানের রাজধানী ম্রোহং-এ একটি সাদা হাতি দেখেন। রালফ ফিচ এবং মানরিক উভয়েই সাদা হাতিকে কিরূপ পরিচর্যা করা হত তার বিবরণ দেন। একে একটি বিশেষ ঘরে রাখা হত, ঘরখানিকে সিল্ক দিয়ে সজ্জিত করা হত, এবং এর পরিচর্যার জন্য অনেক লোক লস্কর সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকত। একে স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে খাবার পরিবেশন করা হত, নিয়মিত স্নান করান হত এবং অত্যন্ত পরিষ্কার রাখা হত। মহিলারা একে বুকের দুধ খাওয়াবার জন্য লাইন ধরে অপেক্ষা করত। (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, ঐ, পৃঃ ৪৭।)

২৩। অবশ্য আমাদের মনে রাখা দরকার যে সম্রাটের অনুমতি ছাড়া সুবাদার এরূপ অভিযান করতে পারতেন না, তবে এক্ষেত্রে মনে হয় সুবাদার পূর্বাহ্নেই সম্রাটের অনুমতি নেন।

২৪। পরে একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৫। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৩২।

২৬। "সোনামুড়া শহরের পূর্বদিকস্থ তিন ক্রোশ দূরবর্তী একটি অত্যোন্নত পর্বত শৃঙ্গে এ গড় (চণ্ডীগড়) বা সেনানিবাস সংস্থাপিত ছিল।" রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, ২৭৮।

২৭। "ইহার অন্য নাম ছবড়িয়া গড়। এই স্থান সদর (আগরতলা) বিভাগের অন্তঃপাতী চড়িলাম মৌজার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।" রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, ২৭৯।

২৮। এইচ. বি. ২য়, ৩০১।

২৯। ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২, ৩৬।

৩০। রাজমালা, তৃতীয়, লহর, ৫৯।

৩১। ঐ, ৫৭।

৩২। ঐ, ৫৯।

৩৩। যথাক্রমে নবম অধ্যায় এবং একাদশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৪। বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত, মধ্যযুগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮০, ৪৯৬; ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২, ৩২-৩৪।

৩৫। বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, ৪৯৬-৯৭; ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২, ৩৩-৩৪।

৩৬। রাজমালা, ৩য় লহর, ২৩৭।

৩৭। ঐ, ১৮।

৩৮। ঐ, ২৩৬।

৩৯। ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২ বাংলা, ৩২-৩৯।

৪০। এইচ, বি. ২য়, ৩০২, টীকা।

৪১। ঐ।

৪২। রাজমালা, ২য় লহর, ২১৭।

৪৩। আলোচ্য পার্বত্য এলাকা বর্তমান বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত এবং আছলং নামে পরিচিত। রাজমালা, ১ম লহর, ২৩৯-৪১; ৩য় লহর, ৩৫১-৫৩।

৪৪। রাজমালা, ৩য় লহর, ৬৮-৭২।

৪৫। ঐ, ২১৭-১৮।

৪৬। কিনার শব্দের অর্থ কিরণ, অর্থাৎ চেরাগ বা বাতি জ্বালাবার জন্য রাজ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ভূ-সম্পদ।

Eidited by Ripon Sarkar

৪৭। সনন্দ সনদ বা রাজ-ক্ষমতায় প্রদত্ত দলীল।

৪৮। বদর মোকাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ভল্যুম ৭, নং ১, ১৭-৪৬।

৪৯। এ সময়টা বাহারিস্তান-ই-গায়বীর আলোচনা অনুসরণ করে নির্ধারণ করা হয়েছে। মিরযা নাথন বলেছেন যে তিনি নিজে ফতেহজঙ্গের দুদিন পরে উদয়পুর পৌছেন এবং ফতেহজঙ্গের সাথে দেখা করেন। তাই মনে হয় মিরযা নাথন ত্রিপুরা পৌছার পরের দিন (ফতেহজঙ্গের পৌছার তৃতীয় দিন) সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এর পরে ফতেহজঙ্গ দুদিন উদয়পুরের থাকেন, এই মোট পাঁচ দিন। ঢাকা থেকে উদয়পুর যাওয়ার সময় তিন দিন এবং ফিরে আসার সময় তিন দিন সময় লাগে। সুতরাং ফতেহজঙ্গের উদয়পুরে যাওয়া আসাতে মোট এগার দিন সময় লাগে।

৫০। রাজা ধর্ম মাণিক্য, ধণ্য মাণিক্য এবং বিজয় মাণিক্যের বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কথা রাজমালায় পাওয়া যায়। রাজমালা, ২য় লহর, পৃঃ ৬, ৩৩, ৬৩।

৫১। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৫৯।

৫২। ঐ, ৭০৭।

৫৩। ঐ, ৭৫৬-৫৭।

৫৪। মাসির-উল-উমারা, ১ম, পৃঃ ৫৬৮।

৫৫। রাজমালা, ৩য় লহর, ২৩৮; রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ, কলকাতা, ১৩৮০, ৪৯১; ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪২, ৫২-৫৪।

Edited by Ripon Sarkar

একাদশ অধ্যায়

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ
চন্দ্রকোণা ও হিজলীর বিদ্রোহ দমন এবং ব্যর্থ আরাকান অভিযান ও মৃত্যু

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সুবাদারী আমলে কামরূপের বিদ্রোহ দমন এবং ত্রিপুরা বিজয়ের কাহিনী ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম খানের সময়ের একমাত্র বড় সাফল্য ত্রিপুরা বিজয়, বাকিগুলি অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন। ইবরাহীম খানের আরাকান অভিযানও ব্যর্থ হয়।

চন্দ্রকোণা বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জিলা শহরের আটাশ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত। মোগল আমলে এখানে একজন জমিদার ছিল। আনুমানিক ১৬১২ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে এ এলাকা ইহতিমাম খানের (মিরযা নাথনের পিতা) জায়গীরভুক্ত ছিল। প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে মিরযা নাথন যখন যশোরে অবস্থান করছিলেন, তখন চন্দ্রকোণার জমিদার চন্দ্রভান এবং বরদা ও কাকরার[১] জমিদারেরা এসে মিরযা নাথনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের স্ব স্ব জমিদারীতে বহাল করা হয়। বরদার জমিদার দলপত অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাঁকে মিরযা নাথন নিজের নিকট রেখে দেন। মিরযা নাথন তাঁর ভাই মিরযা মুরাদের অধীনে একদল সৈন্য দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে পাঠান এবং হিজলীর অধীনস্থ বেতিয়া পাথন্দা[২] আক্রমণ করতে বলেন। কিন্তু জমিদারেরা বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং মিরযা মুরাদ পায়ে আঘাত পেয়ে জাহানাবাদে[৩] ফিরে আসেন। পরে অবশ্য জমিদারেরা তাঁদের ভুল বুঝতে পারেন এবং জাহানাবাদে এসে মিরযা মুরাদের সঙ্গে দেখা করেন।[৪] এর পরে ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে চন্দ্রকোণার জমিদারের অত্যাচারের সংবাদ সম্রাটের নিকট পৌঁছে। তখন সুবাদার কাসিম খান পদচ্যুত হয়েছেন এবং সুবাদার ইবরাহীম খান তখনও দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সম্রাট রাজমহল ও বর্ধমানের ফৌজদার মুরওওত খানকে চন্দ্রকোণার জমিদার হরভানকে শাস্তি দেয়ার আদেশ দেন। মুরওওত খান তাঁকে পরাজিত করায় সম্রাট মুরওওত খানের মনসব বৃদ্ধি করে তাঁকে সম্মানিত করেন।[৫]

হিজলীর জমিদার সলীম খান ইসলাম খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো বাহাদুর খান হিজলীর জমিদারী লাভ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে বাহাদুর খান পূর্ববর্তী সুবাদার কাসিম খানের সঙ্গে দেখা না করায় তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাহাদুর খানকে ঢাকায় ডেকে পাঠালে বাহাদুর খান উড়িষ্যার তদানীন্তন সুবাদার মুকাররম খানের[৬] সঙ্গে যোগসাজশ করে আবার অবাধ্য হন। সুবাদার ইবরাহীম খান মুহাম্মদ খান সবাকশকে[৭] বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং বলেন যে বাহাদুর খান অনুগত না হলে তাঁকে যেন শাস্তি দেয়া হয়। এলাকাস্থ অন্যান্য জমিদারদেরও মুহাম্মদ খান সবাকশকে সাহায্য করার আদেশ দেয়া হয় এবং মুসা খানের দুশ রণতরীও তাঁর নিকট পাঠানো হয়।[৮] মুহাম্মদ খান সবাকশ হিজলী আক্রমণ করলে বাহাদুর খান মুকাররম খানের নিকট সাহায্য চেয়ে

Edited by Ripon Sarkar

পাঠান। যদিও হিজলী মুকাররম খানের অধীনে ছিল না, এবং বাংলার জমিদারদের বিষয়ে তাঁর করণীয় কিছু ছিল না, তবুও মুকাররম খান বাহাদুর খানের সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠান। মুহাম্মদ খান অবাকশ সুবাদারকে এ বিষয়ে অবহিত করেন।[৯]

এ সময় সুবাদার সংবাদ পান যে যশোরের ফৌজদার সোহরাব খান মদ পান করে দিনরাত নেশায় বিভোর হয়ে থাকেন এবং ফলে শাসন ব্যাপারে শিথিলতা দেখা দেয়। হাসান মাশহাদী ছিলেন যশোরের দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশ। তিনি সোহরাব খানকে সৎপরামর্শ দিলে সোহরাব খান তাতে কান দিলেন না, বরং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। সুবাদার আরও সংবাদ পান যে ফিরিঙ্গী দস্যুরা যশোহর অঞ্চলে লুটতরাজ করছে এবং এক সময় পনরশ নারী পুরুষ ধরে নিয়ে গেছে। বস্তুত দিওয়ান হাসান মাশহাদী নিজেই সুবাদারের নিকট সোহরাব খানের গাফেলতীর সংবাদ দেন। কারণ তিনি ওয়াকিয়ানবিশ বা সংবাদ সরবরাহকারীর দায়িত্বেও নিযুক্ত ছিলেন। সুবাদার তখন নিজেই যশোর যাওয়ার মনস্থ করেন। সোহরাব খানের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত করে সুশাসনের ব্যবস্থা করা এবং বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া—এ উভয় উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যশোর যাত্রা করেন। কিন্তু যশোরের পথে তিনি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হন। কিন্তু দূর সোজা পথে গিয়ে তিনি জলা পথে যাত্রা আরম্ভ করেন এবং নদীনালার মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেন। ফলে নদী নালার মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এমন অবস্থায় পড়ে যান যে পাঁচ দিনের মত তিনি একই স্থানে ঘুরেন এবং জনমানবহীন অবস্থায় তাঁর এবং তাঁর সৈন্যদের খাবার জিনিস সংগ্রহ করতেও বেগ পেতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত সুবাদারের এ যাত্রাপথের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, মনে হয় তিনি ফিরিংগী দস্যুদের অত্যাচারের ফলে জনবসতিহীন কোন এলাকায় গিয়ে পড়েন এবং তাঁর সঙ্গে এমন কোন লোক ছিল না যে তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। অনেক কষ্টের পরে তিনি যশোর শহরের তিন ক্রোশ দূরে কাগরাঘাটা[১০] নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছেন।[১১]

কাগরাঘাটা পৌঁছে সুবাদার মির্যা আহমদ বেগ, মির্যা ইউসুফ, জালাইর খান এবং মুসা খানকে তাঁর জমিদার মিত্রসহ হিজলী পাঠান, সঙ্গে তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে বাহাদুর খানের নিকট একখানি পত্র দেন। এ সৈন্যদল সমুদ্রের দিক থেকে হিজলী আক্রমণ করে, মুহাম্মদ খান অবাকশও পূর্ব থেকে ঐ স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে অবস্থান করছিলেন। এদিকে সুবাদার নিজে আমোদ প্রমোদে ব্যস্ত থাকেন। তিনি প্রত্যেক দিন ভোরে নৌকায় করে বেরিয়ে যেতেন, নৌবহর পরিদর্শন করে, নৌকা থেকে নেমে চারি ঘণ্টা ধরে তীর ছুঁড়তেন (মনে হয় শিকার করতেন) এবং পরে শিবিরে ফিরে আসতেন। তাঁর সঙ্গী অফিসারেরাও তাঁর দেখাদেখি শিকার করতেন। ফিরে এসে সঙ্গীদের নিয়ে আহার করতেন। বিকালে তিনি শাসন ব্যাপারে, এবং রাজস্বের হিসাব নিকাশ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। তাঁর সঙ্গীরা অবসর সময়ে দাবা খেলতেন।

এদিকে বাহাদুর খান দেখেন যে সুবাদার যশোরে আসার পরে মুকাররম খান তাঁকে সাহায্য দেয়া বন্ধ করে দেন এবং উড়িষ্যার সৈন্য স্বস্থানে ফিরে যায়। তখন বাহাদুর খানের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় রইল না। তিনি মোগল সেনাধ্যক্ষের নিকট আনুগত্যের বার্তা পাঠান। মির্যা আহমদ বেগ এবং অন্যান্যরা তাঁর জীবনের

Edited by Ripon Sarkar

নিরাপত্তার আশ্বাস দেন। ফলে বাহাদুর খান তাঁদের সঙ্গে এসে সুবাদারের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। সুবাদার বাহাদুর খানকে তাঁর অবাধ্যতার অপরাধের জন্য তিন লক্ষ টাকা জরিমানা করেন কিন্তু তাঁর জমিদারীতে তাঁকে বহাল রাখার আদেশ দেন।[১২]

ফিরে আসার আগে ইবরাহীম খান যশোরের ফৌজদার সোহরাব খানকে পদচ্যুত করেন এবং জালাইর খান, মিরযা ইসফন্দিয়ার এবং মিরযা নাথন, এ তিনজনের মধ্যে যে কোন একজনকে যশোরের সরদার বা সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। মিরযা আহমদ বেগের বিরোধিতায় মিরযা ইসফন্দিয়ারের নাম বাদ পড়ে, জালাইর খান মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর নামও বাদ পড়ে। মিরযা নাথনের নিকট প্রস্তাব করা হলে তিনি বিনীতভাবে আবেদন জানান যে সোহরাব খানকে প্রথম বারের মত ক্ষমা করে তাঁর স্বপদে বহাল করা হোক। সোহরাব খানের নিকট থেকে যশোর সুশাসনের অঙ্গীকার নিয়ে এবং অতিরিক্ত ষাট খানি রণতরী তাঁর দায়িত্বে দিয়ে, হিজলীর বাহাদুর খানকে সঙ্গে নিয়ে সুবাদার ইবরাহীম খান ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩] বাহরিস্তানের বিবরণ অনুসরণ করলে বাহাদুর খানের আত্মসমর্পণের তারিখ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে নিরূপণ করা যায়। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ তারিখ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস নির্ধারণ করেছেন।[১৪]

এ সময় মিরযা আহমদ বেগ উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হন। তিনি ছিলেন ইবরাহীম খানের বড় ভাই রাষ্ট্রদ্রোহে অভিযুক্ত এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত মুহম্মদ শরীফের ছেলে, অর্থাৎ মিরযা আহমদ বেগ সম্রাজ্ঞী নূর জাহানেরও ভাইপো ছিলেন। নূর জাহানের হস্তক্ষেপেই মিরযা আহমদ বেগ উড়িষ্যার সুবাদারী লাভ করেন। এ সময় মুকাররম খানকে উড়িষ্যা থেকে বদলী করে দিল্লীর সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, এ তারিখ ১৬২১ খ্রিস্টাব্দ।[১৫] জালাইর খান তিন লক্ষ টাকা নযরানা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে ইবরাহীম খান তাঁর বেগমের সুপারিশে জালাইর খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন কিন্তু মিরযা আহমদ বেগ এ নিযুক্তির বিরুদ্ধে তাঁর ফুফু সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের নিকট অভিযোগ করেন। ফলে এ মর্মে এক ফরমান জারি হয় যে জালাইর খান উড়িষ্যায় গিয়ে পৌঁছুলে তাঁকে প্রত্যাহার করা হোক এবং আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যায় সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠানো হোক। ফলে ইবরাহীম খান বাধ্য হয়ে আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যায় পাঠান। জালাইর খান ইতোমধ্যেই তিন লক্ষ টাকা দেন, এ অর্থ ফেরত নেয়ার জন্য জালাইর খানকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়। এমন কি তিনি তাঁর জায়গীর ও মনসব হারানোর উপক্রম হয়। অনেক কষ্টের পরে তিনি তাঁর জায়গীর লাভ করেন, এবং কোন কোন এলাকার বাইশ এবং কোন কোন এলাকার ত্রিশ মাসের বকেয়া রাজস্ব সংগ্রহের সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রদত্ত তিন লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণ লাভ করেন।[১৬]

মগ আক্রমণ ঃ

আরাকানের রাজা মিন খামৌঙ্গ বা হোসেন শাহ ম্রখংগ (ম্রোহং বা রোসাংগ আরাকানের রাজধানী) থেকে বাংলা আক্রমণ করেন এবং কয়েকটি গ্রাম লুট করেন এবং গ্রামের লোকদের বন্দী করেন। এটা ইবরাহীম খানের যশোর গমনের আগের ঘটনা এবং মিরযা নাথনের বিবরণ এবং বর্ষাকালের উল্লেখে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের বর্ষাকালে এটা সংঘটিত

Edited by Ripon Sarkar

হয় বলে মনে হয়। ইবরাহীম খান মগদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় জানতে পারেন যে মগ রাজা সাতশ জেব এবং চার হাজার জালিয়া রণপোত নিয়ে ভূগাচর (বা দ্বীপে) এসেছেন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। মগ রাজা ইতোপূর্বে সন্দ্বীপের পর্তুগীজদের পরাজিত করেন, পর্তুগীজ সেনাপতিগান গঞ্জালেসের কোন খবর পাওয়া যায় না। সুতরাং পর্তুগীজদের আক্রমণের ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে মগ রাজা কাসিম খানের সময়ের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। প্রায় পাঁচ হাজার রণপোত নিয়ে আসা এ কথাই প্রমাণিত করে।

খান ফতেহজঙ্গ এ সংবাদ পেয়ে রাতের শেষ দিকে ঢাকা থেকে যাত্রা করেন। রাজধানীর চৌকিতে পাহারারত রণপোতগুলিই শুধু তিনি সঙ্গে নেন, মনসবদারদের বা জমিদারদের রণপোত সঙ্গে নেয়ার সময়ও তিনি পেলেন না। শত্রু শিবিরের তিন ক্রোশ দূরত্বে পৌঁছে তিনি গুণে দেখেন যে তাঁর নিকট মাত্র ত্রিশটি দ্রুত গতিসম্পন্ন রণতরী রয়েছে। তাঁর অনুগামী অফিসারেরা সৈন্য বা রণতরীর অপ্রতুলতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তিনি ফিরে আসলেন না, বরং যেখানে গিয়ে পৌঁছেন সেখানেই থেকে যান; বরং রাজধানী ঢাকার প্রতিরক্ষার জন্য তিনি তাঁর ভাইপো আহমদ বেগ খানকে পাঠানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আহমদ বেগ খান তাঁকে ছেড়ে আসতে রাজি হলেন না। সৌভাগ্যবশত একদিন এক রাতের মধ্যে ঢাকা থেকে উচ্চপদস্থ অফিসারেরা সৈন্য নিয়ে এবং জমিদারেরা রণপোত নিয়ে এসে সুবাদারের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর সৈন্য ও নৌসেনা এবং রণতরীগুলি গণনা করা হয়, এবং দেখা যায় যে চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার রণতরী জমা হয়েছে। এটা দেখে সুবাদার সন্তুষ্ট হন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। মগ রাজাও যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হন, কিন্তু তিনি যখন দেখেন যে, সুবাদার স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত রয়েছেন এবং তাঁর সৈন্য ও নৌকার সংখ্যাও প্রচুর, তখন যুদ্ধ করতে সাহস করলেন না। তিনি তাঁর রাজধানী রোসাঙ্গে ফিরে যান কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় দুই হাজার জালিয়া নৌকা তাঁর রাজ্যের সীমান্তে রেখে যান। ইবরাহীম খান ফুলজুবি থেকে ভুলুয়া পর্যন্ত যান এবং আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে নৌকাযোগে সাত আট হাজার অশ্বারোহী তাঁর অনুসরণ করে। তিনি ভুলুয়া থেকে আরও দু ক্রোশ সম্মুখে অগ্রসর হন এবং সেখানে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হন। পরামর্শ সভায় উপস্থিত অফিসারদের মধ্যে ছিলেন মিরযা আহমদ বেগ ও তাঁর ভাই মিরযা ইউসুফ, মিরযা মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ, মিরযা হিদায়েত বেগ দিওয়ান, মিরযা আশরাফ বখশী, মিরযা নাথন, মুসা খান মনসদ-ই-আলা এবং রাজা রঘুনাথ। পরামর্শ সভায় মিরযা আহমদ বেগ বলেনঃ 'সব কিছুই প্রস্তুত, এখন যা দরকার তা হচ্ছে সাহস।' ইবরাহীম খান এতে বিরক্ত হন এবং মিরযা নাথনের অভিমত জানতে চান। মিরযা নাথন বলেন যে সাহসেরও অভাব নেই, সাহস না থাকলে মাত্র ত্রিশখানি রণতরী নিয়ে সুবাদার একা শত্রুর বিরুদ্ধে চলে আসতে পারতেন না। কিন্তু যে কোন যুদ্ধ করার আগে আবহাওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া দরকার। এ এলাকার আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান না থাকায় তিনি (মিরযা নাথন) কোন মতামত দিতে পারেন না। সুবাদার এ পরামর্শ দেয়ার জন্য মিরযা নাথনের প্রশংসা করেন। ঝড়-বৃষ্টির মওসুম হওয়ায় সেখানে কতকগুলি থানা স্থাপন করা হয়। ফুলজুবি পরগণায় অবস্থানরত নৌ-বাহিনীর দায়িত্বে খান মিরযাকে (ইতমাদ-উদ-দৌলার আত্মীয়, অর্থাৎ সুবাদারেরও আত্মীয়) নিযুক্ত করে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১৭]

Edited by Ripon Sarkar

উপরোক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, কোন যুদ্ধ হয়নি, যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু আরাকানের মগ রাজা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কতদূর প্রবেশ করেছিলেন সে বিষয়ে কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে। মাত্র দুটি স্থানের নাম বাহরিস্তানে পাওয়া যায়, একটি ভগাচর অন্যটি ফুলডুবি। মগ রাজা ভগাচর পর্যন্ত আসেন এবং বাংলার সুবাদার ফুলডুবি পর্যন্ত যান। দুইটির কোন স্থানই সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায় না। নদীর গতি গত কয়েকশ বছরে এমনভাবে পরিবর্তন হয়েছে যে কোন স্থানের নাম আধুনিক মানচিত্রে পাওয়ার আশা করা যায় না। ভগাচর নামেই বুঝা যায় যে এটা একটি চর বা দ্বীপ, এবং এটা মেঘনা নদীর চর রূপে অনুমান করা সঙ্গত। ফুলডুবি থেকে আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে সৈন্য পার হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সুতরাং ফুলডুবি আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরেই কোন স্থান হবে এবং এ সূত্রে এটা বর্তমান ফরিদপুর জেলাতেই অবস্থিত ছিল। অতএব ধারণা করা যায় যে, মগ রাজা ভুলুয়া অতিক্রম করে মেঘনা নদী দিয়ে ফরিদপুরের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হন এবং হয়ত তাঁর লক্ষ্য ছিল ঢাকা। সুবাদার ইবরাহীম খানও ঢাকা থেকে বের হয়ে বিক্রমপুর অতিক্রম করে ফরিদপুরের দিকে যান এবং আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। সুবাদারের সৈন্য ও নৌবল এবং সুবাদারের অবিচল সংকল্প দেখে মগ রাজা ঘাবড়ে যান, তিনি হয়ত অতর্কিত আক্রমণের আশা করেছিলেন। অথবা হয়ত অতিরিক্ত ঝড় বর্ষা দেখে তিনি প্রতিকূল আবহাওয়ায় যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়াই সঙ্গত মনে করেন।

আরাকানের ইতিহাসে এ যুদ্ধের অতিরঞ্জিত বিবরণ আছে, এই সূত্র অবলম্বনে এ. পি. ফেয়ার বলেন যে আরাকানের রাজা মিন খামৌঙ্গ বাংলাদেশের বাকেরগঞ্জ জেলার একাংশ জয় করেন এবং কিছু দিন ঢাকাও নিজ অধিকারে রাখেন।[১৮] কিন্তু এটা যে সত্য নয় তা বাহরিস্তানের উপরোক্ত বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি। লেখক মিরযা নাথন এ অভিযানে সুবাদারের সঙ্গে ছিলেন। তাছাড়া আরাকান রাজ কর্তৃক ঢাকা অধিকারের কোন প্রশ্নই উঠে না, ঢাকা যে এ সময় আরাকান রাজের অধিকারে যায় এরূপ কোন প্রমাণ নেই। মগ রাজা অবশ্য ভুলুয়া অধিকার করেই মেঘনা নদী পর্যন্ত পৌঁছেন, ভুলুয়ার মোগল থানাদার তখন কোথায় ছিলেন বা তাঁর কি অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে বাহরিস্তানে বা অন্য কোন সূত্রে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যা হোক মগ আক্রমণের সময় ভুলুয়া মোগলদের হস্তচ্যুত হলেও ইবরাহীম খান আবার ভুলুয়া পুনরাধিকার করেন এবং ভুলুয়া অতিক্রম করে আরও দু ক্রোশ সম্মুখে গিয়ে থানা প্রতিষ্ঠিত করেন।

ইবরাহীম খানের আরাকান অভিযান

আগে বলা হয়েছে যে সম্রাট জাহাঙ্গীর ইবরাহীম খানকে নিযুক্তির সময় আরাকান জয় করে সাদা হাতি হস্তগত করার আদেশ দেন। সুতরাং আরাকান অভিযানে যাওয়া ইবরাহীম খানের পরিকল্পনায় ছিল। এখন তিনি (আনুমানিক ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে) নিজেই আরাকানে অভিযান পরিচালনা করেন। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরা বিজয়ের পরে মিরযা নূর উল্লাহকে (বা মিরযা নূর-উদ-দীন) ত্রিপুরার সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। এখন মিরযা নূর উল্লাহ সুবাদারের নিকট সংবাদ পাঠান যে ত্রিপুরার লোকেরা স্বেচ্ছায় সুবাদারকে আরাকান অভিযানের পথ নির্দেশ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। ত্রিপুরার রাজা ইতোপূর্বে কয়েকবার আরাকান অভিযান করেন, তিনি যে পথে

Edited by Ripon Sarkar

অভিযানে যান সে পথই তারা সুবাদারকে নির্দেশ করবে। অতএব সুবাদার ইবরাহীম খান মিরয়া নূর উল্লাহর প্রদর্শিত পথে আরাকান যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল দু হাজার রণতরী, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য, এক হাজার হাতি এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধের সরঞ্জাম। দু ফেনী নদী অতিক্রম করে এ বাহিনী এক জঙ্গলাকীর্ণ পথে যাত্রা করে। সারা পথে সৈন্যরা ছাড়াও সুবাদার নিজে জঙ্গল পরিষ্কার করে অগ্রসর হয়ে এমন এক স্থানে পৌঁছেন যেখানে আর নৌকা চলে না। শুধু একটি গণ্ডোলা সুবাদারকে নিয়ে যায়, এমনকি ঘোড়াও সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে না। অনেক কষ্টে হাতি অগ্রসর হয়। এ দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হয়, কিছু পাওয়া গেলেও তার দাম ছিল অত্যন্ত চড়া। চালের দাম টাকায় দু সের, এবং তেলের দাম সের প্রতি পনের টাকায় উঠে। অন্যান্য ভোজ্য পণ্যের দামও সে পরিমাণে বেড়ে যায়। এ অবস্থায় অনেক লোকের অনাহারে মৃত্যু হলে ইবরাহীম খান অভিযান প্রত্যাহার করে ফিরে আসেন।[১৯]

বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে প্রাপ্ত ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের আরাকান অভিযানের উপরোক্ত বিবরণে খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাহরিস্তানে আরাকান অভিযানের কথা বলা হলেও বিবরণের প্রথম দিকে এক স্থানে আছরঙ্গ বলা হয়েছে, যা অনুবাদক বরুনীর মধ্যে আরাকান লিখেছেন। পার্বত্য ত্রিপুরার আছরংগ একটি দুর্গম এলাকা, এটা বর্তমানে আছলঙ্গ নামে বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত। ত্রিপুরা মোগল অধিকারে এলে এবং ত্রিপুরার রাজা বন্দী হলে ত্রিপুরার একজন সেনাপতি আছরঙ্গ গিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[২০] ইবরাহীম খান এ আছরঙ্গ আক্রমণ করেন মনে করার কোন কারণ নেই, আছরঙ্গ জয় করার প্রয়োজনও ছিল না এবং মিরযা নাথন শিরোনামে আরাকান অভিযানের কথাই বলেছেন। বাহরিস্তানে আরও বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার ভিতর দিয়ে ইবরাহীম খান ফেনী নদী পর্যন্ত যান এবং দু ফেনী নদী পার হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হন। ফেনী পর্যন্ত যাত্রা পথে জঙ্গল পরিষ্কারের কথা নেই। এতে মনে হয় স্থলবাহিনী ত্রিপুরার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয় এবং নৌবাহিনী মেঘনা নদী দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফেনীতে যায়। কারণ ত্রিপুরার গোমতী নদী থেকে ফেনী নদীর কোন সংযোগ নেই। ফেনী নদী পার হয়ে মোগল বাহিনী জঙ্গল পরিষ্কার করতে করতে অগ্রসর হয়। এতে মনে হয় তারা ফেনী নদী দিয়ে উজানে চলে যায়। এবং রামগড়ের পাহাড়ের ভিতর আটকা পড়ে। ফেনী নদী পার হয়ে বর্তমান মীরসরাই উপজিলার ভিতর দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলে এত জঙ্গল পরিষ্কার করতে হত না, কারণ সুলতানী আমল থেকে এ পথে রাস্তা ছিল, এবং সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯) সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম পর্যন্ত এ রাস্তাটি নির্মাণ করেন।[২১] কাসিম খানের অভিযানের সময় মোগলরা এ পথে অগ্রসর হয়ে নিজামপুর পার হয়ে কাটগড় পর্যন্ত যান। সে পথে জঙ্গল পরিষ্কার করার দরকার হত, তবে সে জঙ্গল গভীর জঙ্গল নয়, সংস্কার বিহীন রাস্তার উভয় দিকের জঙ্গল। এ পথ মোগলদের জানা ছিল, কিন্তু ত্রিপুরার লোকেরা আরও সংক্ষিপ্ত পথ দেখাবার আশ্বাস দেয়ায় ইবরাহীম খান বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ত্রিপুরার লোকদের হয়ত সৎ উদ্দেশ্য ছিল, ত্রিপুরার রাজা যে পথে চট্টগ্রাম বা আরাকান আক্রমণ করেছিলেন, সে পথেই তারা মোগল বাহিনীকে নিয়ে যান, ত্রিপুরার সৈন্যদের ত্রিপুরা রাজ্যে সকল পথঘাট জানা থাকায় তাদের অসুবিধা ছিল না, কিন্তু মোগলদের জন্য ছিল সব কিছুই অজানা। অথবা হয়ত ত্রিপুরার লোকেরা [illegible] ইবরাহীম খানকে ভুল

Edited by Ripon Sarkar

পড়ে নিয়ে যায়। যা হোক, ইবরাহীম খানের এ আরাকান অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। তিনি অনেক সৈন্য হারিয়ে ঢাকা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

অল্পদিন পরে মগ রাজা আবার দক্ষিণ শাহবাজপুর আক্রমণ করেন[২২] এবং নদীর চরে সৈন্য সামন্ত নিয়ে অবস্থান করেন। সুবাদার এ সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা থেকে চার পাঁচ হাজার রণতরী নিয়ে অগ্রসর হন এবং বিক্রমপুরে যান।[২৩] কিন্তু মগ রাজা সংবাদ পান যে বর্মীরাজ তাঁর নিজের দেশ আরাকান আক্রমণ করেছেন। তাই মগ রাজা শত্রুর মুকাবিলা করার জন্য তড়িঘড়ি করে স্বদেশে ফিরে যান। ইবরাহীম খান তাঁর বখশী মিরযা বাকীকে ছয়শ রণতরী দিয়ে নদী পাহারার কাজে নিযুক্ত করে নিজে ঢাকায় ফিরে আসেন।[২৪] এর পর ইবরাহীম খানের সময়ে আরাকানীদের সঙ্গে কোন যুদ্ধ হয়নি।

ইবরাহীম খানের মৃত্যু

ইবরাহীম খানের সময়ে কামরূপের বিদ্রোহ দমন প্রায় সম্পন্ন হয়, আরাকানের মগ রাজার কয়েকবার আক্রমণও ব্যর্থ হয়, ত্রিপুরা বিজিত হয় এবং কয়েকজন জমিদারের বিদ্রোহ দমন করা হয়। সুতরাং তাঁর সুবাদারী আমলের শেষ দিকে, আনুমানিক ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে, ইবরাহীম খান স্বস্তিতে দিন কাটানোর এবং শাসনকার্যে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান। তিনি মোটামুটি শান্তিতেই ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে কেন্দ্রীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ইবরাহীম খান এক মহাবিপদের সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যন্ত নিহত হন। এ মহাবিপদ যুবরাজ শাহজাহানের বিদ্রোহ এবং বাংলায় আগমন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে নূর জাহান চক্রই প্রকৃতপক্ষে দেশ শাসন করে, এ চক্রে ছিলেন নূর জাহান, তাঁর পিতা ইতমাদ-উদ-দৌলা, তাঁর ভাই আসফ খান এবং যুবরাজ শাহজাহান। শাহজাহান ছিলেন যুবরাজদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, দক্ষ এবং সাহসী। আবার তিনি ছিলেন আসফ খানের জামাতা, অর্থাৎ চক্রের অন্যদের সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। অবশ্য সম্রাটের উপর ব্যক্তিগত প্রভাবের ফলে সাম্রাজ্ঞী নূর জাহানই ছিলেন এ চক্রের নেত্রী। প্রথমে এই চক্রের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল, কিন্তু সম্রাটের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়লে নূর জাহান চক্র সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে থাকেন। ১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাটের প্রথম গুরুতর অসুখ দেখা দেয়, প্রথমে তিনি সর্দিতে আক্রান্ত হন কিন্তু তা পরে হাঁপানীতে রূপ নেয়। সম্রাট অত্যধিক মদ পান করতেন, মাত্রা কিছু কমিয়ে দেন এবং স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য কাশ্মীর যান, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি এত অসুস্থ হন যে তিনি আত্মজীবনী লিখতেও অসমর্থ হন। ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে নূর জাহানের মাতা পরলোক গমন করেন, স্ত্রীশোকে পরের বছর অর্থাৎ ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে ইতমাদ-উদ-দৌলাও ইন্তেকাল করেন। ইতমাদ-উদ-দৌলার মৃত্যুতে নূর জাহান চক্রে ভাংগন ধরে। কারণ ইতমাদ-উদ-দৌলা ছিলেন এ চক্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ কিন্তু নূর জাহান চক্র ভাঙ্গনের সবচেয়ে বড় কারণ তাঁর নিজের উচ্চাশা এবং নিজের ক্ষমতা স্থায়ী করার প্রয়াস। নূর জাহান জানতেন এবং সকলেই জানত যে সম্রাটের মৃত্যুর পরে শাহজাহানই

Edited by Ripon Sarkar

হবেন সম্রাট, সম্রাটের ছেলেদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। সম্রাটও তাঁকে সেভাবেই গড়ে তোলেন এবং যুবরাজ থাকাকালেই শাহজাহান উপাধি দেন। সাম্রাজ্যের সকল উচ্চপদস্থ আমীরও তাঁকে ভাবী সম্রাট রূপে মেনে নেন। কিন্তু নূর জাহান আরও জানতেন যে শাহজাহান সম্রাট হলে তাঁর কর্তৃত্ব থাকবে না, শাহজাহান কারও কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার মত লোক নন। তাই তিনি সম্রাটের মৃত্যুর পরেও যাতে তাঁর ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকে সে চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টার দুটি দিক প্রথমতঃ শাহজাহানের পরিবর্তে অন্য কোন যুবরাজকে ভাবী সম্রাট মনোনীত করা এবং দ্বিতীয়ত, শাহজাহানের ক্ষমতা খর্ব করা। তিনি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহরিয়ারের সঙ্গে তাঁর (নূর জাহানের) প্রথম পক্ষের কন্যা লাডলী বেগমের বিয়ে দেন, ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এর পরে নূর জাহান শাহজাহানকে সম্রাটের কোপদৃষ্টিতে ফেলার ষড়যন্ত্র করেন এবং শীঘ্রই সে সুযোগ এসে যায়। ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যের শাহ আব্বাস কান্দাহার আক্রমণ করেন। নূর জাহানের পরামর্শে সম্রাট শাহজাহানকে কান্দাহার অভিযানে যাওয়ার আদেশ দেন। শাহজাহান এতে শংকিত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর অনুপস্থিতিতে নূর জাহান তাঁর সিংহাসন লাভে বিঘ্নের সৃষ্টি করবেন এবং নিজ জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন। তিনি আরও বুঝতে পারেন যে তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি দাক্ষিণাত্যে, কান্দাহার গেলে তাঁর এই ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি এমন সব প্রস্তাব করেন যার অর্থ দাঁড়ায় কান্দাহার অভিযানে যেতে তাঁর অসম্মতি জ্ঞাপন। এতে নূর জাহানের সুবিধা হয়। তিনি এটাই আশা করেছিলেন। তিনি শাহজাহানের বিরুদ্ধে সম্রাটের মন বিষাক্ত করে তোলেন এবং শাহরিয়ারকে বিরাট জায়গীর এবং উচ্চ মনসব দান করেন। শাহজাহান সম্রাটের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং সম্রাটের প্রতি ভক্তি ও আনুগত্যের শপথ নেন, কিন্তু নূর জাহানের চক্রান্তে সবকিছু ব্যর্থ হয়। অবশেষে শাহজাহান বিদ্রোহ করতে বাধ্য হন। দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে তিনি বাংলার দিকে যাত্রা করেন এবং ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে উড়িষ্যা সীমান্তে এসে পৌছেন।[২৫]

শাহজাহানের বাংলা আগমন, ইবরাহীম খানের সঙ্গে যুদ্ধ এবং ইবরাহীম খানের মৃত্যু সম্পর্কে বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বিবরণ আছে। এ বিবরণ নিম্নরূপঃ

উড়িষ্যার সুবাদার আহমদ বেগ খান যখন শুনতে পান যে শাহজাহান বানপুর[২৬] এসে পৌছেছেন, তিনি হতাশ হয়ে পড়েন। যুবরাজকে বাধা দেয়ার সাহস তাঁর ছিল না। তাই গিরিপথে[২৭] যেখানে তিন চার লক্ষ সৈন্যকে[২৮] মাত্র পাঁচশ বন্দুকধারী সৈন্য ঠেকিয়ে রাখতে পারে, সেখানে যুবরাজ বিনা যুদ্ধে পাঁচ ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহাড়ী এলাকা অতিক্রম করে উড়িষ্যায় প্রবেশ করতে সমর্থ হন। তিনি প্রথমে খুর্দায়[২৯] আসেন; রাজা পুরুষোত্তম,[৩০] রাজা পঞ্চ, রাজা নীলগিরি, বাজাধর এবং উড়িষ্যার অন্যান্য জমিদারেরা যুবরাজের সঙ্গে দেখা করেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করেন।

ইতোপূর্বে শাহজাহানের বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্রাট ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গকে সতর্ক করে দেন। সম্রাট ফরমান জারি করে বলেন যে যুবরাজ পারভেজ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে যুবরাজ শাহজাহান বুরহানপুর ত্যাগ করেছেন এবং কোথায় গিয়েছেন তা বলা যাচ্ছে না। সুতরাং ইবরাহীম খান যেন উড়িষ্যার ব্যাপারে, বিশেষ করে আহমদ বেগ খান

Edited by Ripon Sarkar

সম্পর্কে উদাসীন না থাকেন ফরমান। পেয়ে ইবরাহীম খান আহমদ বেগ খানকে প্রায়ই চিঠি লিখে উপদেশ দিতেন এবং সুবাদার বিভিন্ন এলাকা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন। তিনি যুবরাজের আগমন সংবাদ শুনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, কারণ তিনি জানতেন যে যুবরাজের আদেশ মানা ছাড়া তাঁর উপায় থাকবে না, যদিও মোগল রাজবংশের প্রতি আনুগত্যের কারণে তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে নিজে শহীদ হয়ে (সম্রাটের প্রতি) তিনি আনুগত্য প্রদর্শন করবেন এবং সুবা বাংলা যুবরাজ শাহজাহানের অধিকারে ছেড়ে দেবেন। তাই তিনি যুবরাজকে বাধা দেয়ার প্রস্তুতি নেননি এবং এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। বাংলার সুবাদারের মত উড়িষ্যার সুবাদারও উদাসীন থাকেন। ফলে যুবরাজের আগমন সংবাদ শুনে আহমদ বেগ খান ভয়ে পালিয়ে যান এবং বর্ধমানে আসেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বর্ধমানের ফৌজদার মিরযা সালেহ সহ একসঙ্গে রাজমহলে যাবেন। কিন্তু মিরযা সালেহ রাজি হলেন না। তিনি বর্ধমান দুর্গ সুরক্ষিত করার কাজে লিপ্ত হন। তাই আহমদ বেগ খান একা রাজমহলে চলে যান।

এদিকে যুবরাজ শাহজাহান বিনা বাধায় উড়িষ্যা অধিকার করেন এবং কটকে কয়েকদিন অবস্থান করে উড়িষ্যার শাসন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন। যুবরাজের আগমনে উড়িষ্যায় আতংকের সৃষ্টি করে এবং সকলে যুবরাজের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। হুগলীর পর্তুগীজ নেতা ক্যাপ্টেন চানিকা[৩১] নামক একজন পর্তুগীজ অনেক উপহারাদি নিয়ে কটকে গিয়ে যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, তাঁর উপহারের মধ্যে ছিল পাঁচটি জলহস্তী, দশ হাজার টাকা মূল্যের মূল্যবান পাথর। তিনি যুবরাজের দরবারে তিন দিন অবস্থান করেন এবং প্রত্যেক দিন যুবরাজ তাঁকে খেলাত এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী উপহার দেন। যুবরাজ মুহাম্মদ তকীকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। তাঁকে পাঁচ হাজার মনসব এবং শাহ কুলী খান উপাধিতে ভূষিত করা হয়। শাহজাহান কটক থেকে মেদিনীপুর যান এবং মুহাম্মদ শাহকে শাহ বেগ খান উপাধি দিয়ে মেদিনীপুরে নিযুক্ত করেন এবং নিজে বর্ধমান যাত্রা করেন। এদিকে বর্ধমানে মিরযা সালেহ দুর্গ সুরক্ষিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। শাহজাহানের সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজ জঙ্গ এবং রাজা ভীম, দরিয়া খান, শুজাত খান ওরফে সৈয়দ জাফর, নাসির খান ওরফে খাজা সাবির, রাও মানরূপ, রাজা সারদুল, লস্কর শের খাজা, খাজা দাউদ, খাজা ইবরাহীম, বাবু খান এবং দরিয়া খানের ছেলে বাবু খান[৩২] প্রমুখ সেনানায়কেরা বর্ধমান দুর্গ চারদিক থেকে আক্রমণ করেন। যুবরাজের সৈন্যরা কৃত্রিম প্রতিবন্ধক (সিবা এবং সাবাত[৩৩]) তৈরি করে দুর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করে এবং মিরযা সালেহর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠে। মিরযা সালেহ[৩৪] নিজে নর্তকী বেষ্টিত হয়ে আমোদে প্রমোদে দিন রাত ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর সৈন্যরা পরিখা করে তীব্র যুদ্ধ করেন। যখন দুর্গ বিদ্রোহীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় তখন তিনি তাঁর বেগমের পরামর্শে এবং মমতাজ মহলের মধ্যস্থতায় একা যুবরাজের বাসস্থানের দরজায় আসেন এবং দারাব খান[৩৫] তাঁকে যুবরাজের নিকট নিয়ে যান। শাহজাহান তাঁকে শাস্তি না দিয়ে বন্দী করে রাখেন। তিনি খান দৌরানকে বর্ধমানের জায়গীর মঞ্জুর করেন এবং খান দৌরানের ভাই দুরমুজ বেগকে বর্ধমানের শাসনভার দেন। অতঃপর যুবরাজ রাজমহলের দিকে যাত্রা করেন।

এদিকে মিরযা আহমদ বেগ খান বর্ধমান থেকে রাজমহলে গিয়ে ঢাকায় সুবাদার ইবরাহীম খানের নিকট সংবাদ পাঠান। ইবরাহীম খান বিভিন্ন থানার সুশাসনের ব্যবস্থা

Edited by Ripon Sarkar

করে তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী খাজা ইদরাককে ঢাকায় তাঁর পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য নিযুক্ত করে পাঁচশ অশ্বারোহী এবং এক হাজার বন্দুকধারী সৈন্য নিয়ে এগার দিনের মধ্যে রাজমহল পৌঁছেন। নদীর গতি পরিবর্তনের দরুন নদী রাজমহল দূর্গ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় তিনি রাজমহল দূর্গ অধিকার না করে তাঁর পুত্রের মাযারকে সুরক্ষিত করেন এবং তাঁর ভাতিজা মিরযা ইউসুফকে এর দায়িত্ব দেন। জালাইর খান এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অফিসারকেও সেখানে নিযুক্ত করে তিনি নিজে নদীর তীরে যান এবং শিবির স্থাপন করেন। শাহজাহানও রাজমহলে গিয়ে পৌঁছেন এবং ইবরাহীম খানের নিকট নিম্নরূপ সংবাদ পাঠান ঃ ইবরাহীম খান একজন পুরাতন বিশ্বস্ত অফিসার, আসফ খানের মাধ্যমে তিনি আমার আত্মীয়। এমতাবস্থায় আমার নিকট তাঁর আসা উচিত। তিনি যুবরাজ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে বাংলায় থাকতে পারেন, যাতে আমি পেছন দিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারি।' ইবরাহীম খান বিনীতভাবে উত্তর দেন, 'আমি সম্রাটের জন্য আমার মত শত জীবন দানও সৌভাগ্য মনে করি, এবং সম্রাটের ছেলের নিকট আত্মসমর্পণ করা আমার জন্য সুখের বিষয়। কিন্তু তা করা নিমক হারামী হবে, সুতরাং সম্রাটের অর্পিত দায়িত্ব লংঘন করা আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় হবে।' শাহজাহান তখন সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের পরামর্শে দারাব খানকে মাযার অবরোধ করার আদেশ দেন। দারাব খান বিভিন্ন স্থানে পরিখা খনন করেন এবং মাযার দুর্গের তিন দিকে মাইন পুঁতে রাখেন।

শাহজাহান দরিয়া খান এবং তাঁর ছেলে বাবু খানকে একদল আফগান সৈন্য নিয়ে তাজপুর পূর্ণিয়ার দিক থেকে পশ্চিম[৩৬] নিকটে নদী পার হয়ে ইবরাহীম খানকে আক্রমণ করার আদেশ দেন। ইবরাহীম খান এ সংবাদ পেয়ে আহমদ বেগ খানকে দু হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং একশটি হাতি নিয়ে দরিয়া খানকে বাধা দিতে পাঠান। আহমদ বেগ খান দিনরাত চলে পরের দিন সকালে দরিয়া খানকে দেখতে পান; দরিয়া খান নিজে এবং কিছু সৈন্য বেপারীর নৌকায় নদী পার হয়ে আসেন, কিন্তু তাঁর বাকি সৈন্যরা এবং ঘোড়াগুলি নৌকার অভাবে তখনও নদী পার হতে পারেনি। এ অবস্থায় আহমদ বেগ খান দরিয়া খানকে আক্রমণ করেন। দরিয়া খান এবং তাঁর সৈন্যরা মাথায় কাফনের কাপড় পরে অর্থাৎ মরণ পণ যুদ্ধ করেন। তাঁদের প্রচণ্ড আক্রমণে আহমদ বেগ খান পরাজিত হয়ে ফিরে যায়। পথে রাত্রি যাপন করে তিনি পরের দিন দরিয়া খানকে আবার আক্রমণ করেন কিন্তু ইত্যবসরে দরিয়া খানের সকল সৈন্য এবং ঘোড়া নদী পার হতে সমর্থ হয়। এ অবস্থার আহমদ বেগ খানের পরাজিত হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তিনি শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ইবরাহীম খানের নিকট ফিরে আসেন। তখন ইবরাহীম খান নিজে দরিয়া খানের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। শাহজাহান এ সংবাদ পেয়ে প্রথমে রাজা ভীম এবং পরে সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গকে দরিয়া খানের সাহায্যার্থে পাঠান। ইবরাহীম খান মীর শামসের অধীনে তিনশ রণতরী পাঠান যেন রাজা ভীম ও ফীরুজজঙ্গ নদী পার হওয়ার সময় বাধা দিতে পারে। মীর শামসের সঙ্গে মনমিল ফিরিঙ্গীর অধীনে অনেক পর্তুগীজ রণতরীও পাঠানো হয়। কিন্তু মীর শামস এবং মনমিল উভয়ে ভিতরে ভিতরে শাহজাহানের পক্ষে ছিলেন, তাই তাঁরা সামান্য বাধা দিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ খান এবং রাজা ভীম নদী পার হয়ে দরিয়া খানের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর যুদ্ধ হয়, কিন্তু যুদ্ধে সুবাদারের বাহিনী অত্যন্ত ভীরুতার পরিচয় দেয়। আহমদ বেগ খানের অধীনস্থ সৈন্যরা মনোবল হারিয়ে

Edited by Ripon Sarkar

ফলে ইবরাহীম খানের অধীনস্থ সৈন্যরা ছিল প্রায় আনকোরা, যুদ্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সুবাদারের অভিজ্ঞ সৈন্যরা সকলেই মাখারের দুর্গে বা মীর শামসের নৌবাহিনীতে ছিল। তবুও ইবরাহীম খান প্রবল বাধা দেন, একজন আফগান সৈন্য তাঁকে না চিনেই হত্যা করে।

অতঃপর শাহজাহানের সৈন্যরা মাখারের দুর্গ আক্রমণ করেন। মাখারের ভিতরের সৈন্যরা তাদের বাধা দেয়, বিশেষ করে জালাইর খান, মিরযা ইসফনদিয়ার এবং মিরযা নূর-উল্লাহ প্রাণপণ যুদ্ধ করেন কিন্তু ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তারা সকলেই হতবল হয়ে পড়েন। মীর শামস, মাসুম খান মনসদ-ই-আলা (ঈসা খানের নাতি, মুসা খানের ছেলে) এবং ফিরিঙ্গীদের সরদার মনমিল নৌবাহিনী নিয়ে ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। সুবাদারের সৈন্যরা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে যে যেভাবে পারে স্থলপথে বা নৌপথে ঢাকার দিকে যাত্রা করে। মিরযা আহমদ বেগ খানও ঢাকা যাত্রা করেন, এবং রাজমহল শাহজাহানের হস্তগত হয়।[৩৭]

মিরযা নাথনের বাহরিস্তান-ই-গায়বী অনুসরণ করে উপরে দীর্ঘ বিবরণ দেয়া হয়েছে। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতেও এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।[৩৮] তুজুকে প্রথমে বলা হয়েছে যে সম্রাট ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের নিকট থেকে সংবাদ পান যে বিদ্রোহী যুবরাজ উড়িষ্যায় পৌঁছেছেন, কিন্তু পরে বলা হয়েছে উড়িষ্যার সুবাদার আহমদ বেগ খান এবং ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ উভয়েই শাহজাহানের আগমন সংবাদ পেয়ে বিস্মিত হন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। রিয়াজ-উস-সলাতীনেও ঠিক একই কথা বলা হয়েছে,[৩৯] অবশ্য লেখক গোলাম হোসেন সলীম তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী অনুসরণ করেই এ কথা লিখেন। কিন্তু তুজুক বা রিয়াজের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। তুজুকেই বলা হয়েছে যে সম্রাট ইবরাহীম খানের নিকট থেকে শাহজাহানের উড়িষ্যা পৌঁছার সংবাদ পান। শাহজাহানের উড়িষ্যা সীমান্তে পৌঁছার প্রায় ছয় মাস পরে রাজমহলে ইবরাহীম খানের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এ ছয় মাসে বাংলার সুবাদার যুদ্ধের জন্য ভাল প্রস্তুতির সুযোগ পান। সুতরাং তাঁর বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। মোগল আমলে সম্রাটের দরবারে সুবাদারের নিজ নিজ প্রতিনিধি নিয়োগ করার রেওয়াজ ছিল। এই প্রতিনিধি মারফত সুবাদারেরা কেন্দ্রের খবর সংগ্রহ করতেন। যুবরাজ শাহজাহানের বিদ্রোহের সংবাদ বাংলার সুবাদার সময় মত পাননি মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের আপন ভাই; নূর জাহান এবং শাহজাহানের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলেই শাহজাহান বিদ্রোহ করেন, শাহজাহানের ধ্বংসই তখন নূর জাহানের কাম্য। সুতরাং নূর জাহান তাঁর ভাই প্রাদেশিক সুবাদারকে আগে থেকে সতর্ক করে দেবেন, এটাই প্রত্যাশিত। মিরযা নাথন স্পষ্টভাবে বলেন যে সম্রাট ইবরাহীম খানকে সতর্ক করে দেন এবং ইবরাহীম খানও তাঁর ভাইপো উড়িষ্যার সুবাদার আহমদ বেগ খানকে সতর্কমূলক উপদেশ দেন। মিরযা নাথনের এ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য। ইবরাহীম খান নিহত হলে শাহজাহানের সাফল্যকে খাটো করে দেখানোর জন্য তুজুকে বলা হয়েছে, বাংলা এবং উড়িষ্যার সুবাদার অপ্রস্তুত ছিলেন। স্মরণ রাখতে হবে যে এ সময় অসুস্থতার জন্য সম্রাট নিজে আত্মজীবনী লেখা ছেড়ে দিয়ে মুতামদ খানকে এ দায়িত্ব দেন, অর্থাৎ তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীর এ অংশ মুতামদ খানের লেখা।

তুজুক এবং রিয়াজে আরও বলা হয়েছে যে শাহজাহানের উড়িষ্যা আগমনের সময় মিরযা আহমদ বেগ খান খুর্দা অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। বাহরিস্তানে এ কথা না থাকলেও

Edited by Ripon Sarkar

এটা সত্য হতে পারে মিরযা নাথন বলেন যে শাহজাহান চতর দুয়ার অতিক্রম করার সময় মিরযা আহমদ বেগ খান বাধা দিতে পারতেন। ঐ গিরিপথে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য বিরাট বাহিনীকে সাফল্যজনকভাবে বাধা দিতে পারে, কিন্তু মিরযা আহমদ বেগ খান কাপুরুষের মত সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। তুজুকে এবং রিয়াজে আরও বলা হয়েছে যে মিরযা আহমদ বেগ দ্রুত রাজধানী পিপলি[৪০] আসেন। সেখান থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে বাংলার দিকে বার ক্রোশ দূরে কটকে আসেন এবং কটক থেকে বর্ধমানে আসেন। বাহরিস্তানে পিপলি যাওয়ার কথা না থাকলেও পরিবার পরিজন সঙ্গে নিয়ে আসার জন্য আহমদ বেগ খানের পিপলি যাওয়া সম্ভব।

বাহরিস্তানে বলা হয়েছে হুগলীর পর্তুগীজ নেতা ক্যাপ্টেন চানিকা কটাকে শাহজাহানের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। পর্তুগীজ ইতিহাসে এ কথাটি ভিন্নভাবে লিখিত. কেম্প্‌স বলেন শাহজাহান বর্ধমানে পৌছে হুগলীর পর্তুগীজ গবর্ণর মিগুয়েল রড্রীগসকে বলেন তিনি যেন যুবরাজকে সৈন্য এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন, বিনিময়ে যুবরাজ তাঁকে অনেক ধন সম্পদ এবং প্রচুর ভূ-সম্পদ দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু পর্তুগীজ গবর্ণর তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন, কারণ তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। গবর্ণর হয় মনে করেন যে একজন বিদ্রোহী যুবরাজকে সাহায্য দেয়া অন্যায়, অথবা তিনি ভয় পান যে বিদ্রোহী যুবরাজকে সাহায্য দিলে তিনি সম্রাটের কোপে পড়বেন। যুবরাজকে সাহায্য দিতে অস্বীকার করার ফলে কয়েক বছর পরে শাহজাহান নিজে সম্রাট হয়ে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়ন করেন।[৪১] যা হোক, মিগুয়েল রড্রীগস্ এবং ক্যাপ্টেন চানিকা ভিন্ন ভিন্ন লোক বলে মনে হয়। রড্রীগস্ ছিলেন হুগলীর পর্তুগীজ গবর্ণর এবং ক্যাপ্টেন চানিকা কটকে নিযুক্ত তাঁর একজন অফিসার। চানিকা কটকে যুবরাজের সঙ্গে দেখা করেন এবং বর্ধমান থেকে শাহজাহান রড্রীগসের নিকট আদেশ পাঠান। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন:[৪২]

Unable to maintain his hold in the Deccan, Shah Jahan decided to leave the country and create for himself a new centre of influence and authority.

This was found in Bengal, which, on account of its peculiar physical features, geographical isolation, rich natural resources, coupled with its chronic political confusion had afforded a tempting field to many a daring adventurer and an asylum to many a political refugee. The internal situation at that moment seemed to be favourable to the rebel prince. Inspite of Ibrahim Khan's generous treatment of Masum Khan, this son and successor of Musa Khan proved to be a hot-headed and fickle youth, anxious to throw off the shackles of vassalage, and in fact he became an easy tool in the hands of Shah Jahan. The external situation also appeared to be inviting. The rebel prince could easily make an alliance with the king of Arakan in fighting their common enemy, the Mughal Emperor. The Portuguese settlers and officers in Bengal might be won over by promise of trade facilities, while the services of Portuguese captains of war, with their

Edited by Ripon Sarkar

war-boats, might also be utilised. So Shah Jahan decided to go to
Bengal not only to recoup and replenish his resources, but also to
secure fresh recruits, fresh allies, and a fresh base of operations for the
final war.

অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ ঐতিহাসিক ডঃ ভট্টাচার্যের এ বক্তব্য অত্যন্ত সতর্কতাবে
লিখিত, এ বক্তব্যের বিরোধিতা না করেও কিছু মন্তব্য করা প্রয়োজন। যদিও যুবরাজ
দাক্ষিণাত্য থেকে তাড়া খেয়ে বাংলায় আসেন, বাংলায় থাকার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল
না। ইবরাহীম খানের প্রতি যুবরাজের পাঠানো সংবাদেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়।
যুবরাজ বলেন:[৪৩] "যদিও আমার আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে এই স্থানের আয়তন ও পরিধি
অতি সামান্য, তথাপি যখন আমার চলার পথে পড়েছে তখন আমি এটাকে নির্দ্বিধায়
ছেড়ে যেতে পারি না।" যুবরাজের দৃষ্টি ছিল দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি এবং তাঁর ইচ্ছা
ছিল দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া। সুতরাং তিনি শুধু একটি সুবা নিয়ে
সন্তুষ্ট থাকবেন কেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি এবং অল্পদিনের মধ্যে বাংলা
ছেড়ে চলে যান। যুবরাজ যে সচেতনভাবে একটি নতুন ক্ষমতার ভিত্তি পাওয়ার জন্য
বাংলায় এসেছিলেন তা নয়, বরং যুবরাজের নিজের ভাষায় নিয়তির বিধানে তিনি
বাংলায় এসেছিলেন। দ্বিতীয়ত মূসা খান মসনদ-ই-আলার পুত্র মাসুম খান যে
মোগলদের অধীনতা ছিন্ন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন এ তথ্য কোন সূত্রে পাওয়া যায়
না, এ সময় মাসুম খানের পক্ষে তা সম্ভবও ছিল না। ইবরাহীম খানের মৃত্যুর পরে
মাসুম খান যুবরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, অনেকেই তা করেন, এছাড়া তাদের
উপায় ছিল না। পর্তুগীজদের নিকট থেকে সাহায্য লাভের আশা হয়ত যুবরাজ
করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা পাননি, বরং পর্তুগীজরা ইবরাহীম খানের পক্ষেই যুদ্ধে অংশ
নেয়। ম্যানুয়েল টেক্সেরেস কিছু রণতরী নিয়ে শাহজাহানের সাহায্যে যান, কিন্তু যুদ্ধ
শুরু হলে তিনি রাজার সঙ্গে মিত্রতা করার কথা তখন চিন্তা করেছিলেন কিনা জোর
করে বলা যায় না; অবশ্য পরে দেখা যাবে যে শাহজাহানের সঙ্গে মগ রাজার
যোগাযোগ হয়। কিন্তু এর কারণ বুঝা যায় না। জাহাঙ্গীর মগ রাজার শত্রু এবং
শাহজাহানের মিত্র হবেন কেন তা অনুধাবন করা যায় না। মনে হয় নিছক ঘটনাচক্রে
মগ রাজা শাহজাহানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন।

সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের মৃত্যু তারিখ কোন সূত্রে পাওয়া যায় না।
শাহজাহান ১৬২৩ খ্রিষ্টাব্দের নবেম্বরের দশ তারিখের পরে উড়িষ্যা সীমান্তে পৌছেন।
তিনি সেখান থেকে কটক, মেদিনীপুর হয়ে বর্ধমানে আসেন। বর্ধমানে ফৌজদারের
সঙ্গে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি রাজমহলে আসেন। রাজমহলেই যুদ্ধে
ইবরাহীম খানের মৃত্যু হয়। এর মধ্যে অন্তত ছয় সাত মাস গত হওয়ার কথা।
শাহজাহান ইবরাহীম খানের মৃত্যুর পরে ঢাকায় যান। সেখানে সাত দিন অবস্থানের
পরে তিনি যখন আবার রাজমহলের দিকে ফিরে আসছিলেন তখন বর্ষাকাল।[৪৫]
অতএব ধারণা করা যায় যে ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের বর্ষাকালের আগে, আনুমানিক এপ্রিল-মে
মাসে ইবরাহীম খান নিহত হন। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে আনুমানিক
২০শে এপ্রিল তারিখ ইবরাহীম খান নিহত হন।[৪৬] নিহত হওয়ার পরে শাহজাহান
সম্রাটের প্রতি ইবরাহীম খানের আনুগত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আদেশ দেন যে

Edited by Ripon Sarkar

ইবরাহীম খানের মাথা রাজমহলের দুর্গে ঝুলিয়ে রাখার পরিবর্তে তাঁর দেহ সম্মানের সঙ্গে সমাহিত করা হোক। ইবরাহীম খানের মৃতদেহ তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর পুত্রের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়।[৪৭]

ইবরাহীম খানের চরিত্র

ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁর নিযুক্তির দিন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মোট সাত বছর বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। নিযুক্তির পরে ঢাকা পৌঁছুতে তাঁর প্রায় ছয় মাস সময় লাগে, সুতরাং তাঁর প্রকৃত সুবাদারী আমল সাড়ে ছয় বছর। এ সময় তাঁর সুবাদারী বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। কামরূপের বিদ্রোহ দমন, দুটি অহোম আক্রমণ প্রতিরোধ, ত্রিপুরা বিজয়, দুটি মগ আক্রমণ প্রতিরোধ, একটি আরাকান অভিযান, হিজলীর বাহাদুর খানের বিদ্রোহ দমন এবং চন্দ্রকোণার চন্দ্রভানের পরাজয় ইত্যাদি তাঁর সুবাদারী আমলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আরাকানের আক্রমণ প্রতিরোধে, আরাকান অভিযানে এবং বাহাদুর খানের বিরুদ্ধে তিনি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। মিরযা নাথন বাহরিস্তানের বিভিন্ন স্থানে তাঁর সাহসের বিশেষ প্রশংসা করেন। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ইবরাহীম খানের চরিত্র চিত্রণ করে বলেনঃ[৪৮]

> His character offers a pleasant contrast to that of his predecessors, Islam Khan and Qasim Khan. He was free from the vices of both, while he possessed the ability, energy, discretion and resourcefulness of Islam Khan, and added to these some noble traits unknown to him and to his brother, an honesty of purpose, a mastery of temper, a spirit of moderation, conciliation and compromise, and above all, an innate nobility of character and dignity of bearing, which endeared him to friends and foes alike.

একথা সত্য যে ইবরাহীম খানের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা বা বদ মেজাজ ছিল না, তিনি সকলের সঙ্গে সমঝোতার মনোভাব নিয়ে কাজ করতেন। তাঁর মধ্যে মহানুভবতা এবং মানবিক গুণ ছিল। এ কারণে তিনি কামতার রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ, কামরূপের রাজা পরীক্ষিত, বার-ভুঁঞা প্রধান মুসা খান মসনদ-ই-আলা এবং যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের ছেলেদের মুক্তি দেয়ার জন্য সম্রাটের নিকট আবেদন জানান। তাঁর এ পদক্ষেপের সুফলও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ স্বদেশে ফিরে গিয়েও মোগলদের প্রতি অনুগত থাকেন এবং কামরূপের বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মোগলদের সহায়তা করেন। আগেই বলা হয়েছে যে রাজা পরীক্ষিত স্বদেশে ফিরে যেতে পারেননি, তিনিও ফিরে যেতে পারলে হয়ত মোগলদের প্রতি অনুগত থাকতেন এবং মোগলদের সাহায্য করতেন। কামরূপের বিদ্রোহও হয়ত তাঁর ফিরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেত। মসনদ-ই-আলা মুসা খান বিভিন্ন যুদ্ধে মোগলদের পক্ষে অংশ নিয়ে মোগলদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনেন। মুসা খান কামরূপের মধুসূদনকে পরাজিত করে তাকে আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। অতঃপর মধুসূদনও মোগলদের প্রতি অনুগত থাকেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করেন। মুসা খান ত্রিপুরার যুদ্ধেও অংশ নেন এবং ত্রিপুরা বিজয়ে সাহায্য করেন। ইবরাহীম খানের এ মানবিক পদক্ষেপ যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয় তাতে কোন সন্দেহ নেই।

Edited by Ripon Sarkar

ইসলাম খানের যুদ্ধের পরিকল্পনা বা সাংগঠনিক শক্তির কোনটিই ইবরাহীম খানের মধ্যে দেখা যায় না। ইসলাম খান অভিযান প্রেরণের দিন থেকে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, সৈন্য এবং রণতরী গণনা করার ব্যবস্থা করতেন, মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠাতেন, যুদ্ধ সম্পর্কে উপদেশ পাঠাতেন, সৈন্যদের ব্যূহ রচনা করে পাঠাতেন, এবং এমনকি শত্রুদের দুর্গ অবরোধের সময় কখন কিভাবে দুর্গ জয় করা হবে তার উপদেশও দিয়ে পাঠাতেন। ইবরাহীম খান এরূপ কিছু করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তিনি ত্রিপুরা জয় করেন, ত্রিপুরায় মিরযা ইসফনদিয়ার, মিরযা নূর-উদ-দীন (বা নূর-উল্লাহ) এবং মূসা খান মসনদ-ই-আলার নেতৃত্বে সৈন্য এবং নৌ-বাহিনী পাঠিয়েই তিনি নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁর সুবাদারী আমলে কামরূপে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল, বিদ্রোহীদের সঙ্গে অহোম রাজাও দুবার আক্রমণ চালায়। দ্বিতীয়বারে অহোম বাহিনী মোগলদের পরাজিত করে পর্যুদস্ত করে দেয়। কিন্তু ইবরাহীম খান কামরূপের যুদ্ধের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন বলেই মনে হয়, অন্তত বাহরিস্তান-ই-গায়বী পাঠে এরূপ ধারণাই জন্মায়। আগেই বলা হয়েছে যে কামরূপের যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ার প্রধান কারণ সেনাপতি বা সেনানায়কের মধ্যে মতানৈক্য এবং অন্তর্বিরোধ, অর্থাৎ এক কথায় সেনাপতির অভাব। ইবরাহীম খান এ বিষয়ে জানতেন, কিন্তু তিনি এর প্রতিকার করার জন্য কোন পদক্ষেপ নেননি। তিনি জানতেন যে শয়খ কামালের সঙ্গে মিরযা নাথনের বিবাদ দীর্ঘদিনের এবং এ বিবাদ মিটানোর কোন উপায় ছিল না। তবুও তিনি জেনে শুনে শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতি ও অন্যান্যরা যাতে একযোগে একতাবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহীদের বাধা দেয় সেরূপ কোন ব্যবস্থা নেননি। একবার তিনি শয়খ কামালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কপটতার আশ্রয় নিয়ে প্রথমে মিরযা নাথনকে কামরূপে সেনাপতি নিযুক্ত করেন, কিন্তু অল্পদিন পরে শয়খ কামালকে সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান। এরূপ কাজ সুবাদারের জন্য শোভন নয়। তাছাড়া এর ফলে কামরূপে সেনাপতি ও সেনানায়কদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠেনি এবং ফলে কামরূপের যুদ্ধ বিলম্বিত হয়।

ইবরাহীম খানের ব্যর্থ আরাকান অভিযান প্রমাণ করে যে সেনাপতি হিসেবে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন না। ত্রিপুরার লোকেরা তাঁকে এমন এক পথে নিয়ে যায় যে পথে তাঁর অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং অনেক সৈন্য হারিয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়। কোন সেনাপতি রাস্তা ঘাটের খোঁজখবর না নিয়ে এভাবে অগ্রসর হতে পারেন না। দু হাজার রণতরী, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্য, এক হাজার হাতি এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে তিনি আরাকান অভিযানে গিয়েছিলেন।[৪৯] এরূপ বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে সোজা পথে অগ্রসর হয়ে তিনি যে চট্টগ্রাম জয় করতে পারতেন এরূপ আশা করা মোটেই বাতুলতা নয়। শুধু সঠিক পথে অগ্রসর না হওয়ায় তাঁর এ বিপুল প্রস্তুতি এবং আরাকান অভিযান ব্যর্থ হয়। আরাকানের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। ইতোপূর্বে কাসিম খানের সময়েও আরাকান অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু সে সময় মোগল বাহিনী সঠিক পথে অগ্রসর হয়। সে অভিযান ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ সরহদ খান ও শয়খ কামালের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ষড়যন্ত্র। পূর্বের ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে অগ্রসর হলে ইবরাহীম খান সফলতা লাভ করতেন, এরূপ আশা করা যায়। অনুরূপভাবে যশোরে যাওয়ার পথেও ইবরাহীম খান

Edited by Ripon Sarkar

পথ হারিয়ে অনেক কষ্ট ভোগ করেন। সৌভাগ্যবশত তিনি পরে সঠিক পথ খুঁজে পান, কিন্তু পথ হারানোটা সুবাদারের দক্ষতার পরিচায়ক নয়। ইসলাম খানের সময় যশোর বিজিত হয়। ইসলাম খান এবং কাসিম খানের সময় দুবার হিজলীর বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানো হয়। সুতরাং মোগলদের যশোরের সোজা পথ না জানার কথা নয়। কিন্তু মনে হয় ইবরাহীম খান পথ ঘাটের খোঁজ খবর না নিয়েই যাত্রা করেন।

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি ইসলাম খানের যেমন দুর্বলতা ছিল, ইবরাহীম খানেরও তেমনি ছিল। তাঁর সময়ে তাঁর দু ভাইপো মিরযা আহমদ বেগ খান এবং মিরযা ইউসুফের প্রাধান্য দেখা যায়, অথচ তাঁরা কেউ যে দক্ষ সেনাপতি ছিলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। একবার মিরযা আহমদ বেগের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার জন্য ইবরাহীম খান অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েন। তিনি দু হাজার টাকা নযরানার বিনিময়ে সিলেটের সেনাপতি বা ফৌজদারের পদ গ্রহণের জন্য একবার মিরযা নাথনকে ডেকে পাঠান। মিরযা নাথন তখন তাঁর জায়গীর সোনাবাজুতে[৫০] ছিলেন। ইবরাহীম খান তখন আরাকান অভিযান থেকে ফিরে আসার পথে ছোট ফেনী নদীর তীরে ছিলেন। মিরযা নাথন তাড়াতাড়ি সোনাবাজু থেকে ঢাকায় আসেন এবং ঢাকায় মহাজনদের নিকট থেকে বার হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সুবাদারের সঙ্গে দেখা করতে যান। সুবাদারের সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলেন যে তিনি ইতোমধ্যে মিরযা আহমদ বেগ খানকে সিলেটের সেনাপতি এবং তাঁর প্রতিনিধিরূপে শয়খ সোলেমানের ছেলেকে নিযুক্ত করেছেন। মিরযা নাথনের উপস্থিতিতে সুবাদার লজ্জিত হন। তিনি মিরযা নাথনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন 'আমি তোমাকে এর চেয়ে একটি ভাল জায়গা দেব (অর্থাৎ ভাল স্থানে সেনাপতি নিযুক্ত করব)।'[৫১]

ইবরাহীম খান অর্থের প্রতি নির্লোভ ছিলেন বলে মনে হয় না। কাসিম খানেরও এ লোভ ছিল, কিন্তু ইসলাম খানের বিরুদ্ধে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইবরাহীম খান আশি হাজার টাকার বিনিময়ে শয়খ কামালকে কামরূপের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং শয়খ কামালের নিযুক্তি কামরূপের যুদ্ধ বিলম্বিত হওয়ার প্রধান কারণ। একটু উপরেই বলা হয়েছে যে মাত্র দু হাজার টাকা নযরানার বিনিময়ে তিনি মিরযা নাথনকে সিলেটের সেনাপতি নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মীর আবদুর রাজ্জাক বিদ্রোহী করৌরী শয়খ ইবরাহীমকে পরাজিত করায় মিরযা নাথন তাঁকে একটা চাকনা বা দাঁত বিহীন হাতি উপহার দেন। মীর আবদুর রাজ্জাক এ হাতিটি দিওয়ান মুখলিস খানকে উপহার দেন। হাতিটি ইবরাহীম খানকে না দেয়ায় তিনি মিরযা নাথন এবং মীর আবদুর রাজ্জাকের প্রতি অসন্তুষ্ট হন।[৫২] ইবরাহীম খান আবার তিন লক্ষ টাকা নযরানার বিনিময়ে জালাইর খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মিরযা নাথন বলেন যে এ নিযুক্তিতে ইবরাহীম খানের বেগমেরও ভূমিকা ছিল। ইসলাম খান বা কাসিম খানের সময় বেগমদের কোন ভূমিকা দেখা যায় না। ইবরাহীম খান তাঁর এক খালাকে বিয়ে করেন, যদিও শাসন ব্যাপারে সুবাদারের উপর বেগমের প্রভাব দেখা যায়। যা হোক, সাম্রাজ্ঞী নুর জাহানের হস্তক্ষেপে ইবরাহীম খান জালাইর খানের নিযুক্তি বাতিল করে মিরযা আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করতে বাধ্য হন। ইবরাহীম খান

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] ১৬২৩, [illegible] তার [illegible]
[illegible] কামরূপের [illegible]
[illegible] কামরূপের [illegible] দখল [illegible]

ইসলাম খানের মত ইব্রাহিম খানও [illegible] করতেন। [illegible] পরে তিনি [illegible] উড়িষ্যা [illegible] এবং [illegible] করেন [illegible] অধিকারের [illegible] খানের মত [illegible] উপর [illegible] আক্রমণের [illegible] তিনি ক্রুদ্ধ হন কিন্তু মির্জা [illegible] তিনি অধীনস্থ অফিসারদের কথা শুনতেন এবং তাঁদের পরামর্শ নিতেন এবং [illegible] দিতেন। যশোরের [illegible] ফৌজদার [illegible] কাশেমকে কর্তব্যে অবহেলার জন্য পদচ্যুত করা হয়, কিন্তু মির্জা নাথনের অনুরোধে সুবাদার তাঁকে ক্ষমা করেন এবং স্বপদে বহাল রাখেন। ইব্রাহীম খানের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল সম্রাটের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য। শাহজাহানের সংবাদের উত্তরে তিনি যা বলেন তা যে কোন অফিসারের জন্য আদর্শরূপে গণ্য হতে পারে। তিনি বলেন[৫৫] "বাদশাহ [illegible] এ পুরাতন বান্দাকে এ প্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মাথা থাকবে, ততক্ষণ আমি এ প্রদেশ আঁকড়ে থাকবো, যতক্ষণ আমার জীবন থাকবে ততক্ষণ আমি প্রতিরোধ করবো। আমার অতীত জীবনের সব মুহূর্ত আপনার জানা আছে। এ পৃথিবীতে আমার ভবিষ্যত জীবনের কতটুকুই বা আর অবশিষ্ট আছে? এখন আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই যে, অতীতের বাদশাহী অনুগ্রহের জন্য কর্তব্য সম্পাদনে ও আনুগত্যের কারণে আমি যেন জীবন বিসর্জন দিয়ে শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারি।" ইব্রাহীম খান শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেন। কিন্তু তিনি সেনাপতি হিসেবে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। প্রথমত, শাহজাহানকে উড়িষ্যা সীমান্তে চতর দুয়ার গিরিপথে বাধা দেয়ার জন্য মি[illegible] আহমদ বেগকে নির্দেশ দেয়া উচিত ছিল, মির্জা আহমদ বেগ তা না করে পালিয়ে এসে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দেন। দ্বিতীয়ত, মির্জা সালেহ যখন বর্ধমানে শাহজাহানকে বাধা দিচ্ছিলেন ইব্রাহীম খানের উচিত ছিল তাঁকে সাহায্য করা, তা না করে ইব্রাহীম খান আবার মারাত্মক ভুল করেন। তিনি তা না করে রাজমহলে শাহজাহানকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। রাজমহল পর্যন্ত এসে শাহজাহান উড়িষ্যা সম্পূর্ণ এবং বাংলার একাংশ আগেই দখল করে নেন। রাজমহলে তিনি মীর শামসের অধীনে নৌ বাহিনী নদীতে শাহজাহানের সৈন্যদের বাধা দিতে পাঠান। মীর শামস নৌ-বাহিনী পরিচালনায় উপযুক্ত ছিলেন কিনা সন্দেহজনক। বাহারিস্তানে জানা যায় যে মীর শামস অনেক দিন সংসার ত্যাগী দরবেশ ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে ইব্রাহীম খান পাঁচ হাজারী মনসবে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি সংসারী হবেন না। ইব্রাহীম খান পাঁচ হাজারী মনসব পেয়ে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এলে মীর শামসও তাঁর সঙ্গে আসেন। ইব্রাহীম খান তাঁকে বছরে ত্রিশ হাজার টাকা দিতেন।[৫৬] যদিও তিনি ইব্রাহীম খানের ভক্ত ছিলেন, তাঁর মত একজন খামখেয়ালী লোক নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি ভিতরে ভিতরে শাহজাহানের পক্ষে ছিলেন। পর্তুগীজ মনরিকও যুদ্ধ করেননি; বাহারিস্তানের মনরিক অবশ্যই পর্তুগীজ ঐতিহাসিকদের ম্যানুয়েল টেভারেস, তাঁর সম্বন্ধে বিপরীতমুখী তথ্য পাওয়া যায়।

Eidited by Ripon Sarkar

[illegible] তিনি [illegible] ছিলেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] মোগলদের [illegible] কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

সকল দিক বিবেচনা করে ইব্রাহীম খানকে একজন সফল সুবাদার বলা যেতে পারে। তাঁর সময়ে সারা বাংলায় শান্তি বিরাজ করে। [illegible] এবং [illegible] বিদ্রোহ দমন করা হয়। আরাকান রাজার আক্রমণ প্রতিরোধ করা হয়, ফিরিঙ্গীদের লুটতরাজ সীমা অতিক্রম করে বলে মনে হয় না। কামরূপ বিদ্রোহ দমনেও [illegible] অনেক বিদ্রোহী নেতা এবং পার্বত্য রাজা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। দুটি অহোম আক্রমণও শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করা হয়। ইব্রাহীম খানের [illegible] ব্যর্থ হলেও তিনি ত্রিপুরা জয় করতে সমর্থ হন। ত্রিপুরার [illegible] হয়, যদিও তাঁর মৃত্যুর পরে মোগলরা ত্রিপুরা ত্যাগ করে চলে আসে। ইব্রাহীম খানের সময়ে বাংলার মোগল অধিবাসীদের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল, [illegible] সুবাদারী আমলের মত কোন প্রকার [illegible] পাওয়া যায় না। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন:[৬৯]

> In regard to internal administration he initiated a new policy of political conciliation and release of political prisoners which had a beneficent effect. It promoted peace, security, and good government. For the first time since the Mughal conquest, Bengal now settled down to enjoy the blessings of the Mughal peace. Bengal had every prospect of enjoying an undisturbed state of felicity. But the rebellion of Shah Jahan and his march into Bengal broke the short spell of peace and made it again the scene of bitter strife and bloody warfare.

১। [illegible] [illegible] ছিল। [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] ছিল। ([illegible], [illegible], [illegible], টীকা [illegible])

২। [illegible] ছিল। [illegible] (dependency) [illegible] [illegible] ছিল।

৩। [illegible] [illegible] [illegible]।

Edited by Ripon Sarkar

৪। বাহরিস্তান, ১ম, ১৩৯।

৫। তুজুক, ১ম, ৩৯২। তুজুকের চন্দ্রকোটা এবং হরভান অবশ্যই চন্দ্রকোণা এবং চন্দ্রভান হবে।

৬। মুয়াজ্জম খানের ছেলে এবং ইসলাম খানের জামাতা মুকাররম খান কাসিম খানের সময়ও বাংলায় ছিলেন। রাজা পরীক্ষিতকে কেন্দ্র করে কাসিম খানের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। মুকাররম খানের উড়িষ্যায় নিযুক্তির তারিখ পাওয়া যায় না। তুজুকে দেখা যায় যে তিনি ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন এবং খুরদা জয় করেন (তুজুক, ১ম, ৪৩৩)। মনে হয় কাসিম খানের পদচ্যুতির আগে তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়।

৭। তিনি ছিলেন মিরযা আহমদ বেগ ও মিরযা ইউসুফ বেগের ভগ্নীপতি, অর্থাৎ ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গেরই ভাই-এর মেয়ের জামাই।

৮। বাহরিস্তান, ২য়, ৬৩১-৩২।

৯। ঐ, ৬৩৪-৩৫। মুকাররম খান কর্তৃক বিদ্রোহী জমিদারদের সাহায্য করার কারণ বুঝা যায় না।

১০। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

১১। বাহরিস্তান, ২য়, ৬৩৫।

১২। ঐ, ৬৩৬-৩৭।

১৩। ঐ ৬৩৭-৩৮।

১৪। এইচ. বি. ২য়, ৩০৫।

১৫। তুজুক, ২য়, ২০৯। মুকাররম খানকে উড়িষ্যা থেকে বদলী করার তারিখ পাওয়া যায় না। তবে বাহাদুর খানের আত্মসমর্পণের নির্ধারিত তারিখ (জুন, ১৬২১ খ্রিঃ) নির্ভুল প্রমাণিত হলে বলা যায় যে ঐ একই সালে মুকাররম খানকে উড়িষ্যা থেকে বদলী করে দিল্লীতে নিযুক্ত করা হয়। মুকাররম খান বিদ্রোহী বাহাদুর খানকে সহায়তা করায় তাঁকে বদলী করা হয় বলে মনে করা যায়।

১৬। বাহরিস্তান, ২য়, ৬৩৪। এ কাহিনী বিবৃত করে মিরযা নাথন প্রথমে বলেন যে "যেহেতু ইবরাহীম খান মুকাররম খানের বদলীতে রাজি নন, সেহেতু আহমদ বেগ খানকে উড়িষ্যার সুবাদারের দায়িত্ব দেয়া হোক" (ঐ)। কথাটা বোধগম্য নয়, কারণ মুকাররম খান উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। সুতরাং মুকাররম খানকে বদলী না করলে আহমদ বেগকে নিযুক্ত করেন কিভাবে? মনে হয় এখানে ইবরাহীম খানের 'রাজি থাকার' স্থলে 'রাজি নন' কথাটি লিখিত হয়েছে।

১৭। বাহরিস্তান, ২য়, ৬২৯-৬৩১।

১৮। এ. পি. ফেয়ার ঃ হিস্টরি অব বার্মা, ১৭৭।

১৯। বাহরিস্তান, ২য়, ৬৩২-৩৩।

২০। রাজমালা, ৩য় লহর, ৩৫১-৫৩। দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২১। যদুনাথ সরকার ঃ স্টাডিজ ইন মোগল ইন্ডিয়া, ১২২।

২২। দক্ষিণ শাহবাজপুর বাকেরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত ছিল। আইন-ই-আকবরীতে এটা সরকার ফতহাবাদের একটি পরগণা। আইন, ২য়, ১৪৪।

২৩। বাহরিস্তান, ২য়, ৬৩৯।

২৪। ঐ, ৬৪১।

২৫। এ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সকল তারিখের জন্য দেখুন, বেণী প্রসাদঃ হিস্টরি অব জাহাঙ্গীর, ২৯২-৩০০। নবেম্বরের ১০ তারিখে (১৬২৩) শাহজাহান মসলিপত্তম ত্যাগ করেন। তাই ঐ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি উড়িষ্যা সীমান্তে পৌছেন।

Edited by Ripon Sarkar

২৬। বিহারের ত্রিহুত সরকারে বানপুর একটি মহাল (আইন, ২য়, ১৬৮) কিন্তু এখানে বোধ হয় এ বানপুরকে বুঝান হয়নি। আকবরনামায় (৩য়, ৯৬৯) তেলিঙ্গানা এবং উড়িষ্যার মধ্যে মানপুর নামে একটি স্থানের উল্লেখ আছে। মনে হয় এ মানপুরকেই বাহরিস্তানে বানপুর বলা হয়েছে।

২৭। এটা চতর দুয়ার গিরিপথ। জাহাঙ্গীর তুজুকে এ গিরিপথের নাম বলেননি, কিন্তু তিনি বলেন যে এর একদিকে উচ্চ পর্বতমালা এবং অন্যদিকে নদী এবং জলা। গোলকুণ্ডার সুলতান এখানে একটি দুর্গ এবং একটি দেয়াল নির্মাণ করেন এবং একে কামান দ্বারা সুরক্ষিত করেন। (তুজুক, ২য়, ২৯৮)। মাসির-উল-উমারায় (১ম, ৪১০) চতর দুয়ারের যে বিবরণ পাওয়া যায় তা তুজুকের বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। গোলকুণ্ডার সুলতানের মনসুর নামক একজন অফিসার এ দুর্গ নির্মাণ করেন এবং এর নামকরণ করা হয় মনসুর গড়। (তুজুক, ২য়, ২৯৮ টীকা)।

২৮। শ্রীরাম শর্মা বলেছেন ত্রিশ-চল্লিশ হাজার (ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি, ভল্যুম, ১১, ৯২), কিন্তু বাহরিস্তানে এটা তিন-চার লক্ষ। শ্রীরাম শর্মা অনুবাদে ভুল করেছেন।

২৯। উড়িষ্যার খুর্দা রাজবংশ প্রাচীন, রাজা রামচন্দ্র দেব এর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মোগলদের প্রতি অনুগত ছিলেন এবং উড়িষ্যার যুদ্ধে মোগলদের সাহায্য করেন। ফলে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে বংশানুক্রমিক রাজা উপাধি দেয়া হয়। এ রাজ্য কটকের উত্তর সীমায় অবস্থিত মহানদী থেকে গঞ্জাম জেলার নিকটবর্তী খেমতা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খুর্দায় পাহাড়ের উপরে একটি দুর্গ ছিল। এ রাজবংশ ঐ দুর্গের মালিক ছিল বলে তারা খুর্দা রাজবংশ নামে পরিচিত হয়। মোগলরা এ বংশকে জগন্নাথ মন্দিরের বংশানুক্রমিক অভিভাবক নিযুক্ত করে। (এশিয়াটিক রিসার্চেস, ভল্যুম ১৫, ২৯৪, বাহরিস্তান, ২য়, ৮০৫-০৬, টীকা)।

৩০। রাজা পুরুষোত্তম ছিলেন খুর্দার রাজা, তিনি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। অন্যান্যরা উড়িষ্যার জমিদার ছিলেন। রাজা পঞ্চ পাকেরার রাজা হতে পারেন, এ রাজ্য ভদ্রকের চব্বিশ মাইল পশ্চিমে বৈতরণী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত। (বাহরিস্তান, ২য়, ৮৫৩, টীকা)।

৩১। মির্যা নাথন তাঁর নাম লিখেন ক্যাপ্টেন চানিকা, কিন্তু পর্তুগীজ ইতিহাসে দেখা যায় যে তাঁর প্রকৃত নাম মিগুয়েল রড্রীগস (জে.জে.এ. কেমপসঃ হিস্টরি অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, ১২৮)। পরে দ্রষ্টব্য।

৩২। এঁদের কারও কারও পরিচয় জানা যায়। আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গ একজন নামকরা সেনাপতি ছিলেন। তিনি আহাদী (gentleman trooper বা মোটামুটিভাবে স্বেচ্ছাসেবী সৈন্য বলা যায়) সৈন্য রূপে আকবরের সময় যোগদান করেন। মেবারের রাজা অমর সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে দক্ষতা দেখালে জাহাঙ্গীর তাঁকে পাঁচ হাজার মনসব এবং ফীরুজজঙ্গ উপাধি দেন। তিনি বিদ্রোহী যুবরাজের সঙ্গে যোগ দেন। সম্রাট তাঁকে লানত উল্লাহ (আল্লাহর অভিশাপ) রূপে ডাকতে থাকেন। তুজুকে এ নাম পাওয়া যায়। রাজা ভীম উদয়পুরের রাণা অমর সিংহের ছেলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর তাঁর রাজত্বের পনর বর্ষে তাঁকে রাজা উপাধি দেন (তুজুক, ২য়, ১২৩, ১৬২)। এখানে খাজা দাউদ এবং খাজা ইবরাহীমের নামও পাওয়া যায়, বাহরিস্তানে মির্যা নাথন এঁদের পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে খাজা উসমানের ভাই ও ভাতিজা রূপে (বাহরিস্তান, ২য়, ৬৮৯) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খাজা উসমানের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল উল্টো। খাজা দাউদ ছিলেন খাজা উসমানের ভাতিজা (খাজা সোলায়মানের পুত্র) এবং জামাতা এবং খাজা ইবরাহীম ছিলেন খাজা উসমানের ছোট ভাই। (পঞ্চম অধ্যায় এবং বাহরিস্তান, ১ম, ১৭৩ দ্রষ্টব্য)। পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে খাজা উসমানের পতনের পরে তাঁর ভাই ও ছেলেদের সম্রাটের দরবারে পাঠানো হয় এবং সেখানে উসমানের ভাই খাজা ওয়ালী এবং ছেলে খাজা মুমরিজকে হত্যা করা হয়, অন্যদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে যে খাজা দাউদ এবং খাজা ইবরাহীম সম্রাটের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এবং বিদ্রোহী যুবরাজের বাহিনীতে যোগদান করেন।

৩৩। ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

Edited by Ripon Sarkar

৩৪ মির্জা নাথান ছিলেন তখন বঙ্গে জাহাঙ্গীরের ভক্তিভাজন, ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাকে ১০০০/৫০০০ মনসব দিয়ে সম্রাট বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত করে পাঠান। ইতিপূর্বে মুবারক খান বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন। (তুজুক, ২য়, ৩)।

৩৫ মনসুর খান ছিলেন বাকলার মহীর খান বাহাদুরের ছেলে।

৩৬ এটি রেনেলের এক মানচিত্রে পাইকি, রাজমহল থেকে ত্রিশ মাইল পূর্বে অবস্থিত।

৩৭ বাহারিস্তান, ১ম, ৬৮৭-৬৮৬

৩৮ তুজুক, ২য়, ১৯৮-৯৯

৩৯ রিয়াজ, ১৮৯

৪০ তুজুকে শাহজাদা বর্ধমান... কিন্তু ইকবালনামায় (২১৭) এবং মাসির উল-উমারায় (১ম, ১০৭, ১৯৬) বলেছে পিপলি, কিন্তু এ পিপলি বোধ হয় বিখ্যাত বন্দর পিপলি নয়। বালেশ্বরের পিপলি কটক থেকে বন্দরের নিকটে, কিন্তু তুজুক এবং রিয়াজের বক্তব্য পিপলি থেকে কটক বাংলার কাছে প্রথম নিকটে, দুই জেলাতেই এক পিপলি আছে, এবং এ পিপলি থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে কটক, অর্থাৎ পিপলি থেকে কটক বাংলার নিকটবর্তী। দেখুন, ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার, নতুন সংস্করণ, অনুচ্ছেদ ২০, ৪৩৪।

৪১ জে. জে. এ. কেম্পবেল: হিস্টরি অব দি পর্তুগিজ ইন বেঙ্গল, ১২৮-২৯।

৪২ এস. বি. ২য়, ৩০৬।

৪৩। তুজুক, ২য়, ২৯৯।

৪৪। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৯০-৯৪।

৪৫ শাহজাদা ঢাকা থেকে রাজমহলে ফেরার পথে আলাইপুরে ঝড়ের কবলে পতিত হন। (বাহারিস্তান, ২য়, ৭১১)।

৪৬। এস. বি. ২য়, ৩০৯।

৪৭। বাহারিস্তান, ২য়, ৭০১।

৪৮। এস. বি. ২৯৯।

৪৯। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৩২।

৫০। দোহারপাড়া ছিল একটি পরগণা, পদ্মা নদীর উত্তরে অবস্থিত ছিল। রেনেলের মানচিত্র নং ১।

৫১। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৩৩।

৫২। ঐ, ৪৭৯।

৫৩। ঐ, ৬৩৪।

৫৪। ঐ, ৬৪৩।

৫৫। রিয়াজ, ১৮৬; বাংলা অনুবাদ আকবর উদ্দীনের, দেখুন, বাংলার ইতিহাস (রিয়াজুস সালাতীনের অনুবাদ), ১৪১।

৫৬। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৪৯।

৫৭। ঐ, ৬৫১-৬৫২।

৫৮। কেম্পবেল, ৩০৩৩, ১৪৯।

৫৯। বাহারিস্তান, ২য়, ৬৫০।

৬০। এস. বি. ২য়, ২৯৯।

Edited by Ripon Sarkar

বাংলায় বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহান এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা

পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে শাহজাহান রাজমহলে যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং সুবাদার ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ নিহত হন; অতঃপর প্রায় এক বছর কাল সুবা বাংলা শাহজাহানের অধীনে থাকে। ইব্রাহীম খানের মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগত সেনানায়কেরা ঢাকা ত্যাগ করেন। মির্যা আহমদ বেগ কয়েকজন সেনানায়ক সহ স্থলপথে যাত্রা করেন; মির্যা ইউসুফ, জালাইর খান, মীর শামস, মাসুম খান বকশল-ই-আলা এবং ব্যাপুজেল টৈঙারের নদীপথে নৌবহর নিয়ে যাত্রা করেন। এদিকে ঢাকায় সংবাদ পেয়ে ইব্রাহীম খানের বেগম এবং ব্যক্তিগত অফিসার খাজা ইদ্রাক ঢাকা ছেড়ে পাটনার দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং তাঁরা সকল ধন সম্পদ নৌকায় বোঝাই করেন।

শাহজাহান চিত্রকরদের দুখানি পতাকায় ছবি আঁকার নির্দেশ দেন। ছবিতে সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গ সিংহের উপর বসা, তাঁর ডান হাতে খোলা তরবারি এবং বাম হাতে ইব্রাহীম খানের ছিন্ন মস্তক। শাহজাহান একখানি পতাকা একজন বিশ্বস্ত সৈন্যকে দিয়ে পাটনা পাঠান। সৈন্যটি তাঁর ঘোড়ার জিনে পতাকা বেঁধে একখানি ফরমান সহ পাটনায় মুখলিস খানের[1] নিকট যান। ফরমানে মুখলিস খানকে নির্দেশ দেয়া হয় যেন পাটনা দুর্গ শাহজাহানের অফিসারদের নিকট হস্তান্তর করেন, নতুবা তাঁর (মুখলিস খানের) অবস্থাও ইব্রাহীম খানের মত হবে। শাহজাহান রাজা ভীমকে রাজমহলের সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং রাজা সাদত ও অন্যান্যদের মুঙ্গের পর্যন্ত জায়গীর দিয়ে অগ্রবর্তী দল হিসেবে মুঙ্গেরের দিকে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গের মনসব বৃদ্ধি করেন এবং তাঁকে মূল্যবান উপহারাদি দেন। দরিয়া খানের মনসব বৃদ্ধি করা হয় এবং তাঁকে শের খান ফতেহজঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। দরিয়া খানের ছেলে বাহাদুর খানের মনসব বৃদ্ধি করা হয় এবং বাবু খানের মনসব বৃদ্ধি করে তাঁকে দিলাওয়ার খান উপাধি দেয়া হয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারকে ১২০ থেকে ২০০ পর্যন্ত মনসব মঞ্জুর করা হয়।[2]

অতঃপর শাহজাহান ঢাকার দিকে যাত্রা করেন। মালদহ পৌঁছে তিনি কামরূপের শাসনের প্রতি মনোযোগ দেন। তিনি মির্যা মাক্কীকে কামরূপের অস্থায়ী সেনাপতি নিযুক্ত করেন এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যেন তিনি কামরূপে একজন সুবাদার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত সেখানে শাসন পরিচালনা করেন এবং সুবাদার পেলে তিনি যেন শাহজাহানের নিকট চলে আসেন। মির্যা মাক্কী যাঁকে উপযুক্ত মনে করেন তাঁকে রেখে বাকি অফিসারদের শাহজাহানের নিকট পাঠিয়ে দেয়ার জন্য নির্দেশ লাভ করেন। এ মর্মে ফরমান জারি করে ইয়াকা বাহাদুর নামক একজন অফিসারের মারফত কামরূপে পাঠানো হয়। তাঁর সঙ্গে উপরে উল্লেখিত সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের একখানি ছবিও দেয়া হয়। স্মরণ থাকতে পারে যে ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গ মির্যা মাক্কী বারখুরদারকে কামরূপের সেনাপতি নিযুক্ত করে পাঠান, শাহজাহান তাঁকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁকে

Edited by Ripon Sarkar

দরবারে (শাহজাহানের নিকট) পাঠানোর জন্য মির্যা নাথনকে নির্দেশ দেয়া হয়। মির্যা নাথন সুবাদারের পদ পেয়ে আকা তকীকে কামরূপের দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশ পদে নিয়োগ করেন এবং তাঁকে ৪০০/১০০ মনসব মঞ্জুর করার জন্য শাহজাহানের নিকট সুপারিশ করেন।[৩] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এ প্রথম কামরূপকে সুবা এবং কামরূপের সেনাপতিকে সুবাদার রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। কামরূপ বিজয়ের পর থেকে কামরূপ সরদার বা সেনাপতির অধীনে ন্যস্ত ছিল। কামরূপে সর্বদা যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকায় অবশ্য সেনাপতির অধীনে থাকাই সমীচীন ছিল। এখন কামরূপে স্থিতাবস্থা ফিরে আসে মনে করে শাহজাহান বোধ হয় কামরূপকে সুবায় পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু এটা সাময়িক ব্যাপার, কারণ মোগল আমলে কামরূপ কোন সময় পৃথক সুবার মর্যাদা পায়নি।

শাহজাহান মালদহ থেকে সরাই শর্ধারিয়ে[৪] যান। পাণ্ডুয়া নিকটবর্তী হওয়ায় তিনি পাণ্ডুয়ায় গিয়ে শায়খ নূর কুতুব আলমের মাযার জিয়ারত করেন এবং খাদিমদের চার হাজার টাকা উপহার দেন। পাণ্ডুয়া থেকে দিহিকোট[৫] হয়ে তিনি ঘোড়াঘাট যাত্রা করেন। পথে তিনি মির্যা নাথনের আবেদনপত্র পান এবং মির্যা নাথনের সুপারিশে রাজা লক্ষ্মী নারায়ণ, রাজা শত্রুজিৎ, রাজা রঘুনাথ এবং রাজা মধুসূদনকে উৎসাহিত করে ফরমান জারী করেন। আগে বলা হয়েছে যে মির্যা নাথন আগা তকীকে কামরূপের দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশ পদে নিয়োগ করেন। মির্যা নাথনের সুপারিশে শাহজাহান আগা তকীকে উক্ত পদগুলিতে নিয়োগ অনুমোদন করেন এবং তাঁর জাগীর ও মনসবও অনুমোদন করেন। ঘোড়াঘাট পৌঁছে শাহজাহান ইবরাহীম খানের শোক সন্তপ্ত বেগম ও অফিসারদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ইতিমাদ খানকে ঢাকা পাঠিয়ে দেন। ঢাকায় তখন মির্যা আহমদ বেগ খান, মির্যা ইউসুফ, জালাইর খান, মির্যা ইসকন্দিয়ার ও মির্যা নূর উল্লাহ প্রমুখ ইবরাহীম খানের বিশ্বস্ত অফিসারেরা ইবরাহীম খানের বেগমের সঙ্গে ছিলেন। শাহজাহান নিজেও ঘোড়াঘাট থেকে ঢাকা যাত্রা করেন, এবং শাহজাদপুর হয়ে ঢাকা পৌঁছেন। রাজমহল থেকে যাত্রার ষষ্ঠ দিনে তিনি শাহজাদপুর পৌঁছেন এবং শাহজাদপুর থেকে চতুর্থ দিনে অর্থাৎ রাজমহল থেকে যাত্রা করার নয় দিন পরে শাহজাহান ঢাকা পৌঁছেন। ইহাতে মনে হয় শাহজাহান স্থল পথে ঘোড়ায় চড়ে ঢাকায় আসেন, বর্ষা তখনও শুরু হয়নি, তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তিনি ঢাকা পৌঁছুতে পারতেন না। আরও দেখা যায় পথে তিনি কোথাও দেরী করেননি বা যাত্রা বিরতি করেননি। কোথাও দেরী করার তাঁর সময় ছিল না, কারণ তাঁর লক্ষ্য বাংলা জয় করা নয়, তাঁর লক্ষ্য ছিল দিল্লীর সিংহাসন। মির্যা নাথনের বিবরণে দেখা যায় ঘোড়াঘাটে পৌঁছবার আগে শাহজাহান তাঁর (মির্যা নাথনের) আবেদন পত্র পেয়ে ঘোড়ার পিঠে থেকেই আবেদন পত্রখানি পাঠ করেন, অর্থাৎ এতটুকু সময় নষ্ট করার ইচ্ছাও তার ছিল না।

ঘোড়াঘাট থেকে ইতিমাদ খানকে ঢাকা পাঠাবার ফলে ঢাকার অফিসারেরা শাহজাহানের ঢাকা পৌঁছবার সংবাদ আগেভাগে পেয়ে যান। ফলে কেউ এক ক্রোশ বা কেউ দুই ক্রোশ অগ্রসর হয়ে সকলে শাহজাহানকে অভ্যর্থনা জানায়। শাহজাহান খেলাত, ঘোড়া বা শাল উপহার দিয়ে প্রত্যেককে সম্মানিত করেন। ইবরাহীম খানের বেগমও শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করেন এবং শাহজাহানের আতিথেয়তা করেন। যুবরাজ সাতদিন

Edited by Ripon Sarkar

ঢাকার দুর্গে ইব্রাহীম খানের প্রচুর সম্পদ হস্তগত করেন এবং বন্দর ও জেটিঘাটের এক কাবরুলের বিভিন্ন খান সুলতানের হস্তগত করেন।[৮]

উপরে বর্ণনা করেছি যে শাহজাহান ফুলপুর হয়ে ঢাকা যান। কিন্তু মির্জা-ই-নাথান বলে উল্লেখ যে শাহজাহান বর্ধমান হয়ে ঢাকা যান। ইসলামাবাদ-ই-ভটচার্য্যের অনুসন্ধান বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু কী ... রাজমহল থেকে যে পথের বিবরণ দেন তাতে দেখা যায় যে তিনি রাজমহল থেকে যাত্রা করে মরাট পাবালি, পাণ্ডুয়া, শিকারপুর, আকবরপুর, হয়ে দেওয়ান হয়ে, এবং সম্ভবত ফুলপুর ঘোড়াঘাট থেকে শাহজাদপুর হয়ে তিনি ঢাকা যান। এটা নাথান হয়ে শাহজাহান আনুমানিক একমাস পরে বা ঐ মাসের শেষের দিকে ঢাকা পৌঁছান ... তিনি ফুলপুরেই গিয়েছিলেন।[৯] টাণ্ডা ফুলপুর না হয়ে তিনি যদি রাজমহল থেকে ঢাকা পৌঁছতে পারতেন না। যা হোক ঢাকা এসে তিনি ইব্রাহীম খান ফতেহজঙ্গের পরিত্যক্ত বিত্তের ধন-সম্পদ হস্তগত করেন। মির্জা আহমদ বেগ খান আগেই ঢাকা এসেছিলেন। তিনি শাহজাহানকে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পদ এবং পাঁচশ হাতি হস্তান্তর করেন।[১০] রিয়াজে বলা হয় যে শাহজাহান ঢাকায় এসে ইব্রাহীম খানের সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেন বিভিন্ন দ্রব্য, রেশমের কাপড় ছাড়াও হাতী, ঘোড়া ও অন্যান্য মূল্যবান বস্তু এবং চল্লিশ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়।[১১] ঢাকায় এ বিপুল অর্থ প্রাপ্তি বিদ্রোহী যুবরাজ শাহজাহানের জন্য ছিল আশীর্বাদস্বরূপ সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল সৈন্যবাহিনীর এবং সৈন্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজন ছিল অর্থের। ঢাকায় প্রাপ্ত অর্থে যুবরাজের এ প্রয়োজন মিটে যায়। শুধু তাই নয় যুবরাজ এখানে অনেক হাতি, ঘোড়া, বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং বিপুল সংখ্যক রণতরী এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম লাভ করেন। নৌ-বাহিনী ছিল সুশিক্ষিত ও সুদক্ষ।

শাহজাহান ঢাকায় সাতদিন অবস্থান করেন। এ সাত দিনে তিনি বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ পুনর্গঠিন করেন। তিনি বাংলা এবং কামরূপকে কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করেন। প্রধান সুবা ভাটি এবং এ সুবায় দারাব খানকে সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। দারাব খান ছিলেন আবদুর রহীম খান খানানের দ্বিতীয় ছেলে। আবদুর রহীম খান খানান প্রথমে শাহজাহানের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু পরে তিনি শাহজাহানকে ত্যাগ করে সম্রাটের পক্ষে যোগদান করেন। ফলে শাহজাহান দারাব খানকেও অবিশ্বাস করতেন। কিন্তু ইব্রাহীম খানের সঙ্গে যুদ্ধে, বিশেষ করে রাজমহল দুর্গ আক্রমণ করলে দারাব খান যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তাতে শাহজাহান মুগ্ধ হয়ে যান এবং তিনি দারাব খানের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং তাঁকে ভাটির সুবাদার নিযুক্ত করেন।[১২] দারাব খানের মনসব ৬০০০/৫০০০ এ উন্নীত করা হয় এবং তাঁকে খেলাত, ঘোড়া, মণিমুক্তা খচিত তরবারি এবং তরবারির বন্ধন উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। দারাব খানের ছেলে আরাম বখশকে ১০০০ মনসব এবং দারাব খানের ভাই শাহনওয়াজ খানের ছেলে শকরশিকনকে ১০০০/১০০০ মনসব দেয়া হয় এবং তাঁদের উভয়কে শাহজাহান নিজের সৈন্যদলে স্থান দেন। দারাব খানের আর এক ছেলে এবং ভাইপোকে অনুরূপ মনসব দিয়ে দারাব খানের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেয়া হয়। মির্জা মুলকীকে[১৩] ৫০০/২০০ মনসব দিয়ে দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। মির্জা হেদায়েত উল্লাহকে ঢাকায় বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশ নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে ৪০০/১৫০ এ

Edited by Ripon Sarkar

উন্নীত করা হয়। মালিক হোসেনকে বাংলার কোষাধ্যক্ষ পদে বহাল রাখা হয়, অর্থাৎ তিনি ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের সময়েও ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলী খান নিয়াজীকে সুবা যশোরের সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে ২০০০/১৫০০ মনসব মঞ্জুর করা হয়। মিরযা সালেহকে সিলেটের সেনাপতি এবং ইবরাহীম খানের ব্যক্তিগত বখশী মিরযা বাকীকে ভুলুয়ার থানাদার নিযুক্ত করা হয়, তাঁকে ৫০০/৪০০ মনসব মঞ্জুর করা হয়। ইবরাহীম খানের এ্যাডমিরাল আদিল খান এবং পাহার খানকে স্ব স্ব পদে বহাল রাখা হয়। আদিল খানকে দারাব খানের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং পাহার খানকে যুবরাজের সঙ্গে নিয়ে যুবরাজের এ্যাডমিরাল খেদমত পরস্ত খান ওরফে রেজার অধীনে নিযুক্ত করা হয়। প্রশাসনিক পুনর্গঠন ছাড়াও যুবরাজ সুবা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার দিকেও মনোযোগ দেন। তিনি ওয়াজির খানকে এ কাজে নিযুক্ত করেন এবং রাজস্ব তালিকা তৈরি করার নির্দেশ দেন।[১৪]

উপরে দুটি সুবার উল্লেখ করা হয়েছে—সুবা ভাটি এবং সুবা যশোর। দারাব খানকে ভাটির সুবাদার এবং আলী খান নিয়াজীকে যশোরের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। আগে বলা হয়েছে যে কামরূপকে একটি আলাদা সুবায় পরিণত করা হয় এবং মিরযা নাথনকে একজন সুবাদার নিযুক্ত হওয়া পর্যন্ত কামরূপের সুবাদারের পদ দেয়া হয়। পরে জাহিদ খানকে[১৫] কামরূপের সুবাদার নিযুক্ত করে মিরযা নাথনকে যুবরাজের নিকট ডেকে পাঠানো হয়। আরও পরে গৌড়কে একটি পৃথক সুবায় পরিণত করা হয়, রাজমহলে এর কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। মিরযা নাথনকে রাজমহলে সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। বাহরিস্তানে সুবা গৌড় রাজমহলের সীমানা দেয়া হয়েছে নিম্নরূপঃ পূর্বে শাহজাদপুর, উত্তরে কামরূপ সীমান্তে বাহিরবন্দ, দক্ষিণে বর্ধমান সহ উড়িষ্যা সীমান্ত পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গর্হি।[১৬] এ হিসেবে অন্যান্য সুবার সীমাও নির্দেশ করা যায়। মোটামুটিভাবে সুবা ভাটি ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট, ত্রিপুরা এবং ভুলুয়া নিয়ে গঠিত ছিল; সুবা যশোর সারা দক্ষিণ বঙ্গ এবং সুবা কামরূপ কামতা এবং কামরূপ নিয়ে গঠিত ছিল। সুবা বাংলা এবং কামরূপকে এভাবে প্রশাসনিকভাবে বিভক্ত করায় শাহজাহানের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ বোধ হয় দারাব খানের একচ্ছত্র ক্ষমতা খর্ব করা। সুবা বাংলাকে যে কোন একজনের অধীনে ন্যস্ত করার বিপদ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেশ দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ করত। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক সর্বপ্রথম বাংলাকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন—লখনৌতি, সাতগাঁও, এবং সোনারগাঁও। শের শাহও বাংলাকে একক শাসন থেকে মুক্ত করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করেন। এখন দেখা যায় শাহজাহানও এ একই নীতি অবলম্বন করেন।[১৭] দারাব খানের পিতা আবদুর রহীম খান খানান শাহজাহানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেন। সুতরাং দারাব খান তাঁর পক্ষে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও যুবরাজ দারাব খানকে বোধ হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। খান খানানের ছেলে বাংলা কামরূপের একচ্ছত্র সুবাদার হলে তিনি যে বিপদের কারণ হতে পারেন এ কথা শাহজাহান বুঝতে পেরেছিলেন। পরে অবশ্য দারাব খান শাহজাহানের সঙ্গে সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করেন। দ্বিতীয়ত, চারটি সুবায় চারজন উচ্চপদস্থ অফিসার নিয়োগ করায় একজন বিদ্রোহী হলেও অন্যরা তার বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারবে এ বিশ্বাসও শাহজাহানের ছিল। সুতরাং তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেন।

Edited by Ripon Sarkar

ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে আরাকানের রাজা শাহজাহানের নিকট দূত পাঠান। আরাকানের মগ রাজা মিন খামৌঙ (হোসেন শাহ), যিনি কাসিম খান এবং ইবরাহীম খানের সময়ে কয়েকবার ভুলুয়া এবং অন্যান্য মোগল এলাকা আক্রমণ করেন, ১৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ছেলে থিরি থুধম্মা (দ্বিতীয় সলীম শাহ) সিংহাসনে বসেন।[১৮] মির্‌যা নাথন বলেন[১৯] "শাহজাহান ঢাকায় পৌঁছার পরে মগ রাজা যুবরাজের আগমন সংবাদ শুনে তাঁর নিকট এক লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য দুর্লভ উপহারসহ একজন দূত পাঠান। মগ রাজার অধীনে দশ হাজার রণতরী, পনরশ হাতি এবং দশ লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল। মগ রাজা অত্যন্ত বিনীতভাবে আবেদন জানান যে তাঁকে যেন অনুগত সামন্তরূপে গণ্য করা হয় এবং তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করেন যে তাঁকে যে কোন সময় ডাকা হলে তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে (যুবরাজের) সেবা করবেন। অতএব শাহজাহান একটি বহু মূল্যবান খেলাত এবং মূল্যবান উপহারাদি মগ রাজার নিকট পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এক ফরমান জারি করে মগ রাজাকে তাঁর রাজ্যের সার্বভৌমত্বে বহাল করেন এবং তাঁকে বলেন তিনি যেন তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেন এবং ঢাকার মোগল অফিসারদের সাহায্য সহযোগিতা করেন। এই বলে শাহজাহান মগ রাজার দূতকে বিদায় দেন। মির্‌যা নাথনের এ বক্তব্য কতটুকু সত্য বলা যায় না। আরাকানের পূর্ববর্তী রাজা মিন খামৌঙ কয়েকবার মোগল এলাকা আক্রমণ করার কথা আগেই বলা হয়েছে। নতুন রাজা সিংহাসনে বসার পরে তাদের নীতি পরিবর্তিত হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। তাছাড়া পরে দেখা যাবে যে এ রাজাই, অর্থাৎ থিরি থুধম্মাই আবার মোগল এলাকা আক্রমণ করেছিলেন। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন:[২০] "Common hostility to the Emperor obviously induced the new king to conciliate the rebel prince by this friendly gesture, which the latter fully reciprocated. No tangible result, however, followed, and the whole thing proved to be nothing more than a diplomatic game".

ঢাকায় গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের পরে শাহজাহান ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি বিশাল নৌবাহিনী নিয়ে নদীপথে যাত্রা করেন এবং প্রধান সেনাপতি আবদুল্লা খান ফীরুজজঙ্গ ও অন্যান্য অফিসারেরা স্থলপথে রওয়ানা হন। শাহজাহান প্রথমে খিজিরপুরে অবস্থান করেন এবং সেখান থেকে নদীর অপর তীরে নবীগঞ্জে (কদম রসূল বা রসূলপুর) গিয়ে সেখানে রক্ষিত রসূলের পবিত্র পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে মুসলিম জগতে রসূলের পদচিহ্ন মুসলমানদের নিকট অতি সম্মানিত। তাই বিভিন্ন স্থানে পদচিহ্ন স্থাপন করে তাঁর প্রতি ভক্তি করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের বাইরের এরূপ কয়েকটি বিখ্যাত স্থান (১) দামেস্কের মসজিদ-ই-আকদাম, যেখানে মুসা নবী (আঃ) এর পদচিহ্ন আছে বলে ধারণা করা হয়, (২) শ্রীলঙ্কায় আদমের পদচিহ্ন, এবং (৩) দিল্লীর কদম শরীফ। বাংলায় গৌড়ের কদম রসূল, নবীগঞ্জের কদমরসূল, চট্টগ্রামের কদম মুবারক প্রসিদ্ধ।[২১] মির্‌যা নাথন বলেন যে নবীগঞ্জের পদচিহ্ন মাসুম খান কাবুলী[২২] অনেক অর্থ ব্যয়ে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে ক্রয় করেন এবং এখানে স্থাপন করেন।[২৩] শাহজাহানও এখানে এসে কদম রসূলের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জানান। অতঃপর যুবরাজ নবীগঞ্জ থেকে বিক্রমপুর, কলাকোপা, যাত্রাপুর হয়ে আলাইপুরে পৌঁছেন। আলাইপুরে তিনি ঝড়ের কবলে পড়েন। যুবরাজের নৌকা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু কোন রকমে রক্ষা

Edited by Ripon Sarkar

পায়। ২০শে মে মাস। তাই তিনি কালবিলম্বহীন কবলে পড়েন। আলাতিপুর থেকে তিনি পাঁচ মঞ্জিলে রাজমহল পৌঁছেন এবং সেখানে তিন দিন যাত্রাবিরতি করে পাটনার দিকে রওয়ানা হন। বেগম মমতাজ মহল এবং অন্যান্য কয়েকজন নিকটাত্মীয়কে তিনি সঙ্গে নিয়ে যান, এবং হারেমের সকল মহিলা, সকল মূল্যবান সম্পদ; সাজ-সরঞ্জাম এবং ভারি জিনিসপত্র তিনি রাজমহলে রেখে যান। আকবরনগরে বা রাজমহলে একটি প্রাসাদ নির্মাণের জন্য তিনি বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করেন এবং মুহাম্মদ সালেহকে সুবা গৌড়ের বখশী ও ওয়াকিয়ানবিশ এবং ইমারত বিভাগের দারোগা নিযুক্ত করেন, এবং তাঁকে নির্দেশ দেন যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাসাদটি নির্মাণ সমাপ্ত করা হয়। তিনি পশ্চিমে দিয়ে যাত্রা বিরতি করেন। উজির খান বাংলা রাজস্ব তালিকা তৈরি করে রাজস্ব তালিকাসহ এখানে এসে শাহজাহানের সঙ্গে মিলিত হন।[২৪]

আগে বলা হয়েছে যে ইবরাহীম খানের মৃত্যুর পরে শাহজাহান ঢাকা যাওয়ার আগে মুখলিস খানকে পাটনা দুর্গ দখল করার নির্দেশ দেন। মুখলিস খান এত ভয় পেয়ে যান যে তিনি পাটনা যতদূর সম্ভব শাহজাদা পারভেজের যুদ্ধের সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে যান। শাহজাহান পশ্চি থেকে যাত্রা করে পাটনা পৌঁছেন এবং প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফিরুজজঙ্গকে জৌনপুরে যাওয়ার আদেশ দেন। সারা সুবা বিহার জায়গিরদারদের মধ্যে জায়গীর বণ্টন বিতরণ করা হয়। পাটনা থেকে শাহজাহান রোটাস দুর্গের কিল্লাদার সৈয়দ মুবারকের নিকট ফরমান পাঠিয়ে আদেশ দেন যে তিনি যদি যুবরাজের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাঁকে পুরস্কৃত করা হবে এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করা হবে। সৈয়দ মুবারক এসে যুবরাজের সঙ্গে দেখা করেন, তাঁকে অনেক মূল্যবান উপহার দেয়া হয় এবং তাঁর মনসব ৪০০০/৪০০০ এ উন্নীত করা হয়। শাহজাহান সৈয়দ মুযাফফরকে ৭০০/৫০০ মনসব দিয়ে তাঁকে রোটাস দুর্গের কিল্লাদার নিযুক্ত করেন।[২৫]

১০৩৩ হিজরীর ২৭শে শাবান (১৪ই জুন ১৬২৪ খ্রিঃ) তারিখে শাহজাহান জৌনপুরের উদ্দেশে পাটনা ত্যাগ করেন। পথে তিনি সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের নিকট থেকে সংবাদ পান যে তিনি যুবরাজ পারভেজ এবং মহাবত খানের গতিবিধি সম্পর্কে কোন খবর পাননি এবং তিনি এলাহাবাদে যাচ্ছেন। শাহজাহান মানের পৌঁছেন এবং সেখানে মখদুম শরফ শরফ-উদ-দীন ইয়াহয়া মানেরীর মাযার জেয়ারত করেন।[২৬] অতঃপর তিনি বালিয়া গমন করেন। সেখান থেকে শাহজাহান খান দৌরানকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন। এ সময় রাজা নারায়ণ মল্ল উজ্জনীয় তাঁর আত্মীয় স্বজন এবং ভাইদের নিয়ে এসে শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করেন, যুবরাজ তাঁদের সকলকে মনসব দিয়ে সম্মানিত করেন। এর পর শাহজাহান গোমতী নদীর[২৭] মোহনায় গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের নিকট থেকে একখানি চিঠি পান। সেনাপতি লিখেন যে এলাহাবাদের সেনাধ্যক্ষ মির্যা রুস্তম খান দুর্গ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করেছেন এবং যুবরাজের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। শাহজাহান গোমতীর মোহনা থেকে জৌনপুরে যান। তিনি রাজা ভীমকে গঙ্গা পার হয়ে একটি থানা স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং সেনাপতি আবদুল্লাহ খানকে এলাহাবাদের

Eidited by Ripon Sarkar

বিপরীতে নদী পার হয়ে এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করার আদেশ দিয়ে চিঠি পাঠান এবং রুস্তম খান ও মুর্তাজিদ খানকে দোস্তী দিয়ে সেনাপতি আবদুল্লাহ খানের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি আরও কয়েকজন সেনানায়ককে কারা মানিকপুর পাঠান এবং তাদের নির্দেশ দেন যেন তারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের নদী পার হতে বাধা দেয়। শেষমত দরবেশ খানের অধীনে মীর শামস, মসনদ-ই-আলা মুসা খানের ছেলে মাসুম খান এবং ভাটির অন্যান্য জমিদারকে নৌবাহিনীসহ আবদুল্লাহ খানের নিকট পাঠানো হয় এবং মির্জা নাথনকে সুবা গৌড়ের শাসন ব্যাপারে অনেক উপদেশ দিয়ে রাজমহলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গের বেগম তাঁর পুত্রের মাযারের (ইবরাহীম খানকেও সেখানে সমাহিত করা হয়) নিকটে একটি প্রাসাদে বাস করতে থাকেন। তিনটি বাজারের রাজস্ব তাঁকে বরাদ্দ করা হয়। মির্জা নাথন হাতি, ঘোড়া, মূল্যবান জিনিস এবং নগদ সহ মোট তিয়াত্তর হাজার টাকার নযরানা শাহজাহানের নিকট পাঠান। শাহজাহান সন্তুষ্ট চিত্তে এগুলি গ্রহণ করেন।[২৮]

এদিকে শাহজাদা পারভেজ এবং মহাবত খান বুরহানপুরে শাহজাহানের গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজ খবর পান। তাঁরা জানতে পারেন যে বাংলার সুবাদার ইবরাহীম খান যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। শাহজাহান, বাংলা বিহার উড়িষ্যা এবং কামরূপ অধিকার করে জৌনপুরে পৌঁছেছেন। শাহজাহানের সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গ এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করেছেন এবং শাহজাহানের সৈন্যরা কারা মানিকপুর দিয়ে চতুর্দিকে লুটপাট করছে। পারভেজ এবং মহাবত খান আহমদ নগর, আহমদাবাদ, খান্দেশ, মালওয়া এবং আজমীরের শাসন ব্যাপারে সুবন্দোবস্ত করে শাহজাহানের বিরুদ্ধে গমন করেন এবং মানিকপুরের দিকে যাত্রা করেন। পারভেজ মুখলিস খানকে বিনা যুদ্ধে পাটনা দুর্গ পরিত্যাগ করে আসার জন্য তিরস্কার করে চিঠি দেন। মুখলিস খান ভয়ে আত্মহত্যা করেন। পারভেজ এবং মহাবত খান মানিকপুরের বিপরীতে কারায় শিবির স্থাপন করেন। আগেই বলা হয়েছে শাহজাহান মানিকপুর রক্ষার জন্য কয়েকজন সেনানায়ক পাঠান। তাদের নেতা ছিলেন শের খান ফতেহজঙ্গ (দরিয়া খান)। তিনি মদাপ ছিলেন। তাঁর সৈন্যরা প্রস্তাব করে যে তাদের তখনই নদীর তীরে গিয়ে শিবির স্থাপন করা উচিত এবং পারভেজ ও মহাবত খানকে নদী পার হওয়ার সময় বাধা দেয়া উচিত। শের খান ফতেহজঙ্গ মদের নেশায় এতই বিভোর ছিলেন যে তিনি কারও কথা শুনলেন না বরং বলেন: 'মহাবত খান নদী পার হলে আমি তাঁকে এমন শিক্ষা দেব যে সে আর কোন দিন যুদ্ধ করতে চাইবে না।' ফলে মহাবত খান বিনা বাধায় নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা সংগ্রহ করতে থাকেন।[২৯] সেনাপতি আবদুল্লাহ খান এলাহাবাদ দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। অবরুদ্ধ সেনানায়কদের কেউ কেউ এসে আবদুল্লাহ খানের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। শাহজাহান তখন মনে করেন যে পারভেজ এবং মহাবত খানের সঙ্গে যুদ্ধের আগে চুনার দুর্গ জয় করা উচিত। তিনি উজীর খানকে এই কাজে পাঠান এবং উজীর খানও চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। এ সময় বীর সিংহ বুন্দেলার[৩০] ছেলে কানওয়ার পাহাড় সিংহ, তাঁর পাঁচ ভাই, আট হাজার অশ্বারোহী এবং পনর হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে শাহজাহানের সঙ্গে মিলিত হন। শাহজাহান তাঁদের উচ্চ মনসব দিয়ে সম্মানিত করেন। এ সময় শাহজাহান তাঁর হারেমের মহিলাদের এবং যুবরাজ দারাশিকোহ ও আওরঙ্গজেবকে রোটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেন।[৩১]

ইতোমধ্যে মহাবত খান অনেকগুলি নৌকা সংগ্রহ করেন এবং ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে নদী পার হয়ে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। শের খান ফতেহজঙ্গ (দরিয়া খান) তাঁর

Edited by Ripon Sarkar

সেন দুটি পক্ষ এ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে যান এবং মহাবত খানের সঙ্গে যুদ্ধ না করে ফিরে যান। এখন সেনাপতি আবদুল্লাহ খানও এলাহাবাদ দুর্গের অবরোধ প্রত্যাহার করে ঝুসীর দিকে যাত্রা করেন। তিনি শাহজাহানকেও জৌনপুর ছেড়ে বাহাদুরপুরে[৩২] শিবির স্থাপন করার পরামর্শ দেন। শাহজাহান বাহাদুরপুরে আসেন, সেনাপতি আবদুল্লাহ খান, শের খান ফতেহজঙ্গ, রাজা ভীম, উজীর খান সকলেই একের পর এক বাহাদুরপুরে এসে শাহজাহানের সঙ্গে মিলিত হন। ভাটির জমিদারদের রণতরীগুলি শাহজাহানের সঙ্গেই ছিল। এখন তিনি ঢাকায় দারাব খানের নিকট আদেশ পাঠান যেন মনমিল (ম্যানুয়েল টেভারেস) এবং দুরজিসুজ[৩৩] নামক পর্তুগীজদের তাদের নৌবাহিনী নিয়ে পাঠান হয়।[৩৪]

উভয় পক্ষ যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা গণনা করা হল। পারভেজের অধীনে আশি হাজার অশ্বারোহী, এক লক্ষ পদাতিক সৈন্য এবং এক হাজার নয়শ হাতি গণনা করা হয়। এ সংবাদ শাহজাহানের নিকট গেলে তিনিও সৈন্য গণনার নির্দেশ দেন। দেখা গেল শাহজাহানের সঙ্গে এক লক্ষ আশি হাজার বর্ম পরিহিত অশ্বারোহী, এক লক্ষ নব্বই হাজার পদাতিক সৈন্য, দু হাজার চারশ হাতি, পাঁচ হাজার রণপোত এবং পনরশত কামান ছিল।[৩৫] মিরযা নাথন প্রদত্ত এ সংখ্যা অতি রঞ্জিত, কোন পক্ষেই এত অধিক সৈন্য থাকা সম্ভব ছিল না। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরীতে এ সংখ্যা পারভেজের পক্ষে চল্লিশ হাজার এবং শাহজাহানের পক্ষে দশ হাজার এবং রিয়াজ-উস-সলাতীনেও এ সংখ্যাই দেয়া হয়েছে।[৩৬] উভয় পক্ষ যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন হয়ত শাহজাহানের সৈন্য সংখ্যা আরও বেশি ছিল, কিন্তু টন্স নদীর তীরে চূড়ান্ত যুদ্ধের সময় শাহজাহানের সৈন্যসংখ্যা দশ হাজারের বেশি ছিল বলে মনে হয় না। কারণ ইতোমধ্যে শাহজাহানের সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে, অনেকে তাঁকে ছেড়ে শত্রুপক্ষে যোগ দেয় বা পালিয়ে যায়।

চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে উভয়পক্ষে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ হয় এবং শাহজাহানের শিবিরে দলত্যাগ শুরু হয়। প্রথমে বেলমত পরস্ত খানের অধীনস্থ জমিদারদের নৌবাহিনী নদীর তীরে অবস্থানরত পারভেজের সৈন্যদের আক্রমণ করে, ঢাকা থেকে আগত পর্তুগীজ নৌবাহিনীও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। উভয়পক্ষে মাঝে মাঝে যুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষে সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু ফলাফল কিছু ছিল না।[৩৭] ইতোমধ্যে শাহজাহানের পক্ষের সেনানায়কেরাও বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। প্রথমে পাটনার সুবাদার খান দৌরান এবং দারাব খানের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ ধরা পড়ে। তাদের পত্রালাপ মিরযা নাথনের হাতে পড়ায় মিরযা নাথন তা শাহজাহানের নিকট পাঠিয়ে দেন। শাহজাহান উজীর খানকে পাটনার সুবাদার নিযুক্ত করে খান দৌরানকে ডেকে পাঠান[৩৮]। এ সময় পারভেজ ঝুসীতে অবস্থান করছেন জেনে খান দৌরান, খাজা উসমানের ভাই খাজা ইবরাহীম, ভাইপো খাজা দাউদ পারভেজকে আক্রমণ করার জন্য শাহজাহানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। শাহজাহান অনুমতি না দিলে এঁরা শাহজাহানের অজান্তে ঝুসী গিয়ে পারভেজের বাহিনীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু খান দৌরান যুদ্ধে নিহত হন, খাজা ইবরাহীম এবং খাজা দাউদ আহত হয়ে খান দৌরানের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে আসেন।[৩৯] এ পর্যায়ে দারাব খানের ষড়যন্ত্রমূলক কয়েকখানি চিঠিও মিরযা নাথনের হস্তগত হয়। দু খানি চিঠি দারাব খানের পিতা খান খানান আবদুর রহীম কর্তৃক দারাব

Edited by Ripon Sarkar

খানের নিকট লিখিত হয়। এ চিঠিগুলি খান খানান শাহজাহানের দরবারে অবস্থানরত দারাব খানের প্রতিনিধির নিকট পাঠান এবং প্রতিনিধি এটা দারাব খানের নিকট পাঠান আর একখানি চিঠি দারাব খান ঢাকা থেকে তাঁর প্রতিনিধির নিকট লিখেন। মিরযা নাথন চিঠিগুলি শাহজাহানের নিকট পাঠিয়ে দেন।[৪০] শাহজাহান দারাব খানকে ডেকে পাঠান এবং আদেশ দেন যে তিনি যেন তাঁর ছেলেকে ঢাকার দায়িত্ব দিয়ে নিজে দরবারে চলে আসেন। কিন্তু দারাব খান মগ আক্রমণের অজুহাত দিয়ে দরবারে আসতে বিলম্ব করতে থাকেন এবং তাঁর ছেলেকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈনা এবং দুশ রণতরীসহ শাহজাহানের নিকট পাঠিয়ে দেন।[৪১] ইতোমধ্যে খেদমত পরস্ত খান, মীর শামস, মসনদ-ই-আলা মাসুম খান এবং ফিরিঙ্গীরা শাহজাদা পারভেজের সহযোগী রাজা গজ সিংহের বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।[৪২] এ সকল বিচ্ছিন্ন যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষ চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। উভয় পক্ষ টনস্ নদীর তীরে মুখোমুখি হয়ে সমবেত হয়। এ সময় মাসুম খান, পর্তুগীজ ক্যাপ্টেনরা এবং অন্যান্য নৌ-অধ্যক্ষরা মহাবত খানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। তারা মহাবত খানকে জানায় যে সম্রাটের অনুগ্রহের নিশ্চয়তা দেয়া হলে তারা শাহজাহানকে ত্যাগ করে ঢাকায় চলে যাবে এবং সেখানে দারাব খানকে বন্দী করে সুবা বাংলায় তীব্র গোলযোগ সৃষ্টি করবে। মহাবত খান এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন এবং নিজের এবং শাহজাদা পারভেজের দস্তখতে জমিদারদের আশ্বাস দান করেন যে তাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে। এ নিশ্চয়তা পেয়ে জমিদারেরা তাদের লোকজন জড়ো করে দলত্যাগ করে চলে যায়।[৪৩] শাহজাহান সংবাদ পেয়ে ত্বরিত গতিতে রাজমহলে মিরযা নাথন এবং ঢাকায় দারাব খানের নিকট এ কথা জানান এবং তাঁদের নির্দেশ দেন যেন দলত্যাগীদের ধরে তাঁর নিকট পাঠানো হয়। যিনিই তাদের ধরতে পারবেন তাঁকে বাংলা এবং বিহারের সুবাদারী দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। দলত্যাগীরা পাটনায় পৌঁছে শহর এবং বাজারে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং ব্যাপক লুটতরাজ করে। পাটনায় সুবাদার উজীর খান তাদের বাধা দিতে ব্যর্থ হন। মিরযা নাথন শাহজাদার সংবাদ পেয়ে রাজমহল রক্ষা করার কাজে লিপ্ত হন এবং দারাব খানকে সতর্ক করে দেন। দলত্যাগীরা রাজমহলে পৌঁছে রাজমহল শহর ও বাজারও লুট করার চেষ্টা করেন, কিন্তু মিরযা নাথন তিন হাজার অশ্বারোহী, পাঁচ হাজার বন্দুকধারী এবং হাতি নিয়ে তাদের প্রচণ্ড বাধা দিলে দলত্যাগীরা সেখানে সুবিধা করতে পারল না। ফলে তারা রাজমহলে দেরী না করে সম্মুখে (বাংলার দিকে) অগ্রসর হয়। এ সময় মিরযা নাথন তাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং তাদের সম্পূর্ণ অভয় দিয়ে শাহজাহানের নিকট ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু দলত্যাগীদের কিছুতেই ফেরান গেল না, তারা অগ্রসর হয়ে খিজিরপুর পৌঁছে যায় এবং ঢাকা ঘিরে ফেলে।[৪৪]

অবশেষে টনস্ নদীর তীরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের আগে শাহজাহানের সেনাপতিদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। রাজা ভীম তখনই যুদ্ধ শুরু করার প্রস্তাব দেন; কিন্তু প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ খান ফীরুজজঙ্গ বলেন যে সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে তখনই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি প্রস্তাব করেন যে অযোধ্যা হয়ে দিল্লী এবং সেখানে টিকতে না পারলে আবার দাক্ষিণাত্যে ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে; অন্যান্য সেনাপতিরাও আবদুল্লাহ খানের প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু রাজা ভীমের বারবার

Eidited by Ripon Sarkar

[illegible] শাহজাহান টনসের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। সম্রাটের বাহিনীও প্রস্তুত থাকায় ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ১৮শে অক্টোবর তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথমে শাহজাদার সৈন্য সেনার আক্রমণ শুরু করে, শাহজাহানের পক্ষে আবদুল্লাহ খানের সেনার আগের দুর্দশা হয় শেষ পর্যন্ত ফিরোজজঙ্গের সৈন্যরা তাদের অবস্থান থেকে কিছু দূর উঠে দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হয়ে শত্রুদের বাধা দেন। রাজা ভীম নিহত হন এবং সম্মুখ প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে শাহজাহানের গাড়িগুলি পারভেজের দখলে হয়। শাহজাহানের হাতিগুলি শত্রুদের বিরুদ্ধে পাহাড়ের মত দাঁড়ায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরোজজঙ্গ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকায় হাতির যুদ্ধেও কোন সুবিধা হল না। প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ খান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যান এবং বীর সিংহ বুন্দেলার ছেলে পাহাড় সিংহ আত্মসমর্পণ করে। শাহজাহান নিজেও যুদ্ধ করেন, তাঁর ঘোড়া গুলীতে আহত হলে তিনি আর একটি ঘোড়ায় চড়েন, কিন্তু এ ঘোড়াও আহত হয় এবং একজন শত্রু সৈন্য শাহজাহানকে আক্রমণ করে। শাহজাহান তার আক্রমণ প্রতিহত করেন। এ সময় জামাল-উদ-দীন নামক একজন অফিসার এসে শাহজাহানের আক্রমণকারীকে হত্যা করেন। শাহজাহান অক্ষত থাকেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হন।[৪৫]

পরাজিত হয়ে শাহজাহান নিজে রোটাস দুর্গে যান এবং আবদুল্লাহ খান ও অন্যান্যদের পাটনায় যাওয়ার আদেশ দেন। রোটাসে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি পাটনায় আসেন। অন্যদিকে পারভেজ এবং মহাবত খান শাহজাহানের পশ্চাদ্ধাবন করে শোন নদী অতিক্রম করেন এবং শাহজাহানও এই সংবাদ পেয়ে পাটনা ছেড়ে রাজমহলে যাত্রা করেন। তিনি স্থির করেন যে তেলিয়াগড়ে সম্রাটের বাহিনীকে বাধা দেবেন, তাই তিনি তেলিয়াগড় দুর্গ সুরক্ষিত করার জন্য রাজমহলে অবস্থানরত মির্যা মাক্কিকে নির্দেশ দেন। তেলিয়াগড় দুর্গ সুরক্ষিত করা হয়।[৪৬]

শাহজাহান রাজমহলে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং শিকারে মনোনিবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করেন। টনসের যুদ্ধে আবদুল্লাহ খানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন এবং দেরা খান করেওজান এর নিষ্ক্রিয়তা তাঁকে ব্যথিত করে। বেগম মমতাজ মহল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেনঃ "এ দুজন লোক নির্লজ্জ, আপনার সামনে আসার আগে তাদের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা উচিত ছিল। তাঁরা নিজ নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলে আপনার পরাজয় বরণ করতে হত না। তবে আপনার সকল স্থির থাকলে জয় হবেই।"[৪৭] শাহজাহান দেখেন যে তাঁর অনেক সৈন্য তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে, বাংলার জমিদারদের এবং পর্তুগীজদের নৌবাহিনী তাঁকে ত্যাগ করে ঢাকায় চলে গেছে। ঢাকায় দারাব খানও বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মাসুম খান মসনদ-ই-আলা এবং অন্যান্য জমিদারেরা খিজিরপুর থেকে অগ্রসর হয়ে ঢাকা অবরোধ করেন। সিলেট থেকে মির্যা সালেহ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। দারাব খান তখন সম্রাটের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাই তিনি জমিদারদের বাধা দেয়ার চেষ্টা না করে বরং তাদের সঙ্গে যোগ দেন। শাহজাহান রাজমহলে মির্যা মাক্কির নিকট বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং দারাব খানের বিষয়ে জানতে পারেন। রাজমহল থেকে শাহজাহান ঢাকায় দারাব খান, কামরূপে জাহিদ খান এবং শরীফ শাহ যুবায়েরের নিকট ফরমান পাঠান কিন্তু তাঁদের কেউ সাড়া দিল না।[৪৮] অতএব শাহজাহান বুঝতে পারেন যে তেলিয়াগড়ে পারভেজ ও মহাবত খানকে বাধা দিতে

Edited by Ripon Sarkar

পারলেও কোন সুবিধা হবে না কারণ বাংলাদেশ থেকে তাঁর সাহায্য পাওয়ার বিশেষ সুযোগ নেই। তাই তিনি যে পথে এসেছিলেন সে পথে, অর্থাৎ উড়িষ্যার পথে আবার বুরহানপুরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১০৩৪ হিজরীর ১১শে রবিউস আউয়াল (২১শে জানুয়ারি, ১৬২৫ খ্রীঃ) তারিখে শাহজাহান রাজমহল ত্যাগ করেন।[৪৯]

রাজমহল ত্যাগের আগে শাহজাহান সোলায়মানাবাদ এবং জাহানাবাদ[৫০] পরগণার জায়গীরদার সৈয়দ মুবারককে তাঁর জায়গীরে পাঠিয়ে দেন। উড়িষ্যার পথে বুরহানপুরে যাওয়ার সময় শাহজাহানকে জাহানাবাদের পথেই যেতে হবে। তাই তিনি সৈয়দ মুবারককে তাঁর জায়গীরের রাজস্ব আদায় করে নেয়ার নির্দেশ দেন। শাহজাহানের তখন অর্থের প্রয়োজন খুব বেশি; এত দিন বাংলার অর্থে তাঁর যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ হয়। আগেই বলা হয়েছে যে ঢাকায় ইবরাহীম খানের পরিত্যক্ত বিপুল অর্থ তাঁর হস্তগত হয়। টন্সের যুদ্ধের আগেও তিনি বাংলার রাজস্ব থেকে বিপুল অংকের অর্থ লাভ করেন। রাজমহলের সুবাদার মির্যা নাথনই একবার তাঁকে এক সঙ্গে সাত লক্ষ টাকা পাঠান। নগদ অর্থ ছাড়াও খাদ্যশস্য, গোলাবারুদও রীতিমত সরবরাহ করা হয়। মির্যা নাথনের উপর নির্দেশ ছিল ঃ সৈন্যদের রসদ সরবরাহে তিনি যেন অবহেলা না করেন, রোটাস দুর্গে রসদ সরবরাহের জন্যও মির্যা নাথন আদিষ্ট হন। তাছাড়া রাজকীয় রাজস্ব, বারুদ, সীসা এবং লোহাও রীতিমত সরবরাহ করা হত। মির্যা নাথন প্রত্যেক নৌকায় পাঁচশ থেকে এক হাজার মণ করে খাদ্যশস্য পাঠাতেন এবং মোট তিন লক্ষ বিশ হাজার মণ খাদ্যশস্য পাটনায় পাঠান। তাছাড়া চার হাজার মণ বারুদ, আট হাজার মণ সীসা, লোহা এবং পাথরের গোলাও পাঠানো হয়। সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মির্যা নাথন সর্বদা পাঁচশ মণ বারুদ, চার থেকে পাঁচশ মণ সীসা ও লোহা রাজমহলের দুর্গে জমা রাখতেন।[৫১] রাজমহল ত্যাগ করে গেলে এ অর্থ ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। তাই শাহজাহান সৈয়দ মুবারককে বিশেষ করে অর্থ সংগ্রহের জন্য পাঠান। কিন্তু সম্রাট ও যুবরাজের গৃহ যুদ্ধের এবং বিশেষ করে শাহজাহানের পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে বাংলা উড়িষ্যা সীমান্তবর্তী জমিদারেরাও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। বকরা-বরদার জমিদারেরা রাতের অন্ধকারে সৈয়দ মুবারককে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে এবং তাঁর শিবির লুট করে এবং শেষে শাহজাহানের আগমনের আশংকা করে পালিয়ে যায়।[৫২] যা হোক, রাজমহল ত্যাগ করার সময় শাহজাহান গঙ্গার উপরে সদ্য নির্মিত পুলটি ধ্বংস করে দেন এবং দলত্যাগী প্রায় এক হাজার সৈন্যকে হত্যা করার আদেশ দেন।[৫৩]

এক বছরেরও কম সময় বাংলায় শাহজাহানের শাসন স্থায়ী থাকে। তিনি আনুমানিক ১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিকে বাংলার সীমান্তে উপস্থিত হন এবং পরের বছর জানুয়ারি মাসের প্রথমদিকে রাজমহল ত্যাগ করেন এবং ঐ মাসের শেষ দিকে বাংলার সীমান্ত ত্যাগ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে তিনি বাংলার শাসন পুনর্গঠন করেন, বাংলা এবং বাংলার অধীনস্থ এলাকা কামরূপকে চারটি সুবায় ভাগ করেন এবং প্রত্যেক সুবায় শাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাঁর এই নতুন শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। তিনি যে উদ্দেশে শাসন পুনর্গঠন করেন, তাঁর বাংলা ত্যাগ করার আগেই সে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। একমাত্র রাজমহলের সুবাদার ছাড়া আর কেউ শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুগত থাকেনি। শাহজাহান দারাব খানকে ঢাকার সুবাদার নিযুক্ত করেন, কিন্তু দারাব খানের ক্ষমতা অনেক সংকুচিত করে দেন। প্রকৃতপক্ষে দারাব খানের ক্ষমতা পূর্বের সুবাদারদের তুলনায় এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। এ সময়ের বাংলার আভ্যন্তরীণ

Edited by Ripon Sarkar

শাসন সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। যা জানা যায় তা এই যে দারাব খান প্রথম থেকেই শাহজাহানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করেন। মাসুম খান এবং অন্যান্য জমিদার ও পর্তুগীজেরা শাহজাহানকে ত্যাগ করে সমগ্র নৌ-বাহিনী নিয়ে এলে দারাব খানের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও (অবশ্য ইচ্ছা ছিল না) শাহজাহানের সাহায্য করা সম্ভব ছিল না। তিনি নিজেই জমিদারদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আরাকান রাজের মোগল এলাকা আক্রমণ। স্মরণ থাকতে পারে যে শাহজাহান ঢাকা আগমন করলে আরাকানের রাজা শাহজাহানের নিকট উপহারাদি সহ দূত পাঠান। বাহরিস্তানে প্রাপ্ত এ তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করেছি, কিন্তু যেহেতু বাহরিস্তানই একমাত্র সূত্র, সেহেতু বাহরিস্তানের সাক্ষ্য একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। এখানে বাহরিস্তানের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। মিরযা নাথন বলেনঃ[৫৪]

> His Royal Highness sent a valuable dress of honour along with many precious gifts to the Raja of the Mags and a peremptory Farman was issued confirming the sovereignty of his territory and asked him to be firm in his words and to attain eternal glory by helping the state officers at Jahangirnagar.

এই ফরমান জারির কারণ,

আরাকান রাজা প্রতিজ্ঞা করেন যে,

"And with great humility he made a representation that he should be considered as loyal vassal and he swore by God the great that he would serve loyally whenever he would be summoned for any work."

ভাষায় অতিশয়োক্তি বাদ দিলে সাদামাটা কথায় এই দাঁড়ায় যে শাহজাহান এবং আরাকানের রাজা উভয়ে মিত্রতা স্থাপন করেন, কিন্তু এখানে একটা অতিরিক্ত কথা আছে। শাহজাহান আরাকানের রাজ্যে রাজার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন। এখন প্রশ্ন হয়, আরাকান রাজ্যের সীমা কতটুকু? সুলতানী আমল থেকে চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে আরাকানের রাজা, ত্রিপুরার রাজা এবং বাংলার সুলতানের মধ্যে বিরোধ লেগে থাকত, অর্থাৎ তারা প্রত্যেকেই চট্টগ্রামের উপর তাদের সার্বভৌমত্ব দাবি করত। বাংলার সুলতানদের উত্তরাধিকারী হিসেবে মোগল সম্রাটেরাও চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব লাভের চেষ্টা করেন। ইসলাম খান ভুলুয়া জয় করে ফেনী নদী পর্যন্ত মোগল অধিকার বিস্তৃত করেন। কাসিম খান এবং ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ চট্টগ্রাম জয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। সুতরাং শাহজাহান চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব আরাকানের হাতে ছেড়ে দেবেন এমন মনে হয় না। সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা আগেই বলেছি যে এটা একটি কূটনৈতিক তৎপরতা মাত্র।

সুনীতিভূষণ কানুনগো শাহজাহান ও আরাকান রাজের এ কূটনৈতিক তৎপরতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন যে আরাকানের রাজা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে শাহজাহানের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত মোগল এলাকা আক্রমণ করেননি এবং শাহজাহানও তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চট্টগ্রাম আক্রমণ করেননি।[৫৫] কিন্তু

Edited by Ripon Sarkar

একথা সত্য নয় যে মগ রাজা এর পরে মোগল এলাকা আক্রমণ করেননি, যদিও ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দের আগে মোগলরা আর চট্টগ্রাম আক্রমণ করার সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে দারাব খান যখন ঢাকায় সুবাদার এবং সম্রাটের বাহিনী শাহজাহানের সঙ্গে টনস নদীর তীরে যুদ্ধে ব্যস্ত, তখন আরাকানের রাজা ভুলুয়া আক্রমণ করেন। পূর্ববর্তী সুবাদার ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ শাহজাহানকে বাধা দেয়ার জন্য রাজমহলে যাওয়ার সময় ভুলুয়া থানা রক্ষার ব্যবস্থা করে যান এবং মিরযা বাকীকে প্রচুর সৈন্যসহ ফুলছুরিতে পাঠিয়েছিলেন। শাহজাহান শাসন পুনঃবিন্যাসের সময় মিরযা বাকীকে ভুলুয়ার থানাদার পদে বহাল রাখেন। সুতরাং মিরযা বাকী আরাকানীদের বাধা দেন, কিন্তু সুবিধা করতে না পারায় আরাকানীরা মোগল এলাকায় ব্যাপক লুটতরাজ করে ফিরে যায়।[৫৬]

শাহজাহানের অধীনস্থ বাংলার এ স্বল্প সময়ের আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে বলা যায় যে এ সময় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সেনাপতিরা পিতা পুত্রের যুদ্ধের ফলাফলের জন্য আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে এবং সুযোগ বুঝে বিজয়ীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার চেষ্টায় থাকে।

জাহাঙ্গীরের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত

শাহজাহান রাজমহল ছেড়ে চলে যাওয়ার সংবাদ সম্রাটের কাছে গেলে সম্রাট শাহজাদা পারভেজকে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার আদেশ দেন এবং মহাবত খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন। মহাবত খানের প্রকৃত নাম জামানা বেগ এবং পিতার নাম ঘিওয়ার বেগ কাবুলী। তিনি রিজভী সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। ঘিওয়ার বেগ পারস্যের শিরাজ থেকে কাবুল এবং সেখান থেকে দিল্লীতে এসে সম্রাট আকবরের চাকুরি গ্রহণ করেন। জামানা বেগ যুবরাজ জাহাঙ্গীরের অধীনে চাকরি নেন এবং জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করার পরে তাঁকে ব্যক্তিগত বখশীর পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর মনসব বৃদ্ধি করে ১৫০০ তে উন্নীত করেন। ঐ সময়ে তাঁকে মহাবত খান উপাধিও দেয়া হয়।[৫৭] এর পরে তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। যুবরাজ পারভেজের সঙ্গে শাহজাহানের বিরুদ্ধে গমনের এবং যুদ্ধের কাহিনী উপরে বর্ণিত হয়েছে।

ঢাকার মহাবত খানের প্রথম কাজ দারাব খানের মৃত্যুদণ্ড। সম্রাটের আদেশে তিনি দারাব খানকে হত্যা করেন। সম্রাট যখন মহাবত খানের নিকট দারাব খানের উপস্থিতির সংবাদ পান, তখন মহাবত খানকে দারাব খানের শিরশ্ছেদ করে তাঁর মাথা বাদশাহের নিকট পাঠানোর আদেশ দেন। মহাবত খান বাদশাহের আদেশ মত দারাব খানের শিরশ্ছেদ করে তাঁর মাথা সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন।[৫৮] মহাবত খান বাংলার শাসন ব্যবস্থায় মনোযোগ দেয়ার আগেই তাঁর বিরুদ্ধে আবার নূর জাহান তাঁকে শাহজাহানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। নূর জাহানের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মনোনীত যুবরাজ. তাঁর জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসানো। মহাবত খানকে যুবরাজ পারভেজের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে দিয়ে তিনি পারভেজের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে দিয়ে তিনি পারভেজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন, কিন্তু পারভেজের ক্ষমতা বৃদ্ধি হওয়াও তাঁর কাম্য ছিল না। মহাবত খানের মত একজন সেনাপতিকে পারভেজের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার জন্য তাই নূর জাহান এবং তাঁর ভাই আসফ খান মহাবত খানের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনেন। মহাবত খান বাংলায় অধিকৃত হাতিগুলি এবং বাংলার

Edited by Ripon Sarkar

রাজস্বের হিসাব সম্রাটের দরবারে পাঠাননি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে এগুলি আত্মসাতের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরব দস্ত যায়েবকে মহাবত খান কর্তৃক ধৃত হাতিগুলি বাজেয়াপ্ত করতে এবং রাজস্বের সঠিক হিসাব নিতে পাঠানো হয়। আরব দস্ত যায়েবকে নির্দেশ দেয়া হয় যে রাজস্বের হিসাবের গোলমাল দেখা গেলে মহাবত খানকে যেন সুবাদারী থেকে প্রত্যাহারের আদেশ দেয়া হয়।[৫৯] মহাবত খান বুঝতে পারেন যে তিনি এক গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। তিনি হাতিগুলি সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং নিজে সম্রাটের দরবারে চলে যান। সম্রাট তখন লাহোর থেকে কাবুল যাচ্ছিলেন, পথে ঝিলাম নদীর তীরে মহাবত খান সম্রাটকে হস্তগত করেন (বা বন্দী করেন) অতিকষ্টে নূর জাহান সম্রাটকে মুক্ত করেন। মহাবত খান প্রথমে থাট্টায় পলায়ন করেন, পরে শাহজাহানের সঙ্গে মিলিত হন। এ সকল ঘটনা সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পূর্বে কেন্দ্রীয় রাজনীতির অংশ।[৬০]

মহাবত খান সম্রাটের দরবারে যাওয়ার সময় তাঁর ছেলে খানজাদ খানকে বাংলার রেখে যান। খানজাদ খান ছিলেন অল্প বয়স্ক, অলস এবং আমোদপ্রিয়। মোল্লা মুরশিদ এবং হাকিম হায়দর নামক তাঁর দুজন অনুগৃহীত অফিসার ছিলেন। খানজাদ খান তাঁদের হাতে শাসন ভার ছেড়ে দেন। আরাকানের মগ রাজা এ সময় বাংলা আক্রমণ করেন। মোগলরা এ আক্রমণ বাধা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আরাকানের ইতিহাসে এ মগ আক্রমণের সামান্য উল্লেখ আছে। এ.পি. ফেয়ার এবং জি.ই. হার্ভের বার্মার ইতিহাসে তাই এ অভিযানের উল্লেখমাত্র পাওয়া যায়। কিন্তু ফতিয়া ইবরীয়াতে দেখা যায় যে আরাকানীরা সীমান্ত অতিক্রম করে খিজিরপুরে আসে এবং ঢাকা অবরোধ করে। খানজাদ খান, এবং তাঁর দুজন অনুগৃহীত মোল্লা মুরশিদ এবং হাকিম হায়দর শত্রুদের বাধা দি' পরাজিত হয় এবং পালিয়ে যায়। আরাকানীরা ঢাকায় ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে লুটপাট করে এবং অনেক লোক বন্দী করে নিয়ে ফিরে যায়।[৬১] হার্ভে বলেন যে খানজাদ খান এত ভয় পেয়ে যান যে তিনি কিছুদিন ঢাকা ছেড়ে গিয়ে একটি দ্বীপে বাস করেন।[৬২] ফতিয়া ইবরীয়ায় বলা হয় যে ভবিষ্যৎ মগ আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য খানজাদ খান নদীতে লোহার জাল দিয়ে মগদের রণতরীর পথে বাধা দান করেন। ফতিয়ার লেখক শিহাব-উদ-দীন তালিশ ব্যঙ্গ করে বলেন যে যুদ্ধ করা মোল্লা ও হাকিমের কাজ নয়।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এই শেষ মগ আক্রমণ। হার্ভের মতে এটা ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা,[৬৩] মনে হয় এ সালের বর্ষা মৌসুমে মগ আক্রমণ সংঘটিত হয়। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও তাই মনে করেন।[৬৪] মগরা যেভাবে ঢাকায় ঢুকে অগ্নিসংযোগ করে এবং লুটপাট করে তাতে বাংলার তৎকালীন শাসকদের সীমাহীন দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। এ দুর্বলতার প্রধান কারণ নূর জাহান চক্রের ষড়যন্ত্রের ফলে প্রথমে যুবরাজ শাহজাহান এবং পরে মহাবত খানের বিদ্রোহের ফলে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে গোলযোগ। মহাবত খান ঢাকায় উপস্থিত থাকলে মগদের ঢাকা পর্যন্ত উপস্থিতি সম্ভব হত না। ইসলাম খান, কাসিম খান এবং ইবরাহীম খানের সময়ে এটা ছিল অকল্পনীয়।

মহাবত খান বিদ্রোহ করলে খানজাদ খানকে প্রত্যাহার করা হয় এবং মুকাররম খানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। মুকাররম খান আগে থেকেই বাংলার সঙ্গে

Edited by Ripon Sarkar

পরিচিত ছিলেন। তাঁর বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে তাঁর জীবন কাহিনী নিম্নরূপ। তিনি ছিলেন শয়খ সলীম চিশতীর প্রপৌত্র, শয়খ বায়েজীদ মুয়াজ্জম খানের পুত্র এবং সুবাদার ইসলাম খানের জামাতা। ইসলাম খানের সময়ে তিনি কামরূপের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। তিনিই কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। কাসিম খানের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করা হয় এবং পরে দিল্লীর সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। তিনি আনুমানিক ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অল্প কিছুদিন পরে, আনুমানিক পরের বছর, ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে মৃত্যুবরণ করেন।[৬৫] এ অল্প সময়ের সুবাদারী আমলের কোন ইতিহাস জানা যায় না। এ সময় একদিন সম্রাটের ফরমান এলে তিনি ফরমান গ্রহণ করার জন্য নৌকা যোগে অগ্রসর হন।[৬৬] বিকালের নামাজের (আছরের নামাজের) সময় হওয়ায় তিনি নামাজ পড়ার জন্য নৌকা তীরে ভিড়ানোর আদেশ দেন। মাঝিরা নৌকা তীরে নেয়ার চেষ্টা করলে নৌকা ভেসে যায় এবং প্রচণ্ড ঝড় ও ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা ডুবে যায়। সঙ্গী সাথীসহ মুকাররম খানও পানিতে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেন।[৬৭] ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমদিকে মুকাররম খানের মৃত্যু হয়।[৬৮] কিন্তু ঝড় এবং ঢেউয়ে নৌকাডুবির কথা বলায় মনে হয় ঐ সালের বর্ষার প্রথমেই এ ঘটনা ঘটে।

পরবর্তী সুবাদার ফিদাই খান। তাঁর প্রকৃত নাম মিরযা হেদায়েত উল্লাহ। সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ফিদাই খান উপাধি দেন,[৬৯] এর পরে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন এবং তাঁর মনসবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। মুকাররম খানের মৃত্যুর পরে তাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। নিযুক্তির সময় তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয় যে তিনি যেন সম্রাটের জন্য পাঁচ লক্ষ এবং সম্রাজ্ঞী নূর জাহানের জন্য পাঁচ লক্ষ মোট দশ লক্ষ টাকা প্রতি বছর সম্রাটের দরবারে পাঠান।[৭০] প্রকৃতপক্ষে বাংলার বার্ষিক রাজস্ব অনেক বেশি হলেও এ পর্যন্ত সম্রাটের নিকট বার্ষিক রাজস্ব পাঠানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে সুবাদারেরা প্রায় সময় বাংলা থেকে মূল্যবান উপহারাদি এবং হাতি সম্রাটের নিকট পাঠাতেন, কিন্তু রাজস্ব হিসেবে কোন অর্থ দেয়ার কথা নেই। গোলাম হোসেন সলীম বলেন যে ইতোপূর্বে বাংলা থেকে শুধু রেশমের দ্রব্যাদি, হাতি, অগুরু কাঠ এবং অন্যান্য উপহার ব্যতীত নগদ অর্থ সম্রাটের নিকট প্রেরিত হত না। ফিদাই খানের নিযুক্তির সময়েই প্রথম নগদ অর্থ পাঠানোর শর্ত দেয়া হয়।[৭১]

ফিদাই খানের সুবাদারী আমল বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কাশ্মীর থেকে লাহোরে ফিরে আসার পথে ১০৩৭ হিজরীর ২৭শে সফর তারিখে (৭ই নবেম্বর ১৬২৭ খ্রিঃ) রাজৌর নামক স্থানে সম্রাট জাহাঙ্গীর মৃত্যুবরণ করেন।[৭২] শাহজাহান তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। এদিকে রাজধানীতে উত্তরাধিকার নিয়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়। নূর জাহান তাঁর জামাতা শাহরিয়ারকে সিংহাসনে বসানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু শাহজাহানের শ্বশুর আসফ খান শাহজাহানকে ত্বরিত গতিতে আগ্রা আসার জন্য সংবাদ পাঠান। উচ্চপদস্থ প্রায় আমীরও শাহজাহানের পক্ষে ছিলেন। অবশেষে নূর জাহানের তৎপরতা নস্যাৎ করে শাহজাহান ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি আগ্রা পৌঁছেন এবং ফেব্রুয়ারির ৪র্থ

Edited by Ripon Sarkar

তারিখে সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৭৩] নতুন সম্রাট শাহজাহান বাংলার সুবাদার ফিদাই খানকে অপসারণ করে কাসিম খান জুয়ুনীকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।[৭৪] এভাবেই শেষ হয় বাংলায় মোগল আমলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

১। ফিদাই খানের ভাই মুখলিস খান কাসিম খানের সুবাদারীর শেষ দিকে বাংলার দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়া নবিশ পদে নিযুক্ত হন। ইবরাহীম খানের সময়ে ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে প্রত্যাহার করা হয় এবং যুবরাজ পারভেজের দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। (তুযুক, ২য়, ১০৪, ১০৬)। এ সময় তিনি পাটনায় ছিলেন। পাটনা যুবরাজ পারভেজের জায়গীর হওয়ায় মুখলিস খান পাটনা দুর্গের রক্ষক ছিলেন।

২। বাহরিস্তান, ২য়, ৭০১-২।

৩। ঐ, ৭০২-৭০৭।

৪। সরাই পাখারি বর্তমানে চিহ্নিত করা যায় না, তবে বিবরণে মনে হয় এটা পাণ্ডুয়ার নিকটে হবে।

৫। সরকার লখনৌতির একটি মহালের নাম দিহিকোট। শায়খ নূর কুব আলমের জন্য দেখুন, আব্দুল করিমঃ সোশ্যাল হিষ্টরি, ২য় সংস্করণ, ১৩৬-৩৯।

৬। বাহরিস্তান, ২য়, ৭০৭-৭০৯।

৭। রিয়াজ, ১৯৩।

৮। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২২২।

৯। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন যে শাহজাহান মে মাসের প্রথম দিকে ঢাকা পৌছেন। এইচ. বি. ২য়. ৩১০।

১০। মাসির-উল-উমারা, ১ম, ৬৫৯।

১১। রিয়াজ, ১৯৫। বেণী প্রসাদ (হিষ্টরি অব জাহাঙ্গীর, ৩৪৯) বলেন যে ঢাকায় ইবরাহীম খানের পঁচিশ লক্ষ টাকা, জালাইর খানের পাঁচ লক্ষ টাকা, পাঁচশ হাতি, চারশত ঘোড়া, মূল্যবান কাপড় চোপড়, মূল্যবান অগুরু কাঠ, এবং নৌ-বাহিনী ও কামান গোলা ইত্যাদি শাহজাহানের হস্তগত হয়।

১২। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী (২২১-২২) এলিয়ট এ্যাণ্ড ডউসনঃ হিষ্টরি অব ইন্ডিয়া এজ টোল্ড বাই ইটস ওন হিষ্টরিয়ানস, (ভল্যুম ৬, ৪১০) এবং ইকবালনামার অনুসরণে বেণী প্রসাদ (হিষ্টরি অব জাহাঙ্গীর, ৩৪৯) বলেন যে ঢাকা বিজিত হওয়া পর্যন্ত দারাব খান বন্দী ছিলেন। তিনি আনুগত্যের শপথ করায় এবং তাঁর স্ত্রী, ছেলে এবং ভাইপোকে (শাহনওয়াজ খানের ছেলে) জিম্মি রেখে শাহজাহান তাঁকে বাংলার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কিন্তু বাহরিস্তানের বিবরণে এটা ভুল প্রমাণিত হয়। বাহরিস্তানে দেখা যায় যে দারাব খান ইবরাহীম খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। (বাহরিস্তান, ২য়, ৬৯৪-৯৫)।

১৩। মির্যা মুলকী এবং খাজা মুলকী বোধ হয় একই লোক। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দের শেষ দিকে সম্রাট জাহাঙ্গীর খাজা মুলকীকে বাংলার বখশী নিযুক্ত করে পাঠান (তুযুক, ১ম, ৩২২)। এখন দেখা যায় যে তিনি শাহজাহানের পক্ষ অবলম্বন করেন।

১৪। বাহরিস্তান, ২য়, ৭০৯-৭১১।

১৫। ঐ, ৭১২।

১৬। ঐ, ৭২৮।

১৭। আবদুল করিমঃ বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), ১৩৬, ৩৬৫-৩৬৬।

১৮। জি. ই. হার্ভেঃ হিষ্টরি অব বার্মা, ১৪৪-৪৫।

১৯। বাহরিস্তান, ২য়, ৭১০-১১।

Edited by Ripon Sarkar

২০। এইচ. বি. ২য়, ৩১১।

২১। কদম রসূল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবদুল করিমঃ সোশ্যাল হিস্টরি অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২২৩-২২৬।

২২। মাসুম খান কাবুলী আকবরের সেনাপতি ছিলেন, তিনি আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ঈসা খান মসনদ-ই-আলার সঙ্গে যোগ দিয়ে আকবরের বিরুদ্ধে আক্রমণ যুক্ত করেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২৩। বাহারিস্তান, ২য়, ৭১০।

২৪। ঐ, ৭১১-৭১২।

২৫। ঐ ৭১২, ৭১৮-১৯।

২৬। বিখ্যাত সূফী শয়খ শরফ-উদ-দীন ইয়াহয়া মানেরী এবং মানের সম্পর্কে দেখুন, বাহারিস্তান, ২য়, ৮৫৮, টীকা ১৩; আবদুল করিমঃ সোস্যাল হিস্টরি অব দি মুসলিমস্ ইন বেঙ্গল, ২য় সংস্করণ, ১২৯।

২৭। ভারতের উত্তর প্রদেশের গোমতী নদী সুলতানপুর এবং জৌনপুরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বারানসীর দক্ষিণ-পূর্বে সৈয়দপুরের নিকটে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

২৮। বাহারিস্তান, ২য়, ৭২১-৭৩০।

২৯। ঐ, ৭৩০-৩১।

৩০। তিনি ছিলেন গহড়ওয়াল রাজপুতদের বুন্দেলা গোত্রের লোক। বীর সিংহ বুন্দেলা সম্রাট আকবরের রাজত্বের শেষ দিকে যুবরাজ সেলিম জাহাঙ্গীরের প্ররোচনায় ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করেন। জাহাঙ্গীর সিংহাসনে বসে এই কাজের জন্য বীর সিংহকে সম্মানিত করেন এবং তা তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে অকপটে লিখেন। (তুযুক, ১ম, ২৪-২৫)।

৩১। বাহারিস্তান, ২য়, ৭৩১-৭৩২।

৩২। বাহাদুরপুর কুসী থেকে বত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।

৩৩। দুরজিসুজ বোধ হয় ডি. সুজা নামক পর্তুগীজ ক্যাপ্টেন।

৩৪। বাহারিস্তান, ২য়, ৭৩৩-৭৩৪।

৩৫। ঐ, ৭৩৪-৭৩৫।

৩৬। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২৩২; রিয়াজ, ১৯৮।

৩৭। বাহারিস্তান, ২য়, ৭৩৬।

৩৮। ঐ, ৭৩৭-৭৩৮।

৩৯। ঐ, ৭৩৮-৩৯।

৪০। ঐ, ৭৩৯।

৪১। ঐ, ৭৪৯, ৭৭১-৭৭২।

৪২। ঐ, ৭৪৩।

৪৩। ঐ, ৭৪৯-৫০।

৪৪। ঐ, ৭৫০-৭৫৪।

৪৫। ঐ, ৭৫৪-৬২। বেণী প্রসাদ বা বানারসী প্রসাদ সাকসেনা (যথাক্রমে জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের ঐতিহাসিক) কেউ এ যুদ্ধের তারিখ দেননি। কারণ সমসাময়িক লিখিত ইতিহাসে

Edited by Ripon Sarkar

এর তারিখ নেই। একমাত্র বাহরিস্তানেই এ তারিখ পাওয়া যায়। এ তারিখ সঠিক বলেই মনে হয়, কারণ এ তারিখ অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

৪৬। ঐ, ৭৬২-৬৫।

৪৭। ঐ, ৭৬৩-৭৬৪।

৪৮। ঐ, ৭৬৬-৬৭, ৭৭১-৭২, ৭৮১।

৪৯। ঐ, ৭৮৩। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে শাহজাহান ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে রাজমহল আসেন এবং চব্বিশ দিন সেখানে অবস্থানের পরে রাজমহল ত্যাগ করেন (এইচ. বি. ২য়, ৩১৩), কিন্তু বাহরিস্তানে শাহজাহানের রাজমহল ত্যাগের তারিখ ২২শে রবিউল আউয়াল, অর্থাৎ ৩রা জানুয়ারি, সাল অবশ্যই ১৬২৫ খ্রিঃ।

৫০। জাহানাবাদ হুগলী জেলায়।
সেলায়মানাবাদও জাহানাবাদের নিকটস্থ একটি পরগণা।

৫১। বাহরিস্তান, ২য় ৭৪০-৪১।

৫২। ঐ, ৭৭২।

৫৩। ঐ, ৭৮৪-৮৫।

৫৪। ঐ, ৭১১।

৫৫। সুনীতিভূষণ কানুনগোঃ এ হিস্টি অব চিটাগাং ভল্যুম ১, ২৭০-৭১।

৫৬। ফতিয়া ইবরীয়া, বর্ধিত অংশ, ১৭৬ ক। ডঃ সুনীতিভূষণ কানুনগো এ তথ্য লক্ষ্য করেননি। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বাহরিস্তানকেও এ তথ্যের সূত্র রূপে উল্লেখ করেন (এইচ. বি. ২য়, ৩১২), কিন্তু বাহরিস্তানে এ তথ্য পাওয়া যায় না। বাহরিস্তানে শুধু বলা হয় যে দারাব খান মগ আক্রমণের অজুহাত দেখিয়ে শাহজাহানের সঙ্গে দেখা করতে যাননি।

৫৭। তুযুক, ১ম, ২৪।

৫৮। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২৩৯-৪০। রিয়াজ, ২০৩। দারাব খান শাহজাহানের নিকট ফেরত গেলে হয়ত একই শাস্তি পেতেন।

৫৯। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২৫২-৫৩; রিয়াজ, ২০৩।

৬০। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, বেণী প্রসাদঃ হিস্টরি অব জাহাঙ্গীর, ৩৬৮-৩৮৫।

৬১। ফতিয়া ইবরীয়া, দেখুন, প্রবাসী, ১৩২৯-৬৬৯।

৬২। হার্ভেঃ হিস্টরি অব বার্মা, ১৪৩।

৬৩। ঐ।

৬৪। এইচ. বি. ২য়. ৩১৪, টিকা।

৬৫। গোলাম হোসেন সলীম বলেন যে মুকাররম খান ১০৩০ হিজরী বা ১৬২০-২১ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন (রিয়াজ, ২০৭) কিন্তু এ তারিখ গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ সময়ে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ বাংলার সুবাদার ছিলেন।

৬৬। তখন সম্রাটের ফরমান গ্রহণের জন্য কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার রেওয়াজ ছিল। এভাবে অফিসারেরা সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। এতেই মোগল সম্রাটের দাপট বুঝা যায়।

৬৭। রিয়াজ, ২০৭।

Edited by Ripon Sarkar

৬৮। এইচ. বি. ২য়. ৩১৪।

৬৯। তুযুক ১ম, ৩৮৩।

৭০। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২৯১; রিয়াজ, ২০৮।

৭১। রিয়াজ, ২০৮।

৭২। ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, ২৯৪। বেণী প্রসাদ (হিস্টরি অব জাহাঙ্গীর, ৩৯৮) ১০৩৭ হিজরীর ২৭শে সফর লিখলেও ইংরেজি তারিখ দিয়েছেন ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর; বানারসী প্রসাদ সাকসেনা (হিস্টরি অব শাহজাহান অব দিল্লী, ৫৬) দিয়েছেন ২৯শে অক্টোবর এবং সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এইচ. বি. ২য়, ৩১৪) সাকসেনাকে অনুসরণ করেছেন।

৭৩। বানারসী প্রসাদ সাকসেনাঃ হিস্টরি অব শাহজাহান অব দিল্লী, ৬৩।

৭৪। ঐ, ৬৪।

Edited by Ripon Sarkar

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উপসংহার

বাংলার শেষ আফগান সুলতান দাউদ খান কররানী পরাজিত ও নিহত হলে বাংলায় মোগল অধিকারের সূচনা হয়। কিন্তু আফগান রাজশক্তির পতন হলে আফগান সেনানায়ক এবং বাংলার ভূঁঞা জমিদার ও সমস্ত প্রধানেরা মোগল শাসন মেনে না নিয়ে ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ফলে সম্রাট আকবর সেনাপতির পর সেনাপতি পাঠিয়ে বাংলা জয়ের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে বাংলায় নিযুক্ত মোগল সেনানায়কেরাও আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং মোগল শক্তির অবসান ঘটিয়ে অল্প দিনের জন্য পাল্টা সরকার গঠন করে আকবরের ভাই মির্যা হাকিমের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে।[১] বিদ্রোহী মোগল সেনানায়কেরা অবশ্য পরাজিত হয় কিন্তু তাদের কেউ কেউ যেমন, মাসুম খান কাবুলী বাংলার ভূঁঞা জমিদারদের, বিশেষ করে বার-ভূঁঞার সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রতিরোধ জোরদার করে। মাসুম খান কাবুলী আমৃত্যু আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর প্রধান সহযোগী ছিলেন ঈসা খান মসনদ-ই-আলা। অল্পদিনের ব্যবধানে উভয়ের মৃত্যু হলে মাসুম খানের ছেলে মির্যা মুমিন ঈসা খানের ছেলে মুসা খানের সঙ্গে যোগ দেন। আকবরের মৃত্যু পর্যন্ত বাংলায় প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে এবং বাংলা জয় সমাপ্ত হওয়ার আগেই সম্রাট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আকবরের সময় বাংলার শুধু পশ্চিম অংশ যেমন ঘোড়াঘাট থেকে দক্ষিণে বগুড়ার শেরপুর মুর্চা হয়ে উত্তরবংগ মোগলদের অধিকারে যায়। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য মোগলদের অনুগত থাকায় দক্ষিণ বঙ্গের পশ্চিমাংশও মোগলদের অধিকারে ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের কোন কোন ভূঁঞা জমিদার সুযোগ পেলেই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে।

মোগলরা প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশ জয় করে জাহাঙ্গীরের আমলে। সুবাদার ইসলাম খান চিশতী নতুন উদ্যমে এবং নতুন পরিকল্পনায় অগ্রসর হয়ে চট্টগ্রাম ছাড়া সারা বাংলা অধিকার করেন, এমনকি সীমান্তবর্তী রাজ্য কাছাড়, কামতা এবং কামরূপও জয় করেন। ইসলাম খানের সাফল্যের প্রধান কারণ, নৌ-বাহিনী শক্তিশালী করে এর পুনর্গঠন, ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর, যুদ্ধের নিখুঁত পরিকল্পনা এবং তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং পরাজিত ভূঁঞা-জমিদারদের দ্বিতীয়বার শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ না দেয়া। এর সঙ্গে যোগ হয় তাঁর প্রতি সম্রাটের আস্থা এবং তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সম্রাটের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা। ইসলাম খান ইহতিমাম খান নামক একজন সুদক্ষ এ্যাডমিরালের অধীনে নৌ-বাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং শক্তিশালী করেন। বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোগল নৌ-বাহিনী অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেয়। আকবরের সেনাপতিরা তাঁড়া বা রাজমহল থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তারা পরাজিত ভূঁঞা-জমিদারদের তাদের স্ব স্ব এলাকায় পুনর্বহাল করত এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে রাজধানীতে ফিরে যেত। ফলে পরাজিত ভূঁঞা-জমিদারেরা সুযোগ পেলেই শক্তি সঞ্চয় করে আবার গোলযোগ সৃষ্টি করত। কিন্তু ইসলাম খান এ নীতিপরিবর্তন করেন। তিনি রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করে বার-ভূঁঞার শক্তির কেন্দ্রস্থলে অবস্থান নেন এবং বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তাছাড়া তিনি পরাজিত বা আনুগত্য প্রদর্শনকারী ভূঁঞা-জমিদারদের স্ব

Edited by Ripon Sarkar

র জমিদারীতে ফিরে যেতে দেননি, হয় তাদের নযরবন্দী করে রাখেন বা তাদের মোগল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করেন। জমিদারদের রণতরীগুলি মোগল নৌ-বাহিনীর অধীনস্থ করে নেয়া হয়। ইসলাম খানের যুদ্ধের পরিকল্পনাও ছিল নিখুঁত এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অপূর্ব। তিনি শত্রুদের এক এক করে পরাজিত করেন, তাদের একতাবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেননি। যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় থেকে যুদ্ধ জয় না হওয়া পর্যন্ত তিনি সৈন্য ও নৌকা গণনার ব্যবস্থা করে, সেনাপতিদের বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে এবং মাঝে মাঝে অতিরিক্ত সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ জয় নিশ্চিত করতেন। এরূপ দক্ষতা অন্য সুবাদারদের মধ্যে দেখা যায় না। ইসলাম খান এমন চূড়ান্তভাবে ভূঁএগ্র জমিদার এবং সামন্ত প্রধানদের ক্ষমতা খর্ব করেন যে বাংলার কোন ভূঁএগ্র জমিদার বা সামন্ত প্রধান আর মাথা তুলতে পারেনি। মুসা খান মসনদ-ই-আলা বেশ কিছুদিন নযরবন্দী থাকেন, তাঁর ভাই এবং অন্যান্য ভূঁএগ্রদের মোগল বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়, তারা মোগলদের পক্ষ হয়ে মোগলদের বিজয়ে সাহায্য করে। মুসা খানের চাচাত ভাই আলাওল খান এবং বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার খান আবার বিদ্রোহের চেষ্টা করলে তাঁদের অন্ধ করে দেয়া হয় এবং রোটাস দুর্গে পাঠানো হয়।[২] পরে ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ মুসা খানকে মুক্তি দিলে তিনিও মোগলদের পক্ষে কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নেন এবং কৃতিত্বের পরিচয় দেন। খাজা উসমানের ভাই খাজা ওয়ালী এবং ছেলে খাজা মুমরিজকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু খাজা উসমানের অন্য ভাই এবং ভাইপো মোগল বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়। যুবরাজ শাহজাহান বিদ্রোহ করলে খাজা উসমানের ভাই খাজা ইবরাহীম এবং ভাইপো খাজা দাউদকে শাহজাহানের বাহিনীতে দেখা যায়।[৩] ভূষণার শত্রুজিত সারাজীবন মোগল বাহিনীতে থেকে যুদ্ধ করেন, তিনি কামরূপে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন, শাহজাহানের বিদ্রোহ পর্যন্ত এবং পরেও তাঁকে কামরূপে দেখা যায়। ফতহাবাদের মজলিশ কুতুবকে মোগল বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। তাঁর রণতরীগুলি মোগল নৌ-বাহিনীতে যুক্ত করা হয়, কিন্তু পরে মজলিশ কুতুব সম্পর্কে আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বার-ভূঁএগ্রর অন্যদের মোগল বাহিনীতে যুক্ত হয়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশে নিতে দেখা যায়। যুবরাজ শাহজাহান ঢাকায় এলে মুসা খানের ছেলে মাসুম (ইতোপূর্বে মুসা খানের মৃত্যু হয়) খান এবং অন্যান্য জমিদারদের তাঁর দলে যোগ দিতে বাধ্য করেন এবং নৌ-বাহিনীসহ বারানসী পর্যন্ত নিয়ে যান। কিন্তু জমিদারেরা দলত্যাগ করে নৌবহরসহ ঢাকায় পালিয়ে আসেন এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন। বাকলার রাজা রামচন্দ্রকে ঢাকায় নযরবন্দী করে রাখা হয়। পরে তাঁর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্যের পরাজয়ের পরে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর ছেলেদের বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়, পরে দিল্লীতে পাঠানো হয়। প্রতাপাদিত্যের নাম ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। তাঁর ছেলেদের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়,[৪] কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। আলাইপুরের ইলাহ বখশ বিদ্রোহ করে পরাজিত হন, পরে তার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না; চিলাজোয়ারের পীতাম্বর ও অনন্ত বশ্যতা স্বীকার করে জমিদারী রক্ষা করেন।[৫] বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাচেটের শামস খান এবং হিজলীর সলীম খান ইসলাম খানের সময়ে বশ্যতা স্বীকার করেন, কাসিম খানের সময়ে তাঁরা আবার বিদ্রোহ করার চেষ্টা করলে তাঁদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। ইবরাহীম খানের সময়ে হিজলীর বাহাদুর খান বিদ্রোহ করলে তাঁকে বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়। সিলেটের

Edited by Ripon Sarkar

বায়েজীদ কররানী ও তাঁর ভাইদেরও বন্দী করা হয়। খাজা উসমানের ভাই ও ছেলের সঙ্গে তাদেরও সম্রাটের নিকট পাঠানো হয়, এর পরে তাঁদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এভাবে ভূঁঞা জমিদার এবং আফগানদের একে একে দমন করা হয়। সীমান্তবর্তী রাজাদের বেলায়ও একই নীতি গ্রহণ করা হয়। কাছাড়ের রাজা শত্রুদমন বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর সিংহাসন রক্ষা করেন, কিন্তু কামতার রাজা লক্ষী নারায়ণ এবং কামরূপের রাজা পরীক্ষিত নারায়ণকে বন্দী করে সম্রাটের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হয়। রাজা লক্ষী নারায়ণকে পরে মুক্তি দেয়া হয় এবং তিনি করদ রাজারূপে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। রাজা পরীক্ষিতকেও মুক্তি দেয়া হয়, কিন্তু তিনি কামরূপে ফিরে যেতে পারেননি। তাঁর পরিণাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। এক সূত্রে তাঁকে পুনরায় দিল্লী নিয়ে যাওয়ার পথে তিনি আত্মহত্যা করেন।[৬] সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ প্রথম থেকেই মোগলদের অনুগত থাকেন। তিনি ইসলাম খানকে যুদ্ধে সহায়তা করেন; এবং তাঁর পরামর্শে ইসলাম খান বেশ সুফল লাভ করেন। তাঁকেও শেষ পর্যন্ত মোগলদের অনুগত থাকতে দেখা যায়।

ইসলাম খান চিশতীর বিজয়ের পরে অন্যান্য সুবাদারেরা সীমান্ত আর বিশেষ বাড়াতে পারেননি; শুধু সুবাদার ইব্রাহীম খান ত্রিপুরা জয় করেন কিন্তু ত্রিপুরা বিজয় স্থায়ী হয়নি। সুতরাং সুবা বাংলার সীমান্ত ইসলাম খানের সময় যতটুকু বিস্তৃত হয়, জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত সেই সীমান্তই বজায় থাকে। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে ইসলাম খানের বিজয়ের পূর্ণ বিবরণ নেই, থাকার কথাও নয়, কিন্তু তুজুক বার-ভূঁঞার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা একেবারে বাদ পড়াটা বিস্ময়কর। আকবরনামায় বার-ভূঁঞা ও ভূঁঞা প্রধান ঈসা খান মসনদ-ই-আলার যুদ্ধের কথা স্থান পেয়েছে; আকবরনামায় মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকলেও তাঁর সাহস ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু তুজুকে বার-ভূঁঞার কোন উল্লেখ নেই, শুধু খাজা উসমানের যুদ্ধ ও পতনের নাতিদীর্ঘ বিবরণ আছে। তুজুকের অনুসরণে রিয়াজ-উস-সলাতীনেও খাজা উসমানের যুদ্ধের কথা আছে, বার-ভূঁঞার কথা নেই। কিন্তু মির্যা নাথনের বাহারিস্তান-ই-গায়বী এবং আবদুল লতীফের ভ্রমণ কাহিনী বা ডায়েরীতে বার-ভূঁঞাকেই মোগলদের প্রধান শত্রুরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মির্যা নাথন এবং আবদুল লতীফ উভয়েই ইসলাম খানের সহযাত্রীরূপে রাজমহল থেকে যাত্রা করেন এবং উভয়েই বলেছেন যে ইসলাম খানের লক্ষ্যস্থল ছিল ভাটি এবং উদ্দেশ্য ছিল ভাটির মুসা খান ও বার-ভূঁঞাকে দমন করা। অতএব আকবরের সময় থেকে জাহাঙ্গীরের সময় পর্যন্ত বার-ভূঁঞাই ছিল বাংলায় মোগল বিজয়ের প্রধান অন্তরায়, এবং ইসলাম খান চিশতী বার-ভূঁঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রথমে তাদের বিরুদ্ধেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। পূর্ববর্তী ঐতিহাসিকেরা বার-ভূঁঞার পরিচয় দিতে পারেননি। কারণ তাঁরা সারা বাংলায় বার-ভূঁঞা খুঁজেছেন। কিন্তু বার-ভূঁঞা ছিল ভাটির লোক, ঢাকা-ময়মনসিংহের নিম্নাঞ্চল নিয়ে ভাটি গঠিত ছিল। ভাটিতে আমরা আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ের বার-ভূঁঞার পরিচিতি পেয়েছি।

ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেনঃ "He (Khwaja Usman) proved to be the most valiant and redoubtable champion of Afghan independence, and, as such the most formidable enemy of the Mughal peace in Bengal."

Edited by Ripon Sarkar

খাজা উসমান অবশ্যই একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং মোগলদের বিরুদ্ধে এমন তীব্র যুদ্ধ করেন যে প্রকৃতপক্ষে দৌলম্বপুরের যুদ্ধে তিনি মোগল বাহিনীকে পরাজিত করেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বিজয় পরাজয়ে পরিণত হয়। কিন্তু তাঁর এবং বার-ভূঁএগার মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। দাউদ খানের পতনের পরে কতলু লোহানীর অধীনে আফগানেরা উড়িষ্যায় সমবেত হয়, খাজা উসমানের পিতা ঈসা খান মিয়া খেলও তাঁর পুত্রদের নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। রাজা মানসিংহের ভুল নীতির ফলে খাজা উসমান বাংলায় আসেন। মানসিংহ খাজা উসমানেরা পাঁচ ভাইকে বাংলায় নির্বাসনের আদেশ দেন।[৭] কিন্তু অল্প পরে মানসিংহ বুঝতে পারেন যে তিনি ভুল করেছেন, বিদ্রোহী আফগানেরা বাংলায় গিয়ে আরও বেশি উৎপাত করবে। কিন্তু ইতোমধ্যে আফগানরা তাঁর নাগালের বাইরে গিয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছে। খাজা সোলায়মান, খাজা উসমান, খাজা ওয়ালী, খাজা মালহী, এবং খাজা ইবরাহীম তারা এই পাঁচ ভাই বাংলায় আসেন। ইতোমধ্যে বড় ভাই খাজা সোলায়মানের মৃত্যু হয়। অন্য চার ভাই ময়মনসিংহের গৌরীপুর থানার নিকটে বুকাইনগরে পৌছেন এবং সেখানে দুর্গ নির্মাণ করে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকেন। বাংলায় খাজা উসমানের রাজ্য বুকাইনগরের চতুর্দিকে সীমাবদ্ধ ছিল। সিলেটের আফগান নেতা বায়েজীদ কররানী এবং বানিয়াচঙ্গের জমিদার আনোয়ার খানের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। ভূঁএগা প্রধান ঈসা খানের সঙ্গেও তাঁর ভাল সম্পর্ক ছিল, কিন্তু মুসা খানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর স্বদেশপ্রেম বার-ভূঁএগাদের মত গভীর ছিল না। কারণ বুকাইনগরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অতি অল্প দিনের। মোগলদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধের প্রধান কারণ মোগলদের প্রতি আফগানদের জাত-ক্রোধ। আফগানরা মোগলদের নিকট সাম্রাজ্য হারানোর পরে অনেকদিন ধরে মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায়। কিন্তু তবুও ইসলাম খান চিশতী রাজমহল থেকে ভাটি আসার পথে খাজা উসমান ইসলাম খানের নিকট দূত পাঠিয়ে আনুগত্য স্বীকার করেন। "২রা জানুয়ারি ১৬০৯ খ্রিঃ নবাব ইসলাম খাঁর দূত মির্জা আলীর সহিত উসমান আফগানের দূত আসিয়া সুবাদারের সাক্ষাৎ করিল। উসমান বশ্যতা স্বীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করিয়া এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য উপহার পাঠাইবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন।"[৮] এ তথ্য আবদুল লতীফের ডায়রী ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এ তথ্য ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় তিনি খাজা উসমানকে "most formidable enemy of the Mughal peace in Bengal" বলেছেন।[৯] খাজা উসমান দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন, মোগল সেনাপতি গুজাত খানের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে নিজের জীবন দান করেন। কিন্তু মোগলদের formidable enemy ছিলেন মুসা খান ও বার-ভূঁএগা। বার-ভূঁএগারা প্রকৃতপক্ষেই স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই মোগলদের বাধা দেন, যুদ্ধের আগে তাঁরা কেউ ইসলাম খানের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করেননি। মোগলদের তুলনায় তাদের ধনবল জনবল ছিল অতি নগণ্য। তাঁদের না ছিল হাতি, না ছিল পর্যাপ্ত গোলাবারুদ। শুধু রণতরী নিয়েই তাঁরা অদম্য মনোবল নিয়ে যুদ্ধ করেন। তা সত্ত্বেও তাঁরা মোগল বাহিনীকে কয়েকবার শোচনীয় অবস্থায় ফেলে দেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে মোগলদের চূড়ান্ত যুদ্ধ একদিনে শেষ হয়, কিন্তু বার-ভূঁএগারা এক বছরেরও বেশি কাল যুদ্ধ করেন এবং এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁদের নৌ-যুদ্ধের বিবরণ পাঠে ধারণা করা যায় যে পর্যাপ্ত অর্থবল থাকলে তারা আরও

Edited by Ripon Sarkar

অনেকদিন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতেন। খাজা উসমানের ছিল স্বাধীনতা-প্রেম, বার-ভূঁঞার স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রেম দুইই ছিল।

বার-ভূঁঞার মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার ছিলেন। হিন্দুদের মধ্যে ছিলেন খালসীর জমিদার মাধব রায় বা মধু রায় এবং চাঁদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায় এঁরা দুজন ডাকছড়ার যুদ্ধে যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করেন এবং মোগলদের সঙ্গে হাতাহাতি যুদ্ধ করেন[১০] তার বিবরণ পড়ে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। ভুলুয়ার রাজা অনন্ত মাণিক্যের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন মিরযা ইউসুফ বারলাস[১১], যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন জামাল খান[১২] এবং ইসলাম খানের নিকট প্রেরিত রাজা লক্ষ্মী নারায়ণের দূত ছিলেন মুহাম্মদ ইয়ার।[১৩] অতএব, শুধু যে বার-ভূঁঞার মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তা নয়, বিভিন্ন হিন্দু রাজা জমিদারদের অধীনেও মুসলমানরা বিভিন্নভাবে নিয়োজিত ছিল। এমনকি, উচ্চ পদেও অধিষ্ঠিত ছিল। তাই দেখা যায়, হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক একাত্ম হয়ে মুসলমান মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। বাংলাদেশে সুলতানী আমলেও হিন্দুরা মুসলমান সুলতানদের অধীনে দিল্লীর সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, কিন্তু সুলতানী আমলের তুলনায় এ সময়ের অবস্থা ভিন্ন। সুলতানী আমলে হিন্দুরা মুসলমান রাজশক্তির অধীনে ছিল, কিন্তু এ সময় মোগল মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিন্দু মুসলমান একযোগে কাজ করেছে। মোগলদের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের এ মিলিত প্রয়াস বাংলার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে।

জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার মোগল শাসকদের মধ্যে দু পরিবারের সদস্যদের প্রাধান্য দেখা যায়—শয়খ পরিবার এবং মিরযা পরিবার। শয়খ পরিবারের লোকেরা শয়খ সলীম চিশতীর এবং মিরযা পরিবারের লোকেরা মিরযা গিয়াস বেগ ইতমাদ-উদ-দৌলার বা নূর জাহানের পরিবারের লোক। ইসলাম খান চিশতী সুবাদার হয়ে আসার সময় শয়খ সলীম চিশতীর পরিবার এবং এ পরিবারের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই বাংলায় আসেন। জন্মের পর থেকে জাহাঙ্গীর এ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। ইসলাম খানের ভাই শয়খ গিয়াস-উদ-দীন (গিয়াস খান বা এনায়েত খান) শয়খ হাবীব উল্লাহ, ইসলাম খানের চাচা শয়খ মউদুদ (পরে চিশতী খান); ইসলাম খানের চাচাত ভাই শয়খ বায়েজীদের (মুয়াজ্জম খান) ছেলে এবং ইসলাম খানের জামাতা মুকাররম খান ও তাঁর ভাইয়েরা, আবদুল সালাম এবং শয়খ মুহী-উদ-দীন, ইসলাম খানের ফুফাত ভাই শয়খ খুবুর (কুতুব-উদ-দীন খান) ছেলে কিশওয়ার খান সকলেই বাংলায় আসেন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁদের কেউ কেউ সেনাপতি, ফৌজদার এবং থানাদারের পদ লাভ করেন। ইসলাম খানের অন্য তিন ভাই শয়খ ফরীদ, শয়খ জামাল এবং শয়খ ইউসুফ মক্কীও এ সময় বাংলায় কর্মরত ছিলেন। খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শয়খ কবীর শুজাত খানও শয়খ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। তিনিও তাঁর ছেলেদের নিয়ে বাংলায় আসেন। তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর ছেলেরা বাংলায় থেকে যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪] শুজাত খানকে ইসলাম খানের সুপারিশে সম্রাট নিজেই খাজা উসমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠান। ইসলাম খানের ব্যক্তিগত দিওয়ান শয়খ তাঁকনও তাঁর ছেলেদের নিয়ে বাংলায় আসেন। ইসলাম খান প্রধান সেনাপতি ও সেনাপতি পদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর ভাই বা

Edited by Ripon Sarkar

ব্যক্তিগত অফিসারদের নিয়োগ করতেন। ফলে শাহী মনসবদারদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল এবং অন্তত একবার মনসবদারেরা ইসলাম খানের বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট অভিযোগ করে। ফলে কোন ব্যক্তিগত অফিসারের অধীনে মনসবদারদের নিয়োগ না করার জন্য সম্রাট ইসলাম খানের প্রতি নির্দেশ দেন।[১৫] কাসিম খানের পদচ্যুতির পরে বাংলায় শয়খদের প্রাধান্য নষ্ট হয়, এবং মিরযাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ তাঁর ভাইপো মিরযা আহমদ বেগ খানও মিরযা ইউসুফ বেগকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। মিরযা নূর-উদ-দীন, মিরযা ইসফন্দিয়ার এবং মিরযা বাকীও এ সময় ছিলেন, এবং এ সময়ের যুদ্ধে এঁরাই কর্তৃত্ব লাভ করেন। এ সময় বখশী ও দিওয়ান ছিলেন যথাক্রমে মিরযা আশরাফ এবং মিরযা হিদায়েত বেগ। ইবরাহীম খানের সময় শয়খ কামাল, শয়খ আবদুল ওয়াহিদ এবং শয়খ মউদুদ (চিশতী খান) বাংলায় ছিলেন, তাঁদের কোন প্রাধান্য দেখা যায় না। কারণ প্রথমত, একই সময়ে কুলীজ খানকে কামরূপের জায়গীরদার করে পাঠানো হয়। এবং আরও দেখা যায় যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাঁদের সেখানে পাঠানো হয় কামরূপে তাঁদের তেমন কোন ভূমিকার প্রমাণও পাওয়া যায় না। সেখানেও শয়খ এবং মিরযাদের মধ্যে রেষারেষি দেখা যায়। মিরযা নাথন ও সুবাদার ইবরাহীম খানের নিম্নরূপ বাদানুবাদে শয়খদের প্রতি মিরযাদের মনোভাব প্রকাশ পায়ঃ[১৬]

সুবাদার ঃ তুমি পছন্দ কর বা না কর, তোমাকে হাজো ফিরে যেতেই হবে।

নাথন ঃ আমি কোন অবস্থাতেই ফিরে যাব না। এতদিন আমি যেখানে নেতা (সেনাপতি) ছিলাম, এখন সেখানে অন্যের অধীনে চাকরি করা আমার জন্য অপমানকর হবে।

সুবাদার ঃ ইসলাম খান এবং কাসি[illegible]নের সময়ে তুমি কিভাবে শয়খদের অধীনে চাকরি করেছ?

নাথন ঃ (ছলছল চোখে বলেন) ফিরিঙ্গীরা যেমন ক্রীতদাস রাখে, তখন আমি মনে করতাম, আমি সেরূপ একজন ক্রীতদাস এবং অসহায়। সম্রাটের মঙ্গলের জন্য আমার কাজ করতে হয়েছে। এখন আমি মনে করি যে আল্লার কৃপায় আমার একজন পৃষ্ঠপোষক এসেছেন, যিনি গুণের কদর করতে জানেন। আপনি যদি আগের মত ব্যবহার করেন, আমি মনে করব যে মগ ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব এখনও চালু আছে।

এতে সুবাদার মিরযা নাথনের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং নাথনকে সান্ত্বনা দেন। শয়খ কামালের প্রতি মিরযা নাথনের বিরাগের বেশ কিছু কারণ ছিল, নাথন অনেক স্থানে শয়খ কামালকে পেশাদার পীর বলে ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু শয়খদের সম্বন্ধে [illegible] একটা তাচ্ছিল্য ভাব ছিল, তিনি শয়খদের হিন্দুস্থানী বলে গালমন্দ [illegible] নিজেকে মোগল বলে আত্মতৃপ্তি অনুভব করতেন। কাসিম খান বাংলা [illegible] যাওয়ার সময় ইবরাহীম খান, মিরযা আহমদ বেগ খান এবং মিরযা [illegible] করেন[১৭] তাতেও শয়খদের প্রতি মিরযাদের বিরূপ মনোভাব [illegible] হয়।

Edited by Ripon Sarkar

আকবর সাম্রাজ্যকে প্রথম বারটি সুবায় বিভক্ত করে সুবা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন এবং বাংলাকে একটি সুবার বা প্রদেশের মর্যাদা দেয়া হয়। প্রত্যেক সুবার জন্য সুবাদার (প্রাদেশিক গবর্নর), দিওয়ান (রাজস্ব বিভাগীয় কর্তা), বখশী (সৈন্য বিভাগের কর্তা), সদর (বিচার বিভাগের কর্তা), কাজী (ফৌজদারী বিচারক), কোতওয়াল (পুলিশ বিভাগের কর্তা) এবং ওয়াকিয়ানবিশের (সংবাদ সরবরাহকারী) পদ সৃষ্টি করা হয়।[১৮] ১৫৮৫ সালে আকবর উজীর খানকে সুবাদার, করম উল্লাহকে দিওয়ান এবং শাহবাজ খানকে বখশী নিযুক্ত করেন। ইসলাম খান চিশতী সুবাদার হয়ে আসার সময় মুতাকিদ খান দিওয়ান পদে এবং খাজা তাহির মুহাম্মদ বখশী পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। ইসলাম খানের সুবাদারীর শেষ দিকে, ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে ইয়াগমা ইসফাহানী ওয়াকিয়ানবিশ নিযুক্ত হন। একই সময়ে দিওয়ান মুতাকিদ খানকে প্রত্যাহার করে মিরযা হোসেন বেগকে দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়।[১৯] কাসিম খানের সুবাদারী আমলে মুখলিস খানকে দিওয়ান, বখশী এবং ওয়াকিয়ানবিশের যুক্ত পদে নিযুক্ত করা হয়[২০] কিন্তু পরে ইবরাহীম খানের সময়ে তাঁকে প্রত্যাহার করে যুবরাজ পারভেজের অধীনে নিযুক্ত করলে[২১] বাংলায় মিরযা আশরাফকে বখশী এবং মিরযা হেদায়েত বেগকে দিওয়ান নিযুক্ত করা হয়। যুবরাজ শাহজাহান বাংলা অধিকার করে বাংলাকে চারটি সুবায় বিভক্ত করেন—সুবা ভাটি, সুবা যশোর, সুবা রাজমহল এবং সুবা কামরূপ এবং প্রত্যেক সুবায় অফিসার নিযুক্ত করেন[২২] কিন্তু এ ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। সম্রাটের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়ে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। অতএব বাংলায় মোগল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাসন কাঠামোয় বাংলায় সুবা বা প্রাদেশিক শাসনও প্রবর্তিত হয়।

সাধারণ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব ব্যবস্থার দিকেও মনোযোগ দেয়া হয়। ইসলাম খান চিশতী বিভিন্ন এলাকা জয় করার সঙ্গে সঙ্গে রাজস্বের রেকর্ডপত্র তৈরির ব্যবস্থা নেন। মিরযা নাথন বাহরিস্তান-ই-গায়বীতে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি এলাকার রাজস্ব নির্ধারণের কথা বলেন। অফিসারদের জায়গীর বন্টন কালে সাধারণত রাজস্বের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা হত। কিন্তু কয়েকটি এলাকা বিজয়ের পরে সে সব এলাকার রাজস্ব নির্ধারণের কথাও উল্লেখ আছে। যশোর সম্পর্কে বাহরিস্তানে বলা হয়ঃ[২৩] "....Khwaja Muhammad Tahir Bakhshi was sent to make due assessment of revenue of Jessore and to bring the rent roll (nuskha) to the government record office." বুকাইনগর জয়ের পরে রাজস্ব নির্ধারণের কথা নেই, তবে দৌলম্বপুর যুদ্ধের আগে শুজাত খান খাজা উসমানের নিকট প্রেরিত শান্তি প্রস্তাবের একটি শর্ত ছিলঃ[২৪] "The imperial Diwans should also be allowed to prepare the permanent rent register (nuskha-i-Jama-i-maqarrari) of his domain in order to send it to the sublime Court." কামরূপের রাজস্ব ব্যবস্থা নির্ধারণের কথাও নিম্নরূপ পাওয়া যায়[২৫] ঃ

> ....and ordered Mirza Hasan, the Diwan and Bakhshi, to arrange for the collection of revenue in the parganas and other places. The aforesaid Mirza, due to his great experience, divided the parganas of the Kuch territory into twenty well-defined circles. Some other lands

Edited by Ripon Sarkar

were assigned to the imperial Karoris and the Fawjdars in order to realise the revenue. Some of the lands were given to Mustajirs (Revenue farmers) by taking deed of acceptance from them for the parganas."

যুবরাজ শাহজাহান বাংলা অধিকার করে বাংলার রাজস্ব নথি তৈরি করার জন্য উজীর খান নামক একজন উচ্চপদস্থ অফিসার নিয়োগ করেন। বাহরিস্তানে বলা হয়ঃ[২৬]

"Wazir Khan was left at Jahangirnagar for a period of seven days in order to prepare and to bring the rent-roll of the whole of Bengal." এবং শাহজাহান পাটনায় পৌঁছলে বলা হয়,[২৭]

"Wazir Khan also after settling the affairs of the whole of Bengal obtained the honour of kissing the ground." আরও পরে শাহজাহান রাজমহলে মিরযা নাথনের নিকট নিম্নরূপ আদেশ পাঠানঃ[২৮]

> Tajpur Parnea was given as a Jagir to Shir Khan Fath-Jang in lieu of his salary. But Shir Khan has some doubts as to the assessment of its revenue. ...... Therefore, we have issued this Royal command (to you) to make a thorough enquiry into the ryots and the jagirdar may be put to hardship nor the imperial revenues fall short, and then you are to send a report to the Court,

এ পরগণাগুলির রাজস্ব নির্ধারণ সম্পর্কে মিরযা নাথন বলেনঃ[২৯]

> Accordingly, a confidential Afghan officer named Yara Khan was deputed to these two parganas along with Khwaja Todarmal, the Mir Saman of this humble self with these instructioen,— ' I shall send another party of make secret enquiries, about the real state of affairs over and above yourself. I may even go personally. After understanding the situation, prepare a correct register of revenues of those two parganas with the consent of the ryots, the signature of the Qanungus, and the deed of agreement (qabuliyat) of the Chawdhuris, verified and attested by the agents of Shir Khan Fath-Jang.' They started for that place. Although I had confidence in them yet another party was secretly appointed to see that they may not conspire with the officers of Shir Khan. They went there and began to survey and inspect the villages so that after ascertaining the facts they might be able to finish the preparation of the rent-roll.

Edited by Ripon Sarkar

আকবরের সময়ে তোডর মল্ল বাংলার রাজস্ব নির্ধারণ করেন, এটার কাঠামো আইন-ই-আকবরীর দ্বিতীয় খণ্ডে পাওয়া যায় এবং এটা তোডর মল্লের বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। কিন্তু তোডর মল্লের সময়ে সারা বাংলা বিজিত হয়নি, শুধু বাংলার একাংশ আকবরের অধীনস্থ হয়। তাই সঙ্গতভাবেই ধারণা করা যায় যে তোডর মল্ল পূর্বতন সরকারের রেকর্ডের ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থা নির্ধারণ করেন। জাহাঙ্গীরের আমলে সারা বাংলা জয় হয়। তাই এ সময় রাজস্ব ব্যবস্থা পুনর্নিরীক্ষণ করা হয় এবং তোডর মল্লের বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। এ সময় কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না, তবে বাহারিস্তানে প্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন বক্তব্যে বুঝা যায় যে ইসলাম খান প্রত্যেকটি এলাকা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজস্ব নির্ধারণের উদ্যোগ নেন। যশোর এবং বুকাইনগরে যে রাজস্ব নির্ধারিত হয়, তা বাহারিস্তানে বলা হয়েছে, মনসবদারদের জায়গীর বন্টন করার সময় যে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় তার বিচ্ছিন্ন বিবরণও বাহারিস্তানে পাওয়া যায়। কামরূপে নতুনভাবে রাজস্ব নির্ধারণের কথাও বাহারিস্তানে আছে। কামরূপের রাজস্ব আদায় নিলামকারীদের দেয়ার কথাও পাওয়া যায়, নিলামকারীদের অত্যধিক রাজস্ব সংগ্রহের প্রবণতা কামরূপের বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।[৩০] শাহজাহানের নির্দেশে উজীর খান যে সারা বাংলার রাজস্ব তালিকা তৈরি করেন, তা অবশ্যই দিওয়ানী অফিসে রক্ষিত রেকর্ডের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়। কারণ সাত দিনের মধ্যে এর বেশি কিছু করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু মির্যা নাথনের তত্ত্বাবধানে তাজপুর পূর্ণিয়ার দুটি পরগণার যে রাজস্ব নির্ধারিত হয়, তাহা ছিল অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। কারণ, এ দুটি পরগণার প্রকৃত জরিপ করে রায়ত, কানুনগো, চৌধুরী এবং জায়গীরদারের সম্মতিতে রাজস্ব নির্ধারিত হয় এবং রেকর্ড তৈরি হয়। জাহাঙ্গীরের সময়েও যে সারা বাংলাদেশে জরিপ করা হয়, এরূপ মনে করা সে হয় ভুল হবে, তবে তোডর মল্লের বন্দোবস্ত যে সংশোধন করা হয়, তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত এ সময়ের কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। তাই বাংলার মোগল রাজস্ব বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। যদি কোন দিন সৌভাগ্যক্রমে এ রেকর্ডগুলি আবিষ্কৃত হয়, তাহলে মোগল শাসন আমলের রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। এখানে এ আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা এ যে এতে প্রমাণিত হয় যে জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার মোগল বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল শাসন ব্যবস্থাও পুরাপুরি প্রবর্তিত হয়।

বাংলার ইতিহাসে এ পর্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার প্রেক্ষাপটে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কথা, বাঙালিরা স্বাধীনতা হারায়। কিন্তু সুফলও ছিল। বাংলা সর্বপ্রথম তার স্বাভাবিক সীমারেখা লাভ করে। এই সীমারেখা ভাষাভিত্তিকও হয়। আকবর সুবার সীমা নির্ধারণের সময় প্রাকৃতিক সীমারেখা এবং ভাষার দিকে দৃষ্টি রাখেন। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ বেশ কিছুদিনের জন্য স্থিতিশীলতা এবং শান্তি ফিরে পায়। সুফল কুফল আরও ছিল, কিন্তু তা আমাদের এ রাজনৈতিক ইতিহাসে অপ্রাসঙ্গিক, আলোচনাও দীর্ঘ এবং সময়-সাপেক্ষ। মোগল পক্ষে এ পর্বের গুরুত্ব এ যে এ সময়ে মোগল আগ্রাসন নীতি চরিতার্থ হয়েছে। আকবরের আরব্ধ কাজ তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর সফলভাবে সমাপ্ত করেন। সীমান্তবর্তী দুটি রাজ্য আসাম এবং আরাকানের মুখোমুখি হয়ে সমস্যারও উদ্ভব হয়, মোগলরা এখন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ডঃ সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এ পর্বের সমাপ্তি টেনে বলেন:[৩১]

Edited by Ripon Sarkar

The twenty two years of Bengal history in the reign of Jahangir proved to be a formative period. The leading tendencies of the subsequent history of Mughal Bengal, and the directions in which the currents of political life and foreign relations mainly ran, were determined during this period. As a result of the exertions of a few noted governors, particularly Islam Khan, the whole of Bengal had been brought under the effective rule of the Mughal Emperor, and the province had attained a geographical and political unity unknown for a long time before. But in the process of rounding off the territories of the new province, the government had been brought into direct and immediate contact with two powerful frontier states, the Ahom kingdom on the north-east and the kingdom of Arakan on the south-east, with both of which it had to wage severe and prolonged warfare of which only the beginnings lie in the reign of Jahangir.

১। তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
২। বাহারিস্তান, ১ম, ১৪০।
৩। ঐ, ১ম, ৭০৮, ৭৫৬।
৪। ঐ, ৫২১।
৫। ঐ, ১ম, ১২০-১২৪।
৬। কামরূপের বুরঞ্জী, ১০-১৩।
৭। আকবরনামা, ৩য়, ৮৬৮-৬৯, ৯৯৭।
৮। আবদুল লতিফের ভ্রমণ কাহিনী, [illegible], ১০২৬।
৯। জে. বি. ৪র্থ, ২৪০।
১০। বাহারিস্তান, ১ম, ৫৮।
১১। ঐ, ৯৭।
১২। ঐ, ১০৬।
১৩। [illegible], ১০২৬।
১৪। বাহারিস্তান, ১ম, ২৮৪।
১৫। ঐ, ২২০-২২১।
১৬। ঐ, ২য়, ৫০০-৫০১।
১৭। সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৮। আকবরনামা, ৩য়, ৭৯৩।
১৯। বাহারিস্তান, ১ম, ২০৭-২০৯।
২০। ঐ, ৩৭৭-৭৮।
২১। ঐ, ২য়, ৭০১-৭০২।

Edited by Ripon Sarkar

২২। ঐ, [illegible]
২৩। ঐ, ১খ, ১৪৮
২৪। ঐ, ১খ, ১৭৪
২৫। ঐ, ২খ, ১৫৩।
২৬। ঐ, ১খ, ৩১১।
২৭। ঐ, ৭১।
২৮। ঐ, ৭৮১।
২৯। ঐ, ৭৮১ ৮১।
৩০। ঐ, ১খ, ২৮৯
৩১। এম. বি. ২খ, ৩১৪ ১৫।

Edited by Ripon Sarkar

গ্রন্থপঞ্জি

ফার্সি ও উর্দু পুস্তক:

আইন-ই-আকবরী, আবুল ফজল রচিত, ব্লকম্যান সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৭৭।
আকবরনামা, আবুল ফজল রচিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা।
আমল-ই-সালেহ, মুহাম্মদ সালেহ কাম্বো রচিত, কলকাতা, ১৯২৩-৩৯।
আসুদগান-ই-ঢাকা, হাকিম হাবিবুর রহমান রচিত, ঢাকা।
ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী, মুতামদ খান রচিত, আবদুল হাই এবং আহমদ আলী সম্পাদিত, কলকাতা, ১৮৬৫।
তবকাত-ই-আকবরী, নিযাম উদ দীন আহমদ বখশী রচিত, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা, ১৯২৭-৩৫।
তবকাত-ই-নাসিরী, মিনহাজ-উস-সিরাজ রচিত, আবদুল হাই হাবিবী কর্তৃক সম্পাদিত, কাবুল।
তারিখ-ই-খানজাহানী ও মখজন-ই-আফগানী, খাজা নিয়ামত উল্লাহ রচিত, এস. এম. ইমাম-উদ-দীন সম্পাদিত, দুইখণ্ড, ঢাকা ১৯৬০, ১৯৬২।
তারীখ-ই-ঢাকা, রহমান আলী তায়েশ রচিত, ঢাকা।
তারীখ-ই-নসরতজঙ্গী, নওয়াব নসরতজঙ্গ রচিত, হরিনাথ দে সম্পাদিত, মেমোয়ারস অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, খণ্ড ২, নং ৬।
তারীখ-ই-ফিরিশতা, আবুল কাসিম ফিরিশতা রচিত, নেওলাল কিশোর, লক্ষ্ণৌ।
তারীখ-ই-শোজাই, [illegible] রচিত, এস. এম. ইমাম-উদ-দীন সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৪।
তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী, জাহাঙ্গীর রচিত, সৈয়দ আহমদ খান সম্পাদিত, আলীগড়, ১৮৬৪।
পাদশাহনামা, আবদুল হামিদ লাহোরী রচিত, কলকাতা ১৮৬৭-৬৮।
ফতীয়া ইবরীয়া, শিহাব-উদ-দীন তালিশ রচিত, [illegible] প্রেস, কলকাতা, ১৮৪৯।
বাহারিস্তান-ই-গায়বী, মির্জা নাথন শিতাব খান রচিত, পাণ্ডুলিপির কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত।
মাসির-উল-উমারা, শাহনওয়াজ খান ও আবদুল হাই রচিত, কলকাতা, ১৮৮৮-৯১।
মুন্তখব-উত-তওয়ারীখ, আবদুল কাদির বাদাউনী রচিত, কলকাতা, ১৮৬৯।
রিয়াজ-উস-সালাতীন, গোলাম হোসেন সলীম জায়েদপুরী রচিত, কলকাতা, ১৮৯০।

বাংলা ও আসামী পুস্তক ও সাময়িকী :

অচ্যুত চরণ চৌধুরী : শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, দুই খণ্ড, ১৩১৭, ১৩২৮ বাংলা।
আহোম বুরঞ্জী, গো. চ. বড়ুয়া সম্পাদিত, শিলং, ১৯৩০।
আকবর উদ্দীন : বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বাংলা অনুবাদ) ঢাকা, ১৯৭৪
আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া : তবকাত-ই-নাসিরী (বাংলা অনুবাদ), ঢাকা, ১৯৮৩।
আবদুল হক চৌধুরী : শহর চট্টগ্রামের ইতিকথা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৫।
আবদুল করিম : বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৭।
: ঢাকাই মসলিন, ঢাকা, ১৯৬৫।

Edited by Ripon Sarkar

: "জাহাঙ্গীরের রাজত্বে মুসলমানদের ত্রিপুরা রাজ্য বিজয়", বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-কার্তিক, ১৩৯০

আমানতুল্লা আহমদ : কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, ১৯৩৬।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৮৬।

রাধারমণ সাহা : পাবনা জেলার ইতিহাস, পাবনা, ১৩৩৩ বাংলা।

আবুল কালাম জাকারিয়া (অনূদিত) : তবকাত-ই-নাসিরী, ঢাকা

বে এ চক্রবর্তী সম্পাদিত : বীরভূম বিবরণ, বীরভূম, ১৩৩৫ বাংলা।

কাজী মোহাম্মদ মিছের : বগুড়ার ইতিকাহিনী, বগুড়া, ১৯৫৭।

: রাজশাহীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বগুড়া, ১৯৬৫।

কামরূপের বুরঞ্জী : গভর্নমেন্ট অব আসাম, ১৯৩০।

কালী প্রসন্ন সেন (সম্পাদিত) : শ্রীরাজমালা, ৩ খণ্ড, ১৩৩৬-১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

কুমিল্লা জেলার ইতিহাস : কুমিল্লা জেলা পরিষদ প্রকাশিত, ১৯৮৪।

কেদার নাথ মজুমদার : ময়মনসিংহের ইতিহাস, কলকাতা, ১৯০৬।

: ময়মনসিংহের বিবরণ, ১৯১০।

ক্ষিতীশ মৌলিক সম্পাদিত : "দেওয়ান ঈশা খাঁর পালা" প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা, সপ্তম খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৫।

যো. চ. বসু : মেদিনীপুরের ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৪৬ বাংলা।

কালীকমল চৌধুরী : "ত্রিপুরার বংশাবলি", ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৪২ বাংলা।

প. চি. সেন গুপ্ত : বগুড়ার ইতিহাস, রংপুর সাহিত্য পরিষদ, ১৯১২।

মহেন্দ্রনাথ করণ : হিজলীর মসনদ-ই-আলা, মেদিনীপুর, ১৩৩৩ বাংলা।

ময়মনসিংহের জীবন ও জীবিকা : ময়মনসিংহ জিলা পরিষদ প্রকাশিত, ১৯৮৭।

যদুনাথ সরকার, স্যার : "বাংলার স্বাধীন জমিদারদের পতন", প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩২৯।

: "প্রতাপাদিত্যের পতন," প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭;
শনিবারের চিঠি, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫।

: "বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী," প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩২৯।

: "প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ," প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩২৮।

: "প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রিস্টান পাদ্রী," প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৮।

: "বাংলার শেষ পাঠান বীর," শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৫৫। প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩২৮ বাংলা।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : বিক্রমপুরের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ।

রজনীকান্ত চক্রবর্তী : গৌড়ের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মালদহ, ১৯০৯।

রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত : বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ, কলকাতা, ১৩৮০।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্যযুগ, কলকাতা, ১৯১৭।

রামরাম বসু : প্রতাপাদিত্য চরিত, শ্রীরামপুর, ১৮০২।

সতীশচন্দ্র মিত্র : যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫।

সূর্য কুমার ভূঞা : আসাম বুরঞ্জী, গভর্নমেন্ট অব আসাম।

হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন : আসাম বুরঞ্জী, সতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, গৌহাটী, ১৩৬৯।

ইংরেজি পুস্তক ও সাময়িকী :

Ahmad, Shamsuddin : Inscriptions of Bengal, vol. IV, Rajshahi, 1960.

Edited by Ripon Sarkar

Allen, B. C. : Assam District Gazetteer, Sylhet, Calcutta, 1905.
Assam District Gazetteer, Kamrup, Allahabad, 1905.

Benerji, R. D. : History of Orissa, vol. II, Calcutta, 1930.

Barua, K. L. : Early History of Kamrupa, Shillong, 1933.

Beveridge, H. The District of Bakarganj, its History and Antiquities, London, 1876

tr. : Maasir-ul-Umara, 2 vols.

: "The Antiquities of Bagura" in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLVIII, 1878.

: "On Isa Khan, the ruler of Bhati, in the time of Akbar", in Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904.

tr. : Akbarnama, vol. III, Reprint, 1973.

Beams, John : "Notes on Akbar's Subahs" in Journal of the Royal Asiatic Society, London, 1896.

Bhattacharyya, S. N. : Mughal North-East Frontier Policy, Calcutta 1929.

: "Rebellion of Shah Jahan and his career in Bengal." In Indian Historical Quarterly, vol. X, no. 4, December, 1934.

: "On the Transfer of the Capital of Mughal Bengal from Rajmahal to Dacca," In Dhaka University Studies, vol. I, 1935.

Bhattasali, N. K. : "Bengal Chiefs' Struggle for Independence in the reigns of Akbar and Jahangir" in Bengal Past and Present, vol. 35, 1928, vol. 36, 1928; vol. 38, 1929.

: "Early Days of Mughal Rule in Dhaka," in Islamic Culture, 1942.

Bhuyan, S. K. : "New Lights on Moghal India from Assamese Sources" in Islamic Culture, vol. II, 1928, vol. III, 1929.

Blochmann, H. : Ain-i-Akbari, vol. I (tr.), Calcutta, 1927.

: "Contributions to the Geography and History of Bengal," in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLII, 1873; XLIII, 1874 and XLIV, 1875.

: "Koch Bihar, Koch Hajo and Assam in the 16th and 17th Centuries according to the Akbarnama, the Padshanama and the Fatiya-i-Ibriya." in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLI, 1872.

Borah, M. I. tr : Baharistan-i-Ghaybi, 2 volumes, Government of Assam, 1936.

Bradley-Bart, F. : Romance of an Eastern Capital, London, 1906.

Campos, J. J. A. : History of the Portuguese in Bengal, Calcutta, 1919.

Dani, A. H. : Dacca, a Record of its Changing Fortune, Dacca, 1957.

Eidited by Ripon Sarkar

Diwakar, R. R. ed. — Bihar Through the Ages, Government of Bihar, 1958

D'Oyly, Charles — Antiquities of Dacca, 1824-30.

Elliot, H. and Dowson, J. — History of India as told by its own Historians, vol. VI.

Gait, E. A. — History of Assam, Calcutta, 1926.

Gastrell, J. E. — Geographical and Statistical Report of the District of Jessore, Fureedpore and Backergange, Calcutta, 1868.

— Statistical and Geographical Report of the Murshidabad District, Calcutta, 1860.

Gupta, N. K. — Dacca (old and New), Dacca, 1940.

Gupta, J. N. — Eastern Bengal and Assam District Gazetteer, Bogra, Allahabad, 1910.

Habib, Irfan. — Agrarian System of Mughal India, London, 1963.

Harrison, J. B. : Article on Arakan, in Encyclopaedia of Islam, new edition, London, 1960.

Harvey, G. E. : History of Burma, London, 1925.

Hasan, Sayid Aulad : Notes on the Antiquities of Dacca, 1910.

Hosten, H. : "The Twelve Bhuiyans or Land Lords of Bengal", in Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. IX, No. 10. 1913.

Hunter, W. W. : The Imperial Gazetteer of India, vol. X, new edition.

Hussain, Md. Delwar : A Study of Nineteenth Century Historical Works on Muslim Rule in Bengal, Dhaka, 1987.

Imamuddin, S. M. tr. : Tarikh-i-Sher Shahi, Dacca, 1964.

Jack, J. C. : Bengal District Gazetteer, Backerganj, Calcutta, 1918.

Jarrett, H. S. tr. : Ain-i-Akbari, vol. II, Corrected and annotated by J. N. Sarkar, Calcutta, 1949.

Karim, Abdul : Dacca the Mughal Capital, Dacca, 1964.

: "A Fresh Study of Abdul Latif's Diary: North Bengal in 1609" In Journal of the Institute of Bangladesh Studies, vol. XIII, 1990.

: Social History of the Muslims in Bengal 2nd edition, 1985.

: Murshid Quli Khan and his Times, Dhaka, 1963.

Karim, Kh. Mahbubul : The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, Dhaka, 1974.

Khatun, Habiba — "In Quest of Katrabo" in Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, vol. XXXI, No. 2, December, 1986.

Lambourne, G. E. : Bengal District Gazetteer, Malda, Calcutta, 1918.

Luard & Hosten tr. : The Travels of Fray Sabastien Manrique, 2 vols. London, 1926-27.

Mahmood, A. B. M. : The Revenue Administration of North Bengal, Dacca, 1970.

Edited by Ripon Sarkar

Martin, M. : The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, 3 volumes, London, 1838.

Mohsin, K. M. : A Bengal District in Transition. Murshidabad, Dacca, 1973.

Moreland, W. H. : The Agrarian System of Moslem India, Cambridge, 1929.

Morrison, M. & Shaw, L. A. : Coins and Bank notes of Burma, Manchester, England, 1980.

Mukherjee, R. K. : The Changing Face of Bengal, Calcutta, 1938.

O' Malley, L. S. S. : Bengal District Gezetteer, Bankura, (Calcutta, 1908);
Khulna, (Calcutta, 1908), Birbhum, (Calcutta, 1910);
Midnapore, (Calcutta, 1911); Hooghly, (Calcutta, 1912);
Murshidabad, (Calcutta, 1914); Pabna (Calcutta, 1923);
Faridpur, (Calcutta, 1925).

O' Malley, L. S. S. & Chakravarty, M. M. : Bengal District Gazetteer, Hawrah, Calcutta, 1909.

Pearson, J. C. K. : Bengal District Gazetteer, Burdwan, Calcutta, 1910.

Phayre, A. P. : History of Burma, London, 1884.

Prasad, Beni : History of Jahangir, 5th edition, Allahabad, 1962.

Price, J. C. : Notes on the History of Midnapore, Calcutta, 1876.

Qanungo, K. R. : Sher Shah, Calcutta, 1921.

Qanungo, Suniti Bhushan : A History of Chittagong, Chittagong, 1988.

Rahim, M. A. : The History of the Afghans in India, Karachi, 1961.

Ranking, George, S. A. tr. : Muntakhab-ut-Tawarikh, vol. I. Calcutta, 1898.

Raverty, Major tr. : Tabakat-i-Nasiri, 2 volumes.

Ray Chaudhuri, T.K. : Bengal under Akbar and Jahangir, Calcutta, 1953.

Rennell, James : A Bengal Atlas.

Rogers, A. & Beveridge, H. tr.: The Tuzuk-i-Jahangiri, 2 vols. 2nd edition. 1968.

Sachsy, E. A. : Bengal District Gazetteer. Mymensingh, Calcutta, 1917.

Saksena, Banarsi, P. : History of Shahjahan of Dilhi, Allahabad, 1962.

Salam, Abdus, tr. : Riyazu-s-Salatin, Delhi Reprint, 1975.

Sarkar, Sir Jadunath : Studies in Mughal India, Calcutta, 1919.

ed. : History of Bengal, vol. II, Dacca, 1948.
: "North Bengal in 1609 A. D. "in Bengal Past and Present, vol. XXXV. Nos. 69-70, 1928.
: "A New History of Bengal in Jahangir's Time", in Journal of Bihar and Orissa Research Society, vol. VII, 1921.
: "The Conquest of Chatgaon, 1666 A. D" in Journal of the Asiatic Society of Bengal, N S. vol. III. 1907.
" The Firingi Pirates of Chatgaon" in Journal of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. III, 1907.

Edited by Ripon Sarkar

Sayeed, Abdus — History of the Afghan Rule in Bengal, unpublished Ph. D. Thesis, Chittagong University, 1986.

Sen, P. C. — Mahasthan and its Environs, Rajshahi, 1929.

Sharma, Sri Ram — Religious Policy of Mughal Emperors, 2nd edition, 1962.

"Bengal under Jahangir: Baharistan-i-Ghaibi of Mirza Nathan" in Journal of Indian History, vol. XI, 1932; vol. XIII, 1934; vol. XIV, 1935.

"Prince Shahjahan in Bengal (as described in Baharistan-i-Ghaibi)," in Indian Historical Quarterly, vol. XI, 1935.

Smith, Vincent A. : Akbar the Great Mogul, London, 1914.

Stewart, Charles — History of Bengal, London, 1813.

Taifoor, Syed M. : Glimpses of Old Dhaka, Dhaka, 1952.

Taylor, James : A Sketch of the Topography and Statistics of Dacca, London, 1840.

Vas, J. A. : Eastern Bengal and Assam District Gazetteer, Rangpur, Allahabad, 1911.

Webster, J. E. : Eastern Bengal District Gazetteer, Tippera, Allahabad, 1910, Noakhali, Allahabad, 1911.

Westland, J. : A report on the District of Jessore, its antiquities, its history and commerce, Calcutta, 1871.

Wise, James : "Bara-Bhuiyans of Eastern Bengal" in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. XLIII, 1874; vol. XLIV, 1875.

Edited by Ripon Sarkar

নির্ঘণ্ট

অ

অক্সফোর্ড ৯৬
অজয় নদী ১৬৮
অনিক ব্লাকে ২০৪, ২০৫
অনিমার সিংহলদম ৩২৭, ৩৬০
অনুপ রায় (দেখুন অনিমার সিংহলদম)
অনন্ত ৭৮, ২৬৭, ২৭৫, ২৭৭, ৪৬৭
অনন্ত মাণিক্য (ভুলুয়ার রাজা) ৫, ১৪, ২১, ৩৮, ৫২, ২০৬, ২০৭, ২৭৭, ২৯৯, ৩০৫, ৩৪৯, ৩৫১, ৪১০, ৪৬৭, ৪৭০
অনন্ত মাণিক্য (ত্রিপুরার রাজা) ৬১
অন্নদামঙ্গল (ভারত চন্দ্র রচিত) ৩১
অন্নপুরম ২০৫
অনন্তপেতপুর (কম্বোজের মহাধর্ম রাজা) ৩৫০
অমরাবতী (ত্রিপুরার রাণী) ১২২
অমর ১৫২
অমর মাণিক্য ১৮, ৬১, ৬৫, ৬৬, ৭২, ১২১, ১২২, ২৬৫
অমর সিংহ ৪৪৫
অবর্শি ৪৩, ৪৪
অযোধ্যা ৫৬, ৬০, ১০৪, ১০৬, ৩৯৬, ৪৫৫
অরিমত ৩৬
অষ্টগ্রাম ৬১, ৬২, ৮৯, ১২১, ১৪০, ১৬০
অসুরিয়ানগর ২৭৮, ২৯০, ৩৩৯
অয়েন সুন্দরী ১৬৮

আ

আইন-ই-আকবরী ১, ৫, ১২, ১৯, ২২, ২৯, ৪৮, ৫৬, ৬০, ৭০, ৭৮, ৮৩, ৮৮, ১০৩, ১০৪, ১১০, ১৪২, ১৫৬, ১৫৭, ১৬২-১৬৪, ১৬৮, ১৬৯, ২১৪, ২১৮, ২৫৮, ২৭৬, ২৯২, ২৯৪, ৩৬২, ৪৪৪, ৪৭৪
আইনিয়া ২৫২, ২৬২, ২৬৪
আওরঙ্গজেব ৪৪, ৪৫, ১০৬, ৪৩৫, ৪৫৩
আকাইয়ানদা ইসলামাবাদী ৪, ৩১২, ৩২৫, ৩২৭, ৪৭২
আকাডলী ৩৯২, ৪৪৮
আকা মুকিম বাকী ৮, ৯
আকবর ১, ৫, ৪, ১৪, ১৬, ২০, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪৭-৫৬, ৬৪, ৬৫, ৬৭-৬৯, ৭১-৭৪, ৭৮, ৮০, ৮২-৮৫, ৮৯, ৯২-৯৪, ৯৬, ১১২, ১১৩, ১১৫-১১৮, ১২১-১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২-১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৫৫, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ১৮৮, ১৯১, ২১২, ২২০, ২২৭, ২২৮, ২৪৬, ২৬১-২৬৩, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৮১, ২৯৪, ২৯৮-৩০০, ৩২৩, ৩৩৬, ৪১১, ৪৪৫, ৪৫৯, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭২, ৪৭৪
আকবর উদ্দীন ৪৪৬
আকবরনামা ১, ৪, ৫, ১৪, ১৯, ২২, ২৭, ২৯, ৩৩, ৪০, ৪৬, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭২, ৭৬-৭৮, ৮৩, ৮৯, ৯০, ৯২-৯৪, ১০২-১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৯-১২২, ১২৫, ১২৬, ১৪০-১৪২, ১৪৪, ১৫০, ১৫৩, ১৫৯-১৭০, ২১৪, ২১৫, ২২৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৭৫
আকবর নগর (দেখুন রাজমহল)
আজম ১৫৭
আদম রাজা ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯৯
আফ্রিকা ৩৬০, ৪২৩
আদেক গোমেজি ৩৪৩
আগা নেয়ামত বন্দী ২০০
আগা মাহদী তেহেরেন ৩২৩
আগরতলা ৪২৩
আগ্রা ১৫, ১৬, ৬৪, ৬৫, ৮৫, ৯৯, ১০০, ১২৬, ১৫২, ১৫৫, ১৭২, ১৭৬, ১৮০, ১৮১, ১৮৮, ২৪৮, ২৫৭, ২৭২, ২৭৩, ২৯৬, ৩১৪, ৩১৬, ৩২৭, ৪৬১
আচারপে ৪১৮, ৪২৪, ৪৩১
আবলাগে (দেখুন আচারপে)
আজমীর ১০৮, ১৫৫, ৩২০, ৪৫৩
আমির-উল-উমরা ৫৬
আতাখান ১৮৫, ২১৬
আত্মারাম ৪১৯
আতিয়া ৭০, ৭১

Edited by Ripon Sarkar

আত্রাই (আত্রেয়ী) নদী ১৩, ১৬৫, ১৯০, ৩০২, ৩২৩
আজম তাজবন্দ ১১৩
আদিল খান ৩৯২, ৪৫০
আদিল বেগ ২২১
আদিল শাহ (আদলী) ১০০
আনোয়ার খান (গাজী) ২৬, ৭৫, ৯২, ২০৮-২১০, ২১২, ২১৬, ২২০, ২২২, ২২৪, ২২৮, ২৭৩, ৩০০, ৪৬৭, ৪৬৯
আফজাল খান ২৩০, ৩৬১
আবুল ফজল ১, ৪, ৫, ১৯, ২০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৭৮, ৮৬-৮৯, ৯২, ৯৬, ১১৩, ১১৪, ১১৭-১১৯, ১২২, ১২৩, ১২৬-১৩১, ১৩৩, ১৩৭-১৩৯, ১৪২-১৪৯, ১৫২-১৫৬, ১৬০-১৬৩, ১৬৮, ২৭৭, ২৯৭, ৩৬১, ৪৬৩
আবুল হাসান মশহদী ২৩
আবুল হাসান শিহাবখানী (দেখুন মুতাকিদ খান)
আবদাল খান ২৮০
আবদুন নবী ৩২৮, ৩৩১, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৭-৩৫৯
আবদুর রাজ্জাক মামুরী ১৫৫-১৫৭
আবদুর রাজ্জাক শিরাজী (মীর) ২২১, ২২৯, ২৫৫, ২৮১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৭২, ৪৪১
আবদুর রহমান পতনী ২০৮
আবদুর রহমান, প্রফেসর ১৬
আবদুর রহীম খান খানান ১১, ১২৩, ১৭১, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৫
আবদুল ১৩৪
আবদুল ওহাব ২৩৫, ২৭৬
আবদুল ওয়াহিদ (সরহদ খান) ১৮৮, ১৮৯, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৮, ২০১, ২০৪, ২০৭, ২০৯, ২২১-২২৪, ২৫৯, ২৭৭, ২৭৯, ৩০০, ৩০৪-৩০৭, ৩০৯, ৩৪৫-৩৪৭, ৩৪৯-৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৭১, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪৪০, ৪৭১
আবদুল কাদির বদায়ূনী ১, ১২৩
আবদুল বাকী ৩২৮, ৩৩১-৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬৬
আবদুল্লাহ আব্বাসী ১৫, ১৬, ১৭৭
আবদুল্লাহ খান ৭১, ৯৫, ১১৫, ১৯৯, ২০২, ২১৬
আবদুল্লাহ খান ফীরুজজংগ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৫১-৪৫৬
আবদুল্লাহ বেগ বদখশী ১৩৪
আবদুল লতীফ ৯, ১৫-১৮, ৪০-৪২, ৪৬, ৪৭, ৯১, ১৬১, ১৭৬-১৮৫, ১৮৮, ১৯৮, ২১৪, ২৫৭, ২৬৩, ২৬৪, ২৭৬, ২৯১, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৫
আবদুল হক চৌধুরী ৩৬৪
আবদুল হাই ৬
আবদুল হামীদ লাহোরী ২৯৪
আবদুস সাঈদ, ড. ১১১
আবদুস সালাম, শয়খ ২৩২, ২৫০, ২৫৩, ২৮০, ২৯০, ৩২৮, ৩৩০-৩৩৩, ৪৭০
আব্বাস খান সরওয়ানী ৯৯-১০১
আমীর তৈমুর ৩৩১
আমজোলা দুর্গ ৩৭৯, ৩৮২
আমা খান কাশ্মিরী ১৭২, ১৭৩
আমরুল পরগণা ১৯০, ৩০২, ৩২৩, ৩৬৭, ৩৯৭
আমীর দাল্লাম বেগ ১৩৪
আরজুমন্দ বানু বেগম (দেখুন মমতাজ মহল)
আরবশির ২৬৬
আরব দস্ত ঘায়েব ৪৬০
আরব দেশ ১৩৫
আরব বদখশী ১৩১, ১৩৪
আরব বাহাদুর ১৩৪
আরাকান ৫, ১২, ১৫, ১৯, ২১, ৩৪, ৩৭, ৩৯, ৫২, ৭৯-৮১, ১১৭, ১৪৯, ১৫৮, ১৫৯, ২০৩, ২০৪, ২০৭, ২১৮, ২৭৭, ৩২৯, ৩৪১, ৩৪৫-৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৪, ৪০৯-৪১১, ৪১৮, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩০-৪৩২, ৪৩৮-৪৪০, ৪৪৩, ৪৫১, ৪৫৮-৪৬০, ৪৭৪, ৪৭৫,
আরামবাগ ১৬৮, ৪৪৩
আরাম বখশ ৪৪৯
আরা ফুলবাড়িয়া ৫৩-।
আর্লি ট্রাভেলস ইন ইন্ডিয়া, হর্টন রাইলী প্রণীত ১০৯
আর্লি হিস্টরি অব কামারূপ, এস. কে. ভূঞা প্রণীত ২৩

Edited by Ripon Sarkar

আলপশাহী (আলপ সিংহ) ৬৯, ৭১, ১৮২, ১৮৬, ২০৪, ২২১, ২৯৯, ৩০৪
আলাইপুর ৪১, ৭৮, ৯১, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৮৬, ২১৪, ২৬৪, ২৬৬, ২৬৭, ২৭৫-২৭৭, ২৯২, ৩৬৭, ৪৪৬, ৪৫১, ৪৫২, ৪৬৭
আলাওল খান ৭১, ৯৫, ১৯৯, ২০২, ২১০, ২১৬, ৩০০, ৪৬৭
আলা বখশ ৭৮
আলা বখশ বরখুরদার ২৭৬
আলী আকবর ২০৫, ২০৬
আলী কাসেম বারলাস ১৩৪
আলী কুলী ইস্তজলু (দেখুন শের আফগান)
আলী খান নিয়াজী ৪৫০
আলী মানিক ২৫১, ৩৫২
আলু খান ২১১
আল্লা খান দখিনী ৩৪২
আল্লামা বেগ ৩৩১, ৩৩২
আসদ খাম ১৫৭, ২৫২
আসফ খান ১৬, ১৭, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৫৯, ৪৬১
আসফ খান জাফরবেগ ৪৪৬
আসাম ৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৮, ২১, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৫১, ১৭, ১৪০, ১৮৭, ২৯৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৩, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৭৫, ৩৮৩, ৪১০, ৪৭৪
আসাম গবর্নমেন্ট ৮
আসাম বুরুঞ্জী ১০, ২৩, ৩৪৫
আসালত খান ৮, ৯
আসিরগড় ১৬৪, ২৯৭
আহমদ ৭৪
আহমদাবাদ ১৫, ১৬, ১৭৭, ২৫৪, ৩৬৫, ৪৫৩
আহমদনগর ৪৫৩
আড়িখোলা ১২০
আড়িয়াল খাঁ নদী ১৯৪, ২৬৪, ৪২৯, ৪৩০
আরাজ খাসা খেল ১১৫
আরাজ গোলাম২৫৪

ই

ইউসুফ বারলাস ২০৭, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৪, ৩৭০-৩৭২, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯, ৪৭০
ইউসুফ বেগ ১৫০
ইউসুফ শাহী পরগণা ১৮৭
ইওজ বাহাদুর ১৩১, ১৩৪
ইকনমিক হিস্ট্রি অব এ বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট, জে. সি. জ্যাক প্রণীত ৯৬
ইকবালনামা-ই-জাহাঙ্গীরী ১, ৬, ১৭৯, ২৪২, ২৬১, ৩১৮, ৩২৪, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫৪ ৪৬২-৪৬৫
ইকরাম খান (দেখুন হুসাম)
ইখতিয়ার খান ৪২, ৪৪-৪৭
ইছামতী নদী ১২, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৫, ১৪৬ ১৫৮, ১৬৯, ১৮০, ১৯২, ১৯৪-১৯৬ ২১৫-২১৭, ২৬৭, ২৯২, ৩৯৭
ইন্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি ১০৮, ৪৪৫
ইতমাদ-উদ-দৌলা (মিরযা গিয়াস বেগ) ১৬, ১৭, ১৭২, ২১২, ৩৬৫, ৩৯৭, ৪৩২, ৪৭০
ইতিকাদ খান ১৬, ১৭
ইতিমাদ খান ১১৬, ৪৪৮
ইন্দ্রনারায়ণ ৪০, ৪১, ১৮৩, ১৮৪
ইন্দ্রমণি ৩৪৩
ইনস্ক্রিপশনস্ অব বেঙ্গল, অধ্যায় ৪, শামস-উদ-দীন আহমদ রচিত ২৪, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১৬৪, ২৫৮
ইফতেখার খান ৯১, ১৮৪, ১৯৫-১৯৮, ২০৬, ২২১, ২২৯, ২৩২-২৩৭, ২৪৩-২৪৫, ২৪৯, ২৬৬, ২৯৯, ৩০৪, ৩১০, ৩৪০৩৬২, ৩৬৭
ইবনে ইয়ামীন ৩১৭, ৩২৫
ইবরাহীম কালাল (ইহতিমাম খান) ৩২৮-৩৩০, ৩৫৮
ইবরাহীম খান ফতেহজঙ্গ ১, ৫, ৮, ৯, ১৬, ১৯, ২১, ৪৬, ২৬০, ২৭৩, ৩৩৮, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৫-৩৬৯, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৯-৩৯৬, ৩৯৮, ৪০০, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৯-৪১১, ৪১৪, ৪১৬, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৮-৪৩৬, ৪৩৮-৪৪৪, ৪৪৭-৪৫৩, ৪৫৭-৪৬০, ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১-৪৭৩,
ইবরাহীমনামা ৮, ৯, ১০
ইবরাহীম নারাল ৭২, ৮৮, ৮৯, ৯৩, ১১৯, ১২১, ১২২, ১৪৩, ১৪৪
ইবরাহীমপুর ২০৩, ২০৪, ২০৮, ২১৮
ইবরাহীম ফতেহপুরী ১৩৬
ইবরাহীম বেগ ১৫০, ১৫৮
ইয়াকুব ৩৫৪

Edited by Ripon Sarkar

ইমাম উদ দীন, ও এস এম, ১১১
ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার ৪৪৬
ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি, কলকাতা ১০৩
ইরাক ২২৯
ইরান ২৩, ১২৫, ১৭১
ইলামচক ১৩৪
ইলাহ ইয়ার ১৯৭, ৩১০
ইলাহদাদ ২৪২, ২৫২
ইলাহদাদ খান ২০০, ৩৪০, ৩৪৩
ইলাহ বখশ ২৬৭, ২৭৫, ৪৬৭
ইলিয়াস খান ১৯৮, ২১৭
ইলিয়াস শাহ (দেখুন, সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ)
ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, মার্টিন সম্পাদিত ৩৬১, ৩৬২
ইসমাইল (ঈসা খানের ভাই) ৫৬, ৫৭, ৬০
ইসমাইল কুলী খান ১১৫, ১২৩, ১২৭, ১২৯
ইসমাইল খান ১১৫
ইসলাম কুলী ১৯৯, ২০২, ২০৮-২১০, ২৭৪, ২৮০, ২৭১, ৩৭৫
ইসলামাবাদ ৩৪৬, ৩৮৩
ইসলাম খান চিশতী ১, ৪-৬, ৯, ১১, ১৪-১৮, ২০, ২১, ২৫-২৭, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫২, ৭৭, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ৯১, ৯২, ৯৪, ১৫৩, ১৫৭, ১৭১-১৮৩, ১৮৫-২০১, ২০৩-২১১, ২১৩, ২১৪, ২১৭, ২১৯, ২২০-২২৬, ২২৮-২৩২, ২৪২, ২৪৩, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫২-২৫৪, ২৫৬-২৬০, ২৬৩-২৬৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৪-২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ২৯০-২৯২, ২৯৪, ২৯৬-৩১২, ৩১৪, ৩৫৬-৩৬০, ৩৬২, ৩৭৪, ৩৭৯, ৩৯৬, ৩৯৭, ৪১১, ৪১৭, ৪২৩, ৪২৬, ৪৪০-৪৪২, ৪৪৪, ৪৫৮, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬৬-৪৭২, ৪৭৪, ৪৭৫
ইসলামনাবা ৮
ইসলাম শাহ সুর ২০, ৫৭-৬০, ৯৯, ১৫০, ১৫৩
ইহতিমাম খান (মালিক আলী) ৬, ৯, ১২, ১৩, ১৭৫-১৭৭, ১৮০, ১৮১, ১৮৫-১৮৭, ১৮৯-১৯২, ১৯৪, ১৯৮, ১৯৯, ২০১-২০৪, ২০৬, ২১৪, ২২১-২২৪, ২২৯-২৩২, ২৩৪, ২৪০, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৪, ২৬৪, ২৬৬, ২৭০, ২৭৯, ২৯৯, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩১০, ৩২৩, ৪১৭, ৪২৬, ৪৪০, ৪৬৬
ইয়াকুব (বায়েজীদ কররানীর ভাই) ৭৫, ২৫৫, ২৫৬
ইয়াকুব বেগ ১৫০
ইয়াক্তা বাহাদুর ৪৪৭
ইয়ালদার বাহাদুর ২৩৯
ইয়ামীন-উদ-দৌলা ১৭
ইয়ারা খান ৪৭৩
ইয়ার বেগ মুহাম্মদ ১৩৪

ঈ

ঈশ্বরগঞ্জ থানা ২৫৮
ঈশ্বরী পট্টনায়ক ৪৩
ঈসা খান উসতাজালী ২৫২
ঈসা খান মসনদ-ই-আলা (ঈসা খান) ১, ৫, ১৮-২০, ২২, ২৬, ২৮-৩১, ৩৮, ৪৯, ৫৩-৭২, ৭৬, ৭৭, ৮৪-৯০, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১১৩, ১১৯-১২২, ১৩৬, ১৪০-১৪৯, ১৫৩-১৫৫, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৯, ২২০, ৪০৩, ৪২৩, ৪৩৬, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৬৮
ঈসা খাঁ ৪২
ঈসা খান মিয়া খেল ৭৬, ৭৭, ১৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫৮, ১৬৯, ২২০, ৪৬৯

উ

উজির খান (সুবাদার) ১৭, ১৩৭-১৩৯, ১৪৪-১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৬০, ১৬১, ১৬৭, ৪৭২
উজির খান ১৭৫, ২০৫, ২১৩, ৪৫০, ৪৫২-৪৫৫, ৪৭৩, ৪৭৪
উজির জামিল ১৩০, ১৩১, ১৩৪, ১৩৬
উত্তরকুল ৩৯০, ৩৯৫
উদয়পুর (ত্রিপুরা) ১২, ৫৫, ৬২, ১০৬, ২৬০, ৩১০, ৪০১-৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৮-৪২৩, ৪২৫, ৪৪২
উদয়পুর (রাজপুতানা) ৪৪৫
উদয় মাণিক্য ৪১, ৪২৩
উদয়াদিত্য ২৬৭-২৭২
উদনার সরকার (সরকার উদাড়া) ২১৪
উনাও জিলা (অযোধ্যা) ১০৪
উপেন্দ্র চন্দ্র গুহ ১৯, ৩১
উমর ২৩৮
উমেদ রাজা (রাজা উমেদ) ৩৮৩
উয়ারী ১১

Edited by Ripon Sarkar

উলুগ বেগ ১৪৬
উসমান ১৫৫
উসমানপুর ২৫৮
উহর ১২, ১৫, ১৯, ২১, ২২৩, ২২৫, ২২৮, ২২৯, ২৩৪, ২৪৯, ২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৮, ২৭৭
উড়িষ্যা ১৪, ১৫, ৪০, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৭৬, ৭৭, ৮১-৮৪, ৮৭, ১০১, ১১৬, ১১৮, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬-১৫১, ১৫৫-১৫৯, ১৬১, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৪, ২২০, ২২৮, ২২৯, ২৩৬, ৩০৯, ৩১৫, ৩১৬, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৫০, ৪৫৩, ৪৫৭, ৪৬১, ৪৬৯

এ

এতিমাদ খাঁ (দেখুন ইতিমাদ খান)
এনাম সিন্দুর ১২, ১৯, ৬৩, ৬৫, ৮৯, ৯০, ৯২, ১২০, ১২১, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৩, ২০৮, ২০৯, ২২০, ২২৫, ২২৬, ২৩০, ২৫৮, ২৬৬, ৩০৫, ৩০৬, ৩১০, ৩২৮, ৩৩৩
এজলী ইয়াকবেল ১৩১
এ রিপোর্ট অন দি হিস্ট্রি অব যেশোর, ওয়েস্টল্যাণ্ড রচিত ১০২
এলাহাবাদ ১৩৬, ১৫৬, ১৮০, ২১৩, ২১৫, ৪৫২-৪৫৪
এলাহি বখশ, মওলানা ১৬৭
এলিয়ট এ্যাণ্ড ডওসন, হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া, অনূদিত ৬, ৪৬২
এশিয়াটিক রিসার্চেস ৪৪৫
এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা ২২, ১০১
এ হিস্ট্রি অব চিটাগং, সুনীতিভূষণ, কানুনগো রচিত ৪৬৪

ও

ওলি বেগ জুলকদর ১১২
ওয়াইজ জেমস ১৯, ২৯, ৩০, ৫১, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০-৬৫, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮৪, ৮৭, ১০১, ১০২, ১৬০, ১৬৬
ওয়াকিয়াত-ই-জাহাঙ্গীরী ৮
ওয়াজির খান (দেখুন উজির খান)
ওয়াকাস বেগ ১৩৪
ওয়ালী মহু বেগ ২৭৪, ২৪৯-২৫১, ২৫৪
ওয়েস্টল্যাণ্ড, জে. ১৯, ২৯, ১০২

ক

কটক ৪৪, ৮১, ১১২, ৩০৯, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪৫, ৪৪৬
কটকী ব্রাহ্মণ ১৭১
কতলু খান (কতলু লোহানী) ৪০, ৪৪, ৪৭, ৪৮, ৭৫, ৭৬, ১১৬, ১৩৪, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৬-১৪৯, ১৫১, ১৫৮, ১৬৯, ১৮৪, ২২০, ৪৬৯
কতরাব ১১, ২০, ৩০, ৬৫, ৬৮, ৭০, ৮১, ৮৪, ৮৯, ৯০, ১৪০, ১৪২-১৪৪, ১৫৪, ১৬৫-১৬৭, ১৯৯, ২০০-২০২, ২১৭, ২১৮, ২৫৪, ৩০৩
কদমতলা ২৫৫, ২৬২
কদম রসুল ১০, ১২, ১৪৩, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৭, ৩০১, ৩৩৩, ৪৫১, ৪৬০
কর্নওয়ালিশ, লর্ড ২৮
কর্ণফুলী নদী ১০৯
কন্দর্প নারায়ণ ২৯, ৫১, ৫২, ৩৭৪
কপোতাক্ষ নদী ২৯২
কমল ৫০
কমলগঞ্জ ২৫৮
কমলা দেবী ৪২৩
কমলা সাগর ৪২৩
করতোয়া নদী ১২, ১৩, ৪০, ১৮৭, ১৯০, ২১৪, ৩০২
কাস্তেলো (এস্তিভো কাস্তেলো) ৩৪৭, ৩৪৮
করম উল্লাহ ১৫০, ৪৭২
করতাল ৩৪৩
কালীবাড়ি ৩৭৪
করিম, ড. আবদুল ২৩, ১০১, ১৩৩, ১৩৬, ১৩৭, ১১৩, ১৬১, ১৬৫, ২১৮, ২৪৭, ৩২৩, ৩৬৪, ৪৬২, ৪৬০
করিমগঞ্জ ৩৬২
কালিদাস গজদানী ৭২, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১১৯, ১২১, ১৪০
কর্ণাট ৫৩
কলাতলি ৩৭৫
কলাকোপা ৯১, ১৭৯, ১৯৮, ২১৫, ২১৭, ৪৫১
কলাবাড়ি পরগনা ৩১৫, ৩২৩, ৪৪৯
কল্যাণ মাণিক্য ৪০৯, ৪১৬, ৪১৮, ৪১৯, ৪২১, ৪২২
কলিকাতা ৩১, ১০২, ১২৩
কসবা ৪৩, ৩৬৩, ৪২১
কাবুল (আফগানিস্তান) ৬১, ৮৯, ১১৯, ১২১, ১৪৩
কমার্স এ্যাণ্ড ব্যাংকে সোসাইটি অব বার্মা ৪২৩

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] ৩০৬, ৩৩৭
[illegible] নদী ৭১
[illegible] পাহাড় ৩৩৪
[illegible] (দেখুন কৈলাসহর)
[illegible] ৭০
[illegible] ২৭০-২৭২, ৪২৭
[illegible] ১৫০
[illegible] ৩৮৫
কাছাড় ৫, ১৪, ১৫, ১৮, ৩৬, ২৪৬, ২৬০, ২৭৭-২৭৯, ২৮১, ২৯১, ২৯৩, ৩০১, ৩০৫-৩০৭, ৩১১, ৩২০, ৩৩৮, ৩৩৯, ৪১৩, ৪৬৬, ৪৬৮
[illegible] জেলা ১৩, ১৪৬, ১৭৮, ১৯১, ১৯২, ১৯৫, ২১৫, ২১৬
[illegible] ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬৪, ৪০১
[illegible] জেলা ১৭৮, ১৭৯, ১৮৫, ১৯৮, ২১৫
কানুনগো, ড. সুনীতিভূষণ ৪৫৮, ৪৬৪
[illegible] পাহাড় [illegible] ৪৫০
[illegible] রাজা ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯৯
[illegible] ৩৭৫
[illegible] ৩৭৫
[illegible] ১৭১, ৪০০
[illegible], [illegible] ১০২
[illegible] ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৪২, ১৮১, ৪৫৯, ৪৬০
কামতা (কামতাপুর) ৩৬, ১৮৭-১৮৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৮২, ২৮৭, ২৮৯, ২৯১, ২৯৪, ২৯৬, ৩২০, ৩২৬-৩২৮, ৩৩১, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫৮, ৩৬৫, ৩৭৭, ৪১৩, ৪৩৯, ৪৫০, ৪৬৬, ৪৬৮
কামরূপ ৫, ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৮, ২০, ২৬, ৩৬, ৫১, ৭০, ১১৭, ১৮৭-১৮৯, ২৬০, ২৭০, ২৭৩, ২৭৭, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৭-২৮৯, ২৯১, ২৯৪, ২৯৫, ৩০০, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২৫-৩২৮, ৩৩০-৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৪-৩৪৭, ৩৪৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৫-৩৬৭, ৩৬৯-৩৭১, ৩৭৪-৩৭৯, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০-৪০০, ৪১৩, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৯-৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৭-৪৫০, ৪৫৩, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬৬-৪৬৮, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩
কামরূপ বুরঞ্জী ৩৯১
কামরূপের বুরঞ্জী ১০, ২৩, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৯০, ৩৯৫, ৩৯৭-৪০০, ৪৭৩
কামাখ্যা [illegible] ৩৯১
কামাখ্যাপীঠ ৩৮৪
কামাল-উদ-দিন ৪৫৬
ক্যাটালগ অব কয়েন্স ইন দি ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, ক্যালকাটা, ভল্যুম ২। ১১১
ক্যালকাটা রিভিউ ১০২
[illegible] ১০৬
[illegible] ([illegible]) ৯৯, ১০০
[illegible] ১৫৭, ১৫৮
[illegible] ৭০
[illegible] ৪৫০
[illegible], জে. এন. ২৭৬
[illegible] ৪০০
[illegible] পাহাড় ৪৯, ১১৮, ১০৬
[illegible] নদী ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৯
[illegible] ৩৫০
[illegible] ([illegible]) নদী ১০৬
[illegible], [illegible] ৩৬
[illegible] ২৫৪
[illegible] ৭০, ৮০, ১২০, ১৬৬, ১৯৯
[illegible] (দেখুন [illegible])
[illegible] ১০২
[illegible] ১৮, ৭২, ৪০১, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৯, ৪২০
[illegible] ২৭০, ৪০৭, ৪১৫
[illegible] ১৭২, ৪০২, ৪৬১
[illegible] ১৩১, ১৩২
কাসিম খান (সুবাদার) ৮, ১১, ২১, ৪৬, ২২৫, ২২৬, ২৭৯, ৩১৮-৩২০, ৩২৪-৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৮-৩৪২, ৩৪৪-৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫২-৩৬০, ৩৬৩-৩৬৯, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯৮, ৪০৯, ৪১০, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩১, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৭, ৪৭১, ৪৭২
কাসিম খান [illegible] ([illegible]) ৪৬২
কাসিম [illegible] ৭৬, ৯৪
কাসিমপুর ৭৬, ৯৪
[illegible] ৪২, ৪৪
[illegible] ৩৩৫
কিশওয়ার খান ২২৫, ২২৯, ২৩২, ২৩৩, ২৩৮, ২৪০-২৪৫, ৩১৪, ৪৭০

[illegible] ৫৬, ৮৯, ৯৮, ১৮০, ২৫৭, ২৫৮
[illegible] ১৫১
[illegible] ১৪৫
[illegible] ২১৫
[illegible] ([illegible]) ২৭৮
[illegible] ৩২
[illegible] ১২০
[illegible] ([illegible]) ৫৭
[illegible] ১, ৫, ১৭১-১৭৩, ১৮১, ২১২, ২১০, ২২৫, ৩১১, ৩১৩, ৩১৮, ৪৭০
[illegible] ১১০
[illegible] ১০, ১২০
[illegible] ৫২
[illegible] ([illegible]) ২০০, ২০১
[illegible] ১৬২, ২১৯, ৩৬০, ৪১১, ৪২১, ৪২০
[illegible] ১০৪
[illegible] ২১১
[illegible] ৭০, ৭১
[illegible] ১৫৭, ২০৬, ২১৮
[illegible] ৩৭০, ৩৮০, ৩৮১
[illegible] ৩৬৫, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৭-৩৮১, ৩৮৪-৩৮৬, ৪৭১
[illegible] ২১২
[illegible] ৪০
[illegible] ৪২০
[illegible] ৩১, ৬৯, ১০৬
[illegible] ৩৭২, ৩৮৭
[illegible] ১, ৫, ২৬, ২৯, ৫০, ৫৪, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৫, ৯০, ৯০, ৯৬, ১৫৭-১৬০, ১৬৯
[illegible] ১১, ৩০, ১৬২, ৪৫৭, ৪৪৫
[illegible] ৩৫৬, ৩৬০, ৪০২, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৪২১, ৪২০
[illegible] ৩০
[illegible] ৩১৮, ৩৬৫, ৩৮৬
[illegible] ৫, ২৬, ৩৬, ৩৯, ১১৭-১১৯, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৫০, ১৫৪, ১৮৭-১৮৯, ২৭০, ৩০১, ৩৬৬, ৩৭৭, ৩৮৬, ৪১০, ৪৫৯
[illegible] ([illegible]) ১২৫, ১২৮, ২০১, ২০৪, ২১৭
[illegible] ([illegible]) ৩৫৪, ৩৫৫
[illegible] ৩৫১, ৩৫২, ৩৬০
[illegible] ৬১
[illegible] ৭১

খ

[illegible] ৩৮২, ৪০০
[illegible] ১৮৭, ১২৪, ৩৩৪
[illegible] ২৭০
[illegible] ৬০, ৭০
[illegible] ১০৬
[illegible] ২০
[illegible] ৭৬
[illegible] ([illegible]) ৬, ১৫২, ১৫০, ১৬৪, ১৭১, ১৭৬, ১৮১, ২২৭
[illegible] ১৬৬
[illegible] ১৬, ৩৬৫
[illegible] ৪৫৫, ৪৫৭
[illegible] ২১০, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৯, ২৫২, ২৫৫, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৫৪, ৪৫৭, ৪৬৯
[illegible] ২১০, ২৪৫, ২৪৭, ২৫০-২৫২
[illegible] ১, ৫, ৬, ১০, ১১, ১৪, ১৬, ১৯, ২১, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৪, ৭১, ৭৫-৭৭, ৯০-৯২, ১৩১, ১৪৭, ১৫১, ১৫৮, ১৫৯, ১৭০, ১৭৬, ১৭৯, ১৮২, ১৮৬, ১৯৮, ২০৬, ২০৮-২১১, ২২০-২২৪, ২২৬-২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩০-২৩২, ২৩৪-২৩৮, ২৬১, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৭২, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৯-২৮১, ২৯০, ২৯৬-২৯৯, ৩০১-৩০৮, ৩১১, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩৬২, ৪১০, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৬৭-৪৭০, ৪৭২
[illegible] ২২০, ২৩১-২৩৩, ২৩৭, ২৪৫, ২৪৮, ২৫০-২৫৫, ৪৪৫, ৪৬৭, ৪৬৯
[illegible] ([illegible]) ২৬৭-২৬৯, ২৮২
[illegible] ২২১, ২২০
[illegible] ৩৮২
[illegible] ১৯৮, ২২২, ২২৬, ২৩১, ২৭২, ২৭৯-২৮০, ৩০৭, ৩৩৫, ৩৫৩, ৩৬১, ৪৭২
[illegible] ৪৭০
[illegible] ২২০, ২০০, ২৪১, ২৪৫, ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ৪৩৪, ৪৪৫, ৪৪৮, ৪৬৭
[illegible] ২৪০
[illegible] ১৫৭, ২০৫

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] ২১১, ২২০, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২৩২, ২৩৬, ২৪৫, ২৪৯, ২৫১-২৫৩, ৩৬১

[illegible] ১৫৮

[illegible] ৩৬২

[illegible] ২১১, ২২০, ২২৪, ২২৫, ২২৮, ২৩৮, ২৩৯, ২৩৩-২৩৫, ২৪৯-২৫৪, ২৬১, ৩৩৫, ৩৩৭

[illegible] ১৬১, ১৬২

[illegible] ([illegible])

[illegible] ২৫২

[illegible] ([illegible]) ১৪, ৫৪, ৭৬, ৭৭, ১৫১, ২২০, ২৩৫, ২৪১, ৩৬১

[illegible] ([illegible]) ১৫৭

[illegible] ৩৫৭

[illegible] ৩৯

[illegible] ১৩৪

[illegible] ([illegible]) ১৩৫-১৩৮, ১৫০, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৭১, ২২৭

[illegible] ২৬০

[illegible] ৫০, ১৮৬

[illegible] ১৬০

[illegible] ৩৬০

[illegible] ১২৪

[illegible] ২৫, ৪৭, ৫৮, ৬১, ৬৭, ৭২, ৭৪, ৮৮-৯০, ১১২, ১১৪-১১৭, ১১৯-১২০, ১২৬-১২৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৪০, ১৪৪, ১৪৯, ১৬০-১৬২, ২১৪, ২৬০

[illegible] ১৪৪, ২৬০

[illegible] ৩৩৪, ৩৪২, ৩৪৩

[illegible] ৪২৯

[illegible] ৩৫২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮

[illegible] ৩৭৮, ৩৭৯

[illegible] ১২৯, ১৩৪, ১৩৫, ১৬০

[illegible] ১৫৬, ১৯১, ২১৬

[illegible] ৫০, ৯৫, ১৭৩, ১৮৭, ১৯৩, ৪৭০

[illegible] ৭০, ৭২, ১৩৫, ১২১

[illegible] ৯৯, ১০০

দিনাজপুর ১২, ২৯, ৫০, ৭২, ৮৪, ৯০, ১৪০, ১৪২-১৪৪, ১৫৫, ১৬৬, ১৯৯-২০২, ২১৭২৩০, ৩৩৩, ৩৪৫, ৩৫০, ৩৫৪, ৩৭৪, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬০

[illegible] ২৮৭, ২৯৫, ৩৩০-৩৩২, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬০-৩৬২

[illegible] ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪৪, ৪৪৫

[illegible] ১৫৮

[illegible] ২০, ২৬, ১৫৬, ২৬০

[illegible] ৪৫০, ৪৫০-৪৫৫

[illegible] ৪৪৫

[illegible] ২২১

[illegible] ১৩৪

[illegible] ১২৩

ন

[illegible] ১৫৭

[illegible] ১৩৪

[illegible] ৪৪৫

[illegible] ২০৫, ৩৪৭-৩৫০, ৪২৯

[illegible] ৪৫৫

[illegible] নদী ২৮৭, ২৮৮, ২৯৫, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩৬১, ৩৬৩

[illegible] ৫০

[illegible] ৫২

[illegible] ৩৪৩

[illegible] ২৫৮

[illegible] নদী ৩৩৭, ৩৬২, ৩৮৫

[illegible] নদী ৩৩২, ৩৬১

[illegible] ২৯২

[illegible] ১৩৫

[illegible] নদী ৩১, ৭৮, ৮০, ৮৫, ৮৯, ৯২, ৯৩, ১১৩, ১২১, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৪৯, ১৬১, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৭, ২১৪, ২১৫, ২১৮, ২৯৯, ৪৫২, ৪৫৭, ৪৬৩

[illegible] ৭০

[illegible] ১০২

[illegible] ৮৮, ১১০

[illegible] ৭৩, ৩৭৯, ৩৯৮, ৩৯৯

[illegible] ১১১

[illegible] ([illegible]) ২৮২, ২৮৬-২৮৯, ৩০০, ৩৩২-৩৩৬, ৩৬১, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৫

[illegible] এস. এম. [illegible] ১০২

নিজাম-উদ-দীন আউলিয়া ৩৭২, ৩৭৩, ৩৯৭

নিজাম-উদ-দীন [illegible] ৩৩৬, ৩৭১-৩৭৩

নিজাম খান ([illegible] নিজাম-উদ-দীন) ৯২, ১৮২, ২০৪, ২০৯, ২২০-২২৩, ২২৯, ২৩০, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৬, ২৬৭,

Eidited by Ripon Sarkar

২৭০-২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৯, ৩০৪-৩০৬, ৩০৯-৩১১, ৩২৫, ৩৯৭, ৪৭০
গোদাগাড়ি ১৬৪, ১৭৭, ২০৫, ২২৭
গোর দুর্গ ৩৩৩
গোপালপুর গ্রাম ২১৪
গেইট, ই. এ ২৫, ২১৯, ৩৬৫, ৩৯৭
গেসুন টান ৩৩০
গোপাল মলকত ৩৮৬
গোবিন্দপুর ১৫৪
গোবিন্দ মাণিক্য ৪০১
গোবিন্দ মামুদ (দেখুন আবু গোবিন্দ)
গোবিন্দ দত্ত ৩৮০
গোবিন্দ সামন্ত ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪
গোমতী নদী ৪১২, ৪১৩, ৪১৯, ৪৩১
গোমতী নদী (উত্তর বঙ্গে) ৪৬০
গোমতী ২১৪
গোলাপুর ৪৪৫
গোলাম আকবর ৩৬২
গোলাম হোসেন সলীম ১, ৫, ৪৩৯, ৪৬১, ৪৬৪
গোয়া ৮০, ৩৫০
গোয়ালপাড়া ২৮৫, ৩৩৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৯১, ৩৯৮
গোয়ালন্দ ১৮৫, ২১৭
গোঘাট ১১৭, ১২১, ১৬১, ১৭৭, ১৮৫ ১৮৬, ২২১, ২২৪, ২৬৪
গৌরীপুর উপজিলা ২৫৭, ৪৬৯
গৌরী নদী ৪১৩
গৌহাটি ২৮৫, ৩৩৭, ৩৬২, ৩৯৯
গৌড় ১০, ২৮, ৪৫, ৫৯, ৬৭, ৮১-৮৩, ৯৫, ৯৭, ১০১, ১১২, ১১৩, ১৬১, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৩, ১৯২, ২১৪, ২১৮, ২৭৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৩

ঘ

ঘাঘরা নদী ২৮৯
ঘাটিন মনসুর ৮২
ঘিয়াস বেগ মসুমী ৪৫৯
ঘোড়াঘাট ১৫-১৮, ৪০, ৪৮, ৮৬, ৯১, ৯৫, ১১৩, ১১৮, ১৩৯, ১৩৮-১৪০, ১৪৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৫৯, ১৬২, ১৭৫, ১৭৭, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮৫, ১৮৭-১৯০, ১৯২, ২০৪, ২০৯, ২১৪, ২২১, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৯, ২৮৬-২৮৯, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩১৯, ৩২৫, ৩৬৫, ৩৬৭, -৭৮, ৪৪৯, ৪৬৬
ঘোড়াশাল ১৬৫

চ

চট্টগ্রাম ১৪, ১৯, ২১, ৪৮, ৫১, ৫২, ৮০, ৮১, ৮৮, ৯৮, ৯৯, ১০৮, ১৪৮, ১৪৯, ১৪৮, ২০৪, ২০৫, ২০৭, ২১৯, ২৭৭, ২৯১, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫৫, ৩৬৯, ৩৬৪, ৪১০, ৪১১, ৪১৯, ৪২০, ৪২৩, ৪৩১, ৪৪০, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ১১১
চন্দ্রদ্বীপ ৩০, ৭৯, ৮১-৮৪
চন্দ্রগড় ৪০৪, ৪১২, ৪২৪
চন্দ্রকেতু ৪৪, ৪৫
চম্পা দুয়ার ৪০৭, ৪৪২, ৪৪৫
চন্দ্রকোণী (দেখুন চন্দ্রকোনা)
চন্দ্রকোনা ৪৭, ২৭৭, ৩৪০, ৩৬২, ৩৬৯, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৪৩, ৪৪৪
চন্দ্রদীপ ২৯, ৫১
চন্দ্রকোণা ৪৭, ৩৪০, ৩৬৯, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৪৩, ৪৪৪
চন্দ্রাবতী ৩৯৯
চম্পানগর ৩৯
চন্দ্রিমা ৪২৪
চাগতাই সুলতান ৩৩০
চান্দুর ১৮০, ২১৫
চাটমোহর (চাটমহল) ২০, ২৭, ৪৯, ১৮৬, ১৮৭
চার্নক কাপ্টেন ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৪৫
চারঘাট ২৭৫
চার্লস স্টুয়ার্ট ২, ৩, ১৫, ১৭৯, ২১৫, ২৫২, ২৬২, ২৬৪
চীন দেশ ৮৩
চীন সাগর ৭৪, ৯৪, ৯৬
চিনপুর ২১৯, ৩৩৮
চীন প্রকাশ ৫০, ৭৩, ৭৪, ৯১, ৯৪, ৯৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৩, ৪৭০
চীন মজলুম ৩৩৩, ৩৭৪, ৩৭৫
চীন যাত্রা ২৯, ৫৩, ৫৪, ৬২, ৭৬-৭৮, ৮৩, ৮৫
চিলমারী ঘাট ২১০, ২১৯, ৩২৫
চিতোর ২২৪
চিত্রা নদী ২১৬
চিলারায় (নাম শুক্লধ্বজ) ২৫৯, ২৭৪, ৩৭১, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪৭০, ৪৭১
চিলারায় সেতেলী ৩২৪

Edited by Ripon Sarkar

চন্দ্রদ্বীপ ৭৮, ১৮৫, ১৮৬, ২৬৭, ২৭৫, ৪৬৭
চুনার দুর্গ ৪৫৩
চুল ১৭৬, ২১৪
চুর্ণিকা ৩৮৫, ৩৯৯, ৪০০
চৌদ্দগ্রাম ১০৬
চৌপর খেলা ১২৩
চীনা ৭০, ১১০, ১২০, ১২১, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৪
চৌসার যুদ্ধ ৯৭
চৌরাশিন পরগনা ২০৪, ২৫৮, ২৬২, ২৬৪

ছ

ছত্রিশা গড় (ছত্রিশগড়) ৪০৪, ৪০৫, ৪১২, ৪২৪
ছোট নাগপুর ৩৯, ১৮৪
ছুরির ৩৬

জ

জগত সিংহ ৪০, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৬১, ১৮৪
জগদেব ৩৪০, ৩৪৩
জগন্নাথ মন্দির ১৫১, ৪৪৫
জলুভরাল (দশকৌড়ি বা পৌর) ২৮, ১৫৭, ১৬৭, ২১৮
জনপদ ১১৬, ১১৭
জমাদি ১০০, ১০৪, ১০৬, ১০৯, ১৬৫
জমি ২১৪, ২১৬, ২৬৬
জমির বেগ ৩৩৩
জমশেদ মহম্মদীন ১০৫
জমলা ৩৬২
জরিমানা ২৭৮
জলাপুর (জলপাড়া) ৩৩২, ৩৩৩, ৩৬২
জরিমানা ২৭৮
জলী ৩৬৮
জলসত্রাদি ৫৬, ৫৯, ১০৪
জসলী ৩৬৯
জসলী বসন ৩৯৪
জহ মুহম্মদ কলুী ১৬৩
জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি, ত্রিবান্দ্রম ২৩
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা ১০৯., ১৬৭, ২১৮, ৩১৪
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, কলকাতা ৪৯, ১০৭, ১০৯, ১১০
জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ঢাকা ৪২৫
জার্নাল অব দি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী ২৩, ১৭০, ৩২২
জার্নাল অব দি নিউমিসম্যাটিক সোসাইটি অব ইন্ডিয়া ১১৩
জার্নাল অব রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৬৪
জার্নাল অব বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি ৮, ২২, ১৬১
জাজনগর ৫০, ১৮৭, ২১৫
জাফর বেগ ১০১, ১০২, ১০৪
জাফর শাহী ৭০
জামানা বেগ (দেখুন মহাবত খান)
জামাল ৪৪
জামাল-উদ-দীন হোসেন আঞ্জো (দেখুন জামাল-উদ-দীন হোসেন আঞ্জুয়া)
জামাল খান ২৬৭-২৬৯, ২৭১, ৩৫৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৭, ৩৪৩
জামালপুর ৭০
জামাল বখতিয়ার ১৪৫
জামাল খান মঙ্গলী ২৮০, ২৮১, ২৮৬, ২৮৮, ৩৩১, ৩৪০, ৩৪৩
জ্যাক জে. সি. ৯৬
জালাইর খান (দেখুন শীরক বাহাদুর জালাইর)
জালামুখী ৪৩, ৪৪
জাহেদার ১২৩, ১২৯
জালাল খান কাররানী ১৫৭
জালাল খান শিরওয়ানী ২৫২
জালালাবাদ ১৫১, ৪২৬, ৪৪৩, ৪৫৭, ৪৬৪
জাহান খান পন্নী ২০১
জাহাঙ্গীর ১, ২, ৪, ৯, ১৪-২০ ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ৩১, ৩৩, ৩৮, ৪০, ৪৭-৪৯, ৫১, ৫২ ৫৪, ৭২, ৭৬, ৭৮, ৮১-৮৪, ৯০-৯৬, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৭, ১৬৪, ১৭১-১৭৩, ১৭৬, ১৮০, ১৮১, ১৯৭, ২১২, ২১৩, ২২৬, ২২৭, ২৪২, ২৪৩, ২৪৬, ২৫৭, ২৬৩, ২৭৮, ২৯১, ২৯৬, ২৯৭, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২১, ৩২৫, ৩২৯, ৩৫৬, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৯৬, ৪০৪, ৪০৬, ৪১০, ৪১২, ৪১৯, ৪২০, ৪৩০, ৪৩২-৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪৫, ৪৪৭, ৪৫৩, ৪৫৯-৪৬০, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৭৫
জাহাঙ্গীরনগর (দেখুন ঢাকা)

Edited by Ripon Sarkar

জাহাঙ্গীর কুলী খান ১৭২, ১৭৩, ১৭৬, ১৮১, ২৩০, ২৯৬
জাহাঙ্গীরনগর (দেখুন ঢাকা)
জাহিদ খান ৪৫০, ৪৫৬
জিজি আবলা ১৫৫
জিলান ১২৪
জুতিয়া দুর্গ ৩৩৬
জুনায়েদ বাগদাদী ১১, ২৩
জুমরিয়া দুর্গ ৩৯২
জুলক আলী ১৩১, ১৩৪
জেরেট এইচ. এস ১৬৯,
জৈন খাঁ (জৈন খান) ৪৩, ৪৪, ৪৬
জোনায়েদ কররানী ১১৬
জোয়ার শাহী পরগণা ৬১, ৭০, ৭২, ১০৬, ১১১
জোয়ার শাহি ৭০
জোয়ার হোসেনপুর ৭০, ৭১
জৌন (দেখুন দুন)
জৌনপুর ১২৪, ১২৮, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬০

ঝ

ঝকরা-ঝরণা ৪৭, ২৭৭, ৪২৬, ৪৪৩, ৪৫৭
ঝরিয়া ঘাট ৩৭০, ৩৯৭
ঝাকর খান ১৫৪
ঝাড়খণ্ড ৪৭, ৪৪৩
ঝাড়খণ্ড ৩৯, ১৮৩
ঝিনাই নদী ১১৭, ৪৬০
ঝুসী (দেখুন ঝোসী)

ট

টঙ্গন্ নদী ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৯
টমাসের যুদ্ধ ৭, ৯, ৪১৭, ৪৫৬, ৪৫৭
টপোগ্রাফী এ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস্ অব ঢাকা, জেমস্ টেলর প্রণীত ১৬৬
টঙ্গী ১২০, ১৬৫
টাঙ্গাইল ৭০
টাকশালিয়া ১৬৮
টিলাগাজী ৭৪, ৮৯, ৯৩, ১১৯, ১২০, ১২২, ১৪৪
টেকনাফ ৪২০
টোক ১২, ১৪, ৮৯, ৯০, ১২০, ১২১, ১৪০, ১৪৩, ২০৯, ২২২, ২২৪, ২২৫, ২৫৮, ২৬৬, ২৮০, ২৮৫, ২৯০, ৩০৩, ৩১৭, ৩১৯

ড

ডাকী পাহাড় ১৮৩, ১৮৪
ডাকাতরা ১২, ১৩, ৯৫, ১৯২-১৯৮, ২০৮, ২১০, ২১১, ২১৬, ২১৭, ২২৪, ৩০১, ৪০৭
ডাকাতিয়া খাল ২০৭, ২১৯, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫২
ডাপু (পার্বত্য রাজা) ২৮৩
ডালম সেন ৩৩৮, ৩৮৬, ৩৯১
ডিসার্টেশন কনসার্নিং দি ল্যান্ডেড প্রপার্টি অব বেঙ্গল, রাউস রচিত ২১ ডিহিকোট (দেখুন দিহিকোট)
ডু-জারিক ৭৯-৮১
ডুমুরিয়া ২৮৭, ২৮৮, ২৯৫, ৩৩৮, ৩৮৬
ডুলাব পাহাড় ১৮৪
ডেমরা ১২, ১৪২, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২১৭
ডোম জেরোনিমো ডি. আজেভেডো ৮০

ঢ

ঢাকা ৭, ১০, ১৯, ২১, ২৬, ২৭, ৩০, ৪৪-৪৬, ৬০, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৬, ৮১-৮৫, ৯০-৯৩, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০২, ১২০, ১৪১, ১৪৭, ১৪৮, ১৬৬, ১৬৭, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৮-১৮২, ১৯১, ১৯২, ১৯৮, ১৯৯, ২০৫, ২০৯, ২১০, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২২, ২২৪-২২৬, ২৪৮, ২৫০-২৫২, ২৫৮, ২৬২-২৬৪, ২৬৬-২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৮, ২৮৫-২৮৭, ২৯০, ২৯৯, ৩০০, ৩০৪, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৫, ৩১৬-৩১৮, ৩২০, ৩২১, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭-৩২৯, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৫৬-৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৭-৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৫, ৩৯০-৩৯২, ৩৯৫, ৩৯৮, ৪০০, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৯, ৪১০, ৪১৪-৪১৬, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২৩, ৪২৮-৪৩০, ৪৩২, ৪৩৪-৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪৬-৪৪৮, ৪৫০-৪৫২, ৪৫৪-৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬২, ৪৬৬-৪৬৮
ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নাল, ভল্যুম ১, ২১৫
ঢাকা, এ রেকর্ড অব ইটস্ চেঞ্জিং ফরচুনস, এ. এইচ. দানী প্রণীত ২১৫, ৪০০
ঢাকা দি মোগল ক্যাপিটাল, আঃ করিম প্রণীত ১৬৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২, ৮, ২৫, ৩৩, ৫২, ১৯৩

Edited by Ripon Sarkar

ঢাকা মিউজিয়াম ৪১৩
ঢাকা রিভিউ (পত্রিকা) ১৬২

ত

তকরিহ (পার্বত্য রাজা) ৩৮৩
তবকাত-ই-আকবরী ১
তবীব ২৮৩
তবারাহিম্মা ১২৩
তরখান দিওয়ানা ১৪৬
তরফ ১২, ১৮, ৬২, ৬৩, ৭৫, ২১১, ২১৯, ২২৪, ২২৬, ২২৮, ২৩১, ২৫৯, ৩০৮
তরাহ ১৫৮
তরসুন খান ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮-১৪১, ১৪৩, ১৬৪
তসলিম খান ৩৭৫, ৩৬২
তহল ৩৭৫
তাকুনিয়া (টাকুনিয়া) ৩৩৪, ৩৭৬
তাজ খান ৪২-৪৬, ১২২
তাজ খান কররানী ২২, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ১০১
তাজপুর ১৩৮, ১৪৬, ১৫০, ১৬৪, ২২৩, ৩৫৮, ২৫৯
তাজপুর-পূর্ণিয়া ২০৬, ২১৮, ৪৩৫, ৪৭৩, ৪৮৪
তাজমহল ১৫২
তাতার খান নাসির ২২২, ২২৩
তাতার খান খেওয়াতী ২২৯, ২৩১, ২৪১, ২৮০, ৩৫৪, ৩৯৭
তারাব ১৬৬
তারীখ-ই-খান জাহানী ওয়া মখজন-ই-আফগানা ১০০
তারীখ-ই-ফিরিশতা ১
তারীখ-ই-ফীরুজশাহী ১০৯, ১৬৩
তারীখ-ই-শেরশাহী ১০০, ১১১
তালা গাজী (দেখুন টিলা গাজী)
তালিপাবাদ (তালিবাবাদ) ৭৩, ৭৪, ১২০, ১২২, ১৪৪
তাশ বেগ ১৩৪
তাশপুর ৩৭৫
তাহির ইলানচক ১৪৬
তাহির সাইফ-উল-মুলক ১৪৮
তাঁড়া (তাণ্ডা) ৩৭, ৩৯, ৮৩, ৮৭, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১১৯-১২২, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭-১৩৯, ১৪১-১৪৪, ১৪৬, ১৪৮, ১৫০-১৫৩, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৭৭, ২১৪, ২২৮, ২৯৯, ৩৮৬, ৪৬৬
তাইফুর, এস. এম. ১০২, ১৮০
তিতুলী ১৭৭, ২১৪
তিপুরা ১৭৭, ১৭৮, ২১৪
তিব্বত ৮৭
তিমুর খান ১৩১, ১৩২
তিস্তা নদী ৩৯
ত্রিপুরা ৫,. ১০, ১২, ১৪, ১৫, ১৮-২১, ২৬, ৩৪, ৫২, ৫৪, ৬০-৬৩, ৬৫, ৬৬, ৭২, ৮০, ৯৩, ১১৭, ১২১, ১২২, ১৪৩, ১৬২, ২১৯, ২৬০, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৮৩, ৩৯০, ৪০১-৪০৫, ৪০৯-৪২৩, ৪২৫, ৪২৬, ৪৩০-৪৩২, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৫০, ৪৫৮, ৪৬৮
ত্রিবেণী ৮৫, ১৪৫, ১৪৬, ১৬৭, ১৬৯, ২৯২, ৩৭৮
ত্রিমোহনী ১৬৮, ১৬৯, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৯৬
ত্রিশাল ২১৫
ত্রিহুত ১১৩, ১৩৪, ৪৪৫
তুকমক খান ১৮৬, ১৯১, ১৯৫, ২১০, ২০২, ২০৪, ২২১, ২২৩, ২২৫, ২৫৫, ২৯৯,
তুকারায়ের যুদ্ধ (মোগলমারীর যুদ্ধ) ৬৭, ২৪৬, ২৬১
তুঘলক ডাইনেস্টি, আগা মাহদী হোসেন প্রণীত ৩২৩
তুযুক-ই-জাহাঙ্গীরী (তুযুক) ১, ৫, ৬, ৯, ১১, ১৪, ১৬ ২১, ২৩, ৮৩, ১৭১, ১৭৩, ১৭৬, ১৭৯-১৮২, ২১২-২১৪, ২২৬, ২৩৫, ২৪২-২৪৪, ২৪৬-২৪৯, ২৫২, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯-২৬২, ২৬৪, ২৭৭, ২৯৭, ৩১৩, ৩১৫-৩২৫, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৭৭, ৩৯৬-৩৯৮, ৪১০, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪৪-৪৪৬, ৪৬৩-৪৬৫, ৪৬৮
তুপিয়া (তোপিয়া) ২২৬, ২২৭, ২৩১, ২৩২, ২৫১, ২৫১, ২৫৫, ২৬০
তুফান বাহাদুর ৩৫৪
তুরাগ নদী ৭৪
তুরান ৫৭, ৬০
তেলিয়াগড় ৩৯, ৬৭, ৮৮, ১১৫, ১৩২, ১৩৫-১৩৭, ১৬১, ১৬৪, ৩৬৫, ৪৫৬
তেলিজালা ৪৪৫
তৈমুর তাশ ১৩৪
তৈমুর বদখশী ১৩৯
তোডরমল্ল (দেখুন রাজা তোডরমল্ল)

থ

থাট্টা ১৭১, ৪৬০
থিরি থুধম্ম (দ্বিতীয় সলীম শাহ্, আরাকানের রাজা) ৪৫১

দ

দক্ষিণকূল ৩৩২, ৩৭৩-৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৪, ৩৯৫
দর্প নারায়ণ ৩৭৭
দমদমা ৩৩৫, ৩৩৬
দরজী বাহু ২৫২
দরিয়া খান (শের খাফতেহজঙ্গ) ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৭, ৪৫৩-৪৫৬, ৪৭৩
দরিয়া খান পত্নী ২৫২
দরিয়া খান ৪৪, ৫০, ৫৭, ৯১, ৯৪, ১৮৬, ১৯২, ২২৩
দরিয়াপুর ৪৩
দশজাহানিয়া রাজু ৬৯
দলগাঁও ৩৩৩, ৩৬২
দলপত ৪৭
দল-দলপতি (পার্বত্য রাজা) ৩৮৩
দাউদ কররানী ১, ২০, ২৫, ৩৮-৩৯, ৪৭, ৪৮, ৬৭, ৭৫, ৭৯-৮১, ৮৪, ৮৮, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৫-১১৮, ২১৪, ২৩৩, ২৬১, ২৬৩, ৩২০, ৪৬৬, ৪৬৯
দাউদ খান (ঈসা খানের ছেলে) ৭১, ১৯৯, ২০১
দাউদ খান ৪২, ৪৪, ৪৬, ১৫৮, ১৬৯, ২০২, ২০৩
দাক্ষিণাত্য ৬, ৭, ১৬, ২২, ১৬৪, ২২৫-২২৭, ৪২১, ৪৩৩, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৬১
দাতু ২৫৬
দানিয়াল (যুবরাজ) ১৬, ১৫০
দানী, এ. এইচ. ১৮০, ২১৫, ৩২৪, ৪০০
দামেক ৪৫১
দারাশিকোহ (যুবরাজ) ২৯৭, ৪৫৩
দ্বারকাদাস ৪৪
দ্বারভাঙ্গা ১৫০
দারার খান ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৪-৪৫৯, ৪৬২, ৪৬৪
দাসতাম খান কাকশাল ১৪৫, ১৪৮
দি ডিস্ট্রিক্ট অব বাকেরগঞ্জ, বেভেরীজ প্রণীত ১০২, ১০৯
দিনাজপুর ৪০, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ২১৮
দিপালপুর ৪২৩
দিবাকর পাত্র ৪৪
দিলাওয়ার ৭৬
দিলীর বাহাদুর (দিলীর খান) ১৮৫, ১৮৬
দিল্লী ১, ৬,. ১৬, ২০, ৫৫, ৬০, ৭৩, ৮০, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১১৪, ১১৬, ১২৬, ২২৬, ২২৭, ২৭৩, ৩৬১, ৪০৪, ৪০৭, ৪০৯, ৪১০, ৪১৫, ৪২৮, ৪৩৮, ৪৪৮, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৯, ৪৬১, ৪৬৩, ৫৬৭, ৪৬৮, ৪৭০
দিহিকোট ২০৫, ২১৮, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৬২
দিয়ানত খান ৩২৪
দিয়াস ১০৯
দীন-ই-এলাহী ১২৬, ১৩০, ১৬৪
দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ ৫৬
দুরমুজ বেগ ৪৩৪
দুর্লভ নারায়ণ ৩৬, ৫২
দুরজিসুজ (ডি. সুজা) ৪৫৪, ৪৬৩
দুর্জন সিংহ ৬৫, ১৫৪, ১৫৫, ১৬০, ১৬১
দেওয়ান ইছা খাঁর পালা (পূর্ববঙ্গ গীতিকা) ১৯, ৫৬, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ১০৪, ১৬০
দেওয়ান মজিলশ গাজী ১০৬, ১০৭
দেওয়ান বাগ ৩০, ৪৯, ৬৩, ৭৩
দোস্ত বেগ ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৯০
দোস্ত মুহাম্মদ ৩৭৩
দোস্ত মুহাম্মদ ফুলকতী ১৩৪
দোলাই খাল ১৪২, ১৯৯, ২০০, ২০১
দৌরান খান ৩৫৪
দৌলত ৭৪
দৌলতপুর ১৯, ২৩৪, ২৪২, ২৪৮, ২৫১-২৫৩, ৩৬২
দৌলতপুর যুদ্ধ ১১, ১৪, ১৫, ২১, ২৬২, ২৬৪, ৩০৩, ৩১৪, ৪৬৯, ৪৭২

ধ

ধন্য মানিক্য ৪২৩, ৪২৫
ধনপত সিংহ ১০৪
ধমধমা খানা ৩৭০, ৩৯৭
ধর্ম নারায়ণ (দেখুন বলদেব)
ধর্ম মানিক্য ৪২৫
ধরং জিলা ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৬২
ধলেশ্বরী নদী ১২, ৫০, ৭৪, ১৪৬, ১৮৭ ১৯৯, ২১৫, ২১৭
ধাকালুমুজী ৩৮৮, ৩৯৯

Edited by Ripon Sarkar

ধীর নবকুল ৩৭৭
ধুবড়ী ১৮৮, ২৮২-২৮২, ২৮৭-২৮৯, ৩৩২
ধুমঘাট ৮৩

ন

নওগাঁও (নওগাঁ) ৩৬, ১৬৫, ২৯৮
নওলাখা ১১৬, ১২১
নওয়াবগঞ্জ ২১৬
নগরকোটা ৩৯১, ৩৯২
নন্দপুর ১৭০
নন্দকুর ২১৪
নবীনগর ১৪২, ১৬৬, ১৯৯, ৪৫১
নন্দীগ্রাম ২১৮
নন্দ ২০৫
নরনারায়ণ ৩৬, ১১৭, ১৫৩, ১৮৭, ১৮৮
নরসিংদী ২১৮
নরসিংহ রায় ৩৪৩, ৩৪৪
নলবাড়ি ৩৬২
নালিতাবাড়ি ৭০
নড়াইল ২১৬
নাগরী ১২০
নাসিরপুর ১৫৯, ১৭০, ১৭৭, ১৭৮, ১৯৮, ২১৪, ২৯৮, ৩২২
নাটোর ৭৮, ২১৪, ২৯১
নয়াবাজার (গৌরাঙ্গবাজার) ১৭৭, ২১৪
নারায়ণগঞ্জ ৮৪, ১৪২, ১৬১, ১৯৯, ২১৭, ৩৬৪
নাসির (কতলু খানের ছেলে) ৭৬, ১৫১
নাসির উদ্দিন ৬৯
নাসির খান ২৫২
নাসির খান ওরফে খাজা সাবির ৪০৪
নাসির খান পট্টি ২২৩
নিক মুহম্মদ ৩৯৩
নিকোলাস পাইমেন্টা ৭৯
নিখিলনাথ রায় ৩১
নিজ কসবা ৪২
নিজাত খান ১০৪
নিয়ামত খান ১২৪, ১২৫., ১৩১, ১৬৩
নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ার দরগা ২৫৭
নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশী ১
নিজামপুর ৩৫৫, ৩৫৬, ৪৩১
নিম রায় ৫৩
নিয়ামত উল্লাহ, খাজা ১০০
নিকলী ১৭৩
নিজানপুর ২১৪
নীলগঞ্জ ৭৮

নীল রক্ষী (পর্তুগীজ রাজা) ৩৯৩
নুসরতপুর ৩৪৩
নূর (আনোয়ার) ৭৪
নূর-উদ-দীন মুহাম্মদ ১৫৮
নূর জাহান ১৬, ১৭, ২৩, ১৭২, ২১২, ২১৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৯০, ৪২৮, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৭০
নূর মুহাম্মদ ১০৬, ১০৭
নেত্রকোণা ২৫৮
নেপাল ৩৩, ২১৮
নোটস্ অন দি রেসেস কাস্টস এ্যান্ড ট্রাইবস্ অব ইস্টার্ন বেঙ্গল, ওয়াইজ প্রণীত ১০১
নোয়াখালী ৫২, ২০৬, ২১৯
নোয়াখালী ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ২১৯

প

পটিলাদহ ২৮১, ২৯৪, ৩৬৪
পটাশপুর ৪৪
পদ্মা নদী ১২, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৮৪, ৯২, ৯৩, ৯৫, ১৬৫, ১৯২, ১৯৩, ২১৪-২১৭, ২৬৬, ২৭৫
পণ্ডি ১৩৫, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫২
পত্নীতলা ১৬৫, ২১৪, ২৯৮
পরীক্ষিত নারায়ণ (রাজা) ২১, ১৮৮, ১৮৯, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৯, ২৮১, ২৮২, ২৮৮-২৯১, ২৯৩, ২৯৫, ৩০০-৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৭-৩১৯, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৬-৩৭৮, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৯৪-৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০৯, ৪৪৪, ৪৬১, ৪৬৮
পরমানন্দ রায় ৫১
পরশুরাম ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৯০
প্রতাপাদিত্য (রাজা) ৫, ১০, ১৫, ২১, ২৬, ৩০-৩২, ৩৮, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৮৪, ১০২, ১৫৯, ১৭৭, ১৮২, ১৮৫, ১৮৯, ২১০, ২২৫, ২৪২, ২৬৩-২৬৬, ২৭০-২৭৪, ২৭৭, ২৯২, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৫, ৩৭৭, ৪২৬, ৪৩৯, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭০
প্রতাপাদিত্য চরিত, রামরাম বসু প্রণীত ৩১, ২৯২
প্রতাপগড় ৩৩৯, ৩৬২
প্রতাপ নারায়ণ ২৭৮
প্রতাপ সিংহ ১৫৫, ১৫৬, ৩৩৬, ৩৪৩

Edited by Ripon Sarkar

প্রতিভা (পত্রিকা) ১৯, ৩১
প্রবাসী (পত্রিকা) ৮, ২২, ৩১, ১০৩, ২১৭, ২৫৮-
২৬১, ২৯২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৪৭৫
প্রয়াগ ৪১৫
পশুপতি ৩৮৮
পাইককারা ৭০
পাবুনিয়া ৮৯
পাটেট ৫, ১০, ৪০-৪২,, ৪৬, ১৮৩-১৮৫, ১৮৯,
২৭৭, ২৯৯, ৩০, ৩৪০, ৩৬৩, ৪৬৭
পাচোত্রা বন্দর (মুর্শিদাবাদ) ২৫৭
পাটনা ১১৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৯, ১৭৬, ১৮০,
২৩০, ৩১৫, ৩১৬, ৪৪৭, ৪৫২-৪৫৬,
৪৬২
পাঞ্জাব ১১২, ১১৭, ১৫০, ১৫২
পাণ্ডু খানা ২৮৯, ২৯০, ৩৩৬-৩৩৮, ৩৬৬, ৩৭০,
৩৭১, ৩৮৪, ৩৮৯
পাণ্ডুয়া ১০, ২৭, ৯৮, ১৭৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৬২
পাতকুনওয়ার ১৬৮
পাথরঘাটা ১৯৯, ২১৭
পাদশাহনামা, আব্দুল হামীদ লাহোরী প্রণীত ৭২,
৩৬৩
পানকিয়া নদী (দেখুন মেঘনা নদী)
পাবনা ২৭, ৩৯, ৪০, ৪৯, ৫০, ৭৮, ১৬৪, ১৬৭,
১৬৯, ১৮৭, ২১৪, ৪৪৬
পারভেজ (যুবরাজ) ৯, ৪৩৩, ৪৫২-৪৫৬, ৪৫৯,
৪৬২, ৩৭২
পারস্য ৪৩৩, ৪৫৯
প্রাগজ্যোতিষপুর ১৮৭
প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা , ক্ষীতিশ মৌলিক সম্পাদিত
১০৬, ১৬০
পাহার খান লোহানী ২৪১, ২৫২
পাহার সিংহ ৪৫০, ৪৫৬
পাহলোয়ান (মাতঙ্গ এর জমিদার) ৭৫, ৯৫, ৯৬,
২০৮, ২১১, ২১৬, ২২৪, ২২৮
পাহলোয়ান আলী ৪৩
পাহলোয়ান শাহ ৭৩
পাচকলা খুলিয়া ৩৮৫
পাঁচপিরি ৩৮০, ৩৯৯
পিতাম্বর ৭৮, ২৬৭, ১৭৫-২৭৭, ৪৬৭
পিপলি ৮১, ৪৩৭, ৪৪৬
পীর মুহাম্মদ লোদী ২৩৯, ২৪৫, ২৬৮
পুখরিয়া পরগণা ৭০
পুঠিয়া ৭৮, ৮৫, ২১৪, ২৭৫, ২৭৬
পুঠিয়াজুরী ২৩১, ২৩৪, ২৬০
পুত্তামারী ৩৩৪, ৩৬২
পূর্ণিয়া ১১৩, ১৫০, ১৫৭, ১৬৪, ২১৮
পুরী ১৫১, ৪৪৬
পেগু ৮০
পেরার ১৬৭
পেশরাও ১৪৪
পোড়ার ১৬৭

ফ

ফকনার লিউ ৩২
ফজল গাজী ২৯, ৭৩, ৭৪
ফতহাবাদ ৫, ১৪, ৫০, ৫১, ৭২, ৯১, ৯৮, ১৩১,
১৩৪,, ১৪৫, ১৮৫, ১৮৯, ১৯০, ১৯৩,
১৯৮, ২০৪, ২৬৫, ২৭৭, ২৯৯, ৩০৫,
৪৪৪, ৪৬৭
ফতেহ খান (তরফের জমিদার) ১৮, ৬২, ৬৩,
২২৮
ফতেহ খান (হিজলীর জমিদার) ৪৬, ৪৭
ফতেহ খান সুর ১৫৪
ফতেহ খান সালকা ২৮৫
ফতেহ চাঁদ মনকলি ১২৮
ফতেহ দরিয়া (চাঁদনী) ২১৯
ফতেহপুর ৪০, ৪১, ১৩৮, ১৭৭, ১৮৫, ২৯৬
ফতেহপুর সিক্রি ২৯৬, ২৯৭, ৩১৭, ৩১৮, ৩২৪
ফতীয়া ইবরীয়া শিহাব-উদ-দীন তালিশ প্রণীত
৪৬০, ৪৬৪
ফন ডেন ব্রুক ১৯৯
ফরিদপুর ৫০, ৮৪, ৯১, ৯২, ৯৬, ৯৮, ১৩৬,
১৪৫, ১৮৯, ২৬৪, ৪০০
ফরিদাবাদ ২১৭
ফররুখ ১৫০
ফররুখ ইনগালিক ১৩১, ১৩৪
ফরীদুন ১৩৪
ফাজিল ৭৪
ফাতিমা খাতুন ৫৭
ফিদাই খান (মেদারেত উল্লাহ) ৪৬১, ৪৬২
ফিরিশতা (আবুল কাসিম ফিরিশতা) ১
ফিলিপ ডি ব্রিটো ৮০
ফীরুজ খান ১০০
ফেনী জিলা ২১৯
ফেনী নদী ১২, ২০৭, ২১৯, ২৭৭, ৩২০, ৩৪৬-
৩৪৮, ৩৫২, ৩৫৪, ৩৫৯, ৪৩১, ৪৪১,
৪৫৮
ফেয়ার, এ.পি ১৯, ৪৩০, ৪৪৪, ৪৬০
ফুতুহাত-ই-ফীরুজশাহী, আঃ করিম অনূদিত ৩২৩

Edited by Ripon Sarkar

ফুলজুরি ৪১৯, ৪৩০, ৪৫৯
ফুলবাড়িয়া ২১৫
ফোর্ট উইলিয়াম, কলকাতা ২৯২

ব

বকসা দুয়ার ৩৩৭
বখতিয়ার খলজী ১৮৭
বখশী বন্দর (হুগলী) ২৫৭
বগুড়া ২৭, ১৪২, ১৪৪-১৪৬, ১৫৩, ১৫৯, ১৬২, ১৬৫, ১৯০, ১৯৮, ২০৬, ২১৪, ৪৬৬
বজালি ৩৯৯
বজ্রপুর ৪৮, ২৬৪, ২৮১, ২১৪
বজ্রপুর (বজরাপুর) ১৭৭, ১৮৯, ২১৪
বনগ্রাম ১১২
বন্দর মোকাম ৪১৯, ৪২০, ৪২৫
বংশীদাস ৩৮১, ৩৮৩
বনগাঁও ২৬৭, ২৯২
বন্দর ৩৫৪, ৩৬৪
বন্দর খাল ১২, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৪, ২১১, ২১৭
বরগুনার
বরণা-কবলা (দেখুন কবলা-বরণা)
বর্ধমান ২৭, ১৪৪, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, ১৫৬, ১৫৯, ১৭১, ১৭২, ১৮১, ১৮৪, ২১২, ২১৩, ৩৪০, ৩৬২, ৩৬৩, ৪২৬, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৪৬, ৪৫০
ব্রহ্মপুত্র ১২, ২৬, ৩৬, ৭০, ৭১, ৭৭, ৮৯, ৯০, ৯৩, ১২০, ১২১, ১৪০, ১৪১, ১৪৩, ১৫৩, ১৫৮, ১৬৪-১৬৬, ১৮৭, ১৮৮, ২২০, ২২২, ২৫৭, ২৫৮, ২৮১, ২৯৪, ২৯৫, ৩০২, ৩০৭, ৩৩৮, ৩৪২, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২
বরেন্দ্র ৮৫
বরা নদী ২৮৯, ২৯৫
বরগুনা ৭৮, ২৭৫, ৩৬২
বর্দতি (দেখুন বোয়ালি)
বরানগর (বড়নগর) ১৮৮, ৩৩৫-৩৩৭
বরালিয়া নদী ৩৭১
বলদা খাল (বলদাখাল) ৭০, ৭১,
বলদেব (রাজা বলি নারায়ণ) ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৬১, ৩৭১-৩৭৩, ৩৮০-৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৯০, ৩৯৯
বলরাম দাস ৩৩৫, ৩৭৫, ৩৮২, ৩৮৩
বলরা ১৭৯, ১৯৮, ২১৫
ব্লখম্যান, হেনরী ২৯, ৪৯, ৫৬, ৭৮, ৮৮, ১২৩, ১২৮, ১৩৭, ১৬৫, ১৬৬
বসন্ত রায় ৩৮, ৪৭, ৪৮, ১৫৯
বহমা ৪২
বহলুল খান ২৪০
বড় দুয়ার ৩৮২, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯১
বড়পত্ত পোয়াক্রি ৩৯৭
বড় পোয়াক্রি ৩৯৭
বড় বাজু ৬৯, ৭০, ৩৬৬
বড়াল নদী ১৮৭
বংসেরাচার্য ২৭৫, ২৭৬
বংশী নদী ৭৪
বাইসওয়ারা ১০৪
বাউলিয়া ২১৪
বাকলা ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৯, ৩৮, ৫১-৫৩, ৬২, ৭৯, ৮১, ২১০, ২২৫, ২৬৩, ২৬৬, ২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৯৯, ৩০৫, ৪৬৭
বাকু দুর্গ ৩৯১, ৩৯৯
বাঁকুড়া ৪০, ১৮৪
বাঁকুড়া মন্দির ২৭২
বাকের খান ৪৪-৪৬, ৩৯০
বাকেরগঞ্জ ২৬, ৮৪, ৮৮, ২৬৩, ২৭৪, ৪৩০, ৪৪৪
বাগ্না ২৬৫, ২৭৬, ২৯২
বাজুখালী ৬০
বাজ খান ১২২
বাজ বাহাদুর কররানি ৯০, ১৫৭, ১৫৮, ১৭০, ২০২, ২০৮, ২১০
বাজাপর ৪৩৩
বাজারের দালাই ৩৮৮
বাজিতপুর ৯০, ১৪০, ১৪৩
বাজু-ই-কিলাম ২৫২
বাজুহা (সরকার) ৭০, ১৮৭, ১৮৯
বাগজোয়ারা ৩৩৪, ৩৩৫
বানপুর ৪৩৩, ৪৪৫
বানসওয়ারা ১০৪, ১১৬
বানার নদী ৭১, ৭৯, ৯০, ১২১, ১৪১-১৪৩, ১৫৮, ২৫৮
বানিয়াচঙ্গ ৬২, ৭৫, ৯২, ৯৩, ২০৮-২১২, ২২০, ২২২, ২২৪, ২২৮, ২৭৩, ৪৬৭, ৪৬৯
বাবর ৩২০
বাবা খান কাকশাল ১২৭, ১২৮, ১৩০-১৩২, ১৩৪-১৩৬
বাবা শেখ ফুরকান ১৩৪
বাবুই মানকলী ১১৮, ১৩৬, ১৪৮

Edited by Ripon Sarkar

বাদু খান (দিনাজের খান) ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৪৭
বাবার জননী ১৩৯
বাকুল রাজা ৩৮২, ৩৮৮, ৩৮৯
বারবক শাহ (দেখুন সুলতান বারবক-উদ-দীন)
বারবকাবাদ ২৭৫, ৩১৭
বারাসত ৪৬৩, ৪৬৭
বালিজানা ৩৭৫, ৩৭৬
বালিয়া ১৭৮, ১৯১, ২১৫, ২১৬
বালিয়া (উত্তর প্রদেশ) ৪৫২
বালু নদী ২১৭
বাসেরা ৪৩, ৮১, ৪৪৬
বাহারিস্তান-ই-গায়বী, মির্জা নাথন রচিত ৪, ৬-১৮, ২১-২৩, ৩০, ৩১, ৩৮, ৪০, ৪৬, ৪৭, ৫০-৫২, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৮, ৮১-৮৩, ৮৭, ৯১, ৯২, ৯৪, ১০৩, ১০৯, ১৪৩, ১৪৬, ১৫৭, ১৬৫, ১৭৪-১৮২, ১৮৮, ১৯০, ১৯৭-১৯৯, ২০৩, ২০৫, ২১৩-২২০, ২২৩, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২৪২-২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ২৫৪-২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৯১-২৯৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৭, ৩১৩, ৩১৯, ৩২২-৩২৪, ৩৩৮, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৭, ৪০৯-৪১৩, ৪১৮, ৪১২-৪২৫, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৬, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪২-৪৪৬, ৪৫৮, ৪৬১-৪৬৪, ৪৬৮, ৪৭২-৪৭৫
বাহাদুর খুলন ১৩৫
বাহাদুর খান ৫, ১৪, ২৬, ৪৩-৪৭, ১৮৪, ১৮৬, ৩৪০, ২৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৭, ৪০২, ৪১১, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৪, ৪৬৭
বাহাদুর খান (দরিয়া খাঁ খান মহেশখালীর প্রধান) ৪৪৭
বাহাদুর বেগী ১৩৫
বাহাদুর গাজী ৭৩, ৭৪, ৯০-৯৫, ১৯৯, ২০১, ২০৪, ২০৯, ২১২, ২২৬, ২৩৮, ২৮০, ২৮৮, ৩০০, ৩০১
বাহাদুর কাসী ১৩৪
বাহাদুর বেগ ২৬৬
বাহাদুরনগর ২৬৫
বাহাদুরপুর ৪৫৪, ৪৬৩
বাহারলাল ৩৩২
বাহির বন্দ পরগনা ১৮৯, ২৮২, ২৮৫, ৪৫০
বাউফলজুড়ী ৪৩
বাহাদুরপুর ৩৬৪
বায়েজীদ কররানী ৫, ১৪, ২১, ৭৫, ২২, ২২৮-২৩০, ২৫৪-২৫৭, ২৬৩, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮৫, ২৯১, ২৯৯, ৩০১, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৪১৩, ৪৭৮, ৪৬৯
বায়েজীদ খান পন্নী ১৯৯, ২০১
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ৬৩
বাংলার ইতিহাস (সুলতানী আমল), আবদুল করিম রচিত ১০১, ১০৬, ১১০, ১১৫, ১১৬, ২১৮, ৩৬৪, ৪৬২, ৪৬৩
বাংলাদেশের ইতিহাস, রমেশ মজুমদার সম্পাদিত ২১৬, ৪২৪, ৪২৫
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত ১৬৫
বার্মা (ব্রহ্মদেশ) ২১৮, ৩৫০, ৪১০
ব্রহ্মপুত্রিয়া ৬১, ৭৫, ২১৮, ২৫৯, ২৬০, ৩৬৩
বিকুলিয়া চর ২০৩
বিক্রমপুর ১৬৯, ২৯, ৫৩, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৮৩, ৮৫, ৯০, ৯৩, ৯৬, ১০২, ১৪২, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৯, ১৯৮-২০১, ২১৫, ২৬৪, ২৭৭, ৩৩৫, ৪৩০, ৪৩২, ৪৫১
বিজয় বিজয়, নবান কবির রচিত ৫২
বিজয় কবির ৫৪, ৬০, ৬১, ৪২৫
বিক্রম রায় (আরেক ব রায়) ৫০, ৭৪, ৯১, ৯৫, ৯৬, ১৮৬, ১৯০, ২১৬, ৩০০, ৪৭০
বিদ্যাবোধনী সাময়িক, পত্রিকা ৭
বিলাসদেব পুর ৮৭
বিষণ রোজ পোড়া ৮৩, ৮১
বিশ্ব সিংহ (বিশু) ৩৬, ১৮৭
বিষ্ণুপুর ৪৩, ১৫১, ১৫৯, ১৬১, ১৮৪
বিহার ৪৯, ৬৮, ১১৩-১১৫, ১২৪, ১২৬-১৪৯, ১৫২, ২৩৪-২৩৮, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০-১৫২, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৭২-১৭৪, ১৮১, ২০০, ২৫৩, ২৮০, ২৯৬, ৩০২, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩২৫, ৩৩৬, ৪৪৫, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫
বীরম, রাম ১৬৪, ১৬৫
বীরভান (দেখুন ভবানন্দ)
বীরভূম ৫, ৪০, ৪১, ৪৬, ১৬৪, ১৮৩-১৮৫, ১৮৯, ২৭৭, ৩৩৪, ৩৪০, ৩৬৩, ৪৬৭
বীর সিংহ বুন্দেলা ৪৫৩, ৪৫৬, ৪৬৩
বীর হামীর ৫, ৪০, ৪১, ৪৬, ১৫১, ১৫৯, ১৬১, ১৮৩, ১৮৪, ৩৪০, ১৮৪, ৩৪০, ৩৬৩, ৪৬৭

Edited by Ripon Sarkar

Eidited by Ripon Sarkar

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] '[illegible]' ১৭৫, ২১০
[illegible] ৭০, ৮১
[illegible] ৩৭৭, ৩৭৯
[illegible] ৮৮৩
[illegible] ৮৮১, ৪৮৩
[illegible] [illegible] ৮১-৮৫, ৮৭, ১১৮, ১৩৯, ১৫৮, ৪১৪
[illegible] [illegible] ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৪৭, ৪৫৪
[illegible] [illegible] ([illegible], [illegible]) ৩৩৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫৪-৩৫৬, ৩৫৯, ৩৬৮, ৩৬৯
[illegible] ১৪৪, ৪৫৩
[illegible] ২২৭, ২২৮
[illegible] ২৭, ৩৯, ৪০, ১৪৪, ১৫৭, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৭, ১৮৫, ২০৬, ২১৪, ২১৮, ৪৪৭-৪৪৯
[illegible] ৫১০
[illegible] (দেখুন [illegible])
[illegible] ২০১, ৪৪০
[illegible]-উদ-[illegible] ৬, ২০, ১৬৬, ১৭২, ২১২, ২২৭, ২২৭, ২৪২, ২৪৪, ২৫১-২৫৪, ২৫৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৯৭, ৩১৫-৩১৭, ৩২২-৩২৫, ৩৬০, ৩৬৬, ৪২১, ৪৪৫, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬২
[illegible] ([illegible]) ২৬৭
[illegible] ৮৪, ১৪০, ১৪৫, ১৬৬, ১৬৭
[illegible] ([illegible]) ৭১, ৭২, ১৬৬, ৩৬২, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪৭, ৪৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৬৭
[illegible] ১, ৫, ২০, ২৭, ৩৮, ৪৯, ৫০, ৫৮, ৮৯, ৯০, ৯৬, ১০২-১০৬, ১০৮-১১২, ১৪৪-১৪৯, ১৫১, ১৫০-১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৭, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ২১৫, ২১০, ৪৫১, ৪৬০, ৪৬৬
[illegible] ১৩৫, ১৩৬, ১৩৫
[illegible] ৭০, ৭৪
[illegible] ৭১, ৯৫, ৯৫, ১৯৯, ২০১, ২০৯, ২১৬, ২২১, ২২২, ৩০০
[illegible] ২৩৩, ২৫৫
[illegible] ২৩৬
[illegible] ২৩৬, ২৯২, ৩২৭
[illegible] ১৩৫
[illegible] ৪০৭, ৪৪৫
[illegible] ([illegible]) ৩৪১, ৩৫০, ৩৭৪, ৩৬৪, ৪১৮, ৪৩০, ৪৫১
[illegible] ([illegible]) ২০৪, ২১৮, ৩৩৪
[illegible] ১৪
মির্জা [illegible] ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯৬
মির্জা [illegible] ২১২
মির্জা [illegible] ১২৯, ২০২
মির্জা [illegible] ২৮০,
মির্জা [illegible] ৫৯
মির্জা [illegible] ২৫০
মির্জা [illegible] ২৫১
মির্জা [illegible] ২২১, ৪৬৯
মির্জা [illegible] ৪২৯, ৪৭১, ৪৭২
মির্জা [illegible] বেগ ৩৬৮, ৩৭৪, ৪২৭-৪২৯, ৪৩০-৪৩৭, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৭-৪৪৯, ৪৭১
মির্জা [illegible] বেগ ৩৬৮, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩৫, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৭১
মির্জা [illegible] বেগ [illegible] ২০০, ২৮০-২৮২, ২৮৪, ২৮৫, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪
মির্জা [illegible] ২২০, ৩৫৪, ৪০২-৪০৬, ৪০৬, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪২০, ৪২১, ৪২৮, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪৮, ৪৭১
মির্জা [illegible] ২২১
মির্জা [illegible] বেগ ২২১, ২০২, ২৫১, ২৮০
মির্জা [illegible] ([illegible]) ২২৯, ২৩২, ২৫৯, ২৮৯, ২৯০, ৩২৬
মির্জা [illegible] ২২১
মির্জা [illegible] বেগ (দেখুন [illegible]-উদ-[illegible])
মির্জা [illegible] ২৫৭
মির্জা [illegible] ৬-১৪, ১৬, ১৭, ২০, ২২, ২৩, ৩০, ৩৪, ৩৭, ৩৯-৪২, ৪৬, ৪৭, ৫৪, ৭৮, ৮৬, ৮৮, ৯০, ৯৪-৯৬, ১৪২, ১৫৬, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯-১৮৪, ১৮৬, ১৮৯, ১৯০-২০৭, ২১০, ২১৬, ২১৭, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২২৬-২২৮, ২৩১-২৩৩, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৮, ২৩৯-২৪২, ২৪৪-২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬৪, ২৬৬-২৭২, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০-২৮৫, ২৮৮, ২৮৯, ২৯৪, ২৯৭, ৩০১, ৩০৩, ৩০৭-৩১৫, ৩১৭-৩১৯, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৩৩-৩৩৮, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫২, ২৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৬, ৩৬৮-৩৭৬, ৩৭৯-৩৮৫, ৩৮৭,

Edited by Ripon Sarkar

৩৯৯-৪০৩, ৪১০, ৪১১, ৪১৭, ৪২৫,
৪২৫, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৩৭,
৪৩৯-৪৪৭, ৪৫৭-৪৬১, ৪৬৫-৪৬৭,
৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৪
মির্জা এম. ইউ. বি. ১৭৪, ১৭৭, ২৮০, ২৯০,
৩৫৪, ৩৬৪, ৪০২-৪০৬, ৪০৯, ৪১১,
৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪২০, ৪২১, ৪৩০,
৪৩১, ৪৩৬, ৪৪০, ৪৪৮, ৪৭১
মির্জা নূর-উদ্দিন (দেখুন মির্জা নূর-উদ-দীন)
মির্জা নওয়াবী ২৪
মির্জা নজরুল ১০০
মির্জা বাকী ১২৪, ৩৫৪, ৪৩১, ৪৫০, ৪৫৯,
৪৭১
মির্জা বাহাদুর খানদান৩৯২, ৪৪৭
মির্জা বেগ ৩৫৪
মির্জা বেগ আসকারি ২১১, ২২৯, ২৩২, ২৩৬,
২৫৪
মির্জা মকী ২৬৬, ২৬৮, ২৭২, ৩৪০, ৩৪৩,
৩৪৪, ৩৪৬, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬২, ৩৬০,
৪২৬, ৪৪৬
মির্জা মকসুদ ২০০, ৩০৯
মির্জা মক্কী ৩৮৬, ৩৯৯
মির্জা মীরক মক্কী ২৮০, ২৮১, ৩৩৪
মির্জা মুহিউদ্দীন-উদ-দীন মুহম্মদ ৪২৯
মির্জা মুমিন ৪৯, ৯১, ৯৪-৯৬, ১৫৭, ১৮৬,
১৯২, ১৯৪, ১৯৯, ২০২, ২০৩, ২১২,
২১৬, ২১৮, ৩৬৬
মির্জা মুহম্মদ ২১৭, ৩১১
মির্জা মুহম্মদ হাকীম ৪৯, ১২৬, ১৩০, ১৩২-
১৩৫, ১৫২, ৪৫৬
মির্জা মুন্সী ৪৪৯, ৪৬২
মির্জা মাহমুদ-উদ-দীন ২৬৬, ২৬৭, ২৮০, ২৮১,
৩৩৯
মির্জা মক্কী ২২৪, ২৫৪
মির্জা মামের ৪৩৩, ৪৪২, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫২,
৪৫৬
মির্জা মামুদ জামাল ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৭০, ৩৮৬,
৩৮৭
মির্জা হাসান রসওয়ানী ২০২, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭,
৩৩০, ৩৩১, ৪২৭
মির্জা হোসাইন বেগ ৪২৯, ৪৪৯, ৪৭১, ৪৭২
মির্জা হোসেন বেগ ২৫৪, ৩২৫-৩২৭, ৩৫৩,
৩৫৭, ৩৬১, ৪৭২
মিল মাহমুদ ১৯৯
মিশর ২১৩
মীর্জা আলী ১২৪
মীর আবদুল ১২৪, ১৫১
মীর আলী বেগ ১১৯, ২৫৫, ৩৩১
মীরক আবদুল আলাউদ্দীন ১৮৬, ১৯১, ১৯৫, ১৯৬,
১৯৯, ২০১, ২২১-২২৩, ২২৯, ২৩৫,
২৩৫, ৩২৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৪১৭, ৪১৮,
৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৭, ৪৪৮
মীরকী খান ১৩১
মীর জলিল ১৩৪
মীর আলাউদ্দিন-উদ-দীন মুহম্মদ খাদেম ১২৪, ১২৯,
১৩১
মীর মুহম্মদ ১০, ১৪২
মীর মুহম্মদ আলী ২৮০, ২৮১, ৩৩১
মীর মুহম্মদ ১০৫
মীর আলী-উদ-দীন ১৩২
মীরমালী ৪৩১
মীর শাহর ৩৯২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪২, ৪৪৭,
৪৫০, ৪৫৫
মীর শাহ আবদুল মালী ৪৯
মীর শরীফ আমলী ১৪১
মীর শাহী ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৪
মীরান তৈমুর মসুদ৩৩০
মুহিবুল ইসলাম (কোরা), ডঃ ১১৫, ১৬৫, ১৭৯,
১৮০, ১৮৪, ২১৪, ২১৭, ২৪৯, ২৫০,
২৬২, ২৯২, ২৯৫, ৩৭৮
মুলতান-উল-মোমিন ২৫৮
মুলতান খান ২২৫, ২৩২, ২৭৯-২৮২, ২৮৮-
২৯১, ২৯৪, ২৯৭, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮,
৩১৭, ৩২২, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, ৩৩০,
৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৫৭, ৩৫৮,
৩৬০, ৩৭৭, ৩৮৬, ৪২৬-৪২৮, ৪৪৪,
৪৫০, ৪৬৪, ৪৭০
মুন্সী নারায়ণ ১৮৮
মুনিম খান (মুনইম খান) ৩৮, ৫০, ৫১, ৭৬, ৮০,
১৩৪, ১৪২, ১৪৯
মুলতান ২১৫
মুহসিন খান ৩৫০, ৩৫৬-৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১,
৩৬৬, ৪৪১, ৪৪৭, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৬২,
৪৭২
মুহম্মদ বেগ ১৩১
মুহম্মদ কাসেম ১৪৪,
মুহাম্মদ খান ১৫-১৮, ১৭৫-১৭৭, ১৯৪-১৯৬,
১৯৮, ২১৩, ২২৯, ২৩১, ২৩২, ২৪৯,
২৫০, ২৫৩, ২৫৫, ২৫৭, ২৭৩, ২৯৩,
৩০৯, ৩১৬, ৪৫২, ৪৭২,

Edited by Ripon Sarkar

মুহাম্মদ খান ১, ৮, ৪৩১
মুফাখির খান ১৪৫
মুনওয়র খান (ঈশা খানের বংশীয়) ৪৫, ৭১
মুনিম খান ৬৭, ৮৮, ১১২, ১১৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৬০
মুখবন্ধ ডঃ ওয়াকীল, বখতুয়ী প্রণীত ১
মুন্সী নাসির উদ্দীন ৪৩
মুন্সীগঞ্জ ৫৪, ৭৬, ১৬৭
মুবারিজ খান ১৯৮, ২০৮-২১০, ২২১, ২২., ২৫৫, ২৬৬, ২৭৮, ২৭৯, ৩০৫, ৩০৭, ৩২৭, ৩৮৮, ৩৯৯, ৩৬০
মুজাফফর খান তুরবতী ৪৯, ১১৫, ১২৩-১২৯, ১৩১-১৩৩, ১৩৫, ১৩৭, ১৬০, ১৬২, ১৬৩
মুহতশম খান (দেখুন মির্জা মক্কী)
মুরাদ (যুবরাজ) ১৬৪
মুরাদ খান ৫০, ১১৩, ১৩১, ১৩৪
মুরাদ বেগ উজবেগ ১৫৭
মুর্শিদাবাদ ১১৭, ১৬১, ১৬৪, ২১৪, ২৭৭
মুর্শিদ কুলী খান ২
মুর্শিদ কুলী খান এ্যান্ড হিজ টাইমস, আবদুল করিম রচিত ৩, ১০৩, ১০৭, ২৫৭
মুলতান ১৩৭, ১৫০, ১৭১
মুসা খান মসনদ-ই-আলা ৫, ১২-১৪, ২১, ২২, ৪৯-৫১, ৫৪, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৭, ৮৪, ৮৬, ৯১-৯৬, ১৫৮, ১৬৯, ১৭৮ ১৮০, ১৮৬, ১৯১-১৯৬, ১৯৮-২১১, ২১৬,-২১৮, ২২০, ২২১, ২৬৪-২৬৬, ২৮০, ২৮১, ২৯৪, ২৯৮, ৩০০-৩০২, ৩৭১,, ৩৭৪, ৩৯২, ৩৯৭, ৪০০, ৪০২, ৪০৩, ৪০৯, ৪১১, ৪১৪, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৯, ৪২৯, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৪০, ৪৫৩, ৪৬৭-৪৬৯
মুসা খান (কাসিম খানের বন্দী) ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৯৭
মুসাহিব খান ৩৭৬
মুহম্মদ কুলী বেগ ৩৯১
মুহম্মদ ২২৯, ২৩৬, ২৪৫
মুহম্মদ খান ৩৭১,
মুহাম্মদ আমীন ৩৩৪
মুহাম্মদ ইরাক ১৮৮, ৪৭০
মুহাম্মদ শীরক ১৩৪
মুহাম্মদ কুলী ৮৮, ১১৯, ১২১, ১৩১
মুহাম্মদ খান ৩৪৬
মুহাম্মদ খান আবাকশ ৪২৬, ৪২৭
মুহাম্মদ খান পন্নী ২০০, ২৬৬
মুহাম্মদ জামান তেহরানী ৩৩০
মুহাম্মদ আতাআলা ২৫২
মুহাম্মদ তকী (শাহকুলী খান) ৪৩৪
মুহাম্মদ তকবাই ১৩৪
মুহাম্মদ বেগ আবকাশ ১৩২, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯
মুহাম্মদ মুরাদ, (মির্জা নাথনের ভাই) ২৭০, ৪২৬
মুহাম্মদ শাহ (শাহ বেগ খান) ৪৩৪
মুহাম্মদ শরীফ ৪২৮
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ ৪০০
মুহতাশাম খান শায়খ কাসিম ফতেহপুরী (দেখুন কাসিম খান)
মুহিব আলী খান ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯-১৪১, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০
মুড়াপাড়া ১৬৫
মুড়াপাড়া ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল ১৬৬, ১৬৭
মুয়াজ্জম খান ২২৫, ২৩২, ৩২২, ৪৪৪, ৪৬১, ৪৭০,
মুঙ্গের ১৩৪-১৩৬, ২২৫, ৩১৮, ৩২৫, ৪৪৭
মূলচর ৫৪
মেঘনা নদী ১২, ৫২, ৬১, ৮৮, ৯০, ৯৩, ৯৮, ১২১, ২০৫, ২০৭, ২১৫, ২১৮, ২১৯, ২৩০, ২৩৫, ২৫৯, ২৬০, ৪০৮ ৪১৩ ৪২৩, ৪৩০, ৪৩১,
মেচপাড়া ২৯৫,, ৩৭৫
মেজেল, জে. এম. ২৯৩
মেদিনীপুর ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৭, ৮১-৮৩, ৮৭, ১০৩, ১৮৪, ৩৬২, ৪২৬, ৪৩৬, ৪৩৮
মেবার ৩৩, ১৭২, ৪৪৫
মেরৌলা ৬৯, ৭০
মেহের-উন-নিসা (দেখুন নূর জাহান)
মেহেরকুল ১২১, ১৬২, ৪০৪, ৪০৮, ৪১১, ৪১২, ৪১৮,, ৪২১
মোগল নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার পলিসি, এস. এন. ভট্টাচার্য রচিত ৩৬০, ৩৯৯
মোগলমারীর যুদ্ধ ৬৭, ১১২, ২৪৬
মোল্লা আবদুর রাজ্জাক ১২৪
মোল্লা মুর্শিদ ৪৬০
মোরং (মোরাঙ্গ, মরঙ্গ) ৩৫৪, ৪২৪, ৪২৮, ৪২৯
মৌলবী বাজার (জিলা) ১২৮, ২৩৪, ২৫৮
মৌলানা সাদিখান ২৭৬
মৌলানা মীর কাসিম ১১

Edited by Ripon Sarkar

য

যদুনাথ সরকার, স্যার ২, ৩, ৭, ৮, ১৫-১৭, ২৫-২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৪১, ৪৪, ৫০, ৭১, ৭৫, ৭৬, ৯৪, ১০২, ১২৪, ১২৭, ১৪২, ১৪৭, ১৪৬, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৬, ১৫৭, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৫, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২৫৭, ২৬১, ২৬৫, ২৭২, ২৭৩, ২৯১, ২৯২, ৩০০, ৩১৬, ৩১৮, ৩৪৭, ৩৬৪, ৪০১, ৪৪৪, ৩৭৫
যদুনায়ক ৩৬৮, ৩৯১ ৩৮৩
যমুনা খাল ৩১৮, ৩৬৫
যমুনা নদী ১৭, ৭০, ১০৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৫, ১৪৬, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ২১৭, ২৬৭, ২৭০, ২৯২, ৩০২, ৩৬৭
যশিপুর ৩৭৫
যশোদল ১৮
যশোর (এ রিপোর্ট অন দি ডিস্ট্রিক্ট অব যশোর, ওয়েস্টল্যান্ড প্রণীত) ১৯
যশোধর মাণিক্য (যশো মাণিক্য) ৪০৪-৪০৯, ৪১২, ৪১৩, ৪১৫-৪১৭, ৪২১, ৪২২
যশোহর ৫, ১২, ১৪, ১৫, ২০, ২১, ৩০, ৩২, ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৭৬, ৮২, ৮৪, ৮৮, ১১৬, ১৫৬, ১৭৭, ১৮২, ১৮৫, ১৮৯, ২১০, ২২৫, ২৫৯, ২৬৩, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৮-২৭৫, ২৭৭, ২৯৯, ৩০৫, ৩০৯, ৩২৫, ৩৭৭, ৩৯৭, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৯-৪৪২, ৪৫০, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৪
যশোহর-খুলনার ইতিহাস, সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ৩১, ১০২, ১০৩, ২১৬, ২৫৭, ২৯১, ২৯২
যাত্রাপুর ১২, ৯১, ১৪৬, ১৬৭, ১৯১-১৯৮, ২০৮, ২১৬, ২১৭, ৩০২, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৮৭, ৩৯৬, ৪৫১
যিয়া-উদ-দীন বরনী ১০৯, ১৬৩
যোগলিয়া ২০৭,
যোগী (যুগী) ১৮০, ২১৫, ৪৫২, ৪৫৪

র

রওয়াজা নদী ৩৭৩, ৩৯৮
রঘুদেব ১৫৩, ১৫৪, ১৬৮, ১৮৮, ৩৮৮, ৩৯৮
রঘুনাথ (রঘুরাম, সুসঙ্গ এর রাজা) ১২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২৫৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭, ৩০২, ৩৯২, ৪১৯, ৪৪৮, ৪৬৮
রঘুনাথ ৫৯
রঘুনাথ মিত্র ৪০
রঘুরাম ১৮৬
রজনী খান (মির্জা মিরক) ১২৪, ১২৮, ১৬১
রতিকান্ত ৩৮১
রত্নপুর ৩৬
রত্ন-দা ৪০১
রণজিৎ নারায়ণ ৪১৮, ৪১৯
রস-ভাণ্ডার ৬২, ৭১, ৭৩, ১২০
রবিনসন, এম, ৪২০
রসুল খান ৪৪
রসুলপুর (দেখুন বন্দর রসুল)
রসুলপুর নদী ৪১
রহমত৪২, ৪৪, ৪৫
রহিম, ডঃ এম. এ. ৩৭, ৬৭, ৭৭, ১০৪, ১০৬, ১০৭
রাঙামাটি ৩৩৪, ৩৬২
রাঙ্গুলী ৩৭৯-৩৮২, ৩৯৮
রাখেন ৩৭৫, ৩৭৬
রংপুর ৩৬, ৩৯, ১৬২
রাইট, সি. ডব্লিউ. বি. ২৯, ৯৭
রাও মানসিংহ ৪৩৪
রাঢ়েশ ৪৬১
রাজঘোষা ৩৬২, ৩৭৩, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৮৭
রাজচন্দ্র সেন, মুন্সী ৫৬
রাজধর মাণিক্য ৬১, ৪১৫, ৪১৬
রাজপুতনা ৩৩, ১১৬, ২১২
রাজপুত ৫৪
রাজমহল ৬, ৭, ১৫-১৮, ২৫, ২৭, ৩৯, ৪৭, ৪৮, ৬৭, ৮১-৮৪, ৯১, ৯৫, ১০৫, ১১৫, ১৩১, ১৩২, ১৪২, ১৫৩, ১৪৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬৪, ১৭৪, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৯, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৫, ১৯২, ২১৪, ২২১, ২৬৩, ২৬৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৯৮, ২৯৯, ২৯৯, ৩০৯, ৩১৫, ৩১৬, ৩২০, ৩২১, ৩২৬, ৩৪০, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৯, ৪২১, ৪২৬, ৪৩৪-৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৬-৪৫০, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৫-৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৩
রাজমহলের যুদ্ধ ১১৫, ১১৬,
রাজমালা, কালী প্রসন্ন সেন সম্পাদিত ১০, ১৫, ১৮-২০, ৩৪, ৫৬, ৬০-৬২, ৬৫, ৬৬,

Edited by Ripon Sarkar

Eidited by Ripon Sarkar

শরীফ চৌধুরী ১৪৪
শাহাবুদ্দিন (শাহাবুদ্দিন) ৩৬০
শহর (পাকিস্তান রাজ্য) ৪৬৩
শহীদ খান ১৭, ৭৩, ৭৮ ৭৭৫
শহীদুল্লাহ ৭৮, ৮৫ ৭৭৫, ৫৭৩
শহর শের খান ৪৫৪
শান্তি ২৩৩, ৩৫৮
শাহিন আকবাল ১৩৭
শাহী খান ১৭৫, ৩১৩
শামসুল ৩৫৮
শামসী বেগম ৪৩৩
শামসুর (শামসুর) ৩৮৬
শাহ বাহাদুর ৩৬৫
শাহা বেগ ১৭৩
শাহেদ ১৮১, ৪৮৬, ৪৮১
শিবরাম ৮০০

শুক্কুর আলী বেগ ১৮৬
শোয়েব আলি বেগ ৩৪৩,
শেখ খান ৪৭

স

স, এস, এ, ২৪৩
সত্য রায় ১২০
সদর দিল্লী ২২৯
সরকার (বাংলা) ৫, ১৪, ৩৮, ৫১, ৭০, ৮৩, ৮৪, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৪, ২০৪, ২০৯, ২১০, ২১৬, ২২৫, ২২৬, ২৩৪, ২৭৫, ২৭৫, ২৭৭, ২৮০, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৯, ৩০০, ৩০৪, ৩৩১, ৩৩৭, ৩৪০, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৮০, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৯, ৪৪৮, ৪৮৭
সরফরাজ (রাজা প্রতাপ নারায়ণ) ২৭৮, ৩৩৮, ৪৪৮
সৈয়দ উদ দিন মোহন ১৩৫, ১৪৬
সলিমুল্লাহ ৯৮, ১৩৬, ১৩৭, ১৪৯, ২৯২
সলিম মজলিশ ১৫১
সলিমুল্লাহ খান ২৩০
সৈয়দ আহমদ ২২৮, ২২৯, ২৩৬, ২৪০, ২৪৫
সৈয়দ আবদুলাহ ৩৪৪
সৈয়দ আবদুল জলিল (দেখুন আবদুল জলিল)
সৈয়দ আবদুল জলিল ২৩৭, ২৪৪
সৈয়দ আমিরা ২২৯, ২৪১, ২৪৬
সৈয়দ আলা উদ দিন হিন্দী (দেখুন উদ্দীন আল হিন্দী)

সৈয়দ আলা উদ দিন ৩৭ ১৮
সৈয়দ আমজাদ হোসেন কাশেমী ৩৩৯৮, ৩৩১, ৩৭৪, ৩৪১, ৩৮০, ৩৮৮, ৩৮১
সৈয়দ আহমেদ ৩৬৮
সৈয়দ ইউসুফ ৩৭৭
সৈয়দ ইউসুফ আলী ১৯৮, ২৩৫, ৫৩৭, ৪৭৮
সৈয়দ ইমাম ২৩৯, ২৪১, ২৪৫
সৈয়দ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ৩৩৫ ৩৩৭, ৩৬৮, ৩৬৯ ৫৭৩, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৯৪, ৫৯৭, ৫৫১
সৈয়দ উমরাবিন ১৭১, ২২১, ২৩৬, ২৪৮, ২৮৩
সৈয়দ উম্মা ৩৩৯, ২৪১, ২৪৫,
সৈয়দ কবীর (দেখুন কবীর খান)
সৈয়দ আহমদ ৪১, ৪৬, ১৮৩, ১৮৪, ১৯১, ১৯৫, ২০০, ২০১, ২০৬, ২৩৮, ২৬৯, ২৫১, ২৪৪, ২৫৮, ২৫৪ ২৫৭, ২৫৯, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৯, ২৮১ ২৮৮, ২৯০, ২৯৪, ৩৩৪ ৩৩৮, ৩১৭, ৩১৯, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৪৫, ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭১ ৩৭৫, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৫ ৩৮৭, ৩৮৯-৩৯৪, ৩৯৪, ৩৯৫, ৪৪০ ৪৪৫, ৪৭১
সৈয়দ জামিল ২২৯, ২৩৪, ২৩৩, ৩৩৪
সৈয়দ হুসেন ২২৯, ৩১৫, ৩৩৪
সৈয়দ জু (দেখুন জুলফিকার-উদ-দিন খান হায়দার)
সৈয়দ তাজ কবিরাজ ২০০
সৈয়দ আফজাল ২৩৫, ৩৪৫, ৩৩৭, ৪৭৩
সৈয়দ জামিল (আমির খানের সেনাপতি) ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৯, ৩৩৯
সৈয়দ জামাল-উদ-দিন ঘুরানী ২২৭
সৈয়দ নূর ছুফান আলম ১০, ৪৪৮, ৪৫৩
সৈয়দ নীর ৭০, ৮০
সৈয়দ নসীর (ইমামের খাসের ভাই) ৩৪৫, ৩৩৭, ৪৭০
সৈয়দ নসীর খান ২২৯, ২৩১, ২৩৪, ২৪১, ২৪০
সৈয়দ নিয়ত ৩৪৬
সৈয়দ ফতে-উদ-দিন ২৩৬, ৩৪৫
সৈয়দ বখত (দুর্গানী) ১৮৩, ২৪০
সৈয়দ বাহা উদ দিন নকশবন্দী ১৩৭
সৈয়দ মাহমুদীন ২২৯, ২৪১, ২৪৫
সৈয়দ মহমুদ ৩৩১, ৩৩৪
সৈয়দ মির্জাহুসেন মাহমুদ ৪৩
সৈয়দ মীরাজ ২৩০, ২৮৭, ৩১১, ৩১৭, ৩৪৯, ৩৪১, ৪৭০
সৈয়দ মুরাদ ২২৯

Edited by Ripon Sarkar

শয়খ মাসুম ২২৯, ২৪১, ২৪৫
শয়খ মওদুদ (দেখুন চিশতী খান)
শয়খ মুঈন-উদ-দীন চিশতী ১৩৮
শয়খ মুবারক ১৩০
শয়খ মুমিন ২২৯, ২৪১, ২৪৫, ২৬৬, ২৭২
শয়খ মুসা ৩৪৬
শয়খ মুহাম্মদ দায়েম ৪৩
শয়খ মুহী-উদ-দীন ২৮০, ৩২৫, ৪৭০
শয়খ মুয়াজ্জম ২৯৭, ৩২৩
শয়খ রুকন ২০১, ২০৪
শয়খ শাহ মুহাম্মদ ৪৫৬
শয়খ শারফ-উদ-দীন ইয়াহয়া মানেরী ৪৫২, ৪৬৩
শয়খ সলীম চিশতী ১৬, ১৭১, ১৭৩, ২২৭, ২৯৬, ২৯৭, ৩১৭, ৩২৪, ৩২৫, ৩৬০, ৪৬১, ৪৭০
শয়খ সাদী ১১, ১৬২
শয়খ সিরু ১৬২
শয়খ সোলায়মান ৪৪১
শয়খ সোলায়মান উসমানী ২০০
শয়খ হাবীব-উল্লাহ ১৯০, ১৯৩, ১৯৪, ২০৪, ২০৬, ২২১,. ২৮০, ২৮১, ২৮৪, ২৯৯, ৩০৫, ৩৫৬, ৪৭০
শয়খ হোসেন ৩০৯, ৩১১, ৩১৮
শয়খ হোসেন দখনী ৩২২
শান্ডু ৩৬
শামস উদ-দীন আহমদ ১০১, ১০৩, ১০৭, ১৬৪, ২৯৩
শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ আতকা খান ১৩৫
শামস খান ৫, ১৪, ৪০-৪২, ৪৬, ১৮৩, ১৮৪, ২৯৯, ৩৪০, ৪৬৭
শ্যাম ৩৪, ৪১০
শাসারাম ২১৪
শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ ৫২
শাহ আব্বাস ৪৩৩
শাহ কুলী খান মাহরম ১৩৯, ১৪১, ১৪৫
শাহজাদপুর ৫০, ১৪৫, ১৬৭, ১৬৯, ১৭৮, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯১, ২০৯, ২১০, ২১৪, ২১৫, ৩৬৭, ৪১৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০
শাহজাদা রায় (দেখুন শত্রুজিত)
শাহজাহান ১, ৫-৯, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ৪০, ৪৪, ৫১, ১২০, ১৫২, ১৫৭, ১৬২, ২৫৫, ২৭৬, ২৯৭, ৩৯৩, ৪১৭, ৪২০-৪২২, ৪৩২-৪৩৮, ৪৪২-৪৪৪, ৪৪৬-৪৫৮, ৪৬০-৪৬৪, ৪৬৭, ৪৭২-৪৭৪
শাহনওয়াজ খান ৬, ৪৪৯, ৪৬২
শাহ নসর ৯২, ২০৯, ২২১-২২৩, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৬
শাহ বরদী ৬৭, ৮৮, ১১৩, ১১৯, ১২১, ১২৫, ১৩১, ১৩৯
শাহবাজ খান কামবো ৪, ৬৮, ৮৫, ৯০, ১৩৫, ১৩৭-১৫১, ১৬০, ১৬১, ১৬৫-১৬৭, ২৭৫, ২৭৬, ৪৭২
শাহবাদ খান বরীজ ২০০-২০২, ২০৪
শাহবাদ খান মুরাদেল ২৫২
শাহবাজপুর ৪, ৩২, ৪৪৪
শাহবাদ ২১৪
শাহবেগ ২৬৬, ২৬৮
শাহ মনসুর ৪৯, ১২৪, ১২৬, ১২৯
শাহ মুহাম্মদ ২৮৪
শাহ মুয়াজ্জম দানিশমন্দ ২৭৬
শাহ শুজা ২, ৪০, ৪৪-৪৬, ৫৬
শাহাম খান ১১৩
শাহিনশা বিবি ৫৬
শাহী বেগম ৪৪
শহরিয়ার (সুলতান) ৪৩৩, ৪৫৯, ৪৬১
শায়েস্তা খান২, ১৬৮
শিতাব খান (দেখুন মিরযা নাথন)
শিবানন্দ ৪৮
শিরাজ ১২৫, ৪৫৯
শিহাব-উদ-দীন তালিকা ৪৬০
শিহাব খান লোদী ২৩৫, ২৩৭
শ্রীচন্দ্র ৫০
শ্রীপাল কুমার ৩৪৩
শ্রীপুর ১৯, ৫১-৫৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮৫, ৯০, ৯২, ৯৩, ৯৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬৭, ১৬৯, ১৯৮, ১৯৯, ২০১, ২৭৭, ৩৪৫, ৩৬০
শ্রীমদন ২৫৮
শ্রীরাম শর্মা ৪৪৫
শ্রীলংকা ৪৫১
শ্রীসূর্য ২৫৮
শ্রীহট্ট (দেখুন সিলেট)
শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) ৩৮, ৪৭, ৪৮,৭৫, ৭৬, ৮৪, ১১৬, ১৫৯, ২৬৩
শুজা (মাসুম কাবুলীর ছেলে) ১৪৭
শুজাত খান (শয়খ কবীর) ২১, ২২৫-২৩৫, ২৩৮-২৪৮, ২৫০-২৫৭, ২৬০, ২৬৬, ২৭৯, ২৯৬, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৪-৩১৬, ৩২৪, ৩২৭, ৩৫৪, ৪৬৯,- ৪৭২

Edited by Ripon Sarkar

শুজাত খান ৪৫২
শুজাত খান দখিনী ৩৭১
শুজাত খান ওরফে সৈয়দ জাফর ৪৩৪
শুজামুঠা ৪৪
শুমারুল কায়েত ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৯-৩৮০, ৩৮৬-৩৯০, ৩৯৮, ৪০০
শেখ জলরয়ায় ৩৩৬
শের আফগান (আলীকুলী ইস্তাজলু) ১, ৫, ১৭১-১৭৩, ২১২, ২১৩
শের আলী ৬৯, ৭০
শের খান ৯৩, ১৫৮
শের খান তনজীর ২৯৭
শের খান ফতেহজঙ্গ (দেখুন দরিয়া খান)
শের ঘাটি ১৩৫
শেরপুর আতাই ১৫৫-১৫৭, ১৬৯
শেরপুর আতিয়া ১৫৬
শেরপুর ৭০
শেরপুর মুর্চা ৯১, ১৪০, ১৪২, ১৪৪-১৪৬, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬৫, ১৯৮, ২০৬, ২২১, ২৯৯, ৪৬৬
শেরযা বাহাদুর ১৩৪
শের মরদান ২৩৩, ২৩৮, ২৪৫, ২৫২, ২৫৪
শের মুহাম্মদ দীওয়ানা ১২৩
শের শাহ ২০, ৫৭-৫৯, ৬৮, ৭৩, ৮০, ৯৭-১০১, ১০৮, ১৫০, ২১৪, ৪৫০
শোন নদী ২১৪, ৪৬৫

স

সকরী নদী ১৪৫, ১৪৬
সজাওল ১৫৫
সঞ্জর হাজারী ৫০
সনকোশ নদী ১৮৮, ২৮৯, ২৯৫, ৩৩৩, ৩৩৪
সনাতন ৩৩৭, ৩৭০, ৩৮৯
সন্তোষ ১৩৯, ১৬৫
সন্দীপ ৮০, ২০৫, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৫০, ৪২৯
সতীশচন্দ্র মিত্র ১৯, ২০, ৩০-৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৪, ৪৬, ৭৮, ৮২,. ১০২, ১০৩, ২১৬, ২৫৭, ২৯১, ২৯২
সত্যচরণ শাস্ত্রী, পণ্ডিত ৩০, ৩১
স্বরূপচন্দ্র রায় ৩০
সরস্বতী ১০৭, ১৬৭
সর্ব গোসাঞি ৩৮১, ৩৮৮
সমধারা দুর্গ ৩৪২
সম্ভুর পরগণা ৩৮২
সমুদ্র ৩৬
সরাই পাখাবি ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৬২
সরাইল ১৮, ৬০-৬২, ৬৫, ৬৬, ৭১, ৭২, ৭৫, ১০৬, ১০৭, ১২১, ১৪০, ১৪৪, ২১৯, ২২৬, ২২৯-২৩২, ২৫০, ২৫৯, ২৬০, ৩৩৫, ৩৭৮, ৩৭১
সরকার, ডঃ ডি. সি. ১০৯
সরদহ (সারদা) ৭৮, ৯১, ২৯২
সরহদ খান (দেখুন আবদুল ওয়াহিদ)
সরো ৪৩
সলই গোয়ালপাড়া ৬২
সলিমনগর ১৫৩, ১৫৪
সলিমানবাজ ৩০, ৮২, ৮৪
সলীম খান (হিজলীর জমিদার) ৫, ১৪, ২৬, ৪০-৪২, ৪৬, ৪৭, ১৮৩, ১৮৪, ২৯১, ৩৪০, ২৯১, ৩৪০, ৪১৯, ৪২৬, ৪৬৭
সলীম খান (আফগান) ৫৬
সলীম খান/শাহ (দেখুন ইসলাম শাহ সূর)
সলীম শাহ (আরাকানের রাজা, দেখুন মিন রাজাগী)
সহসপুর ২০৫, ২১৮
সন্দী ৩৪৪
সত্যমাণিক্য ১৮২, ১৯২, ২৬০-২৬৫
সাইফ খান লোদী ৩৯১
সাইদ খান ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯-১৫২, ১৬১, ১৬৬
সালিম তকবাই ১৩১, ১৩৪
সালিম কাকশাল (বাহাদুর শাহ) ১৩৪
সাক্সেনা, ডঃ বানারসী প্রসাদ ৪৬৩, ৪৬৫
সাজাউল খান ১৮২, ২২১
সাদত খান ৩২৭, ৩৫৮, ৩৭৬, ৩৭৯-৩৮১, ৩৮৬, ৩৮৭
সাদিক খান ১৩৫, ১৩৯, ১৪৫-১৪৮, ১৬০
সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) ৭৬, ৮২, ৮৫, ৯৮, ১০৭, ১১৬-১১৮, ১৪৪, ১৪৬, ১৫৯, ১৬৯ ২২০, ৪৪০
সাতক্ষীরা ২৯২
সাবিত খান ২২৯, ২৩২, ২৩৬, ২৪৫
সামন্ত ৩৬
সামুগড় ২৯৭
স্টাডিজ ইন মোগল ইন্ডিয়া, যদুনাথ সরকার প্রণীত ৪৪৪
স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম এ্যান্ড বিজিনিং অব ইন্ডিয়ান আর্কিওলজী ১০২
স্ট্যাপলটন, এইচ. ই. ৩০, ৪৯, ১০৭
সাঁওতাল পরগণা ৩৯

Edited by Ripon Sarkar

সমাচারদর্পণ ১৮৯, ২৮১
সম্বাদ ১৯১
সহমরণ (উচ্চ বর্ণের লোকেদের) ১৪৭
সামন্ত যুগ ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯২
[illegible] ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৬২
সিরাজগঞ্জ ৩৯
সিকান্দর শাহজাদা (সিকান্দর শাহ) ৪১-৪৪
সিকান্দর শাহ (দেখুন সুলতান সিকান্দর শাহ)
সিকান্দারপুর ২১৯
সিন্দুরী পরগনা ৫০
সিন্ধু দেশ ১৭১
সিন্ধু নদ ১৪২
সিলেট ৫, ১২, ১৪, ২১, ২৬, ৩১, ৬২, ৭১, ৭৫, ৭৭, ৮৫, ৮৮, ৯৯, ১০১, ২০৮, ২১৯, ২২০, ২২৮, ২২৯, ২৫৪-২৫৬, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৯১, ২৯৯, ৩০১, ৩০৫, ৩০৭, ৩২৮, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪৬, ৩৫০, ৩৬২, ৪১০, ৪৪১, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৫৯
সিরাজপুর ১১৯, ১২২
সিয়ার [illegible] ৬৯, ৭০
সিরাজগঞ্জ ১৭৮, ১৮০, ৩০২
সিলসিলা (সিলসিলা কাদিরি) ৬৯
সিং [illegible] ৬৯
সিরাজ খান ৩৫৯
সীতাকুণ্ড ৩৬৪
সীল, সিলেট, ৫, ১০০
সুখ-দ ৩৬
সুবর্ণ-দ ৩৬
সুনামগঞ্জ ২৫৮
[illegible] ৩৩
সুবর্ণরেখা নদী ১৫
সুর [illegible] ৩৭৭
সুরমা নদী ২৫৫
সুলতান আলা-উদ-দীন গাজী ১৬০
সুলতান আলা-উদ-দীন ফিরোজ শাহ ৫৮
সুলতান আলা-উদ-দীন হোসেন শাহ ৩৫, ৪৪-৪৬, ৫৭-৬০, ১০৪, ১৮৭
সুলতান তুগী [illegible] ১৪০
সুলতান [illegible] ৩৮১
সুলতান গাজী ৭৫, ৯৪, ৯৬
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ ২১৮
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন ইওজ খলজী ১৮৭
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তুঘলক ৪৪০
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন আজম শাহ ৫৮
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বাহাদুর শাহ ৫৮, ১০১
সুলতান গিয়াস-উদ-দীন মাহমুদ শাহ ৪৫, ৫৮-৬০, ৯৭, ৯৯-১০১, ১০৪, ১০৫
সুলতান জালাল-উদ-দীন ফতেহ শাহ ২৫৮
সুলতান জালাল-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ ২১৮
সুলতান নাসির-উদ-দীন নসরত শাহ ৫৮, ২৭৬
সুলতানপুর ৪৬০
সুলতান প্রতাপ ৭৫, ৯৪
সুলতান ফখর-উদ-দীন মুবারক শাহ ৪৩১
সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ৩২৩
সুলতান বারবক-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন ২০, ৯৮-১০১
সুলতান বাহাদুর শাহ (খান্দেশ) ১৪৪
সুলতান মুগীস-উদ-দীন ইউজবক ১৮৭
সুলতান মুহম্মদ বিন তুঘলক ৩২৩
সুলতান শামস-উদ-দীন ইলিয়াস শাহ ৩৫, ৬৬
সুলতান শামস-উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ গাজী ৫৮, ১০১
সুলতান সিকান্দর শাহ ৩৫
সুন্নী ১২, ১৮৮, ১৮৯, ১৯২, ১৯৪, ২৫৬, ২৭৯, ৩০২, ৪৫৮
সুফী কুঠি ৩৮০, ৩৯০-৩৯৩
সেলিম গাজী ৭৪, ৯৪
সেলিম প্রতাপ ৭৪, ৯৪
সৈয়দ আওলাদ হাসান ১০৭
সৈয়দ আলম বারহা ২২৬, ২৩১, ২৩২, ২৩৮, ২৪০
সৈয়দ আবু ইসহাক [illegible] ১০১
সৈয়দ আবু বকর ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০-৩৪৩-৩৪৬, ৩৪৯
সৈয়দ আবু সাঈদ ২৬৬, ২৬৮
সৈয়দ আলী ২৪০
সৈয়দ আহমদ ২৬৬
সৈয়দ ইসমাইল ৩৩৭
সৈয়দ কানু ২৭৪, ৩৪২, ৩৪০
সৈয়দ খান সুর ২৪১, ২৪২
সৈয়দ নিজাম-উদ-দীন ২৮০
সৈয়দ [illegible] ২৭২
সৈয়দ মুবারক ৪৪২, ৪৪৭
সৈয়দ মুহম্মদ ৩৪২
সৈয়দ শমস-উদ-দীন ২৮০
সৈয়দ হবীব ২৭০, ২৭১, ২৭৪, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৪০
সৈয়দ হবীব ১৮৫, ১৮৬
সৈয়দ হোসেন ১৪১

Edited by Ripon Sarkar

[illegible] ২২৯, ২৩৩, ২৩৮, ২৪৫
সোনাকান্দা ৭৩, ১৬৬
সোনাখিরা ৯৮
সোনাগাজী ৭৪, ৯৫, ১১১, ১১৬, ১২৯, ১৩২, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৯, ১৬০, ১৬৮, ৩০০, ৩০১, ৩২৫, ৩২৮, ৩৭১
সোনাবাজু ১৮৫-১৮৭, ৪৪১, ৪৪৬
সোনাবাড়িয়া ৩৮০
সোনামতী (সোনাই) ৫৩
সোনামুড়া ৪১৪
সোনারগাঁও (সুবর্ণ গ্রাম) ১৯, ৫৫, ৬৮, ৭০, ৭২, ৮৩, ৮৫, ৮৯, ৯১, ১০১, ১০৮, ১১১, ১৩১, ১৪০-১৪৪, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২১৭, ২১৮, ২৩৮, ৩২১, ৪৫০
সোনাবাদি ৩৭৫, ৩৭৯
সোলায়মান (দেখুন খাজা সোলায়মান)
সোলায়মান কররানী ২৬, ৫৫, ৫৮, ৬৮
সোলায়মান খান (কালীদাস গজদানী) ২০, ৫৬-৬০, ৯৯-১০১, ১০৪, ১০৫, ১৬৬
সোলায়মানাবাদ ২১৮, ৪৫৭, ৪৬৬
সোলায়মান মনকলি ১১৮
সোলায়মান সার্বভৌম ১৮৭
সোশ্যাল হিস্টরী, আবদুল করিম রচিত ৪৬২
সোহরাব খান ৪২৭, ৪২৮, ৪৪১

হ

হবিগঞ্জ ৭৫, ২৬০, ২৬২
হরগোপাল সিংহ ৩৪০
হরদেব (দেখুন চন্দ্রদেব)
হংস রাজা ৩৮২, ৩৮৩
[illegible] ৫৬, ৫৯, ১০৪, ১৪৮
হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ. ১৯, ৩০, ৭৮, ৮২, ৮৩, ৮৭, ১০৭
হাবিল হাওলা ২০৪
হাতিয়া ১২০
হাওয়াল মিয়া ২৭৬
[illegible] ১০৩
হাকিম আবদুল কাদের ১২৪, ১৩১
হাকিম নূর-উদ-দীন ১২৪
হাকিম সরদার ৪৬০
হাকিম মোমেন ১২৪
হাজারি ৭০
হাজী ইসমাইল ১০৭
হাজীগঞ্জ ১৪২, ১৬৫
হাজী বদরুদ্দীন ৭৫, ৯৫
হাজীপুর ১১৪, ১২৬, ১৩৭, ১৫০, ১৫১
হাজী শাহ ১০১, ১০৪
হাজী শামস উদ-দীন [illegible] ৭৫, ৯৫, ৯৬, ১১৯, ১২৩, ১২৭, ২১১, ২১৬, ২২৪, ২২৫
হাতিয়া ৩০৬, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৫৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৭৮-৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩, ৩৯৭, ৪৭১
[illegible] (দেখুন [illegible])
হাবশা ১৫৫-১৫৭
[illegible] ৩৬৯
হাতিয়া গেল ২২১
হাফিজ বড়ুয়া ৩৪১-৩৪৪, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৮৩-৩৮৬, ৩৮৮
হামজা ৩১৭, ৩১৯
হাবলা ৮৭, ৮৮
হাবিবা খাতুন, বি এ ২০, ১৪০ ১৬৫-১৬৭
হাসনাবাদ ৩৬১, ৩৯৮
হাবিব খান লোদী ৩৮৯, ৩৯১
হার্ভে, জি. ই. ১৯, ৩৩০, ৩৩৪, ৪৩০, ৪৬২, ৪৬৪
হাসনাবাদ ১০২
হুকুমতিয়া মুড়া ৩৮৮, ৩৮৯
হুলিচাঁদ ৩৮৪-৩৮৬, ৩৯৯
হুসেনপুর ২০৮, ২১০, ২২২, ২২৫, ২৫৮, ২৬৬, ৩০৪
হুসেন বেগ খান গাজী উজিরী ৪০২
হুসেনগঞ্জ ৩৮০, ৩৮৯, ৩৯৯
হিজলী ৫, ১৪, ২০, ২৬, ৪০-৪৭, ৮২, ৮৩, ৮৮, ১৮০-১৮৫, ১৮৯, ২৭৭, ৩০১, ৩০৪, ৩৬০, ৪২৬-৪২৮, ৩৩৯, ৪৪১, ৪৪৩, ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৭৬
হিজলীর মসনদ-ই-আলা, মহেন্দ্রনাথ করণ রচিত ৪০, ১২০
হিম্মত সিংহ ৬৫, ১৪২-১৪৫, ১৬১
হিস্টরী অব আসাম, ই. এ. গেইট রচিত ২০, ২১৬, ৩৬২, ৩৩৭
হিস্টরী অব দি মুসলমানস ইন ইন্ডিয়া, এস. এম. জাফর রচিত ১০২, ১০৬, ১০৭
হিস্টরী অব ইন্ডিয়া, এলফিন্সটন প্রণীত, ৪৬২
হিস্টরী অব জাহাঙ্গীর, বেনী প্রসাদ রচিত ২১০, ২৫৯, ৩৩৬, ৪৪৪, ৪৬২, ৪৬৪, ৪৬৫
হিস্টরী অব বাংলাদেশ, মোজাম্মিল রচিত ১৯

হিস্ট্রী অব বার্মা, ফেয়ার প্রণীত ১৯, ৩৬৩, ৩৬৪,
৪৪৪, ৪৬২, ৪৬৪
হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, চার্লস স্টুয়ার্ট প্রণীত ১, ১১৫,
১৬২, ১৬৩
হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ১, আর. সি. মজুমদার
সম্পাদিত ১
হিস্ট্রী অব বেঙ্গল, ভল্যুম ২, স্যার যদুনাথ
সম্পাদিত ১-৪, ২০-২২, ২৫, ৩৩, ৪১,
১৬৯, ২১২, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২৬১,
৩১৬, ৩১৮, ৩২৪, ৩৯৭, ৪০১, ৪২১,
৪২৪, ৪৪৬, ৪৬২, ৪৬৩
হিস্ট্রী অব দি পর্তুগীজ ইন বেঙ্গল, জে. জে. এ.
ক্যাম্পোস প্রণীত ২৪, ৩০, ১৬২, ৩৬৩,
৪৪৫, ৪৪৬
হিস্ট্রী অব শাহজাহান অব দিল্লী, বানারসী প্রসাদ
সাক্সেনা প্রণীত ৪৬৫
হীরা (হীরা পাজী) ৭৪
হুগলী ৮১, ৮৫, ৮৮, ১০৭, ১১৬, ১৩৪, ১৪৫,
১৪৬, ১৫১, ১৬৭, ১৬৯, ২৯২, ৪৩৪,
৪৩৭, ৪৬৪
হুমায়ুন ২৮, ৪৯, ৮০, ৯৭, ১৫০, ১৭৩, ৩২০
হুমায়ুন শাহ ৯৮, ৯৯
হুসেন (ইকরাম খান) ২৭২, ২৭৩, ২৭৭, ২৯৭,
৩১০, ৩১১, ৩১৭, ৩১৮, ৩২০, ৩২৩,
৩২৫, ৩২৬, ২৫৬
হেজাজ ১৪৭, ১৪৮
হেরাত ১৫০
হেরৌনা ৬৯, ৭০
হোদিওয়ালা, এস. এইচ. ২৮
হোসেন কুলী বেগ (দেখুন খান জাহান)
হোসেন খান ৭৫, ২১০, ২১১, ২৭৩
হোসেন বেগ ইস্তাক আলী ১৩১
হোসেন বেগ জলাল ১৩১, ১৩২
হোসেন শাহী পরগণা ৬৯, ৭১

Edited by Ripon Sarkar

Eidited by Ripon Sarkar